
সায়ন্তনী পূততুন্ড
অধিরাজ সিরিজ
কালরাত্রি

মানুষেরা কোভিডের বিভীষিকার স্মৃতি ভুলতে না-পারলেও দুঃখগুলো একটু একটু করে সইয়ে নিয়েছে। ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাত— 'ফ্যান্টম শিখ'! এবার তার লক্ষ্য কলকাতা, কল্লোলিনী তিলোত্তমা! ল্লি, কানপুর, বেঙ্গালুরুর পর এবার কলকাতার কেঁপে ওঠার পালা!

গ্যাংস্টার 'কাটার-মদন' এর পিছু করতে-করতে অধিরাজ আর টিম জড়িয়ে পড়ে এক নৃশংস মাস-মার্ডারে। এক বীভৎস দর্শন খুনি যাকে দেখে পোড় -খাওয়া ক্রিমিনালরাও ভয়ে ভিরমি খায়।

জর্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালে... খালিস্তানের দাবিতে পাঞ্জাবে রীতিমতো হিন্দুনিধন... ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা... সর্বোপরি '৮৪-এর দিল্লির 'শিখ ম্যাসাকার'...

আর এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন....

কালরাত্রি

(ইতিহাসের ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মুখোমুখি অধিরাজ)

সায়ন্তনী পূততুন্ড



বিভা পাবলিকেশন
রাজারহাট রেসিডেন্সি, কলকাতা-১৫৭

KALRATRI by Sayantani Putatundu Published by Biva Publication 1K, Uday, Rajarhat Residency, Roypara, Hatiara, Kolkata 700157 Phone : 9434343446 e-mail : biva.publications@gmail.com follow us facebook.com/BivaPublication Website : www.bivamart.in

₹649.00
ISBN: 978-81-969528-8-4

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২৪, অগ্রহায়ণ ১৪৩১
প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী
অলংকরণ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
মূল্য : ৬৪৯ টাকা (ভারতীয় মূল্য)
প্রকাশক : বিভা পাবলিকেশন
প্রিন্টার্স : গ্রানকো প্রেস (মুন্না)
৪৪ বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯
পরিবেশক : বিভা মার্ট
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
অক্ষর ডট এক্সওয়াইজেড (বাংলাদেশ),
ট-৬৮/৩, সৈয়দবাড়ি, বৈশাখী সরণী, গুলশান লিংক রোড, ঢাকা -১২১২

সেই সমস্ত পাঠকদের, যারা সত্যিই টিম অধিরাজকে ভালোবাসেন ও পাশে থাকেন। তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।



আমার কাহিনি এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের জুবানি
(১৯৮৪)

ঘটনাবহুল সাল! অথবা রক্তক্ষয়ী একটা বছর। প্রতি পদক্ষেপে ভুল সিদ্ধান্ত ও একটা ভুল ঢাকতে আর একটা ভুল, সেই ভুল ঢাকতে আরও কিছু ভুল। আর অবশেষে সব কিছুর মাশুল ...!

খুন! আবার খুন! খুন কা বদলা খুন! তার বদলে আবার খুন...! আর্মি, হত্যা, দাঙ্গা! এবং একের পর এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ইতিহাস। সাহিত্যে মাত্র একটাই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ছিল। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে বারবার সে এসেছে নতুন রূপে, নতুন চেহারায়। রক্তবীজের মতোই বারবার জন্ম নিয়েছে সে। আর বারবার হত্যা হয়েছে মানবতার!

বছরটা শুরুই হয়েছিল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গল্প দিয়ে। উন্মাদ কিংবা অতিচালাক জর্নেল সিং ভিন্দ্রাওয়ালের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের পাঞ্জা কষা শুরু হয়েই গিয়েছিল আগেই। ভিন্দ্রানয়ালেকে কোনো মানুষ তৈরি করেনি। এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের জন্ম দিয়েছিল স্বয়ং রাজনীতি! অকালি দলের কাছে কংগ্রেসের হেরে যাওয়ার পর জ্ঞানী জৈল সিং ও সঞ্জয় গান্ধীর পালটা চাল ছিল জর্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালে। ফলও পাওয়া গিয়েছিল হাতে-নাতেই। পরবর্তী ইলেকশনে ভিন্দ্রানয়ালে কংগ্রেসের জয়ের পথ মসৃণ করে দিয়েছিল।

কিন্তু তখন কে জানত, এই বোড়েই একদিন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হবে! ছোটোখাটো গুণ্ডা ভিন্দ্রানয়ালে রাজনৈতিক মদতে ত্রাসের অপর নাম হয়ে উঠল। দমদমি টাকশালের চতুর্দশতম 'জাঠেদার গোটা পাঞ্জাবের অধীশ্বর হতে চাইল। এবং বলাইবাহুল্য ক্ষমতার আগ্রাসী খিদেয় নিজের সৃষ্টিকর্তাকেই গিলে খেতে চাইল। স্বাধীন খালিস্তানের দাবিতে সে পাঞ্জাবে রীতিমতো হিন্দুনিধন যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী তাকে আরও আগে থামাতে পারতেন, কিন্তু জ্ঞানী জৈল সিং-এর অতিরিক্ত মহানুভবতায় গোকুলে বাড়ার মতোই নিশ্চিন্তে বেড়েছিল ভিন্দ্রানয়ালে৷ এতটাই বাড় বেড়েছিল যে অকাল তখতের ওপর কবজা করতেও পিছ-পা হয়নি। অদম্য সাহসে বলেছিল—"আর্মি সামনে দিয়ে ঢুকবে, আমি পেছন দিয়ে বর্ডার পেরিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছে যাব।"

এই অহংকার ও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই তার কাল হল। দশ মাথাওয়ালা রাবণও অহংকারের এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা পাননি, জর্নেল সিং ব্রারের তো একখানাই মাথা ছিল। নিজের কফিনে সে শেষ পেরেক ঠুকেই দিয়েছিল ১৯৮৩ সালের ২৫ এপ্রিলে। স্বয়ং পাঞ্জাব পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অবতার সিং অটওয়াল এসেছিলেন স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা করতে। স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র সিঁড়ির ওপরই তাঁকে খুন করেছিল ভিন্দ্রানয়ালের লোকেরা। এমনই আতঙ্ক ছিল, যে পুলিশ টিম দূর থেকে হতভাগ্য ডি.আই.জি.-র লাশ পড়ে থাকতে দেখলেও ধারে কাছে যাওয়ার সাহসই পাচ্ছিল না। জানি না অকাল তখতে বসে ঈশ্বর ঠিক কীভাবে তাকিয়েছিলেন সেই হতভাগ্যের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে। তাঁর চোখে নির্লিপ্তি ছিল? না মর্মান্তিক অসহায়তা। অথবা তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে প্রতিটা অশুভ শক্তিই যখন 'নারী' নামক শক্তির সঙ্গে পাঞ্জা কষতে যায়, তখন তার শেষ পরিণতি ঠিক কী হতে পারে। মহিষাসুরের সর্বনাশ করার জন্য দেবী দুর্গা ছিলেন, রক্তবীজকে ঠেকানোর জন্য মহাকালী, রাবণের সর্বনাশের কারণ ছিলেন সীতা আর কুরুরাজ্য ধ্বংস হওয়ার পেছনে এক ও অদ্বিতীয়া নারী - দ্রৌপদী! ভিন্দ্রানয়ালের সামনেও তখন এসে দাঁড়িয়েছিলেন এক নারী ইন্দিরা গান্ধী!

আমি কিন্তু তাকে সমর্থন করি না। অকাল তখতের ওপর কোনো মানুষের অধিকার থাকতেই পারে না। হিন্দুদের নিধনও ক্ষমার অযোগ্য। যেভাবে সে একের পর এক নৃশংস

হত্যাকাণ্ড করে বেড়াচ্ছিল তাতে আর যা-ই হোক, তাকে মানুষ বলা চলে না। ভিন্দ্রানয়ালের কাজ নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক ও অসমর্থনযোগ্য। মুশকিল হল, ভিন্দ্রানয়ালের মতো রাক্ষসকে দমন করার জন্য শেষ পর্যন্ত যে পদক্ষেপ নিলেন ইন্দিরা গান্ধী, তা আর এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের জন্ম দিল। অনেক নিরীহ মানুষকে খুন করেছিল সে, তাই 'খুন কা বদলা খুন'তার কপালে লিখেছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। অপারেশন ব্লু স্টারের মাধ্যমে সেনাবাহিনী জর্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালেকে শেষ করল ঠিকই, কিন্তু সেই শ্যুট আউটে মারা গেল অনেক নিরীহ মানুষ। সবচেয়ে বেশি দুঃখ ও আতঙ্কের কথা—চরম ক্ষতিগ্রস্ত হল অকাল তখত। শয়তানকে শেষ করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল ঈশ্বরের আসন!

আমি অপারেশন ব্লু স্টারকে সমর্থনও করি না, অসমর্থনও করি না। আর্মি কোনোদিন নিরীহ মানুষের রক্তকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু শ্যুট আউটে তাদের মৃত্যুকে সমর্থন করা যায় না। সমর্থন করা যায় না অকাল তখতের অবমাননা। আবার ভিন্দ্রানয়ালের বিনাশও জরুরি ছিল। আর যা-ই হোক, বাঘের সামনে প্রেমের কীর্তন গেয়ে রক্ষা পাওয়া মুশকিল। আর জর্নেল সিং বাঘের থেকেও খারাপ এককথায় র‍্যাবিস সহ খ্যাপা কুকুর। তাই ভিন্দ্রানয়ালেকে সমূলে উৎখাত করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল কি? তবে সাধারণ মানুষের রক্তপাত ও অকাল তখতের সর্বনাশ কি এড়ানো যেত না? কে জানে, হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তেই ঈশ্বর ফের লিখেছিলেন—'খুন কা বদলা খুন!

অপারেশন ব্লু স্টার এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের অন্ত করলেও আরও দু-জনের জন্ম দিয়েছিল! হ্যাঁ, সবাই তাদের নাম জানে। বেয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং! তাদের পেছনে ছিল কেহর সিং। ছিল দমদমি টাকশাল। একত্রিশটা বুলেটে তারা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর পার্থিব শরীর। অথচ অপারেশন ব্লু স্টারের পর গোয়েন্দাবিভাগ বেয়ন্ত সিং সহ সমস্ত শিখকে ইন্দিরা গান্ধীর দেহরক্ষীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। তাদের কাছে শিখদের অসন্তোষ ও প্রধানমন্ত্রীর হত্যার ষড়যন্ত্রের খবর ছিল। ইন্দিরা স্বয়ং বেয়ন্ত সিংকে নিজের সুরক্ষাকর্মীর পদে পুনর্বহাল করেন। তিনি জানান, "আমার শিখ রক্ষীদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তারা বেইমান নয়।"

একে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ছাড়া আর কী বলব। ইন্দিরার অতিবিশ্বস্ত বেয়ন্ত সিংই শেষে অকাল তখতের প্রতিশোধ নিল। একত্রিশটা গুলি... সর্বমোট একত্রিশটা গুলি মারতে পেরেছিল ওরা। তেইশটা গুলি তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সাতটা দেহের মধ্যেই আটকে ছিল। একটা মাথার চামড়া চিরে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। পোস্টমর্টেমের সময়ে ডাক্তাররা তাঁর যকৃতই খুঁজে পাননি। আততায়ীরা তাঁর পেট লক্ষ্য করে এত গুলি চালিয়েছিল যে লিভার প্রায় টুকরো টুকরোই হয়ে গিয়েছিল। বুকের হাড়ও আস্ত ছিল না। প্রায় ছ-ঘণ্টা ধরে যমের সঙ্গে প্রায় মরণপণ যুদ্ধ করে শেষমেষ দুটো বেজে কুড়ি মিনিটে ইন্দিরা গান্ধীকে মৃত ঘোষণা করেন 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স' তথা 'এইমস'-এর ডাক্তাররা। ততক্ষণে 'এইমসে'-র সামনে হাজার হাজার জনতা ভিড় জমিয়েছে।

১৯৮৪ সালের ৩০ অক্টোবর, ভুবনেশ্বরে ইন্দিরা নিজের শেষ জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "হয়তো কাল আমি বেঁচে থাকব না। তবু আমার দেহের প্রতিটা রক্তবিন্দু ভারতকে মজবুত করবে ও দেশের ঐক্য বজায় রাখবে!" কেউ জানে না, কী ভেবে তিনি শব্দগুলো বলেছিলেন। কিন্তু পরের দিন দিল্লির সফদরজঙ্গের রাস্তায় সত্যিই তাঁর রক্তবিন্দু ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে একত্রিশটা বুলেটের খোল! তাঁর শেষ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, এই রক্তবিন্দু ভারতকে আরও শক্তিশালী করবে ও সবাইকে ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে রাখবে। অথচ সেই রক্তের প্রতিটা ফোঁটা গোটা দিল্লিকে ভেঙেচুরে দিয়েছিল সেদিন। রয়ে গেল শুধু ইন্দিরার সেই বিখ্যাত 'ব্লাড অ্যান্ড ইউনিটি' স্পিচের কয়েকটা শব্দ— "মেরা খুন কা এক এক কতরা...!"

আমি এ ঘটনাকেও সমর্থন করব না। বেয়ন্ত সিং, সতবন্ত সিং আমার কেউ হয় না! কিন্তু তা-ও তাদের আন্তরিক ঘৃণা করি। কারণ তাদের কীর্তি দেখে ফের ঈশ্বরের কলমের নিব ভেঙে গেল। ফের তিনি লিখলেন—'খুন কা বদলা খুন! যুগে যুগে খুনের প্রতিশোধ নিতে নামে একদল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন! এবার সামনে এল স্বয়ং জনতার তৈরি করা রাক্ষস! খোদ সরকারই বদলা নিতে নামল! আর বলি হল নির্দোষ কিছু মানুষ। শুরু হল সেই অন্ধকার বাহাত্তর ঘণ্টা। আমার জীবনের সবচেয়ে কালো অধ্যায়। যা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল সব কিছু। মায়ের স্নেহ, বাবার আশ্রয়, দিদির প্রশ্রয়, জেঠুর চওড়া কাঁধে মাথা রাখার সুখ, দাদার আদর, এমনকি শৈশবও ওই অভিশপ্ত দিনে ছেড়ে গিয়েছিল আমায়। শুধু টের পেয়েছিলাম ফোঁটা ফোঁটা রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার 'টপ টপ'শব্দ। হয়তো সেদিন বিধাতার নীরব অশ্রুও মিশে গিয়েছিল ওই রক্তের সঙ্গে। মেরা খুন কা এক এক কতরা...!

অ্যান্টি শিখ রায়ট। ১৯৮৪ শিখ ম্যাসাকার। ১৯৮৪ শিখ জেনোসাইড! অর্গানাইজড পোগ্রমস এগেইনস্ট শিখ! মাস মার্ডার। মাস রেপ! লুটিং, নেকলেসিং, অ্যাসিড থ্রোয়িং...। সাড়ে তিনহাজার, আট হাজার, সতেরো হাজার... ওঃ। এতকিছুর বদলে একটা শব্দ দিতে পারি। কালরাত্রি। ৭২ ঘণ্টা লম্বা এক অন্ধকার মৃত্যুশীতল রাত্রি। যে রাতের শেষ নেই। রক্তে এত পিচ্ছিল যে ঠিকমতো দাঁড়ানো যায় না, এত ভয়ংকর যে সহ্য করা যায় না। সে গল্প আমি শোনাব। অবশ্যই শোনাব সেই বাহাত্তর ঘণ্টার তাণ্ডব! এতগুলো দশক কেটে গেল, তারপরও ভুলতে পারি না সেই দৃশ্যগুলো। সেই রক্তহিম করে দেওয়া চিৎকার—"খুন কে বদলে খুন, সর্দার গদ্দার হ্যায়।" সেই তরোয়াল দিয়ে কতগুলো অসহায় মানুষকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। গর্ভবতীর পেট তরোয়াল দিয়ে চিরে, গর্ভস্থ শিশুকে বের করে এনে, সেই অসহায় সদ্যোজাতর নগ্ন, রক্তাক্ত লাশ তরোয়ালের তীক্ষ্ণ ফলায় গেঁথে নিয়ে ঘোরানো...! সেই গলায় জ্বলন্ত টায়ার পরে মৃত্যু যন্ত্রণায় আগুনে পাখির শেষ ছটফটানি.... ওঃ ঈশ্বর।

এত কিছু হওয়া সত্ত্বেও আর্মি নামল না। রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং-এর গাড়ির ওপরও আক্রমণ হল। তবু রাজীব গান্ধী হত্যা বন্ধ করতে সেনাবাহিনী নামালেন না! পুলিশ হত্যাকারীদের ঠেকানোর বদলে সাহায্য করতে শুরু করল। একটা আস্ত ট্রেন ভাড়া করে এসে পৌঁছোল আততায়ীর দল। সঙ্গে অস্ত্র, জ্বালানি তেল! পেট্রল পাম্প থেকে প্রচুর পরিমাণে ডিজেল, পেট্রল, গ্যাসোলিন ও কেরোসিন তেল জোগান দেওয়া হল। দলে দলে ছড়িয়ে পড়ল তারা। সুলতানপুরী, মঙ্গলপুরী, ত্রিলোকপুরী সমেত দিল্লির প্রায় সমস্ত শিখ পরিবারের বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। গুরুদ্বারাও জ্বলেপুড়ে ছারখার! গোটা দিল্লিতে যখন একটিও শিখ পুরুষ বেঁচে নেই, তখন মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে রাজীব বললেন, "যখন কোনো সুবিশাল বটবৃক্ষ উপড়ে পড়ে, তখন আশেপাশের মাটি তো কেঁপে উঠবেই।"

মানে! রাজীব কি প্রকারান্তরে অ্যান্টি শিখ রায়টকে জাস্টিফাই করলেন? হয়তো তাই, হয়তো নয়—কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, এটা জাস্টিফিকেশনই বটে! বড়ো দুর্বল জাস্টিফিকেশন! এর চেয়ে নীরবতাই ভালো ছিল না কি? কী প্রয়োজন ছিল এই বাক্যটার? না কি এর আড়ালে কয়েকটা রাক্ষসের মুখ লুকোতে চেয়েছিলেন তিনি? শ্যাম ত্যাগী, ভুপ ত্যাগী, মন্ত্রী এইচ কে এল ভগৎ, বলওয়ান খোখর, শঙ্কর লাল শর্মা, পি কে ত্রিপাঠী, ব্রহ্মানন্দ গুপ্তা এবং সজ্জন কুমারের মতো অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন? না খোদ জগদীশ টাইটলারকে আড়াল করছিলেন, যিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "আমি আরও বেশি শিখকে মারতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সঙ্গীদের অপদার্থতায় মাত্র কয়েকজন শিখই মারা গিয়েছে।" মাত্র। আঠেরো হাজার মানুষের জন্য একটাই শব্দ, 'মাত্র।' শুধুমাত্র দিল্লিতেই তিন থেকে পাঁচহাজার শিখ মারা গিয়েছিল। এটা শুধু দিল্লির হিসাব। গোটা দেশের 'আঁকড়া' কেউ কখনও বলেনি। সরকার ধামাচাপা দিয়েছে। আসল অঙ্কটা লুকোনোর জন্য অনেক চেষ্টা চালিয়েছে।

প্রত্যেকবারই রাজনীতি সাধারণ মানুষকেই গিলোটিনে চড়ায় কেন? তখন আমি না ব্লু স্টার অপারেশন বুঝতাম, না বেয়ন্ত সিংকে চেনা ছিল। ইন্দিরা গান্ধীকে স্বচক্ষে দেখিনি। তাঁকে আমি বা আমার পরিবারের কেউ তো মারেনি। যে ধর্ম নিয়ে এত টানাটানি, সে ধর্মকে ঠিকভাবে বোঝার ক্ষমতাও আমার হয়নি। তবে কেন ঈশ্বর ফের কলম ভেঙে আমার কপালে লিখে দিলেন——খুন কা বদলা খুন।'

(২০২২)

আবার সেই কালরাত্রি ফিরে আসছে। কেউ জানে না, ১৯৮৪-এর অ্যান্টি শিখ রায়ট জন্ম দিয়েছিল নতুন এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের! যারা তাকে সৃষ্টি করেছিল, তাদের শেষ করতে আসছে সে। ইতিহাস সে মুখগুলোকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নিজের স্রষ্টাদের ভোলেনি। কখনোই ভোলে না।

সে আমি! এখন ওদের হাতেও স্রেফ বাহাত্তর ঘণ্টা। ওদের আয়ুও বাহাত্তর ঘণ্টা। পুলিশের হাতেও মাত্র তিনদিন। যে পুলিশ সেদিন স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছিল, আমাদের বাঁচাতে আসেনি, তারাও ওদের বাঁচাতে পারবে না। আমি বাঁচাতে দেব না। যে-ই মাঝখানে আসবে, সে-ই মরবে। পুলিশ হোক, আইন হোক কিংবা গোটা কোর্ট! আবার জ্বলবে আগুন। আবার পুড়বে মানবদেহ! আবার বইবে রক্তের বন্যা....!

"তুমহারা খুন কা এক এক কতরা....!"

(১)

তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত দুটো বাজে। শীতের শহর লেপ, বালাপোষের কবোষ্ণ আরামে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই! চতুর্দিকে শুধু পিনপতনের স্তব্ধতা। রাস্তায়, পথে ঘাটে, গলি-ঘুঁজিতে কুয়াশার অস্পষ্ট চাদর ছেয়ে আছে। শীতল চাঁদের আলো এসে পিছলে পড়েছে মসৃণ পিচের রাস্তায়। কিন্তু সেই আলোও বড়ো রহস্যময়! যেন ভীতু ভীতু বিবর্ণ একটা আভা ছেড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের গহ্বরে। কুয়াশার আস্তরণ যেন পৃথিবীর মাঝখানে একটা সীমারেখা তৈরি করেছে। এ প্রান্তে শান্তি, ঘুম আর নীরবতা। কিন্তু সেই আস্তরণ ভেদ করে অন্যদিকে চলে গেলেই বুঝি খুলে যাবে অন্য এক পৃথিবীর দ্বার। যেখানে হিংসা, অস্ত্র আর মৃত্যু রক্তাক্ত নখ দাঁত বের করে শিকারের আশায় ওঁত পেতে আছে। কেউ জানে না, কত অজ্ঞাত, অন্ধকার প্রবৃত্তির বাস সেখানে। তারা তাদের ছায়া ছায়া শীর্ণদেহ নিয়ে অতৃপ্ত আত্মার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। নরখাদকের মতো উজ্জ্বল সবুজ হিংস্র চোখে মাপছে অন্ধকারকে। যদি দু-চারটে শিকার পাওয়া যায়।

আচমকাই সেই শান্ত কুয়াশাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে একটা গাড়ি লাল চোখ দেখিয়ে হুশ করে সবেগে চলে গেল অন্ধকারের দিকে। মসৃণ পিচের রাস্তা দিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলেছে লাল রঙের একটা মারুতি সুইফট। তবে সে একা নয়। ঠিক তার পেছন পেছনই প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে আসছে টাটা সাফারি স্টর্ম। যেন রাতের শুনশান রাস্তায় কার রেসিং চলছে! কে কাকে গতিবেগে টক্কর দেবে সেটাই দেখার। দুটো গাড়িই স্পিডলিমিটের চরম সীমা ক্রস করে ফেলেছে। প্রাথমিকভাবে দেখলেই সন্দেহ হয়, হয়তো বা কোনো বে-আইনি রেস সংঘটিত হচ্ছে এই অন্ধকার রাত্রির আড়াল নিয়ে। নৈঃশব্দের মধ্যে দুটো চার-চাকার দ্রুত চলে যাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

কিন্তু সেই শীতল নিস্তব্ধতার আয়ুও বেশিক্ষণ নয়। নিস্তরঙ্গ শান্তিকে খান খান করে দিয়ে সরোষে গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র! প্রচণ্ড বেগে ধাবমান দুটি গাড়ির মধ্যে ফায়ারিং চলছে। মারুতি সুইফটের ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা ব্যক্তিটি পেছনের সাফারি স্টর্মের সামনের কাচ লক্ষ্য করে ফায়ার করেছে। বুলেটটা অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ধাতব 'ঠং'আওয়াজ শোনা যায়। সম্ভবত বুলেটটা গাড়ির মজবুত দেহ স্পর্শ করেছে।

"শালা, শুয়োরের বাচ্চা।"

সাফারি স্টর্মের সামনের সিটে বসে থাকা ব্যক্তি দাঁতে দাঁত চেপে হাত আর কাঁধকে খোলা জানলা দিয়ে অদ্ভুত কায়দায় খানিকটা বাইরে বের করে সামনের সুইফটটাকে তাক করে দু-বার জবাবি ফায়ার করল। বারুদের গন্ধে এখন নিঃশ্বাস নেওয়াই দায়। কুয়াশার ভেতরেও বারুদের কটু গন্ধ। দুটো গাড়ি সেই অস্পষ্ট চাদরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলেও একদম সরিয়ে দিতে পারেনি। যার ফলে দুই পক্ষের কেউই প্রতিদ্বন্দ্বীকে একদম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে একে অপরকে মাত দেওয়ার। সুইফটের গতিবেগ আরও বাড়ছে। তাল মিলিয়ে হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছে সাফারি স্টর্মও।

"টায়ারটা ফাঁসিয়ে দিতে পারলেই হত।" দ্বিতীয় গাড়িতে বসে থাকা গোঁফওয়ালা সুগঠিত চেহারার এক যুবক এতক্ষণ সামনের গাড়িটাকে টার্গেট করছিল। ব্যর্থ হওয়ার বিরক্তিতে বলে উঠল-"কিন্তু কুয়াশার জ্বালায় শা কিছু ঠিকমতো দেখতেই পাচ্ছি না। আর ব্যাটা রেসও লাগিয়েছে দেখো! গাড়ি চালাচ্ছে না স্পেসশিপ বুঝতেই পারছি না। এ মাল তো মনে হয় চাঁদে ল্যান্ড করেই ছাড়বে। ইসরো খামোখাই পরিশ্রম করে মরছে!"

আসলে এই মুহূর্তে কার রেসিং নয়, চেজিং চলছে! সি আই ডি হোমিসাইডের অন্যতম সুপারস্টার খবরি ঘন্টু টিপ দিয়েছিল রাজারহাটের কাছে একটি 'পাব'-এ বিখ্যাত গ্যাংস্টার 'কাটার' মদন আসবে। 'কাটার' মদন নামটা শুনতে তুলনামূলক নিরীহ হলেও, লোকটি আদপেও তা নয়। গ্যাংকে তফাতে রাখলে, একা শুধু ওর বিরুদ্ধেই অন্তত পঁচিশটা খুন,

এক্সটর্শন, চল্লিশটা রেপ, বারোটা অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের কেস আছে। একটি মেয়েকে সর্বসমক্ষেই রেপ করে তাকে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছিল। উপস্থিত জনগণ স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। কেউ ভিডিও তুলছিল, কেউ বা আবার ভয়ে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল-কিন্তু একজনও প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ করবে কী করে। এ দেশের পুলিশের হাতে যে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, তার প্রত্যেকটা গুলির হিসাব দিতে হয়। কিন্তু 'কাটার' মদন কোনো হিসাবের তোয়াক্কা করে না। তাই তার নিজের এবং সঙ্গীদের হাতে অটোম্যাটিক রাইফেলই বেশি থাকে। গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়ার শখ আর যারই হোক—ছাপোষা জনগণের নেই।

সি আই ডি বহুদিন ধরেই ওর পেছনে লেগে আছে। হোমিসাইডের বিখ্যাত এনকাউন্টার এক্সপার্ট প্রণবেশ লাহিড়ী একবার মদনকে ধরার জন্য ওর ডেরায় ফোর্স নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মদন আগেই খবর পেয়ে রেডি হয়ে বসেছিল। যে মুহূর্তে প্রণবেশ টিম সমেত ওর বাড়ির গলিতে ঢুকলেন, ঠিক তখনই সে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে অতর্কিতে হামলা করল। অবিকল উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত মাফিয়া বিকাশ দুবের স্টাইলে পুলিশের শিকার করার জন্যই আশেপাশে সদলবলে ওঁত পেতে ঘাপটি মেরে বসেছিল মদন। প্রণবেশও ছেড়ে দেওয়ার লোক ছিলেন না। তাঁর টিম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও একাই লড়ে গিয়েছেন। ফলস্বরূপ পরিণতিটা অত করুণ হয়নি। একজন পুলিশকর্মী বিপজ্জনকভাবে আহত হয়েছিল। স্বয়ং প্রণবেশের কাঁধ ছুঁয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি তথাকথিত সি আই ডি হোমিসাইডের এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্টের। মদন অবশ্য সেই শ্যুট আউটের কভার নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই মিডিয়া তাকে পশ্চিমবঙ্গের 'বিকাশ দুবে' বলে ডাকতে শুরু করেছে। গুজব, সে নাকি বিহার-উত্তরপ্রদেশের দিকেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। সে কথা জানতে পেরে আবার প্রণবেশ লাহিড়ী তুমুল চটে প্রেস কনফারেন্সে বলে বসে আছেন—"বটে? বিকাশ দুবে? ওর অবস্থাও তবে বিকাশ দুবের মতো করেই ছাড়ব।" সেই ডায়লগ দেওয়ার পর থেকেই মিডিয়া ফের লম্ফঝম্প শুরু করেছে। পুলিশকে 'গুণ্ডা' ও 'লাহিড়ী কোটালের' বিবৃতিকে 'হুমকি' হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরেছে তারা। অপেক্ষা করছে এবার উত্তরপ্রদেশের মতোই পশ্চিমবঙ্গে কবে গাড়ি ওলটাবে।

"কী মনে হয় রাজা? আজ গাড়ি ওলটাবে?"

গোঁফওয়ালা যুবকের প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা 'রাজা' তথা অধিরাজ মৃদু হাসল, "তোমার কী মনে হয় অফিসার আচার্য?"

অফিসার আচার্য তথা পবিত্র মুখটা একটু বেঁকিয়ে বলে, "ধুস! জমছে না। গ্যাংস্টারদের কেমন সুন্দর গালভরা নাম থাকে। দাউদ ইব্রাহিম, ছোটো শাকিল, শ্রী প্রকাশ শুক্লা, মানেয়া সুর্ভে কিংবা ফিলহালের অতীক এহমদ বা লরেন্স বিশনোই। আর কিছু না হোক, বিকাশ দুবে, গোল্ডি ব্রার বা টিল্লু তাজপুরিয়ার নামের মধ্যেই বেশ গ্যাংস্টার গ্যাংস্টার গন্ধ আছে। সেখানে এ ব্যাটার নাম 'মদন' কে রাখল বলো তো! বাড়িতে গিয়ে বউকে যদি বলি, 'মদনাকে মেরে এসেছি, তাহলে বলবে তার চেয়ে রান্নাঘরের আরশোলাগুলোকে তো মারতে পারো। নামের মধ্যে কোনো ওয়েটই নেই...!"

পবিত্র কথাটা শেষ করতে-না করতেই ফের আগের গাড়িটা থেকে ফায়ারিং শুরু হয়ে গিয়েছে। পবিত্র'র ঠিক সামনের কাচটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। সে বিদ্যুৎগতিতে ডাক্ করে সিটের নীচে কভার নিয়েছে। অধিরাজ আশঙ্কিত হয়ে ওঠার আগেই শুনতে পেল তার বিরক্তিমাখা কণ্ঠস্বর, "হারামিটা কনভার্সেশনের মাঝখানে ফায়ার করে কেন। এটা কী জাতীয় ভদ্রতা?"

অর্ণব পেছনের সিট থেকে জানতে চাইল, "স্যার, আপনি ঠিক আছেন?"

"বেঁচে আছি।" পবিত্র সন্তর্পণে উঠে এসে সুইফটটাকে তাক করে ফের ফায়ার করল, "তবে এটার বাপের আর চোদ্দপুরুষের নাম পালটে খগেন না করেছি তো আমার নাম পবিত্র আচার্যই নয়।"

অর্ণব একটু নিশ্চিন্ত হল। তবে চিন্তার কারণ এখনও আছে। আজ ওরা ঠিক এনকাউন্টারের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেনি। হয়তো আরও একটু জনবলের প্রয়োজন ছিল। আসলে বেশ কয়েকমাস ধরেই মদন আন্ডারগ্রাউণ্ডে ছিল। এর মধ্যে খবরিরা তার টিপ দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু একটা টিপও সঠিক ছিল না। যখন ঘন্টু জানাল, সুইট ড্রিম 'পাব' এ আজ রাতে মদন আসতে পারে, তখনও খবরটা পাকা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ঘন্টু জানিয়েছিল ওই পাবে মদনের সাম্প্রতিক শয্যাসঙ্গিনী চাকরি করে। অনেকদিন ধরে মালটা বিরহে আছে। তার ঠ্যালা সহ্য করতে না পেরে আজ ব্যাটা নিজের গর্ত থেকে বেরোলেও বেরোতে পারে। কিন্তু একদম নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

মদনের জীবনে নারী হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা। অথচ তার আগমনের খবরটাও অনিশ্চয়তায় ভরা। ওদের আগের টিপগুলোও ব্যর্থ হয়েছে। তবু অধিরাজ ঘন্টুর ট্র্যাক-রেকর্ড দেখে একটা চান্স নিয়েছিল। সন্ধেবেলা থেকেই অধিরাজ, অর্ণব আর পবিত্র ফিল্ডিং দিচ্ছিল পাবের ভেতরে। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল, এই খবরটাও সম্ভবত ভুল প্রমাণিত হতেই চলেছে। কিন্তু রাত ন-টা নাগাদ যখন এক স্বল্পবসনা সুন্দরী স্বপ্নময় আলোয় পারফর্ম করতে এলেন, তখনই অধিরাজের চোখ পড়ল এক উত্তেজিত কাস্টমারের দিকে। তার সতর্ক দৃষ্টি নিমেষে জানিয়ে দিল নিঃসন্দেহে ওটা মদনই। দাড়ি-গোঁফ, চুল কেটে হুলিয়া বদলেছে ঠিকই। কিন্তু তবুও চিনতে কোনো ভুল হয়নি।

অধিরাজ চুপি চুপি অর্ণব ও পবিত্রকে ইনফর্ম করলেও ওদের কোনোরকম অ্যাকশন নিতে বারণ করল। সে আগে নিশ্চিত করে নিতে চেয়েছিল 'কাটার মদনের সঙ্গে তার অটোম্যাটিক রাইফেলধারী কোনো সঙ্গী আছে কিনা। যদিও পৃথিবীর সবচেয়ে চালাক খুনিটিও গোপনে নিভৃত অভিসারে যাওয়ার সময় রাইফেল ঘাড়ে নিয়ে যায় না, তবু একবার যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। অধিরাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মদনকে ভালো করে দেখে নিচ্ছিল। না, তার আশেপাশে কেউ নেই। হয়তো বা প্রেমিকার উষ্ণ সান্নিধ্যে থাকার সময়ে সে অন্য কারোর উপস্থিতি পছন্দ করে না। বড়ো বড়ো রাজা-বাদশারাও নিজের রানিদের সঙ্গে প্রেম করার মুহূর্তে বিশ্বস্ততম দেহরক্ষীকেও সরিয়ে দিতেন, মদন তো নামেও মদন, কাজেও মদন! সুতরাং অটোম্যাটিক রাইফেল বা সঙ্গী-সাথীদের উপস্থিতি না থাকাই স্বাভাবিক। তবে জাতে কালকেউটে যখন, তখন ছোট্ট হলেও একটা বিষদাঁত নিয়ে ঘুরবেই। অটোম্যাটিক রাইফেল না থাক, তার কোমরে গোঁজা আগ্নেয়াস্ত্রটা নজর এড়ায়নি অধিরাজের। সে নীচুস্বরে বাকি দুই অফিসারকে বলে, "ওর সঙ্গে গ্লক জি টোয়েন্টি ওয়ান আছে। এখনই কিছু করতে যেও না।"

"ধরব না?" পবিত্র আহত স্বরে বলে, "সেই কখন থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং দিচ্ছি। একটা লোপ্পা ক্যাচ পেলাম, সেটাও তুমি মিস করতে বলছ!"

"মিস করার প্রশ্নই ওঠে না। এরকম সুযোগ বারবার আসে না। আজ ওর সঙ্গে দলবল নেই, রাইফেলও নেই। এই সুযোগেই কর্ণবধ করব না তো কবে করব!" অধিরাজ জানায়, "কিন্তু এটা পাবলিক প্লেস। জেমস বন্ডের মতো দুমদাম করে গুলি চালালে নিরীহ মানুষ মরবে। তার চেয়ে চুপচাপ বাইরে চলো। বিরহী বাঘ যখন বাঘিনীর কাছে এসে হাজির হয়েছে, তখন প্রেমটা নিশ্চিন্তে করেই নিক। যা করার বাইরেই করব।"

বেশ কিছুক্ষণ পরেই মদন তার সুন্দরীর সঙ্গে পার্কিং লটে চলে এল। গাড়িতে উঠল, কিন্তু গাড়ি স্টার্ট নিল না। অর্থাৎ গাড়ির ভেতরেই ফুলশয্যা করার প্ল্যান। পবিত্র ফের 'রে রে' করে তেড়েই যাচ্ছিল, অধিরাজ তার হাত ধরে মাথা নাড়ল, "উহু।" "আবার কী হল।"

"চুপচাপ অপেক্ষা করো।" সে কী যেন ভাবছে, "আমি ওর প্রেমিকাকেও জানাতে চাই না যে এখানে সি.আই.ডি. এসেছে!"

"মানে?"

"তুমি লক্ষ্য করোনি।" অধিরাজ আস্তে আস্তে চাপা স্বরে বলল, "পাবের ভেতরে কোনো সিসিটিভি ছিল না। সম্ভবত এইসব অ্যান্টিসোশ্যাল মাফিয়ারা আসে বলে সিসিটিভির

বন্দোবস্ত করেনি পাবের মালিকরা। পার্কিং লটেও কোনো ক্যামেরা নেই। অতএব আমরা অদৃশ্য পবিত্র।"

"তাতেই বা কী?"

"চুপচাপ বসে থাকো।" সে বলে, "কিছুক্ষণ বাদে নিজেই বুঝতে পারবে।" ততক্ষণে মদনের গাড়ির 'ডান্সিং সেশন' শুরু হয়ে গিয়েছে। গাড়িটা মাঝেমধ্যেই অজানা শিহরণে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সশব্দে নড়েচড়ে উঠছে। কাচের ওপর দুটো হাতের আদুরে মাখামাখি। অধিরাজ চুপ করে সেদিকেই তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি তরোয়ালের মতো তীক্ষ্ণ। মুখ ভাবলেশহীন। পবিত্র কপাল চাপড়ায়, "রাজা, এখন এসবও দেখতে হবে। এই নৃত্যরত গাড়ি দেখে আমারই রাগ হয়ে যাচ্ছে। হাতের কাছে সানি লিওনি বা বউ কেউই নেই, আছ শুধু তুমি আর অর্ণব। এ কী জাতীয় টর্চার।"

বলতে বলতেই তার ফোন ভাইব্রেট করে ওঠে। কী টাইমিং। ঠিক সেইমুহূর্তে মিসেস আচার্য ফোন করেছেন। গিন্নী হয়তো সুমধুর স্বরে সবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কোথায় আছ? কী করছ?"

পবিত্র রাগে গরগর করে উঠে বলে, "ইংলিশ চ্যানেলে সাঁতার কাটছি। সামনে দুটো হাঙর কামড়াকামড়ি করছে। আর কিছু জানতে চাও?"

মিসেস আচার্য যথেষ্টই বুদ্ধিমতী। স্বামীর উত্তর শুনে কটাং করে ফোনটা কেটে দিলেন। পবিত্র ফোনটা সুইচ অফ করে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, "তাড়াতাড়ি কর মদনা! গোটা জীবনের প্রেম একদিনেই করে নিবি নাকি রে বাবা।"

কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। প্রেম আর শেষ হওয়ার নামই নেয় না। বেচারা গাড়ি হাই জাম্প মারতে মারতে, মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার ভেতরের বাসিন্দাদের বোধহয় ক্লান্তি নামক বস্তুটিই নেই। তারা এখনও কামসূত্রে ব্যস্ত। কখনও সাময়িক বিরতি নিচ্ছে, তারপরই আবার দ্বিগুণ আশ্লেষে নেমে পড়ছে মাঠে। অধিরাজ আড়চোখে পবিত্রকে দেখে নিজের রুমাল এগিয়ে দেয়, "খেটেখুটে তো মদন মরছে, তুমি খামোখা ঘামছ কেন।"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে পবিত্র, "আমার কান্না পাচ্ছে রাজা। এই খানকির ছেলেটাকে খুঁজে খুঁজে রাত দিন এক করে ফেলেছি। ডিউটির চোটে আমার হোম মিনিস্টার খচে বসে আছে। রোম্যান্টিক মুহূর্তে আচমকাই সুন্দরী বউয়ের জায়গায় এই হতচ্ছাড়ার গোঁফ-দাড়িওয়ালা মুখ ভেসে উঠছে। ফলস্বরূপ রোম্যান্সের গুষ্টির তুষ্টি। ছেলেটাও হয়েছে তেমন। সেদিন প্রায় এক সপ্তাহ পরে বাড়ি ফিরেছি, সে ব্যাটা কিনা আমায় দেখে গিন্নীকে বলছে, "মা, এই মামাটা কে!' আর এই মালটা এখানে বসে মেগা ম্যারাথন প্রেম করছে।"

এবার অর্ণব হেসে ফেলল। রেগে মেগে তার চোখের ওপর হাত রেখে বলল সে, "খুব হাসি পাচ্ছে? বাচ্চাদের এসব দেখতে নেই। চোখ বোঁজো।"

"অর্ণব একটু পরে চোখ বুজবে।" অধিরাজ বলল, "তার আগে দেখো তো আমাদের দু-নম্বর রিভলভারগুলো কোথায় আছে?"

"দু-নম্বর রিভলভার? মানে যেগুলোর লাইসেন্স নেই। ওগুলোর খোঁজ পড়েছে যখন তখন নিশ্চয়ই সার্ভিস গানের গল্প নেই।" পবিত্র বেজায় খুশি, "তার মানে আজ গাড়ি ওলটাবে।"

অধিরাজ উত্তরে ইতিবাচক মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ, এনকাউন্টার করারই প্ল্যান আছে। কিন্তু যেহেতু লাহিড়ী কোটাল আগেভাগেই হুমকি দিয়ে বসে আছেন তাই এটাকে পুলিশি এনকাউন্টার হিসাবে সে দেখাতে চায় না। অধিরাজের এনকাউন্টারের স্টাইল কিছুটা এমনই। সবসময়ই সে কিছু বে-আইনি হাতিয়ার মজুত রাখে, যাতে পুলিশি এনকাউন্টারটাকে 'গ্যাং ওয়ার' বলেই মনে হয়। এমনভাবে ক্রাইম সিন সাজায় যাতে পুলিশি হস্তক্ষেপের কোনো প্রমাণ না থাকে। অর্ণব ও পবিত্র, দু-জনেই জানে একটু পরেই গাড়ির শরীর থেকে 'সি.আই.ডি.র সমস্ত চিহ্ন, স্টিকার সরে যাবে। বদলে যাবে নম্বর প্লেটও। ট্র্যাফিক

সিগন্যালের ফুটেজে ধরা পড়লেও ওটা যে সি.আই.ডি. হোমিসাইডেরই গাড়ি তার প্রমাণ থাকবে না! অধিরাজ সবসময়ই আরও একটা নম্বর প্লেট সঙ্গে রাখে। একটু আগেও মদনের উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল বলে এই পরিবর্তনগুলো করেনি। কিন্তু এখন মদন তাদের সামনেই আছে। পাবে বা পার্কিং লটে সিসিটিভি থাকলে সি.আই.ডি.-র উপস্থিতি ক্যামেরায় ধরা পড়ত। এখন সে সম্ভাবনাও নেই। মদনের প্রেমকাহিনিতে অধিরাজ সচেতনভাবে ঢুকতে চায় না কারণ ওর প্রেমিকাও ওদের চিনে ফেলতে পারে। গ্যাংস্টারের মৃত্যুর দৃশ্যে কোথাও সি.আই.ডি. ক্লু রাখবে না। সেইজন্যই বলেছিল, 'আমরা অদৃশ্য।" অর্থাৎ কাল যখন মদনের গুলিবিদ্ধ দেহটা কোথাও পড়ে থাকবে, তখন সি.আই.ডি. টিম ও প্রণবেশ লাহিড়ীর দিকে আঙুল উঠলে দুই পক্ষই, 'সে কী! আমি তো কিছুই জানি না!' বলে চোখ কপালে তুলবেন। ট্র্যাফিকের সিসি টিভিতে যে গাড়িটাকে মদনের গাড়ির পেছনে চেজ করতে দেখা যাবে সেটা যে-কোনো গাড়ি হতে পারে। ওর দেহে যে বুলেটগুলো পাওয়া যাবে, সেগুলো সার্ভিস গানের নয়, কোনো বে-আইনি আগ্নেয়াস্ত্রের হবে। সি.আই.ডি.-কে সন্দেহ করলেও কোনো প্রমাণই থাকবে না যে এটা পুলিশি এনকাউন্টার।

এটাই প্রণবেশ লাহিড়ী ও অধিরাজ ব্যানার্জির করা এনকাউন্টারের মধ্যে পার্থক্য! একজন সংখ্যা বাড়ানোর চক্করে নিজেই অপরাধীদের লাশ নিয়ে মিডিয়া বাইট দিতে থাকেন। নিজের 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' তকমাটাকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য নিজেই এনকাউন্টারটাকে 'খবর' করে দেন। আর অধিরাজ একদম নিশ্চুপে কয়েকটা গুলিতেই গল্প শেষ করে দেয়। কোথাও কোনো ভাষণ নেই, প্রমাণ নেই, কেউ দেখেনি, কেউ জানে না, স্রেফ এক গ্যাংস্টারের বেওয়ারিশ মৃতদেহ কোনো রাস্তায়, গলি-ঘুঁজিতে কিংবা মাঠেঘাটে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাকে কে মারল, কেন মারল, পুলিশ মারল না অপোনেন্ট গ্যাং-যা খুশি ভেবে নেওয়া যেতে পারে। সেজন্যই অপরাধীরা প্রণবেশের থেকেও বেশি ভয় পায় অধিরাজ ব্যানার্জিকে! গরম মাথার বাইসনের থেকে ঠান্ডা মাথার বিষাক্ত সাপ অনেক বেশি বিপজ্জনক।

আরও মিনিট দশেক পরে মদনের গাড়ি সুস্থ ও স্থির হল। কয়েক সেকেন্ড পরেই লক খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বিস্রস্ত বসনা সুন্দরী তার পোষাক ঠিকঠাক করতে করতে একটা সাদা ও লম্বা সিগারেটে টান মারতে মারতে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তারপর প্রেমিককে শেষ বারের মতো আলিঙ্গন ও চুম্বন করে বিদায় নিল সে। মদন খুব নিশ্চিন্তেই ধীরে সুস্থে গাড়িটাকে পার্কিং লট থেকে বের করছিল। তার মনে একবারের জন্যও সন্দেহ জাগেনি যে অনতিদূরেই একটা গাড়িতে তিনজন সি.আই.ডি. অফিসার তারই অপেক্ষায় বসে আছে। কিন্তু যখন একটু পরেই বুঝতে পারল একটা সাফারি স্টর্ম খুব নীরবে, নিঃশব্দে তার পিছু করছে, তখনই সজাগ হয়ে উঠল। আর সেখান থেকেই শুরু এই চেজিং-এর ইতিহাস।

এখন সেই সিকোয়েন্স প্রায় ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছেছে। দুই পক্ষই বেশ কিছুক্ষণ ধরেই মরিয়া হয়ে 'তাবড় তাবড়' ফায়ারিং করে চলেছে। অধিরাজ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ফুলস্পিডে এগিয়ে গিয়ে জোরদার ধাক্কা মারল সুইফটকে। এভাবে বারবার ঠুকে দিতে শুরু করলে গাড়িতে বসে থাকা মানুষটির স্নায়ুতে চাপ পড়ে। ফলস্বরূপ নার্ভাস হয়ে কিছু না কিছু ভুল করেই বসে। পবিত্র এই ফাঁকেই একটা গুলি বিঁধিয়ে দিতে পেরেছে গাড়িটার পেছনের চাকায়। টায়ারটা সশব্দে ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। নিজের কৃতিত্বে নিজেই খুশি হয়ে বলল, "ঝাক্কাস!"

"অর্ণব, ইয়েহ দিল মাঙ্গে মোর।"

বলতে বলতেই ফের স্পিড তুলল অধিরাজ। অর্ণব এই বাক্যটার অর্থ জানে। তার অত্যন্ত পরিচিত ইশারা। সে সচকিত হয়ে ওঠে। ও জানে এখন তাকে কী করতে হবে। তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও বটে। বিন্দুমাত্রও উত্তেজিত না হয়ে অর্ণব প্রয়োজনীয় মুহূর্তটার অপেক্ষা করতে থাকে।

অধিরাজ দাঁতে দাঁত চেপে অ্যাক্সিলেটরের ওপর চাপ বাড়ায়। গাড়িটা যেন এখন

বুলেটের গতিতে ছুটছে। অন্যদিকে মদনের গাড়ির একটি চাকা জখম হওয়ায় তার গাড়ির গতিবেগ কমছে। প্রচণ্ড স্পিডের মাথায় এরকম একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বেসামালও হয়ে গিয়েছে। অধিরাজ গাড়িটাকে একদম সুইফটের পাশাপাশি নিয়ে গেল। সুইফটের গতিবেগ ক্রমশ কমছে...।

আচমকাই সাফারি স্টর্মের ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে গেল। ঘটনাটা কী ঘটতে চলেছে তা বুঝতে পেরে আঁৎকে উঠল পবিত্র, "নো... নো... নো! রাজা, নট এগেইন।"

অধিরাজ তার মন্তব্যের অপেক্ষা অবশ্য করেনি। সে দরজা খুলেই বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল সুইফটের বাঁ-দিকের দরজা লক্ষ্য করে। যেন একটা নমনীয় চেহারার পেশল চিতাবাঘ লাফিয়ে পড়ে সওয়ার হল শিকারের ওপরে। যে মুহূর্তে সে বাইরে লাফিয়ে পড়ল, ঠিক সেই মুহূর্তেই পেছনের সিট থেকে অর্ণব লাফ মেরে ড্রাইভিং সিটে এসে স্টিয়ারিং সামলাল। এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটল যে পবিত্র নিজেই ব্যাপারটা ঠাহর করে উঠতে পারেনি। সে যথারীতি বিরক্ত, "তোমাদের এই বিটকেল মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার এখনই দরকার ছিল?"

অর্ণব নির্লিপ্ত মুখে তার দিকে দেখে নিয়ে সজোরে স্টিয়ারিং ঘোরাল। সাফারি স্টর্ম ফের জোরদার ধাক্কা মেরেছে সুইফটকে। একেই একটা টায়ার গিয়েছে, তার ওপর এই ঠোকাঠুকি। গাড়িটা থরথর করে কেঁপে উঠল। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো চলন্ত গাড়ির জানলায় ঝুলছে অধিরাজ। তার পা পিচের রাস্তায় ঘষা খেলেও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে খোলা জানলা দিয়ে কায়দা করে শরীরের আধখানা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে মদনের সঙ্গে তার হাতাহাতি চলছে। মদন প্রাণপণে স্টিয়ারিং সোজা রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু অধিরাজ তাকে ঠিকমতো গাড়ি চালাতেই দেবে না। সে প্রাণপণে একহাতে স্টিয়ারিং হুইলটাকে বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মদনের হাতের আগ্নেয়াস্ত্রটা ও প্রথম সুযোগেই এক ঘুষিতে নীচে ফেলে দিয়েছিল। মদন সেটাকে তুলে নেওয়ার জন্য ঝোঁকার চেষ্টা করতেই এবার আর একহাতে চেপে ধরল ওর গলা। হিসহিস করে হিংস্র কণ্ঠে বলল, "তুই লেট! স্বর্গে তোর গুরু বিকাশ দুবে টেনশনে ঘড়ি দেখছে। টাইম টু গো।"

বলতে বলতেই স্টিয়ারিংটাকে এক্সট্রিম লেফটে ঘুরিয়ে দিয়েই সে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। পড়েই দেখল চোখের নিমেষে গড়িয়ে চলে গিয়েছে এক সাইডে। অর্ণব গাড়িটাকে আগেই পিছিয়ে এনেছিল। সে অধিরাজকে সরে যেতে দেখেই সবেগে এসে ফের মোক্ষম গতিতে পেছন দিক দিয়ে ঠুকে দিয়েছে গাড়িটাকে। তারপরই দক্ষ হাতে বাঁ-দিকে নিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল।

ওদের অঙ্ক একদম নিখুঁত ছিল। মদনের গাড়িটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, বেসামাল হয়ে গিয়ে ডানদিকের একটা বড় গাছে গিয়ে সশব্দে ধাক্কা মেরেছে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সামনের কাচ। অর্ণব গাড়িটাকে কোনোমতে দাঁড় করিয়েই লাফিয়ে নামল ড্রাইভিং সিট থেকে। নেমে এসেছে পবিত্রও। অধিরাজও এবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেল সেদিকেই। অর্ণব তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, "আর ইউ ওকে স্যার?" "ফিট অ্যান্ড ফাইন।" সে দ্রুত পায়ে দৌড়ে যায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সুইফটের দিকে, "চলো, মাননীয় বিকাশ দুবের চ্যালার খবর নিয়ে আসি।"

কপালগুণে মদন গাড়িটা গাছে ধাক্কা খাওয়ার আগেই কোনোমতে বাইরে লাফিয়ে পড়তে পেরেছিল। সে-ও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। তিন অফিসার তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই সে টেনে দৌড় মারল। কিছুতেই সি.আই.ডি.-র হাতে ধরা দেবে না। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ মারার দরুণ হাতে পায়ে চোটও পেয়েছে। তবু এই দুর্দান্ত অপরাধী হাল ছাড়ল না। সে জানে পালাতে না পারলে আজই তার অন্তিম দিন। সি.আই.ডি. আজ এনকাউন্টার করার মুডে আছে। ওদের হারাতে না পারলে তার লাশটাও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই সে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে অদুরেই দাঁড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত জনপদের দিকে দৌড়োল। মনে একটাই আশা, মানুষজনকে চেঁচামেচি করে জাগিয়ে দিতে পারলে অন্তত সর্বসমক্ষে তাকে

গুলি মারবে না। অফিসাররা।

"যাঃ শালা।" পবিত্র একটু হতাশ হয়েই বলে, "এ মাল তো থামার নামই নিচ্ছে না! সামনের বাড়িগুলোর দিকেই যাচ্ছে।"

অকুস্থল থেকে কিছুটা দূরেই বেশ কয়েকটা বাড়ি পরপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলেই বোঝা যায় এখানে এখনও ফ্ল্যাট কালচার আসেনি। তবু বাড়িগুলোর চেহারা বেশ সম্ভ্রান্ত। বাড়ি আছে অর্থাৎ মানুষও আছে। মদন আজীবন সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে, মেরে এসেছে। কিন্তু আজ যখন তার সামনেও স্বয়ং কাল এসে দাঁড়াল তখন সে সেই মানুষেরই শরণাপন্ন হল। জনবসতির দিকে দৌড়োতে দৌড়োতেই চেঁচাতে শুরু করল, "হে-ল্প! হে- ল্প! বাঁ-চা-ও!"

অধিরাজ আর অর্ণব সবেগে তার পেছনে দৌড়চ্ছে। পবিত্র দৌড়োতে দৌড়োতেই ফের তাকে লক্ষ্য করে ফায়ার করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু অধিরাজ চেঁচিয়ে তাকে বারণ করে, "ডোন্ট শ্যুট। ডোন্ট শ্যু-ট। এটা লোকালয়।"

অবশ্য ফায়ার করলেও বিশেষ লাভ হত না। মদনের মতো অভিজ্ঞ শয়তানরা খুব ভালোভাবেই জানে গুলি বক্রগতিতে চলে না। সেজন্যই সে এঁকেবেঁকে দৌড়োচ্ছিল। প্রাণ বাঁচানোর জন্য হাঁচোড় পাঁচোড় করে সামনে যে বাড়িটা পেল সেটাতেই লাফ মেরে গেট টপকে ঢুকে পড়ল সে। অধিরাজরা দূর থেকেই শুনতে পেল তার চিৎকার, "হে-ল্প। হে-ল্প।" "ফি-শ।"

অধিরাজ এবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে নিজের ব্যর্থতায় বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ে, "ওকে স্বর্গে ডিপোর্ট করার সুযোগটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। এখন অ্যারেস্ট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

অর্ণব আর পবিত্রও হতাশ হয়ে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছে। আজ ওরা মদনকে বাগে পেয়ে গিয়েছিল। ওর মতো ক্ষমতাশালী মাফিয়াকে গ্রেফতার করেও কোনো লাভ নেই। কেউ ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবে না। এরা জেলে বসেও রীতিমতো গ্যাংকে চালনা করার ক্ষমতা রাখে। পুলিশ যদি কোনো সাক্ষীকে খুঁজেও বের করে, ওর দলবল খবর পেয়ে সাক্ষীটিকে উড়িয়ে দেবে। এমনই হয়ে আসছে। শেষপর্যন্ত কোর্ট প্রমাণাভাবে এদের ছেড়ে দেয়। ছাড়া পাওয়া মাত্রই আবার সেই নিধনযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। সবচেয়ে বিপদের কথা, এই ধরনের গ্যাংস্টাররা যতবার আইনের হাত থেকে ফস্কে যাবে, ততই এদের আত্মবিশ্বাস আর দুঃসাহস ক্রমাগতই বাড়তে থাকবে। আর্চ ক্রিমিনাল এভাবেই তৈরি হয়। মদন শুধু পালায়নি, অধিরাজদের সমস্ত পরিশ্রমে জল ঢেলে দিয়ে গেল। ও এখন সাধারণ মানুষকে সামনে এগিয়ে দিয়ে প্রাণ বাঁচাবে। যেমনভাবে বিকাশ দুবে মহাকাল মন্দিরের ভিড়কে বাঁচার জন্য ব্যবহার করেছিল। দুবে ভাবতেও পারেনি শেষমুহূর্তে গাড়ি আর পাশা এমনভাবে উলটে যাবে!

"ফাইন। অ্যারেস্টই করব। লেটস গো।"

ওরা ফের দৌড়োল। কে জানে, যদি কোনো মানুষের ক্ষতি করে এই খুনি। ওকে বিশ্বাস নেই। যে বাড়িতে ঢুকেছে সে বাড়ির বাসিন্দারা বিপন্ন। মদনের মতো নিষ্ঠুর ক্রিমিনাল প্রাণ বাঁচানোর জন্য সব কিছু করতে পারে। এই মুহূর্তে যদিও ওর একমাত্র আগ্নেয়াস্ত্রটাও সঙ্গে নেই, সেটা ওই গাড়ির ভেতরেই রয়ে গিয়েছে। তবুও কোণঠাসা বাঘ নিরস্ত্র হলেও ভয়ংকর।

"বাঁ-চা-ও। বাঁ-চা-ও!"

ওরা দৌড়োতে দৌড়োতেই একটা আর্ত চিৎকার শুনে ফের থমকে গেল। সামনের দৃশ্যটা দেখে তিনজনেরই চক্ষু চড়কগাছ। এ কী। মদন ওই বাড়িটা থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। ও অমন পাগলের মতো দৌড়োতে দৌড়োতে এদিকেই ছুটে আসছে কেন? এ তো পুরো উলটপুরাণ! এতক্ষণ সে অধিরাজদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য চেঁচামেচি করছিল। এখন উলটে অধিরাজদের দিকেই সাহায্যের আশায় ছুটে আসছে!

যে মৃত্যুর হাত থেকে পালাচ্ছিল, এখন সেই মৃত্যুর দিকেই সে বাঁচার জন্য ছুটছে! এ কী অদ্ভুত কাণ্ড!

"রাজা!" পবিত্র সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, "ওর মাথায় ঘুষি টুষি মেরেছ নাকি! না এমনি এমনিই পাগল হয়ে গেল? নাকি ওর পেছনে কোনো ডাইনোসর তাড়া করেছে।" পবিত্র অত্যুক্তি করেনি। এই মুহূর্তে মদনকে দেখে তেমনই মনে হচ্ছে। যেন কোনো অশরীরী বিভীষিকা ওকে তাড়া করছে। এনকাউন্টারের চেয়েও কত বড়ো ভয় সামনে এসে দাঁড়ালে লোকে মৃত্যুদূতের কাছেই জীবন ভিক্ষা করে! অদ্ভুত আশঙ্কায় অধিরাজের কপালে ভাঁজ পড়ে। মদন যে বাড়িটায় আশ্রয় নিতে গিয়েছিল, ওখানেই সম্ভবত এমন কিছু দেখেছে যে এখন উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রকেও ভয় পাচ্ছে না! ভয়, আরও বড়ো ভয়!

ওরা কিছু বলা বা করার আগেই মদন তীর বেগে দৌড়ে এসে দড়াম করে ধাক্কা খেল অধিরাজের সঙ্গে। এতক্ষণ বুঝি অন্ধের মতো, বাহ্যজ্ঞানহীনের মতো দৌড়োচ্ছিল সে। এবার অধিরাজকে দেখতে পেয়ে সবলে জাপটে ধরেছে তাকে। যেন স্বয়ং অধিরাজই তার শেষ আশ্রয়! হাঁউমাউ করে বলে উঠল, "আমায় অ্যারেস্ট করুন! ফাঁসি দিন! আমি সব কবুল করব। কিন্তু আমায় ওর হাত থেকে বাঁচান... ও আমায় মারবে... বাঁচান!"

"এ তো ভূতের মুখে রামনাম!" পবিত্র সটান তার মাথায় রিভলভার তাক করল, "পাগলের অ্যাকটিং করে ফাজলামি করা হচ্ছে!"

সে সভয়ে অধিরাজকে আরও জোরে আঁকড়ে চেপে ধরে তার বুকে মুখ লুকিয়েছে। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ছোটো চারাগাছের মতো কাঁপছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার! তার কম্পন নিজের দেহে অনুভব করতে পারছিল অধিরাজ। সে হাত তুলে পবিত্রকে থামায়। মদনের ভয়টা নকল নয়, একদম খাঁটি। সে কিছু দেখেছে। এমন কিছু যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর! তার মন বলছিল, কিছু বড়ো গোলমাল আছে!

"কে তোকে মারবে? কার কথা বলছিস?"

অধিরাজ তাকে এবার একটু নরম সুরেই জিজ্ঞাসা করল, "তুই ওই সামনের বাড়িটাতে ঢুকেছিলি?"

"হ্যাঁ...হ্যাঁ...." অসংলগ্নভাবে উত্তর দিল মদন, "আমি ওকে দেখেছি। ...কী ভয়ংকর!...ও মানুষ নয় স্যার...কী ভয়ংকর।...কী ভয়ানক...।"

"কী? কী দেখেছিস?" সে জানতে চায়, "কে ছিল?"

মদন কাঁপা স্বরেই উত্তর দেয়, "জানি না! কিন্তু মানুষ নয়... হতেই পারে না। ওর মুখের একদিকটা মানুষের মতো। কিন্তু অন্যদিকটা। স্যার, অন্যদিকে কিচ্ছু নেই। চোখ, মুখ-কিচ্ছু না! একটা লাশের মতো... যেন এখনই লাশ কাটা ঘর থেকে উঠে এসেছে... এক সাইডটা পুরো জ্বলে পুড়ে খাঁক... ঠোঁটটা সেলাই করা....আমি দেখেছি.... আমি দেখেছি ওকে... ওর একটা চোখ রক্তে লাল...ছ-জনকে মেরেছে, আমাকেও মারবে! বাঁ-চা-ন স্যা-র!"

তার কণ্ঠস্বর স্খলিত হয়ে এসেছিল। এবার হাতও শিথিল হয়ে গিয়েছে। মদন পড়েই যেত, তার আগেই তাকে ধরে ফেলেছে অধিরাজ। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছে, "কী বললি! আধখানা মুখ পোড়া। ঠোঁট সেলাই করা। ছ-জনকে মেরেছে! কাকে মেরেছে?"

মদন শুধু কোনোমতে অঙ্গুলিনির্দেশে সামনের বাড়িটা দেখায়। তারপরই এলিয়ে পড়ে। আর তার কোনো সাড়াশব্দই নেই! তার গোটা দেহটা এখন সম্পূর্ণ বেহুঁশ অবস্থায় অধিরাজের বাহুতে ঝুলছে। অধিরাজ স্তম্ভিত! তার বুকের ভেতরটা ধ্বক করে ওঠে। এই মাত্র কী শুনল! ঠিক কার বর্ণনা দিল মদন! সে তবে এখানেও এসে পৌঁছেছে!

"রাজা, তাহলে এখানেও...!"

পবিত্র ঠিক তার মনের আশঙ্কাকেই শব্দে প্রকাশ করল। ওর কণ্ঠস্বরেও ভয় প্রকট। অধিরাজ অজ্ঞান মদনকে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "পবিত্র, টেক কেয়ার অফ হিম। মেরে ফেলো না। ও হিটলিস্টে ছিল ঠিকই, কিন্তু বরাতজোরে সম্ভবত আরও বড়ো কোনো

ক্রাইমের আই-উইটনেস হয়ে গিয়েছে। এখন ওর বেঁচে থাকা দরকার।”

পবিত্র কোনো কথা না বাড়িয়ে মদনের নিঃসাড় দেহটাকে ঘাড়ে তুলে গাড়ির দিকে হাঁটা মারল। অধিরাজ আর অর্ণব পরস্পরের দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় করে। ওদের দু-জনেরই মোটামুটি আন্দাজ আছে যে একটা ভয়াবহ ক্রাইম সিন তাদের জন্য অপেক্ষা করছে! এই নারকীয় দৃশ্যের সাক্ষী প্রথমে দিল্লির পুলিশ হয়েছিল। তারপর ক্রমান্বয়ে কানপুর এবং বেঙ্গালুরু। সব জায়গাতেই ক্রাইম সিন এক! প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণও এক! যে বর্ণনা একটু আগেই মদন দিল, সেই একই চেহারা ফিরে ফিরে এসেছে প্রত্যেকের মুখে। ফিরে এসেছে সংবাদপত্রে ও টেলিভিশনের হেডলাইনে, একটাই বাক্য, ‘সে মানুষ নয়! সে মানুষ নয়!' অধিরাজের মনে হল, তার মাথার মধ্যে টিক টিক করে একটা টাইমার চলতে শুরু করেছে...! “এই শুরু হল অর্ণব!”

সে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে নিয়ে পকেট থেকে গ্লাভস বের করে পরে নিতে নিতে বলল, “আমরা কোনো ক্রাইমসিন চেক করার জন্য রেডি হয়ে আসিনি। তবু খুব সাবধানে একবার দেখে আসি চলো।”

দু-জনেই নিঃশব্দে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। দূর থেকে বোঝা যায়নি। কিন্তু কয়েক কদম এগোতেই দেখা গেল বাড়িটার জানলা দরজা দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাইরে বেরিয়ে আসছে। তার সঙ্গেই একটা মাংস পোড়া কটু গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল। আশ্চর্য! আশেপাশের বাড়ির লোকেরা এখনও টের পায়নি? হয়তো শীতের কারণে সবাই দরজা জানলা বন্ধ করে ঘুমে তলিয়ে আছে বলে এখনও তাদের কাছে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ পৌঁছোয়নি। তবে আরও কয়েক মিনিট পরেই তারাও জেনে যাবে। কারণ ধূম্রকুণ্ডলী আরও বড়ো আকার ধারণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে দুর্গন্ধের দাপটও।

অধিরাজের মুখে চিন্তার ছাপ প্রকট। অনেক সময় অর্ণব লিড করে। কিন্তু আজ তাকে লিড করতে দিল না অধিরাজ। বরং সে নিজেই সন্তর্পণে এগিয়ে গেল। অর্ণব লক্ষ্য করল, অধিরাজের হাতে ফণা তুলেছে আগ্নেয়াস্ত্র। এবার সার্ভিস রিভলভার। অর্ণবও গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল তার পেছন পেছন। তার হাতেও অস্ত্র। কে জানে! যদি ভেতরে কেউ থেকে থাকে! যাকে দেখে মদনের মতো ছুঁদে ক্রিমিনাল ও ভয়ে কাঁপে, সে আর যা-ই হোক নিরীহ গোছের কেউ নয়। মদন তাকে একটু আগেই দেখেছে। ওরা তাকে ছাড়া আর কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখেনি ওই বাড়ি থেকে। অতএব খুনির স্পটে থাকার চান্সই বেশি।

বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার। নৈঃশব্দও থাবা গেড়ে বসে আছে এখানে। এই শীতেও বাড়িটার সমস্ত দরজা জানলা খোলা! অধিরাজ অবাক হল না। কারণ এর আগেও প্রত্যেকটা ক্রাইম সিনেই দরজা জানলা খোলা ছিল। সে সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা দেখে নেয়। ভেতরে কেউ কি লুকিয়ে আছে? না মদনকে দেখা দিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। সেই ভয়ানকদর্শন খুনি তাদেরও কি দেখা দেবে? না আপাতত অন্তরালেই থাকবে? খোলা দরজা জানলা দিয়ে তার পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মদন চেঁচিয়ে মেচিয়ে তাকে সজাগ করে দিয়েছে। সুতরাং পালাবার জন্য যে খুনি অন্য পথ বেছে নিয়েছে হাট করে খোলা জানলাই তার সাক্ষী! সে নিঃশব্দে ভেতরের দিকে পা বাড়াল। তার দীর্ঘ উদ্ধত দেহ এখন উত্তেজনায় টানটান। প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয় সজাগ! দেখা যাক কী আছে কপালে।

অর্ণবের বুকের ভেতরটা চরম উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। হৃৎপিণ্ডের জায়গায় প্রচণ্ড শক্তিশালী একটা যন্ত্র যেন কয়েকশো গুণ বেগে রক্ত পাম্প করে চলেছে। এই অন্ধকার আর ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে কার মুখ লুকিয়ে আছে! অথবা কোন্ হাড় হিম করা দৃশ্য প্রকাশ্যে আসার অপেক্ষা করছে! এই চরম প্রাণঘাতী নিস্তব্ধতার মধ্যে সে শুধু নিজের হৃৎস্পন্দনের আওয়াজ পাচ্ছিল। এত জোরে ধুকপুকিয়ে চলছে যে ভয় হয়, বুকের হাড় পাঁজর ফাটিয়ে না বাইরে বেরিয়ে আসে। দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে পা টিপে টিপে সে অধিরাজের পেছনে ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে এগোল। সামনে একটা বিশাল হলঘর। তার জমাট তমিস্রার মধ্যেই ঠিক যেন দুটো ছায়া নিশ্চুপে এগিয়ে চলেছে অনিশ্চিত গন্তব্যের

দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরছে। কিন্তু একরাশ ঠান্ডা হাওয়া শুধু হু হু করে বয়ে এসে আছড়ে পড়ছে শূন্য ঘরের প্রতিটা কোণে। তার দমকে জানলার পর্দাগুলো উড়ছে আর যেন বলছে, কেউ নেই... এখানে কেউ নেই...!”

“অল্ ক্লিয়ার। কেউ নেই। কিন্তু....!”

অধিরাজ ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে পড়ে আশপাশটা ভালো করে দেখে নিয়েছে। তার শাণিত দৃষ্টি অন্ধকার ঘরের প্রত্যেকটা কোণ জরিপ করছে। সে চাপা স্বরে কথা বলতে বলতেই আচমকা থমকে গেল! এই মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হচ্ছে আচমকাই বুঝি প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে অধিরাজ! মানুষ নয়, বুঝি কোনো মূর্তিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে তার জায়গায়। অধিরাজের দৃষ্টি অনুসরণ করে অর্ণবও সেদিকে তাকাল। দৃশ্যটা চোখে পড়া মাত্রই মনে হল তার গোটা দেহের রক্তই বুঝি বরফ হয়ে গিয়েছে! কোনোমতে বলল সে, “মা-ই গ-ড!”

হলঘরের সংলগ্ন আরও একটি ছোট্ট ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। সেখান থেকেই কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ঘরটা কিন্তু অন্ধকার নয়। বরং লেলিহান আগুনের শিখা চতুর্দিক দিয়ে রক্তিম আগুনে আলোয় আলোকিত করে তুলেছে। এত উজ্জ্বল আর হিংস্র জ্বালাময়ী সহস্র ফণায় জ্বলছে যে তার বিচ্ছুরণ রীতিমতো চোখে লাগে। সেই আলোতেই স্পষ্ট দেখা গেল সামনের পরিস্থিতি!

ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে ছ-ছটা দেহ। তাদের নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে রক্তের ধারা। রক্ত এখনও তাজা! কেউ তাদের বুকের ওপর দিয়ে মালা পরানোর মতো রাবারের টায়ার গলিয়ে দিয়েছে। টায়ারগুলো থেকে এখনও উৎকট কেরোসিন তেলের গন্ধ আসছে! একটা গোটা মৃতদেহকে মৃত্যু আলিঙ্গনে সাপটে নিয়ে ধু ধু করে জ্বলছে টায়ার! তার সঙ্গে জ্বলছে লাশও! ছ-টা জ্বলন্ত টায়ার বুকে নিয়ে শুয়ে আছে ছ-টা জ্বলন্ত মৃতদেহ! পড়পড় শব্দে জ্বলছে তাদের চুল। জ্বলে পুড়ে কুঁকড়ে গিয়েছে চামড়া। মুখের মাংস পুড়ে, খসে খসে পড়ছে। কারোর কারোর গালের মাংস পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে হিংস্র দন্তপংক্তিও বেরিয়ে পড়েছে। নেকলেসিং!

“অর্ণব! কুইক! আগুন নেভাতে হবে।”

অধিরাজের কণ্ঠস্বরে সংবিৎ ফিরে পেল অর্ণব। তার এতক্ষণ মনে হচ্ছিল সে বুঝি ভুল করে শ্মশানভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে! আর চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে চিতা! পোড়া মাংসের উৎকট গন্ধ আর ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। তার পা দুটো এখনও অল্প অল্প কাঁপছে। একটা দুর্দম বিবমিষা পাকস্থলী থেকে উঠে এসে গলার কাছে চাপ মারছিল। তবু সে সামলে নিয়ে বলল, “ইয়েস স্যার....!”

দুই অফিসারই এবার আগুন নেবানোর চেষ্টায় তৎপর হল। অধিরাজ প্রথমে হলঘরের বিরাট কার্পেটটাকেই তুলে এনে জ্বলন্ত দেহগুলোর ওপর চাপা দিয়ে, ঝাপটে ঘষে ঘষে আগুনটাকে নির্বাপিত করার চেষ্টা করছে। আগুনের শিখা তাতে কিছুটা অবদমিত হলেও সহজে ছাড়ছে না দেহগুলোকে। অর্ণব দৌড়োল বাড়ির ভেতরের দিকে। যদি আশেপাশে, কিচেনে বা বাথরুমে জল পাওয়া যায়! কিন্তু এত বড়ো বাড়ির কোথায় কিচেন! কোথায়ই বা বাথরুম! বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত ওয়াশরুমের খোঁজ পাওয়া গেল। সেখানে একটা জলভরা বালতিও ছিল। অর্ণব আর একটুও সময় নষ্ট না করে ভরা বালতিটা নিয়ে ফিরে এল অকুস্থলে।

কার্পেটের মুহুর্মুহু ঘষা খেয়ে আর কয়েক বালতি জল ঢালার পরে আগুন অবশেষে পরাজিত হল। ততক্ষণে মার্বেলের সাদা মেঝের ওপরে কালো কালো দাগ পড়ে গিয়েছে। কালো কালো পোড়া চামড়া লেপটে আছে রক্তের সঙ্গে। লাশগুলোকে শনাক্ত করাই দায়! সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই না-হলেও শরীরের প্রায় ষাট শতাংশই পুড়ে কাঠ হয়েছে। চামড়ার টায়ারগুলো গলে গিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছে মৃতদেহের সঙ্গে যে খোলা প্রায় অসম্ভব! চতুর্দিকে শুধু ছ-টা পোড়া মানবদেহ বীভৎস, গলিত মুখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

কেরোসিন তেলের উগ্র গন্ধে, কালো ধোঁয়ায় বাতাস ভারি। অর্ণবের মনে হল, তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তার দুর্দশা দেখে মরদেহগুলো যেন ভয়াবহ মুখে নারকীয় খল খল হাসি হেসে ওঠে।

"হ্যালো।" অধিরাজ ততক্ষণে মোবাইলে এডিজি শিশির সেনকে ধরেছে। ও প্রান্তে এডিজি সেনের কণ্ঠস্বর জাগ্রত হতেই সে বলল, "ব্যাড নিউজ স্যার। 'বার্নিং শিখ' এখন কলকাতায়। একটা মাসমার্ডার হয়ে গিয়েছে। আরও ক-টা হবে জানি না। সেগুলোকে ঠেকানোর জন্য আমাদের হাতে আর মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা আছে...!"

ওরা জানত না, যখন অধিরাজ এবং অর্ণব ও বাড়িতে ঢুকছিল, তখন খানিকটা দুরেই একটা বড়ো গাছের আড়ালে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ওদের সকৌতুকে দেখছিল। তার মুখ চাদরে ঢাকা। তবু অদূরবর্তী ল্যাম্পপোস্টের চলকে পড়া আলোয় যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট! একদিকের মুখ অবিন্যস্ত গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে ঢাকা। অত গোঁফ দাড়ির প্রাবল্যে আসল মুখের আদল বোঝাই দায়। অন্যদিকে মুখ নামক কোনো বস্তুই নেই। গোটাটাই পোড়া! পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া চামড়ার মাঝখান দিয়ে মাঝেমধ্যে লাল মাংসের উঁকি ঝুঁকি। চট করে দেখলে মনে হয়, মুখের একপাশে বুঝি সে কোনো ভয়াবহ মুখোশ পরে আছে। চোখের অংশটা খোবলানো, গালের বেশ কিছুটা খুবলে তুলে নেওয়া। চোয়ালের একপাশ দিয়ে দাঁতসহ হাড় বেরিয়ে পড়েছে। ঠোঁট দুটো এবড়ো খেবড়ো ভাবে কে যেন সেলাই করে দিয়েছে। মদন ভুল বলেনি। বীভৎস সে মুখ! তাকে দেখলে মানুষ কম, পোস্টমর্টেম টেবিল থেকে উঠে আসা লাশ বলেই বেশি মনে হয়! অপলক দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ দুই অফিসারকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যেতে দেখল। তার একপাশের চোখে আলগা একটা কৌতুক ঝিকিয়ে ওঠে। তারপরই সে চাদর দিয়ে ভালো করে মুখটা ঢেকে নিয়ে আলতো শিস দিতে দিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ছায়াটা হালকা হতে হতে কালোয় মিশে গেলেও দূর থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল সেই বিখ্যাত গানের কলি, যার সুরে সে তীক্ষ্ণ হুই দিচ্ছিল....!

"গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই... কিসকো খবর, কৌন হ্যায় উয়ো, ...অনজান্ হ্যায় কোই...!"

**** *

(২)

১৯ ডিসেম্বর, ২০১৮

নিউ দিল্লির সফদরজঙ্গ হসপিটাল আর এইমসের মাঝখানের চত্বরটা খুব মন দিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল এক সাফাইকর্মী। এখনও ভোর হয়নি। একটু পরেই ভোরের আলো ফুটবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই আস্তে আস্তে ভিড় জমে উঠবে এখানে। দুই দিকে দুটো নামজাদা হসপিটাল থাকার ফলে এই জায়গাটা প্রায় সবসময়ই সরগরম থাকে। দিনের বেলায় তো কথাই নেই। মানুষে মানুষে ছয়লাপ। এমনকি মধ্যরাতের তন্দ্রাময় নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়ে একের পর এক গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স আসতেই থাকে! পেশেন্ট আসার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। রোগ এবং মৃত্যু জানান দিয়ে আসে না। তাই হসপিটালের দ্বার সবসময়ই খোলা। কখনও কোনো সিরিয়াস রোগি আসছে, কখনও বা রক্তাপ্লুত অ্যাক্সিডেন্টের ভিকটিম। কখনও বা একের পর এক মৃতদেহ ঢুকেই চলেছে মরচুয়ারিতে। স্ট্রেচার, অ্যাম্বুলেন্স, ওয়ার্ডবয় ও ডাক্তারদের ছোটাছুটি সবসময় লেগেই আছে। তাদের কোনো ক্লান্তি নেই, বিকারও নেই! অ্যাক্সিডেন্টে পিষে যাওয়া, দলা পাকানো মৃতদেহগুলোকে দেখেও তাদের বোধহয় কিছুই মনে হয় না!

ঝাঁট দিতে দিতে লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজকাল সে নিজেই তো কেমন অনুভূতিহীন পুতুলে পরিণত হয়েছে। একসময় খুব ভয় করত। আজও তার মনে পড়ে ছ-বছর আগের সেই দৃশ্যটা! মাসটাও ডিসেম্বরই ছিল। তারিখও কাছাকাছি। একটা জলজ্যান্ত মেয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে সে বমি করে ফেলেছিল। মাথা থেকে পা অবধি রক্তে স্নান করেছিল মেয়েটা! সবাই বলাবলি করছিল ওর নাকি নাড়িভুঁড়িও বাইরে এসে ঝুলছিল! রেপ ভিক্টিম! তাকে সফদরজঙ্গ হসপিটালে নিয়ে গেল সবাই। মেয়েটার আসল নাম কী ছিল তা ওর জানা নেই। তবে গোটা ভারতবর্ষ তাকে 'নির্ভয়া' নামেই চেনে! ঠিক এখানেই দিনরাত এক করে দাঁড়িয়ে থাকত কত মানুষ! ভিড় জমে থাকত মিডিয়ার। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেডিক্যাল বুলেটিনের জন্য ওঁত পেতে থাকত সাংবাদিকরা। কত মানুষ সেই অজানা মেয়েটির খবর নিতে আসত। নিঃস্বার্থভাবে প্রার্থনা করত তার সুস্থ হয়ে ওঠার। কেউ হাত পাতত ঈশ্বরের কাছে, কারোর হাত উঠত 'খোদার' উদ্দেশে আবার কেউ বা মোমবাতি হাতে দ্বারস্থ হত জেসাসের! কত চেষ্টা করা হল বাঁচানোর। ডাক্তারদের আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব ছিল না। অভাব ছিল না কাতর প্রার্থনারও। তবু বাঁচল না!

কত কিছুই না দেখেছে এই দিল্লির রাস্তা, সফদরজঙ্গ হসপিটাল ও এইমসের মাঝখানের এই অংশটা। কত ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই হাসপাতাল। জীবনের অনিশ্চয়তা কী, তা একমাত্র এখানে এসে বসে থাকলেই জানা যায়। একদিকে নতুন কোনো পেশেন্ট জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে এসে ঢুকছে, অন্যদিক দিয়ে নিথর লাশ চলে যাচ্ছে মরচুয়ারিতে। জীবন-মৃত্যু একই দরজা দিয়ে ঢুকছে ও বেরোচ্ছে। ঠিক এখানেই ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর 'খুন সে লতপত' অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। কেউ বলে ওঁর গার্ডরা ওঁকে ত্রিশটা গুলি মেরেছিল, কেউ বা বলে একত্রিশটা। গুলির সংখ্যা যা-ই হোক, পরিণতি একটাই ছিল-মৃত্যু! তখন অবশ্য সে এখানে কাজ করত না। নেহাৎই ছোটো ছিল। তাও মনে আছে, বাবার হাত ধরে সে-ও এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক এইখানেই। অবাক চোখে দেখেছিল, অগণিত মানুষের কালো কালো মাথা গিজগিজ করছে চতুর্দিকে। ওই ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর কষ্ট হচ্ছিল বলে বাবা ওকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন।

তখনও অবশ্য এইমসে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। পরে সে জেনেছে যে দুপুর দুটো বেজে তেইশ মিনিটেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন ডাক্তাররা। গোটা দেহে কিছু ছিল না আর! কিন্তু বাইরে দাঁড়ানো ভিড় তখনও পাকাপাকিভাবে কিছুই জানতে পারেনি। তারা

দেখছিল কংগ্রেস নেতাদের ব্যস্ততা, ডাক্তারদের দৌড়োদৌড়ি, একের পর এক বড়ো বড়ো মানুষের গাড়ির এসে থামা! জনতার মধ্যে তখনই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এর মধ্যেই সে একঝলক দেখতে পেয়েছিল রাজীব গান্ধীকে। তখনও পর্যন্ত জনগণ বিমূঢ়, শোকাহত অবস্থাতেই দাঁড়িয়েছিল।

আন্দাজ সেইদিনই বিকেল চারটে বা সাড়ে চারটে নাগাদই সেই ভয়ানক স্লোগানটা শোনা যায়! কে প্রথম বলেছিল তা তারও জানা নেই। কিন্তু সমবেত কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠে স্লোগান দিচ্ছিল, 'সর্দার গদ্দার হ্যায়।' বেচারি ছোট্ট শিশু কিছুই বুঝতে না পেরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, "গদ্দার কী?" বাবা সেই প্রশ্নের উত্তর দেননি। বরং শিশুপুত্রকে নিয়ে কোনোমতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন জমায়েত থেকে। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে মা-কে বলেছিলেন, "আজ তুমি কাজে বেরিও না। দাঙ্গা লাগবে মনে হয়!

বাবার আশঙ্কা সঠিক ছিল। দাঙ্গা লাগল। অথবা একতরফা খুন বলাই ঠিক। তারা হিন্দু হওয়ায় সে আগুনের আঁচ ওদের গায়ে পড়েনি। কিন্তু এই সফদরজঙ্গ আর এইমসের সামনে এবার মানুষের নয়, লাশের ভিড় জমে ওঠার পালা ছিল। কত হাজার লাশ যে একের পর এক ঢুকতে শুরু করল তার কোনো শেষ নেই! সফদরজঙ্গ আর এইমস্ সেই মর্মান্তিক ইতিহাসেরও সাক্ষী বটে। ৩১ অক্টোবর থেকে যে নিধনযজ্ঞ শুরু হয়েছিল, তা তেসরা নভেম্বরে গিয়ে থামল! ততক্ষণে দুই হসপিটালের ডাক্তাররা পোস্টমর্টেম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ওঁদের ভাষায়, "ফির তো লাশ আতে গয়ে... আতে গয়ে... আতে হি গয়ে...!" যে লোকটা আগের দিনই দিব্যি বেঁচেবর্তে ছিল, পরদিনই তার বিকৃত জ্বলন্ত লাশের সাক্ষী থাকল মুখোমুখি দাঁড়ানো এইমস্ আর সফদরজঙ্গ! ওদের প্রাচীন দেহে এমনই কত ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে। কত খুনোখুনি, কত হত্যালীলা, কত পৈশাচিক ঘটনা নিরুত্তাপ দৃষ্টিতে দেখে চলেছে নিরন্তর!

কাজ করতে করতেই আপনমনে হাসল সে। ঈশ্বরেরও কী অদ্ভুত রসিকতা। গতকালই অ্যান্টি শিখ রায়টে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার অপরাধে সজ্জন কুমারের যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে! হাঃ, ১৯৮৪ সালের কীর্তির হিসাব হল ২০১৮ সালে। লোকটার বয়েস এখন বাহাত্তর কী তিয়াত্তর! ব্যাটার জীবনের আর কী বাকি রয়েছে। ঠিকমতো সাজা বোঝার আগেই ও মাল টপকে যাবে! এখন যাবজ্জীবন দেওয়া হাস্যকর নয়?

"কিসকো সমঝে হাম অপনা
কল কা নাম হ্যায় এক সপনা,
আজ অগর তুম জিন্দা হো,
তো কল কে লিয়ে মালা জপনা!..."

হঠাৎই অতি পরিচিত গানের কয়েক কলি শুনে সে অবাক হয়ে পেছনে ফিরে তাকায়। এতক্ষণ এই জায়গাটা শুনশানই ছিল। শেষ অ্যাম্বুলেন্সটা এসেছে ঘণ্টাখানেক আগে। অন্যান্য দিনও শেষ রাতটা শান্ত, নিস্তব্ধই থাকে। আজও তাই ছিল। কিন্তু সাফাইকর্মীটি বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল দিল্লির বিখ্যাত কুয়াশার মধ্যে আচমকা যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল একটি মানবদেহ! সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে থাকে আগন্তুককে এ ব্যাটা এখানে টপকে পড়ল কোথা থেকে? এইম্স থেকে বেরোল না সফদরজঙ্গ থেকে? কোনো পেশেন্ট পার্টি কি? কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো পেশেন্ট পার্টিকে এভাবে গুনগুনিয়ে গান গাইতে দেখেনি সে!

আস্তে আস্তে কুয়াশার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল এক সর্দারজির দেহরেখা। মাঝারি উচ্চতার রোগাটে চেহারা হলেও বেশ চওড়া কাঠামো। মাথার লাল পাগড়িটা কাছের হসপিটাল চৌহদ্দির বিষণ্ণ আলোয় স্পষ্ট। পরনে ময়লা সাদা চোলা আর পাজামা। সে ঘাবড়ে যায়। এ কী রে বাবা! হসপিটালের সামনে এমন শিখ যোদ্ধার বেশে কে ঘুরছে! এ কি ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এল? নাকি তারই অবচেতন মনের ভুল। এতক্ষণ ধরে সে অ্যান্টি শিখ রায়টের কথাই ভাবছিল। সেই চিন্তারই প্রতিফলন নাকি? সর্দারজি ততক্ষণে তার

একেবারে মুখোমুখি। তার মুখ দেখেই হাড় কাঁপানো শীতেও দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে লোকটা। এ লোকটা পেশেন্ট নয়। হতেই পারে না! সত্যিই এ ইতিহাস থেকেই নেমে এসেছে। ১৯৮৪ সালে এমন হাজার হাজার বিকৃত মরদেহ ঠিক এখানেই মর্গে পড়ে ছিল! এই লোক ১৯৮৪ সালের সফদরজঙ্গ হসপিটালের মর্গ থেকেই বুঝি কোনো অলৌকিক উপায়ে বেরিয়ে এসেছে। তার মাথা বনবন করে ঘুরতে থাকে। গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না। চতুর্দিকে কালো অন্ধকার। কানের মধ্যে কুঁ-উ-উ করে এক যান্ত্রিক শব্দ...!

রক্তাক্ত ও অর্ধদগ্ধ শিখটি কোনো কথা না বলে তার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়েছে। সে কোনোমতে দেখল খামের ওপর হিন্দিতে লেখা আছে, 'পুলিশ চৌকি।' কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগেই সর্দার তাকে পাশ কাটিয়ে কুয়াশার মধ্যে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। শুধু শুনতে পেল সে ওই গানটার সুরেই একটানা শিস দিয়ে যাচ্ছে। গোটা মানুষটা কুয়াশায়, অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে তার চোখের সামনেই অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও শোনা যাচ্ছে সেই মিষ্টি অথচ হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া শিস, "গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই...!"

সেদিন যে কীভাবে লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাছের পুলিশ স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছিল তা ঈশ্বরই জানেন! দৌড়োতে দৌড়োতেই সে থেকে থেকে বিড়বিড় করছিল, "ভূত.... ভূত...!" কোনোমতে পুলিশ অফিসারের হাতে চিঠিটা তুলে দিয়েই অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছিল মানুষটা! সেই অবস্থাতেই একবার উচ্চারণ করেছিল, "ভূ-ত!"

১৯৮৪ সালের যে জায়গা থেকে শিখ নিধন যজ্ঞের গল্প শুরু হয়েছিল, সেই সফদরজঙ্গ আর এইমসের মাঝখানের চত্বর থেকেই ফের ২০১৮ সালে 'বার্নিং শিখ' বা 'ফ্যান্টম শিখ'-এর গল্প শুরু হল। তার প্রথম আবির্ভাব ওখানেই। যে চিঠিটা পুলিশ স্টেশনে পৌঁছেছিল তাতে হিন্দিতে লেখা ছিল, "আদরণীয় 'নালায়ক' দিল্লি পুলিশ, আমি তোমাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে একটু আগেই রিং রোডের কাছে চমনলাল শর্মার বাড়িতে আটজনের নিধন হয়েছে। "বুডঢা' চমনলাল অবশ্য সুস্থই আছে, তার কোনো শারীরিক ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তাকে ছাড়া বাকি সবাইকেই আমি নিজের হাতে খুন করেছি। এতক্ষণে যদি পুড়ে কয়লা না হয়ে গিয়ে থাকে তবে দয়া করে লাশগুলো উদ্ধার করে নাও। এবং তোমাদের জ্ঞাতার্থে আরও জানাই যে আগামী বাহাত্তর ঘণ্টায় আমি আরও তিনটে মাসমার্ডার করব। ক্ষমতা থাকলে ঠেকিয়ে দেখাও, রোক সকো তো রোক লো।"

এখানেই চিঠি শেষ। এরকম ভয়ানক চিঠি পড়ে দিল্লি পুলিশ পড়িমড়ি করে দৌড়াল চমনলাল শর্মার বাড়িতে। গিয়ে যা দেখল তাতে পুলিশেরই ঘাম ছুটে যাওয়ার দশা! আটখানা লাশ পরপর একটা ঘরে সাজানো। প্রত্যেকের বুকে বেড় দিয়ে আছে একটা করে জ্বলন্ত টায়ার! দেহগুলো ততক্ষণে পুড়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তবে বৃদ্ধ চমনলাল শর্মা বেঁচে ছিলেন। তিনি নিজের ঘরে বেহুঁশের মতো পড়ে ছিলেন। বাড়িতে কী হয়ে গিয়েছে তা টেরই পাননি। তার অজ্ঞাতেই তারই পুত্র, পুত্রবধূ, স্ত্রী এমনকি নাতি-নাতনি সমেত আটজনই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। চমনলালের যন্ত্রণা কমানোর কোনো নিদান বোধহয় ঈশ্বরের কাছেও ছিল না। তাকে সফদরজঙ্গ হসপিটালেই ভরতি করা হল।

এরপরই দিল্লি 'বার্নিং শিখ' এর ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। আগামী বাহাত্তর ঘণ্টায় যা ঘটল তা দিল্লি পুলিশ ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। তাদের অসহায়তার সীমাও ছিল না। চমনলাল শর্মার পরিবারের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের খবর প্রায় আগুনের মতোই ছড়িয়ে পড়ল গোটা দিল্লিতে। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর বিস্তারিত বর্ণনাও বাদ গেল না। ২০০১ সালে মাংকি-ম্যান বা নর-বানরের তাণ্ডব সকলেরই মনে ছিল। অবিকল সেভাবেই ছড়িয়ে পড়ল 'বার্নিং শিখ' এর কাহিনি। এরপরই লোকে পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে, দিনে-রাতে দিল্লির রাস্তায় সেই অর্ধদগ্ধ শিখকে দেখতে শুরু করল! কোথা থেকে আসে, কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, কেউ জানে না! দিল্লির বিখ্যাত জমাট 'কোহরা' থেকে সে হঠাৎই আবির্ভূত হয়, আবার

'কোহরা'তেই মিশে যায়! মিডিয়া উঠে পড়ে দিনরাত এক করে পাহারা দিতে শুরু করল। মাংকি ম্যানের দেখা তারা পায়নি। এবার কপালগুণে যদি বার্নিং শিখের একঝলক তাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। অষ্টপ্রহর পুলিশের এমার্জেন্সি লাইনগুলো ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল ভয়ার্ত জনতার নানারকম বয়ানে। কেউ জানাল, 'বার্নিং শিখ' তাদের বাড়ির ছাতেই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ জানাল কখনও সুলতানপুরীর রাস্তায়, কখনও-বা মহীপালপুর এলাকায় তাকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা গিয়েছে। পুলিশ একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড আগেই দেখেছিল। তারা জনতার বয়ানকে নজর আন্দাজ না করে তাদের কথামতো প্রত্যেকটা স্পটে গিয়ে পৌঁছোল যেখানে যেখানে সেই ভয়াবহ মূর্তিকে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তখন কেউ নেই! যেমন রহস্যময়ভাবে সে দেখা দিয়েছিল, তেমনই রহস্যময়ভাবে অদৃশ্যও হয়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে কেউ জানে না! পুলিশ ক্রাইম সিন তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো ক্লু পেল না! একটা অজানা ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডি.এন.এ. স্যাম্পল্ল, কিংবা অন্য কোনো প্রমাণ, কিচ্ছু নেই। এমনকি বেডরুম, টেরেস কিংবা মেইন দরজায় কোনো ফোর্সড এন্ট্রির চিহ্নও পাওয়া যায়নি।

পুলিশের সমস্ত পরিশ্রমকেই ব্যর্থ করে দিয়ে প্রথম মাসমার্ডারের ঠিক চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় দ্বিতীয় মাসমার্ডারের খবর চলে এল। এবারের শিকার চন্দ্রকুমার ভগতের পরিবার। দৃশ্য একই। জ্বলন্ত টায়ারের মৃত্যু আলিঙ্গনে পড়ে আছে চারটে রক্তাক্ত অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ! আশ্চর্য বিষয়, বৃদ্ধ চন্দ্রকুমার ভগতের শরীরে একটা আঁচড়ও পড়েনি! তিনি অসুস্থ হলেও জীবিত আছেন। তবে এভাবে বেঁচে থাকা অর্থহীন! স্বজনহারা বৃদ্ধ চন্দ্রকুমারের হাহাকার কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। সত্তর অতিক্রম করা মানুষটি কপালে করাঘাত করতে করতে নিজেরই মৃত্যুকামনা করছিলেন।

দিল্লি পুলিশ ও ক্রাইমব্রাঞ্চ এই খুনগুলোর পেছনের ব্যক্তিটিকে ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু তাদের হাতে কিছুই ছিল না। দ্বিতীয় কেসেও আততায়ী নিজের কোনো চিহ্নই ছাড়েনি। ফরেনসিকও ক্রাইম সিন খুঁজে কিছুই পায়নি। যথারীতি দরজাগুলোও অক্ষত অবস্থায় আছে। কেউ জবরদস্তি ঢোকার চেষ্টাও করেনি, অর্থাৎ নো ফোর্সড এন্ট্রি! পুলিশ সম্পূর্ণ অসহায়! খুনি কে? তার সূত্র তো দূর, এত বড়ো দিল্লি শহরে কোন্ পরিবারের ওপর 'বার্নিং শিখ'এর বিধ্বংসী দৃষ্টি পড়তে চলেছে, তাও তাদের জানা ছিল না। গোটা শহরটাকেই হাই অ্যালার্টে রাখা হল। 'বার্নিং শিখ'-এর বর্ণনা সব পুলিশ চৌকিতে চলে গেল। যে বেচারি পথিক রাস্তা দিয়ে মনের আনন্দে শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে চলেছিল, পুলিশ তাকেও খপাৎ করে ধরে হাজতে চালান করে দিল। লাল রঙের পাগড়ি বা চোলা দেখলেই জনতা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। পুলিশ সবেগে এক গাদা লাল পাগড়িকেও রাউন্ড আপ করে জেলে ঢোকাল। তা সত্ত্বেও আলোর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। বরং গোটা ডিপার্টমেন্ট অন্ধকারে হাত-পা মেরে স্রেফ গলদঘর্ম হচ্ছিল।

কয়েকঘণ্টার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লাল পাগড়িধারী সর্দারজিকে হাজতে ঢুকিয়ে দিয়েও শেষ রক্ষা হল না। ভগৎ পরিবারের ট্র্যাজেডির ধাক্কা সামলাতে-না-সামলাতেই ফের আর একটা দুঃসংবাদ! এবার খুনি ঢুকে পড়েছে খোদ পুলিশেরই ঘরে। প্রাক্তন পুলিশ কর্মচারী, আই.পি.এস. দেবধর চৌবের বাড়ি থেকেও বেরোচ্ছে ধূমকুণ্ডলী! শুধু তাই নয়, তাঁর বাড়ির বাইরে প্রহরারত গার্ডদের ধরে কেউ কচুকাটা করেছে। পুলিশ যখন অকুস্থলে পৌঁছোল তখন গেটের বাইরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা! সামনের উঠোনটা রক্তে যেন ভেসে গিয়েছে! তাজা রক্তে উঠোনের মাটি পিচ্ছিল। তার ওপর হতভাগ্য সিকিউরিটি গার্ডদের ক্ষত-বিক্ষত দেহগুলোকে কে যেন টুকরো টুকরো করে কেটে ছড়িয়ে দিয়েছে চতুর্দিকে। কোথাও একটা কাটা হাত পড়ে আছে, কোথাও পা! কোথাও বা খণ্ডিত লাশের পেটের ভেতরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—অস্ত্র, যকৃত পড়ে রয়েছে, আবার কোথাও কর্তিত মুণ্ডু। পুলিশের টিম বুঝতেই পারছিল না, এই লাশের স্তূপের ওপর দিয়ে ভেতরে যাবে কী করে। বুটসুদ্ধ পা রাখারই জায়গা নেই। যেখানেই পা রাখছে, হয় পিছল রক্তে পা স্লিপ করছে,

নয়তো পায়ের তলায় কারোর কাটা মাথা, হাত, পা পড়ছে। পুলিশেরা নিজেরাই প্রায় তখন উলটোদিকে দৌড় মারতে পারলে বাঁচে। মনে হল, যেন মুহূর্তের মধ্যে তাদের ফের কেউ খাড়া করে দিয়েছে ১৯৮৪ সালের সেই অভিশপ্ত দিনগুলোতে। অথবা কোনো অদৃশ্য টাইমমেশিনে চড়ে তারা পৌঁছে গিয়েছে সেই কালান্তক বাহাত্তর ঘণ্টায়! এটা বুঝি কোনো আই.পি.এস.-এর বাংলো নয়, বরং হতভাগ্য শিখ শ্রমিকদের কলোনি!

দেবধর চৌবে যথারীতি বেঁচেবর্তে ছিলেন। কিন্তু তার পরিবারের আর কেউ বেঁচে ছিল না। ইনফ্যাক্ট তিনি নিজেই পোড়া লাশগুলোকে ঠিকমতো শনাক্তই করতে পারছিলেন না। অতবড়ো জাঁদরেল পুলিশ কর্তা, যিনি জীবনে এমন বহু লাশ দেখেছেন, তিনিই স্বজনদের দেহ দেখে কখনও পাগলের মতো কাঁদছিলেন, কখনও শোকে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। পুলিশ ও ফরেনসিক টিম এবারও যথারীতি ক্লু-লেস।

'বার্নিং শিখ' বা 'ফ্যান্টম শিখ'-এর মোটিভ বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি ক্রাইম ব্রাঞ্চের। ঠিক সজ্জনকুমারের সাজা ঘোষণা হওয়ার পরদিন থেকেই সে মার্ডার করতে শুরু করেছে। নিজের প্রথম আবির্ভাবস্থল হিসাবেও বেছে নিয়েছিল সফদরজঙ্গ ও এইমসের চত্বরকে! কারণ ১৯৮৪ সালের ৩১ শে অক্টোবরও ঠিক এখান থেকেই ক্রুদ্ধ জনতা 'সর্দার গদ্দার হ্যায়' স্লোগান দিতে দিতে প্রতিহিংসার আগুন নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা শহরে। রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং-এর গাড়ির ওপরও এখান থেকেই প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে 'কমল' সিনেমার সামনে প্রথমবার আক্রমণ হয়। দ্বিতীয়বার সফদরজঙ্গ হসপিটালের সামনেই আক্রান্ত হন তিনি। তাই সফদরজঙ্গ ও এইমস-কেই সাক্ষী রেখে তার এই নাটকীয় আবির্ভাব! এখান থেকেই প্রতিহিংসার কাহিনি সে-ও শুরু করেছে। সময়ও সেই বাহাত্তর ঘণ্টা! মোটিভ সেই এক ও অদ্বিতীয় প্রতিশোধ—'আঁখকে বদলে আঁখ!' তার বেছে নেওয়া তিনজন ভিকটিমের নামও সেই কুখ্যাত 'নানাবতি কমিশনের' ফাইলে ছিল। চমনলাল শর্মা সেই সময়ে কংগ্রেস নেতাদের কাছের মানুষ ছিলেন। শিখ নিধন যজ্ঞে তাঁকে প্রকাশ্যেই খুনি ভিড়ের নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু পরে সাক্ষ্য ও সাক্ষীর অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে যান। চন্দ্রকুমার ভগৎ সজ্জনকুমারের অত্যন্ত অনুগত রাজনৈতিক গুণ্ডা! তার মাথায় সরকারের হাত ছিল বলে তাকেও কাঠগড়ায় তোলা যায়নি। কিন্তু সবাই জানত, সজ্জনকুমারের সঙ্গে ওই ভিড়ের মধ্যে তিনিও ছিলেন। 'নানাবতি কমিশন' এও জানায় যে আই.পি.এস. চৌবে এবং তাঁর পুলিশকর্মীরা শিখ নিধনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল সেই উন্মত্ত ভিড়কে! যদিও তাঁরও কোনো শাস্তি হয়নি। কেস চলাকালীনই তিনি ক্রমাগত প্রোমোশন পেতে পেতে শেষে আরামসে রিটায়ারও করে যান। তাঁর কেস যখন ডিসমিস হল তখন তিনি দিব্যি নাতিপুতি নিয়ে শান্তিতে ভরপুর সংসারের আনন্দে মেতে আছেন।

১৯৮৪ সালের হিসাব সে ২০১৮-তে মেটাবে। কিন্তু কেন? এতবছর ধরে ও কীসের প্রতীক্ষা করছিল? এরকম ভয়াবহ চেহারা নিয়ে লোকটা আত্মগোপন করে কীভাবে? এই মুখ লুকিয়ে রাখা মোটেই সহজ নয়। যতই লোকে তাকে প্রেতাত্মা বা ভূত বলুক না কেন, পুলিশ খুব ভালোভাবেই জানত যে এই তথাকথিত 'বার্নিং শিখ' রক্তমাংসেরই মানুষ ও একজন 'খুংখার' সিরিয়াল কিলার। হয়তো চুরাশির সেই ভয়ংকর দাঙ্গায় তার মুখ পুড়ে গিয়েছিল। এ পর্যন্ত মোটামুটি সবই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু একটা জিনিসই পুলিশের মাথায় ঢুকছিল না। তার যদি প্রতিশোধ নিতেই হয়, তবে সেই মানুষগুলোর ওপর আক্রমণ হওয়া উচিত যারা সরাসরি এই শিখ-হত্যার পেছনে জড়িত ছিল। সেক্ষেত্রে চমনলাল, চন্দ্রকুমার ভগত বা দেবধর চৌবেকে খুন করলেই তো মিটে যেত! তাদের নির্দোষ পরিবারকে এরকম বীভৎস মৃত্যু দেওয়ার মানে কী! বাড়ি সুদ্ধ সবাই মরল, এমনকি সিকিউরিটি গার্ডরাও বাদ গেল না, অক্ষত শুধু আসল লোকটাই! এই দ্বিচারিতার অর্থ কী! যদি এর পেছনে মানবিক গুণসম্পন্ন খুনির এইটুকু উদারতা থেকে থাকে যে সে অসহায় সিনিয়র সিটিজেনটিকে মারবে না, তবে ছোটো ছোটো শিশুদের ক্ষেত্রে সেই মানবিক গুণ গেল কোথায়? নিষ্পাপ শিশুদেরও তো ছাড়েনি সে। এ কেমন 'দোগলাপন্'?

পুলিশ ওই বাহাত্তর ঘণ্টার চক্করে এতটাই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে তখন তাদের কাছে খুনির মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করার সময় ছিল না। খুনি তার কথা রেখেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সে তিনটে মাস মার্ডার করেছে। তার কথামতো আর একটাই মার্ডার বাকি ছিল। হাতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা! দিল্লি পুলিশ ও ক্রাইম ব্রাঞ্চ নানাবতি কমিশনের ফাইল নিয়ে বসে গেল। এদের মধ্যেই রয়েছে সম্ভাব্য ভিকটিম ও তার পরিবার। কিন্তু নামের লিস্ট দেখতে দেখতে তাদের প্রায় গলদঘর্ম অবস্থা! শ্রী রাধিকে চন্দ্রাবলী, কারে রেখে কারে ফেলি! যাদের অল্পবিস্তর সাজা হয়েছে তারা তো রয়েছেই, তার সঙ্গে এমন একগাদা নামও রয়েছে যাদের আইন ছুঁতেও পারেনি। এর মধ্যেই একজনের পরিবারের ওপরেই সর্বনেশে মৃত্যুর মেঘ ঘনাচ্ছে। কিন্তু ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে যে। অবস্থা এমন দাঁড়াল, যে প্রায় পুরো দিল্লিতেই আর্মি নামিয়ে দিলে ভালো হয়! সেই শেষ চব্বিশ ঘণ্টার কথা বোধহয় আজীবন ভুলবে না দিল্লি পুলিশ। তাদের হট লাইন, এমার্জেন্সি লাইন, হেড কোয়ার্টারের ফোন অক্লান্তভাবে বেজেই চলেছে। অন্তত সেদিন পাঁচশোরও বেশি ফোন এসেছিল তাদের কাছে। ওপ্রান্ত থেকে অনেকগুলো বিপন্ন কণ্ঠস্বর বলে চলেছিল- "প্লিজ, আমাদের পুলিশ প্রোটেকশন দিন। আমরা ওই শিখের হাতে মরতে চাই না।"

এ প্রান্ত থেকে পুলিশ অফিসাররা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন, "প্লিজ, শান্ত হোন। এমন কিছুই ঘটবে না।"

ও প্রান্তের মানুষটি খেপে গিয়ে বলেছেন, "ধুর মশাই! হবে না মানে? অন্তত দশটা শিখকে আমি একাই মেরেছিলাম। দশটার পর আর গুনিনি। তার দায় কি আপনি নেবেন? আপনারা আমাদের প্রোটেকশন দিতে না পারলে বলুন। আমরা নিজেরাই কাছের থানায় গিয়ে সারেন্ডার করে হাজতে ঢুকে বসে থাকছি।"

১৯৮৪ থেকে ২০১৮ অবধি আইন, পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা যা করে দেখাতে পারেনি, একটা উন্মাদ খুনি একাই তা করে দেখাল। ১৯৮৪ সালের হিংসাত্মক ভিড়ের মধ্যে যারা নিজেদের মুখ লুকিয়ে হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল, তারাই এবার প্রকাশ্যে এসে সপরিবারে পুলিশ স্টেশনগুলোয় ভিড় জমাতে শুরু করল। অবস্থা এমন জায়গায় গেল যে থানায় আর জায়গাই নেই! চোর, ডাকাত, কেপমার ধরা পড়লেও তাদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে! তার ওপর পুলিশের নিজেরই বা নিরাপত্তা কোথায়! আই.পি.এস. চৌবেকে যারা নিরাপত্তা দিচ্ছিল তাদের পরিণতি স্বচক্ষেই দেখেছে। অধিকাংশ পুলিশকর্মীই ওই রাতটা ভয়ে সিঁটিয়ে থেকে কাটিয়েছিল। নিজেদের ছায়া দেখে নিজেরাই ভয় পাচ্ছিল। সার্ভিস রিভলভারটা অনেক অফিসারই সর্বক্ষণ হাতে নিয়ে ঘুরছিলেন। অনেকেই বলেছিলেন, রাউণ্ড দেওয়ার সময়ে মনে হচ্ছিল, যুদ্ধে যাচ্ছেন! আশেপাশে কোনো ছায়া, কোনো মানুষ দেখলেও আঁৎকে উঠছিলেন। ভাবছিলেন, এই বুঝি এসে পড়ল একটা জ্বলন্ত টায়ার! অথবা কোনো উদ্যত তরোয়াল। রাতের গভীরে নিঃসঙ্গ গলি খুঁজিতে বুঝি জাগ্রত হল সেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ, 'গুমনাম হ্যায় কোই...! '

কোনো ঝড়-জল-প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, পলিটিক্যাল দলের মারমারি নয়, ধর্মের লড়াই বা আতঙ্কবাদও নয়, শুধুমাত্র একটা মানুষের ভয়ে গোটা দিল্লি জুড়ে অঘোষিত কার্ফিউ নেমে এসেছিল। অন্তিম চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় কাটেনি। বার্নিং শিখ যে-কোনো অজ্ঞাত কারণেই হোক, শেষ মার্ডারটা করেনি। তার দেওয়া বাহাত্তর ঘণ্টার সময়সীমাও শেষ হল। অথচ ভয় শেষ হল না। পুরো নভেম্বর মাসটা সেই আতঙ্কের তাড়সে কেঁপেছে দিল্লি।

বৃদ্ধ চমনলাল শর্মা অবশ্য বেশিদিন বাঁচেননি। সফদরজঙ্গ হাসপাতালে থাকাকালীন দু-বার কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট আর একবার ব্রেইন স্ট্রোক হয়েছিল তার। পক্ষাঘাতে একদিকটা নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল। দু-মাস কোনোভাবে টিকে ছিলেন। শেষে তৃতীয়বার কার্ডিয়াক ফেইলিওর হওয়ার পর সফদরজঙ্গ হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। মৃত্যুর আগে তিনি পুলিশের কাছে খুব কষ্ট করে বয়ান দিতে পেরেছিলেন। খুব বেশি তথ্য অবশ্য দিতে পারেননি। শুধু এইটুকু জানিয়েছিলেন ওই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ঠিক একমাস আগেই

তাদের বাড়িতে একটি নতুন মুখের আবির্ভাব হয়েছিল। তার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কট্টর ক্রিশ্চান পরিবারের মেয়ে ছিল। প্রেমটা কী কারণে ভারতীয় হিন্দুর ছেলেকে করেছিল তা জানা নেই। ভারতীয় সংস্কৃতি বা পূজা পাঠের সঙ্গে হিন্দুধর্মকেও সে গ্রহণ করে নিয়েছিল। কিন্তু পাশাপাশি প্রতি রবিবার চার্চে যেতে কখনও ভুলত না। সে গর্ভবতী হওয়ার পর মন্দির থেকে এক পুরোহিত রোজ সকালে এসে আশীর্বাদ করে যেতেন। আর চার্চ থেকে তার অনুরোধেই এক ফাদারও রোজ এসে তাকে ব্লেসিংস দিয়ে যেতেন। ঠিক একমাস আগেই চেনা ফাদারটি অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে চার্চ থেকেই অন্য একজন ফাদারকে পাঠানো হয়। একজন বিধর্মী এসে গোটা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও পবিত্র জল ছিটিয়ে বেড়াচ্ছে, এ ব্যাপারটা চমনলালের পছন্দ না-হলেও ছেলের গুঁতোয় বাঁশটা হজম করে নিয়েছিলেন। সেই অভিশপ্ত দিনেও নতুন ফাদার এসেছিলেন। তবে সেদিন তার আসতে রাত হয়েছিল। তিনি এসে নম্র কণ্ঠে দেরি করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন, এবং যথারীতি গোটা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পবিত্র করে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনভেস্টিগেটর জানতে চান, “তারপর আপনি সবাইকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন?”

“হ্যাঁ।” তিনি জবাব দেন, “ফাদার চলে যাওয়ার পর আমরা সপরিবারে ডিনার করলাম। তারপর আমার একটা জরুরি মিটিংও ছিল। মিটিং বেশ রাত অবধি চলেছিল। তখনও আমার ফ্যামিলি জেগে ছিল। বাচ্চারা পড়াশোনা করছিল। ছেলেরা গল্পে ব্যস্ত ছিল। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে চা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে দরজা টরজা লক করে যে যার ঘরে ঘুমোতে চলে গেলাম। তারপর আর কিছু জানি না।”

পুলিশ এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে সন্দেহের কিছু খুঁজে পায়নি। তবু জানতে চেয়েছিল, “দুই ফাদারের নাম বলতে পারেন?”

“একজনের নাম ফাদার রিচার্ড লরেন্স আর পরের জনের নাম সম্ভবত ফাদার স্টেফানো মাইনো।”

“পরের দিন সকালে কি ফাদার মাইনো এসেছিলেন?”

বৃদ্ধ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, “কই! না তো!”

“বাড়িতে এত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আপনি কিছু টের পাননি?” অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, “কোনোরকম চেঁচামেচি, চিৎকার শুনতে পাননি?”

“না।” তার ঘোলাটে দৃষ্টিতে সংশয়, “কিচ্ছু শুনিনি! কোনো আওয়াজই পাইনি। ....কেন পাইনি।... কেন পাইনি....।”

পুলিশ আর কথা না বাড়িয়ে সে দিন বাড়িতে যারা যারা উপস্থিত হয়েছিলেন সবারই বয়ান নিতে গেল। সবাইকেই পাওয়া গেল শুধু ফাদার স্টেফানো মাইনো ছাড়া। ফাদার লরেন্স জানালেন এমন কোনো ফাদারকে তিনি চেনেন না। চার্চও এমন কোনো ফাদারকে পাঠায়নি। ওরা যদি চার্চকে অনুরোধ করতেন, তবে নিশ্চয়ই কাউকে পাঠানো হত। কিন্তু ওপক্ষ থেকে কোনো অনুরোধ না-আসায় চার্চও গা করেনি।

অন্যদিকে চন্দ্রকুমার ভগৎকে মেন্টাল অ্যাসাইলামে পাঠাতে হয়েছিল। ঘটনার পর থেকেই তার মধ্যে মানসিক সমস্যার প্রবল লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তার ঠাঁই হল মানসিক হাসপাতালে। তিনি কোনো বয়ান দেননি। তবে তার প্রতিবেশীরা জানিয়েছিল যে দিন দশেক আগে থেকে এক পাঞ্জাবি ড্রাইভার তার বাড়ির গাড়ি চালাচ্ছিল। পুরোনো ড্রাইভার ছুটিতে যাওয়ায় সাময়িক ড্রাইভারের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ওরা। তাতেই সাড়া দিয়ে বহাল হয়েছিল পাঞ্জাবি ড্রাইভারটি। জাতে সে শিখ। নাম কেহর সিং!

বলাই বাহুল্য স্টেফানো মাইনোর মতো কেহর সিংকেও পুলিশ খুঁজে পায়নি।

আই.পি.এস. চৌবের বয়ানও কিছুটা এরকমই। তবে সরাসরি ড্রাইভার বা ফাদার নয়, তার রাঁধুনীর এক নতুন বন্ধু হয়েছিল। দেশোয়ালি ভাই বলা যেতে পারে। রাঁধুনী বিরজু মাঝেমধ্যেই সৎসঙ্গ বা রামলীলা দেখতে যেত। সেখানেই এই নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ।

নাথুরাম নামের সেই ছেলেটি মাঝেমধ্যেই বিরজুর সঙ্গে দেখা করতে আসত। তার উপস্থিতি নিয়ে কখনও কেউ তেমন মাথাব্যথা করেনি। বিরজু ওর সম্বন্ধে হয়তো কিছু বলতে পারত। কিন্তু তাকেও খুন করে কেটে রেখে দিয়েছিল 'বার্নিং শিখ।' তাই নাথুরামও রইল ধরাছোঁয়ার বাইরে। আই.পি.এস. চৌবে এরপর ছ-মাস বেঁচেছিলেন। ছ-মাস পর তাঁর ঝুলন্ত লাশ পাওয়া গিয়েছিল। সঙ্গে সুইসাইড নোট।

দিল্লির ঘটনার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই 'বার্নিং শিখ' আবার দেখা দিল। এবার কানপুরের রাস্তায়! আবার ধরধর করে লাফিয়ে উঠল মিডিয়া। আবার শোনা গেল সেই ভয়াবহ শিস। এবার পুলিশকে লেখা প্রেমপত্রে সে জানিয়েছিল, বাহাত্তর ঘণ্টায় তিনটে মাস মার্ডার করবে। দিল্লিতে কথা না রাখলেও কানপুরকে সে হতাশ করেনি। তিনটে মাস মার্ডারই করেছিল। অবিকল একই পদ্ধতিতে! জ্বলন্ত টায়ারের নেকলেস পরিয়ে তিনটে পরিবারের মোট সতেরোজনকে খুন করে কানপুরেও সে ক্ষান্ত দিল। পরিবারের কর্তা বৃদ্ধ মানুষগুলো যথারীতি অক্ষত। পুলিশ এবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল খুনগুলোকে আটকানোর। দুটি ফ্যামিলিকে পুলিশ প্রোটেকশনও দিয়েছিল। কিন্তু যে উর্দিধারীরা ওই ফ্যামিলিকে নিরাপত্তা যোগাচ্ছিল তাদেরও কেটে গেটের সামনে সাজিয়ে দিল বার্নিং শিখ! যেন পুলিশের রক্তে রেডকার্পেট বিছিয়ে দিল! একজন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের ওপর অ্যাসিড অ্যাটাক হল। আর একজন রহস্যময়ভাবে অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন!

কানপুর যখন বার্নিং শিখের জ্বালায় জ্বলছে ঠিক তখনই চীনে 'কোভিড নাইন্টিনের তাণ্ডব শুরু হল। এরপর কোভিডের লক-ডাউন, মৃত্যুমিছিল, অনাহার, বেকারত্ব, ডিপ্রেশন, আত্মহত্যা, এই সব উপসর্গেই গোটা বিশ্ব টালমাটাল হল। তখন করোনার ধাক্কায় বার্নিং শিখকে সকলেই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু ২০২১-এর শেষের দিকে পরিস্থিতি কিছুটা ঠিক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফের হেডলাইনে চলে এল বেঙ্গালুরু! বেঙ্গালুরুতে ফের দেখা গেল লাল পাগড়ি বাঁধা সেই ভয়াবহ মুখ! পুলিশ চিঠিও পেল যে বাহাত্তর ঘণ্টায় সে দুটো খুন করবে। দিল্লি, কানপুরের ঘটনা সম্পর্কে বেঙ্গালুরু পুলিশ রীতিমতো রিসার্চ চালিয়েছিল। দিল্লি, কানপুর এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বেঙ্গালুরুর পুলিশ অফিসাররাও প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামলেন। কারা খুন হবেন জানা ছিল না, তাই নানাবতি কমিশনের লিস্টে যে ক-জনের নাম পেল, সবাইকেই অন্য বাড়িতে, তথা 'সেফ হাউসে' চালান করে দেওয়া হল। তাদের সঙ্গে জাঁদরেল অফিসাররাও প্রহরায় থাকলেন। ফলস্বরূপ দুটি পরিবারের বারোজনের সঙ্গে দু-জন অফিসারও শহীদ হলেন। তাদেরও টায়ার বাঁধা জ্বলন্ত লাশই মিলল! 'সেফ হাউস'-এর ঠিকানা যে সে কীভাবে পেল তা ঈশ্বরই জানেন! এবার জনতার সঙ্গে পুলিশের মনেও ঢুকে গেল বার্নিং শিখের আতঙ্ক। অনেকে তাকে 'ফ্যান্টম শিখ'-ও নাম দিল। চ্যানেলে চ্যানেলে তার এই কীর্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হল। মনস্তত্ত্ববিদরা অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করলেন। তাদের মতে লোকটি কোনোরকম মানসিক বিকৃতির শিকার। সে নটোরিটি চাইছে। প্রচারও চাইছে। অনেক জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে এই 'বার্নিং শিখ' এর পরবর্তী টার্গেট হয়তো মুম্বাই, রাজস্থান বা বোকারো হতে চলেছে। রাজনীতিবিদরা আবার আর এক দিকে আলোকপাত করলেন। তাঁরা বললেন-এই 'বার্নিং শিখ' আসলে খালিস্তানি মুভমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। এটা কোনো একা মানুষের কীর্তি নয়। এর পেছনে আস্ত একটা গ্যাং আছে। কয়েকদিন পর তারা স্বাধীন খালিস্তানের দাবি করবে।

সকলেই নিজের মতামত এবং থিওরি রাখছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে অন্য প্রশ্ন। এরপর কোথায়? এরপর কাদের পালা? কোন শহরের বুকে পড়বে এই সিরিয়াল কিলারের পদচিহ্ন! কাদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে এবার? এবার পুলিশের ভূমিকা কী হবে? সৌভাগ্যবশত দিল্লি পুলিশকে তেমন কোনো ট্র্যাজেডির সামনাসামনি হতে হয়নি। কিন্তু কানপুর আর বেঙ্গালুরুর রেকর্ড চূড়ান্ত খারাপ! পুলিশ কি এবার আদৌ থামাতে পারবে তাকে? না নিজেরাই তার ক্রোধ আর জিঘাংসার শিকার হয়ে যাবে! এই বার্নিং শিখ আসলে কে? বা ঠিক কী? কেন ক্রাইম স্পটে সে কোনো ক্লু ছাড়ে না! না ফিঙ্গারপ্রিন্ট, না ভাঙা

দরজা, না অন্য কোনো খুচরো, সূক্ষ্ম প্রমাণ! এ তো পারফেক্ট মার্ডার!

বেশ কিছুদিন ফের চুপচাপ কাটল। কোথাও তার কোনো খবর নেই। ইতোমধ্যে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে বিশ্ব। মানুষের মুখ থেকে মাস্ক সরে গিয়ে হাসি ঝলমলিয়ে উঠছে। মানুষেরা কোভিডের বিভীষিকার স্মৃতি ভুলতে না পারলেও দুঃখগুলো একটু একটু করে সইয়ে নিয়েছে। এই কয়েক বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। শিশুদের জীবন থেকে অজান্তেই আস্ত দুটো বছর কী করে খসে গিয়েছে তা তারা টেরও পায়নি। এই বছরগুলোয় যাদের আরও প্রতিশ্রুতিবান হয়ে ওঠার কথা ছিল, তারা স্রেফ হতাশায় কাটিয়েছে সময়টা। অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছে স্বজনদের অসহায় মৃত্যু। সেসব আঘাত কাটিয়ে এখন ফের জীবনের মূল স্রোতে ফেরার চেষ্টা করছে প্রত্যেকেই।

ঠিক তখনই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সবার অনুচ্চারিত প্রশ্নটার জবাব দিল ‘ফ্যান্টম শিখ’ নামক ব্যক্তিটি। নাঃ, জয়পুর বা মুম্বাই নয়। বোকারো বা বিহারের অন্য কোনো অঞ্চলেও নয়। এবার তার লক্ষ্য কলকাতা, কল্লোলিনী তিলোত্তমা! দিল্লি, কানপুর, বেঙ্গালুরুর পর এবার কলকাতার কেঁপে ওঠার পালা!

“দুশমন হ্যায় হজারোঁ ইয়াহা
জানকে যরা মিলনা নজর পহচানকে
কঈ রূপ মে হ্যায় কাতিল...!”

**** ****

(৩)

এডিজি শিশির সেনের মুখ থমথম করছে। তিনি অধিরাজের ফোনটা পেয়েই তড়িঘড়ি বিছানা ছেড়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন ব্যুরোয়। না এসেও উপায় ছিল না। ‘বার্নিং শিখ’ এর প্রেমপত্র ইতিমধ্যেই লালবাজারে এসে পৌঁছেছে। যথারীতি পুলিশকে ‘অপদার্থ, ‘নিষ্কর্মা’, ‘পেটমোটা ঘুষখোর' ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর বিশেষণে বিশেষিত করে সে জানিয়েছে, একটা মাসমার্ডার দিয়ে শুরু করলেও আগামী বাহাত্তর ঘণ্টায় সে আরও দুটো মাসমার্ডার করবে। পুলিশের বাপের সাধ্য থাকলে আটকে দেখাক। এই জাতীয় পত্রাঘাতে রাতের ঘুম উড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। শিশির সেনেরও উড়েছে। ভিকটিমদের পুলিশ প্রোটেকশন দিলে সে পুলিশদেরও ধরে ধরে কাটছে। ‘সেফ হাউসে' সরিয়ে নিরাপত্তায় রাখলেও যে শান্তি নেই, তা বেঙ্গালুরুর ঘটনাতেই স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে মাথা ঠিক রাখা কি আদৌ সম্ভব!

এবার যাঁর বাড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তাঁর নাম জ্যোতিপ্রকাশ ত্রিপাঠী। তিনিও ১৯৮৪ সালে দিল্লিতেই ছিলেন। ওঁর নামও নানাবতি কমিশনের লিস্টে আছে। ইনিও যথারীতি কংগ্রেসেরই ক্যাডার ছিলেন। দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি অ্যাকটিভ পলিটিক্সেও ঢুকে গিয়েছিলেন ত্রিপাঠী। তৎকালীন তরুণ প্রজন্মের আইডল তথা ‘চিফ’ সঞ্জয় গান্ধীর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। ১৯৮০ সালে সঞ্জয় গান্ধীর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর তিনি অন্যান্য নেতাদেরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। খুব বড়ো নেতা বা পার্টির মুখ হওয়ার স্বপ্ন জ্যোতিপ্রকাশ কখনোই দেখেননি। কিন্তু কংগ্রেস পার্টিটার জন্য সব কিছু করতে পারতেন! এটা ভালোবাসা, গোঁড়ামি না অল্পবয়েসের স্পর্ধা তা বলা মুশকিল। যথারীতি ১৯৮৪ সালে তিনি শ্যাম ত্যাগীদের দলে ছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে তার বনিবনা না-হওয়ায় পার্টি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৯০ সাল থেকে আর দিল্লির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না তার। রাজনীতি ছেড়ে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ঢুকে যান জ্যোতিপ্রকাশ ত্রিপাঠী। এরপরের জীবন কলকাতাতেই কেটেছে তাঁর।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, দিল্লিকে তিনি ছেড়ে দিলেও, দিল্লির কলঙ্কজনক অধ্যায়টি ওঁর পেছন ছাড়েনি। উনি ১৯৮৪ সালকে ভুলে গেছেন। ১৯৮৪ সাল ওঁকে ভোলেনি। তখন যৌবনের উন্মাদনায় যা করেছিলেন, আজ এই বৃদ্ধ বয়েসে তার মাশুল দিতে হল। স্ত্রী বিয়োগ হয়েছিল আগেই। বর্তমানে ছেলে, ছেলের বউ, দুই নাতি আর এক নাতনিকে নিয়ে থাকতেন। তাঁর অবসর জীবনের সঙ্গী ছিল নেপালি কম্বাইন্ড-হ্যান্ড তেনজিং! বাবুর দেখাশোনা সে যত্ন নিয়েই করত। বহু বছরের ভৃত্য। বাবুর গাড়ি ড্রাইভিং থেকে জুতো পালিশ অবধি সবকিছুই সানন্দে করে দিত। কিন্তু সে বেচারির প্রাণটাও বেঘোরে গেল!

জ্যোতিপ্রকাশ ত্রিপাঠী প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁকে আপাতত একটি হসপিটালের আই.সি.ইউ.তে রাখা হয়েছে। কিছু বলার বা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার অবস্থায় নেই। তবে প্রতিবেশীরা ওঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিয়েছে। ‘বার্নিং শিখ'-এর ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই কেমন যেন গুম মেরে গিয়েছিলেন ত্রিপাঠীজি। অথচ ২০১৬ সালে স্ত্রী বিয়োগ হওয়ার পরও বোধহয় এতখানি মুষড়ে পড়েননি তিনি। লোকজনের সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। এমনকি ছেলের সঙ্গেও কথাবার্তা বিশেষ বলতেন না। তবে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। আর যত প্রাণের কথা, মনের কথা—সবই হত তেনজিং-এর সঙ্গে। তেনজিং অসম্ভব শান্ত ও সুন্দর স্বভাবের মানুষ ছিল। সে শৈশব থেকেই অনাথ। একটি বৌদ্ধ মনাস্ট্রিতেই বড়ো হয়েছে। সে নিজেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। তার সৌজন্যে এ বাড়িতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণদের যাতায়াত ছিল। প্রতিবেশীরা অনেকেই বৌদ্ধ লামাদের এ বাড়িতে আসতে দেখেছেন। তেনজিং-এর প্রভাবে পড়ে ত্রিপাঠীও ক্ষমাসুন্দর বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন। নিজেও পণ্ডিত

মানুষ ছিলেন। তাই প্রায়ই বৌদ্ধ লামাদের সঙ্গে ধর্ম আলোচনা করতেন, ধর্মকথা শুনতেন।

অর্ণব জানতে চায়, "কলকাতায় বৌদ্ধ লামা! এখানে মনাস্টারি আছে?"

"আছে বোধহয়।" একজন বলেন, "মহাবোধি সোসাইটি অব ইন্ডিয়ার মনাস্টারি তো বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটেই আছে। এছাড়া টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধিস্ট মনাস্টারির নামও শুনেছিলাম তেনজিং-এর কাছে। ও নিজে এই দুটোতেই যেত।"

"লামাদের চেহারা মনে আছে আপনাদের?"

এবার প্রতিবেশীরা আমতা আমতা করে বলেন, "একজন নয় স্যার, অনেকেই আসত। আর সবারই মোটামুটি একইরকম চেহারা। ন্যাড়া মুন্ডি, সাফসুতরো মুখ আর গৈরিক পোষাক। আলাদা করে চেনা মুশকিল। তবে তেনজিং-এর মোবাইল ঘাঁটলে কয়েকজনের ছবি পেতে পারেন।"

"আর সন্দেহজনক কিছু?"

"না স্যার।" ওঁরা জানালেন, "কিচ্ছু না! চিৎকার তো দূর, কোনোরকম টু শব্দটিও শুনিনি। জানলা দরজা বন্ধ ছিল বলে ধোঁয়াও দেখতে পাইনি। নয়তো আগেই পৌঁছে যেতাম!"

এডিজি শিশির সেনের সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। এসব আদতে হচ্ছেটা কী। যে-কোনো খুনের ঠিকমতো তদন্ত করতেই বাহাত্তর ঘণ্টা কেটে যায়। অথচ সেই ন্যূনতম সময়টাই নেই। এই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে গোটা কলকাতা শহর থেকে আরও দু-জন সম্ভাব্য ভিকটিমকে খুঁজে বের করতে হবে। ওই নির্দিষ্ট সময়েই খুনিকে ধরতে হবে কিংবা ঠেকাতে হবে। তার মধ্যেই ভিকটিমদের প্রোটেকশনও দিতে হবে! কোন দিক ছেড়ে কোন দিকে যাবেন!

সি.আই.ডি. হোমিসাইডের গোটা অফিস এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ডঃ চ্যাটার্জি তাঁর দলবল নিয়ে লেগে পড়েছেন ছ-টা লাশের পোস্টমর্টেমে! ভাগ্যক্রমে আহেলির সঙ্গে এখন আইভি থাকায় কাজ অনেক বেশি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। তিনজন ফরেনসিক এক্সপার্ট এখন মৃতদেহের সঙ্গে বাক্যালাপে ব্যস্ত। পবিত্র আর কৌশানী দিল্লি, কানপুর ও বেঙ্গালুরুর থেকে 'বার্নিং শিখ' সম্পর্কিত যতটুকু তথ্য, বয়ান বা এভিডেন্স যোগাড় করা যায় তার পেছনেই লেগে আছে। অর্ণব ও আত্রেয়ী প্রতিবেশীদের এখনও একটানা জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছে। যদি এর মধ্যেই কোনো কাজের কথা জানা যায়!

"লোকটার তো দেখছি অষ্টোত্তর শতনাম! স্টেফানো মাইনো, কেহের সিং, নাথুরাম, রাজেন্দ্র কুমার, মহম্মদ ইউনুস, পরমেশ্বর নারায়ণ রেড্ডি, রামেশ্বর রাও ... বলতে বলতেই এডিজি সেন আঁৎকে উঠলেন, "অ্যাঁ, এ কী! সাসপেক্ট লিস্টে তো একজন মহিলাও আছেন দেখছি। সমা বিবি! মুসলিম। কী সর্বনাশ! ইনি মহিলাদেরও ভেক ধরতে জানেন নাকি!"

"সবই চলে স্যার।" অধিরাজ চিন্তিত, "তবে আগের ভেকগুলো দেখে লাভ নেই। এখন তিনি কোন্ ভেক ধরে কোথায় আছেন, সেটা জানতে পারলেই হবে।"

দিল্লি ও বেঙ্গালুরু থেকে জোগাড় করা ফুটেজগুলো বারবার মন দিয়ে দেখছিলেন শিশির সেন ও অধিরাজ। বেঙ্গালুরুর একটি সিসিটিভিতে আবছাভাবে ধরা পড়েছে শুনশান রাস্তায় বার্নিং শিখের বীভৎস মূর্তি। তার মুখটা দেখলে যে কেউ ভয়ে হার্টফেল করবে! সত্যিই কোনোদিক দিয়েই তাকে মানুষ বলা যায় না! দিল্লির ঘটনার সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরা, তথা ফাদার স্টেফানো মাইনো, কেহর সিং ও নাথুরামের ছবিও কারোর না কারোর মোবাইলে বা বাড়ির সিসিটিভিতে পাওয়া গিয়েছে। সেগুলোই প্রোজেক্টরের সাহায্যে কনফারেন্স রুমের পর্দায় বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল ওরা। এডিজি সেন দেখতে-দেখতেই বললেন, "হোপলেস। বুঝতেই পারছি না এরা একই ব্যক্তি না আলাদা আলাদা লোক? কারা খুন হবে, কে খুন হবে, কখন, কোথায়, কিচ্ছু জানি না। আমি পুরোপুরি কনফিউজ ব্যানার্জি। বুঝতেই পারছি না কোথা থেকে শুরু করব!"

অধিরাজ ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে পর্দার দিকে তাকিয়েছিল। তার সামনে এখন বার্নিং শিখের ফুটেজ। জুম করার পরে তার গোটা মুখটাই ধরা দিয়েছে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

বলল, "একদম কিছু জানি না তা বোধহয় বলতে পারি না। নিজের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য সে নিজেই আমাদের জানিয়েছে।"

"যেমন?"

"যেমন তার মোটিভ জানতে আর বাকি নেই। শুরু থেকেই সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই খুনগুলোর পেছনে ১৯৮৪ সালের অ্যান্টি শিখ রায়ট-ই দায়ী। খুনি তখন রায়ট-এর ভিকটিম ছিল। সম্ভবত সেই রায়ট-এর কারণে সে সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে যায়। তার গোটা পরিবারই এই দাঙ্গায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু সে একাই সার্ভাইভ করতে পেরেছিল। এবং কিছুদিন আগেও তার দেশের আইন-কানুনের ওপর কিছুটা হলেও ভরসা ছিল যা সজ্জনকুমারের যাবজ্জীবন হওয়ার পর একেবারেই উঠে গিয়েছে। সম্ভবত লোকটি সজ্জনকুমারের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট তথা ডেথ পেনাল্টি চেয়েছিল। তা না হওয়ায় সে প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট।"

শিশির সেন আলতোভাবে মাথা নাড়েন, "সজ্জনকুমারের সাজাটা তার পছন্দ হয়নি তা বোধহয় ঠিক তার পরের দিনই দিল্লিতে অ্যাটাক করার জন্য আন্দাজ করতে পেরেছ। এটা আমারও মনে হয়েছে। আরও আগে সে প্রতিশোধ নিতে পারত৷ কিন্তু এত বছর অপেক্ষা করার একটাই মনস্তাত্ত্বিক কারণ পাচ্ছি। ও শেষপর্যন্ত দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। হয়তো চেয়েছিল, আইনই দোষীদের সাজা দিক। যখন দেখল সাজার নামে স্রেফ প্রহসন হচ্ছে, তখনই শাস্তি দেওয়ার দায় নিজের হাতে তুলে নিল।" তিনি একটু থেমে বললেন, "তবে লোকটা ১৯৮৪ সালেই অনাথ হয়েছিল এটা তুমি কী করে বললে? ওই রায়টে মূল টার্গেট করা হয়েছিল শিখ পুরুষদের। মব কিলিংটা বা লিঞ্চিংটা তাদের ঘিরেই হয়েছিল। সব মহিলাদের প্রাণে মারেনি। এই লোকটার পরিবারে দিদি, বোন বা মা কেউ ছিল না বলছ?"

অধিরাজের চোখে অদ্ভুত একটা ঘোর, "হয়তো ছিল। তবে দাঙ্গার পর আর কেউ ছিল না তার স্যার। 'মব' জিনিসটা কোনো প্রিন্সিপ্‌ল্ মেনে চলে না। তারা নীতি, আদর্শের তোয়াক্কা করে না। সবসময়ই যে পুরুষদেরই মারবে, সব মেয়েদের ছেড়ে দেবে এমন কোনো কথা নেই। অন্তত এক্ষেত্রে দেয়নি।"

"বুঝলে কী করে?"

"তার প্যাটার্নটা দেখুন স্যার। নিজেকে খুনির জায়গায় বসিয়ে দেখুন।" তার অন্যমনস্ক আঙুলগুলো পেপার ওয়েটটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, "সে আসল কালপ্রিটদের মারছে না। অথচ ওই বুড়ো লোকগুলো অনেক বেশি ভলনারেবেল এবং সফট টার্গেট। তাদের মারাটাই স্বাভাবিক ও সহজ। ও সাত-আট জনকে মেরে ফেলছে, অথচ পার্টিকুলার ওই ব্যক্তিটিকে ছুঁচ্ছেও না! কেন?"

শিশির সেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন, "পয়েন্ট। যাকে শাস্তি দেওয়া উচিত, তাকেই ছেড়ে দেওয়ার মানে কী! বুড়ো বলে ছেড়ে দিল?"

অধিরাজ হেসে ফেলে, "অত দয়ার শরীর তার নয়। আসলে সে ওই লোকটাকেই শাস্তি দিচ্ছে। এবং সেটা ডেথ পেনাল্টির চেয়েও ভয়ংকর। সার্ভাইভারদের পরিণতিগুলো দেখুন। কেউ প্যারালাইসিজড হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, কেউ পাগল হয়ে গেল, কেউ আত্মহত্যা করল—এর চেয়ে তো ফাঁসিও অনেক ভালো। দিল্লি, কানপুর, বেঙ্গালুরু-সব জায়গাতেই বেঁচে থাকা মানুষদের এই তিনটে পরিণতিই হয়েছে। ওঁদের যদি মেরে ফেলত, তবে একপ্রকারের মুক্তিই পেয়ে যেতেন ওঁরা। সেটা শাস্তি হত না। এই 'ফ্যান্টম' তাঁদের ঘাড় ধরে দেখিয়ে দিল 'নিজের গোটা পরিবারের এমন বীভৎস মৃত্যু হলে দ্যাখ কেমন লাগে!' এই জ্বালা অন্য কারোর নয় স্যার। এ জ্বালায় সে নিজেই জ্বলেছে। চোখের সামনে নিজে বেঁচে থেকে পরিবারের সবাইকে মরতে দেখেছে বলেই জানে এটা মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণাটাই সে নিজের অপরাধীদের দিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটাকে মিডিয়া পাগল বলছে ঠিকই, কিন্তু আমি ওর পাগলামির চেয়েও আবেগটা বেশি টের পাচ্ছি। আদৌ ও পাগল নয়। বরং খুব ঠান্ডা মাথার মানুষ যে পুরো হোমওয়ার্ক করে, আঁটঘাঁট বেঁধে, ক্রাইমটা করার ফিল্ড রেডি করেই পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে। এতটা কনফিডেন্ট হওয়ার

একটাই কারণ, লোকটা বেসটা অনেক আগেই তৈরি করে রেখেছে। তাই ভালোভাবেই জানে আচমকা ঘুম থেকে উঠে পুলিশ কিছুই করতে পারবে না বরং চোখে মুখে অন্ধকার দেখবে। যেমন আমরা দেখছি। এত অঙ্ক করে যে খুন করে, সে আর যা-ই হোক পাগল নয়।"

"কিন্তু এটা কি আদৌ একটা লোকের কাজ ব্যানার্জি?" শিশির সেন চিন্তান্বিতভাবে বললেন, "ছ, সাত, আটজন লোককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে টায়ার পরিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া—এ কি একটা লোক পারে! দিল্লিতে আড়াইশো-তিনশো লোকের ভিড় এই কাজটা করেছিল। একাধিক লোক তো ছাড়ো, একটা লোককেই ওভাবে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিতে গেলে যথেষ্ট হাতাহাতি করতে হবে। ক্যাওয়াস হবে, চিৎকার চেঁচামেচি হবে, প্রতিবেশীরা টের পাবেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাড়িতে থাকা বৃদ্ধ লোকটিই কিছু শুনতে পাননি, প্রতিবেশীরা তো শীতের রাতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমারও মনে হয় একটা গোটা গ্যাং এর পেছনে আছে। আর এরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা লোক! আর ওদের টিমে একজন বা একাধিক মহিলাও আছে।"

অধিরাজ নঞর্থক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে, "আই বেগ টু ডিফার। প্রথমত, একটা গ্যাং হলে বরং চিৎকার চেঁচামেচি বেশি হওয়ার চান্স ছিল। একজন একটা কাজ নিশ্চুপে সারতে পারে। একটা দল তা পারে না। ভিড় হলে চেঁচামেচি হবেই। এক্ষেত্রে তা হয়নি। মদন যখন দেখেছিল তখন একজনকেই ক্রাইম সিনে দেখেছিল। লাশ পাওয়ার পর গোটা বাড়ি আমি আর অর্ণব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি। ত্রিপাঠীজি ছাড়া সেখানে আর কেউ ছিল না। একটা মানুষ যত সহজে গায়েব হতে পারে, গ্যাং অত সহজে, অত কম সময়ে হাওয়া হতে পারে না। তাই আমার মনে হয় না এখানে কোনো গ্যাং আছে। দ্বিতীয়ত, এই সব ক-টা ছবিই একটি ব্যক্তির, যিনি মেক-আপে সিদ্ধহস্ত! শুধু মেক-আপ নয়, প্রস্থেটিক মেক-আপও চমৎকার জানেন। নয়তো 'বার্নিং শিখ'-এর এই ভয়াবহ পৈশাচিক মুখটি তৈরি করতে পারতেন না! কোনো মুখের সঙ্গে কোনো মুখের কোনো মিল নেই! বার্নিং শিখের মুখ তো বোঝাই যায় না! এটা আমার দেখা হ্যালোউইন মেক-আপের এখনও পর্যন্ত সর্বসেরা দৃষ্টান্ত! শিখ ড্রাইভারের মুখও দাঁড়ি গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা, মাথার ওপরে পেল্লায় পাগড়ি! এর পেছনের আসল মুখ শনাক্ত করে এ সাধ্য পুলিশের চোদ্দগুষ্টিরও নেই। ফাদারের মুখ দেখা যাচ্ছে। ক্লিন শেভডও বটে। অথচ নাকটা দেখুন বেশ লম্বা, চিবুকটা শার্প, খাঁজকাটা! চোখে ভারি পাওয়ারের চশমা। নাক, চিবুক, গালে প্রস্থেটিক মেক-আপ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অর্ণব ও মিস্ দত্ত একটু পরেই বেশ কিছু বৌদ্ধ লামাদের ছবি নিয়ে আসবে, যার মধ্যে অন্তত একজন সাড়ে পাঁচ ফুট থেকে পাঁচ ফুট ছ-ইঞ্চির কাছাকাছি হবেন। তিনি একজন বৃদ্ধ লামা হবেন যাঁর গায়ের রং চাপা হলেও মুখটা নেপালি ধাঁচের হবে। আই মিন চ্যাপ্টা নাকের, চওড়া গালের ও ছোটো নাকের মানুষ যার মুখ বলিরেখার জ্বালায় বোঝাই দায়! এবং মোস্ট প্রব্যাবলি তাঁর নামের শুরুটা 'বুদ্ধ' দিয়েই হবে। যেমন বুদ্ধভদ্র, বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ....!"

"বুদ্ধদত্ত স্যার! আপনি কী করে জানলেন!"

অধিরাজের কথার মধ্যেই কনফারেন্স রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেছিল অর্ণব ও আত্রেয়ী। তারা ক্রাইমসিন ভালো করে তল্লাশি করে এভিডেন্স সংগ্রহ করে, সমস্ত পড়শিদের ইন্টারোগেট করে ফিরে এসেছে। অধিরাজের কথা শুনতে পেয়ে অর্ণব অবাক হয়ে বলল, "চার পাঁচজন লামা আসতেন ও বাড়িতে। ওঁদের একজনেরই নাম বুদ্ধদত্ত, এবং স্যার যেরকম বললেন, অবিকল তেমনই দেখতে। একদমই বৃদ্ধ, মুখে প্রচুর কাটাকুটি। তেনজিং এর মোবাইলে তাঁর ছবিও আছে। নেপালিদের মতোই মুখ, কিন্তু রং চাপা! একে নিয়েই প্রতিবেশীদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। সেজন্যই ওঁর নাম মনে আছে তাদের।"

"ছবি এনেছ? ফ্যান্টাস্টিক।" সে উত্তেজিত, "দেখি খানদানি মুখটা।"

তেনজিং-এর মোবাইল থেকে ছবিগুলো নিজের মোবাইলে ট্রান্সফার করে নিয়েছিল অর্ণব। সে এক এক করে সব লামাদেরই ছবি দেখাচ্ছিল। প্রতিবেশীরা ঠিকই বলেছিল।

সবাইকেই মোটামুটি একইরকম দেখতে। তার মধ্যেই এক অতিবৃদ্ধ লামাকে দেখে অধিরাজ বলে উঠল, "ইনিই নির্ঘাৎ বুদ্ধদত্ত?"

"হ্যাঁ।" অর্ণবের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, "কিন্তু আপনি কী করে....!"

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ছবিটা শিশির সেনকে দেখাল সে, "এই দেখুন স্যার! মুখের চামড়ায় পুরো ওয়ার্ল্ডের ম্যাপ তৈরি হয়ে গেছে। মাথা ন্যাড়া, চোখ প্রায় দেখাই যায় না, নাকটা চ্যাপটা, আগের ছবিগুলোর সঙ্গে কোনো মিলই নেই। ইনফ্যাক্ট কারো মুখে এত বলিরেখা ও ভাঁজ থাকলে আদতে তাকে দেখতে কীরকম তা বোঝা অসম্ভব! এত নিখুঁত প্রস্থেটিক মেক-আপ খুব কম লোকই পারে।" বলতে-বলতেই সে অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গী করে তাকিয়েছে অর্ণবের দিকে, "বাই দ্য ওয়ে অর্ণব, ওঁকে সবার মনে আছে কেন? শুধু দুধ পান করতেন বলে?"

এবার অর্ণব এবং আত্রেয়ী-দু-জনেরই মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করেছে। অর্ণবের মুখ দেখে মনে হল সে এখনই ফেইন্ট হয়ে পড়ে যাবে। আত্রেয়ী বিস্মিত স্বরে বলল, "অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট স্যার। তেনজিং আর ত্রিপাঠীজি প্রত্যেক বৌদ্ধ শ্রমণকে ডিনার বা লাঞ্চ অফার করতেন। বাকিরা তো সাধারণ নিরামিষ খাবারই খেতেন। কিন্তু ইনি আবার পিকিউলিয়ার। দুধ ছাড়া আর কিছু গ্রহণই করতেন না। ওঁর বক্তব্য ছিল, বয়েস হয়ে গিয়েছে বলে সব কিছু হজম হয় না। বিড়ালের মতো চুক চুক করে সাবধানে দুধ খেতেন! তেনজিং নিজেই এই গল্প প্রতিবেশীদের কাছে করেছিল। প্রতিবেশীরাও তেমনি তাঁকে আসতে দেখলেই বলত, "ওই যে! বিড়ালদত্ত এসেছে! কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"নাথিং মিস্ দত্ত! কারোর নাক থেকে ঠোঁটের অংশে প্রস্থেটিক মেক-আপ থাকলে সে শক্ত খাবার অ্যাভয়েডই করবে। ফলের রস, লস্যি, স্যুপ, সব লিকুইড ছেড়ে দুধকে কেন বেছে নিয়েছেন সেটা অবশ্য পরে বোঝাব।" সে মৃদু হাসল, "আসলে দিল্লির সময় থেকেই এই অপরাধীটির কীর্তিকলাপ ফলো করছি আমি। ভাবিনি যে তিনি কলকাতায়ও আসবেন। জাস্ট এমনিই কৌতূহল থেকেই স্টক করা আর কী! তাই তিনি কী করছেন, কেন করছেন, ভবিষ্যতে কী করতে পারেন, মোটামুটি একটা অঙ্ক করছিলাম। সেই অঙ্কের একটা পার্টই জাস্ট মিলে গেল, অন্য ম্যাজিক কিছু নয়।"

অর্ণব বুঝতে পারে, অধিরাজ তার থিয়োরি এখনই ভেঙে বলতে চায় না। আত্রেয়ী কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল, অর্ণব চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়েছে। শিশির সেন একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বাট্ ব্যানার্জি, আমি এখনও কনফিউজড! এখনও মনে হচ্ছে এর পেছনে গোটা একটা গ্যাং কাজ করছে। তুমি শিওর যে এটা একজনেরই কাজ?"

"মেইন লোক একজনই স্যার। এসব কীর্তি তারই। সবক-টা ছবিতে যাকে দেখছেন তিনি এক ও অদ্বিতীয়।" সে বলল, "তবে হ্যাঁ, তার একটা বিরাট কানেকশন আছে। পাবলিক রিলেশন খুব স্ট্রং। যার জন্য নানাবতি কমিশনের লিস্টের নামগুলো তিনি পেয়ে যান, এবং তাদের কারেন্ট লোকেশনও অ্যাকসেস করতে পারেন। শুধু এইটুকু করার জন্যই যা কানেকশন লাগে তা একজন পাওয়ারফুল ব্যক্তিত্ব, পুলিশ-ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোক, আন্ডারগ্রাউন্ড এজেন্ট বা 'র' এজেন্টদের তথা স্পাইদের থাকে। অনেক প্রতিভাবান প্রাইভেট ডিটেকটিভও চেষ্টা করলে খুঁজে বের করতে পারে। তার ওপর এরকম মেক-আপের অসাধারণ ক্ষমতা। আমার মনে হয় না ইনি কোনো সাধারণ লোক।"

"কিন্তু তোমার কেন মনে হয় এই সবক-টা ছবিই একজনের?" এডিজি সেন কিন্তু কিন্তু করে বলেন, "এমনও তো হতে পারে এরা প্রত্যেকে আলাদা ব্যক্তিত্ব! কারণ এদের প্রত্যেককেই দেখতে আলাদা।"

"শুধু মুখটা আলাদা।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, "কিন্তু হাইট, চেহারার ধরণ, গায়ের রং একই। প্রস্থেটিক মেক-আপ দিয়ে মুখ অনেকটাই বদলে দেওয়া যায়, চুল উইগ দিয়ে পালটানো যায়, চোখের রং লেন্স দিয়ে চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু চোখের অ্যাকচুয়াল আকার কমানো বাড়ানো যায় না। তাই লামা সাজতে গিয়ে বেচারিকে এক্সট্রা বলিরেখা আমদানি

করতে হয়েছে। চামড়ায় যত ভাঁজ থাকবে চোখ ততই ছোটো দেখাবে। এটা কমল হাসান 'হিন্দুস্তানি' ফিল্মে হাতে কলমে করে দেখিয়েছিলেন। আবার ফাদার সাজতে গিয়ে চোখদুটো বড়ো করার জন্য একটা ভারি পাওয়ারের চশমা নাকে চাপিয়েছে। ভারি পাওয়ারের চশমার পেছনের চোখ, আর অরিজিনাল চোখ এক নয়।

ভারি পাওয়ারের চশমা খুলে ফেললে তাই চোখ আর চোখের দৃষ্টি দুই-ই পালটে যায়। ফাদার আর লামাকে ছেড়ে দিয়ে বাকি ছবিগুলোতে লোকটার চোখ দেখুন—একই। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটা ছবিতে উনি কিছু-না কিছু ধরে আছেন বা করছেন। ফাদারের হাতে পবিত্র জলের শিশি, ড্রাইভারের হাতে স্প্যানার, লামার হাতে একটা রোজারি মালা বা নেনজু ধরা আছে, নাথুরাম ফুটেজে বিড়ি খাচ্ছে, 'বার্নিং শিখ' ফুটেজের ভেতরে একবার নিজের পাগড়ি ঠিক করেছে, রাজেন্দ্র কুমার সিগারেট টানছে, মহম্মদ ইউনুস লাঠি ধরে আছে, সব বাঁ-হাতে। আপনি বলতে চান কেউ এমন একটি সদস্যদের টিম তৈরি করেছে যারা একই হাইটের, একই শেপের, একই কমপ্লেক্সনের এবং একইরকম শেপের চোখের অধিকারী! সবচেয়ে মজার কথা, সবাই লেফটি।"

"নাঃ। চোখের যুক্তিটা যদি একটু দুর্বল বলে উড়িয়েও দিই, লেফটি হওয়ার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।" তিনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "তবু অন্তত কিছু তো লিড পাওয়া গেল।"

"চোখটাকে উড়িয়ে দেবেন না স্যার।" অধিরাজ বলল, "আমি যদি খুনির জায়গায় থাকতাম তবে যেখানে দাড়ি-গোঁফের ক্যামোফ্লেজ দেওয়ার উপায় নেই, সেখানে প্রস্থেটিক মেক আপ ছাড়া চোখটাকেও ছোটো বড়ো করতাম। কারণ চোখ দেখেও মানুষ চেনা যায়। যেমন সলমান খান কিংবা অজয় দেবগণকে শুধু চোখ দেখেই চেনা সম্ভব। তাই এরপর আমি হয় চাপদাড়ি বা গোঁফ দেখলে কিংবা অতিরিক্ত বলিরেখার কাটাকুটি অথবা হাই পাওয়ারের চশমা চোখে পড়লেই সন্দেহ করব। তার ওপর সে ব্যক্তি লেফটি হলে তো কথাই নেই।"

শিশির সেন কাঁধ ঝাঁকালেন, "ফাইন। সাসপেক্টের কিছু ধর্ম তো জানা গেল। সম্ভবত লোকটি হিন্দিভাষীও বটে। কলকাতায় অবশ্য প্রচুর অবাঙালি আছে। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর বাংলা জানে ও বোঝে। ইনি দিল্লির লোক, বাংলা নাও বলতে পারেন।"

"এটাও পয়েন্ট হতে পারে।" অধিরাজ ফের অন্যমনস্ক, "তবে আমি অত আশাবাদী নই স্যার। দিল্লি ও কানপুরে না হয় হিন্দিতে কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু বেঙ্গালুরুতে কাজ চালালেন কী করে? ওখানে লোকে হিন্দির চেয়ে কন্নড়, তামিল আর তেলুগুতেই বেশি কথা বলে। হিন্দিভাষী ওখানে প্রায় নেই। ইংরেজি অবশ্য চলে। কিন্তু এই ব্যক্তি সেখানেও প্রত্যেকটি কেসেই স্থানীয় বাসিন্দা এবং একটু লো প্রোফাইলের মানুষ রূপে ছিলেন। যেমন ড্রাইভার, লেবার—ইত্যাদি। স্থানীয় ড্রাইভার বা মজুর ঝরঝর করে ইংরেজি বলবে সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তার ওপর পুলিশ সজাগও ছিল। ইংরেজি বলার ভুল সে করবেই না। কারণ দক্ষিণ ভারতীয়দের ইংরেজির অ্যাকসেন্ট আলাদা। তবে সে কোন ভাষায় কথা বলেছিল?"

"তাই তো।" এডিজি স্তম্ভিত, "তার মানে সে সাউথ ইন্ডিয়ান ভাষাও জানে!" "সেটাই মনে হচ্ছে।" বলতে-বলতেই তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, "ব্যাপারটা অত সহজ হবে না স্যার। আমি যদি ভুল না করি তবে এ মক্কেল একাধিক ভাষা জানে। বাংলা অল্পস্বল্প বলতে পারলে আমি আশ্চর্য হব না। আপনি ওকে আন্ডার এস্টিমেট করছেন। এ রীতিমতো প্রতিভাবান ক্রিমিনাল। সহজে ধরা দেবে না।"

"তাহলে? কীভাবে এগোব আমরা?" তিনি চিন্তিত স্বরে বললেন, "কাদের খুন করবে অন্তত সেটাও যদি জানা যেত...!"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঝড়ের গতিতে এসে হাজির হল পবিত্র এবং কৌশানী। ওরা এতক্ষণে নানাবতি কমিশনের ফাইলের নামগুলোর মধ্যে কতজন এইমুহূর্তে কলকাতায়

আছেন, সেই খবরই নিচ্ছিল। ২০১৮ সাল অবধি মামলা চলেছে বলে দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চের কাছে সমস্ত আপডেটেড রেকর্ডই ছিল। সেখান থেকে কলকাতার উড বি ভিকটিমদের তালিকা বানিয়ে ফেলেছে ওরা।

পবিত্র উত্তেজিত ভঙ্গিতে জানায়, "সর্বনাশ করেছে রাজা! ওই ফাইলের মধ্যে আটজন এই মুহূর্তে কলকাতাতেই আছেন। অবশ্য লেটেস্ট নিউজ অনুযায়ী তাদের মধ্যে দু-জন অলরেডি কোভিডে মারা গিয়েছেন। একজন বিয়ে থা করেননি। বৃদ্ধাশ্রমেই থাকেন। বাকি পাঁচজনের মধ্যে জ্যোতিপ্রকাশ ত্রিপাঠীর বাড়িতে অলরেডি অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে এই খবরটা কী করে যেন নিউজ চ্যানেলে লিক হয়ে গিয়েছে। কী করে মিডিয়ার লোকগুলো এত তাড়াতাড়ি খবর পায় কে জানে! তার পর থেকেই এমার্জেন্সি লাইনগুলোয় একের পর এক ফোন আসছে। ছ-জন ব্যক্তি এবং আটজনের পরিবার পুলিশ প্রোটেকশন চাইছেন! যারা মারা গিয়েছেন, তাদের গোটা ফ্যামিলি তো সোজা নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে গিয়ে বসে আছে!"

শিশির সেনের মাথায় হাত। আটজনের পরিবারকে কীভাবে একসঙ্গে প্রোটেকশন দেবেন! তাছাড়া পুলিশ প্রোটেকশন দেওয়া মানে পুলিশকর্মীদেরও জীবন বিপন্ন করা। কানপুর ও ব্যাঙ্গালুরুর ঘটনার পর এখন পুলিশও নিরাপত্তা দিতে ভয় পাচ্ছে। এই মুহূর্তে ঠিক কী করবেন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। অধিরাজ কিন্তু অদ্ভুত শান্ত। সে আস্তে আস্তে বলল, "কুল পবিত্র। এত টেনশন নেওয়ার কোনো মানে হয় না। অপরাধী চাইছে আমরা কনফিউশনে পড়ি। সেজন্যই চ্যানেলে খবরটা সে নিজেই লিক করেছে। অন্য কোনো সূত্র থেকে লিক হয়নি। এই ক্যাওয়াসটা সে চাইছিল, তাই তার কাজ সে করেছে। আমরা আমাদের কাজ করব। তুমি বরং যাদের ওপর বিপদের সম্ভাবনা নেই তাদের এই লিস্ট থেকে আউট করো এবং তাদের প্রত্যেককে নিশ্চিন্ত করো।"

"বিপদের সম্ভাবনা নেই মানে!" পবিত্র বলল, "আমি তো আটজনের ফ্যামিলির মাথাতেই যমরাজের খাঁড়া লটকে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। আর তুমি বলছ বিপদের সম্ভাবনা নেই!"

"না। সবার মাথার ওপর খাঁড়া লটকে নেই।" সে বুঝিয়ে বলে, "যে দু-জন কোভিডে মারা গিয়েছেন, তাদের পরিবার সম্পূর্ণ নিরাপদ। খুনি যাদের চরম শাস্তি দিতে চেয়েছিল, যখন তারাই ধরাধামে নেই তখন তার পরিবারকে খামোখা মেরে সে কী করবে? শোকাহত হওয়ার লোকটাই তো নেই। পরিবার তখনই বিপন্ন যখন ব্যক্তিটি তাদের নিয়ে সুখে সংসার সাজিয়ে বসে আছেন। সেটা না থাকলে বিপদও নেই। আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, তবে দিল্লিতে সে শেষ খুনটা এই কারণেই করেনি। পেপারে পড়েছিলাম ঠিক ওই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লির এক বিখ্যাত বয়স্ক কংগ্রেস নেতা টেঁসে গিয়েছেন। খবরটা পেপারে উঠেছিল কারণ তিনি কুখ্যাত সজ্জনকুমারের সঙ্গেই মামলায় ফেঁসেছিলেন। সম্ভবত ওই লোকটাই নেক্সট টার্গেট ছিল। কিন্তু মরে গিয়ে ভদ্রলোক গোটা ফ্যামিলিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।" অধিরাজ মৃদু হাসল, "ঠিক একই কারণে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা ব্যক্তিটিরও দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। তার পরিবারই নেই তো মারবে কাকে! ভদ্রলোক বিয়ে করেননি, কোনো সংসারের ঝামেলা নেই। বৃদ্ধাশ্রমে হয়তো বন্ধু বান্ধব কিছু হয়েছে। কিন্তু তাদের ধরে কচুকাটা করলে ভদ্রলোক দুঃখেই মরে যাবেন বলে মনে হয় তোমার? আমার মনে হয় না! আর সরাসরি তাকে মেরে ফেললে সেটা শাস্তির চেয়ে মুক্তিই বেশি হবে। খুনি সেটাও চাইবে না। অতএব তিনিও এ যাত্রা বেঁচে গেলেন। বাকি পাঁচজনের মধ্যে একজনের বাড়িতে অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে। অতএব সংখ্যাটা আরও কমল। বাকি রইল হারাধনের চারটি ছেলে। তাদের স্টেটাস কী?"

'এর মধ্যে আনোয়ার শেখ নামের এক ভদ্রলোক আছেন। বর্তমানে প্রায় পঁচাশি বছর বয়েস। সেই সময়ে দিল্লিতে তাঁর তিনটে বিরাট পেট্রোল পাম্প ছিল। সেখান থেকেই সবরকমের জ্বালানি তেল ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছিল। এই মুহূর্তে তিনি ঢাকুরিয়ার একটা বিরাট প্রাসাদে চাকর-বাকরের সঙ্গে একাই থাকেন। তাঁর পুত্রসন্তান নেই। সম্ভবত ছেলে ছেলে করতে করতেই তিনজন কন্যাসন্তানের জন্ম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু একজন মেয়েও

নিজের বাবাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না! বাবারও তিন মেয়ে ও জামাই চক্ষুশূল। বাবার সম্পত্তি নিয়ে তিন মেয়ে কামড়াকামড়ি করছিল দেখে খেঁকুটে বাবা ডিক্লেয়ার করেছেন, সমস্ত প্রপার্টি তিনি খুব শীগগিরিই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দান করে যাবেন। এরমধ্যেই যদি বার্নিং শিখ মেয়ে জামাইদের উড়িয়ে দেয়, তবে বাবা বিশেষ দুঃখিত হবেন বলে মনে হয় না। বরং সম্পর্কটা এমনই দাঁড়িয়েছে যে আনোয়ার উলটে খুশিই হবেন।"

"আমাদের খুনি কি এত বড়ো খুশির খবর প্রাণে ধরে আনোয়ার সাহেবকে দিতে পারবেন? মনে হয় না।" সে মাথা নাড়ে, "চরিত্র যা বুঝলাম যে এরকম সংবাদ শুনে আনোয়ারও হার্ট ফেল করতে পারেন। তবে সেটা আনন্দের চোটে। এত বড়ো আনন্দ তাঁকে দেওয়া যায় না। অতএব তিনিও বাদ গেলেন। নেক্সট?"

"রাজনীতিবিদ পি সি চৌধুরী। কট্টর কংগ্রেস সমর্থক। জগদীশ টাইটলারের অনুগত ভক্তদের মধ্যে অন্যতম। নিজে মরতেও পারতেন, মারতে তো পারতেনই। ইনি রীতিমতো ঘোষণা করেছিলেন পাগড়িসহ এক একজন শিখের মুণ্ডু পিছু পাঁচশো টাকা দেবেন! উনি আলিপুরে সপরিবারেই থাকেন। যদিও খুব বড়ো পরিবার নয়। তাঁর নিজের কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। তাই মধ্যবয়েসে এসে একটি বাচ্চা ছেলেকে অ্যাডপ্ট করেছিলেন। তিনি, তাঁর স্ত্রী সোমলতা, দত্তক পুত্র পরিমল আর পুত্রবধূ মেঘনা, এই চারজনই থাকেন। এখনও নাতি বা নাতনির মুখ দেখেননি। সঙ্গে একজন কম্বাইন্ড হ্যান্ড, শিবু। টোট্যাল পাঁচজন।"

"এই ফ্যামিলিটার খুন হওয়ার চান্স আছে পবিত্র।" অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকায়, "নোট করো।"

"রাজ কানোয়ার।" পবিত্র কন্টিনিউ করে, "ইনি তৎকালীন দিল্লির একজন আই.এ.এস. অফিসার ছিলেন। দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকার দায়িত্ব ওঁর ওপরই ছিল। অসহায় শিখেরা সাহায্যের জন্য মিঃ কানোয়ারের সাহায্যপ্রার্থী হয়েওছিল। তিনি তাদের সুরক্ষিত রাখার আশ্বাস দিলেও আসল সময়ে কোনো স্টেপই নেননি। উলটে ভোটার লিস্ট তুলে দিয়েছিলেন আততায়ীদের হাতে, যার ফলে ভোটার লিস্ট ধরে ধরে শিখদের খুঁজে বের করে খুন করাটা জলভাত হয়ে গিয়েছিল।"

"এখন তিনি কোথায় আছেন? কী করছেন?"

"রিটায়ার্ড লাইফ লিড করছেন। স্ত্রী গত হয়েছেন কোভিডের সময়ে। ছেলে, পুত্রবধূ, নাতনি—সবাই বিদেশে থাকে। বছরে একবারও আসে কিনা সন্দেহ। ছেলে লন্ডনে ডাক্তারি করে। গ্রীন কার্ড হোল্ডার। ভারতবর্ষে আসার কোনো প্ল্যানিংই নেই।" "ইনিও সম্ভবত সেফ জোনেই আছেন। খুনি বুড়ো শয়তানকে মেরে হাত গন্ধ করবে না। ফ্যামিলি তো এখানেই নেই। বার্নিং শিখ আর যা-ই হোক, কষ্ট করে লন্ডনে গিয়ে ওঁর পুত্র-পুত্রবধূকে মারবে না। চিঠি অনুযায়ী খুনগুলো কলকাতাতেই হবে, লন্ডনে নয়। ওকেও বাদ দিতে পারো।"

"তাহলে নেতি নেতি করে ছাঁকনিতে আর একজনই রইলেন। এক্স আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তা। ইনি ভয়াবহ মেজাজি লোক। শিখেরা ওঁর কাছেও সাহায্য আর নিরাপত্তা চাইতে গিয়েছিলেন। শোনা যায় দত্তাসাহেব তাদের শান্ত করে প্রোটেকশন দেওয়ার আশ্বাস দেন এবং তাদের কাছ থেকে শিখরা যেসব অস্ত্র ঘরে রাখে, যেমন তরোয়াল, কৃপাণ, ছুরি—ইত্যাদি নিয়ে নেন। এরপরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। উন্মত্ত ভিড় নিরস্ত্র শিখদের সহজেই মেরে, ধরে, জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। তিনি ও তাঁর টিম দূরে দাঁড়িয়ে স্রেফ তামাশা দেখছিলেন। তবে জ্বালানোর জন্য যখন দেশলাই কাঠি কম পড়ছিল, তখন নিজের লাইটারটিও ডোনেট করেছিলেন। নানাবতি কমিশন এবং কপুর মিত্তল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ওঁর বিরুদ্ধে অনেক সাক্ষী থাকলেও পরে তারা সাক্ষ্য পালটে দেয়। কেস টিকল না। ইনিও নিশ্চিন্তে পুলিশের চাকরির মেয়াদ শেষ করে সম্প্রতি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। এখন অবশ্য কংগ্রেস নয়, বিজেপি সাপোর্টার। চুটিয়ে রাজনীতি করছেন। আর্বানায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে সপরিবারে থাকেন। পরিবারে তিনি, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে, জামাই,

আর তাদের দুই ছেলে মেয়ে আছে।”

“ইনি আমাদের দ্বিতীয় মক্কেল অর্ণব। নাম, ঠিকানা নোট করে নাও।”

অর্ণব মাথা ঝাঁকিয়ে লোকটির ডিটেলস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, “ইয়েস স্যার।” “ছি ছি!” এডিজি শিশির সেন এবার বিরক্তিতিক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, “আমারই লোকটাকে খুন করতে ইচ্ছে করছে! পুলিশ নামের কলঙ্ক! এদের প্রোটেকশন দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। বরং ওঁর ঘাড় ধরে বার্নিং শিখের সামনে ফেলে দেওয়া উচিত!! অন্তত আমাদের ইনোসেন্ট পুলিশকর্মীগুলো প্রাণে বাঁচে! কতগুলো ক্রিমিনালকে ফালতু বাঁচানোর চেষ্টা করছি কেন আমরা ব্যানার্জি?”

অধিরাজ পূর্ণদৃষ্টিতে এডিজি সেনের দিকে তাকায়। এডিজি সেনকে কখনোই এত উত্তেজিত ও বিরক্ত হতে সে দেখেনি। কখনও তিনি অপরাধীদের স্বপক্ষে কথা বলেন না। অথচ আজ যথেষ্ট বিচলিত। সে ওঁর মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, “সিরিয়াসলি স্যার, যতজনের প্রোফাইল শুনলেন, অথবা বেঙ্গালুরু আর কানপুরে যাদের প্রোটেকশন দিতে গিয়ে কতগুলো পুলিশকর্মী ও অফিসার মারা গেল, তাদের একজনকেও কি মর‍্যালি আমাদের বাঁচানো উচিত? আমাদের ওঁদের প্রতি সহানুভূতি নেই। কিন্তু বার্নিং শিখ ওদের মারছে না, ওদের ইনোসেন্ট ফ্যামিলিকে মারছে। এবং এটা সে নিজের জীবন যন্ত্রণা থেকেই করছে। চোখের সামনে সে নিজের পরিবারকে মরতে দেখেছে, নিজে বেঁচে থেকে তাদের মৃত্যুর দুঃসহ ভার বয়ে বেরিয়ে হয়তো তিল তিল করে মরছে। তাই তার পে-ব্যাক করার কয়েনটাও এক। তার দিক থেকে সে হয়তো ঠিক, কিন্তু নিষ্পাপ পরিবার, বিশেষ করে ছোটো ছোটো শিশুদেরও সে খুন করছে। আমরা সেটা হতে দিতে পারি না।”

শিশির সেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, “বুঝলাম। এখন কী করণীয়?”

“প্রথম কাজ আটটি পরিবারকেই প্রোটেকশন দেওয়া। যে ভুলটা কানপুর ও বেঙ্গালুরুর পুলিশ করেছিল, আমরাও সেটাই করব। বার্নিং শিখকে বুঝতে দেব যে আমরাও কনফিউজ। কে মরবে তা আদৌ বুঝিনি। আমরা প্রেস কনফারেন্সে বলব ঠিকই যে আটজনকেই পুলিশ প্রোটেকশন দিচ্ছি, সকলের সঙ্গে সশস্ত্র উর্দিধারীও থাকবে, কিন্তু আমাদের মেইন টিমের লক্ষ্য থাকবে এই বিশেষ দুটি পরিবারের দিকে। আমাদের টিম এই দুটো পরিবারকেই আসলে নিরাপত্তা দেবে। বাকিগুলো ফর শো! খুনি আমাদের যথেষ্ট কনফিউজ করে রেখেছে। এবার তাকেও আমরা একটু কনফিউজ করি। বাকি ছ-টা কেসে যারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছেন, তাদের পবিত্র শান্ত করে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে একজন করে কনস্টেবল খাড়া করে ছেড়ে দেবে। আমি নিশ্চিত, তাদের কিচ্ছু হবে না, কনস্টেবলরাও সুরক্ষিতই থাকবে। কারণ এবার খুনি যেদিকে দেখছে, আমরাও ঠিক সেদিকেই দেখছি।”

“বেশ। স্ট্র্যাটেজি কী? এই বাহাত্তর ঘণ্টা ওদের প্রোটেক্ট করা?”

“না স্যার।” অধিরাজ মাথা নাড়ল, “আমরা যা করব অবিকল খুনির পয়েন্ট অব ভিউ থেকে করব। আমাদের গোটা টিমকে তিনভাগে ভাগ করতে হবে। আমি আর অর্ণব তাকে চেজ করার চেষ্টা করব। পুলিশি তদন্ত নয়, একদম তার পয়েন্ট অব ভিউ থেকে এগোব। ম্যান টু ম্যান মার্কিং এর গেম। যে পথে সে হাঁটছে বা হাঁটবে সেটা ধরতে পারলে তাকেও পাওয়া যাবে। তখন তার পক্ষে গোল দেওয়া অত সহজ হবে না। মিস্ বোস আর পবিত্র প্রয়োজনীয় ব্যাক আপ এবং ইনফর্মেশন দেবে। ওদিকে প্রণবেশ লাহিড়ীকেও চাইছি স্যার। ওই ডেয়ার ডেভিল অফিসারটিকে আমার চাই। উনি আর মিস দত্ত ইন্টারোগেশনে হেল্প করবেন।” সে একটু থেমে যোগ করল, “আর একটা সাবোর্ডিনেট টিম তৈরি করতে হবে। খবরিদের টিম। আমাদের সেরা ইনফর্মারদের এবার মাঠে নামাতে হবে স্যার। ঘন্টু, যাদব, গুল্লু, ইসমাইল এবং রকিকে একঘণ্টার মধ্যে আমি ব্যুরোয় চাই। সময় হাতে একেবারেই নেই। এই চারটে টিম নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে শহর জুড়ে ঝড়ের বেগে কাজ না করলে বাকিদের মতোই একতরফা মাত খেতে হবে। কারণ খুনিকে আটকাতে গিয়ে সেটাই হয়েছে। এবার প্ল্যান বদল। আমরা ডিফেন্সিভ না খেলে সোজা অ্যাটাকে যাব, খুনিকে ধরার চেষ্টা করব,

যেটা সে একেবারেই এক্সপেক্ট করছে না।”

“তুমি যথারীতি খুনির মস্তিষ্কে ঢোকার চেষ্টা করছ দেখছি।” এডিজি ছোট্ট নড করলেন, “ওকে। তুমি লাহিড়ীকেও নিয়ে নাও। দরকার পড়লে লোক্যাল পুলিশদের হেল্পও নাও৷ যেমনভাবে প্ল্যান করছ, তেমনভাবেই এগোতে থাকো। চারটে টিমই একসঙ্গে কাজ করুক। ফরেনসিককেও এই বাহাত্তর ঘণ্টার জন্য হাই-অ্যালার্টে থাকতে হবে। তুমি ডঃ চ্যাটার্জিকে বলবে না আমি বলব?”

“তিনদিন তাঁকে ল্যাবেই কাটাতে হবে এমন সুসংবাদ হয়তো আমার মুখে শুনলেই তিনি বেশি আহ্লাদিত হবেন।” অধিরাজ হেসে ফেলে, “ইনফ্যাক্ট আমি আর অর্ণব এখন তাঁর কাছেই যাচ্ছি। আমিই না-হয় ঘণ্টাটা বেঁধে দিয়ে আসব।”

“ফাইন।” এবার শিশির সেনের কণ্ঠে একটু ব্যাকুলতা স্পর্শ করল, “তবে একটা কথা মনে রেখো। এই বাহাত্তর ঘণ্টায় তোমার যা ব্যাক আপ লাগবে সব দিতে রাজি আছি। কিন্তু কোনোরকম ক্যাসুয়ালিটি চাই না। একটা সাইকোর প্রতিশোধের ঠ্যালায় আমার কোনো অফিসার শহীদ হয়ে গেলে জীবনেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না আমি রাজা।”

অনেকদিন পর তিনি আবার অধিরাজকে ‘রাজা” বলে ডাকলেন। তাঁর চোখের চিকচিক করে ওঠাটাও নজর এড়াল না অর্ণবের। এই প্রথম তার মনে হল, একটা ভয়ানক যুদ্ধ লাগতে চলেছে। এবারের পরিস্থিতি প্রায় চোখ বুঁজে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। কানপুর আর বেঙ্গালুরুতে এই আগুন অনেক জীবনকে পুড়িয়ে ছাই করেছে। এবার কলকাতায় সেই আগুন জ্বলে ওঠার পালা! অধিরাজ আবার সেই আগুনের পদচিহ্ন ধরেই এগোতে চায়। অর্ণবের মনে হল একটা অগ্নিকুণ্ডের দিকে নিজেই ছুটে যাচ্ছে অধিরাজ। ম্যান টু ম্যান মার্কিং।

তার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। হৃৎপিণ্ডটাই বুঝি টিকটিক করে উঠে কাউন্টডাউন ঘোষণা করছে। জানান দিচ্ছে, লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। ওয়ান... টু... থ্রি... দ্য গেম ইজ অন!

**

(৪)

“আহেলি.... কুইক... তোমার হাতে অনন্ত সময় নেই। এখনই নবাবজাদারা ঘোড়ায় চড়ে আমাদের উদ্ধার করতে আসবেন। এসেই শুরু করবেন, হাই ডক্‌, কী খবর! ...কতদূর! ....কী হল! ...কেন হল? ...কেন হল না? রিপোর্ট নিতে এই সালেই আসব না পরের বছর?... উঃ, আসামাত্রই এমন হাঁউমাউখাউ শুরু করে দেবে যেন পারলে আমার টাকেই উঠে পড়ে।... একজন মিটিয়ে মিটিয়ে খোঁচা মারবে, অন্যজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে কাশবে! জগাই-মাধাই দুটোকেই খুব ভালো চিনি। তাড়াতাড়ি করো...!”

ডঃ চ্যাটার্জি মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে আহেলিকে বকার কোটা শেষ করে এবার আইভিকে নিয়ে পড়লেন, “মামণি... তোমার টেস্ট কতদূর! তুমি টেস্ট করছ না রেসিপি লিখছ ভাই? এখানে এসে এত স্লো কাজ করলে চলবে না বাপু! ইনফ্যাক্ট জম্বিরাও তোমার চেয়ে তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করে। দরকার পড়লে কাল থেকে কয়েক গ্যালন এনার্জি ড্রিঙ্ক খেয়ে আসবে। সারাদিন ধরে গাছপালা ঘাসপাতা আর তরমুজের শরবত খেলে এই হবে! তোমরা তো আমায় ডোবাবে দেখছি। রিডিকুলাস!”

বেচারি আইভি নিজের ফিগার সম্পর্কে খুব সচেতন। তাই প্রচুর পরিমাণে স্যালাড আর ফ্রুট জুস খায়। এখন সেটারও চচ্চড়ি আর ঘন্ট না বানালে ডঃ চ্যাটার্জির হচ্ছে না! আহেলি আড়চোখে আইভিকে দেখে নেয়। বেচারির মুখ বকা খেয়ে ইতিমধ্যেই বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। ডঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে এতদিন থেকে সে খুব ভালো করেই জানে যে ওঁর হৃদয়টা যতটা মিষ্টি, জিভটা ঠিক ততটাই কড়া! প্রথম প্রথম বকুনি খেয়ে ও নিজেই খুব মুষড়ে পড়ত। পরে বুঝেছে, ওই বকুনিই তাকে আরও নিখুঁত, আরও ভালো একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ বানিয়েছে। সে কথা আহেলিকে বোঝানোর জন্য কেউ ছিল না। কিন্তু আইভি'র ক্ষেত্রে সে আছে।

আহেলি আইভি'র মুখের অবস্থা দেখে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে, “স্যার, ওই তো ওর হয়েই এসেছে। আর একটু সময় দিন...!”

“গত দেড় ঘণ্টা ধরেই এই ‘হয়েই গেছে’ ডায়লগটা আমি অন্তত সাড়ে সাতান্নবার শুনেছি।” শান্ত হওয়ার বদলে আরও ক্ষেপে গেলেন ফরেনসিক বিশারদ, “ওর ‘হয়েই গেছে’-টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা! ওর হওয়া আর সরকারের ডি.এ. দেওয়া একই ব্যাপার। প্রত্যেকবার শুনছি এবার হয়ে যাবে। কিন্তু কোনোবারই হয় না! সব দোষ হচ্ছে ওর ডায়েটের। ঘাসপাতা খেলে নাকি স্লিম, ফিট থাকা যায়। তুমিই বলো, হাতি, গন্ডার, বাইসন রোজ রোজ ভূরি ভূরি পাতা খেয়ে কি ভুঁড়ি একটুও কমাতে পেরেছে? সিংহ, বাঘ বা লেপার্ড কি যথেষ্ট স্লিম, ফিট আর স্পিডি নয়? এসব হয়েছে ওই হতচ্ছাড়া অ্যাভোক্যাডো খাওয়ার ফলাফল। আর একটা কী যেন? পালংশাক আর ফুলকপি মার্কা লামড়োটার নাম যেন কী?”

আহেলি নামটা বলতেই যাচ্ছিল, তার আগেই পেছন থেকে যথারীতি গম্ভীর মোলায়েম অথচ পুরুষালি কণ্ঠে উত্তর এল, “ব্রকোলি।”

“হ্যাঁ। ব্রকোলি!” ডঃ চ্যাটার্জি মেশিনগানের ফায়ার করার মতো বলেই চলেছেন, “সকালে ব্রকোলি স্যুপ, দুপুরে ব্রকোলি স্যালাড, রাতে বেকড ব্রকোলি। ওকে এখন এক কাপ আদা-চা করতে বলতেও ভয় পাই। কে জানে, আদার বদলে যদি ব্রকোলি দিয়ে দেয়!”

“আদার বদলে দেবেন কেন?” এবার অধিরাজ একেবারে ডঃ চ্যাটার্জির নাকের সামনে এসে মসৃণভাবে দীর্ঘদেহটাকে সামান্য ঝুঁকিয়ে বাও করে বলল, “বরং চা আদা দিয়ে করে সঙ্গে ‘টা’-টা ব্রকোলি দিয়ে বানাতে বলুন না! ব্রকোলির পকোড়া খেতে কিন্তু খুব ভালো। আমার মা বানাতে পারেন।”

ডঃ চ্যাটার্জি কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার মা ল্যাবে কাজ করতে পারেন?”

সে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল, "নাঃ।"

"তাহলে তিনি আমার কোন্ ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে লাগবেন?"

"কেন?" তার মুখ যথারীতি শান্ত, "যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে আপাতত ব্রকোলি লাগছে!"

"হ্যাত্তেরি!" ডঃ চ্যাটার্জি মুখখানা হাঁড়ির মতো করে ফেলেছেন, "ভূতের বাপের নয়। আমারই শ্রাদ্ধ হচ্ছে। তাও ওই ব্রকোলির দৌলতে। এই মহিলাকে যখনই জিজ্ঞাসা করি, 'কী খেয়ে এলে?' সবসময়ই উত্তর, 'ব্রকোলি।' তার ফলাফলও দেখে নাও। একটা টেস্টের রেজাল্ট বের করতে গোটা একটা শতাব্দীই লাগছে! এর দায় কে নেবে?"

"ওঃ!" অধিরাজ মিটিমিটি হাসছে, "তাহলে সেনোরিটার এটা ভারি অন্যায়! তিনি নিজে ব্রকোলি খেয়ে থাকুন তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের প্রিয় টাকবাবুকে লাঞ্চে একটু ভালোমন্দ বানিয়ে বা আনিয়ে খাওয়ালে বোধহয় লেট হওয়ার দায়টা উনি নিতে রাজি আছেন! তাই না ডক্?"

অর্ণব সজোরে কেশে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লাফিয়ে ওঠেন ভদ্রলোক, "ওই যে! বলেছিলাম না আসামাত্রই কাশাকাশি শুরু হয়ে যাবে। এইজন্যই দু-চক্ষে দেখতে পারি না। আমার কী? আমি বেকার মানুষ। সারাজীবন অপেক্ষা করতে রাজি আছি। কিন্তু তোমার খুনি কি 'আব্বুলিশ' বলে বাহাত্তর ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করবে?"

এইবার অধিরাজের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "তা ঠিক। আমাদের সত্যিই এবার একটু তাড়া আছে। তাই বলে কাউকে খোঁচা মেরে হুড়মুড়িয়ে কাজ করানোও বোধহয় ঠিক নয়। মাদমোয়াজেল যা করছেন করতে দিন। আপনি বলতে শুরু করুন। সবার আগে বলুন, এই হাড় কাঁপানো শীতে মাথায় আইসব্যাগটি চাপিয়েছেন কেন?"

"কারণ আমার মাথা ঘুরছে। মাথার ভেতরে ঘিলুগুলো টগবগ করে ফুটছে। তোমাদেরও ফুটবে। আগে দুঃসংবাদটা শোনো।"

ডঃ চ্যাটার্জির কথা শুনে অধিরাজ চোখ ছানাবড়া করে বলে, "দুঃসংবাদ! কী সর্বনাশ! আপনি বিয়ে করছেন?"

"যাঃ কচু!" তিনি বিরক্ত হলেন, "এর মধ্যে আমার বিয়ে এল কোথা থেকে!"

"কারণ ওর থেকে বড়ো দুঃসংবাদ আর কিছু হতে পারে না।"

অর্ণব প্রচণ্ড একটা কাশিকে কোনোমতে সম্বরণ করে ফরসা মুখ লাল করে ফেলল। ডঃ চ্যাটার্জি গরগর করে ওঠেন, "তোমার এই ধাষ্টামোগুলোকে একটু সাইডে রাখবে! যা বলতে চলেছি তা শুনে দেখো। তারপর এই আইসব্যাগটা তুমিই চাইবে।"

সে এবার গম্ভীর হয়ে বলল, "বলুন। শুনি।"

"অ্যাজ ইউজুয়াল, ক্রাইম স্পটে কোনো অচেনা ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। ইনফ্যাক্ট কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্টই নেই! খুনি সব মুছে দিয়েছে। ফোর্সড এন্ট্রি নেই। অন্য কোনো ক্লুও পাইনি। তবে একটা জিনিস নিশ্চয়ই তোমরা ভেবে মরছ।" তিনি বললেন, "ছ-টা লোক জ্যান্ত পুড়ে মারা গেল, অথচ কেউ চেঁচাল না কেন? ছ-জন লোককে কেউ টায়ার পরাল, কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালল, অথচ কোনো আওয়াজ, কোনো চেঁচামেচি বা সামান্য শব্দও হল না! এমন নয় বাড়িটা লোকালয় থেকে দূরে। বরং এখনও পর্যন্ত যে সব জায়গায় খুন হয়েছে সেগুলো সবই বেশ জনবহুল এলাকায় পড়ে। বাড়িগুলো সব পাশাপাশি। তা সত্ত্বেও শব্দ পেল না কেউ। এটা কোন ম্যাজিকে সম্ভব সেটাই নিশ্চয়ই তোমার চিন্তার কারণ।"

"অফকোর্স।" অধিরাজের সুন্দর মুখে চিন্তার মেঘ ঘনায়, "এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের! যে কোনো মানুষের গলায় জ্বলন্ত টায়ার থাকলে সে তো চেঁচাবেই। ইভেন আগুন নেভানোর জন্য দৌড়োদৌড়ি করবে, মাটিতে গড়াগড়ি খাবে। কিন্তু ক্রাইমসিন দেখে একবারও মনে হয়নি যে ওঁরা এসব কিছু করেছেন। পোড়ার দাগ শুধু ওদের বাড়ির চারদিকেই ছিল। সেটাও টায়ারের ঘষা খাওয়ার দাগ নয়। অর্থাৎ কেউ মাটিতে শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টাই করেননি। জ্বলন্ত অবস্থায় ওই ঘর ছাড়া আর কোনো ঘরে যানওনি। একদম

শান্তশিষ্ট হয়ে শুয়ে শুয়ে পুড়েছেন! এটা কী করে সম্ভব!”

“এটা এইজন্যই সম্ভব...!” তিনি উত্তর দিলেন, “কারণ জ্বলার সময় ওঁরা কেউ বেঁচেই ছিলেন না। খুনি ছ-জন জ্যান্ত মানুষকে আদৌ নেকলেসিং করে মারেনি। মারার পর নেকলেসিং করেছে। এই বার্নটা অ্যান্টিমর্টেম বার্ন নয়, পোস্টমর্টেম বার্ন।”

“মানে!” এবার সত্যিই স্তম্ভিত অধিরাজ, “তার মানে ওঁরা পুড়ে মারা যাননি?” “এখানেই তো আসল প্যাঁচ। পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। আগে পুরোটা শুনে নাও।” ডঃ চ্যাটার্জি বলতে থাকেন, “দিল্লি, কানপুর বা ব্যাঙ্গালোরের এক্সপার্টরা ব্যাপারটা হয় খতিয়ে দেখেননি, নয় বডির অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে বুঝতে পারেননি। ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ লাশই প্রায় ছাই হয়ে গিয়েছিল তাই সম্ভবত ধরাই পড়েনি। কিন্তু কলকাতার বডিগুলো অতখানি পোড়েনি। তাই কিছু কিছু জিনিস বোঝা গিয়েছে। পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে এদের কারোর ট্র্যাকিয়ায় কার্বন সুট পার্টিকল্ নেই! অথচ জ্যান্ত মানুষ, ইনফ্যাক্ট সে যদি অজ্ঞানও হয়, তবুও নিঃশ্বাস নেবে। আর তার নাকের মাধ্যমে ধোঁয়া ফুসফুস অবধি পৌঁছবেই। ট্র্যাকিয়ায় কার্বন সুট পার্টিকল্ থাকবেই। কিন্তু এক্ষেত্রে নেই। এছাড়া জ্যান্ত মানুষের দেহে আগুন জ্বালালে ব্লিস্টার্স প্রেজেন্স মানে যাকে বলে ফোস্কা, প্রচুর পরিমাণে থাকবে। আশ্চর্যের বিষয়, এই ছ-টা দেহে প্রায় ফোস্কা পড়েইনি! অ্যান্টিমর্টেম বার্নের ক্ষেত্রে স্কিন তখনও জীবিত আছে ও কাজ করছে, মানে ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। ওটা যে কোনো জীবিত মানুষের দেহের স্বাভাবিক হিলিং প্রসেস। তাই পুড়ে গেলে স্কিন ব্লিস্টার বা ফোস্কা তৈরি করে দেয় যাতে পোড়া অংশটায় ইনফেকশন না হয়। একরকম বাইরের জার্ম থেকে ঢেকে রাখে বলতে পারো। এই মানুষগুলো যদি জ্যান্ত থাকত, তবে পোড়া চামড়ার ওপরে ফোস্কা থাকতই। অথচ চারজনের শরীরে কোনো ব্লিস্টারই নেই! দু-জনের শরীরে হাতে গোণা কয়েকটা আছে। যখন কেটে দেখলাম, তখন ব্লিস্টারগুলো পেল ইয়েলো রঙের দেখা গেল! জ্যান্ত মানুষের দেহের ফোস্কা টকটকে লাল হয়, ইয়েলো নয়! আরও আশ্চর্য, একটা লোককে ধরে জোর করে জ্বলন্ত টায়ার পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা টায়ার পরিয়ে আগুন ধরানো হচ্ছে, তা সত্ত্বেও সে কোনো স্ট্রাগল করল না। এদের কারোর দেহে স্ট্রাগল মার্কস নেই। এছাড়া বডিগুলোর হাত দেখো। একদম স্ট্রেট। মানুষের শরীরের সফট টিস্যু, মাসল পুড়ে কুঁকড়ে গেলে আর বার্নের কারণে ডিহাইড্রেডেট হয়ে গেলে সচরাচর হাত দুটো বক্সারদের মতো বুকের ওপর উঠে আসে। অবিকল বক্সাররা যে পজিশনে হাত রাখে, হাত দুটো ভাঁজ হয়ে তেমনই রূপ ধরে। এটাকে ‘পালিস্টিক অ্যাটিটিউড' বলে। অথচ এদের সবার হাত একদম স্ট্রেট। বেঁচে থাকা মানুষের ক্ষেত্রে অ্যাড্রিনালিন লেভেল অ্যাবনর্মালি হাই থাকার কথা। কারণ যে কোনো মানুষই এই পরিস্থিতিতে ফাইট ব্যাক করার চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে তাও হয়নি। এর একটাই কারণ হতে পারে। পোড়ার আগে ওদের শরীরের জয়েন্টগুলো একদমই ফ্লেক্সিবল ছিল না। এটা প্রি-বার্নিং স্কেলিটাল ট্রমা থাকলেও হতে পারে। কিন্তু একই স্কেলিটাল ট্রমা একসঙ্গে ছ-জনেরই হবে বা একই হাড় বা জয়েন্টের রোগ বাচ্চা থেকে বড়ো প্রতিটা লোকেরই থাকবে, তা হয় না। এর একটাই অর্থ দাঁড়ায়, এদের শরীরগুলো পোড়ার আগে একেবারেই নমনীয় ছিল না, বরং মৃত্যুকঠিন ছিল। এই ছোটো ছোটো লক্ষণগুলো এক করে হিসেব করলে বোঝা যায় যে এদের মধ্যে একজনও জ্বলে মরেননি, মরে জ্বলেছেন।”

তিনি একটু শ্বাস টেনে বললেন, “আর মরা মানুষের গায়ে আগুন কেন, গোটা আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা ঢেলে দিলেও সে চেঁচাবে না, বাধা দেবে না বা দৌড়োদৌড়ি করবে না! তাই কোনো আওয়াজ হয়নি, প্রতিবেশী কিংবা বাড়ির অন্য সদস্যেরও ঘুম ভাঙেনি। কতগুলো মরা মানুষকে এক এক করে টায়ার পরিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সাংঘাতিক বলশালী পালোয়ান বা একাধিক মানুষের দরকার নেই। একটা সাধারণ চেহারার মানুষই পারে।”

“যাক্।” অধিরাজ যেন একটু স্বস্তি পেল, “তার মানে ওরা পুড়ে যাওয়ার আগেই মারা গিয়েছিলেন। এইবার বুঝলাম এর পেছনের নীরবতার অর্থ। মরা মানুষ চেঁচায় না!”

“না।”

“তবে ওঁদের মৃত্যুর কারণ কী?”

ডঃ চ্যাটার্জি ফ্যাকাশে হেসে বললেন, “এইবার তোমার মাথায় বাজটা পড়তে চলেছে। ওঁদের মৃত্যুর কারণ বার্ন-ই।”

“হো-য়া-ট!”

অধিরাজ সচরাচর এত জোরে কথা বলে না। তার স্বর সবসময়ই উষ্ণ ও মন্দ্র। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কায় সেই সহজাত গাম্ভীর্যও সরে গেল, “কী বলছেন ডক্। এইমাত্রই তো বললেন যে ওঁদের আগুনে পোড়ার জন্য মৃত্যু হয়নি। মরার পর লাশগুলোকে নেকলেসিং করে জ্বালানো হয়েছে!”

“আমি এখনও তাই বলছি। এদের মধ্যে কেউ আগুনে পুড়ে মরেনি।” তিনি শুকনো মুখে বললেন, “কিন্তু ওদের প্রত্যেকের মৃত্যুর পেছনে একটাই কারণ। লাংস থেকে ল্যারিংস অবধি ভয়াবহভাবে পুড়ে যাওয়া! যেটা বাইরে থেকে আগুন জ্বালানোর ফলে একেবারেই হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, ওদের বডির ভেতরে কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছিল, অথবা মারাত্মক কোনো অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল। বিশেষ করে ল্যারিংস পুড়ে যাওয়ার জন্য ভোকাল কর্ড পুরোটাই মায়ের ভোগে! বার্ন হওয়ার ফলে রেস্পিরেটরি সিস্টেম ফেল করবে। যার জন্য নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না কেউ। এবং ভোকাল কর্ড পুড়ে যাওয়ায় ওঁরা যন্ত্রণায় চিৎকার করলেও সে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। যেমন বোবার চিৎকার কেউ শোনে না। তেমন এই হতভাগ্যদের মরণ-আর্তনাদ কেউ শুনতে পায়নি! প্রথম প্রথম জোরালো কাশির শব্দ শোনা গেলেও যেতে পারে। কিন্তু এই শীতে লোকে হাঁচবে বা কাশবে, সেটা এতটাই স্বাভাবিক যে শুনলেও কেউ পাত্তা দেয়নি।”

শুনতে শুনতে অর্ণবের গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছিল। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! লোকগুলোকে জ্বালানো হল মৃত্যুর পরে। অথচ আগুন লাগার আগেই তারা পুড়ে মারা গিয়েছিলেন! এ কীভাবে সম্ভব! যখন আগুন জ্বলল, তখন তারা জীবিত ছিলেন না। আবার যখন তাদের দেহের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল, তখন আগুন তাদের ধারে কাছেও ছিল না! এ কী আশ্চর্য হেঁয়ালি!

“তার মানে ওরা অ্যাসিড খেয়েছিলেন?” অধিরাজ বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বলে, “রাইট?”

“রং।” তিনি মাথা নাড়ছেন, “অ্যাসিড খেলে মুখ, জিভ থেকে শুরু করে গ্রাসনালী, পাকস্থলী, ইনটেস্টাইন, সব জ্বলে পুড়ে একসা হয়ে যেত। ওরা কোনোরকম অ্যাসিড পান করেননি। পুড়েছে শুধু ল্যারিংস টু লাংস। অ্যাসিডটা মুখ দিয়ে গেলে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া কোথাও কিছু নেই, আচমকা অ্যাসিড খাওয়ার দুর্বুদ্ধি কারোর হবেই-বা কেন? অ্যাসিড কি কোকাকোলা যে ঢকঢকিয়ে খেয়ে নেবে! আর খাবেই-বা কেন শুনি? তুমি বলতে চাও, হঠাৎ শীতের রাতে ওদের মনে হল, শরীরটা ভয়াবহ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, গরম কিছু খাওয়া দরকার! আর অ্যাসিডের চেয়ে গরম আর কী হতে পারে? তাই সবাই বোতল থেকে একগ্লাস করে অ্যাসিড ঢেলে চিয়ার্স করে খেয়ে ফেললেন! শরীর গরম করার অব্যর্থ ওষুধ।”

“ডক্, আপনার ভুল হচ্ছে না তো?” তার হতবিহ্বল মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ক্রমশই এই অদ্ভুত মৃত্যুর ধাঁধার জটে জড়িয়ে পড়ছে, “এমনও তো হতে পারে যে মরার পর হয়তো জ্বলন্ত টায়ারের আগুনই ওদের ফুসফুস আর শ্বাসনালী অবধি পৌঁছেছে। আগুনেই হয়তো ফুসফুস পুড়ে গিয়েছে। আর আপনি গুলিয়ে ফেলছেন।” “শোনো ছোঁড়া।” ভদ্রলোক এবার চটে গিয়েছেন, “যখন তুমি হামাগুড়ি দিচ্ছিলে, আর মায়ের কোলে শুয়ে আঁও আঁও করে কান্নাকাটি জুড়েছিলে, তখন থেকেই আমি মড়া কাটছি! তাই গুলিয়ে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না। টায়ারের আগুন গোটা স্কিনের লেয়ার পুড়িয়ে, মাংস-পেশী অবধি পৌঁছেছে ঠিকই। কিন্তু

ফুসফুস বা হার্টের মতো ইন্টারন্যাল অর্গান অবধি পৌঁছতেই পারেনি। তার আগেই সৌভাগ্যবশত তোমরা আগুনটা নিভিয়ে দিয়েছ। নয়তো অন্যান্য মার্ডারগুলোর মতো এখানেও বডি বলে কিছু থাকত না। আমাকেও কয়েকটা হাড়গোড় আর ছাই দেখে বলতে হত, 'আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে।' বিশ্বাস না হলে গীতা এনে দাও। হাতে রেখে বলতে পারি এরা কখনোই আগুনে পুড়ে মরেনি। মরার পর আগুন ধরানো হয়েছে। অ্যাসিডও ওরা পান করেননি!"

"তবে!" অধিরাজের স্বাভাবিক স্থৈর্যেও যেন এবার একটু চিড় ধরেছে। সে এবার অধীর কণ্ঠে বলে, "আগুনে পুড়ে মরেননি, অ্যাসিডও খাননি, অথচ পুড়েই মরেছেন! এ কী জাতীয় প্যারাডক্স! তবে আগুন, অ্যাসিড বা কোনোরকম দাহ্যবস্তু ছাড়া মরলেন কী করে? জলে ডুবে! না ফ্রস্টবাইটিং এ?"

"আরে!" ডঃ চ্যাটার্জি রেগে গেলেন, "তখন থেকে বলছি যে পুড়ে মরেছে, আর তুমি মানুষগুলোকে জলে ডোবাচ্ছ! আবার বরফও আমদানি করেছ! এটা কলকাতার শীত, নর্থপোল নয় যে বরফ পড়ে ফ্রস্ট বাইট হবে। ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"ইয়ার্কি তো আপনি করছেন ডক্।" এবার তার সম্পূর্ণ ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, "নিজেই বলছেন, ওরা মৃত্যুর পরে আগুনে পুড়েছেন। ওদিকে এ-ও বলছেন, পোড়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে। লোকে হয় আগুনে পোড়ে, কখনও কখনও বরফেও পোড়ে। ওদিকে আপনি বলছেন পুড়েছে, কিন্তু আগুনে বা বরফে পোড়েনি! আসলে হয়েছে-টা কী?"

ডঃ চ্যাটার্জি তেড়েফুঁড়ে কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন তার আগেই আহেলি বলে উঠল, "স্যার ঠিকই বলছেন অফিসার ব্যানার্জি। লাশগুলোর গায়ে যে আগুনের বার্ন দেখতে পাচ্ছেন, সেটা পোস্টমর্টেম বার্ন। আবার লাশের ল্যারিংস থেকে শুরু করে লাংস অবধি যে বার্ন দেখা যাচ্ছে, সেটাই মৃত্যুর আসল কারণ। পুরোটাই পুড়ে গিয়ে রেস্পিরেটরি সিস্টেম ফেইল করেছে। লাংসের মধ্যে প্রচুর ফ্লুইড জমার ফলে চোকিং ও হয়েছিল। ওরা কেউ শ্বাস নিতে না পেরে, ভেতরে ভেতরে পুড়ে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মরেছেন। মারাত্মক গ্রুসাম মৃত্যু। শুধু তাই নয়, লাশের আশপাশ থেকে আপনারা যে ব্লাডের স্যাম্পল্ নিয়ে এসেছিলেন না?"

"হ্যাঁ?" এতক্ষণে অধিরাজ ও অর্ণবের মনে পড়ল যে ক্রাইমসিনে যথেষ্ট পরিমাণে ব্লাডও ছিল। লাশগুলোর নাক মুখ দিয়ে তখনও রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। অধিরাজ এবার একটু শান্ত হয়ে বলল, "ব্লাডে কিছু পাওয়া গিয়েছে?"

"হ্যাঁ।" আহেলি সপ্রতিভভাবে জানায়, "ওটা আসলে ব্লাড ভমিটিং। যে-কোনো কারণেই হোক ভিকটিমরা মারা যাওয়ার আগে রক্তবমি করছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার আমি ওর ভেতরে লাংসের কিছু সফট টিস্যু পেয়েছি। অর্থাৎ লাংস পুড়ে যাওয়ার ফলে সফট টিস্যুগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে বমির সঙ্গে উঠে আসছিল। যেহেতু ব্লাডের সঙ্গে উঠে এসেছে, এবং ব্লাডটা ভমিট, সুতরাং এটাও সঠিক যে যখন ভেতর থেকে ওদের ফুসফুসগুলো পুড়ছিল তখনও ওরা বেঁচেছিলেন। আর এটাই ওদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ। কিন্তু এটাও হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্যি তাতে আগুনের কোনো ভূমিকা নেই।"

"ব্লাড ভমিটিং?" অধিরাজ যেন ক্রমশই চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে। অসহায়ের মতো ভেসে ওঠার একটা শেষ চেষ্টা করল, "তাহলে ওরা কি কোনো বিষাক্ত ধোঁয়া ইনহেল করেছিলেন? অথবা কোনো রেডিয়েশন বার্ন, বা রেডিও অ্যাকটিভ গ্যাস? বা বিষ?"

এবার ডঃ চ্যাটার্জি জানালেন, "নট অ্যাট অল্। কোনো রেডিয়ো-অ্যাকটিভিটির গল্প এখানে নেই। থাকলে আমায় ল্যাবে লাশের কাছে এভাবে ঘুরঘুর করতে দেখতে পেতে না। স্রেফ পালিয়ে যেতাম। আপনি বাঁচলে তবে লাশ কাটার নাম। আর রইল বিষের কথা?" তিনি সোজা আইভিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওই মিস ব্রকোলিকে জিজ্ঞাসা করো! আমরা 'সর্বনাশিনী' কেসে হাবুডুবু খেয়েছিলাম বলে সরকার বাহাদুর ওঁকে আমাদের ঘাড়ে এনে বসিয়ে দিয়েছেন। ফরেনসিক টক্সিকোলজিস্ট কিনা! বিষ বিশারদ পয়জন আইভি! বডি ফ্লুইড

আর টিস্যু স্যাম্পল নিয়ে এক যুগ ধরে নাড়াচাড়া করে চলেছেন। এখনও পর্যন্ত কোনো রেজাল্ট পাননি আমাদের পয়জন এক্সপার্ট! পাবেন বলে মনেও হচ্ছে না, কারণ ওঁর ব্রেনের জায়গায় আস্ত একটা ব্রকোলিই বসে আছে!"

অর্ণবের চোখের সামনে একটা ব্রেনের জায়গায় ব্রকোলির ছবি ভেসে উঠল। সত্যি! দুটোকে অনেকটা একইরকম দেখতে। অধিরাজ এবার অসহায়ের মতো আইভির দিকে তাকিয়েছে। তার চোখে এখন হতাশা। আইভি ভেতরে ভেতরে ভীষণ নার্ভাস বোধ করছিল। এমনিতেই ঘেঁটে আছে। তার ওপর এই মানুষটাকে দেখলেই সব কিছু গুলিয়ে ফেলে। এমন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে যার উষ্ণতায় আইভির-ই ল্যারিংস থেকে লাংস অবধি ভেতরে ভেতরে পুড়ে যাওয়ার জোগাড়। এভাবে তাকাতে হয়? অন্য কোথাও সিরিয়াল কিলার খোঁজার দরকার কী! অফিসার ব্যানার্জির মতো সাইলেন্ট কিলার খুব কমই আছে। এভাবে ভেতরে ভেতরে পুড়িয়ে দিতে তো তিনি ওস্তাদ! সেটা ওঁকে বলে কে? তার কপালে এই শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে!

অর্ণব তার অনুরাগ সিক্ত চাউনি আর গালের লাল আভা দেখে মনে মনে হাসল। এই মেয়েটা কিন্তু মোটেই খারাপ টক্সিকোলজিস্ট নয়। পবিত্র-র একটা কেসে ইনি রীতিমতো কামাল করেছিলেন। কিন্তু অধিরাজ সামনে এসে দাঁড়ালেই কেমন যেন ক্যাবলা হয়ে যান। তার ওপর ডঃ চ্যাটার্জির লাফালাফির সঙ্গে এখনও মানিয়ে নিতে পারেননি। সে একটু সহৃদয় স্বরেই বলে, "মিস্ ভট্টাচার্য, আপনার কিছু বলার আছে?" "ইয়েস... ইয়েস...!" আইভি যেন সংবিৎ ফিরে পায়। একটু হতাশ স্বরেই বলে, "আমি চারবার টেস্ট করেছি। চারবারই নেগেটিভ। ফ্লুইডে বা টিস্যুতে কোনো বিষের ট্রেস নেই। তবে একটা ব্যাপার...!"

বলতে বলতেই থেমে গিয়েছে সে। অধিরাজ এবার তার কথা পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। আর যখনই সে কোনোকিছু গভীর মনোসংযোগের সঙ্গে শোনে, তখন তার অজান্তেই চোখের দৃষ্টিটায় অল্প উষ্মা মিশে যায়। একটু যেন রাগ রাগ ভাব ফুটে ওঠে। আইভি সেটা দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে থতমত খেয়ে থেমে গেল। ডঃ চ্যাটার্জি ব্যাপারটা বুঝেই টাক চাপড়ালেন, "নাও, বাকি এপিসোডগুলো ওটিটিতে দেখে নিও। আইভি, হি ইজ অল ইয়ার্স! বলতে থাকো...!"

কপালদোষে 'হি ইজ অল ইয়ারস্' শব্দটা আইভি 'হি ইজ অল ইওরস্' শুনেছিল। সে একটা ভয়াবহ বিষম খেয়ে বলল, "ইওরস্ মানে!"

"আহেলি।" তিনি রেগেমেগে হুকুম করলেন, "কাল থেকে বাসকপাতা নিয়ে আসবে। এখানে এলেই সবার কাশি পায়! ইওরস্ নয় মামণি, ইয়ার্স! মানে উনি কর্ণময়। অফিসার ব্যানার্জি খুব মন দিয়ে কান খাড়া করে তোমার কথা শুনছেন। উনি আদৌ রেগে নেই। ওঁর চোখটাই ওরকম, ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট। তুমি নিশ্চিন্তে কন্টিনিউ করতে পারো।"

এরকম ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট কেন যে ভগবানের হাত দিয়ে বারবার হয় না! অর্ণব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আইভি কোনোমতে নিজেকে ফের গুছিয়ে নিল, "হ্যাঁ। একটা ব্যাপার একটু অদ্ভুত লাগছে।"

ডঃ চ্যাটার্জি বললেন, "কী?"

"ফ্লুইডে ক্লোরাইডের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। বিশেষ করে কার্বাময়েল ক্লোরাইড।" সে একটু থেমে বলল, "পয়জনিং হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মনে হচ্ছে পয়জনটা একদমই আনকমন। হয়তো এখনও বিষটা মার্কেটে আসেনি।"

অধিরাজের মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। অসীম চ্যাটার্জি একটু থেমে বললেন, "ইন দ্যাট কেস ক্রোমাটোগ্রাফি করে ভাঙো। খতিয়ে দেখি কী কী কম্পাউন্ড রয়েছে। কম্পোজিশনটা জানতে পারলে হয়তো কিছু বুঝতে পারব।"

"ওকে স্যার।"

আইভি কথা শেষ করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেখান থেকে দ্রুত পায়ে চলে গেল সে।

একপ্রকার যেন পালিয়েই বাঁচল। অর্ণব লক্ষ্য করল আহেলির মুখ এক মুহূর্তের জন্য যেন শক্ত হয়ে ওঠে। তারপরই সে চোখ সরিয়ে নিয়েছে ওদিক থেকে। এই দুটি মেয়ের মধ্যে একটা নীরব প্রতিযোগিতা আছে তা অর্ণব ও ডঃ চ্যাটার্জি, দু-জনেই লক্ষ্য করেছেন। একমাত্র যার লক্ষ্য করার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সে-ই করে না!

"ডক্।" অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডান হাতটা ডঃ চ্যাটার্জির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে, "আই রিয়েলি নিড ইওর আইসব্যাগ।"

"পথে এসো বাছা।" তিনি হাসতে হাসতে আইসব্যাগটা এগিয়ে দেন, "সব মিলিয়ে কী বুঝলে?"

"কী বুঝলাম?" সে আইসব্যাগটা নির্বিবাদে মাথায় চাপিয়েছে, "বুঝলাম যে, আতাগাছে তোতা পাখি, কত কথা বলা বাকি!"

"সে আবার কী! আধুনিক কবিতা নাকি?" ভদ্রলোক ভয়ানক ভ্রূকুটি করেছেন, "জঘন্য! আমি এক বর্ণও বুঝতে পারি না যে কী বলতে চায়! অর্থহীন!"

অধিরাজ করুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনার আজকের রিপোর্টটা ওই আধুনিক কবিতার মতোই অর্থহীন ডক্। কী যে বললেন, কিছুই মাথায় ঢুকল না! আগুন যখন লাগল ততক্ষণে ভিকটিমরা মারা গিয়েছিল। আবার ভিকটিমরা তখনই মারা গেল যখন ফুসফুস পুড়ে গেল। অথচ তখন আগুন লাগেনি। এর অর্থ কী! ওদিকে একজন বাহাত্তর ঘণ্টার ডেডলাইন দিয়ে রেখেছে। এই গোটা শহরের মধ্যে ওই একটা লোককে কী করে খুঁজে বের করব বুঝতে পারছি না। তবু ভরসা ছিল যে মৃত্যুর কারণটা অন্তত জানি। এখন দেখছি তাও জানি না! আরও দুটো পরিবারের শিয়রে সমন। তার মধ্যে আপনিও আধুনিক কবিতার মতো ফরেনসিক রিপোর্ট শোনাচ্ছেন। ইচ্ছে করছে নিজেই নিজের মুখাগ্নি করে দিই।" বলতে বলতেই সে অর্ণবের দিকে কাতর চোখে তাকায়, "অর্ণব, তুমি কি বলো?"

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। অর্ণব স্মিত হাসল। আজকাল অধিরাজের সিগারেটের প্যাকেট ও লাইটার তার হেফাজতেই থাকে। নিতান্তই প্রয়োজন না পড়লে অন ডিউটিতে চারটের বেশি সিগারেট সে অ্যালাউ করে না। অধিরাজও তার এই নিঃশব্দ কড়া শাসন সসম্মানে মেনে নিয়েছে। এই শুভচিন্তক বন্ধুটির ওপর তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

অর্ণব কোনো কথা না বলে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে লাইটারটাও। অধিরাজের একটা হাত আইসব্যাগটা ধরে রেখেছে। অন্য হাতে সিগারেটটা মুখে গুঁজে লাইটার দিয়ে জ্বেলে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "আপনি কী বুঝলেন ডক্?"

"আমি মোটেই ভালো বুঝছি না রাজা।" ডঃ চ্যাটার্জির মুখ গম্ভীর, "জানি না তুমি কী করতে চলেছ। কিন্তু এই লোকটা ডেঞ্জারাস! তুমি তার সম্পর্কে কিছু জানো না! সামনে কোনো সাসপেক্টও নেই! পি সি সরকার শূন্যে হাত ঘুরিয়ে রসোগোল্লা আমদানি করতেন। সেই ম্যাজিকটাই তোমায় করতে হবে। শূন্য থেকে অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে। অথচ মার্ডার ওয়েপন কী সেটাও তোমার জানা নেই। নেকলেসিংটা স্রেফ ফরেনসিকের চোখকে ধুলো দেওয়ার জন্য। টায়ার, আগুন-পুরোটাই শো-অফ। ওয়েপনটা কী তা আমার জানা নেই, কিন্তু সেটার মারাত্মক এফেক্ট স্বচক্ষে দেখেছি। বিলিভ মি, জ্বলন্ত টায়ার গলায় পরে পুড়ে মরাটা অসম্ভব গ্রুসাম ডেথ। তবু সে হতভাগার যন্ত্রণায় চিৎকার করার স্বাধীনতা আছে, ফাইট ব্যাক করার অপশন আছে। কিন্তু এখানে কী হয়েছে তা একবার কল্পনা করো। আমি যতদূর বুঝেছি, বলছি।" বলতে বলতে তিনি অধিরাজের সিগারেটটাই টেনে নিয়ে একটা টান মেরেছেন। শীতের মধ্যে উষ্ণ মৌতাত নিয়ে বললেন, "ভেবে দেখো, তোমার শ্বাসনালীটা পুড়ে যাচ্ছে। অথচ তুমি আগুনটা দেখতেই পাচ্ছ না। ধীরে ধীরে তোমার ফুসফুসটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার জানা নেই এই জ্বলাটা থামাবে কীভাবে! গায়ে আগুন জ্বললে গড়াগড়ি দিয়ে, মাটিতে ঘষে, নিদেনপক্ষে হাত দিয়ে চাপড় মেরে থামানো যায়। যে আগুন তোমার রক্তমাংসের ভেতরে, শরীরের অন্দরে ফুসফুসে জ্বলছে, তাকে থামাবে কী করে? তার মধ্যেই ফুসফুসে ফ্লুইড জমা হয়ে দম আটকে আসছে, মনে হচ্ছে

কেউ গলা টিপে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভলকে ভলকে তুমুল রক্তবমি! দৌড়োদৌড়ি করার ক্ষমতা দূর, নড়াচড়ার শক্তিও নেই। চামড়ায় আগুন লাগলেই লোকে চেঁচিয়ে একসা করে, তবে ফুসফুসে আগুন লাগলে কী নিদারুণ যন্ত্রণা হতে পারে তা আন্দাজ করো। তুমি গলা ফাটিয়ে মরণ-চিৎকার করছ, তোমার মুখ খুলছে, অথচ গলা দিয়ে টু শব্দটিও বের হচ্ছে না! ল্যারিংসটাই আস্ত নেই, ভোক্যাল কর্ড তো ছাড়ো। অদৃশ্য আগুনটা তোমার লাংসটাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েই চলেছে, কিচ্ছু করার নেই। এভাবেই যতক্ষণ না ফুসফুসটা পুরোপুরি পুড়ে গিয়ে রেস্পিরেটরি সিস্টেম ফেইলিওর হয়ে তোমার শ্বাস বন্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমার স্রেফ যন্ত্রণা সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এর থেকে গ্রুসাম আর কিছু ভাবতে পারো?”

অর্ণব দৃশ্যটা ভেবেই আঁৎকে উঠল। কী ভয়াবহ মার্ডার ওয়েপন। কী নিদারুণ তার যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা! এমন মৃত্যুর চেয়ে নেকলেসিং-এ মরাও বোধহয় ভালো! এতগুলো লোক সম্ভবত এভাবেই মারা গিয়েছে। প্রত্যেকবারই তাদের মরদেহকে খুনি নেকলেসিং এর ভাঁওতা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফরেনসিক ওর চালাকি ধরতে পারেনি। এবারও সে সফল হয়ে যেত যদি না মদন তাড়া খেয়ে মোক্ষম সময়ে ক্রাইম সিনে গিয়ে পৌঁছোত। আধপোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করতে পেরেছিল বলে অন্তত এইটুকু বোঝা গেল যে আসল অস্ত্র টায়ার, কেরোসিন বা আগুন-কোনোটাই নয়!

“লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই বুদ্ধিমান রাজা!” তিনি এবার চিন্তিত স্বরে বলেন, “বার্নিং শিখের মেইন ভিকটিমরা সকলেই নো ডাউট এভাবেই মরেছে। কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড আর পুলিশ অফিসারদের মৃত্যুর গল্পও শোনো। ওদের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছি আমি। দিল্লির আই.পি.এস. দেবধর চৌবের সিকিউরিটি গার্ডরা রোজ রাতে গরম চা খেত। চৌবের বাড়ি থেকেই সেই চা একটা বিশেষ টি-পটে দেওয়া হত। ঘটনার দিন ওই চায়ে চড়া মাত্রায় ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই চা খেয়ে ওরা গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিল। তারপর খুনি তরোয়াল দিয়ে প্রথমেই একে একে তাদের গলার নলিটা ফাঁক করে দিয়েছে। তারপর জ্যাক দ্য রিপারের মতো তাদের কেটে টুকরো টুকরো করেছে। এমনকি ইন্টারনাল বডি পার্টস, লিভার, ফুসফুস, প্যানক্রিয়াস, স্টমাক, কিডনি নাড়িভুঁড়ি সমেত বাইরে বের করে এনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে। কানপুরের পুলিশ কনস্টেবলদেরও ঠিক একইভাবে কেটেছিল সে। কানপুরের একজন পুলিশ অফিসারকে দুটো অ্যাসিড বাল্ব ছুড়ে মেরেছিল। অন্যজনের মৃত্যুটাও রহস্যজনক। তবে এইটুকু দেখা গিয়েছে যে সেই অফিসারের গাড়ির ব্রেক ফেল হয়ে গিয়েছিল ও গাড়িতে একটা ব্লাস্টও হয়েছিল। সেটা দুর্ঘটনাজনিত ব্লাস্ট না বম্ব প্ল্যান্ট করা হয়েছিল-তা আজও জানা যায়নি। ইনফ্যাক্ট পুলিশ অফিসারের দেহটাই পুরোটা পাওয়া যায়নি। ব্লাস্টে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। শনাক্ত করাই যায়নি! যা দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল তার ডিএনএ টেস্ট করে মৃতের পরিচয় বের করতে হয়েছে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট বেঙ্গালুরুর দু-জন পুলিশ অফিসারের গায়ে সেই ভয়াবহ জ্বলন্ত টায়ার ছিল। আমি শিওর, তাঁদেরও ভিকটিমদের মতোই মারা হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, কয়েকটা পোড়া হাড়ে একটু পোড়া মাংস ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না ওদের গায়ে। উর্দিটা নেহাৎ পুড়ে গিয়ে মাংসের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল বলে ওঁদের পুলিশ অফিসার বলে শনাক্ত করা গিয়েছিল! সম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্য ফের ডিএনএ টেস্ট।”

অধিরাজ তাঁর ভাষণ শুনে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। তারপরই কথা নেই বার্তা নেই ভদ্রলোকের হাত থেকে সিগারেটটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বলল, “থ্যাংকস ফর দ্য মোটিভেশন।”

“তোমায় মোটিভেট করছি না গর্দভচন্দ্র।” বুড়ো এবার খ্যাঁক করে উঠল, “স্রেফ সতর্ক করে দিচ্ছি। অন্তত এই কেসের ক্ষেত্রে মরে গেলেও বাইরের খাবার-জল-চা-কফি কিচ্ছু খাবে না, কেউ যদি কিছু ছোঁড়ার মতো পোশ্চারে থাকে তবে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে, কারণ ছোঁড়ার জিনিসটা বলও হতে পারে, অ্যাসিড বাল্বও হতে পারে। গাড়ি সাবধানে চালাবে, হাঁই হাঁই করে র‍্যাশ ড্রাইভিং করবে না। আর পারলে সবাই সবাইকে প্রোটেক্ট করবে।

যদি কোনো মুহূর্তে কেউ কেশে ওঠে সেক্ষেত্রেও অ্যালার্ট থাকবে। এখানে খুনির পার্সোনাল ফেভারিট কেউ নেই। সে তোমাদের মধ্যে যাকে খুশি অ্যাটাক করতে পারে, তাই সবাই সতর্ক থাকলে ভালো হয়। বাকিটা ভগবান জানেন।" তিনি আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বললেন, "জানি না আরও কত লাশ দেখতে হবে! বাহাত্তর ঘণ্টাও আর নেই! আর মাত্র সাতষট্টি ঘণ্টা! বড়ো কম সময়... বড়ো কম সময়...!"

বলতে-বলতেই কেমন যেন অন্যমনস্ক পায়ে নিজের কেবিনের দিকে চলে গেলেন ডঃ চ্যাটার্জি।

* * *

(৫)

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ডায়েরি

মঙ্গলপুরীর ভোরটা সেদিন ভীষণ থমথমে ছিল। আমার তো মনে হয় সূর্যটাও সেদিন উঁকি মারতে ভয় পাচ্ছিল। ভোরের আলোটা আজও মনে পড়ে। কী অদ্ভুত বিষণ্ণ ও পিঙ্গল। যেন ওকে পীতরোগে ধরেছে। অন্যান্য দিন রোদে গলা সোনার আভার কারুকার্য থাকে। কিন্তু সেদিন আলোটাকে কেমন যেন বিবর্ণ, রক্তহীন মানুষের মতো মনে হচ্ছিল। এমন ভোর আমি আগে আর কখনও দেখিনি। সচরাচর ভোর হলে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। অথচ সেদিন যেন ভোরটাই অন্ধকারের ছায়া নিয়ে এসে উপস্থিত।

রোজ ভোরে আমার ঘুম ভাঙত নানারকম 'শোর-শরাবায়।' আমার 'বাপু' দিল্লিতে অটো-রিকশা চালাতেন। সংসার খুব স্বচ্ছল ছিল না। তাই আমরা সবাই শ্রমিকদের কলোনিতে থাকতাম। বেশ বড়ো পরিবার ছিল আমার। সবার মধ্যে আমিই ছোটো। দুই দাদা আর এক দিদি ছিল মাথার ওপরে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই তারা মহা শোরগোল লাগিয়ে দিত। সরবজিত আর আমনপ্রীত প্রাজির মধ্যে প্রায় মারপিটই লেগে থাকত কে আগে স্নানে যাবে, তাই নিয়ে! দিদি যসমিত কৌর আর 'বেবে তাদের সামাল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যেত। বাপুজি অবশ্য এসবের মধ্যে থাকতেনই না। তিনি ভীষণ শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন। হাঁকডাক করে কথা বলতেন, জোরে জোরে হাসতেন, কিন্তু কখনও তাকে উচ্চস্বরে ছেলে-মেয়েদের বকা দিতে শুনিনি। বরং তিনি ভালো করে বোঝাতেন, "পুত্তর, নিজের ভীরার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই৷ আমি কি তোদের 'তাওজি'র সঙ্গে ঝগড়া করি? বড়ো ভাই পিতার সমান হয়। তাকে সম্মান দিতে হয়।"

আমনপ্রীত সরবজিতকে মরে গেলেও বোধহয় সম্মান দেবে না। সরবজিতও ছেড়ে দেওয়ার লোক নয়। সে-ও সম্মান আদায় করেই ছাড়বে। ফলস্বরূপ দু-জনের মধ্যেই কুস্তি লেগে থাকত! যতক্ষণ না পাশের বাড়ি থেকে গুরশরণ 'তাওজি'র ধমক এসে না পড়ছে, ততক্ষণ ওরা কেউ থামবে না। পেল্লায় দাড়ি নিয়ে বিশালবপু তাওজি তেড়ে এলে তবেই এ ঝগড়া থামবে। কখনও কখনও তো ওদের চিৎকারে তিনি খেপে গিয়ে তরোয়াল নিয়ে দুই নির্বোধ বালককে তাড়া করতেন! আমনপ্রীত ও সরবজিত তখন এমন হাপিশ হয়ে যেত যেন 'গধে কে সর সে সিং!' ওদিকে সময়মতো স্নান খাওয়া না করলে স্কুলে যেতে দেরি হবে। অগত্যা সেই তাওজিই ডাকাডাকি করে 'বাবা রে, বাছা রে' বলে ওদের ঘরে ফেরাতেন।

আমার বাবা, তাওজি দু-জনেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করতেন। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মকে তাঁরা নিজেদের কষ্টের জীবনের দায়ভার দিতে চাননি। বাবা-বেবে-তাওজি-তাইজি প্রত্যেকেই চাইতেন তাঁদের ছেলেরা পড়াশোনা করে লায়েক হোক। তাই আমার দুই প্রা'জি সকাল সকালই নাওয়া খাওয়া মিটিয়ে স্কুলে চলে যেত। আমিও স্কুলে যেতাম। তবে আর একটু পরে। আমি ছোটো ছিলাম বলে বোধহয় বাপু আমায় নিজেই অটো করে স্কুলে ছাড়তে যেতেন। একটু একটু করে আমাদের সংসার সুখের মুখ দেখছিল। বেবে আগে কাঠপাতার উনুনে রান্না করত। পরে বাপু একটা স্টোভ এনে দিয়েছিলেন। আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বেবেকে ওই স্টোভেই রান্না করতে দেখেছি।

রোজ ভোরে স্টোভের কেরোসিন তেল পোড়া ধোঁয়ার ঝাপটা আমার নাকে এসে লাগত৷ জানি না আর কারোর এমন অনুভব হয়েছে কিনা। কিন্তু স্টোভের কেরোসিন তেল পোড়ার গন্ধটা ভীষণ মিষ্টি লাগত। ওই গন্ধটায় কেমন যেন নেশা হত। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই বুক ভরে কেরোসিনের গন্ধটা ফুসফুসে ভরতাম। সঙ্গে শোনা যেত বেবের হাতের কাচের চুড়ির টুংটাং শব্দ! তার সঙ্গে ভেসে আসত আকাশবাণীর সিগনেচার টিউন। বেবে রুটি বানাতে বানাতে রেডিও শুনত। গরীবের ঘরে ওইটুকু বিলাসিতাই ছিল। বেবের সঙ্গে যসমিত

দিদি 'চুলা-চৌকা'য় সাহায্য করত। তবে বেবে কিছুদিন ধরে তাকে চুলায় বসতে দিচ্ছিল না। কারণটা অবশ্য সর্বজনোবিদিত। যসমিতের সঙ্গে দু-তিনটে বাড়ি পরের প্রতিবেশী নভজ্যোতের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। নভজ্যোতের চেহারাটা আজও মনে পড়ে। মেইন রোডের ওপর ওদের ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান ছিল। নভজ্যোত আমাদের তুলনায় বড়ো ঘরের ছেলে। দিদি অসম্ভব সুন্দরী ছিল। নভজ্যোত তাতেই ক্লিন বোল্ড! ওর ছোটোখাটো পাতলা চেহারাটা দেখলে বেশ হাসি পেত। সেজন্যই হয়তো গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য সবসময়ই নভজ্যোত 'জিজাজি' খুদে শালাদের সামনে হাঁড়িমুখ করে বসে থাকত। আর শালাদের মুখোমুখি হলেই তার একটাই প্রশ্ন, "পড়াশোনা কেমন চলছে? অঙ্ক পারিস তোরা?"

অঙ্কের নাম শুনলেই তিন বাচ্চা-শিখের গায়ে জ্বর আসত। কে জানে, এরপর হয়তো অঙ্কের পড়াই ধরবে! বলাই বাহুল্য কিছুক্ষণের মধ্যেই এই গম্ভীর ও শিক্ষিত জামাইবাবুটিকে ছেড়ে তারা কেটে পড়ত। সরে আসতে পেরে শালার দলও হাঁফ ছেড়ে বাঁচত আর জামাইবাবু তাদের সরাতে পেরে। নয়তো হবু পত্নীর সঙ্গে সুখসম্ভাষণটা কিছুতেই হচ্ছিল না। শালারা পালিয়ে গেলে পরমসুন্দরী যসমিত কৌরের সঙ্গে কুজনে গুঞ্জনে মেতে উঠত নভজ্যোত। আমি তখন একবার উঁকি মেরে দেখেছি। তখন জিজুকে একেবারেই গোমড়ামুখো মনে হত না! আমি দৌড়ে গিয়ে দুই প্রা'জিকে এই দারুণ উত্তেজক সমাচারটা শুনিয়েছিলাম, "ওরে, জিজুব্যাটা হাসতে জানে!"

আমার কাছে ওই ছোট্ট বস্তিটাই স্বর্গের সমস্ত সুখ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। শৈশবের মতো স্বপ্নময় সময় গোটা জীবনে আর পাওয়া যায় না। সুখ দুঃখ সবটাই যেন রূপকথার মতো ঠেকে। গোটা কলোনির পাঞ্জাবি বউ, মেয়েরা দুবেলা কল থেকে স্টিলের কলসীতে জল তুলে আনতে যেত। তাদের সমবেত খিলখিল হাসিতে, কাচের চুড়ির টুংটাং শব্দে, পাজেব বা নূপুরের ঝঙ্কারে আলাদা আলাদা সুর একসঙ্গে মিলেমিশে তৈরি করত এক আনন্দময় মিঠে সুরেলা বন্দিশ। বাপু স্নান করতে করতে যখন গাইতেন, "ইক ওঙ্কার সতনাম কর্তা পুর..., নির্ভাউ নির্ভের অকাল মুরত...' তখন আমাদের দেওয়ালে টাঙানো 'ওয়াহেগুরু'র ছবিটাও বুঝি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকিয়ে এক অপার্থিব হাসি হাসত। বাপুর সঙ্গে গুরুদ্বারায় গেলে আমার বুকটা পরম শান্তিতে ভরে যেত! দুপুরবেলা মাঝেমধ্যেই এসে হাজির হত চুড়িওয়ালা, মিঠাইওয়ালা। কুলপিওয়ালা এলে তো কথাই নেই! গোলগাপ্পা বিক্রেতার চারদিকে মেয়েদের ভিড় দেখে কলোনির ছেলেদের বুকে আগুন জ্বলত। সরবজিত তো ঠিকই করে নিয়েছিল বড়ো হয়ে সে হয় গোলগাপ্পা বেচবে, নয়তো কাচের চুড়ি। চুড়িওয়ালা কেমন সুন্দর মেয়েদের ফর্সা ফর্সা সুগোল নরম হাত টিপে টিপে একটা একটা করে চুড়ি পরিয়ে দেয়। এমন সৌভাগ্য আর ক-জনের হয়! আর আমনপ্রীতের আবার অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির ওপরে খুব লোভ ছিল। তার প্ল্যান ছিল সরবজিত প্রা এর 'শাদিতে' সে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি চালিয়ে 'বারাতি'-দের নিয়ে যাবে! তাওজি তার পরিকল্পনা শুনে চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, "সর্বনাশ! তাহলে কনে বাড়ির সবাই হার্টফেল করবে! ভাববে যে বারাতিরা সবাই মরে গেছে!"

এখনও মনে পড়ে সেদিনগুলো। বেবের হাতের সামান্য ঘি মাখানো রুটি আর ডালেও অমৃতের স্বাদ পেতাম। তাওজি সুযোগ পেলেই আমায় ডেকে পাকা চুল আর পাকা দাড়ি বেছে দিতে বলতেন। আমি তাঁর একটা একটা করে পাকা চুল বা দাড়ি তুলে দিতাম, পরিবর্তে তিনি আমায় একটা একটা করে বাদাম দিতেন। সে বাদামের স্বাদ অতুলনীয়! সন্ধেবেলায় ঘিয়ের প্রদীপ আর ধূপের গন্ধে ম ম করত গোটা এলাকা। রাতের খাওয়ার পর বাপুর কোলে শুয়ে কতরকম গল্প শুনতাম। বাপু শোনাতেন গুরু গোবিন্দ সিং-এর কঁহানি। সেই বিখ্যাত চমকৌরের দ্বিতীয় যুদ্ধের গল্প, যেখানে গুরু গোবিন্দ সিং-এর নেতৃত্বে চল্লিশজন শিখ প্রায় দশ লাখ মোঘল সেনার 'দাঁত খট্টে কর দিয়ে!' ওয়াজির খান আর ঔরঙ্গজেবের দশ লাখি সেনার সামনে বুক চিতিয়ে লড়ে গিয়েছিল মাত্র চল্লিশজন শিখ। তারা শহীদ হয়ে গেলেও মোগলদের হাত থেকে ফস্কে গিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং। তাঁর কণ্ঠে গমগমিয়ে উঠত সেই রক্ত গরম করে দেওয়া গুরু গোবিন্দ সিং এর বলা শব্দগুলো, "চিড়িয়াঁ তে ম্যায় বাজ

তুড়াওয়া, গিদরী তো ম্যায় শের বনাওয়া, সওয়া লাখ সে এক লড়াওয়া, তাঁবে গোবিন্দ সিং নাম কহাওয়া।” তাঁর অনুগত শিখ যোদ্ধারাও ঠিক তাই করে দেখিয়েছিল।

বলতে বলতেই আমার শান্ত বাপুর চোখদুটো যেন দপ্ করে জ্বলে উঠত। আরও একটা প্রিয় গল্প ছিল তাঁর। সেটা বলতে বলতে তিনি কখনওই ক্লান্ত হতেন না, শুনতে শুনতে আমিও না। সেই সারাগড়ি ফোর্টের একুশ জন শিখের মরণপণ শেষ যুদ্ধের গল্প! দশ হাজার পাঠানের বিরুদ্ধে হাবিলদার ঈশর সিং-এর নেতৃত্বে একুশ জন শিখ একদম ‘চট্টান’ এর মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরাকজাই আর আফ্রিদি আফগানরা একদিনেই সারাগড়ি, লকহার্ট আর গুলিস্তান দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। আর সারাগড়ির ‘ছত্তিস শিখ ব্যাটেলিয়নের' একুশজন সিংহ পণ করল যে সন্ধে নামা অবধি পাঠানদের ওখান থেকে এগোতেই দেবে না! একে একে কুড়ি জন মারা যাওয়ার পর যখন সিপাই গুর্মুখ সিং একাই কেল্লার অটল প্রাচীর হয়ে লড়ে যাচ্ছিল তখন গুলিস্তান আর লকহার্টের সেনারাও শুনেছিল তার গর্জন, ‘বো-লে সো নি-হা-ল! স-ত্ শ্রী অ-কা-ল!' কেল্লা পুড়ে গেল, পুড়ে গেল গুর্মুখ সিংও, কিন্তু সন্ধের অন্ধকার নামার আগে একচুলও নড়তে দিল না গুল বাদশার দলবলকে!

যখন এসব গল্প আমি বাবার মুখে শুনেছিলাম তখন সাধারণ মানুষেরা এসব জানতই না। পরে ফিল্ম হওয়ার পর লোকে শিখ প্রজাতির বীরত্ব ফিল্মের পর্দায় দেখে কেঁদে ভাসিয়েছিল। কিন্তু তার বহু বছর আগেই বাবা কেঁদেছিলেন! যখন গল্পে গুর্মুখ সিং-এর মৃত্যু হল, তখন বাপুকে দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি তাঁরই সন্তান মারা গিয়েছে। আর আমার স্বপ্নে আমার অটোরিক্সাচালক বাপু হয়ে যেতেন সারাগড়ির গুর্মুখ সিং! উদ্ধত তরবারি তুলে সিংহের মতো গর্জন করে বলে উঠতেন, ‘বো-লে সো নি-হা-ল!' আমার শান্তিপ্রিয় বাপুই আবার শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিং-এর বেশ ধরে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে চিৎকার করে উঠতেন, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ!” কখনো-কখনো সেই বাপুই জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতে সর্দার উধম সিং-এর বেশে সর্বসমক্ষে মাইকেল ও' ডায়ারকে গুলি মারতেন। বাপু বলতেন, “পুত্তর। জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি আমাদের রক্তে। যুগে যুগে শিখ প্রমাণ করে এসেছে তারা ‘কায়র’ নয়! শিখ অকারণে কাউকে আক্রমণ করে না, কাউকে দাস বানায় না। কিন্তু শিখকে যারা ঘাঁটাতে এসেছে, তারা ‘জিন্দা’ ফেরত যায়নি কখনও। তুই সেই শিখ! একটা ‘জিদ্দি’ শিখ!”

বাপুর বলা প্রত্যেকটা শব্দ আমার রক্তে মিশে গিয়েছিল। সব কিছু যে খুব বুঝতাম তা বলতে পারি না। কিন্তু অজান্তেই একটা প্রভাব পড়েছিল। আমি জানতাম শিখ বীরের জাতি। ইংল্যাণ্ডের রানিও তাঁদের সম্মানে উঠে দাঁড়ান। আমাদের কলোনিতে এক জওয়ানের পরিবার থাকত। সরতাজ সিং। সে ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিল। আমার জীবনে বাপুর পরে সে দ্বিতীয় নায়ক। ওর উদ্ধত লম্বা চেহারা, চওড়া কাঁধ, কাজল কালো চোখ দেখে মনে হত আমি কেন এমন হলাম না। ১৯৭১-এর ইন্দো-পাক যুদ্ধে সে লড়েছিল। বেশ কয়েকটা বুলেট খেয়েও ময়দান ছাড়েনি! যখন সে কলতলায় সরষের তেল গায়ে মেখে স্নান করত তখন ওর গায়ের তেল আদৃত বুলেটের দাগগুলোয় রোদ পিছলে পড়ে চকচক করে উঠত। মনে হত, হীরের থেকেও দামি অলঙ্কার বুঝি ও-ই পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

এমনভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। হয়তো আগামী দিনগুলোও সোনালি রোদে, রূপোলি স্বপ্নে কেটে যেত। নভজ্যোত আর যসমিত দিদির বিয়ের দিন একটু একটু করে এগিয়ে আসছিল। ওদের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেলেও ‘লাড্ডু’ তো আমাদের মনের মধ্যে ফুটছে। বিয়েটা কী জিনিস তখন অত বুঝতাম না। শুধু এইটুকু জানতাম যে যসমিত দিদির বিয়ে হলে আমরা নতুন পোষাক পাব আর খুব ভালোমন্দ খেতে পাব। আমনপ্রীত ভাবছিল অ্যাম্বুলেন্সে বারাত নিয়ে আসার আইডিয়াটা জিজুকে দেবে কিনা! কিন্তু জিজুর সামনে যেতেই সে বলে বসল, “কী রে ক্কাকে! এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছিস? পরীক্ষা কবে তোর?” বেচারি আমনপ্রীত তখন পালাতে পারলে বাঁচে। ঠিক তখনই সেই কালান্তক দিনটা

এল! ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪!

সকাল থেকেই চতুর্দিক থমথমে। যসমিত দিদির হাতে আগের রাতেই মেহেন্দি রং জমিয়েছে। অসম্ভব গাঢ় রং হয়েছিল মেহেন্দির! ও শখ করে একদিন আগেই মেহেন্দি পরেছে। ওর বক্তব্য অনুযায়ী বিয়ের আগের রাতে মেহেন্দি করলে নাকি 'রসম'টার মজাই পাওয়া যায় না! হাত-পা নাড়ার উপক্রম থাকে না। স্ট্যাচু হয়ে থাকতে থাকতে হাত পা ব্যথা হয়ে যায়। আর গায়ে ব্যথা নিয়ে কনের বিয়ে করতে মোটেই ভালো লাগার কথা নয়। তাই একদিন আগেই কাজ সেরে ফেলেছে। হিসেবমতো আজ বাড়িতে প্রচুর শোরগোল আর অতিথিদের ভিড় থাকার কথা। তার সঙ্গে ছাঁচ, লাড্ডু, নমকিন আরও রকমারি খাবার দাবারের স্তূপও সাজানো থাকা উচিত।

কিন্তু এর একটাও হল না! সেদিন ভোরটাই যেন কেমন একটা অদ্ভুতভাবে এসেছিল! হয়তো প্রকৃতি দুর্ঘটনার আগাম সঙ্কেত দেয়। সেদিনও দিয়েছিল। আমরা কেউ তখনও কিছুই বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারেনি গোটা দিল্লিও। শুধু জানত দু-জন তারা ওঁৎ পেতে বসেছিল সঠিক সময়ের জন্য। তখন তাদের নাম জানতাম না। বহুবছর পরে যখন ঘটনাটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি তখনই জেনেছি সেই দুটো ভয়াবহ নাম! বেয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং। তাদের ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্রের কারণ অনেক পরে বিস্তারিত পড়ার সুযোগ হয়েছে! যাঁকে ঘিরে এই ষড়যন্ত্র এবং যিনি অজান্তেই আমার সারাজীবনের দুরারোগ্য ক্ষতটি উপহার দেবেন, তাঁকেও তখন ঠিকমতো চিনতাম না। ভারতের তৎকালীন ঈশ্বরী এবং সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার আর এক নাম— ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর নাম বাপুর মুখেই কথায় কথায় একবার শুনেছিলাম। বাপু তাওজির সঙ্গে বসে রাজনৈতিক আলোচনা করছিলেন। তখনই জানতে পারি অপারেশন ব্লু স্টার আর ভিন্দ্রানয়ালের কথা। তখন কথাগুলো শুধু শব্দ হয়েই কানে বেজেছিল। অর্থ বুঝেছিলাম প্রায় কুড়ি বছর পরে। বাবা বলছিলেন, অকাল তখতের ক্ষতি হওয়াটা শিখদের সেন্টিমেন্টে খুব বড়ো আঘাত। ইন্দিরাজি স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে আর্মি না-ঢোকালেই পারতেন। তাওজি ইন্দিরাজির এই হঠকারীতা সমর্থন করেননি। তাঁর ক্ষোভ ছিল, অপারেশনটার কথা জ্ঞানী জৈল সিংকেও পর্যন্ত জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি প্রধানমন্ত্রী! আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটার কি সুরাহা হত না?

ওঁরা দু-জন আলোচনা করছিলেন বটে, কিন্তু তখন আমার কাছে কে ইন্দিরা গান্ধী আর কে জর্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালে! আমি তো তখন মায়ের হাতের ঘি মাখানো পরোটা কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা সহযোগে তারিয়ে তারিয়ে খেতে ব্যস্ত। আমার ছোট্ট জীবনে মা, বাপু, দুই দাদা, দিদি, তাওজি-তাইজি, নভজ্যোত আর সরতাজ সমেত গুরু গোবিন্দ সিং, ঈশর সিং, গুর্মুর্খ, ভগৎ সিং, সর্দার উধম— সবাই একসঙ্গে ঢুকে পড়ে বড়োই শোরগোল লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কাঁচা মাথার সব রাস্তাগুলো ওঁরাই জ্যাম করে রেখেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী বা ব্লু স্টার অপারেশনের জন্য রাস্তা ছিল না! তাই সবই মাথার ওপর দিয়ে গেল।

কিন্তু ৩১ অক্টোবর হঠাৎই মঙ্গলপুরীর শিখ কলোনির মধ্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল! সেদিন কলোনি জুড়ে কোনো সাড়াশব্দই নেই। কলোনির বাচ্চারাও খেলতে বেরোয়নি। এক তারিখ দিদির বিয়ে। তাই ত্রিশ তারিখেই আমাদের রিশতেদাররা চলে এসেছিলেন। সকালে গানবাজনার পরিকল্পনা ছিল। আরও অনেক অনুষ্ঠান হওয়ার কথাও ছিল। আমাদের আর তাওজিদের ঘরভরতি অতিথিরা আগের দিন রাতেও খোশগল্প, রঙ্গ-রসিকতায় মেতে উঠেছিলেন। মেয়েরা দিদির হাতের মেহেন্দি দেখে বলাবলি করছিল, "যস্যির হাতে রং বসেছে দেখো! কী লাল। কী রে যস্যি। নিজের বুকের খুনও মিশিয়েছিস নাকি মেহেন্দিতে?" দিদি শুধু হাসছিল। আর ওর টুকটুকে গাল এত লাল হয়ে যাচ্ছিল যেন এখনই ফোঁটায় ফোঁটায় 'খুন' চুঁইয়ে পড়বে।

অথচ পরদিনই সব হাওয়া। প্রত্যেক ঘরে তখন শুধু চাপা স্বরের ফিশফিশ। বেবে কে দেখে মনে হচ্ছিল বুঝি সাংঘাতিক কোনো 'অফশগুন' হয়ে গিয়েছে। বড়োদের মুখ গম্ভীর। কেউ হাসছে না, কথা বলছে না। এদিক ওদিক তাকিয়েও বাপুকে খুঁজে পেলাম না। বেবেকে

জিজ্ঞাসা করলাম, "বাপু কই?"

বেবে গম্ভীর মুখে সবজি কাটতে কাটতে বলল, "ভোরেই বেরিয়ে গিয়েছে। এত মানা করলাম, বললাম মেয়ের বিয়ে, কিছু শুনলই না। বলেছে, তাড়াতাড়ি ক-টা রাউণ্ড মেরে দুপুরেই ফিরে আসবে।"

আমি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছিলাম। পেটে অনেক প্রশ্নই গুড়গুড় করছে। অথচ বেবের মুখের অবস্থা দেখে সাহসও হচ্ছে না। মনে মনে সাহস জুটিয়ে কিছু বলতেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই কচি গলার চিৎকারে চমকে উঠলাম। এতক্ষণের অস্বাভাবিক পরিবেশে স্বাভাবিক চেঁচামেচি কোথা থেকে এল! দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখি কতগুলো আমারই বয়েসী পাগড়ি বাঁধা ছুটকু দৌড়োদৌড়ি জুড়ে দিয়েছে। তাদের হাতে লম্বা লম্বা লাঠি। সেগুলোকে অবিকল বন্দুকের মতো একে অপরের দিকে তাক করে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, "ঠাঁয়.... ঠাঁয়.... ঠাঁয় ...!" আর সজোরে হেসে উঠছে। যেন এটা ভারি মজার খেলা। আমি অবাক হয়ে জানতে চাই, "কী করছিস?"

"গুলি মারছি। ঠাঁয় ... ঠাঁয় ...।"

"কাকে গুলি মারছিস?"

ছোটো সর্দারজি ঠোঁট উলটে বলল, "মৈনু ক্যায়া পতা? শুনলাম ইন্দিরাজিকে কে যেন গুলি মেরেছে। আমরা সেটাই খেলছি।"

আমি মহা বিপদে পড়লাম। এই ইন্দিরাজিটি আবার কে! তিনি আমাদের খেলার মধ্যেই বা এসে পড়লেন কীভাবে! জিজ্ঞাসা করার আগেই অন্য একটি বাচ্চা বলল, "অরে, ইন্দিরাজিকে চিনিস না? ইন্দিরা গান্ধী। বাবা বলে, এই দেশের রানি! উসকো গোলি মার দিয়া-অ্যায়সে। ঠাঁয় ... ঠাঁয় ...!"

সরতাজ কোথায় যেন ছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বাচ্চাদের হাত থেকে লাঠিরূপী রাইফেল কেড়ে নিল। চাপা ধমক দিয়ে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে কী ঠাঁয় ঠাঁয় করছিস! এক্ষুনি ঘরে যা। নয়তো এই লাঠিই তোর পিঠে ভাঙব!"

সরতাজকে সকলেই সমীহ করত। ওরা আর কথা না-বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। সে-ও হাতের লাঠিগুলো ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমিই পেছন থেকে ডাকলাম, "সরতাজ প্রা, ক্যায়া হৈয়া।"

সরতাজ নিজের লম্বা দেহটাকে ঝুঁকিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফিশফিশ করে জানাল, "ইন্দিরা গান্ধীজি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার। তাকে গুলি মেরেছে দুষ্টু লোকেরা। তুই চুপচাপ ঘরে গিয়ে বোস। দুষ্টুমি করিস না।" "কে মেরেছে?"

"ওঁর নিজেরই শিখ সিপাইরা।"

আমি অপরিসীম কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তোমার মতো সিপাই?"

সরতাজের চোখ যেন দপ্ করে একবার জ্বলে উঠল। ক্ষণ মুহূর্তের জন্য হাতের গুলিগুলো শক্ত হয়ে উঠল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না। ওরা আমার মতো না। ওরা কারোর মতোই না। আমারই ভুল। ওরা সিপাই নয়। সিপাই দেশের জন্য গুলি খেতে পারে, কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীকে গুলি মারতে পারে না।"

"আচ্ছা সরতাজ প্রাজি...!" সেই দিনের আট বছরের বাচ্চাটা প্রশ্ন করেছিল, "দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি মরে যায়, তবে স্কুল কতদিন ছুটি থাকবে?"

কত বড়ো গাধা হলে মানুষ এমন প্রশ্ন করে! সরতাজ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কী ভাবছিল জানি না। এতগুলো বছর পরে আমার মনে হয়, ও মনে মনে একটা কথাই বলেছিল, 'অপোগণ্ড!' সেটাই স্বাভাবিক। কারণ ও জানত না ছুটিটা লম্বা হলে আমার বড়োই সুবিধা হয়। আজ এমনিই দিদির বিয়ের চক্করে কামাই হয়েছে। কালও স্কুলে যেতে পারব না। হোমওয়ার্কও করতে পারব না। আমাদের অঙ্কের পণ্ডিতজি একদিনের হোমওয়ার্ক না-করলেই কান টেনে লম্বা করে দিতেন। কখনও কখনও বেতের বাড়িও মারতেন। দু-দিনের হোমওয়ার্ক গায়েব হলে না জানি কী করবেন! তাই তাঁর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য

একাধিক দিনের ছুটি দরকার ছিল। যাতে হোমওয়ার্কের খাঁড়াটা মাথা থেকে নেমে যায়।

"উনি এখনও মারা যাননি ক্কাকে। হাসপাতালে ভরতি আছেন। ডাক্তারেরা ও ওয়াহেগুরু নিশ্চয়ই ওঁকে বাঁচাবেন।"

সরতাজ আমার মাথার পাগড়িটা নেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমিও বড়োই হতাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেলাম। বড়োরা যথারীতি ঘরে বসে চাপা স্বরে কীসব বলে চলেছে। সম্ভবত রাজনৈতিক আলোচনাই করছে। আমার ওসব নিয়ে কোনোদিনই মাথাব্যথা ছিল না। শুধু ডাক্তারদের ওপর অনেকখানি আর ওয়াহেগুরুর ওপর একটু চটেছিলাম। আমার এমন সাধের ছুটির ওপর জল ঢেলে দিতে চলেছেন ওঁরা! এমনিতেই টান খেয়ে খেয়ে কানদুটো লম্বা হয়ে গিয়েছে। এবার পণ্ডিতজি নির্ঘাৎ টেনে ছিঁড়েই দেবেন মনের দুঃখে সেদিন খেয়ে দেয়ে চুপচাপ বসেই রইলাম। এ কী বিড়ম্বনা। দিদির বিয়ের আনন্দও উপভোগ করতে পারছি না, সবাই মুখ ভার করে বসে আছে। অন্যদিকে পণ্ডিতজির হাত থেকে নিস্তার নেই। ওয়াহেগুরুর এ কী বিচার! অন্তত একটা দিক তো রক্ষা করুন। হয় আমায় আনন্দ করতে দিন, নয় ছুটি মঞ্জুর করুন। লোকে বলে শিশুর প্রার্থনা ঈশ্বর একটু তাড়াতাড়িই শুনে ফেলেন। দিল্লির নিস্তব্ধ রাস্তা ঠিক বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হঠাৎই অদ্ভুত এক অপ্রত্যাশিত কলরবে চমকে উঠল। যার রেশ একটু পরেই এসে পৌঁছল আমাদের কলোনিতেও। টের পেলাম কলোনির গলি দিয়ে কারা যেন দুড়দাড় শব্দে দৌড়ে যাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, "সবাই ঘরে যাও! সবাই ঘরে যাও...!"

আমি বাইরের দিকে একটু উঁকিঝুঁকি মারছিলাম। হঠাৎই চোখে পড়ল একটা ভিড় পাগলের মতো দৌড়োতে দৌড়োতে এদিকেই আসছে। তাদের মধ্যে নভজ্যোতও আছে! তার কপাল ফেটে গিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। ওর ঠিক পেছনেই আমার বাপু। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিকেই আসছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল তাঁর হাতে কড়া বা মাথায় অতবড় পাগড়িটা নেই!

বাপু কোনোমতে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে আমাদের ঘরের দরজা ভেতর থেকে সজোরে বন্ধ করে দিলেন। তাঁকে অসম্ভব ভয়ার্ত লাগছিল। কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ওরা আমার অটো জ্বালিয়ে দিয়েছে! নভজ্যোতের দোকানে ভাংচুর করেছে। ওকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছে। ওদের দোকানেও আগুন লাগিয়েছে। এক সর্দারজির স্কুটারও জ্বলছে দেখলাম। কে জানে, গুরুদ্বারাতেও আক্রমণ করবে কিনা!"

বেবে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "ওরা কারা? কী হয়েছে? তোমার পাগড়ি কোথায়?"

"আমার এক বন্ধু খুলে নিয়েছে।" তিনি তখনও হাঁফাচ্ছেন, "ইন্দিরা গান্ধী মারা গিয়েছেন! ওঁর ভক্তরা 'নারা' লাগাচ্ছে 'খুনকে বদলে খুন, সর্দার গদ্দার হ্যায়।' যে সর্দারকে হাতের সামনে পাচ্ছে তাকেই মারছে। গাড়ি, বাস জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আমার সঙ্গে লাইনে দাঁড়ায় আশরফ, ও-ই বলল, "পাগড়ি, কড়া খুলে বাড়ি যাও সর্দারজি! নয়তো তোমায় আস্ত ছাড়বে না।"

জীবনে সেই প্রথম বাপুকে ভয় পেতে দেখলাম। বেবের ফরসা মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, "তবে কী হবে?"

"জানি না।" তিনি চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন, "আমার কেমন যেন ঠিক লাগছে না। যসমিতের বিয়েটা পিছিয়ে দিতে হবে। দুলহার যদি বিয়ের আগের দিন মাথা ফেটে রক্ত পড়ে, তবে সেটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে বাড়িতে উৎসব রাখাটা ঠিক হবে না। হয়তো ইন্দিরাজির মৃত্যুর খবরে ওঁর ভক্তরা সাময়িক রেগে গিয়েছে। দু-চারটে বাস, গাড়ি জ্বালিয়ে হয়তো গায়ের জ্বালা মিটিয়ে নেবে। কিন্তু এর বেশি আর কী করবে? আস্তে আস্তে ওদের রাগও পড়ে যাবে। দেশে পুলিশ আছে, আইন-কানুন আছে। শুধু আজকের রাতটা ভালোয় ভালোয় কাটলেই বাঁচি...।"

আমি এবার নিশ্চিত হলাম যে 'রবজি' আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। ছুটি এবার পাবই।

কিন্তু তখন জানতাম না, শুধু আমার একার নয়, প্রায় প্রত্যেকেরই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমি শুধু সেদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্যই ছুটি পেয়ে যাব! আর স্কুলে যেতে হবে না আমায়! যস্যি দিদির হাতের মেহেন্দিতে বুকের রক্ত মিশবে! সেই রক্তেই লেখা থাকবে নভজ্যোতের নাম। সরবজিত চুড়িওয়ালা হতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিবর্তে তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হবে জমকালো 'নেকলেস!' আমনপ্রীতের অ্যাম্বুলেন্সের ওপর খুব লোভ। সেই অ্যাম্বুলেন্সই এরপর তাকে ও বারাতিদের নিয়ে রওনা হবে শেষ প্রস্থানে! সরতাজের সিপাই হওয়া সার্থক হবে। আর আমার সাধারণ বাপু যেসব বীরের গল্প বলতেন, সেই ঈশর সিং আর গুরু গোবিন্দ সিং-এর মতোই রণভূমিতে রুখে দাঁড়াবেন। তিনি বলেছিলেন, একটা রাত ভালোয় ভালোয় কেটে গেলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। সে রাত এল ঠিকই, তবে গেল না!

পরদিন দুপুর হতে-না হতেই দেখা গেল দিনের আলো ও রোদকে ঝাপসা করে দিয়ে কুণ্ডলীকৃত জমা অন্ধকার গ্রাস করে নিচ্ছে গোটা মঙ্গলপুরীর আকাশ! একদিক থেকে নয়, চতুর্দিক থেকে কালো ধোঁয়া এসে ঢেকে দিয়েছিল সূর্যকে। আমাদের জীবনে রাতের সেই শুরু। কালরাত্রি!

শুনতে পেলাম অজস্র কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার ও কান্না, "ওরা গুরুদ্বারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে! এলাকার সবক-টা গুরুদ্বারায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে! এখন মশাল নিয়ে এদিকেই আসছে! পালাও... পা-লা-ও!"

আট বছরের এক শিশু স্তম্ভিত হয়ে জানলা দিয়ে দেখেছিল ঈশ্বরের আসন জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে তাঁর শান্তিময় আশ্রয়! সর্বশক্তিমান অসহায়ের মতো লেলিহান আগুনে জ্বলছেন! জ্বলছে সব শান্তির বাণী। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে যাচ্ছে ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বাস, ভালোবাসা! জ্বলছে দিল্লি!

আমি কি এটাই চেয়েছিলাম!

**

(৬)

"ঘন্টু, তুই ঠিক জানিস তো? ওর কাছ থেকেই তিনদিন আগেই কুড়ি লিটার কেরোসিন বিক্রি হয়েছিল?"

ঘন্টু সজোরে মাথা ঝাঁকায়, "হ্যাঁ স্যার। উনি গ্যালন গ্যালন কেরোসিন ব্ল্যাকে চড়া দামে বিক্রি করেন। তবে আমি যেটুকু শুনেছি, তাতে কুড়ি লিটার তেল ঠিক বিক্রি করা হয়নি।"

"মানে?" অধিরাজের মুখে বিস্ময়ের ছাপ, "একটু আগেই তো বললি ব্ল্যাক মার্কেট ডিলার প্রকাশ আপ্তের কাছ থেকে তিনদিন আগে কেউ একসঙ্গে কুড়ি লিটার কেরোসিন কিনেছে।"

ঘন্টু পেন্ডুলামের মতো মুণ্ডুটাকে দু-দিকে নাড়ল, "কিনেছে বলিনি। হাওয়া হয়েছে বলেছি।"

ধন্য ঘন্টু ও তার কথার মারপ্যাঁচ! নেহাত ও সি.আই.ডি. হোমিসাইডের সর্বশ্রেষ্ঠ খবরি তাই অধিরাজ আর অর্ণব বিশেষ কিছু বলে না তাকে। প্রণবেশ লাহিড়ী হলে বিরক্ত হয়ে ওর গলাই টিপে ধরতেন। ব্যাটা সবসময়ই জিলিপির মতো প্যাঁচ মেরে কথা বলে! পিৎজা সিরিয়াল কিলিং কেসে ও সত্যিই ভালো ব্যাক-আপ দিয়েছিল। তার ওপর ডঃ চ্যাটার্জির প্রিয় পোষ্য 'দ্রিঘাংচু' নামক কাকাতুয়াটিকেও এই ঘন্টুই এনে দিয়েছিল। বহু বছর ধরে টিম অধিরাজের সঙ্গে কাজ করছে। প্রায় কুড়ি বছরের এক্সপেরিয়েন্স ওর। কলকাতায় নতুন সুপারি কিলার আসুক, কিংবা একটা নতুন ভিখারি, তার সদাসতর্ক কানে সে খবর পৌঁছবেই। তাই ঘন্টু খবরি মহলে প্রায় সুপারস্টার। মদনের টিপটা ও-ই দিয়েছিল। এখন বার্নিং শিখকে খুঁজতেও মাঠে নেমেছে।

একটু আগেই ব্যুরোয় খবরিদের নিয়ে একটা মিটিং হয়ে গিয়েছে। সেখানে ঘন্টু, যাদব, গুল্লু, ইসমাইল এবং রকি উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে ঘন্টু, যাদব ও গুল্লু সরাসরি অধিরাজ ও অর্ণবের সঙ্গে যুক্ত। ইসমাইল ও রকি প্রণবেশ লাহিড়ীর ইনফর্মার। এরাই এই মুহূর্তে ইনফর্মার ওয়ার্ল্ডের হিরো। কোড নেম,পঞ্চপান্ডব। ওদের মধ্যে মোটামুটি দায়িত্ব ভাগ করে দিচ্ছিল অধিরাজ। গুল্লু তথা গুলাব সিং জাতে শিখ। সেই জন্যই অধিরাজ তাকে নির্দেশ দিয়েছে, "কলকাতার সবক-টা গুরুদ্বারায় গিয়ে খবর নিবি যে গত এক বছরে কোনো নতুন সর্দারজি সেখানে মাথা ঠেকাতে আসছে কিনা?"

গুল্লু মাথা চুলকে বলল, "স্যার, একবছর ধরে যে আসছে তাকে নতুন কীভাবে বলা যায়! তাছাড়া বার্নিং শিখ যে গুরুদ্বারায় যাবেই এমন কোনো গ্যারান্টি আছে?"

"তুই সাচ্চা শিখ?"

বুলেটের মতো প্রশ্নটা ধেয়ে গেল গুল্লুর দিকে। সে ঢোঁক গিলে বলে, "হ্যাঁ হুজুর। আমি সাচ্চা শিখ।"

"নিয়ম করে গুরুদ্বারায় যাস?"

"একদম সাহেব।" গুলাব সিং জিভ কাটছে, "গুরুদ্বারায় যাব না তা কী হয়?

সারাদিন ধরে যত পাপ করছি, তা রবজির কাছে গিয়ে ধুয়ে না-এলে নরকে যাব যে!"
"বার্নিং শিখও সাচ্চা শিখ এবং সে সমস্ত বুঝেশুনেই খুন করছে। লক্ষ্য করে দ্যাখ, ছেলেদের পাশাপাশি সে মেয়েদেরও খুন করেছে, কিন্তু রেপ করেনি। করলে কোনো-না কোনো ফরেনসিক রিপোর্টে ঠিকই পাওয়া যেত। ১৯৮৪-এ শিখ মেয়েদের রেপও করেছিল এরা। সে বদলা নিতেই পারত। নেয়নি। তার ওপর অতগুলো লোককে মারার পর বাড়িগুলো অলমোস্ট ফাঁকাই পড়েছিল। প্রত্যেকের বাড়িতেই টাকা, গয়না, কিছু-না কিছু দামি জিনিসপত্র ছিল। কিন্তু একটা জিনিসও চুরি যায়নি। আজ পর্যন্ত কোনো ধর্মভীরু সাচ্চা শিখ চুরি করেনি, জুয়া খেলেনি কিংবা রেপ করেনি। কারণ শিখ ধর্ম এগুলোকে পাপ হিসাবেই গণ্য করে। আমাদের মক্কেল ধর্মভীরু তাই চুরি, ডাকাতি বা রেপ কোনোটাই করেনি। কিলোদরে খুন করছে ঠিকই, তবে সেটাকে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি হিসেবে

জাস্টিফাই করেছে। তবুও মনের শান্তির জন্য সে গুরুদ্বারায় যাবে না তা কি সম্ভব?”

“না। গুরুদ্বারায় সে যাবে। আপনি একজন ধর্মভীরু শিখকে ঠিকই চিনেছেন।” গুল্লু এবার একমত হল, “কিন্তু স্যার, একবছরটাও তো কমদিন নয়। ‘নতুন মুখ' হিসাবে তাকে কেউ চিনবে কী করে? তাছাড়া হুলিয়া এতই মামুলি যে ঘন্টুর সঙ্গেও মেলে, রকি, ইসমাইলের সঙ্গেও মেলে, এমনকি আমার সামনে আয়না রাখলেও ওই একই হুলিয়া দেখতে পাব।”

“ঠিক চিনবে। দোকানি আর ভিখিরিরা নিয়মিত ভিজিটরদের ঠিকুজি কুলুজি রাখে। তাছাড়া শিখদের চেহারা একটু বড়োসড়োই হয়। তার মধ্যে একটা মামুলি চেহারা দেখলে আরও বেশি মনে রাখা উচিত। একটু ঘাম ঝরা, মাথাটা খাটা, পেয়ে যাবি। নয়তো তুই আছিস কী করতে গুলাবোঁ?”

গুল্লুর মুখ ‘গুলাবোঁ’ শুনে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে, “স্যার, গুলাবোঁ নামটা মর্দানা নয়। কেমন যেন জনানি লাগে। তার থেকে আমি গুল্লুই ভালো আছি। আপনার কাজ হয়ে যাবে।”

অধিরাজ সামান্য আশ্বস্ত হয়। এর আগে ফোবিয়া মার্ডার কেসেও গুল্লু চমৎকার কাজ দেখিয়েছে। এবারও দেখাবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অধিরাজের দৃষ্টি এবার ইসমাইল আর রকির দিকে ঘুরল, “তোদের কাজটা একটু কঠিন। তাই দু-জনে মিলেই করবি। জ্যোতিপ্রকাশ ত্রিপাঠী, পি সি চৌধুরী ও এক্স আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তার সমস্ত ঠিকুজি-কুলুজি বের করতে হবে। পি সি চৌধুরী ও ভূপেন্দ্র দত্তার বাড়িতে কে কখন আসছে, কী করতে আসছে, কখন বেরোচ্ছে, কত ঘণ্টা সময় কাটাচ্ছে, সবার নাম, ধাম সমেত ডিটেইলস আমাদের আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চাই। প্রত্যেকের ওপর নজর রাখ। তারা কী করে, কী খায় ও বাড়িতে ঢোকার আগে কোথা থেকে আসে, ও বেরোনোর পর কোথায় যায়, সব খবর চাই। ওদের মধ্যে কেউ লেফটি হলে তাকে আরও বেশি নজরে রাখবি। যাকে সন্দেহজনক মনে হবে তার সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকবি। শ্যাডো করবি। ক্লিয়ার? আমাদের হাতে কিন্তু খুব কম সময়। যে-কোনো মুহূর্তে অ্যাটাক হতে পারে।”

কাজটা সত্যিই কঠিন। তবে ইসমাইল ও রকি দু-জনেই এ বিষয়ে ওস্তাদ। ওরাও অত্যন্ত অভিজ্ঞ ইনফর্মার। আগেও বহুবার এ কাজ করেছে। তাই কোনো কথা না বলে দু-জনেই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ কাজ হয়ে যাবে।

“যাদব আর ঘন্টু, তোরা কেরোসিন তেলের ব্ল্যাক মার্কেটে ঘোরাঘুরি কর।” সে বলল, “যেভাবে লোকটা কিলোদরে পুড়িয়ে মারছে তাতে ওর জ্বালানির প্রয়োজন হবে। এখনও পর্যন্ত ও পেট্রোল বা ডিজেলের ব্যবহার করেনি। কেরোসিন তেলটাই ইউজ করছে। পাতা লাগা এত কেরোসিন তেল আসছে কোথা থেকে! নিশ্চয়ই এটা ও র‍্যাশন দোকানে লাইন লাগিয়ে একটু একটু করে আইনিভাবে তুলে জমায়নি। অত্যন্ত চালাক লোক। কোনোরকম কাগজপত্র বা সাক্ষ্য-সাক্ষী রাখবে না। পেট্রল পাম্পেও যাবে না। তাই নির্ঘাৎ বে-আইনিভাবেই পুরো কোটা একসঙ্গে তুলেছে। কোথা থেকে, কার কাছ থেকে তুলেছে সেটাই জানার।”

ঘন্টু এতক্ষণ একমনে কী যেন ভাবছিল। এবার মুখ তুলে বলল, “কেরোসিনের ব্ল্যাক মার্কেটে তিনদিন আগে একটা খবর খুব উড়ছিল স্যার। আপনাদের কানে আসেনি?”

“আসেনি। তবে তুই চাইলে এবার আসবে।” অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসল। এই খবরিটি তার অত্যন্ত পরিচিত। আগেই মনে হয়েছিল কিছু-না কিছু খবর অলরেডি ওর কাছে নিশ্চয়ই থাকবে। সে বলল, “এমনি এমনিই কানে তুলবি? না তোর ফেভারিট মাখন মারতে লাগবে!”

“হেঁ হেঁ হেঁ।” ঘন্টু বিনয়ে বৈষ্ণব হয়ে হাত কচলাচ্ছে, “সঙ্গে একটা কোল্ডড্রিঙ্কস।”

“বেশ। অর্ণব।” অধিরাজ সহাস্য দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায়। সে প্রায় পোষা বিড়ালের মতো অধিরাজের গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়েছিল। এবার ইশারা বুঝতে পেরে আস্ত ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটাই ঘন্টুর দিকে এগিয়ে দেয়, “মাখন নে। কোল্ডড্রিঙ্কস বলে দিচ্ছি। বাকিদের জন্যও আসবে।”

"হাই শা!" ঘন্টু অবাক। সে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল, "বড়ো স্যার তো সিগারেটের কথা উচ্চারণও করেননি, আর আপনি তাতেই বুঝে গেলেন! আমার বউও এমনভাবে মনের কথা বোঝে না!"

"তোর বউয়ের কথা পরে শুনব।" অধিরাজ এবার ধমক দেয়, "কাজের কথাটা এবার বল্।"

"স্যার, কেরোসিনের ব্ল্যাক মার্কেটের একটা বড়ো চাঁইয়ের নাম প্রকাশ আপ্তে। লোকটা অবাঙালি। কিন্তু কেরোসিনের ডিলার হয়ে পোচুর টাকা করেছে। কানে এসেছিল, তার দোকান থেকে নাকি দিন তিনেক আগে প্রায় কুড়ি লিটার তেল হাওয়া হয়ে গিয়েছে!"

"কুড়ি লিটার! মাই গড!" বিস্ময়ে অধিরাজের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়, "বলিস কী! এতটা কেরোসিন চুরি হয়ে গেল অথচ কেউ কিছু জানল না? চোরকে কেউ দেখেনি?"

'দেখেছে স্যার। তবে তেল চুরি যায়নি। হাপিশ হয়ে গিয়েছে।"

ঘন্টুর কথার ধরণ শুনে দুই অফিসারের ভুরু কৌতূহলে কুঁচকে যায়। অধিরাজ বলল, "মানে? চুরি না হলে হাপিশ কী করে হয়ে যায়?"

'সেটা স্যার আপ্তের মুখ থেকেই শুনতে হবে আপনাকে।" ঘন্টু সিগারেটটা মুখে গুঁজে বুক পকেট চাপড়ে দেশলাই খুঁজছে দেখে অর্ণব তার দিকে অধিরাজের লাইটারটা ছুড়ে দেয়। সে লুফে নিয়ে আরাম করে সিগারেটটা জ্বালিয়ে বলল, "আমি হয়তো ঠিকঠাক বলতে পারব না। ও আমাকেও সবকথা খুলে বলেনি। স্রেফ কয়েকদিন ধরে বাড়িতে ঘাপটি মেরে বসে আছে। মার্কেটেও আসছে না। দু-বেলা ব্যাটা স্রেফ রাম নাম জপছে!"

"সেকী!" সে বিস্মিত, "তুই ওর বাড়িটা চিনিস?" "হ্যাঁ স্যার।"

সেই কথামতোই ঘন্টু ওদের নিয়ে এসেছে আপ্তের বাড়িতে। সে মিথ্যে বলেনি। প্রকাশ আপ্তের বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় লোকটা টাকার কুমীর। বাড়িটা বিশাল বানিয়েছে। যদিও বিশেষ রুচিবোধ নেই। ওর বউ এক গলা ঘোমটা দিয়ে এসে হিন্দিতে বলল, "উনি খুব অসুস্থ। ঘর থেকেই বেরোচ্ছেন না। রকেল নেহি মিলেগা।" অর্ণব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকায়। সে 'রকেল' জিনিসটা কী তা বুঝতে পারেনি। অধিরাজ চাপা স্বরে তার কানে ফিশফিশ করে বলে, "রকেল মানে কেরোসিন।"

"হাম লোগ ইয়াহাঁ মিট্টি কা তেল খরিদনে নেহি আয়ে হ্যায় ভাবিজি।" ঘন্টু দু-হাত জোড় করে সসম্ভ্রমে বলল, "এই দুই স্যার আপ্তে সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। ওঁরা সি.আই.ডি.-র লোক।"

অর্ণব এই ফাঁকে ভদ্রমহিলার মুখ দেখার চেষ্টা করছিল। বাহুতে একটা খোঁচা খেয়ে হেঁচকি তুলে থেমে গেল। পাশ থেকে অধিরাজ ফের চাপা গলায় বলল, "এভাবে মারাঠি বউদের দেখার দুষ্টুমি করতে নেই ডার্লিং। ওর ঘরওয়ালা জানতে পারলে তোমার আর আমার কপালে রিষ্টি আছে।"

যা-ই হোক। সি.আই.ডি.-র লোক শুনে ভদ্রমহিলা বোধহয় একটু আশ্বস্ত হলেন। ওঁর বোধহয় ধারণা যে সি.আই.ডি.-র লোকেরা লুচ্চা, লফঙ্গা হয় না। তাই নিজেই এবার ঘোমটা খুলে নিজের চাঁদমুখ দেখালেন। সসম্ভ্রমে বললেন, "আইয়ে।"

প্রকাশ আপ্তে নিজের ঘরেই চুপচাপ বসে ছিলেন। ঘন্টুর সঙ্গে অপরিচিত আরও দু-জনকে দেখে তাঁর চোখে কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময় ফুটে উঠল। অর্ণব লক্ষ্য করল, ভদ্রলোকের মুখটা কেমন যেন চাইনিজ মুখোশের মতো! গায়ের রং মঙ্গোলিয়দের মতোই পীতাভ ফর্সা। অন্ধকারে এইরকম ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখ আচমকা দেখলে যে কেউ 'বাপ রে' বলে লাফিয়ে উঠবে। গলার স্বরও তেমনই ভয়ানক। যে কণ্ঠস্বরটা ওঁর মুখ দিয়ে বেরোল সেটা একমাত্র ব্যাঙের ল্যারিংজাইটিস হলে তবেই বেরোতে পারে। অবাক হয়ে বললেন, "আপ লোগ?"

ঘন্টু শ্রদ্ধাবিনীত কণ্ঠে অধিরাজ-অর্ণবের পরিচয় দিল। প্রকাশ আপ্তের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল এখনই কেঁদে ফেলবেন। কোনোমতে হাঁউমাউ করে বললেন, "সি.আই.ডি. কিন্তু

স্যার, আমি তো রকেলের ব্যাবসা তিনদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছি। মরে যাব, কিন্তু ও ব্যবসা আর করব না। এমনিতেই মরে আছি। তার ওপর আমাকে জেলে পুরবেন না! তাহলে একদমই মরে যাব।"

অর্ণব ফের ফুসফুস করে, "এখনই যদি মরে থাকে তাহলে আর মরবে কী করে?" "মরা বাবা গো, যেও না মরে, কেস!" অধিরাজ নির্লিপ্ত মুখে কথাটা ছুড়ে দিয়েই ভদ্রলোককে হাওয়া দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, "আমরা আপনাকে জেলে পুরতে আসিনি আপ্তে সাব। জাস্ট ইনফর্মেশন নিতে এসেছি। শুনলাম আপনার দোকান থেকে কুড়ি লিটার কেরোসিন চুরি গিয়েছে...!"

"না... না! তিনি মাথা নাড়লেন "ঘাসলেট চুরি যায়নি সাব। হাওয়া হয়ে গিয়েছে।" ফের হাওয়া হয়ে গিয়েছে। অধিরাজ এবার অধৈর্য হয়ে উঠেছে, "হাওয়া হয়েছে মানে? চোখের সামনে থেকে ভ্যানিশ হয়েছে?"

"না!" আপ্তে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন- "ওই লোকটা নিয়ে গেছে।"

"কে?"

আপ্তে হিন্দিতে থুতিয়ে থুতিয়ে যা বললেন তার সারমর্ম কিছুটা এরকম। তিনদিন আগে তিনি নিজের বে-আইনি কেরোসিনের গুমটিতে বসেছিলেন। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। সারাদিন ধরে বহু লোক খুচরো তেল প্রায় দ্বিগুন দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গিয়েছে। যথেষ্ট লাভও হয়েছে। ওদিকে ঘরওয়ালি বারবার ফোন করছিল। তাই তিনি ঝাঁপ টাপ ফেলে বাড়ির পথ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই চাদরে মোড়া এক ব্যক্তি দুটো বড়ো নোট নিয়ে এসে হাজির। আপ্তের জবানিতে, "সাব, আমার কাছে তখন অত 'চিল্লর' ছিল না! আজকাল লোকে আবার অনলাইন পে-ও করে তাই খুচরোর ঝিকঝিক নেই। আমি বললাম, ফেরত দিতে পারব না। সে বলে কিনা, পুরোটাই রেখে দাও। কিন্তু কুড়ি লিটার কেরোসিন দাও। ভাবলাম কোনো বড়ো শেঠ-টেঠ হবে। লোকটার মুখের দিকে একঝলক তাকিয়েছিলাম। ঠিক তখনই মুখের চাদরটা আচমকা সরে গিয়েছিল! আপনি ভাবতে পারবেন না সাব, সে কী চেহারা একদম খতরনাক!... "

অধিরাজ আর অর্ণব হাড়ে হাড়েই বুঝতে পারছিল। কারণ আপ্তের ভাবলেশহীন মুখটাই ভয়ের এক্সপ্রেশনে যেরকম ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তাতে এখন ওঁকে দেখলেই লোকে ভূত ভেবে অজ্ঞান হয়ে যাবে! এইরকম মুখের মালিকও যে মুখটা দেখে ভিরমি খায়, সে নিঃসন্দেহে 'খতরনাক!'

"আমি স্ট্রেট ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।" আপ্তে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, "ও মুখ দুঃস্বপ্নেও কেউ কল্পনা করতে পারে না! ওকে আমার মানুষ বলে মনে হয়নি। তাই আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ওখান থেকে 'রফু চক্কর' হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মালগুলো ওখানেই পড়ে ছিল। একঘণ্টা আমার কোনো হোঁশই ছিল না। করিব করিব দেড়ঘণ্টা পরে পা টিপে টিপে ফের গুমটিতে যখন ফিরে গেলাম তখন ও লোকটা হাওয়া। তার সঙ্গে আমার দুটো দশ লিটার রকেলের কন্টেনারও। তবে চুরি বলতে পারি না। কারণ সে মানুষ বা ভূত যাই হোক, দুটো বড়ো নোটই ওখানে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে গিয়েছিল।"

"শরিফ ভূত বলতে হবে।" ঘন্টু নিস্পৃহ মুখে বলে, "কুড়ি লিটার বলে কুড়ি লিটারই নিয়েছে। আরও বেশি নিতে পারত। খুল্লা পয়সা নিয়েও ঝামেলা করেনি। এমন আরও গোটা চার পাঁচ কাস্টমার হলে তুমি তো লাল হয়ে যাবে আপ্তে শেঠ।"

"দেবা রে দেবা!" আপ্তে হাতজোড় করে ফেলেছেন, "অমন শরিফ কাস্টমারে আমার কাজ নেই ভাই! আমি এখন থেকে কিরানার দুকান দেব। ইমানদারির রাস্তায় রেশনের জিনিস বিক্রি করব। তাতে খেতে পাই তো ভালো, নয়তো ভিক্ষা করে খাব। তবু ও লাইনে আর যাচ্ছি না! রাম... রাম... রাম!"

আপ্তের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অধিরাজ বলল, "ভদ্রলোক আয়নায় নিজেকে দেখে ভয় পান না?"

ঘন্টু হেসে ফেলে, “ওঁর খবর জানি না। তবে ভাবিজি নাকি ফুলশয্যার দিন ফিট পড়েছিল। বোধহয় ওই মুখ দেখেই।” সে একটু থেমে বলল, “স্যার, ফুলশয্যার কথায় মনে পড়ল, আমার ছেলেটার পরের মাসে বিয়ে। আপনাকে নেমন্তন্ন করলে আসবেন?”

ঘন্টুর এত বড়ো ছেলে আছে তা অর্ণবের জানা ছিল না। অধিরাজ অবশ্য খবরটা আগেই জানত। সে বিন্দুমাত্রও অবাক না হয়ে তার হাতে কয়েকটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বলল, “মেনুর ওপর নির্ভর করছে। তবে যদি ডিনারে চাউমিন রাখিস তবে আমার কান যাবেই। আর কান টানলে মুণ্ডুও আসে। অতএব আমাকে নিয়ে যেতে হলে চাউমিন মাস্ট।”

ঘন্টুর হাসিটা আরও চওড়া হল, “অর্ণব স্যার চাউমিন খেতে ভালোবাসেন? তবে তো রাখতে হবেই।”

অধিরাজ উত্তর না দিয়ে অর্থপূর্ণ হাসল। কথাটা এড়িয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, “এটা জোর খবর দিলি ঘন্টু। তবু তুই আর যাদব কান খাড়া রাখিস। কুড়ি লিটার নিয়ে গিয়েছে মানে এই নয় যে আরও লাগবে না। কিছুটা তো ত্রিপাঠীজির বাড়িতেই ঢেলে দিয়েছে। কেরোসিনের গন্ধে ঢোকাই দায় হয়েছিল। হয়তো কম পড়তে পারে।”

“ওকে স্যার।”

ঘন্টু স্যালুট ঠুকে চলে গেল। অধিরাজ এবার অর্ণবের দিকে তাকিয়েছে, “কী বুঝলে?”

“প্রেতাত্মা হোক কী মানুষ, সাচ্চা শিখ কখনও চুরি করে না!” অর্ণব বলল, “এ লোকটা সত্যিই ধর্মভীরু শিখ। অন্য কেউ হলে আপ্তে পালিয়ে যাওয়ার পর পুরো মালই ঝেড়ে দিত, টাকা রেখে যেত না। ওর চরিত্রটা আপনি একদম ঠিক ধরেছেন স্যার।”

“এই তো! তুমি বুঝতে পেরেছ ডার্লিং!” অধিরাজ মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, “এই আনন্দে আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি?”

“নিশ্চয়ই পারেন। তবে লাঞ্চের পর।” অর্ণব একটু কড়া গলায় বলল, “কারণ এরপর আপনি লাঞ্চের পর আর একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য বায়না করবেন। একটা অলরেডি ল্যাবেই হয়ে গেছে স্যার।”

“ওকে বস্। ওকে!” অধিরাজ পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করতে করতে বলল, “আমি বার্নিং শিখকে কতটা চিনেছি জানি না, কিন্তু তুমি যে হাড়ে হাড়ে আমায় চিনেছ তাতে আমার নাভিশ্বাস উঠছে। সিগারেট আমার মাথায় থাক। ওদিকের আপডেট একবার নিয়ে নিই বরং।”

ওদিকে অবশ্য সি.আই.ডি. হোমিসাইড নীরবে অথচ দ্রুতগতিতে নিজের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করছে। পি সি চৌধুরীর বাড়িতে কিছুক্ষণ আগেই একটা নতুন রিক্রুটমেন্ট হয়েছে। ওঁর স্ত্রী'র একমাস আগে বাথরুমে পড়ে গিয়ে হিপ জয়েন্ট ভেঙেছে। অপারেশনের পর থেকেই তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। এমতাবস্থায় তাঁর বাড়িতে একজন চব্বিশ ঘণ্টার নার্সের দরকার ছিল। কিন্তু সেরকম শিক্ষিত নার্স পাওয়া যাচ্ছিল না। থাকার মধ্যে আছে এক বুড়ি রাঁধুনী কমলা ও ঠিকা কাজের লোক শিখা। তারা কোনোমতে এতদিন গিন্নীকে সামলাচ্ছিল। কিন্তু মালকিনের কিছুতেই তাদের কাজ পছন্দ হয় না। তাঁর মতে শিখা অত্যন্ত ফাঁকিবাজ। নাকের ওপর চশমা এঁটে শুধু বিবিগিরিই করতে পারে। এবং কমলা বয়েসের ভারে ন্যুব্জ। ওর চেয়ে কচ্ছপও দ্রুত গতিতে চলে। দশটার আগে সে ঢোকেই না! তাই একরকম বাধ্য হয়েই চৌধুরী সাহেব এক পরমসুন্দরী ও তরুণী নার্স আমদানি করেছেন। আজ সকাল আটটাতেই সে জয়েন করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই বুড়োর বাড়িতে সুন্দরী নার্স এলে প্রতিবেশীরা চোখ গোলগোল করে দেখবেই! তার ওপরে চলনে বলনে দারুণ স্মার্ট। অন্য দু-জন পরিচারিকার প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি কারণ তারা একটু বেলা করেই আসবে। কিন্তু কম্বাইন্ড-হ্যান্ড শিবুর খুদে খুদে চোখ নাকি এক ধাক্কায় বড়ো বড়ো হয়ে গিয়েছে।

পবিত্রর বর্ণনা শুনে হাসছিল অধিরাজ। হাসতে হাসতেই বলল, “তুমি কোথায় আছ?”

“আমি ওঁর বাড়ির ঠিক উলটোদিকের বাড়িটাতেই নতুন ভাড়া এসেছি। ব্যাচেলর মানুষ!

প্রতিবেশীর সুন্দরী নার্সকে দেখার জন্য একটু কৌতূহলী উঁকিঝুঁকি মারতেই পারি।” পবিত্র বলল, “তবে আমার বউ জানতে পারলে কেলো হবে রাজা! একটা মারও বাইরে পড়বে না। এমনিতেই সানি লিওনিকে নিয়ে তার অভিযোগের শেষ নেই। তার ওপর সুন্দরী নার্সকে ঝাড়ি মারছি জানলে ব্রুস লির ভাইঝি চুপ্ লি আমার রক্ত ভ্যাম্পায়ারের মতো চুষে নেবে।”

এবার সজোরে হেসে উঠল সে, “সুন্দরী নার্সটি কোথায়? তাঁর কোনো খবর আছে?”

“দাঁড়াও। তাঁকেও ধরছি।”

কিছুক্ষণের জন্য কলটা হোল্ডে চলে গেল। তারপরই কনফারেন্স কলে শোনা গেল কৌশানী বোসের জলতরঙ্গের মতো কণ্ঠস্বর, “হ্যালো স্যার…!”

“হ্যালো মিস্…!” অধিরাজ থমকে গিয়ে একটু বিব্রত হয়ে অর্ণবের দিকে তাকায়, “কী যেন!”

গ্রামাফোন রেকর্ড ফের আটকে গিয়েছে দেখে অর্ণব খেই ধরিয়ে দেয়, “মিস্ বোস।”

“ইয়েস …মিস্ বোস্। নতুন চাকরির জন্য অভিনন্দন।” সে বলল, “পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন বুঝছেন?”

“ঠিকঠাক স্যার।” কৌশানীর কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস, “কিন্তু বুড়ো একনম্বরের বদমাশ ঘুঘু! বেশ রসের কথাবার্তা বলতে পারেন। বলেছেন, মাঝেমাঝে যেন আমি ওঁকেও একটু বডিমাসাজ দিই।”

পবিত্র খেপে গিয়ে বলে, “বুড়োর আহ্লাদ দেখো! বার্নিং শিখকে খবরটা দিয়ে দিও রাজা। সে সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে সুন্দর করে বডিমাসাজ দিয়ে দেবে।”

“মাসাজের ব্যাপারটা মিস্ বোস বুঝে নেবেন। তোমার এত চটার কী হল!” অধিরাজ শান্তস্বরেই বলে, “বুড়ো যা-ই বলুক সেনোরিটা, সবসময়ই সজাগ থাকবেন। আগামী কয়েক দিনের জন্য আপনার রেস্ট নেই। ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা ঘর সার্চ করুন। সন্দেহজনক কিছু দেখলে ইনফর্ম করুন। কোনোরকম ধোঁয়া দেখলে, বা কাশি পেলে বা কাউকে একটু বেশিই কাশতে দেখলেই আমাদের জানাবেন। আপনার জামার বোতামের স্পাই ক্যামটা সাবধানে রাখবেন। পবিত্র আপনার থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বসেই ল্যাপটপে মনিটরিং করছে। কোনোরকম গোলমাল দেখলেই পৌঁছে যাবে। আর আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গীটা সঙ্গেই রেখেছেন তো? লোকটা কিন্তু বিপজ্জনক।”

“এভরিথিং ইজ ওকে স্যার। ডোন্ট ওরি।” কৌশানীর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস, “সব একদম হাতের কাছেই রেখেছি।”

“আর…ইয়ে….মানে…!” অধিরাজ মাথা চুলকোচ্ছে, “নার্সিংটা অল্প স্বল্প জানেন তো? দেখবেন, বুড়িকে আবার উলটোপালটা ওষুধ দিয়ে দেবেন না। উনি টপকে গেলে বার্নিং শিখ কী করবে জানি না, কিন্তু বুড়ো ঘুঘু আমাদের ধরে লটকে দেবে।”

“না!” নারীকণ্ঠের লাস্যময় হাসির শব্দ ভেসে এল, “তেমন চান্স নেই। আমার মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁর নার্সিং আমিই করতাম। ওটা কাজ চালানোর মতো পারি।”

“ফাইন।” সে গম্ভীর স্বরে বলল, “পবিত্র, আর্বানার খবর কী? অফিসার লাহিড়ীকে ধরো তো।”

এদিকে যেমন পি সি চৌধুরীর বাড়িতে নতুন নার্স এসেছে, তেমনই আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তার বাড়িতে এক তরুণী রাঁধুনী আমদানি হয়েছে। ব্রেকফাস্টে তার রান্না খেয়ে বাড়ির লোকেরা মুগ্ধ৷ রন্ধন পটিয়সীটিকে পেয়ে গিন্নীও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। এ বাড়ির সকলেরই আবার স্বাদেন্দ্রিয় প্রখর। খাদ্যরসিকদের ভুরু পান থেকে চুন খসলেই বেঁকে যায়। এ বাড়িতে একটিই চব্বিশ ঘণ্টার লোক আছে। সে আবার নেপালি! সুন্দরী কুককে দেখে সে এবং ভূপেন্দ্র'র জামাতা বিরূপাক্ষ বেজায় খুশি হয়েছে। গিন্নীমার কাছ থেকে জানা গিয়েছে এ বাড়িতে প্রতিবেশীদের যাতায়াতই বেশি। ভূপেন্দ্র-র দাবা খেলার নেশা। তিনি দাবা খেলার লোক পেলেই ঘুটি পেতে বসে পড়েন।

কৌশানীকে যা যা নির্দেশ দিয়েছিল অধিরাজ, নতুন রাঁধুনীকেও সে সবই বলল। ভূপেন্দ্র দত্তার উলটোদিকের ফ্ল্যাটেই বসে আছেন অফিসার লাহিড়ী। মিস্ দত্তের পোষাকেও একটি স্পাই ক্যাম ফিট করা আছে। অফিসার লাহিড়ী সেটা চব্বিশ ঘণ্টা মনিটরিং করে আপডেট দিতে থাকবেন।

"সাবধানে থাকবেন মিস্ দত্ত।" সে বলল, "আগামী দিনগুলোয় সব কিছু ঘটতে পারে। আই রিয়েলি মিন- সব কিছু। পুরোটাই হয়তো আপনার এক্সপেক্টেশন ও ইম্যাজিনেশনের বাইরে।"

"চিন্তা করবেন না স্যার।" আত্রেয়ীও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, "আমি একজন কপ্। তাই কাউকেই ছাড়ব না। সবাইকেই রাডারে রাখছি।"

"গুড।"

অধিরাজ ফোনটা কেটে দিয়ে এবার অর্ণবের দিকে মনোনিবেশ করে, "সবাই সবার জায়গায় সেট হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু আমাদের দু-জনের সেট হওয়ার অপেক্ষা। তার আগে চলো, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

বলেই সে রাস্তার উলটোদিকে একটি নামকরা চাইনিজ রেস্তোরাঁর দিকে হাঁটা মেরেছে। অর্ণব অবাক হয়ে বলল, "এখন চাইনিজ?"

"হ্যাঁ।" অধিরাজ মুখ টিপে হাসল, "ওদিকে বুড়ো ঘুঘু মিস বোসকে পটাচ্ছে আর আমি তোমাকে পটানোর চেষ্টা করছি। যদি দয়া করে এখন একটা সিগারেট খেতে দাও। কারণ প্রকাশ করি আর না করি, আমি সত্যিই টেনশনে আছি।" "কেন?"

তার মুখে চিন্তার আভাস, "আজ রাতটা খুব ভাইটাল অর্ণব। আমার মন বলছে, আজ রাতে কিছু ঘটতে পারে।"

অর্ণবের মুখেও এবার উত্তেজনা, "আজ অ্যাটাক হবে?"

"হতে পারে। আবার না-ও পারে।" সে চিন্তামগ্ন স্বরে উত্তর দেয়, "পুরোটাই আমাদের ওপর ডিপেন্ড করছে।"

"মানে?"

"মানে যদি আজ আমরা তার প্ল্যানে বাগড়া দিতে পারি, তবে হয়তো আজ রাতটার জন্য সবাই রক্ষে পাবে।"

"তার প্ল্যান কী সেটা আপনি জানেন?" অর্ণব বিস্মিত।

"সবটা জানি না। যেটুকু আন্দাজ করতে পারি সেটা আমি কেন, তুমিও জানো।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, "দেখো, খুনগুলো আসলে কীভাবে হয়েছে তা আমরা এখনও জানি না। ওয়েটা এখনও অজানা। কিন্তু তার স্টাইল সে বজায় রাখবে। অর্থাৎ এবারও নেকলেসিং করার চেষ্টা করবে। নেকলেসিং করতে যে দুটো পদার্থ লাগে তার মধ্যে একটা অলরেডি তার স্টকে রয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে কেরোসিন এখনও তার কাছে রয়েছে। তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আরও একটি জিনিস রয়েছে যেটা ওভাবে স্টক করে ঘরে রাখা যায় না।" সে যেন একটা অঙ্ক মেলাচ্ছে—"টায়ার! কেরোসিনের কন্টেনার তুমি কিচেনে বা স্টোর রুমে লুকিয়ে রাখতে পারো। কিন্তু বিরাট বিরাট টায়ার কোথায় রাখবে? একটা দুটো রাখা তেমন সমস্যা নয়। কিন্তু যদি একডজন টায়ার রাখতে হয় তবে তার জন্য একটা আস্ত গ্যারাজ ভাড়া করা ছাড়া উপায় নেই। আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, তবে সে ওরকম দিনের পর দিন গ্যারাজে টায়ার ফেলে রাখবে না। এমনকি তার যদি নিজের গ্যারাজও থাকে তবুও রাখবে না। কারণ ওটা লোকের নজরে খুব সহজেই পড়ে। আর এই মুহূর্তে বার্নিং শিখের নেকলেসিং এর স্টাইল এ শহরের হেডলাইন।

এত বড়ো রিস্ক সে নেবে না। আবার প্যাটার্নও ভাঙতে চাইবে না।"

অর্ণব চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল। টায়ারের কথা তার মাথায় সত্যিই আসেনি। সত্যিই তো!

টায়ার তবে কোথা থেকে আসছে? ইনফ্যাক্ট এই জাতীয় সাবধানী চরিত্রের মানুষ কোনো কার মেকানিকের গ্যারাজ থেকেও টায়ার কিনবে না। তাছাড়া একেকবারে ছ-টা, সাতটা টায়ার সে ব্যবহার করছে। এরকম গণহারে টায়ার তো একজন মেকানিকের কাছেও পাওয়া যাবে না। তবে গোটা শহর ঘুরে ঘুরে তাকে একেকটা টায়ার কিনতে হবে, যেটা হাস্যকর আইডিয়া!

“একমাত্র একটাই রাস্তা আছে।” অধিরাজ ভাবছে, “আমি যদি তাঁর জায়গায় থাকতাম তবে আশেপাশের কোনো বেসরকারি বা ইললিগ্যাল কার ডাম্পিং গ্রাউণ্ড থেকে টায়ার তুলতাম। তা-ও বেশি আগে নয়। খুন করার ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে। আর আজ দুপুর থেকে গোটা রাত তুমি, আমি, পবিত্র আর লাহিড়ীবাবু আলিপুরে পি সি চৌধুরীর বাড়ির কাছের আর আর্বানার সবচেয়ে কাছাকাছি ইল্লিগ্যাল বা প্রাইভেট ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে ওঁত পেতে বসে থাকব।”

“কিন্তু এরকম তো অনেকগুলো ডাম্পিং গ্রাউণ্ড থাকবে!”

সে মাথা নাড়ল, “না। আমি অলরেডি ম্যাপ সার্চ করে দেখেছি। আলিপুরে দুটো আর আর্বানার কাছে মাত্র একটা আছে। আলিপুরের লোকেশনের সবচেয়ে কাছের গ্রাউণ্ডে তুমি আর আমি থাকব, পাশেরটায় পবিত্র। আর্বানার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে প্রণবেশ লাহিড়ী থাকবেন। এখনই খাওয়া-দাওয়া করে সবাই সেট হয়ে যাব। ওখানে বসে ধূমপান করলে আমাদের মক্কেল টের পাবেন। তাই তুমি যদি অনুমতি দাও তবে এখনই কোটার দুটো সিগারেট আরাম করে টেনে নিই।”

অর্ণব কোনো কথা না-বলে তার হাতে ব্র্যান্ড নিউ ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট আর লাইটার ধরিয়ে দিয়ে বলে, “আপনি শিওর সে আসবে?”

“নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট চান্স আছে যে আসবে। আর এক পার্সেন্ট তার মর্জি।” অধিরাজের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, “আর ওটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ তাকে ধরার বা প্ল্যান ভেস্তে দেওয়ার, যেটা সে একেবারেই প্রত্যাশা করছে না! তার মাথায় পুলিশ প্রোটেকশন আছে, পালটা চাল দেওয়ার প্রব্যাবিলিটি নেই। সো, লেটস সারপ্রাইজ হিম!”

অর্ণবের বুকের ভেতরটা আবার গুড়গুড় করে ওঠে।

সম্মুখ সমর?

**** * * * *

(৭)

শীতের রাতে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে একপশলা বৃষ্টি হয় তবে উত্তুরে হাওয়ার দাঁত নখ আরও বেশি ধারালো হয়ে ওঠে। মাংস-পেশী ভেদ করে তার মোক্ষম কামড় একেবারে হাড় অবধি পৌঁছে যায়। তখন গোটা কঙ্কালটাই বড়ো বেশি কাঁপাকাঁপি শুরু করে দেয়। মনে হয় গুচ্ছ গুচ্ছ বরফের সূচ সারা শরীরে বিঁধছে। সব চেয়ে বিপদ হয় নাকটাকে নিয়ে। গোটা শরীরে ঢাকা দিলেও নাক চাপা দেওয়া খুব মুশকিল। অনেকে অবশ্য নাক-কান মাফলার দিয়ে জড়িয়ে রাখেন কিংবা মাঙ্কি টুপি পরে বসে থাকেন। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই নাক ঢাকতে চান না। তার প্রথম কারণ মাঙ্কি টুপি পরলে মানুষকে মানুষের পূর্বপুরুষের মতোই লাগে—ওটা একদমই আউট অব স্টাইল। আর মাফলার জড়ালে দমবন্ধ হয়ে আসতে চায়। ফ্যাশন ডিজাইনাররা অনেক রকমের স্টাইলিশ কার্ডিগান, ফারের জ্যাকেট বা গরম আউটফিট, হুডি তৈরি করলেও কেউ বেচারি নাককে বিশেষ পাত্তা দেননি। তাই নাক ঢাকার কোনো ভদ্র সভ্য ফ্যাশনেবল উপায়ও তথা নাসিকাত্রাণও পাওয়া যায়নি।

একটু আগেই এখানে অল্পস্বল্প বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকেই শীত একেবারে বরফ শীতল হাওয়া নিয়ে তেড়ে মেড়ে আসছে। অর্ণবের মাঝেমধ্যেই একটু কাঁপুনি উঠছে। সেটা কতটা শীতের জন্য, আর কতটা উত্তেজনায় তা বলা মুশকিল। একটা একটা করে প্রতীক্ষার প্রহর খসছে, আর তার হৃৎস্পন্দন একটু একটু করে বাড়ছে। কিছুটা আশঙ্কায়, কিছুটা উত্তেজনায় আবার কিছুটা সন্দেহেও থেকে থেকে সে দোদুল্যমান। যার জন্য এত তোড়জোড়, এত শবরীর প্রতীক্ষা, সেই ব্যক্তির পদধূলি এখানে আদৌ পড়বে কি? না পুরোটাই 'ওয়াইল্ড গুজ চেজিং'?

সেই দুপুর থেকেই তারা কার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে সতর্ক প্রহরায় আছে। এদিকে অধিরাজ আর অর্ণব। আর একটু দূরের আর একটা ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে পবিত্র প্রতীক্ষারত। প্রত্যেকের কানেই ব্লুটুথ ইয়ারসেট। সারাদিন ধরেই ওরা কনফারেন্স কলে সবক-টা স্পটের আপডেট নিয়ে চলেছে। আর্বানার কাছের ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে প্রণবেশ লাহিড়ী কোনোক্রমে ধৈর্য ধরে এখনও টিকে আছেন। যদিও সারা দুপুর অপেক্ষা করতে করতে এখন একটু বিরক্ত হয়েই উঠেছেন। মাঝখানে খেপে উঠেছিলেন, হাত পা ছাড়াবার জন্য পায়চারি করবেন! অধিরাজ আর পবিত্র প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠে তাঁকে থামিয়েছে।

অবুঝ ছোট্ট ছেলেকে বোঝানোর মতো বুঝিয়েছে, ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের মধ্যে কোনোরকম মুভমেন্ট করা চলবে না। পাখি যদি এসে দেখে স্বয়ং এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট গোটা গ্রাউণ্ড জুড়ে বাঘের মতো হুমহাম করে রাউন্ড লাগাচ্ছেন, তাহলে সে ওখান থেকেই সবার অলক্ষ্যে কেটে পড়বে!

জনবহুল শহরের মধ্যেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই ডাম্পিং গ্রাউণ্ড। অথচ এখানে কলরবমুখর শহরের কোনো আওয়াজই এসে পৌঁছোয় না! যেন শ্মশানের মতো নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। গোটা দুপুরে একমাত্র দু-চারটে ছোটোখাটো পাখির কিচির মিচির আর বেশ কিছু কাকের কর্কশ 'কা কা' ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যায়নি। অধিরাজ আর অর্ণব নিজেদের উপস্থিতি গোপন রাখবার জন্য গ্রাউণ্ডের কেন্দ্রে একটা চাকাছাড়া রংচটা ভাঙাচোরা আদ্যিকালের অ্যাম্বাসাডরের ভেতরে ঢুকে বসে আছে। এখান থেকে গোটা গ্রাউণ্ডটাই স্পষ্ট দেখা যায়। একদম ক্লিয়ার ভিউ। সবচেয়ে সুখের কথা, গাড়িটার একটাও দরজা নেই! বেবাক ফাঁকা। সামনের কাচটাও হাওয়া। শুধু সামনের আর পেছনের ধুলোমাখা ছাতাপড়া লম্বা সিটদুটো যে কী করে বেঁচে গেল সেটাই আশ্চর্যের। অধিরাজ সেটার অবস্থা দেখে মৃদু স্বরে বলল, "চোর যে ড্রাইভিং সিট আর ছাতটাও ভেঙে খুলে নিয়ে যায়নি এই মহানুভবতার জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।"

অর্ণব এক ঝলক চোখ বুলিয়ে বাকি গাড়িগুলোর অবস্থা দেখে নিল। ওগুলোর অবস্থা

আরও খারাপ। প্রথমে প্ল্যান ছিল যে ওরা দু-জনে দুটো গাড়ির ভেতরে কভার নেবে। গাড়িগুলোর পেছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লুকিয়ে বসে থাকা বেশি পরিশ্রমসাধ্য ও ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু অনেক খুঁজেও আর একটা ঠিকঠাক আশ্রয় খুঁজে পাওয়া গেল না। বেশিরভাগ গাড়িরই ছাত নেই! ওদিকে আকাশে আবার মেঘ! বৃষ্টি হলে বিপদে পড়তে হবে। কয়েকটার ছাত থাকলেও ব্যাকসিট নেই। ফ্রন্টসিটে বসলে যে কেউ দেখতে পাবে। কোনোটার কাচে এমনই পুরু ময়লার স্তর জমে আছে যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না! ওখান থেকে নজর রাখা সম্ভব নয়। কোনোটার শুধু স্টিয়ারিং আর কাঠামোটাই বাকি রয়েছে। লুকোনোর জায়গাই নেই। বেশিরভাগই দোমড়ানো মোচড়ানো। ওর ভেতরে একমাত্র অষ্টাবক্রমুনিই নিজেকে সাইজ করে নিয়ে ফিট হতে পারেন! একটা গাড়ির ব্যাকসিটের দিকে তাকিয়েই তার চক্ষু চড়কগাছ। কতগুলো হৃষ্টপুষ্ট ধেড়ে ইঁদুর রীতিমতো ফাঁকা জায়গা পেয়ে ফুটবল খেলতে শুরু করে দিয়েছে! তাদের তীক্ষ্ণ দাঁতে সিটের নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসেছে।

"থ্যাংক গড।" অধিরাজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, "এটা শীতকাল। অন্য কোনো সময় হলে গোটা কয়েক সাপও ফ্রিতে পাওয়া যেত। কে জানে, এর মধ্যে কোনোটারই ভেতরে ঢুকে তালগোল পাকিয়ে শীতঘুম দিচ্ছে কিনা!"

শুধু সাপ কেন, এখানে কাঁকড়াবিছে থেকে শুরু করে বুনিপ অবধি সবই বোধহয় থাকতে পারে। অন্তত তেমনই মনে হচ্ছিল অর্ণবের। তবে অধিরাজের সন্দেহ সম্ভবত সঠিক। কারণ যত গাড়ির কঙ্কাল এখানে পড়ে আছে তার থেকেও বেশি টায়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কোথাও একগাদা টায়ারের স্তূপ পড়ে রয়েছে। আবার কোথাও বা একটার ওপর আর একটাকে সাজিয়ে কেউ পাহাড় বানিয়ে দিয়েছে। একদম বেওয়ারিশ! এখান থেকে প্রয়োজন মতো তুলে নিয়ে গেলেও কেউ এই টায়ারের দুঃখে মরবে না।

"উপায় নেই! একটাতেই দু-জনকে ফিট হতে হবে! আর কোনো অপশন দেখছি না।"

অধিরাজ অ্যাম্বাসাডরের পেছনের সিটে নিজের দীর্ঘদেহটাকে যতটা সম্ভব ঝুঁকিয়ে বসল। তারপরই একটা মাস্ক এগিয়ে দিয়েছে অর্ণবের দিকে, "এটা দয়া করে পরে নাও।"

"মাস্ক স্যার?" অর্ণব একটু অবাক হয়ে বলে, "কিন্তু এখন তো কোভিড নেই।" "কোভিড গেছে ঠিকই, কিন্তু তোমার ডাস্ট অ্যালার্জি এখনও যায়নি।" সে এবার নিজেই হাত বাড়িয়ে সযত্নে অর্ণবের মুখে মাস্কটা পরিয়ে দিতে দিতে বলল, "তুমি যদি ধুলো গিলে নাক মুখ লাল করে ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর করে হাঁচতে থাকো তবে কাকু-কাকিমা কি আমায় আস্ত রাখবেন ডার্লিং? তাছাড়া আমারও সেটা বিশেষ ভালো লাগবে না! নাও, এবার চুপচাপ এসে বসে পড়ো। অত্যন্ত খারাপ অ্যাকোমোডেশন৷ কিন্তু কিছু করার নেই।"

অর্ণব অসহায় চোখে দেখল সিটটার অর্ধেকটা ভেঙে নিম্নগামী! অধিরাজ যথেষ্ট বেঁকেচুরে হাত পা গুটিয়ে বসেছে বলে তবু একটু জায়গা আছে। নয়তো সেটুকুও থাকত না। আর যতটুকু আছে, তাতে একটা বাচ্চা ছেলেও ঠিকমতো বসতে পারবে না। সে অসহায় স্বরে বলল, "কিন্তু স্যার বসব কোথায়?"

অধিরাজ মুচকি হাসল, "কেন? কমলাকান্তের গানটা শোনোনি? 'এসো এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো।' একটু হাত-পা গুঁজে বেঁকেঝুঁকে বসতে পারো কিনা চেষ্টা করে দেখো। নয়তো আমার কোল তো ফাঁকাই আছে। তুমি সেখানেও বসতে পারো।

এই পরিস্থিতিতে আমি তোমার চরিত্র নিয়ে একটুও সন্দেহ করব না। কাম্ অন। কুইক!"

অর্ণব নিজের শরীরটাকে জিমন্যাস্টিক শিল্পীদের মতো নানারকমভাবে বেঁকিয়ে শেষপর্যন্ত ভাঙা সিটটায় বসতে পারল ঠিকই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঠাসাঠাসির চোটে তার দেহের অর্ধেকটা প্রায় অধিরাজের কোলেই উঠে গিয়েছে। দুই অফিসার প্রায় জাপটাজাপটি করেই কোনোমতে ওইটুকু অংশে সেট হয়ে গেল। অধিরাজের বুকের কাছে অর্ণবের মাথা। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস ছুঁয়ে যাচ্ছে অর্ণবের মুখ। সে মুখ নামিয়ে এনে অর্ণবের কানে ফিশফিশ করে বলে, "তোমার গার্লফ্রেন্ডকে ডেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটা কিন্তু

একেবারে পারফেক্ট ডেটিং স্পট! ইনফ্যাক্ট হনিমুনও এখানেই করতে পারো। অবস্থা দেখতেই পাচ্ছ। একেবারে 'অঙ্গ লগা দে রে, মোহে রঙ্গ লগা দে রে' হওয়ার উপক্রম! বলো তো অ্যাডভান্স বুকিং করে রাখি?"

অর্ণব লজ্জায় কানদুটো লাল করে ফেলল, "আমার এখনও কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই স্যার!"

"সেকী! এখনও নেই! তবে!"

তার চোখে দুষ্টুমি ঝিলিক দিয়ে যায়, "এখনও শুধু আপনিই আছেন!"

অধিরাজ সজোরে হেসে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। আস্তে আস্তে বলে, "কেলো করেছে! তোমার কী হবে অর্ণব!"

সেই প্রতীক্ষার শুরু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একইভাবে বসে থাকতে-থাকতে এখন হাত-পা এবং কোমরের পেশীগুলো টাটাচ্ছে। এমন নয় যে এর মধ্যে কেউ আসেনি। দু-জন ভিখিরি গোছের লোক এসেছিল। তাদের আদ্যিকালের পুরোনো টায়ারের ওপর বিশেষ লোভ নেই। বরং গাড়িগুলোর ধ্বংসস্তূপ খুঁজে টুজে দেখল যদি দামি জিনিস কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এই কঙ্কালগুলোয় বিশেষ কিছুই আর বাকি নেই। গাড়ির ইঞ্জিন থেকে শুরু করে পার্টস পর্যন্ত সবই গিয়েছে। ওদের আশঙ্কা ছিল যে ব্যাটারা অ্যাম্বাসাডরটার কাছেও না আসে! শেষ পর্যন্ত হয়তো অ্যাম্বাসাডরটার হতশ্রী ভগ্নস্তূপ দেখে হতাশ হয়ে আর এগোল না। একরকম নিরাশ হয়েই চলে গেল।

আবার অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গোণা। এর মধ্যেই পবিত্র আর প্রণবেশ লাহিড়ীর সঙ্গে টুকটাক কথাবার্তা চলছে ফোনে। পবিত্র জানায়, তার ওখানেও একটি ভবঘুরে লোক ঘুরঘুর করছিল। কিন্তু এ সেই লোক নয়। নিতান্তই ফালতু পাবলিক। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে চলে গিয়েছে। হয়তো তারও কিছু চুরি করার তাল ছিল। তেমন কিছু না-পেয়ে শূন্য হাতেই ফিরে গিয়েছে। প্রণবেশ অবশ্য তেমন কাউকে দেখতে পাননি। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "ভগবানই জানেন কেন বসে আছি। কতগুলো নেড়ি কুত্তা এসে মহা ঝামেলা শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল ওদেরই শ্যুট করে দিই। হাতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে বলে আর চেষ্টা করলাম না।" অধিরাজ মৃদু স্বরে বলল, "রক্ষা করেছেন।"

পবিত্র এর মাঝখানেই বলে উঠল, "কুঞ্জবনে এসে তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁকা শ্যাম হয়ে বসে আছি রাজা। রাধিকার তো দেখাই নেই! মরার পর স্বর্গে ত্রিভঙ্গমুরারির সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করব এই পোজে দাঁড়িয়ে থাকার পরও তাঁর স্পন্ডেলাইসিস বা স্লিপড ডিস্ক হয় না কেন!"

"তুমি কি দাঁড়িয়ে আছ?"

"না না।" সে হাসল, "আমি একটা মারুতির ব্যাকসিটে অলমোস্ট চার হাত পায়ে ভর দিয়ে কোনোরকমে টিকে আছি। কিন্তু রাধা কই? তাঁকে কি হাতে পায়ে ধরে মানভঞ্জন করে নিয়ে আসতে হবে? তুমি শিয়োর যে তিনি আসবেন?"

"তিনিও আসবেন। অপেক্ষা করো। এখনও গোটা রাত পড়ে আছে।"

পবিত্র বেজায় রেগে বলে, "গোটা রাতটাও স্ট্যাচু হয়ে কাটাতে হবে! মাইরি, পুলিশ ট্রেনিঙে দৌড়, ঝাঁপ, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার সবই শেখায়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরকম আনকমফর্টেব্ল পজিশনে বসে থাকারও একটা কোর্স করায় না কেন? তোমার কাছে ভোলিনি বা মুভ আছে?"

"ব্যুরোয় আছে।" অধিরাজ গম্ভীর স্বরে জানায়, "এখন একদম চুপ করে বসে থাকো। একটু পরেই অন্ধকার হবে...!"

বলতে বলতেই মাথার ওপরে জলবিন্দু পড়ার টপটপ শব্দ! পবিত্র শ্বাস ছেড়ে বলল, "লাও ঠ্যালা! এটাই বাকি ছিল!"

একেই জব্বর শীত। তার ওপর অসময়ের বৃষ্টি! অ্যাম্বাসাডরটার আবার দরজাও নেই। মাথার ওপরে ছাত আছে এই অনেক! অর্ণব আর অধিরাজ একেই যথেষ্ট ঘন হয়ে বসেছিল।

তার ওপর খোলা দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে দেখে দু-জনেরই সরতে সরতে প্রায় একে অপরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার উপক্রম! অর্ণবের অসম্ভব শীত করছিল। উত্তুরে হাওয়াটা এবার যেন আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। তার সঙ্গে বৃষ্টির দাপট। হু হু করে হিমেল ভেজা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছিল তার চোখে মুখে। ওরা দু-জনেই এমনভাবে বসে আছে যে একজনের দেহে কোনোরকম চাঞ্চল্য হলে অন্যজন ঠিকই অনুভব করতে পারবে। অধিরাজ অর্ণবের অবস্থা বুঝতে পেরে নিজের জ্যাকেটটা খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিল, "বি কমফর্টেবল। তুমি তো রীতিমতো কাঁপছ!"

"কিন্তু স্যার...।" অর্ণব অবাক, "আপনি...?"

"আমি আয়রন ম্যান।" সে হেসে ফেলল, "ডোন্ট ওরি। আমি যে জিনিসটা পরে আছি সেটা দেখতে নিরীহ হলেও এইটুকু ঠান্ডা সয়ে নেবে। ভুলে যেও না, আমি মাইনাস ডিগ্রিতেও মাউন্টেনিয়ারিং করি। বরফ ঝড় দেখে অভ্যস্ত। কলকাতার শীত আমার কেশ কর্তনও করতে পারবে না।"

অর্ণব কথা না বাড়ালেও অস্বস্তিতে পড়ল। কে জানে, বীরত্ব দেখাতে গিয়ে লোকটা নিজেই না উলটে পড়ে! এই ভেজা ঠান্ডাটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু জেদি মানুষটাকে কিছু বলাই বৃথা। সে অবশ্য অধিরাজের দেহের উষ্ণতা টের পাচ্ছিল। মজবুত পেশল দেহটার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে উত্থান পতনের আভাসও টের পাওয়া যায়। এমনকি তার উত্তেজিত হৃৎস্পন্দনও শুনতে পাচ্ছে অর্ণব। চতুর্দিকের অসীম নীরবতার মধ্যে একমাত্র বাঙ্ময় অধিরাজের হৃদয়।

আস্তে আস্তে রাতের ঘন অন্ধকার নেমে আসল প্রেক্ষাপটে। বৃষ্টি তখনও থামার নাম নিচ্ছে না। এখন আশঙ্কা হচ্ছে এই অকাল বর্ষণই না মাটি করে! এত শীতে মানুষ পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোয় না। যারা ঘরে আছে তারা হয়তো চাদর, বালাপোষ মুড়ি দিয়ে গরম চা আর ভাজাভুজি সহযোগে শীত উপভোগ করছে। বাচ্চারা হয়তো লেপের ভেতর ঢুকে ভূতের গল্প শুনছে। ভোজনরসিকদের বাড়িতে হয়তো টগবগ করে ফুটছে ফুলকপির খিচুড়ি। যারা বাইরে আছে, তারাও এই শীতের রাতে তাড়াতাড়ি বাড়িমুখো হবে। ভেজা পিচের রাস্তা দিয়ে যানবাহন এখন ক্লান্ত মানুষগুলোকে নিয়ে ঘরের পথে উষ্ণতার খোঁজে ছুটছে। আর ঘণ্টাখানেক পরেই রাস্তা শুনশান হয়ে যাবে। আজ হয়তো ফুটপাথবাসীরাও বাস স্টপে বা অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে। কতগুলো পথবাসী কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজেদের দেহে উষ্ণতার সঞ্চার করবে। কেউ জানবে না, এই শীতের নিস্তব্ধ শহরের নিশ্চিন্ত ছবির উলটোদিকে কী ভয়াবহ একটা জীবন-পণ যুদ্ধ চলছে! কোনো ইতিহাসে লেখা থাকবে না এই চার হতভাগ্য অফিসারের কথা যারা নিশ্চিন্ত ছাত, চার দেওয়ালের উষ্ণতা আর বিছানার আরাম উপেক্ষা করে চুপচাপ বসে শীতের কামড় সহ্য করে চলেছে। পুলিশ বলতে সাধারণ জনগণ ভুঁড়িওয়ালা, ঘুষখোর কতগুলো মানুষকেই চেনে। তার বাইরেও একদল মানুষ যে নীরবে অনেক কষ্ট সহ্য করে, অসীম ধৈর্য ধরে, ঝড়-তুফান-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে নিজের ডিউটি করে চলেছে, তার খবর কোনো সংবাদপত্র রাখে না!

বেশ কিছুক্ষণ একটানা ঘ্যান ঘ্যান করে বৃষ্টি অবশেষে ক্ষান্ত দিল। অবিশ্রান্ত বর্ষণ থামলেও ততক্ষণে কার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের মাটি প্যাচপ্যাচে কাদায় পরিণত হয়েছে। আশেপাশের ছোটো বড়ো গর্ত জলে ভরে গিয়েছে। স্ট্রিটল্যাম্পের আলোর কাঁপা কাঁপা প্রতিবিম্ব মাঝেমধ্যেই ঝিকিয়ে উঠছে জলের বুকে। এখন এই মুহূর্তে কোথাও কোনো শব্দ নেই! একেবারে যাকে বলে পিন পতনের নিস্তব্ধতা! অর্ণবের মনে হচ্ছিল সে বুঝি কোনো কবরস্থানে এসে পড়েছে। সামনে সারি সারি ভাঙাচোরা গাড়ির অন্ধকার সমাধি। কোনোটা মুণ্ডহীন কবন্ধের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনোটা আবার হাত-পা কাটা লাশ হয়ে পড়ে আছে। শূন্য কোটর গাড়িগুলোর মধ্যে অন্তহীন তমিস্রা যেন প্রেতাত্মার মতো ওঁত পেতে বসে আছে। সবটাই বড়ো বিষণ্ণ, বড়ো ছায়াময়।

অধিরাজের উষ্ণ সংস্পর্শে না-থাকলে অর্ণব বোধহয় ভুলে যেত তার সঙ্গে আরও কেউ

বসে আছে। এতখানি বডি কন্ট্যাক্ট অধিরাজ একদমই পছন্দ করে না। হয়তো পাশের মানুষটা অর্ণব বলেই কোনো আপত্তি করছে না। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে ছিটকে সরে যেত। আজও 'সার্জিক্যাল স কিলার'-এর আতঙ্ক তাকে পুরোপুরি ছাড়েনি। তার যে অস্বস্তি হচ্ছে তা সে না বললেও অর্ণব বুঝতে পারে। তবুও একটুও নড়াচড়া করছে না অধিরাজ। সে একদম পুতুলের মতো স্থির। তীক্ষ্ণ চোখদুটো নিবদ্ধ কার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের গেটের দিকে। তার উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাস খুব হালকা সিগারেটের সুগন্ধ নিয়ে আছড়ে পড়ছে অর্ণবের মুখে চোখে। তবু অর্ণবও একচুল নড়ল না।

আচমকাই সব নৈঃশব্দ ভেঙে দিয়ে ওদের ইয়ার পিস কড়কড় করে ওঠে, "মেরা দিল ইয়ে পুকারে আজা, মেরে গম কে সাহারে আজা, ভিগা ভিগা হ্যায় সামা, অ্যায়সে মে হ্যায় তু কহাঁ, মেরা দিল ইয়ে পুকারে আ-জা-আ-আ!"

অর্ণব প্রায় চমকেই উঠেছিল। অধিরাজ একটু রেগে গিয়েই বলল, "এখনই তোমায় গানে পেল!"

পবিত্র-র হাসি ভেসে এল, "নির্ঘাত অর্ণব চমকে গেছে। ওকে মঞ্জুলিকার কেসটাতেও জব্বর ভয় দেখিয়েছিলাম। আসলে ভাবলাম অভিমানিনী রাধা বলে কথা। পায়ে ধরে একটু জোরাজুরি না করলে আসবে কেন!"

"ফের এরকম বেসুরো গান গাইলে আমিই তোমার গলায় টায়ার পরিয়ে জ্বালিয়ে দেব...!" অধিরাজ সরোষে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎই বাকি কথাগুলো গিলে নিয়ে নীচু স্বরে ফিশফিশ করে বলল, "ওয়েট, পবিত্র, আমাদের এদিকে কেউ আসছে। আমি ছায়া দেখতে পেয়েছি।"

পবিত্র উত্তেজিত, "ঠাট্টা করছ? না সত্যিই কেউ আসছে!"

ওদের আর একটা শব্দও খরচ করতে হল না। গাড়ির কবরস্থানের মধ্যে হঠাৎই জাগ্রত হয়ে উঠল সেই বিখ্যাত সুরেলা শিস। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ভেসে এল হাড় হিম করা সুর, "গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই, কিসকো খবর কৌন হ্যায় উয়োহ, অনজান হ্যায় কোই...!"

"শুনতে পেয়েছি রাজা। কপি দ্যাট।"

পবিত্র-র লাইনটা কেটে গেল। সে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এদিকেই আসবে। দুটো কার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি নয়। পবিত্র-র সঙ্গে বাইক আছে। ফুল স্পিডে চালালে পাঁচ মিনিটেই চলে আসবে। যদি লোকটা পবিত্র-র এলাকায় আসত তবে ওরা দুই মূর্তি সঙ্গে সঙ্গেই চলে যেত ওকে ব্যাক-আপ দিতে। প্রণবেশ লাহিড়ীর তো কথাই নেই। তিনি মারপিটে নয়, গুলি চালাতে বিশ্বাসী। একাই পুরো ব্যাটেলিয়ন। তবু তাঁকেও সাপোর্ট দেওয়ার জন্য অনতিদূরেই অপেক্ষা করছিল পুলিশের বাইক বাহিনী। আজ ওরা কেউই ফোর হুইলার সঙ্গে নিয়ে আসেনি। প্রত্যেকেরই বাহন বাইক। নাকের সামনে আস্ত চকচকে চারচাকা দাঁড়িয়ে আছে দেখলে হয়তো চতুর অপরাধী ফাঁদে পা দেবে না। বাইককে তুলনামূলকভাবে লুকিয়ে রাখা সহজ। তাই এই ব্যবস্থা।

এখানে তখনও শোনা যাচ্ছে সেই তীব্র শিস। অধিরাজের নিশ্বাস টানার শব্দ ও আর শোনা যাচ্ছে না। তার প্রত্যেকটা স্নায়ু টানটান। অর্ণব কৌতূহলে সামনের সিটের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তার মাথাটায় একটু চাপ দিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে দিল অধিরাজ। ইশারা স্পষ্ট। সামনের ব্যক্তিটি যেন তাদের ভুলক্রমেও দেখতে না পায়। দু-জোড়া চোখ আড়াল থেকে চরম উত্তেজনায় সামনের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শিসটা শোনা গেলেও শিসের মালিককে এখনও দেখা যাচ্ছে না। কোথায় গেল লোকটা!

কার ডাম্পিং গ্রাউণ্ডের চারদিকেই আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বড়োই বিবর্ণ, নিষ্প্রভ আলো। সেই স্তিমিত পিঙ্গল আভায় আস্তে আস্তে ধরা দিল একটি ছায়ামূর্তি। তার হাবভাব নিশ্চিন্ত। হাতে একটা ঠ্যালাগাড়ি। সম্ভবত টায়ার নিয়ে যাবার জন্যই ওটা নিয়ে আসতে হয়েছে। এই গাড়ির শবের মধ্যে জ্যান্ত মানুষ কোথাও থাকতে পারে এমন কোনো ধারণা

তার নেই। না থাকারই কথা। কারণ একেই শীতের রাত, তার ওপর আবার বৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কোন পাগলে এখানে এসে বসে থাকবে। সুতরাং সে অন্য কোনো মানুষের উপস্থিতি আশা করেনি। বরং খুব সহজ ভঙ্গিতে শিস দিতে দিতে এগিয়ে আসছে।

হুইস্লটার সুরের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা অর্ণবের গায়ের সব রোম একঝটকায় খাড়া করে দিল। বহুবার এই গানটা লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে সে শুনেছে। তখন এটা শুনে এত ভয় লাগত না। কিন্তু এবার সেই অভিশপ্ত সুর শুনে বুকের ভেতরটা শিরশিয়ে উঠছে। তার থেকে কয়েক কদম দূরত্বেই দাঁড়িয়ে আছে 'বার্নিং শিখ।' হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে সে-ই বটে। তার লাল উঁচু পাগড়িটা হলদে আলোয় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। মুখ চোখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও গালের একদিকের দাড়ি জঙ্গলের আভাস বেশ বোঝা যায়। নাতিদীর্ঘ চেহারা। শক্ত কাঠামো। পরনের চোলাও স্পষ্ট। সত্যিই! যেন টাইম মেশিনে চড়ে অতীত থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে সে। এ ধরনের পোষাক শিখেরা এখন আর পরে না। তাকে দেখে অবিকল ইতিহাসের পাতার শিখ যোদ্ধাই মনে হয়।

লোকটাকে স্বচক্ষে দেখে কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল অর্ণব। সংবিৎ ফিরল অধিরাজের খোঁচা খেয়ে, "গেট রেডি অর্ণব।"

তার হাতে অলরেডি ফণা তুলেছে আগ্নেয়াস্ত্র। খুব সন্তর্পণে একটুও শব্দ না করে যেভাবে ক্ষিপ্র কায়দায় সে অবলীলায় ছ-ফুট চার ইঞ্চির দীর্ঘদেহটাকে সামলে নিয়ে গাড়ির বাইরে বের করল তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এতক্ষণ এভাবে বসে থেকেও আড়ষ্ট হয়নি নমনীয় শরীরটা। অর্ণবের তো রীতিমতো হাতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছে। তবু সে-ও দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশব্দে গাড়ি থেকে নামল। ওরা দু-জনেই গাড়িগুলোর অন্ধকার ছায়ার কভার নিয়ে গুটিগুটি পায়ে এগোলো শিকারের দিকে।

"পল্ দো পল্ কী মস্তি হ্যায়, বস্ দো দিন কী বসতি হ্যায়, চ্যায়ন ইয়াহাঁ পে মেহঙ্গা হ্যায়, ঔর মওত ইয়াহাঁ পে সস্তি হ্যায়...!"

লোকটা খুব চাপা স্বরেই কলিগুলো গাইতে গাইতেই আপনমনে একটা একটা করে টায়ার তুলে ঠ্যালায় রাখছিল। এই মুহূর্তে অধিরাজদের দিকে সে পেছন ফিরেই আছে। ঠিক আর চার কদম দূরত্বে! আর এক দু-পা এগোলেই চেপে ধরা যাবে ওকে...!

"গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায়...।"

গাইতে গাইতে হঠাৎ থমকে গেল বার্নিং শিখ। পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে পেছনে ফিরল। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শিকারীদের ছায়া দেখতে পেয়েছে। অধিরাজ সভয়ে দেখল তার হাতটা চোলার নীচ থেকে কিছু একটা বের করে এনেছে। অর্ণব একদম তার মুখোমুখি। সে বন্দুক তাক করে এক পা এগিয়ে গেল, "হল্ট।"

"অ-র্ণ-ব!"

একটা বিদ্যুতের রেখা যেন ঝলসে উঠল। অধিরাজ শূন্যে শরীরটা ছুড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অর্ণবের ওপরে। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়েই গড়িয়ে একপাশে সরে গেল। তার মধ্যেই হাতের জিনিসটা ছুড়ে দিয়েছে বার্নিং শিখ! অর্ণব বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল একটু আগেই যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে কাচের একটা কী যেন এসে আছড়ে পড়ল। সজোরে কাচ ভাঙার শব্দ। ভেজা মাটি যেন রাগে ফোঁস করে উঠেছে। সে স্পষ্ট দেখল মাটি থেকে তেজি ধোঁয়া উঠছে! অ্যাসিড বালব!

তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার আক্রমণ! আকস্মিক আক্রমণে অর্ণব হতভম্ব হয়ে গিয়েছে দেখে অধিরাজ তাকে তখনও ছাড়েনি। অর্ণবকে একরকম বগলদাবা করেই সে পায়ে ভর দিয়ে ফের একটা ভল্ট খেল। দ্বিতীয় অ্যাসিড বাল্বটা এবারও ব্যর্থ হয়ে ফোঁস করে রাগী ধোঁয়া উগরে দিয়েছে।

খণ্ডমুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও এবার নিজেকে ফিরে পেল অর্ণব। তার তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না যে দু-বার প্রায় অব্যর্থ অ্যাসিড অ্যাটাকের হাত থেকে একচুলের জন্য বেঁচে গিয়েছে! ওদিকে কাদাভরতি মাটিতে পড়ে যাওয়ার দরুণ সারা গায়ে চোখে মুখে

কাদা লেগে গিয়েছে। সে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই লোকটার পায়ের দিকে টিপ করে ট্রিগার টিপল। কিন্তু চোখের পাতার নীচে কাদা লেগে থাকায় নিশানাটা নিখুঁত হল না! চরম মুহূর্তে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করল। নিস্তব্ধ কার ডাম্পিং গ্রাউণ্ড কেঁপে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র-র গর্জনে! তবে বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বার্নিং শিখ এবার অসম্ভব আক্রোশে তার দিকে আরও এক পা এগিয়ে আসে। অর্ণব এবার নিশ্চিত ছিল যে আরও একটা অ্যাসিড বাল্ব এসে পড়বে। তাই তৃতীয় আক্রমণটাকে সে নিজেই ডজ করে লাফিয়ে উঠে লোকটার থুতনি লক্ষ্য করে একটা মোক্ষম ঘুঁষি বসিয়ে দিল।

অদ্ভুত ব্যাপার! অত জোরাল পাঞ্চ খেয়েও সে পড়ে গেল না। হয়তো অর্ণবের ওপর ফের ঝাঁপিয়ে পড়ত। তার আগেই পেছন থেকে এক হাতে বজ্রকঠিন আলিঙ্গনে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে অন্যহাতে চোলার তলা থেকে একটা দড়ি টেনে বের করে আনল অধিরাজ। এই দড়িটা ওর কোমরে বাঁধা ছিল। তাতে আরও চারটে অ্যাসিড বাল্ব ঝুলছে! সে বজ্রকণ্ঠে বলল, "সরি। অ্যাসিড বাল্বগুলো আমি একটু ধার নিচ্ছি।" বার্নিং শিখের মুখটা এবার একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কী ভয়ংকর আক্রোশ সে মুখে! একদিকের মুখ যেন ঈশ্বর তৈরি করেও লেপে-পুঁছে দিয়েছেন। ঠোঁটের ওপরের সেলাইগুলো দেখলে মর্গের লাশের সেলাই করা দেহ মনে পড়ে। অধিরাজ এমন বেকায়দায় তাকে ধরেছে যে সেই বজ্রমুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়াতেও পারছে না। পালটা আক্রমণও করা অসম্ভব। তার ওপর তার বিষ-দাঁত, তথা অ্যাসিড বাল্বগুলোও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। একটা আহত সাপের মতো সে অসম্ভব প্রতিহিংসায় ফুঁসছে। "নাইস মেক-আপ! আপনার কল্যাণে আমরাও কাদা মেখে কিছুটা হ্যালোউইন

মেক-আপ করে নিয়েছি।" অধিরাজ ঠান্ডা স্বরে বলল, "বাট একটা টেকনিক্যাল ফল্ট আছে। যার ঠোঁট সেলাই করা সে শিস দিতে বা গান গাইতে পারে না। আপত্তি না থাকলে একটু আপনার আসল মুখটা দেখতে পারি?"

সে আর কিছু করার আগেই বার্নিং শিখের বাঁ-হাতটা ক্ষিপ্রবেগে নিজের পাগড়ি ছুঁল। ওই স্বল্প আলোতেই তার হাতে ধাতব কিছু একটা ঝিকিয়ে উঠল। অর্ণব দেখল তার হাতটা অধিরাজের গলা লক্ষ্য করে সবেগে ছুটে যাচ্ছে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, "স্যা-র!"

লোকটার উষ্ণীষের ভেতরে একটা ছোট্ট অথচ মারাত্মক ধারালো কৃপাণ লুকোনো ছিল। এটার সম্ভাবনা ওদের কারোর মাথাতেই ছিল না। অধিরাজের কণ্ঠ তার লক্ষ্য হলেও শেষমুহূর্তে সে আত্মরক্ষার্থে একটু পিছিয়ে যাওয়ার ফলে কৃপাণটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গলার বদলে কাঁধে আমূল বসে গেল। অধিরাজ কাতরোক্তি করে ওঠে। অর্ণব দেখল তার পরনের কাদামাখা কটস উলের জামাটা আস্তে আস্তে রক্তে লাল হয়ে উঠছে! হাত থেকে অ্যাসিড বাল্বগুলো খসে পড়ল। অপ্রত্যাশিত আঘাতের ধাক্কায় ও যন্ত্রণায় তার লৌহবেষ্টনী আলগা হয়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তের ভগ্নাংশের সুযোগ নিয়েই বার্নিং শিখ ফের এগিয়ে গেল। অধিরাজের কাঁধে তখনও ছুরিটা গভীরে চেপে বসেছিল। লোকটা এক ঝটকায় সেটাকে খুলে নিয়েছে। ছুরিটা ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে মাসতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করল। গোটাটাই এত দ্রুত ঘটে গেল প্রত্যাঘাত করার সময় প্রায় ছিলই না। তবু অধিরাজের এক জোরাল লাথি খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ে। অর্ণব দেখল এই সুযোগ। সে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই একের পর এক ফায়ার করতে শুরু করল ওর মাথা, পেট আর বুক লক্ষ্য করে। কান ফাটানো ফায়ারিং-এর আওয়াজে গোটা এলাকা সচকিত হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ হলে হয়তো এতক্ষণে ঝাঁঝরা হয়ে যেত। অথচ বার্নিং শিখ স্রেফ গুলির ধাক্কায় কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। প্রত্যেকটা বুলেটের আঘাতে সে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঠিকই, কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও বেরোচ্ছে না! সামান্য ঝাঁকুনি ছাড়া বুলেটগুলো আর কোনো ক্ষতি করতে পারছে না! এমনকি তার পাগড়িতেও বুলেট লেগেছে। অথচ কোনোরকম আঘাতের লক্ষণই নেই। এর মধ্যে একটা গুলিই ওর প্রাণ নিয়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট! কিন্তু লোকটা অক্ষত।

তার ভয়াবহ মুখে একটা শয়তানি হাসি ফুটে উঠল।

অর্ণবের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কম-সে কম ছ-টা বুলেট সে ফায়ার করেছে। তারপরও শিকার বহাল তবিয়তে আছে! এ কীভাবে সম্ভব। সত্যিই এ লোকটা মানুষ তো! এতগুলো গুলির একটাও লাগল না! কোনো ক্ষত বা রক্তের চিহ্নই নেই। সে বিস্ময় বিহ্বল অবস্থায় কী করবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু অধিরাজ এবার তার পা লক্ষ্য করে ফায়ার করল। সি.আই.ডি.র সবচেয়ে দক্ষ শার্প শ্যুটারের গুলি এবার গিয়ে লাগল বার্নিং শিখের উরুতে। এই প্রথম কাজ হল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল আততায়ী। এই প্রথম তার পাজামা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। অধিরাজ এবার রিভলভারটা তার চোখের দিকে তাক করে বলল, "তুই বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরেছিস ঠিকই, আমি নিশ্চিত পাগড়িটাও বুলেটপ্রুফ! কিন্তু এবার আর কোনো চালাকি করলে তোর চোখ লক্ষ্য করে ফায়ার করব!"

এইবার কাজ হল। বার্নিং শিখ নামক লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার একটাই চোখ দেখা যাচ্ছিল। সেই চোখে এবার গভীর আতঙ্ক। প্রতিদ্বন্দ্বী যে তার চালাকি এত সহজে ধরে ফেলবে তা ওর কল্পনারও বাইরে। সে আস্তে আস্তে হাত দুটো আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে তুলে দেয়।

অর্ণব একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অধিরাজ এখনও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটাকে মাপছে। চোখে ভয় থাকলেও ওর মুখ এখনও এত নিশ্চিন্ত কেন! নিশ্চয়ই মস্তিষ্কে অন্য কোনো বুদ্ধি এসেছে। তার সতর্ক দৃষ্টি ওর জখম পায়ের দিকে গেল। ওর পা ততক্ষণে ঠ্যালা গাড়ির উঁচু অংশটা ছুঁয়েছে....!

"অর্ণব... নো!"

শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল সে। তার মধ্যেই বার্নিং শিখ পায়ের ধাক্কায় ঠ্যালাগাড়িটাকে পুরো উলটে দিয়েছে। যতগুলো টায়ার তার ওপরে ছিল এক ধাক্কায় শূন্যে উঠে গিয়েছে। বড়ো বড়ো জগদ্দল টায়ারগুলো ধুপধাপ করে দুই অফিসারের ওপরে এসে প্রায় বুমেরাং এর মতো ছিটকে পড়ল। অর্ণবের বুকে একটা টায়ার এসে ধাক্কা মেরেছে। সে তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আগ্নেয়াস্ত্রটা হাত থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল কে জানে। অধিরাজ নিজেকে সামলে নিলেও দেখল লোকটা তাদের এই অবিন্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়ে সবেগে পালিয়ে যাচ্ছে। "এ-ই! দাঁ-ড়া!"

অর্ণব ততক্ষণেও নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারেনি। জমা জল ভরা গর্তে পা স্লিপ করে পড়ে গিয়ে ভিজে গিয়েছে। তার সারা গায়ে প্যাচপ্যাচে কাদা! যেভাবে এই কাদার মধ্যে দু-জনে মিলে গড়াগড়ি খেয়েছে, তাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাদার প্রলেপ লেগে একসা! তবু হাত দিয়ে চোখের ওপর থেকে মাটি পরিষ্কার করে দেখল বার্নিং শিখের পেছন পেছন তীরবেগে দৌড়চ্ছে অধিরাজ। অপরাধীর পক্ষেও কাজটা সহজ নয়। পিচ্ছিল মাটিতে সে-ও একবার আছাড় খেল। তবু হাল ছাড়বে না। ফের উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে দৌড় মারল। অধিরাজের পা-ও স্লিপ করছে। জুতোর গ্রিপ ফস্কাচ্ছে। কাঁধ থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। তাও হাল ছাড়ল না। গোঁয়ার জেদে লোকটাকে চেজ করছে সে! লোকটার উরুতে গুলি লেগেছে। তাও এত জোরে দৌড়চ্ছে কী করে ও? বিন্দুমাত্রও খোঁড়াচ্ছে না!

দু-জনেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল একাধিক ফায়ারিং এর শব্দ! গুলি চলছে। কে কাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে! সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়। হয়তো বাইরের দিকে ছুটেও যেত। তবে তার আর দরকার পড়ল না। দূর থেকেই একটা কাদামাখা মূর্তিকে ফের এদিকেই দৌড়ে আসতে দেখল সে। দীর্ঘ চেহারাটা দেখে বুঝতে অসুবিধে হল না, ওটা অধিরাজ! সে অর্ণবের কাছে ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ধরতে পারলাম না! শয়তানটা একটু দূরেই একটা টেম্পো দাঁড় করিয়ে এসেছিল। ওতে চড়েই পালিয়ে গেল। আমাদের বাইকগুলো আবার উলটোদিকে। ফিরে গিয়েও কোনো লাভ হত না! ফস্কে গেল! একটুর জন্য...!" তার কণ্ঠস্বরে আফসোসের পাশাপাশি এবার উদ্বেগ, "তুমি ঠিক আছ? বুকে খুব জোর লেগেছিল টায়ারটা...!"

অর্ণব কী বলবে ভেবে পায় না! এই লোকটার কাঁধ থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। কৃপাণটা একদম পুরোটাই গেঁথে গিয়েছিল। আপাদমস্তক কাদায় আর রক্তে মাখামাখি। সে আবার জিজ্ঞাসা করছে অর্ণব ঠিক আছে কিনা! এই মানুষটা ঠিক কোন্ ধাতুতে গড়া।

"আরে একী!"

অফিসার আচার্য এতক্ষণে এসে পৌঁছেছে! অধিরাজদের দেখে সবিস্ময়ে বলল, "লোকটা কোথায়! আর তোমরা এতক্ষণ কি কাদামাটিতে কুস্তি করছিলে! এ কী অবস্থা বানিয়েছ!"

অধিরাজ একটা প্রচণ্ড রাগকে সম্বরণ করে বলল, "হ্যাঁ, আমরা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে বার্নিং শিখের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভৌতিক মেক-আপ করছিলাম। আমাদের তো কাদা মেখে ভূত সাজার খুব শখ! তুমি এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লে যে? আর একটু দেরিতে এলে কী ক্ষতি হত!"

"আরে আমার বাইকে আজ তেল ভরতে ভুলে গিয়েছিলাম।" পবিত্র অপ্রস্তুত, "মাঝপথেই থেমে গেল। এমনিতে ওটা ইউজ হয় না। তাই তেল ভরার কথা মাথা থেকেই বেরিয়ে গিয়েছিল...!"

অধিরাজ আর থাকতে না পেরে প্রায় গর্জন করে ওঠে, "ইউ স্টুপিড! তোমার জন্য লোকটা আজ আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল! তুমি জানো এর ফলাফল কী হবে? এরপর আর ও টায়ার আর কেরোসিন ইউজ করবেই না। প্যাটার্নকে গুলি মারো! এবার এমনি এমনিই লোকগুলোকে মারবে। আর আমাদের কোনো ধারণাই নেই যে অ্যাকচুয়াল মার্ডার ওয়েপনটা কী! এবার ওকে আটকাবে কী করে তুমি?" পবিত্র-র মাথা আত্মগ্লানিতে নীচু হয়ে গেল। ও বেচারিরও দোষ নেই। টেনশনে বাইকে তেল ভরার কথা মাথা থেকে বেরিয়েই গিয়েছে। মাঝপথে ওর বাইকটা থেমে না গেলে হয়তো লোকটাকে ধরা যেত। কিন্তু সেকথা অধিরাজ এখন বুঝবে না। ওর মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছে।

"ড্যা-ম্!" প্রচণ্ড রাগে অধিরাজ কী করবে ভেবে পায় না, "আজ ওর প্ল্যান বানচাল হয়ে যাওয়ায় আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় ও সবকিছু করবে! লোকটাকে তুমি দেখোনি, আমরা দেখেছি। কোনোরকম যন্ত্রণা ওকে হারাতে পারে না! এত স্পিডি যে তুমি ভাবতেও পারবে না। আজ তিন তিনবার অর্ণব অ্যাসিড অ্যাটাক থেকে বেঁচেছে। আমি আর একটু হলেই শহীদ হয়ে যাচ্ছিলাম। ও মরে যাবে, কিন্তু হার মানবে না আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় আরও ডেসপারেট হয়ে উঠবে। তার ওপর ওর চোখে আমি প্রতিহিংসা দেখেছি। আজকের সাময়িক ব্যর্থতার বদলা আমাদের থেকে নেবেই। এবার ও রিভেঞ্জ নেবে। এর অর্থ কী বুঝতে পারছ? আমাকে তো ছেড়েই দাও, মিস্ বোস, মিস্ দত্ত, তুমি নিজে, অর্ণব, প্রণবেশদা সমেত গোটা টিমই ওর হিটলিস্টে থাকবে। খবরিরাও হয়তো বাদ যাবে না। কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ হিসাবে এতগুলো প্রাণের দায় কে নেবে? তুমি নেবে? বু-ল্ শিট!"

"রাজা।" এবার পবিত্র তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, "তুমি প্লিজ কোনো হসপিটালে চলো। তোমার উন্ড থেকে ভীষণ ব্লিডিং হচ্ছে।"

"হোক।" সে আরও উত্তেজিত, "আমাদের মতো অপদার্থের এটাই হওয়া উচিত। নাকের সামনে দিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেল। আমরা স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। উই রিয়েলি ডিজার্ভ দিস!"

"স্যার।" এবার অর্ণব তাকে বোঝানোর প্রয়াস করল, "যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আপনার উন্ডটা মারাত্মক। ওটার পরিচর্যা না করলে প্রবলেম হবে।" অধিরাজ অশান্ত, "তুমি বুঝছ না অর্ণব। এখন আমি কোনো হসপিটালে যেতে পারব না। তাহলেই আমাকে অ্যাডমিট হতে বলবে। আর আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় আমার মরার সময়ও নেই। যা করার তা তার পরেই করব।"

"ওকে।" অর্ণব শান্ত স্বরে বলে, "তবে অন্তত ফরেনসিক ল্যাবে চলুন। অ্যাট লিস্ট ডঃ চ্যাটার্জি কিছু-না কিছু করে আপাতত সামাল দেবেন। তারপর দেখা যাবে। ও লোকটারও

তো থাইয়ে গুলি লেগেছে। সে-ও নিশ্চয়ই কোনো না কোনো হসপিটালে যাবে। আমি বরং সমস্ত হসপিটালকে অ্যালার্ট করে দিচ্ছি...!”

“প্রসিডিওর অনুযায়ী তাই করা উচিত।” সে এবার একটু শান্ত হল, “অ্যালার্ট করে দাও। কিন্তু পণ্ডশ্রম। ও পাবলিক কোনো ডাক্তারের কাছে যাবে না। বরং নিজেই হয়তো বুলেট বের করার চেষ্টা করবে। আমার মতো আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা ওরও ছুটি নেই অর্ণব। আমাদের হাতে যেমন সময় কমছে, তেমন ওর হাতেও বেশি সময় নেই। ও জীবনে অনেক যন্ত্রণা সয়ে সয়ে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। একটা বুলেট ওর কিস্যু করতে পারবে না!” বলতে বলতেই অধিরাজ ফিরল পবিত্রর দিকে। রাগত গলায় বলল, “বাইক তো কোনো কম্মের নয়। মোবাইলটা কি ঠিক আছে? না ওটারও চার্জ শেষ?”

তার কথার মধ্যেই ব্যঙ্গ ও রাগ প্রকট। অফিসার আচার্য মাথা নীচু করেই বলল, “না। ওটা ঠিক আছে।”

“দেন, এখনই মিস্ বোস আর মিস্ দত্তকে ফোন করো। দেখো, ওদিকে সব ঠিকঠাক আছে কিনা!”

সৌভাগ্যক্রমে কৌশানী আর আত্রেয়ীর কাছ থেকে কোনোরকম দুঃসংবাদ এল না।

দুই লেডি অফিসারই রাতে চুপচাপ রাউন্ড দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের চোখেও ঘুম নেই। প্রতিটা মুহূর্ত দু-জনেই সদাসতর্ক হয়ে কাটাচ্ছে। কৌশানী জানাল, পি সি চৌধুরীর বাড়িতে কোনোরকম অঘটন কিছু ঘটেনি। গোটা দিনটাই খুব নর্মাল গিয়েছে। আত্রেয়ী অবশ্য কথায় কথায় একটা কথা জানায়। সে বলল, “স্যার, এদের বেডরুমের ঘরের লাইটগুলো পিকিউলিয়ার।”

“পিকিউলিয়ার মানে?”

অধিরাজের প্রশ্ন শুনে একটু ইতস্তত করে বলল মিস দত্ত, “জানি না। আই মিন, হয়তো এটাই নর্মাল। কিন্তু এইরকম লাইট আমি গ্রীনহাউসে দেখেছি। আমার এক বন্ধু বটানিতে এক্সপার্ট। ও অনেকরকম উদ্ভট প্ল্যান্ট গ্রীনহাউসে লাগায়। ওর গ্রীনহাউসে প্ল্যান্টগুলোর মাথায় মাথায় এরকম ভিবজিওর এল ই ডি লাইট আছে। ও বলেছিল ওই লাইটগুলো একদম সানলাইটের এফেক্ট দেয়। গাছগুলো গ্রীনহাউসের মধ্যে থাকলে সানলাইট পায় না। তাই যাতে ওরা সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে যেতে পারে তাই ভিবজিওর আলট্রা ভায়োলেট লাইট লাগাতে হয়। এদের বেডরুমেও ঠিক সেই ভিবজিওর আলট্রা ভায়োলেট লাইট আছে স্যার।”

“স্ট্রেঞ্জ!” অধিরাজের মুখ থেকে চির পরিচিত শব্দটা বেরিয়ে আসে, “ওই বিশেষ লাইটের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব আছে? জানেন আপনি?”

“না স্যার।” আত্রেয়ী হাসে, “ওই লাইটের তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আমার বন্ধু প্রায় তিন চার বছর ধরে কাজ করে চলেছে। ওটা শুধু খাঁটি সানলাইটের পুরো এফেক্টটা দেয়। আর কোনো সাইড এফেক্ট নেই।”

“হুঁ।” তার চোখ অন্যমনস্ক, “ওদের বেডরুমে কোনো প্ল্যান্ট আছে?”

“সব বেডরুমে নেই স্যার। তবে ভূপেন্দ্র স্যার আর ওঁর ওয়াইফের ঘরে আছে।” “কতদিন ধরে ওই লাইট আছে? জিজ্ঞাসা করেছেন?”

“হ্যাঁ।” আত্রেয়ীর সপ্রতিভ উত্তর, “মাস ছয়েক ধরেই আছে।”

“হুম।” অধিরাজ আর কথা বাড়ায় না। শুধু বলল, “মিস্ দত্ত, হাই অ্যালার্টে থাকুন। খুব সাবধান। প্রত্যেকটা পদক্ষেপ খুব সন্তর্পণে রাখবেন।”

“ওকে স্যার।”

আত্রেয়ী ফোন কেটে দিল।

* * * * *

(৮)

“অফিসার ব্যানার্জি, আপনি একটু স্থির হয়ে বসবেন প্লিজ?”

আহেলি অধিরাজের ক্ষতস্থান স্টিচ করতে করতে তাকেই ধমক দিয়ে দিল, “আর ওটা কী হচ্ছে! যতবার বলছি, আপার পোর্শনের কাপড়টা রিমুভ করুন, কিছুতেই আপনি শুনছেন না! আমি কি কাপড় চামড়া স্টিচ করব?”

ডঃ চ্যাটার্জি এবার অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়লেন। গত আধঘণ্টা ধরে ফরেনসিক ল্যাবে এই একই যুদ্ধ চলছে। অধিরাজের কাদামাখা রক্তাক্ত মূর্তি দেখে এমনিতেই তাঁর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হচ্ছিল। কৃপাণটা একদম গভীর অবধি চলে গিয়েছিল। ক্ষত খুব গভীর। তার ওপর একটুর জন্য একটা ভাইটাল শিরা কাটতে কাটতে বেঁচে গিয়েছে! ছুরিটা যদি আর এক-দু-ইঞ্চি এদিক ওদিক পড়ত তবে সর্বনাশ হত! যেটুকু হয়েছে তাও কিছু কম নয়। সঙ্গে সঙ্গেই ড্রেসিং প্রয়োজন ছিল। রক্তক্ষরণও যথেষ্ট হয়েছে। সবমিলিয়ে চিন্তার কারণ যথেষ্টই আছে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! অধিরাজকে প্রায় ঠেলেঠুলে ল্যাবের বাথরুমে স্নান করার জন্য পাঠিয়েছিলেন তিনি। ওরকম কাদামাখা অবস্থায় ক্ষত-র পরিচর্যা করা যায় না। সচরাচর এরকম অ্যালার্মিং পরিস্থিতিতে অফিসারদের এক সেট জামাকাপড় ব্যুরোতেই থাকে। অথচ এবার কপাল দোষে এবং তাড়াহুড়োতে অধিরাজের ড্রেসের সেটটা আনা হয়নি। ওরা কাজের মধ্যে এত মগ্ন ছিল যে খেয়ালই হয়নি যে এক্সট্রা সেটটা ব্যুরোয় নেই। ওদিকে অধিরাজ চুপচাপ স্নান সেরে নিলেও শুধুমাত্র টাওয়েল পরে কিছুতেই সবার সামনে আসবে না। ডঃ চ্যাটার্জি তার এই অস্বস্তির কারণ জানেন। অর্ণবও বুঝতে পারে। কিন্তু ওদিকে রক্তক্ষরণও তো বন্ধ হচ্ছে না! বাধ্য হয়েই তিনি হেঁকে বললেন, “রাজা, আমি একটা বুড়ো ভাম হয়েও ওই টাওয়েলটা পরেই বেরোতে পারি তো তুমি পারবে না কেন?”

“পারব না কারণ এটা লিলিপুটদের টাওয়েল!” ভেতর থেকে অধিরাজের মন্দ্র স্বর ভেসে এল, “আপনার কাছে এটা গাউন হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা রুমাল। আর আমি হারগিস রুমাল পরে ঘুরে বেড়াতে রাজি নই।”

“উর্ফি জাভেদের রুমালও লাগে না!” বেচারি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ প্রায় অনুনয় করেই বললেন, “তোমার কাছে তবু আস্ত রুমাল আছে। প্লিজ বেরিয়ে এসো।”

এবার অধিরাজ না বেরোলেও তার মুণ্ডুটা বেরিয়ে এল। সে ভ্রূকুটি করেছে, “আপনি আজকাল উর্ফি জাভেদের ড্রেস নিয়ে খুব উৎসাহিত হয়ে পড়েছেন দেখছি! মিস কাটামুণ্ডু জানেন?”

বুড়ো এবার চটে লাল, “ফিচলেমি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসো বলছি।”

“হারগিস না।” সে আবার সুড়ুৎ করে টয়লেটে ঢুকে গিয়েছে, “আমি সলমন খান, হৃত্বিক রোশন বা জন আব্রাহাম নই যে এইট প্যাকের প্রদর্শনী করে বেড়াব।”

“এ তো আচ্ছা হালুয়া!” তিনি মরিয়া হয়ে বললেন, “এখানে কোন্ পাপারাজ্জি তোমার দিকে ক্যামেরা তাক করে বসে আছে? আমি তোমার বাপের বয়সি আর অর্ণব তোমার প্রিয় সখা কাম ব্রাদার। বাকি রইল মেয়েরা। ওদের ডাক্তার ভেবে নাও। তুমি তো মেয়েদের মতো লজ্জা পাচ্ছ! কাম্ অন্! আমায় তোমার উন্ডটা দেখতে দাও।”

“না!”

এবার উপায়ান্তর না দেখে অর্ণবের দিকে তাকালেন ডঃ চ্যাটার্জি, “এভাবে হবে না। যাও তো ল্যাবের পর্দাগুলো খুলে নিয়ে এসো।”

অর্ণব তাড়াতাড়ি তাঁর হুকুম তামিল করতে চলে যায়। অবস্থা দেখে ডঃ চ্যাটার্জির দুই ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট মুচকি মুচকি হাসছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে গরগর করে উঠলেন ভদ্রলোক, “এখানে কি কমেডি সার্কাস চলছে? বত্রিশ পাটি বেরোনোর মতো কী হল!”

বকা খেয়ে দুই অ্যাসিস্ট্যান্টই ছদ্ম গাম্ভীর্য অবলম্বন করেছে। অর্ণব ঝড়ের বেগে হাতের

কাছে যতগুলো পর্দা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। ডঃ চ্যাটার্জি অধিরাজকে সেগুলো ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "এগুলো দিয়ে তুমি ঘোমটা বানাও, বোরখা বানাও, প্যাঁচ দিয়ে শাড়ি পরো, আই ডোন্ট মাইন্ড! কিন্তু দয়া করে তাড়াতাড়ি বেরোও। নয়তো আমিই দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ব।"

শেষপর্যন্ত ঝুলি থেকে বিড়াল বেরোল। অর্থাৎ বাথরুম থেকে অধিরাজ। সে একটা পর্দাকে কটিবস্ত্র বানিয়েছে। আর একটাকে অঙ্গবস্ত্র। উর্ধাঙ্গে পর্দাটাকে প্রায় শালের মতো লেপ্টে রেখেছে দেখে ডঃ চ্যাটার্জি অসহায় ভঙ্গিতে দু হাত ছড়িয়ে বললেন, "এভাবে মমি সেজে বসে থাকলে আমি জখম জায়গাটা কীভাবে দেখব!"

অধিরাজের ভেজা চোখের পাতায় আর মাথার চুলে চিকচিক করছে জলবিন্দু। মুখ এখনও জলসিক্ত। লম্বা গ্রীবা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। সে মাথা নাড়ল, "যা দেখার এভাবেই দেখুন।"

"রাজা! আমার চোখে রন্টজেন রশ্মি বসানো নেই।" তিনি বললেন, "অন্তত কাঁধটা দেখাও। নয়তো আমি কেন, গোটা বিশ্বের ডাক্তার মায় স্বর্গ থেকে ধন্বন্তরিকে টেনে আনলে তিনিও কিছু করতে পারবেন না।"

"ওকে।"

অধিরাজ খুব সাবধানে কাঁধের অংশটুকু উন্মুক্ত করল। ঠিক যতটুকু না করলেই নয়, ততটুকুই। ডঃ চ্যাটার্জি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ক্ষতটা এবার ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে। তিনি আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত পরিচর্যায় লেগে পড়লেন। ভালো করে উন্ডটাকে পরিষ্কার করতে করতে বললেন, "থ্যাংক গড। জুগুলার ভেইনটা একটুর জন্য রক্ষে পেয়ে গেছে। কিন্তু জখম বেশ ভালোই হয়েছে। ব্লাড লসও হয়েছে। স্টিচ দিয়ে ড্রেসিং না করলে হবে না। তোমরা হসপিটালে গেলেই ভালো করতে। একটু ব্লাড দিয়ে দিলে ভালোই হত। তুমি এরকম উন্ডেড অবস্থায় এতটা রাস্তা বাইকে কী করে এলে সেটাই আশ্চর্যের।"

"সময় নেই ডক্।" সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়, "ওখান থেকে যে ফরেনসিক স্যাম্পল নিয়ে এলাম তার থেকে কিছু পাওয়া গেল?"

আসার সময়ে ওরা ভাঙা অ্যাসিড বাল্বের কাচ, বার্নিং শিখের রক্ত মাটিতে যেটুকু পড়েছিল, তার ফুটপ্রিন্টের স্যাম্পল তুলে এনেছিল। ডঃ চ্যাটার্জি আড়চোখে আহেলির দিকে তাকালেন। সে অ্যাসিড বাল্বের কাচ পরীক্ষা করে দেখছিল। এবার মুখ তুলে বলল, "এটা হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড স্যার। এর আগের কেসগুলোয় সালফিউরিক অ্যাসিড ছিল, কিন্তু এবার সে হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড ইউজ করেছে।"

"সর্বনাশ!" তিনি সভয়ে বলেন, "লোকটা হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড বাল্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! এ তো পুরো জ্বালাময়ী পাবলিক। ঈশ্বরের অসীম কৃপা যে গায়ে লাগেনি। কাকে মেরেছিল?"

অর্ণব আস্তে আস্তে বলে, "আমায়। তিনটে মেরেছিল।"

"তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন অর্ণব। নয়তো একটাও যদি কোনোক্রমে লাগত তবে তুমি এতক্ষণে হসপিটালের বার্ন ইউনিটে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে।" ডঃ চ্যাটার্জি ভেবেই যেন কেঁপে উঠলেন, "হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিডের নিয়মই হচ্ছে স্লো লি একেবারে ডিপে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া। ও শুধু চামড়া পুড়িয়েই ক্ষান্ত হয় না, চামড়া পোড়াতে পোড়াতে মা টিস্যুতে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কুরে কুরে হাড় অবধি চলে যায়। হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের হাত থেকে তবু নিস্তার আছে। কিন্তু হাইড্রোফ্লুওরিক একদম সাইলেন্ট কিলার। স্লো বাট পেইনফুল ডেথ দিতে ওস্তাদ।"

অর্ণব অ্যাসিড বাল্বগুলোর তেজি এফেক্ট দেখেই ভয় পেয়েছিল। এখন অ্যাসিডটার বিস্তারিত বিবরণ শুনে হাড়ে বুঝি কাঁপুনি লেগে গেল। সে কাঁপা স্বরে বলে, "ভগবান সঙ্গে ছিলেন কিনা জানি না, তবে স্যার ছিলেন।"

অর্ণবের ঠিক ওই মুহূর্তটা মনে পড়ল যখন অধিরাজ ঝাঁপিয়ে পড়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর করাল

গ্রাস থেকে তাকে প্রায় ছিনিয়েই নিয়েছিল। ভাবতেই এখন ভয় লাগছে। কীরকম বোকার মতো সে এগিয়ে গিয়েছিল লোকটার দিকে। লক্ষই করেনি যে ওর চোলার নীচে অতগুলো অ্যাসিড বাল্ব রাখা আছে। লোকটা সাক্ষাৎ কাল!

"আমি বুঝতে পারি না এ পাবলিক এসব আমদানি করছে কীভাবে!" ডঃ চ্যাটার্জি মাথা নাড়ছেন, "এ তো লেভেলের লোক দেখছি! হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড পাওয়া অত সহজ নয়। হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক যদি পাওয়াও যায়, হাইড্রোফ্লুওরিক একদম হাতে গোণা কয়েকটা জায়গা ছাড়া অ্যাভেইলে নয়। মূলত ফার্মাসিউটিকলস্, হাই অক্ট্যান গ্যাসোলিন, ফ্লুওরিসেন্ট লাইট বাল্ব আর ইলেক্ট্রিকাল জিনিসপত্রে ইউজ হয়। এর বিক্রির ওপর অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে।"

অধিরাজ একটু ভেবে বলে, "সত্যিই লেভেলের লোক। সমস্ত চোরা কারবারের হদিশ জানে। কোথায় গেলে ইললিগ্যালি কেরোসিন কেনা যাবে, কোথায় টায়ার পাওয়া যাবে, প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঘুমের ওষুধ কারা বিক্রি করে, হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড চোরা-গোপ্তায় কোথায় বিক্রি হয়, সব তার নখদর্পণে ডক্। বলেছিলাম না! এ লোকটা 'র' এজেন্টের থেকেও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব এমনকি পুলিশ অফিসারও হতে পারে! আমাদের ডিপার্টমেন্টের লোক হলেও আমি অবাক হব না। একদম আঁটঘাট বেঁধেই নেমেছে!"

"হুম।"

তিনি চিন্তিত স্বরে বলেন। এতক্ষণ ধরে ক্ষতটাকে সযত্নে পুরোপুরি ওয়াশ করছিলেন। এবার তুলো, বেটাডিন সরিয়ে রেখে বললেন, "ক্লিন হয়ে গিয়েছে। আহেলি, এবার স্টিচ মেরে দিয়ে ভালো করে ড্রেসিং করে দাও।"

আহেলির নাম শুনেই অধিরাজ হাঁ হাঁ করে ওঠে, "আবার মিস্ মুখার্জি কেন? আপনিই করে দিন না!

"মিস্ মুখার্জি কেন মানে?" ডঃ চ্যাটার্জি ভ্রূকুটি করেছেন, "তোমার মিস্ মুখার্জিতে এত অ্যালার্জি কেন? উনি শুধু স্টিচ করে ড্রেসিং করে দেবেন। তোমায় মারবেন না। এসব কাজ মেয়েরা ভালো পারে।"

"আপনিও ভালো পারেন।" অধিরাজ নাছোড়বান্দা, "আপনিই টুকটুক করে স্টিচটাও মেরে দিন।"

"আমি কি তোমার প্রাইভেট নার্স?" তিনি ধমকে উঠলেন, "যখন বলেছি আহেলি করবে, তখন আহেলিই করবে।"

অগত্যা। তারপর থেকেই চলছে পর্দা কাণ্ড। পর্দে মে রহনে দো, পর্দা না উঠাও! আহেলি যতবার তাকে উর্ধাঙ্গ অনাবৃত করতে বলছে, ততবারই সে পর্দাটাকে আরও চেপে পেঁচিয়ে ধরছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতস্থান স্টিচ করবে কী করে! ওদিকে আহেলির নরম হাত তাকে স্পর্শ করলেই সে নড়েচড়ে উঠছে। মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট, অস্বস্তি হচ্ছে। কিন্তু সেটা বলতেও পারছে না আবার সইতেও পারছে না! আহেলির শত অনুনয়ে, বিনয়ে, ধমকেও কাজ হচ্ছে না! বেশ কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আহেলি কাতর দৃষ্টিতে ডঃ চ্যাটার্জির দিকে তাকায়, "স্যার, উনি কিছুতেই কথা শুনছেন না!"

"হ্যাত্তেরি!"

এতক্ষণে ডঃ চ্যাটার্জির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। তিনি একটানে অধিরাজের অঙ্গবস্ত্রটা খুলে নিলেন। অধিরাজ প্রায় লাফিয়েই উঠতে যাচ্ছিল তার আগেই মোক্ষম একটা ধমক খেল, "চু-প! একদম চুপ করে বসে থাকো! দরকার পড়লে নিজের বউয়ের সামনে ঘোমটা টেনে, বোরখা পরে বা বস্তায় ঢুকে বসে থেকো। কিন্তু ডাক্তারদের সামনে তোমার ট্যাঁ ফোঁ চলবে না চাঁদু। বেশি লাফালাফি করলে নীচেরও পর্দাফাঁস করে দেব!"

এরকম হুমকি দিলে আর কিছু করার থাকে না! ওপরের পর্দাটা সরে যেতেই প্রকট হল ঈশ্বরের ঝলমলে অপূর্ব কারুকার্য। অর্ণব আড়চোখে দেখল, আইভি ফের ঘামতে শুরু করেছে। এ কী ভয়ংকর সুন্দর ভাস্কর্য। সলমন খান, হৃত্বিক রোশন বা জন আব্রাহাম

দেখলেও লজ্জা পাবে। তার সামনে বুঝি লজ্জায় মুখ নীচু করে বসে আছে মাইকেল এঞ্জেলোর 'ডেভিড'! এ দেহ যে কোনো ভাস্করের স্বপ্ন হতে পারে। লজ্জাবনত এ মুখ কোনো দেবশিশুর। শিল্পীদের জন্য একেবারে আইডিয়াল মডেল। সৌন্দর্য ও যৌবনের শিখরে থাকা গ্রীক ভাস্কর্য। সে চোখ সরাতে চায়, কিন্তু কোন এক চৌম্বকশক্তিতে তার দৃষ্টি ওদিকেই আটকে গিয়েছে। আইভির বেহাল অবস্থা দেখে আহেলি গম্ভীর হয়ে অধিরাজকে যেন একটু গার্ড করে দাঁড়ায়। আইভি এবার একটু বিব্রত হয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছে।

অর্ণব মনে মনে হেসে নিশ্চপেই বাইরে বেরিয়ে গেল। স্যার এবার সত্যিই বিপদে পড়েছেন। ভাগ্য ভালো, কৌশানী বোসও এখানে উপস্থিত নেই। থাকলে ওঁর কপালে দুঃখ ছিল। কিন্তু ডাক্তারদের সামনে সে-ও স্যারকে সাহায্য করতে পারবে না। তার চেয়ে এই ফাঁকে ওঁর বাড়ি থেকে জামাকাপড়ের একটা সেট নিয়ে আসা ভালো। নয়তো উনিই এরপর বলবেন, "অর্ণব, আমি কি আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টা টারজান বয় হয়েই কাটাব?" যতক্ষণ ওঁর শুশ্রুষা চলছে, তার মধ্যেই জাস্ট যাবে আর আসবে সে! "ডক্।"

অধিরাজ প্রায় পাতাল প্রবেশ পারলে বাঁচে। তার অনাবৃত কাঁধের ওপর আহেলির নরম আঙুল নড়ছে চড়ছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি জীবনে সে প্রথমবার টের পেল। সেলাই ব্যাপারটা যন্ত্রণাদায়কও বটে। ব্যথায় মাঝেমধ্যে তার মুখ কুঁচকে যাচ্ছে। তবু কোথায় যেন একটা আরামের অনুভূতিও তিরতির করে বইছে। সে সেটাকে সজোরে অস্বীকার করার জন্য প্রসঙ্গান্তরে গেল, "আপনি মার্ডার ওয়েপনের কোনো হদিশ পেলেন?"

ডঃ চ্যাটার্জি হতাশভাবে মাথা নাড়েন, "কিস্যু বুঝতে পারছি না রাজা! যতক্ষণ না ক্রোমাটোগ্রাফির ফুল রিপোর্ট পাচ্ছি কিছু বলা মুশকিল। প্রথম দিকে ভাবছিলাম কোনো অ্যাসিডের ধোঁয়া মার্ডার ওয়েপন হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে শুধু শ্বাসনালী নয়, গোটা দেহটাই অ্যাফেক্টেড হবে। বেছে বেছে ওইটুকুই কেন পুড়ল! নার্ভ এজেন্টগুলোও এভাবে কাজ করে না। একবার ভেবেছিলাম ক্লোরিন বুঝি। ক্লোরিন গ্যাস হিসাবে অসম্ভব বিধ্বংসী। কিন্তু ক্লোরিনের যা ভয়াবহ গন্ধ! ভিকটিমদের নাকের কাছে কেউ ক্লোরিন ধরলে তারা আগেই টের পেয়ে পালিয়ে যেতেন। তাছাড়া বন্ধ ঘরে ক্লোরিনই বা আমদানি করবে কী করে? ভিকটিমরা নিশ্চয়ই সবাই একই লোকেশনে ছিলেন না! কেরোসিন আর টায়ার না-হয় পরে প্রয়োজন পড়েছে। কিন্তু তার আগে একাধিক ক্লোরিন গ্যাসের কন্টেনার ঘাড়ে করে খুন করতে যাওয়া মোটেই ভালো আইডিয়া নয়। তোমরা কি ক্লোরিনের গন্ধ পেয়েছিলে? কিংবা কড়া ব্লিচিং পাউডারের?"

"না।" সে মাথা নাড়ে, "ওখানে শুধু পোড়া মাংস আর চড়া কেরোসিনের গন্ধ আসছিল। তবে ডক্, ঘর কিন্তু বন্ধ ছিল না। বরং এই শীতের মধ্যে সব জানলা খোলা দেখে আমরা অবাকই হয়েছিলাম। এমন নয় তো যে ক্লোরিনটা জানলা খুলে দেওয়ার ফলে বেরিয়ে গিয়েছে?"

"উঁহু।" তাঁর মুখে প্রবল চিন্তার ছাপ, "ক্লোরিন অত সহজে যায় না। ও গ্যাসটা ভীষণ ভারি। তুমি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অসোউইক ফোর্টের কেসটা জানো কিনা জানি না। জার্মানরা ক্লোরিন, ব্রোমিনের সঙ্গে আরও কিছু বিষাক্ত গ্যাস মিশিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল অসোউইক ফোর্টের সামনে। একা ক্লোরিন বা ব্রোমিন নয়, সঙ্গে আরও কিছু ছিল যা জার্মান সরকার কখনও প্রকাশ করেনি। ভেবে দেখো, একটা গোটা ফোর্ট যেটা মোটেই পুরোপুরি বদ্ধ জায়গা নয় সেখানে এই ক্লোরিন-ব্রোমিনের মিক্সচার গিয়ে লোকগুলোকে জীবন্তই পুড়িয়ে মেরেছিল। জার্মান সেনারা কেমিক্যাল অ্যাটাকটা এমনভাবেই করেছিল যাতে গোটা মিক্সচারটা বাতাসের জলীয় বাষ্প আর হাইড্রোজেনের সঙ্গে রি-অ্যাক্ট করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে। হতভাগ্য রাশিয়ান সেনারা ক্লোরিনের ক্লাউডটা দেখতে পর্যন্ত পেয়েছিল। কারণ গোটা ব্যাপারটা দিনের আলোতেই ঘটেছিল। জার্মানরা হাওয়ার গতিমুখ অসোউইক ফোর্টের দিকে সেটা বুঝেই একেবারে নিখুঁত ক্যালকুলেশনে কনটেনার থেকে গ্যাস রিলিজ করেছিল। রাশিয়ানরা বুঝতে পেরেছিল যে গ্যাস অ্যাটাক হয়েছে, কিন্তু ওদের

ক্লোরিন বা ব্রোমিন সম্পর্কে বিশেষ ধারণা ছিল না। তাই ওরা ভেজা রুমাল মুখে বেঁধে নিয়েছিল বাঁচার জন্য। এতে ফল হল উলটো! ভিজে রুমালের জল গ্যাসের মিশ্রণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পিওর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বাষ্প তৈরি করছিল। এমনিতেই ওই গ্যাসটা শুধু জলীয় বাষ্পই নয়, মানুষের দেহের জলীয় অংশের সঙ্গে বিক্রিয়া করেও দেহের ভেতরে ভেতরেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে। বিশেষ করে খোদ লাংসের ভেতরের ফ্লুইডটাই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। সেক্ষেত্রে ভেতরের সবকিছু জ্বলে পুড়ে মরতে কিছুটা হলেও সময় লাগত। ভেজা রুমালের দৌলতে মৃত্যুটা আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল। বেচারা সেনারা প্রত্যেকটা শ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নয়, হাইড্রোক্লোরিকের বাষ্প ডাইরেক্ট ফুসফুসে ভরেছিল! এবার অবস্থাটা একবার বুঝে দেখো। যদি ক্লোরিন হালকা হত তবে হাওয়ার সঙ্গে অসোউইকের ওপর দিয়ে চলে যেত না? তাতে ক্ষতি হলেও অতটা ফ্যাটাল হত না। অলমোস্ট রাশিয়ানরা জীবন্তই অ্যাসিডে পুড়ছিল। গ্যাসটা এতটাই ভারি যে সহজে ফোর্ট থেকে নড়েনি। কিছুক্ষণ পরে জার্মানরা যখন ঢুকল তখন ওদেরও গ্যাস মাস্ক পরতে হয়েছিল....।”

এবার উত্তেজনায় অধিরাজ প্রায় লাফিয়েই ওঠে, “এ তো হুবহু বার্নিং শিখের মোডাস অপারেন্ডি! সেইরকমই ভেতরে ভেতরে একটু একটু করে ফুসফুসের পুড়ে যাওয়া! এখানেও তো তাই হয়েছে! এ আপনার ওয়ার্ল্ডওয়ার ওয়ানের ক্লোরিন আর ব্রোমিনের মিক্সচার নয়তো?”

“নাঃ।” তিনি মাথা নাড়লেন, “সেটা নয়। যদি হত তবে তোমাদের মদন ক্রাইম সিনে গিয়ে পড়েও বেঁচে থাকত না। ওর কিংবা তোমাদের মুখে তখন গ্যাস মাস্ক ছিল না। যতই জানলা খোলা থাকুক, ক্লোরিন এতটাই ভারি গ্যাস যে সহজে নড়ার নাম করে না। কিছুটা বেশ কিছুক্ষণ স্পটেই থেকে যায়। তার ওপর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই মার্ডার ওয়েপনল্টা ক্লোরিন-ব্রোমিনের জগাখিচুড়ি— তাহলেও এই শীতে হাওয়ায় জলীয় বাষ্প ততটা থাকবে না। যদি তাও থাকে, তবু ক্লোরিনের ভয়াবহ গন্ধ আর সবুজাভ হলদেটে রং দেখেই যে কেউ প্রাথমিক ইরিটেশনে আর ভয়ে পালিয়ে যাবে। যারা মারা গিয়েছেন, তাদের অসোউইক ফোর্টের সেনাদের মতো একা কুম্ভ হয়ে কেল্লা পাহারা দেওয়ার দায় ছিল না। তারা চোখের সামনে দেখছেন একটা ভয়ানক সবজে হলুদ ধোঁয়া তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে তীব্র ক্লোরিনের গন্ধ, অথচ কেউ নকল বুদিগড় ছেড়ে পালানোর চেষ্টাও করলেন না! তোমরাও গ্যাসটাকে দেখলে না, গন্ধ পেলে না, এটা কী করে সম্ভব! কিছুটা ক্লোরিন ডেফিনিটলি তখনও থাকত। আর কেরোসিনের গন্ধ ওই ভয়াবহ গন্ধকে চাপা দিতে পারে না। সবচেয়ে যেটা চিন্তার কারণ জার্মানরা ক্লোরিন-ব্রোমিনের কেমিক্যাল অ্যাটাক করার পরও ফোর্টটাকে জিততে পারেনি। রাশিয়ান সেনারা শেষপর্যন্ত জ্বলে পুড়ে মরলেও জার্মানদের হারিয়ে দিয়েছিল!”

“বলেন কী! সে কী করে সম্ভব!”

অধিরাজের বিস্ময় দেখে ডঃ চ্যাটার্জি একটু হাসলেন, “ওখানে তোমার মতো কিছু তেঁএটে পাজি রাশিয়ান সেনা তখনও টিকে ছিল। তারা ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে গলে গেলেও তখনও বেঁচে ছিল। ক্লোরিন ব্রোমিনের এফেক্টে তাদের চোখ, নাক, মুখ দিয়ে ভয়াবহ রক্তপাত হচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই তারা একেবারে রাইফেল নিয়ে হা রে রে রে করে লাফিয়ে পড়েছিল জার্মানদের ওপরে। জার্মানরা ভাবতেই পারেনি ওই কেমিক্যাল অ্যাটাকের পরও দুর্গের ভেতরে কেউ বেঁচে থাকতে পারে! ওদের ক্যালকুলেশনে এই ভুলটাই হয়েছিল। কতক্ষণে সবাই মরবে সেই টাইমিংটা ঠিকমতো হিসেব করেনি। তার ওপর ওই মূর্তি। চোখ, নাক থেকে রক্ত পড়ছে, মুখের মাংস গলে গিয়েছে, কীরকম খোলতাই রূপ একবার কল্পনা করো। জার্মানরা ভেবে বসল, এরা মানুষই নয়, বরং আনডেড আর্মি। আর্মিম্যানদের ভূত বা জম্বি! তখন জম্বি কনসেপ্টটা প্রথম এসেছে আর সদ্য ফেমাস হয়েছে। ফোর্ট জয় করবে কী! উলটে জম্বির ভয়ে নিজেরাই পালানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর পালাতে গিয়ে

নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই উলটে আটকে গেল। সেই ফাঁকেই যতজন রাশিয়ান সেনা ছিল সবাই মিলে ওদের মারতে শুরু করল! যুদ্ধটা জার্মানি হেরেছিল। এটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ইতিহাসে 'আনডেড আর্মি অ্যাটাক' বা 'অ্যাটাক অব দ্য ডেড মেন' নামে বিখ্যাত। পারলে পড়ে নিও।"

"তার মানে ক্লোরিন-ব্রোমিন কেমিক্যাল অ্যাটাক হওয়ার পরও লোকগুলো নড়াচড়া করতে পারছিল। ইনফ্যাক্ট মারামারিও করার শক্তি ওদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল।"

"হ্যাঁ রাজা।" ডঃ চ্যাটার্জি বললেন, "শুধু তাই নয়, ওদের গোটা সর্বাঙ্গ পুড়ে গিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ওসব কিছুই হয়নি। আর ক্লোরিন-ব্রোমিন পাওয়ারফুল ওয়েপন হলেও ডিটেক্টেড্। সহজেই ধরা পড়ে যায়। জানলা খুলে দিয়েও তুমি ও মালটাকে পুরোপুরি বাইরে বের করতে পারবে না। তাছাড়া এই জাতীয় কেমিক্যাল ওয়েপনে ভিকটিমদের লাংস, ল্যারিংস ইনস্ট্যান্ট পোড়ে না। একটু একটু করে গোটা ঘটনাটা ঘটেছে। অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে একঘণ্টা ওরা বিষাক্ত ধোঁয়ার মধ্যে ছিলেন। ক্লোরিন-ব্রোমিনের ক্ষেত্রে নিতান্তই মরার শখ না হলে কেউ অতক্ষণ বসেই থাকবে না। ওই গ্যাসটা ডেঞ্জারাস হলেও ফাইট ব্যাক করার সুযোগ দেয়, মানুষকে অ্যালার্ট করে।" তিনি হতাশভাবে মাথা নাড়লেন, "এটা কী জিনিস এখনও বুঝতে পারছি না। কিন্তু এইটুকু বুঝতে পারছি যে ক্লোরিনের চেয়েও বিধ্বংসী। সার্ভাইভাল ফ্যাক্টর খুব কম। হয় এটার কোনো গন্ধই নেই, নয়তো এত স্বাভাবিক গন্ধ যে কেউ এটার অস্তিত্ব টেরই পাননি। যতক্ষণে টের পেয়েছেন, ততক্ষণে কিছু করার নেই! সাইলেন্ট কিলার। ক্লোরিনের মতো জানান দেয় না, অথচ আরও মারাত্মক। অ্যাসিডের ধোঁয়াও নয়।"

অধিরাজ একটু ভেবে বলল, "গ্যাস হওয়াও মুশকিল ডক্। গ্যাসের কন্টেনার, কেরোসিনের কন্টেনারের মতো স্বাভাবিক জিনিস নয়। সেটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে কেউ খুন করতে যাচ্ছে, অথচ কেউ কিচ্ছু দেখল না, এটাও ইম্পসিব্‌ল্! যদি কোনোভাবে নিয়েও যায়, তবে ঘরের মধ্যে একেবারে নিঃশব্দে ঢুকিয়ে দিল কী করে? এই শীতে কেউ দরজা জানলা খুলে ঘুমোয় না যে জানলা দিয়ে গ্যাস ঢোকাবে! আর একটা অপশনও ছিল। এসি ডাক্টের মাধ্যমেও ঢোকানো সম্ভব। কিন্তু এখানেও সেই একই প্রবলেম। শীত! সে যতবার খুনগুলো করেছে হয় সবে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে, নয় হাড় কাঁপানো শীত। এসি চলার চান্সই নেই। তবে গ্যাস ঘরের মধ্যে ঢুকল কোন্ পথে। যদি বা কোনো অলৌকিক উপায়ে ঢুকেও থাকে তবে বেছে বেছে বৃদ্ধ মানুষটিকেও অ্যাটাক করল না কেন? এটা গ্যাস। মিসাইল বা অন্য কোনো ট্রেইন্ড ওয়ে নয়, যে যার দিকে টার্গেট করা হবে তাকে গিয়েই হিট করবে!" সে মাথা নাড়ল, "নাঃ ডক্। মিলছে না।... কিছুতেই... আউচ!"

শেষ শব্দটা অবশ্য ডঃ চ্যাটার্জির উদ্দেশ্যে নয়। আহেলি মুখার্জি স্টিচ দিতে দিতেই বোধহয় একটু জোর দিয়ে ফেলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই ব্যথা লেগেছে। সে মুখ কুঁচকে বলল, "মিস্ মুখার্জি আপনি ডিসেকশন টেবিলে মড়া সেলাই করছেন না! আমি এখনও বেঁচে আছি।"

আহেলিও এবার মেজাজের সঙ্গে বলল, "আমি কী করব? আপনি যদি এরকম ব্রেকডান্স করতে থাকেন তবে স্টিচটা দেব কী করে? আমরা মৃত মাইকেল জ্যাকসনের পোস্টমর্টেম করতে পারি। কিন্তু জ্যান্ত এবং নৃত্যরত মাইকেল জ্যাকসনকে স্টিচ মারার ম্যাজিক আমার অন্তত জানা নেই।"

বকা খেয়ে অধিরাজের মুখ বিষণ্ণ হয়ে যায়, "আপনি এমনিতে সবসময়ই পুতুলের মতো শান্ত ও সুইট থাকেন। কিন্তু আমার ক্ষেত্রেই সবসময় 'অ্যাংরি বার্ডসের' অবতার ধরেন কেন মিস মুখার্জি? আমার কী অপরাধ...!"

বলতে বলতেই সে হঠাৎ থেমে গেল। তার সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ধরা পড়েছে। ঠিক আওয়াজ নয়, হালকা সুর! কেউ যেন ফরেনসিক ল্যাবের ঠিক সামনের

গলিটা দিয়ে মিষ্টি সুরে শিস দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। না, ভুল হল! চলে যাচ্ছে না। শিস দিতে দিতে এদিকেই আসছে। সুরটা এখনও অস্পষ্ট। তবু খুব চেনা চেনা ঠেকছে। অধিরাজ বিড়বিড় করে বলে, "এ কী!"

"কীসের কী!" আহেলি বিরক্ত হয়ে উঠেছে, "আপনি একটা মিনিটও কি স্থির হয়ে বসতে পারেন না...!"

"চুপ...!"

অধিরাজ এবার ডঃ চ্যাটার্জির দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিতে তাকায়, "ডক্, আমি যা শুনতে পাচ্ছি আপনিও কি তাই শুনছেন?"

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। ডঃ চ্যাটার্জিও তখন পাথরের মূর্তির মতো স্থির!

তাঁর মুখেও ভয়ের ছাপ প্রকট। যেন প্রাণহীন একটা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টিতে ভয়। মুখটা ফ্যাকাশে। একদম দমবন্ধ করে আছেন। যেন শ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ। অভিব্যক্তিতেই স্পষ্ট যে সুরটা তিনিও শুনেছেন! আস্তে আস্তে সুরটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে এদিকেই। স্পষ্ট হচ্ছে তার চলন। অধিরাজ এবার নির্ভুলভাবে শুনতে পেল সেই সিগনেচার টোন, "গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই... কিসকো খবর কৌন হ্যায় উয়ো... অনজান হ্যায় কোই....।"

কাঁধের স্টিচটা তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু অধিরাজ অবিকল একটা শিকারী লেপার্ডের মতো লাফিয়ে উঠে দৌড় মারল সিঁড়ির দিকে। ততক্ষণে সংবিত ফিরে পেয়েছেন ডঃ চ্যাটার্জিও। তিনিও একটিও শব্দ খরচ না-করে তার পেছন পেছন ছুটলেন! আহেলি আর আইভি একবার পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর তারাও একমুহূর্ত নষ্ট না করে দৌড়ে গেল লিফটের দিকে। পুরুষ দু-জন উত্তেজনার চোটে সিঁড়ি দিয়েই দৌড়ে নেমে গিয়েছে। তাই লিফটের দিকে ফিরেও তাকায়নি। মেয়েরা লিফটে উঠেই তাড়াতাড়ি গ্রাউণ্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দেয়। লিফট একটুও বিলম্ব না করে নীচের দিকে নামতে শুরু করল।

অধিরাজ প্রায় চিতার মতো ক্ষিপ্র লাফ মেরে তিনতলার সিঁড়ি মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই ভেঙে নীচে নেমে আসে। সে যে ইনজিওর্ড তা দেখলে এখন কেউ বলবে না। তার খেয়ালই নেই যে এখনও তার উর্ধাঙ্গ অনাবৃত। ডঃ চ্যাটার্জি স্বাভাবিকভাবেই তার পেছনে দৌড়োতে দৌড়োতে হাঁপিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর বয়েস হয়েছে। ফিটনেস ও চেহারার দিক দিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে আছেন। সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়েই দম বেরিয়ে গিয়েছে। কোনোমতে শ্বাস টানতে-টানতে বললেন, "রাজা! কাঁধ সামলে... কাঁধ সামলে...!"

তাঁর কথা অধিরাজের কান অবধি পৌঁছয়নি। সে জ্যা মুক্ত তীরের মতো সটান নেমে গিয়েছে রাস্তায়। ল্যাবের দ্বারপাল তাকে এই অবস্থায় দেখে হাঁ! এরকম ড্রেসকোডে কখনও অধিরাজ ব্যানার্জিকে দেখতে পাবে তা বোধহয় সে ভাবেনি। অধিরাজ পাগলের মতো একবার যেদিক দিয়ে সুর ভেসে এসেছিল সেদিকেই ছুটে গেল। কিন্তু তখন সেখানে কেউ নেই! শুধু শূন্য জনহীন রাস্তার ওপর দিয়ে কুয়াশার স্তর আস্তে আস্তে ভেসে যাচ্ছে। রাস্তার দু-পাশের গাছগুলো মৃদু হাওয়ায় শিরশির করে উঠছে। এছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই। লোকটা যেন স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে কোথাও কাউকে খুঁজে না পেয়ে অধিরাজ ফের তীরবেগে দৌড়ে এল প্রহরীর কাছে। প্রায় উন্মত্তের মতো জিজ্ঞাসা করল, "ওই লোকটা কোথায় গেল? অ্যাঁ?...ওই লোকটা...?"

দ্বারপাল একবার আপাদমস্তক অধিরাজকে দেখে নেয়। সুগঠিত পেশল বুকের প্রতিটা ভাঁজে এই শীতেও চকচক করছে স্বেদবিন্দু। কোমর থেকে পা অবধি সাউথ ইন্ডিয়ানদের লুঙির মতো একটা পর্দা পেঁচানো। কাঁধের স্টিচটা লাফালাফির চোটে কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। মাথার চুল অবিন্যস্ত! সে সাহেবের এই মূর্তি দেখে কী বলবে বুঝে পায় না। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কোন্ লোকটা স্যার?"

"আরে... একটু আগেই শিস দিতে দিতে গেল!" সে গর্জন করে ওঠে, "তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে? দেখতে পাওনি?"

সে আরও নার্ভাস হয়ে যায়, "দেখব না কেন? ওই সর্দারজি তো? সরকার স্যার বেরিয়ে গেলেন তার আগে থেকেই তো এখানে ঘুরঘুর করছিল। বোধহয় গাড়ি ঠিক করতে এসেছিল।"

"গাড়ি ঠিক করতে এসেছিল মানে?" তার হৃৎপিণ্ড বুঝি একটা বিট মিস করল, "তুমি ওকে অ্যালাউ করলে কেন? কার গাড়ি ঠিক করছিল? পারমিশন ছিল? সরকার স্যার বেরিয়ে গেলেন! কখন বেরিয়েছেন? কোথায় গিয়েছেন?"

গেটকিপার এবার একটু অপরাধীর মতো জানায়, "স্যার, আমি কয়েক মিনিটের জন্য চা খেতে গিয়েছিলাম। তখনই লোকটা এসেছিল বোধহয়। আমি এসে দেখি ও সরকার স্যারের গাড়ি ঠিক করছে। আমি ভাবলাম স্যারই বোধহয় সর্দারজিকে ডেকেছেন। হয়তো ওঁর গাড়িতে কোনো কিছু প্রবলেম আছে। লোকটার হাতে মেকানিকের টুল বক্স ছিল। তারপরই সরকার স্যার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি ভেবেছি মেকানিক হয়তো...!"

আরও কিছু বলার আগেই তার গালে সপাটে এসে পড়ল জোরালো বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। অবর্ণনীয় রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল অধিরাজ, "ই-ডি-য়-ট!"

কথাটা শেষ না-করেই সে ফের দৌড়োল নিজের বাইকের দিকে। ততক্ষণে ডঃ চ্যাটার্জিও কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছেছেন পার্কিং লটে। সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। হাঁপানির রোগীর মতো কোনোমতে হাঁসফাঁস করতে করতে বললেন, "রাজা, তোমার কাঁধ...!"

তাঁর দিকে প্রায় বাঘের দৃষ্টিতে তাকায় অধিরাজ। চাপা অথচ রাগী স্বরে জানতে চায়, "অর্ণব কখন বেরিয়ে গিয়েছে আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ, দেখলাম তো।" তিনি জানালেন, "ও বোধহয় তোমার বাড়ির দিকেই গেছে। বেশিক্ষণ হয়নি। সম্ভবত এক্সট্রা জামা কাপড় আনতেই...।"

"শি-ট্... শি-ট্...!"

তার স্পোর্টস বাইক মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল। সে নৃশংস চোখে দ্বারপালের দিকে তাকায়, "তোকে তো কাল দেখে নেব।"

আর একটা মুহূর্তও খরচ না করে প্রায় আলোকবিন্দুর গতিবেগে হুঁশ করে বেরিয়ে গেল লাল সাদা স্পোর্টস বাইকটা। অধিরাজের নগ্ন বুকে পিঠে শীতের হাওয়া কয়েকশো তীর মারছে! চুল এলোপাথাড়ি উড়ছে। সুগঠিত কাঁধ বেয়ে লাল রক্তের ধারা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে বাইকের সিটে। কিছুটা হাত ছুঁইয়েও পড়ছে টপটপ করে। কিন্তু কোনোদিকেই তার খেয়াল নেই! যন্ত্রণাবোধও নেই বোধহয়। চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে কানপুরের সেই হতভাগ্য পুলিশ অফিসারের ভেঙেচুরে, পুড়ে কাঠ হয়ে যাওয়া গাড়িটার ছবি! গাড়িটার জোরদার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তার সঙ্গে ব্লাস্টও করেছিল। অফিসারের দেহটাও প্রায় পাওয়াই যায়নি। স্রেফ পাওয়া গিয়েছিল কয়েকটা টুকরো...!

সে আফশোশে মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে ফেলল। নিজেকে ভয়াবহ মূর্খ মনে হচ্ছে! লোকটা বদলা নেবে সেটা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি....!

দাঁতে দাঁত চেপে বাইকটায় সর্বোচ্চ স্পিড তুলল অধিরাজ। এই মুহূর্তে বাইকের স্পিড দুশো কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে আরও উপরের দিকে চলেছে। প্রায় উড়ছে! কাঁধে প্রচণ্ড যন্ত্রণা! তবু অগ্রাহ্য করল। সে জানে এই যন্ত্রণা তার কাছে কিছুই নয় যে যন্ত্রণা বার্নিং শিখ তাকে দিতে চায়! কিছুতেই তাকে সফল হতে দেবে না অধিরাজ। আজ যদি মরেও যায়, তবু সময়মতো তাকে পৌঁছোতেই হবে অর্ণবের কাছে! বোকা ছেলেটা এভাবে না বলে একা বেরিয়ে গেল!

প্রায় সর্বহারার মতো সে উচ্চারণ করল, "অর্ণব!"

*

(৯)

রাতের শুনশান সড়কে গাড়িটা তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছিল গন্তব্যের দিকে। এখন রাস্তা একদম ফাঁকা। আশেপাশে আর কোনো যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। দূর দূরান্ত অবধি অন্য কোনো গাড়ি কিংবা কোনো মানুষের দেখা নেই। শুধু কখনও কখনও একটা বা দুটো মালবাহী ট্রাক রাতের রাস্তা বেয়ে হুশহাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া কোথাও আর কোনো আওয়াজ নেই।

এখন ঘড়িতে প্রায় তিনটে বাজতে যায়। রাত্রি এখন শেষপ্রহরের দিকে। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে একটু বেশিই স্পিড তুলেছিল অর্ণব। এখন অধিরাজের মা-বাবা হয়তো জেগে থাকবেন না। সে অবশ্য ওঁদের যোগাযোগ করেনি। এসব বিষয়ে অধিরাজের ফেভারিট ভৃত্য 'হিস্টো' ওস্তাদ। তাকে দিনের যে-কোনো সময়েই পাওয়া যায়। এখনও অর্ণব তাকেই ফোন করেছিল। যথারীতি হিস্টো জেগে আছে। সে বলেছে দাদার পোষাক রেডি করে রাখবে। কিন্তু সমস্যা একটাই। কাজ হবে ঠিকই, তবে হিস্টোর বকা শোনাটা মাস্ট। তার 'দাদা'টি যে পয়লা নম্বরের অপদার্থ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন, বাচ্চাদের মতো তারও পেছনে কীভাবে সর্বক্ষণ ট্যাঁক ট্যাঁক করতে হয়, কোনোদিকেই তার খেয়াল নেই, এসব বিষয়ে হিস্টোর দশ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণ শোনাটা বাধ্যতামূলক। কোনো উপায় নেই। স্বয়ং অধিরাজ তো বটেই, এমনকি তার বাবা-মা-ও এই লোকটিকে সমঝে চলেন। এ বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যই হিস্টোর প্রাইভেট প্রপার্টি। তার অধিকারবোধও তেমনই প্রখর। সুতরাং সি.আই.ডি. হোমিসাইডের অফিসাররাও তার মেজাজ বুঝে চলেন। এমনকি এডিজি শিশির সেন একবার ভুল করে জুতো পরেই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন বলে হিস্টো তাঁকেও পাঁচকথা শুনিয়ে দিয়েছিল। প্রায় ধমক দিয়েই বলেছিল, "আপনার লজ্জা করে না, বাড়ির ভেতরে জুতো পরে ঢুকে পড়েছেন? আপনি কোথাকার লাটসাহেব যে জুতো খুলে ঢুকতে পারেন না!" বেচারি শিশির সেনের প্রায় 'সসেমিরা' অবস্থা। রীতিমতো লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিলেন, "স্যরি!"

উত্তরে আরও একটা ধমক, "এই হল সাহেবসুবোর বদমায়েশি বুদ্ধি! পোথমে ভুলভাল কাজ করবেন, তারপর সরি বলে হাত কচলাবেন!"

শিশির সেন ভয়ের চোটে আর কোনো কথাই বলেননি। পরে শুধু অধিরাজকে বলেছিলেন, "ব্যানার্জি, তোমাদের বাড়িতে যে কাং ফু প্যান্ডা থাকেন সেটা তো বলোনি!"

অর্ণব জানে তাকেও একগাদা কথা শুনতে হবে। তবে সেটা ধর্তব্য নয়। এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিরাজের জামা-কাপড়গুলো। বেচারি স্যার আর কাঁহাতক 'মোগলি'র ড্রেসে পোজ মেরে আহেলি আর আইভি-র উৎসুক চারচোখের সামনে বসে থাকবেন। লোকটাকে ভগবান রূপ ঢেলে দিয়েও বড়ো বিপদে ফেলেছেন। এখনও সে ওটাকেই নিজের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ মনে করে। সর্বনাশিনী কেসের অপমানের থেকেও বড়ো ক্ষত সার্জিক্যাল-স কিলারের মলেস্টেশন। একজন নারীর ক্ষেত্রে সহানুভূতি দেওয়ার জন্য গোটা সমাজ আছে। কিন্তু একজন পুরুষের মর্মযন্ত্রণা ভাগ করে নেওয়ার জন্য কেউ নেই। অধিরাজ ব্যানার্জি মেয়েদের চোখে ইপ্সিত পুরুষ। তার পেছনে রূপগুণমুগ্ধ মেয়েদের বিরাট লাইন। শহরের হিরোও বটে। তার প্রত্যেকটা কেস মিডিয়া হাইলাইট করে। অধিরাজের পেছনে রিপোর্টাররা বুম এবং ক্যামেরা নিয়ে ভিড় করে দৌড়োতে থাকে। সে যে একটাও কথা না বলে তার স্বভাবজাত রাজকীয় ভঙ্গিতেই লম্বা পা ফেলে গটগটিয়ে হেঁটে ভিড়কে উপেক্ষা করে চলে যাবে, এটা তারাও জানে। তবু দৌড়োয়। আশপাশ থেকে ভেসে আসতে থাকে আবদার, "স্যার, একটা ফটো... একটা বাইট... একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ...!" তার নামের পাশে 'সুপারকপ', 'সি.আই.ডি.-র হিরো', 'মোস্ট হ্যান্ডসাম কপ', 'হিরো ইন ইউনিফর্ম' ইত্যাদি বিশেষণ বসে ঠিকই। কিন্তু কেউ জানে না, মানুষটা আদৌ ভালো আছে কিনা! কেউ

খবর রাখে না, লাইমলাইটের বাইরে অন্ধকারে এই পুরুষটিই ঠিক কতটা একা ও ক্লান্ত! ,

আর কেউ না জানুক, অর্ণব জানে। সে চোখের সামনে দেখছে অধিরাজের মানসিক লড়াইটা। কীভাবে সে নিজের বিরুদ্ধেই প্রত্যেকদিন লড়ে চলেছে! আগের সেই ভয় থেকে অনেকটা বেরোতে পারলেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেনি। হয়তো গোটা জীবনেও এই রাহুর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই তার। এখনও সে মাঝেমধ্যেই দুঃস্বপ্ন দেখে। অনেক সময়েই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে ঘর্মাক্ত কলেবরে উঠে বসে। তারপর ভোর অবধি একটার পর একটা সিগারেট খেতেই থাকে। যতক্ষণ না ফের ক্লান্তি এসে তাকে অবশ করে দিচ্ছে ততক্ষণ এটাই চলতে থাকে। অনেক সময়ই হিস্টো ভোরে দেখতে পায় ঘুমন্ত অধিরাজের হাতটা খাট থেকে নীচের দিকে ঝুলছে। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট!

এসব কথা হিস্টোর কাছেই শুনেছে অর্ণব। স্বচক্ষেও দেখেছে। আজ যে দু-জনে মিলে প্রায় জড়াজড়ি করে গাড়ির ভেতরে বসেছিল তখনও তার অস্বস্তি অনুভব করেছে। সে তার হাবভাবে প্রকাশ করেনি। কিন্তু তার দ্রুত হৃৎস্পন্দন বলে দিচ্ছিল এই নৈকট্য আবার তাকে তিক্ত অতীতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আজকাল কিছু বিষয়ে অধিরাজ বড়ো বেশিই স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রথম জিনিসটাই হল পোষাক। ভুলবশত বুকের কাছে কোনো বোতাম খোলা আছে কিনা সেটা বারবার চেক করাটা বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে তার। অচেনা কোনো পুরুষ বা নারীর দৃষ্টির সামনে এখনও কুঁকড়ে থাকে। সেই লোকটা এই শীতে দেহের অনেকটা অংশ অনাবৃত করে দুই মহিলার সামনে বসে আছে, এটা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু অর্ণব জানে এটা অধিরাজের কাছে কতবড়ো শাস্তি! এমনিতেই মানুষটা যথেষ্ট সমস্যাতেই আছে। তার মানসিক যন্ত্রণা আর বাড়তে দেওয়া যায় না। সেজন্যই টুক করে বেরিয়ে পড়েছে। জানে এই পরিস্থিতিতে একা রাস্তায় বেরিয়ে পড়াটা বেশ রিস্কি। বার্নিং শিখ শুধু তার ভিকটিমদের নয়, তাদের সুরক্ষা যারা করছে তাদেরও আক্রমণ করে। কানপুরে আর বেঙ্গালুরুতেই তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। স্যার জানতে পারলে তাকে আসতেই দিতেন না। কিন্তু এছাড়া আর উপায় কী! কী করলে মানুষটাকে একটু রিলিফ দেওয়া যাবে সবসময়ই ভেবে চলেছে সে। সবটা তার হাতে নেই। যেটুকু আছে সেটুকু করার জন্য সবরকম রিস্ক নেবে অর্ণব।

ড্রাইভ করতে-করতেই ঘড়ির দিকে আর একবার অধৈর্য দৃষ্টিতে দেখল সে। গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা আরও একটু এগোল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পোষাকের সেটটা নিয়ে ফিরে যেতে হবে তাকে। নষ্ট করার জন্য হাতে অঢেল সময় এখন কারোরই নেই। সুতরাং গতিবেগ আরও একটু বাড়ানো যেতেই পারে।

কিন্তু স্পিড আরও বাড়াতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। স্পিডোমিটারের কাঁটা ঘণ্টায় আশি কিলোমিটার ক্রস করতেই একটা মৃদু অথচ স্পষ্ট বিপিং সাউন্ড পেল সে। ক্ষণিকের বিস্ময়ে একমুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। সেই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে-না কাটতেই লেফট টার্নের মাথায় আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল অর্ণবের। রাস্তাটা যেখানে গিয়ে বাঁ-দিকে বাঁক নিয়েছে ঠিক তার উলটোদিক থেকেই ভীমবেগে ছুটে আসছিল একটা ট্রাক! তার আলোটা এসে পড়েছে চোখে! ট্রাকটা সম্পূর্ণ রং সাইড দিয়ে আসছে। আর একটু হলেই মুখোমুখি সংঘর্ষ হত। ড্রাইভার সময়মতো বুঝতে পেরে শেষমুহূর্তে কাটিয়ে দিয়েছে তাই রক্ষে! ঠিক সেই মুহূর্তে অর্ণবও গাড়িটাকে আপ্রাণ থামাবার চেষ্টা করেছিল। অথচ আশ্চর্য! গাড়ি থামল না! বরং কেমন যেন মাতাল মানুষের মতো বেসামাল হয়ে গেল। কিছু বোঝার আগেই এদিকে ওদিকে বেঁকে যেতে শুরু করল!

ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হতেই অর্ণবের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। ঝট করে মাথা, কান উত্তেজনায় গরম হয়ে গিয়েছে। তার গাড়ির ব্রেক কাজ করছে না! সে পাগলের মতো প্রাণপণে বারবার ব্রেক মারার চেষ্টা করছে! বারবার প্রেস করছে ব্রেকটাকে। কিন্তু এবারও কোনো ফল হল না। অর্ণব নিশ্চিত হল, ব্রেক ফেল হয়েছে। এবার এই দ্রুতগামী চারচাকাকে থামানো কষ্টকর হবে। নিরুপায় হয়ে এবার এমার্জেন্সি ব্রেক মারার

চেষ্টাও করল। আশ্চর্যজনকভাবে সেটাও এখন কাজ করছে না। গাড়ি ক্রমাগতই তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রথমেই যেটা করণীয় তা হল নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করা। অর্ণব নিজেও তা জানে। সে যথেষ্ট ঠান্ডা মাথার মানুষও বটে। অথচ যে মুহূর্তে বুঝতে পারল যে গাড়ি আর তার নিয়ন্ত্রণে নেই, ব্রেক ফেল হয়ে গিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা প্রচণ্ড ভয় তাকে জাপটে ধরল। হয়তো এতটা ভয় সে পেত না যদি না কানপুরের অ্যাক্সিডেন্ট কেসটার ডিটেলস না জানা থাকত। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সন্দেহ করেছিলেন, ওটা আসলে অ্যাক্সিডেন্টই ছিল না। এবং ব্লাস্টটা কোনো বম্বের কারণে হয়েছে। অর্ণবের বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পেটাতে শুরু করল! কে বলতে পারে, তার গাড়ির নীচের অংশেও কোনো বম্ব টিক টিক করছে না! গাড়ির গতিবেগ আশি কিলোমিটার ক্রস করার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্বাভাবিক বিপের শব্দ শুনতে পেয়েছিল না? সেটা কীসের ছিল? তবে কি স্পিডোমিটারের সঙ্গেই জুড়ে আছে বিস্ফোরণের রহস্য!

চোখে দেখতে না পেলেও পুলিশের জাগ্রত ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে বলে দিল, গাড়ির গতিবেগ একশো কিলোমিটার ক্রস করার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির কোনো অংশে লুকিয়ে রাখা অপ্রত্যাশিত ডিভাইস চালু হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ব্রেক কাজ করছে না। কাজ করলেও কোনো লাভ হত না। সে বম্ব স্কোয়াডের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও এইটুকু জ্ঞান আছে যে কাঁটা আশি কিমির নীচে নামলেই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ অবধারিত! কোনোমতেই স্পিড কমানো যাবে না! আর স্পিড না কমালে ব্রেকহীন বেসামাল গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করবেই। ব্রেক ফেল করলেই গাড়ির স্পিড কমিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেই উপায়ও নেই অর্ণবের। যা-ই করুক তার কপালে মৃত্যু নাচছেই। একটা ভয়াবহ বীভৎস মৃত্যু! দুইদিকেই মরণ তার অপেক্ষায় বসে আছে। কোনোভাবে গাড়ির স্পিড নীচে নামলেও মৃত্যু। আবার ব্রেক না কাজ করার দরুণ এত স্পিডে গাড়ি চালালে সামনে সেই একমেবাদ্বিতীয় মৃত্যুই!

গাড়িটা এখন প্রচণ্ড স্পিডে মারমার করতে-করতে এদিকে ওদিকে বেঁকে যাচ্ছে। অর্ণব ভেতরে কুলকুল করে ঘামছে। তার কপালের রগ বেয়ে টপটপ করে ঘামের বিন্দু গড়িয়ে পড়ে। স্টিয়ারিং ধরা হাতের পাতা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। তবু শেষ চেষ্টা করল। কোনোভাবে যদি গাড়ি থেকে বাইরে বেরোনো যায়। ড্রাইভিং সিটের পাশের দরজাটা খোলার আকুলি-বিকুলি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু এ কী! দরজার লক এভাবে জ্যাম হয়ে গেল কখন! দু-হাতে স্টিয়ারিং সামলে পাগলের মতো পা দিয়ে দুমদুম করে লাথি মারছে দরজায়। বাইরে শীত বলে সব কাচ তুলে দিয়েছিল। সে মরিয়া হয়ে এবার কাচ খোলার চেষ্টা করে। খুলছে না তো। অর্ণব অসহায়ের মতো, উন্মাদের মতো একের পর এক লাথি মারছে দরজায়, দরজার কাছে। কিন্তু গাড়িটা বুঝি আপাদমস্তকই ইস্পাত দিয়ে গড়া। হবে নাই বা কেন সি.আই.ডি. অফিসারের গাড়ি, যথেষ্টই মজবুত। অত লাথি খেয়েও দরজা খুলছে না, কাচও ভাঙছে না। যদিও গাড়ির স্টিয়ারিং আর এক্সলেটর সামলে গায়ের সর্বশক্তি প্রয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত স্পেস সে পাচ্ছিল না। ওদিকে গাড়ির ম্যালফাংশন লাইট দানবের চোখের মতো দপদপিয়ে জ্বলছে। কাজ হচ্ছে না, কিছুতেই কাজ হচ্ছে না!

অর্ণব আফশোশে চোখ বুজে ফেলে। আজ আর রক্ষা নেই। মস্তিষ্কও কাজ করছে না। এইটুকু বুঝতে পারছে এই ফাঁদ থেকে আর বেরোনোর উপায় নেই! সে যে চক্রব্যূহে ঢুকে পড়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো রাস্তাই রাখেনি সেই অজ্ঞাত আততায়ী। সব রাস্তাই ডেড-এন্ডে গিয়ে শেষ হচ্ছে। অর্ণবের চোখ আকস্মিকভাবেই ঝাপসা হয়ে আসে। কেউ জানবে না এখানে কী হয়েছিল! পড়ে থাকবে শুধু একটা টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া গাড়ি। কানপুরের পুলিশ অফিসারের তবু দেহাংশ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাও পাওয়া যাবে না। স্যার জানতেও পারবেন না, তার 'স্পেশাল ওয়ান' কীভাবে ধোঁয়া হয়ে গেল। তাঁর জন্যই রিস্ক নিয়ে এত রাতে বাইরে বেরিয়েছিল সে। আর ফেরা হবে না! আর কখনও সেই হাসিমুখের প্রিয়তম মানুষটির কাছে ফিরে যাওয়া হবে না। আর কাউকে

অতিরিক্ত স্মোকিং-এর জন্য বকা দেবে না সে! তার মৃতদেহ শেষ স্পর্শটুকুও পাবে না তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার! এই গাড়িটাই তার কবর হতে চলেছে। এখানেই ছাই হয়ে যাবে অর্ণবের গোটা অস্তিত্ব।

"আই কার্স ইউ... বাস্টার্ড!"

অক্ষম ক্ষোভে চিৎকার করে আততায়ীকে শাপশাপান্ত করল সে। তার হাতদুটো অসহায়ের মতো স্টিয়ারিংটা সজোরে আঁকড়ে ধরল। নিজেও জানে না এখন ঠিক কী করা উচিত! গাড়িটাকে শুধু সোজা রাখা আর স্পিড কমতে না দেওয়ার চেষ্টা করাই ভালো। হয়তো সেই প্রচেষ্টাই তার আয়ু আরও কয়েকটা মুহূর্ত বাড়াতে পারে।

বেশিক্ষণের জন্য না-হলেও আরও অন্তত কয়েক মিনিট! যাতে অন্তত কয়েকটা প্রিয় মুখ সে শেষমুহূর্তে একবার মনে করতে পারে। এ জন্মে আর কখনও তাদের সঙ্গে দেখা হবে না! অর্ণব কখন যে ওদের অজান্তেই নিরুদ্দেশের পথে চলে যাবে, তা তারা জানতে পারবে না! অন্তিম দর্শনের জন্য তার দেহও কেউ খুঁজে পাবে না। এই অন্তিম যাত্রায় সে একা। ভীষণ... ভীষণ একা। তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ বীভৎস মৃত্যুর দিকে...!

গোটা জীবনের স্মৃতি অন্তিম মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল অর্ণবের। মায়ের হাসিমুখ, বাবার আদর, প্রথম সমুদ্র দেখার রোমাঞ্চ, প্রথম পাহাড়ের বিস্ময়, সি.আই.ডি. হোমিসাইডে জয়েন করার মুহূর্ত, প্রথম ব্যর্থতা, প্রথম এডিজি সেনের ভর্ৎসনা, প্রথম সাফল্য, ডঃ চ্যাটার্জির দাঁতখিঁচুনি। তারপর.... তারপর...!

টুকরো টুকরো সমস্ত স্মৃতি একসঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে গোটা মন জুড়ে ফুটে উঠল শুধু একটাই ছবি! এক রূপবান যুবকের দেবশিশুর মতো অপূর্ব নিষ্পাপ হাসি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, ঘণ্টার পর ঘন্টা, মিনিটের পর মিনিট একজনেরই সঙ্গ পেয়েছে সে! মানুষটা জানেও না অবচেতনে বড়ো সত্যি কথাটা তাঁকে বলে দিয়েছিল অর্ণব, 'আমার তো শুধু আপনিই আছেন স্যার!' সত্যি তো! অর্ণবের হৃদয়ে আর কে আছে! সেখানে একটা মানুষেরই তো একচ্ছত্র অধিকার। অথচ কত কথা আজও তাঁকে বলা হয়নি। কত কথা তাঁর কাছে এখনও প্রকাশ করা হয়নি। আর কোনোদিনই প্রকাশ করা হবে না!

রাতের অন্ধকারে গাড়িটা এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছিল। প্রচণ্ড আতঙ্কে সর্বশক্তি দিয়ে স্টিয়ারিং ধরে তাকে সোজা রাখার চেষ্টা করছে অর্ণব। দরজা খুলে বাইরে লাফ মারারও উপায় নেই! দরজা খুলছে না, কাচও নামছে না। তদুপরি যে গতিতে গাড়ি চলছে, তাতে এই স্পিডে বাইরে লাফিয়ে পড়লেও সে মরবে! এত জোরে মাটিতে আছড়ে পড়বে যে তার মাথাটা স্রেফ দু-ফাঁক হয়ে যাবে। ডিভাইডারে পড়লে তো কথাই নেই। বাঁচার কোনো রাস্তাই নেই!

এই পরিস্থিতিতেই সে সভয়ে দেখল আবার একটা বিশালদেহী ট্রাক হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে তারই দিকে। এবার ট্রাক ড্রাইভারের কোনো ভুল নেই। সে রাস্তার সঠিক দিকেই আছে। বরং অর্ণবই বেসামাল হয়ে ভুল দিকে গিয়ে পড়েছে। তীরবেগে দুটো গাড়ি পরস্পরের দিকে একেবারে মুখোমুখি ছুটে যাচ্ছে। ট্রাক ড্রাইভার ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, "এ-ই! সামাল... সামাল...!" অর্ণবের বুকের ভেতর থেকেও কে যেন পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল, "গেল!... গেল...!"

সে অতলান্তিক আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলল। স্টিয়ারিংটাকে সর্বশক্তি দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে উলটোদিকে। গাড়িটা আচমকা একটা গোঁত্তা খেয়ে ঠিক শেষমুহূর্তে সাঁৎ করে সরে গেল ট্রাকটার সাইড ঘেঁষে! ড্রাইভার তেড়ে খিস্তি দিয়ে উঠল, "মরার শখ হয়েছে... বোকা...।"

এ যাত্রা রক্ষা পেল অর্ণব। কিন্তু আর কতক্ষণ! শীতের রাতেও তার সারা দেহ ঘামে ভিজে গিয়েছে। হাতের পেশিগুলো টনটন করছে। গাড়ির স্পিড একচুলও কমানো যাবে না। ওদিকে গাড়িটাও যেন চরম শত্রুতা শুরু করেছে। কিছুতেই সে বাগ মানাতে পারছে না! কখনও এমনভাবে ডানদিকে বেঁকছে যেন এখনই ডিভাইডারে আছড়ে পড়বে। নিরুপায়

অর্ণব আবার কোনোমতে বাঁ-দিকে নিয়ে এলেই ফের রাস্তার পাশের গাছের সঙ্গে বা ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খেতে যাচ্ছে। তার মধ্যেই একের পর এক আসছে স্পিড ব্রেকার। তার ধাক্কায় বেশ কয়েকবার সিট থেকে শূন্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সে। কিচ্ছু করার নেই। হয়তো এরপর আরও বড়ো একটা স্পিডব্রেকারের ধাক্কায় গোটা গাড়িটাই উলটে যাবে। এতক্ষণের অসম যুদ্ধ নিমেষেই শেষ।

আর একটা তেমনই বড়োসড়ো স্পিডব্রেকারের ধাক্কায় এবার আচমকা একটু কাত হয়ে গেল গাড়িটা! তার মধ্যেই একটা টায়ার বার্স্ট করার আওয়াজ পেল সে। অর্ণবের মনে হচ্ছিল তাকে হাত-পা বেঁধে কেউ একটা অ্যাটমবম্বের ওপর বসিয়ে দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে বম্বটা ফাটতে পারে। অসহায়ভাবে মৃত্যুকে নিজের দিকে ধেয়ে আসতে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

তার চোখ ফের বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর দেখা হবে না! আর কথা হবে না। সেই মানুষটার পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ আর হবে না! তার মস্তিষ্কে একটাই বাক্য অনুরণন তুলেছে—'আমার তো শুধু আপনিই আছেন স্যার!' এ বাক্যটা যতটাই অসতর্ক ঠিক ততটাই বাস্তব! এই অন্তিম মুহূর্তে আরও কয়েকটা বাক্য বেরিয়ে আসতে চাইছে বুকের ভেতর থেকে! মরে গেলেও হয়তো সেগুলো অনুচ্চারিতই থাকবে। কিন্তু হৃদয়টা এবার প্রগলভ হয়ে অনেক কিছুই বলে উঠল। অনেক কিছু প্রকট করে বুঝিয়েও দিল। তাকে ছাড়া অর্ণবের জীবনই অর্থহীন। তার জীবন, মরণ, আনুগত্য সবই সেই মানুষটার। তার বিশ্বাস, ভালোবাসা, মনোযোগ, যত্ন, শাসন- গোটা দুনিয়াটাই ওই একটি লোককেই ঘিরে ছিল। আমৃত্যু তাই থাকবে। আজ মৃত্যুও যদি অধিরাজের ওই অপরূপমূর্তি নিয়ে আসে, তবে হয়তো সানন্দে জীবনের হাত ছেড়ে দিতে রাজি আছে অর্ণব। তাঁর জন্য একবার কেন, সহস্রবারও মরতে রাজি আছে সে। কোনোমতে বিড়বিড় করে যেন কার উদ্দেশ্যে বলল অর্ণব, "লাভ ইউ... আই লাভ ইউ সো মাচ...

ইউ আর মাই বেস্ট ম্যান... অ্যান্ড অলওয়েজ উইল বি!"

আবেগে তার চোখ বেয়ে একফোঁটা অশ্রুবিন্দু টপ্ করে হাতের ওপর পড়ল। এখন শুধু নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ির লাফিয়ে লাফিয়ে চলা, গতি, ঝাঁকুনি, সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাওয়া পৃথিবীর দৃশ্যগুলো ছাড়া আর কিছু অনুভব করতে পারছে না। কানে শুধু কতগুলো যান্ত্রিক শব্দ। কী যেন একটা বিপ বিপ করে উঠে বিপদের সঙ্কেত দিচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই! এখানেই সব শেষ...!

আচমকা পেছন থেকেই একটা জোরাল বাইকের হর্ণ শুনতে পেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল অর্ণব। তার চোখ পড়ল সাইড গ্লাসে। একটা স্পোর্টস বাইক তুমুল বেগে হাওয়ার সঙ্গে টক্কর নিয়ে তার গাড়ির পেছনেই আসছে। শুধু আসছে বললে ভুল হবে৷ প্রায় বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে আসছে। অত উত্তেজনার মুহূর্তেও বাইকটাকে চিনতে ভুল হল না তার! এই স্পোর্টস বাইক ও বাইক আরোহীকে সে কয়েক লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যেও চিনে নেবে। তার হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল। স্যার! উনি এসেছেন! কিন্তু জানলেন কী করে!

আরও কিছু বোঝার আগে অর্ণবের ফোনটা ভাইব্রেট করে ওঠে। কানে এখনও ব্লুটুথ ওয়ারলেস ইয়ার সেট পরা রয়েছে। কোনোমতে সে কলটা নিয়ে নিল। কাঁপা স্বরে বলল, "স্যা-র!"

"ই-উ ফু-ল!"

ওপাশ থেকে ভেসে এল অধিরাজের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, "বারণ করেছিলাম আমি! সতর্ক থাকতে বলেছিলাম!"

একটা প্রচণ্ড কান্না অর্ণবের বুকের পাঁজরে ধাক্কা মারছিল। সে আর্দ্র কণ্ঠস্বরে বলল, "স্যরি স্যার!"

"হোয়াট স্যরি!"

আবার ধমক। এবার অধিরাজকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে অর্ণব। তার বাইক হাওয়ার বেগে

এসে পড়েছে ঠিক চলন্ত গাড়ির পাশে। এই হাড়কাঁপানো শীতে এরকম অনাবৃত অবস্থায় বাইক চালিয়ে চলে এসেছে সে! কাঁধের রক্তক্ষরণ এখনও থামেনি। বরং আরও যেন বেড়েছে। অবস্থা দেখে অর্ণব নিজেই আঁতকে ওঠে। এ কী অবস্থা! অধিরাজের কানেও ব্লু টুথ ইয়ারসেট কাম স্পিকার। ওই অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করল, "স্টেটাস কী? ব্রেক ফেইল করেছে?"

"ব্রেক কাজ করছে না স্যার।" সে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলে, "বোধহয় মাল্টিপ্ল ম্যালফাংশন। কাচ নামছে না। ডোর লক কাজ করছে না। একটা টায়ার গেছে। ওয়ার্নিং লাইট দেখাচ্ছে। আর বোধহয়...!"

"বোধহয় কী?"

"যখন স্পিডোমিটারের কাঁটা এইটটি ক্রস করছিল তখন একটা বিপের আওয়াজ শুনেছি। বম্ব থাকলেও থাকতে পারে।"

অধিরাজ এবার নিজেই অসহায়বোধ করছিল। এই বিপিং সাউন্ডটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। এর অর্থ সে-ও বোঝে। অর্ণব চাইলেও এখন গাড়ির স্পিড কমাতে পারবে না। ওদিকে গাড়িটা স্থিরও থাকছে না। বারবার পাগলের মতো এদিক ওদিক যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বাইক নিয়ে চেজ করতে অসুবিধে হচ্ছে। তাকেও এলোপাথাড়ি একবার ডানদিকে, একবার বাঁদিকে যেতে হচ্ছে। এভাবে কিছু করা প্রায় অসম্ভব। আর হাতে সময়ও নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্ণবকে গাড়ির বাইরে বের করে আনতে হবে। একটা চাকা বসে গিয়েছে মানে গাড়িটা তিনটে চাকায় প্রচণ্ড স্পিডে চলছে। এই প্রেশার হয় চারচাকাটা নিতে পারবে না। নয়তো স্পিড একটু পরেই ধরধর করে কমতে থাকবে। তখন আর কিছু করার নেই!

"ঠিক আছে।" সে নিজেকে অদ্ভুতরকম শান্ত রাখল, "ডোন্ট ওরি অর্ণব। জাস্ট চেষ্টা করো যে গাড়িটাকে স্টেডি রাখতে পারো কিনা।

অধিরাজের শান্ত স্বর বুঝি অর্ণবকে কিছুটা সাহস জোগাল। সে এবার প্রাণপণে হুকুম তামিল করার চেষ্টা করে। গাড়িটা মাঝেমধ্যেই বেয়াদবি করে চলেছে। অধিরাজ সেটাকে চেজ করতে-করতে তাল মিলিয়ে এদিক ওদিক যাচ্ছে। অর্ণবের পাশের জানলাটাই তার লক্ষ্য। কিন্তু বারবার দিক বদল করার ফলে সেখানে পৌঁছোতেই পারছে না! যতবার হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করছে, ততবারই ফস্কে ফস্কে যাচ্ছে। ওদিকে অদূরেই ফের একটা ট্রাক দেখা দিয়েছে। শহরের যত ট্রাক সব কি আজ রাতেই পথে নেমেছে...!

"স্যা-র!"

অর্ণব আর্তনাদ করে ওঠে। অধিরাজ শান্ত স্বরে বলল, "ডোন্ট প্যানিক। স্টিয়ারিং যখন কাজ করছে তখন ওটাকেই ঘোরাও। যতক্ষণ না আমি বলব, স্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে হাত সরাবে না।"

সে কোনোমতে বলল, "ওকে।"

এই ট্রাকটা মূর্তিমান ভীমভবাণীর মতোই প্রায় সামনেই এসে পড়েছিল। অর্ণব সারা দেহের শক্তি দিয়ে স্টিয়ারিংটাকে ঘুরিয়ে চেপে ধরল। আবার সেই একই বিপজ্জনক কয়েকটা মুহূর্ত। ঈশ্বরের অসীম কৃপা, এবারও গাড়িটা রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেলেও ট্রাকটা সামান্য হলেও ঠুকে দিল তার ডিপারটাকে। ডিপারটা ভেঙে যাওয়ার প্রচণ্ড শব্দে গোটা পরিবেশ সচকিত হয়ে ওঠে। ডিপারের কাচ ছিটকে পড়ল রাস্তার ওপরে।

"অর্ণব... প্লিজ।"

অধিরাজ একরকম বাইক সমেত নিজেকেও অনেকটা হেলিয়ে দিয়ে ট্রাকটাকে কাটায়। কিন্তু ওটাকে কাটাতে গিয়ে আবার সে দূরে সরে গিয়েছে। এবার একটু অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, "প্লিজ... হোল্ড!"

অর্ণব আঁকপাক করে গাড়িটাকে সোজা রাখার চেষ্টা করে। তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। অথচ ভগবান জানে এখানে এতগুলো স্পিড ব্রেকার কী করছে। একসঙ্গে অতগুলো স্পিডব্রেকারের ধাক্কায় ফের টালমাটাল হয়ে গেছে গাড়ি। সে অসহায়ের মতো দেখছে

কখনও কাত হয়ে যাচ্ছে, কখনও লাফিয়ে উঠছে তার চতুষ্পদ বাহন। ওদিকে স্পিড কমানোও যাচ্ছে না। বুলেটের গতিতে তার পাশে পাশে ছুটছে অধিরাজের বাইক। কখনও কাছে ঘনিয়ে আসছে, কখনও আবার দূরে সরে যাচ্ছে। দুটো গাড়িই সমানতালে দুরন্তবেগে ছুটে চলেছে। শুধু একটা নিয়ন্ত্রণহীন, অন্যটা চালকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যেই বাইকটার সঙ্গে গাড়িটার আলতো ঠোকাঠুকি হচ্ছে। অধিরাজ প্রমাদ গোণে। এভাবে বারবার গুঁতো খেলে বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে বই কমবে না। অর্ণব আপ্রাণ হোল্ড করার চেষ্টা চালাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি একেবারেই অনুকূল নয়। সে ভীষণ জেদে দাঁতে দাঁত পিষল। আজ মৃত্যুকেও হার মানতে হবে তার কাছে। অর্ণবকে স্পর্শ করার আগে অধিরাজের সঙ্গে তাকে পাঞ্জা কষতে হবে! এত সহজে সে হার মানতে রাজি নয়!

আবার বাইকে স্পিড তুলে ফের অর্ণবের পাশে ঘনিয়ে এল অধিরাজ। অর্ণব দেখল তার হাতে একটা ধারালো অথচ ভারি কিছু! তার পার্সোনাল টুল বক্স থেকে বোধহয় কিছু বের করে এনেছে। আরও কিছু বোঝার আগেই কাচের ওপর এসে পড়ল বস্তুটা! এবার জিনিসটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। একটা ক হ্যামার! তার তীক্ষ্ণদিকটা দিয়ে অধিরাজ এক হাতে আপ্রাণ এলোপাথাড়ি আঘাত করে চলেছে জানলার সাইডের দিকে। অন্যহাতটা কন্ট্রোল করছে বাইক। দৃশ্যটা দেখেই ভয়ে কেঁপে উঠল অর্ণব। অত স্পিডে একহাতে বাইক চালাচ্ছে অধিরাজ! তার দৃষ্টিও এখন এই গাড়ির দিকে। সামনে যদি কিছু এসে পড়ে! যদি বিপদ কিছু হয়ে যায়।

অধিরাজ বেশ কয়েকবার ক্ল হ্যামার দিয়ে জানলাটাকে পিটিয়ে আবার একটু তফাতে চলে গেল। দুটো চলন্ত গাড়িকে পাশাপাশি রাখাটাই এখন সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ!

এদিকে অর্ণব দাঁতে দাঁত চেপে চেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে অধিরাজও ছাড়ার পাত্র নয়। সে একহাতে বাইকটাকে ধরে রেখেই বলল, "স্টেডি অর্ণব! হোল্ড দ্যাট পজিশন...।"

অর্ণবের প্রাণপণ চেষ্টায় এবার কিছুটা ফল হল। গাড়িটা আবার অধিরাজের বাইকের দিকে সরে গিয়েছে। বেসামাল গাড়িটা বাইককে বারবার ঠ্যালা মারছে। কিন্তু অধিরাজ একটুও নার্ভাস না হয়ে ঐ পরিস্থিতিতেই এবার বাইকটা সামলায়। সে এবার কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে, বাইকটাকে নিয়ন্ত্রণে এনে ফের প্রচণ্ড শক্তিতে হাতুড়িটা চালায় জানলার কাচের ঠিক সেন্টারে! তার হিসাব একদম সঠিক। এতক্ষণ বুঝে শুনেই ক্ল হ্যামার দিয়ে জানলার প্রান্তরেখাকে বারবার আঘাত করছিল, কারণ ওটাই জানলাগুলোর দুর্বলতম অংশ। যখন ক্রমাগত আঘাতের পর আঘাত খেয়ে কাচটা একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে তখনই সুযোগ বুঝে ঠিক মাঝখানের অংশে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল। প্রথম বাড়িটা খেয়েই কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে না পড়লেও রীতিমতো ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় বাড়িটা মারলেই পুরো জানলাটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়বে। কিন্তু তাতেও বিপদের সম্ভাবনা। হাতুড়ির ফোর্সে কাচ ছিটকে গিয়ে অর্ণবের গায়ে লাগতে পারে।

অধিরাজ এবার একটু সজোরে শ্বাস টানল। যেন আরও কিছুটা শক্তি জড়ো করল নিজের মধ্যে। তারপরই মৃদু স্বরে বলল, "স্যরি অর্ণব।"

অর্ণব কথাটার কোনোরকম অর্থ বোঝার আগেই হ্যামার রেখে দিয়ে দুর্বল ভঙ্গুর

কাচের ওপরে সবলে ঘুষি মারল অধিরাজ। একবার, দুবার, তিনবার...! পরপর... জানলার দুর্বল কাচ আর আঘাত প্রতিহত না করতে পেরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল। হাতুড়ি দিয়ে মারলে কাচের টুকরো যতখানি বেগে অর্ণবের দিকে ছিটকে পড়ত, হাত দিয়ে ভাঙার ফলে অতটা গেল না। তবু বেশ কিছু ধারালো টুকরো ছুঁয়ে গেল তাকে। একটা টুকরো ডান হাতেও বসে গেল। অর্ণব ব্যথা পেলেও সবিস্ময়ে দেখল তার থেকে অধিরাজের হাত আহত হয়েছে অনেক বেশি। সেই রক্তাক্ত হাতেই জানলার বাকি কাচের টুকরোগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বলল সে, "এবার লকটাকে ভাঙা ছাড়া উপায় নেই। এগেইন স্যরি অর্ণব। তোমায় হার্ডওয়্যার স্টোরে গিয়ে একটা নতুন হ্যান্ডল কিনতেই হবে!"

অর্ণব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কী বলবে ভেবে পায় না। এখন

কি হ্যান্ডলের জন্য দুঃখপ্রকাশ করার সময়!

অধিরাজ অবশ্য তার দিকে মন দেয়নি। কথাগুলো ছুড়ে দিয়েই সে হাতুড়ির তীক্ষ্ণ দিক দিয়ে ফের আক্রমণ চালাল ডোর লকের ওপর। ব্লান্ট আঘাতের চেয়ে শার্প ব্লো-ই এক্ষেত্রে বেশি কাজ দেয়। অর্ণবও স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত সরিয়ে গাড়ির ভিতর থেকে দরজায় ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল। অধিরাজের ধমক খেয়ে সিটিয়ে গেল, "স্টিয়ারিং সামলাও ইউ ফুল। ওভাবে ধাক্কা দিয়ে কোনো লাভ হবে না। লক জ্যাম হয়ে রয়েছে। তুমি বরং স্টিয়ারিং আর এক্সেলেটরে মন দাও।"

ততক্ষণে অধিরাজ বাইকটাকে গাড়ির একদম কাছে নিয়ে এসে কাচ শূন্য জানলা দিয়ে নিজের হাত গলিয়ে দিয়েছে ভেতরে। তার দেহটাও বাইকে ভর দিয়ে চলন্ত বাইক আর গাড়ির মাঝখানে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। পরপর কয়েকটা মোক্ষম ব্লো। ভেতরে ও বাইরে আঘাত খেয়ে হ্যান্ডল সমেত গোটা সিস্টেমটাই খুলে পড়ে গেল৷ অর্ণব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এতক্ষণ তার ও জীবনের মধ্যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে দরজা, সেটা অবশেষে খুলেছে! আর একটুও সময় নষ্ট না করে হ্যাঁচকা টান মেরে দরজাটাকে বাইরের দিকে খুলে দিয়েছে অধিরাজ। তারপর বাইকটাকে ফের সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। দূরন্ত বেগে অর্ণবের গাড়ির একেবারে সমান্তরালে চলেছে সে। অর্ণবের ইয়ারসেট ফের কড়কড়িয়ে ওঠে, "স্পিড আপ অর্ণব। গাড়িটাকে একদম জোরদার স্পিডে টানো। মিনিমাম একশো কুড়ি কিমি পার আওয়ারে নিয়ে যাও। চিন্তা কোর না... আমি আছি!"

শুনেই অর্ণবের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। জীবনেও এত স্পিডে সে গাড়ি চালায়নি। চিরকালই সাবধানী ড্রাইভার। অধিরাজেরই বরং র‍্যাশ ড্রাইভিং করার রেকর্ড আছে। স্পিড সে ভালোবাসে, সে বাইকই হোক কী চারচাকা। কিন্তু অর্ণব ড্রাইভার হিসাবে অত্যন্ত সতর্ক। আর এই পরিস্থিতিতে এত দ্রুতবেগে গাড়ি চালাতে হবে! "ভেবো না!" ওদিক থেকে অধিরাজের ধমক ভেসে এল, "যা বলছি করো। স্পিড আপ।"

অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই অ্যাক্সিলেটরের ওপর চাপ ক্রমশ বাড়াতে লাগল অর্ণব। অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ ঠিক আছে। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল তার বাইকের গতিবেগও। একে অপরকে নয়, মৃত্যুর কাউন্টডাউনকে টক্কর দিতেই বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে দুই বাহন। অধিরাজ জানে অর্ণবের এই স্পিড খুব বেশিক্ষণ নিতে পারবে না তার গাড়ির জখম টায়ার। বেশিক্ষণ টানলে অন্য চাকাগুলোও কোলাপ্স করতে পারে। তাই যা করার তা দ্রুতই করতে হবে।

"অর্ণব, যা বলছি মন দিয়ে শোনো।" সে তাকে বুঝিয়ে বলে, "স্পিডটা এমন লেভেলে তুলবে যাতে তুমি স্টিয়ারিং থেকে সরে গেলেও ওটা নিজে থেকেই বেশ

খানিকটা এগিয়ে যায়। তুমি অ্যাক্সিলেটর ছেড়ে দিলেও ওর স্পিড আশির নীচে নামতে যেন কিছুটা সময় নেয়। আর যে মুহূর্তে একদম টপ স্পিডে উঠবে, তুমি একটুও না দেরি করে এক দুই তিন কাউন্ট করে খোলা দরজা দিয়ে সোজা বাইরে লাফিয়ে পড়বে। যতটা সম্ভব জোরে জাম্প করবে।"

এই চরম স্পিডে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লে তো অর্ণব এমনিই বাঁচবে না। সে ভয়ে ভয়ে বলে, "কিন্তু...!"

"আমার ওপর বিশ্বাস আছে?"

যে প্রশ্নটা ভেসে এল তার উত্তর দেওয়াই বাহুল্য। তবু কাঁপা গলায় জবাব দেয় সে, "নিজের চেয়েও বেশি।"

"তাহলে ফুল স্পিডে গিয়ে ওয়ান টু থ্রি কাউন্ট করে লাফিয়ে পড়বে।" তার মন্দ্র কণ্ঠস্বরে আদেশ, "কোনোকিছু ভাববে না। সামনে পেছনে ওপরে নীচে, কোনোদিকে তাকাবে না। বুঝেছ?"

"কপি দ্যাট।"

অর্ণব বিনাবাক্যব্যয়ে অ্যাকসিলেটরটাকে সজোরে চেপে ধরে। গাড়িটা গোঁ গোঁ করে উঠেছে। গিয়ার চেঞ্জ হচ্ছে। গতি ক্রমশ বাড়ছে। খোলা দরজা দিয়ে হিম শীতল হাওয়া হু হু করে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপ্টায় চোখ খোলা রাখাই মুশকিল। যেন শত শত বরফের ছুরি তার খোলা মুখ চোখে আঘাত করছে। বেচারি স্যারের অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পারে অর্ণব। তাঁর হেলমেটটাও মাথায় নেই। স্পোর্টস বাইক হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়ি মরি করে ছুটছে রাতের রাস্তা দিয়ে। অধিরাজের মুখ সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। সে জানে সময় আর মৃত্যুকে টক্কর দিতেই হবে তাকে। অর্ণবের জন্য!

অর্ণবের গাড়ি কখনও কাত হতে হতে, কখনও লাফাতে লাফাতে রাতের অন্ধকার চিরে ফালাফালা করে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্পিডোমিটারের কাঁটা এখন সর্বোচ্চ গতিবেগের অঙ্ক ছুঁয়েছে। বাইরের হাওয়া হা হা করে আছড়ে পড়ে বিপরীত দিকে ধাক্কা মারছে। অর্ণব টের পেল হাওয়ার প্রেশার এখন সম্পূর্ণ তার প্রতিকূলে। এই জোরদার এয়ার প্রেশারকে অগ্রাহ্য করে তাকে সিট থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে! সে গাড়ির স্পিড বজায় রেখে একটা পা গেটের দিকে সরিয়ে নিয়েছে। ড্রাইভিং সিটে বসলে দুটো পা-ই সামনের দিকে থাকে। কিন্তু ওভাবে রাখলে চলবে না। একেই বাতাস তাকে সমস্ত জোর দিয়ে পেছন দিকে ঠেলছে, তার ওপর পা যদি অসুবিধাজনক পজিশনে থাকে তবে বাইরের দিকে লাফিয়ে পড়া অসম্ভব। ভুলবশত যদি বুট, পা আটকে যায়, তবে সব প্রচেষ্টাই মাঠে মারা যাবে।

"ঠিক আছে।" আবার ভেসে এল অধিরাজের স্বর, "গেট রেডি।"

অর্ণব একটা বড়ো শ্বাস টানল। যতটা অক্সিজেন সারা শরীরে সঞ্চার করে নেওয়া যায় ততটাই নিল। এখনও তার একটা হাত স্টিয়ারিং ধরে আছে। একটা পা অ্যাকসিলেটরে। বেশ কয়েক মিনিট ধরেই গাড়িটা চরম গতিবেগে চলছে। স্পোর্টস বাইকটাও সমানতালে লড়ে যাচ্ছে। এবার অধিরাজ বাইকটাকে নিয়ে এল গাড়ির দরজার কাছে। চেঁচিয়ে বলল, "নাও...!"

অর্ণব বিদ্যুৎবেগে হাত আর পা মুক্ত করে নিল অ্যাক্সিলেটর আর স্টিয়ারিং থেকে। বাতাস তাকে পেছন দিকে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সেসব কিছুর তোয়াক্কা না করেই সে অন্ধের মতো লাফ দিল শূন্যে। সেই মুহূর্তটা বুঝি স্থির হয়ে গেল। অর্ণবের দেহটা শূন্যে ভাসছে! বাতাস তার বুকের ওপর পালটা চাপ তৈরি করছে। উলটোদিকে ঠেলছে। সে টের পেল এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্য একটা অদ্ভুত নৈঃশব্দ তার মস্তিষ্কে ছেয়ে গেল। হাত দুটো শূন্যেই আশ্রয় খুঁজছে। এখনই সবেগে মাটিতে আছড়ে পড়বে। অথবা ডিভাইডারে। দু-টুকরো হয়ে যাবে খুলিটা! মেরুদণ্ডটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হবে। একটা প্রাণান্তকর যন্ত্রণার জন্য সে ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল। তার দেহটা এবার সজোরে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে নিম্নমুখী হচ্ছে...! পড়ছে... পড়ছে... পড়ল...!

"গট ইউ!" তার কানের কাছে অতি প্রিয় কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, "আই গট ইউ!... অর্ণব!"

অর্ণব এবার একটু সাহস পেয়ে চোখ খুলল। কই! সে তো রাস্তায় আছড়ে পড়েনি! বরং দুটো শক্তিশালী হাতের বন্ধনের মধ্যে ঝুলছে! দুটো বলিষ্ঠ হাত পরম যত্নে, আশ্বাসে তাকে টেনে নিল অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে। অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল অধিরাজ তাকে দু-হাতে ধরে রেখেছে। অথচ বাইক তখনও তুমুল বেগে চলছে!

সে সভয়ে বলে, "স্যার... বাইকটা কে চালাচ্ছে?"

"আমিই চালাচ্ছি।" অধিরাজ মৃদু হাসল, "যদি সবসময় হাতের সাপোর্টেই বাইক চালাতে হয় তাহলে আর র‍্যালিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানে কী! এসব সিক্রেট স্টান্ট। তুমি ঠিক আছ?"

এবার আস্তে আস্তে বাইকের স্পিড কমছে। ওদিকে ড্রাইভারহীন গাড়িটা এঁকেবেঁকে স্পিডের ধাক্কায় বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল। অধিরাজ অর্ণবকে অবলীলায় টেনে তুলে বাইকের সামনের অংশে বসিয়ে দিয়ে বলল, "এখানে সামলে বোসো। আর এবার যদি আমার চরিত্রে তোমার কোনো সন্দেহ না থাকে তবে অতিরিক্ত সেফটির জন্য আমায়

জড়িয়েও ধরতে পারো।”

অর্ণব আর কোনোরকম দ্বিরুক্তি না করে অধিরাজকেই আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরল। যেমন জলে ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, তেমনভাবেই সে একেবারে সাপটে ধরেছে তাকে। বাইকটা এবার সামনের চাকায় ভর দিয়ে পেছন দিকটা শূন্যে তুলে দিয়ে স্কিড করল। ওকে অদ্ভুত কৌশলে মন্থর থেকে মন্থরতর করতে করতে ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ছে অধিরাজ। অর্ণবের ফাঁকা গাড়িটা টলমল করতে করতেই এখন নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়েছে। ওদের চোখের সামনেই সেটা টাল খেতে খেতে দূরে চলে যাচ্ছিল। আচমকা যেন একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। পরক্ষণেই জোরদার ব্লাস্টের আওয়াজ। অর্ণব বিস্ফারিত দৃষ্টিতেই দেখল নিমেষে তার ধাতব চতুষ্পদ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। প্রচণ্ড শব্দে আগুন গ্রাস করে নিচ্ছে সেই ভগ্নস্তূপকে! অধিরাজের আলিঙ্গনে সে তখন বাঁশপাতার মতো হি হি করে কাঁপছে। কী ভয়ংকর এই দৃশ্য। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ছুঁয়ে এসেছে অর্ণব। একদিনে দু-বার নিশ্চিত যমের মরণ কামড় থেকে বেঁচে ফিরল! ওঃ।

অর্ণব যেন একরকম অবশ হয়ে গিয়েই মুখ গুঁজে দিয়েছে অধিরাজের প্রশস্ত বুকে। একটা অদম্য কান্না আর কাঁপুনিকে চেপে রাখার চেষ্টা করতে করতেই বলল, “থ্যাংক ইউ... থ্যাংক ইউ স্যার...!”

“এক্সট্রিমলি স্যরি অর্ণব।” অর্ণবকে সস্নেহে একহাতে আলগোছে জড়িয়ে ধরে বলল অধিরাজ, “এবার আর হ্যান্ডল নয়, তোমায় একটা আস্ত নতুন গাড়িই কিনতে হবে। তবে থ্যাংকসটা আমায় না দিয়ে আমার মাউন্টেনিয়ারিং-এর অভ্যেস আর ফিজিক্সের ডিগ্রিটাকে তুমি দিতেই পারো। ওই ক্ল হ্যামারটা আমার হাইকিং বা মাউন্টেনিয়ারিং-এর সঙ্গী। বরফ ভাঙতে বা তাঁবুর পেরেক ঠুকতে খুব কাজে লাগে। সবসময়ই আমার বাইকের টুলবক্সে থাকে। আজ এমনভাবে কাজে লাগবে তা ভাবিনি। ভাগ্যিস সঙ্গে ছিল।”

অর্ণব যেমন পুলিশে আসার আগে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই অধিরাজ এ পেশায় আসার আগে ফিজিক্সে এম.এস.সি কমপ্লিট করেছে। সি.আই.ডি. হোমিসাইডের সকলেই জানে যে সে ফিজিক্সের ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া তুখোড় স্টুডেন্ট। ডক্টরেট করার সুযোগ পেলেও তার ইন্টারেস্ট অন্যদিকেই ছিল। তাই পি.এইচ.ডি. করেনি। কিন্তু ফিজিক্সের ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট হওয়ার দরুণ স্পিড, ভর, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, হাওয়ার গতিবেগ কিংবা ফোর্স ক্যালকুলেট করা তার কাছে অন্যদের তুলনায় অনেকটাই সোজা। তাই তার চেজিং সবসময়ই নিখুঁত হয়। অন্যান্য বাইকারদের মতো আনতাবড়ি স্পিডেও সে চলে না। তার কাছে স্পিড জিনিসটা পুরোটাই একটা অঙ্ক যেটা চেজিং-এর ক্ষেত্রে ভীষণভাবে কাজে লাগে। আজও অর্ণবের প্রাণ বাঁচিয়েছে সেই ফিজিক্সই।

“চলো, ফেরা যাক।” অধিরাজ বাইকটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে, “এবার তুমি পেছনে এসে আরাম করে বসতে পারো। ফাঁড়া আপাতত কেটেছে।”

অর্ণবের গায়ে যেন একবিন্দুও শক্তি নেই। সে তখনও এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছে অধিরাজকে যেন এখনই কেউ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! অবস্থা দেখে অধিরাজ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তাকে একটা ছোট্ট শিশুর মতো পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। হাসতে হাসতে সহজ গলাতেই বলল, “তোমার কপালই খারাপ অর্ণব। সমস্ত রোম্যান্টিক মুহূর্তগুলো স্রেফ জলেই যাচ্ছে। কোথায় তুমি প্রেমিকাকে কোলে নিয়ে ঘুরবে, তার বদলে আমার মতো বেরসিকের কোলে ঝুলছ!”

অর্ণব কোনো উত্তর দেয় না। সে তখনও অধিরাজের কপাট বুকে মুখ গুঁজে নিজেকে আপ্রাণ সামলানোর চেষ্টা করছে। তাকে যখন তুলে নিয়ে বাইকের পেছনের সিটে বসিয়ে দিল সে, তখনও ছেলেটা স্বাভাবিক হতে পারেনি। শুধু কোনোমতে বলল, “স্যার, আপনার স্টিচটা কেটে গেছে, ফের ব্লিডিং হচ্ছে।”

“ওটা বড়ো ইস্যু নয় ডার্লিং।” অধিরাজ বাইকে স্টার্ট দিয়ে বলল, “রক্তপাত, ক্ষত, ব্যথা তবু সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের ফরেনসিকের অ্যাংরি বার্ড মহাশয়া ফের সুঁচ-সুতো নিয়ে তেড়ে

আসছেন ভাবলেই হৃৎকম্প হচ্ছে। এর থেকে তো বার্নিং শিখও ভালো। অ্যাট লিস্ট সে ধমক দেয় না।”

এতক্ষণে অর্ণব একটু হাসার চেষ্টা করল, “এবার কি আমরা ফের ল্যাবে ফিরব?”

“হ্যাঁ।” অধিরাজ ক্লান্তস্বরে বলে, “ক্ষতস্থান স্টিচ না করলে লড়াইয়ে টিকে থাকব কী করে? বুঝতেই পারছ এ লোকটা ঠিক কতটা হিংস্র। একটু আগেই পায়ে একটা বুলেট খেয়েছে। তারপরও সে থামছে না। যন্ত্রণাকে যেমন সে অগ্রাহ্য করছে, তেমনই আমাদেরও অগ্রাহ্য করতে হবে। এ ক-দিন সে ঘুমোবে না, বিশ্রাম নেবে না। আমাদেরও ঘুমোনোর বা বিশ্রাম নেওয়ার উপায় নেই। ল্যাবে গিয়ে নিজেদের মেরামত করে ফের কাজে লেগে পড়তে হবে।” “এখন কী কাজ?”

সে বাইকে স্পিড তুলতে তুলতেই জবাব দেয়, “নিজেদের একটু পরিচর্যা করেই আমাদের চলে যেতে হবে পি সি চৌধুরী আর ভূপেন্দ্র দত্তার বাড়িতে। মিস্ বোস আর মিস্ দত্ত অ্যালার্ট আছেন। ফোন করলেই দরজা খুলে দেবেন ওঁরা। যদিও আমার মনে হয় না ওখানে আজ কিছু ঘটবে। আজকের মতো লোকটার প্ল্যান বানচাল করতে পেরেছি ঠিকই, কিন্তু ও ব্যাটা এখানেই থামবে না। অ্যাকশন আর রি-অ্যাকশনের সাইকেলটা চলতেই থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও খুব তাড়াতাড়িই জানবে যে ওর দ্বিতীয় হামলাটাও ব্যর্থ হয়েছে। তখন ও আরও একটা আঘাত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। জানি না, এবার সেটা কোন্ দিক দিয়ে আসবে। সেইজন্যই এই সাবধানতা।” অর্ণবের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এ কীরকম কিলার যে সবসময়ই আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। যুদ্ধে বিরতি দেওয়ার নামও করে না! সে কি থামতেই জানে না?

“শিখ প্রজাতিটা অসম্ভব ডেয়ার ডেভিল অর্ণব।” অধিরাজ জানায়, “ওরা ভালো হলে চূড়ান্ত ভালো। একেবারে শান্তিপ্রিয়, দরাজ মনের মানুষ। দিলদরিয়া যাকে বলে আর কী। কিন্তু মাথায় রক্ত চড়ে গেলে ওদের থামানো মুশকিল। একজন জেদি শিখ যে কী করতে পারে, আর কী পারে না, তার কোনো হিসাব নেই। আমরা ওদের পাঁইয়া, বাঁধাকপি বলে ঠাট্টা করি ঠিকই, বাট্ জেনে রেখো, শিখ জাতটার মতো বীর আর লড়াকু গোষ্ঠী খুব কমই আছে। ওরা হার মানতে জানে না। আর্মিতেও দেখবে শিখ ব্যাটেলিয়নকে ‘ব্রেভেস্ট' বলা হয়। শিখ বীরেরা মোগল, আফগান থেকে শুরু করে ইংরেজদের পর্যন্ত নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়েছে। ভাবতে পারো? জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ সর্দার উধম সিং কীভাবে নিয়েছিল! সে রীতিমতো লন্ডন অবধি চেজ করে মাইকেল ও’ডায়ারকে ক্যাক্সটন হলে প্রকাশ্যে গুলি করে মেরেছিল। কতখানি নির্ভীক, ডেসপারেট আর রিভেঞ্জফুল হলে এটা সম্ভব। শিখ প্রজাতিকে একদম আন্ডার এস্টিমেট কোর না। ওরা মারতে কিংবা মরতে ভয় পায় না।” বলতে বলতেই সে চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ে, “তার ওপর আমাদের মক্কেলকে যতদূর বুঝেছি, সে অন্যদের কবর খোঁড়ার আগেই নিজের কবরটাও খুঁড়ে রেখেই যুদ্ধে নেমেছে। তার কিচ্ছু হারানোর ভয় নেই। তাই সহজে থামবে না। বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা সে পরেছে, তার কারণ এই নয় যে মরতে সে ভয় পায়। ওটা এইজন্য পরে থাকে, যাতে প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আমরা তাকে মারতে না পারি। এবার দেখবে, বুলেটপ্রুফ প্যান্টও পরবে।”

“কিন্তু স্যার...!” অর্ণব একটু বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করে, “এসব তাকে দিচ্ছে কে? আই মিন, যত সাপোর্ট নিয়ে সে মাঠে নেমেছে, আমরাও সবসময় তা পাই না! এগুলো লাখ লাখ টাকার ইকুইপমেন্ট। লোকটা কি কোটিপতি?”

“উঁহু।” অধিরাজ বলে, “একেবারেই নয়। কোনো কোটিপতি আর যাই সাজুক, চাকর-বাকর-ড্রাইভার সাজবে না। সাইকোলজিতেই আটকে যাবে। যে অন্যকে হুকুম দিয়ে অভ্যস্ত, সে কিছুতেই অন্যের হুকুমে ‘আজ্ঞে হুজুর' গোছের অ্যাটিটিউড রাখতেই পারবে না। তার মধ্যে একটা কম্যান্ডিং টোন থাকবেই, যেটা কোনো চাকর বা ড্রাইভারের থাকে না। এ কোনো

কোটিপতি নয়। অত্যন্ত সাধারণ কোনো মানুষ।"

"তবে? আধুনিক বুলেটপ্রুফ ভেস্ট বা পাগড়ি, হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড, বিষাক্ত গ্যাস-কিংবা যাই হোক, প্রায় আনডিটেক্টেড্ একটা মার্ডার ওয়েপন, ইললিগ্যাল ঘুমের ওষুধ, ট্রিগার বম্ব-এগুলোর কোনোটাই কেরোসিন বা টায়ারের মতো সহজলভ্য নয়।" সে জানতে চায়, "এত সহজে সে এগুলোর অ্যাক্সেস পায় কী করে? আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে কেনে? না সত্যিই খালিস্তানি আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে যুক্ত?"

"এখানেই তাকে বুঝতে সবচেয়ে বড়ো ভুল করছ তোমরা।" অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল, "ও লোকটা মার্ডারার ঠিকই, কিন্তু সে শুধু রিভেঞ্জ নিচ্ছে। ভেবে দেখো, যাদের ও টার্গেট করছে তারা নিজেরাই ক্রিমিনাল। তাদের সে ঘৃণা করে। লোকটা যদি আতঙ্কবাদী বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের কেউ হত, তবে পুলিশ অফিসারদের গাড়ি না উড়িয়ে গোটা থানা বা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টটাকেই উড়িয়ে দিত। কিংবা আরও কোনো বড়ো কিছু, ট্রেন, বাস জাতীয় কিছুকে টার্গেট করত। টেররিস্ট বা আন্ডারওয়ার্ল্ডের ওটাই স্টাইল। তা সে করছে না। তার অ্যাক্টিভিটি সজ্জনকুমারের যাবজ্জীবন হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে। তার আগে সে কিচ্ছু করেনি। অর্থাৎ ভারতীয় আইনের ওপর কয়েকবছর আগেও তার ভরসা ও বিশ্বাস দুই-ই ছিল। কতগুলো ক্রিমিনালের অ্যাকশনের রি-অ্যাকশনে ইনিও দায়ে পড়ে ক্রিমিনাল হয়েছেন। তাও বহুবছর পরে। কিন্তু লোকটা জাত ক্রিমিনাল নয়। তারও কিছু নীতি আছে। তাই আন্ডারওয়ার্ল্ডের কোনো ডন বা কোনো আতঙ্কবাদী সংগঠনের কাছে সে যাবে না। কারণ আন্ডারওয়ার্ল্ড এবং টেররিস্ট— দুই পক্ষই দেশের জন্য ক্ষতিকর। ওরা বিনা কারণে মানুষ মারে। যে লোক সজ্জনকুমার বা জগদীশ টাইটলারের মতো লোককে ঘৃণা করে, সে দাউদ কিংবা ওসামার জাতের মানুষের শরণাপন্ন হবে এটা প্রায় অসম্ভব। আমি যদি ভুল না করি, তবে সে দেশের ক্ষতি কোনোমতেই চায় না। এই দুই মক্কেলই তাকে ইকুইপমেন্টের বদলে এমনকিছু করতে বলবে যা সম্পূর্ণ ওর নীতিবিরুদ্ধ। শিখরা ক্রিমিনাল হলেও কিছু আদর্শ মেনে চলে। তাই এদের সঙ্গে হাতও মেলাবে না।"

"তবে?"

"মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন অর্ণব। এর উত্তর তো একমাত্র আমাদের 'গুলাবোঁ'-ই দিতে পারবে। মারো তো ব্যাটাকে একটা ফোন।"

'গুলাবোঁ' তথা খবরি গুল্লু। অর্ণব এক হাতে অধিরাজের কোমর চেপে ধরে অন্য হাতে গুল্লুর নম্বর ডায়াল করে। গুল্লু এখনও সম্ভবত জেগেই ছিল। একবার রিং হতেই ফোনটা ধরল, "জি সাহেব।"

অধিরাজ হাত বাড়িয়ে অর্ণবের ফোনটা নিয়ে বলল, "গুলাব মিঞাঁ, আপনার জন্য আরও একটি গোপন কাজ আছে। একটু কষ্টকর। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর তুই ছাড়া এটা আর কেউ পারবে না।"

"হুকুম করুন স্যার।" গুল্লু আত্মবিশ্বাসী, "হয়ে যাবে।"

"আগে কাজটা শোন।" সে গলার স্বর নামিয়েছে, "খবর নে, শহরে এমন ক-টা ফার্মাসিউটিকলস্ কোম্পানি, ক-টা পেট্রল পাম্প আর লোক্যাল ইলেক্ট্রিকাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আছে যার মালিক একজন এমন শিখ যার পরিবার ১৯৮৪ সালের আগে দিল্লিতে থাকত। এবং এদের কারোর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কিনা। কাল দুপুর বারোটার আগে লিস্টটা আমার চাই। পারবি?"

"বললাম তো স্যার।" গুল্লু খবরি জোর দিয়ে বলে, "হয়ে যাবে।"

"গ্রেট।"

অধিরাজ লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা অর্ণবকে ফেরত দেয়। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে নিজে থেকেই বলল, "দেখো, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট সে কোথা থেকে নিয়ে আসে তা ট্র্যাক করা মুশকিল। হয়তো বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট লোকটা দিল্লিতেই আমদানি করেছে। কিন্তু দুটো জিনিস আছে যেটা নিজে তৈরি করা মোটেই হালুয়া-পুরী নয়। থালায় কিনতে

পাওয়া যায় না। সঙ্গে কিলোদরে ক্যারি করা যায় না। বা বাইরে থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো যায় না। দ্যাটস্ হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড অ্যান্ড বম্ব। কারণ এর আগে সে সালফিউরিক অ্যাসিডই ইউজ করেছিল। কলকাতায় এসে হাইড্রোফ্লুওরিক ইউজ করছে। মানেটা একদম স্পষ্ট। এখান থেকেই জিনিসটা সে জোগাড় করেছে, বাইরে থেকে ক্যারি করে আনেনি।"

এবার অর্ণবের মনে পড়ল ডঃ চ্যাটার্জির কথাটা। হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড জোগাড় করা খুব মুশকিল। তিনি বলেছিলেন ও জিনিসটা একমাত্র ফার্মাসিউটিকলস্, হাই অক্ট্যান গ্যাসোলিন, ফ্লুওরিসেন্ট লাইট বাল্ব আর ইলেক্ট্রিকাল কিছু জিনিসে ব্যবহৃত হয়। এবার গোটা ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকল। অধিরাজ হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিডের মাধ্যমে বার্নিং শিখকে চেজ করবে। সঙ্গে একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারকেও খুঁজবে যাদের বিশেষ করে অয়েল মেকিং ইন্ডাস্ট্রি ও ফার্মাসিউটিক্ কোম্পানিতে থাকার

সম্ভাবনা প্রবল। কারণ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররাই বম্ব বানাতে ওস্তাদ। "লোকটা নিশ্চয়ই গুচ্ছ গুচ্ছ হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড আর এক ডজন বম্ব পকেটে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায় না। তাতে তার নিজেরই বিপদে পড়ার চান্স প্রবল। সুতরাং দুটোই লোক্যালি আমদানি হয়। উপরোক্ত তিনটে জায়গা থেকেই সে একমাত্র অ্যাসিডটা পেতে পারে। কিন্তু সবজায়গায় পাবে না। এমনকি প্রচুর টাকা দিলেও পাবে না। সেক্ষেত্রে একটাই রাস্তা আছে। এমন কিছু কন্ট্যাক্টের সঙ্গে ডিল করা যারা তার সমব্যথী। অর্থাৎ যারা সেই একই জ্বালায় জ্বলছে, অথচ নিজেরা কিছু করতে পারছে না। শিখপ্রজাতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য যে ওরা প্রচণ্ড ঐক্যবদ্ধ। তার ওপর সেই শিখটি যদি নিজেই কোনোভাবে অ্যান্টি শিখ রায়টের শিকার হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। টাকার গল্পও নেই। বিনামূল্যেই সে বার্নিং শিখকে অ্যাসিড আর বম্বের জোগান দিয়ে যাবে। যদি ধরাও পড়ে, তবু মরে গেলেও মুখ খুলবে না। আন্ডারওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রিশিটারকে থার্ড ডিগ্রির দাওয়াই দিলেই সে সব বলে দেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে একজনও মুখ খুলবে না।" অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক স্বরে বলে, "কারণ জিহাদিদের মাথায় যেমন ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে 'কৌম' তথা জাত ও জাতভাইদের জন্যই তারা বলিপ্রদত্ত, তেমনই শিখও মরে যাবে, তবু জাতভাইয়ের সঙ্গে বেইমানি করবে না। এটাই ওদের ধর্ম অর্ণব। তার ওপর যদি সমব্যথী হয় তবে তাদের চোখে বার্নিং শিখ যেটা করছে, সেটাই জাস্টিস। ওরা নিজেদের প্রাণ দিয়েও ওকে সাপোর্ট করবে। হয়তো এটাই তোমার প্রশ্নের উত্তর। ঠিক এভাবেই সে কখনও দিল্লিতে, কখনও কানপুরে, কখনও বেঙ্গালুরুতে বা কখনও কলকাতায় সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী অনায়াসেই কালেক্ট করছে। গোটা ভারতবর্ষে বিভিন্ন পেশায় শিখেরা ছড়িয়ে আছে। বার্নিং শিখ 'কৌম' বা জাতীয়তাবাদের ভোক্যাল টনিক দিয়েই তাদের কাছ থেকে সব আমদানি করছে। দেখবে, গুলাবোঁ কাল যখন ডিটেইলস নিয়ে এসে হাজির হবে তখন কোনো এক পেট্রল পাম্প বা ফার্মাসিউটিক্ কোম্পানির মালিক হিসাবে অবধারিতভাবে অন্তত একজন শিখকে পাওয়া যাবেই। একাধিক থাকলেও আশ্চর্য হব না। এবং তাদের মধ্যে কারোর-না কারোর কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে বাধ্য। মিলিয়ে নিও। আর গুল্লু এই কাজের জন্য পারফেক্ট চয়েস কারণ সে নিজেই একজন শিখ। জাতভাইরা মোটামুটি সব জাতভাইদের খবরই রাখতে পারে। তারা কমিউনিটির ই লোক। তাই খবর বের করা সহজ হয়।"

অর্ণব স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অধিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই লোকটার কি কোনো অলৌকিক শক্তি আছে! এক্স-মেন নামের ফিল্মসিরিজে 'প্রোফেসর-এক্স' বা

'জেভিয়ার' নামের একটি চরিত্রের প্রত্যেকের মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল। স্যারেরও কি তেমনই কোনো ক্ষমতা আছে? নয়তো যে প্রশ্নের উত্তর সবার কাছে প্রায় প্রহেলিকার সমান, তা তিনি এত দ্রুত বুঝছেন কী করে? বার্নিং শিখের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি ভাবনা চিন্তা কী করে এত সহজে মেপে নিচ্ছেন।

"বার্নিং শিখ কোনো ক্লু ছাড়ে না।" অধিরাজ ধীর স্বরে বলল, "কিন্তু ওর মোডাস অপারেন্ডিই আমাদের ওর কাছে নিয়ে যাবে অর্ণব। তুমি বরং বলো আজ শেষরাতে কোথায়

পাহারা দিতে যেতে চাও! পি সি চৌধুরীর বাড়ি না আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাট? তোমায় আমি নিজেই সেখানে ড্রপ করে দেব। এই মুহূর্তে কোনো মূল্যেই তোমাকে একা ছাড়তে রাজি নই।"

"আজ পি সি চৌধুরীর বাড়িতেই যাই।" অর্ণব একটু ভেবে বলল, "ওখানে আচার্য স্যার আছেন। ওঁর আর মিস বোসের কাছ থেকে আপডেট নেওয়াও হয়ে যাবে।"

"ফাইন।" সে কাঁধ ঝাঁকায়, "অ্যাজ ইউ উইশ। আজ তবে আমি প্রণবেশদা আর মিস্ দত্তের কাছেই ডিউটি দিই। তবে যা-ই ঘটুক ফোনে ক্রমাগত আপডেট দিয়ে যাবে। মিস্ বোসকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে আর বাইরে ক্রমাগত রাউন্ড লাগাবে। অপরিচিত কাউকে দেখলেই অ্যালার্ট হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে জরুরি কথা, বি অ্যালার্ট অ্যান্ড কেয়ারফুল। কারণ পরবর্তী আঘাত কখন ও কোথা দিয়ে আসবে তা আমরা জানি না।"

অর্ণবকে বোধহয় এই সাবধানবাণীটা না দিলেও চলত। একটু আগেই যা ঘটেছে তারপর থেকে যে-কোনো মানুষ আর কোনোরকম চান্স নেবে না! এখন থেকে তো সে নিজের ছায়া দেখলেও সতর্ক ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠবে। সে নিবিড় স্বরে কিছু একটা বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজ তাকে বাধা দিয়ে ফের বলে ওঠে, "হিস্টোকে বলো তো তাড়াতাড়ি কয়েক সেট জামাকাপড় ফরেনসিক ল্যাবে নিয়ে আসতে। আমি আর কতক্ষণ পর্দা, কার্পেট, কলাপাতা জড়িয়ে বসে থাকব?"

তার কণ্ঠে অসহায়তা প্রকট। অর্ণব আগের বাক্যটা চেপে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "ওকে স্যার...!"

যে বাক্যটা আটকে গিয়েছিল সেটা আর তার মুখে এল না। আবেগের বশে বলে ফেলতে যাচ্ছিল। সে নিজেকে সামলে নেয়। কে জানে, স্যার কী মনে করবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে মনে বলল, "আপনার অনুমতি ছাড়া আমি কিছুতেই মরব না...!"

* **

(১০)

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ডায়েরি

লড়াইটা ক্রমশ বড্ড কঠিন হয়ে যাচ্ছে! অন্যান্য শহরের পুলিশেরা আমায় এতটা ভোগাতে পারেনি, যতটা কলকাতার সি.আই.ডি., হোমিসাইড প্রতি পদে বাধা দিচ্ছে। ওদের জন্য চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় নষ্ট হল। প্রত্যেকটা ঘণ্টা আমার কাছে অমূল্য। প্রতিটা মুহূর্ত দামি। অথচ কোন্ ম্যাজিকে জানি না, তদন্তকারী অফিসারটি আমার সমস্ত পরিকল্পনা বরবাদ করে ছাড়ছে। এখনও বুঝতে পারিনি যে, রাতে ডাম্পিং গ্রাউণ্ডে আমি যাব, গেলেও কোথায় যাব, সেটা লোকটা আন্দাজ করল কী করে। ওর চোখে বুলেটপ্রুফ ভেস্টটাও এড়ায়নি। সঙ্গীটি ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ও শেষপর্যন্ত দমেনি। যার জন্য একটা গুলি খেতেই হল আমায়। নিতান্তই 'ওয়াহেগুরু' সহায় ছিলেন বলে কোনোমতে পালিয়ে আসতে পেরেছি। অ্যাসিড বাল্বগুলো কোমর থেকে খুলে নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওটা একটা চরম ভুল! আফসোস, যে সেগুলোও ওদের হাতে চলে গেল। কৃপাণটা ছিল বলে শেষরক্ষা হয়েছে। নয়তো কপালে অশেষ দুঃখ ছিল।

প্রত্যেকবারই যে শহরে গিয়েছি, সেইসব শহরের সুপার-কপদের ইতিহাস খুব ভালোভাবেই জেনে নিয়েছিলাম। কলকাতার এই সুপার-কপটির কীর্তিও অজানা ছিল না। অন্যান্যদের মাত দিতে কোনো অসুবিধে হয়নি। ওকেও আমি খরচের খাতায় লিখেই রেখেছিলাম। এখন দেখছি, ভুল করেছিলাম! প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও ওর প্রতি আমার সম্মান ক্রমাগতই বাড়ছে। বাকিরা সুপার-কপের থেকে বেশি সুপার ফ্লপ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ অফিসারটিকে রীতিমতো ভয় পাচ্ছি। 'সুপার-কপ' শব্দটা ওর জন্য সার্থক। প্রথমবার ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় অ্যাটেম্‌টা নিয়েছিলাম গোটা পুলিশবাহিনীকে ভয়ে কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য। অথচ যা হল তাতে নিজেই ঘাবড়ে গেলাম। আমার ফুলপ্রুফ প্ল্যান স্রেফ একটা লোকের দক্ষতায় ভেস্তে গেল! নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত, না অফিসারটির প্রশংসা করা, তা বুঝতে পারছি না। শুধু এইটুকু বুঝেছি, ও এবার ছায়ার মতো প্রতি পদক্ষেপে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবে। যদি ওকে না হারাতে পারি, তবে ও আমায় হারাবে। কিন্তু আমি হারতে রাজি নই! যুদ্ধটা এবার সেয়ানে সেয়ানে।

গুলিটা লাগার পর থেকেই বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। তবুও কোনো হসপিটালে যাইনি। কারণ যে লোক এভাবে অপ্রত্যাশিত ফাঁদ পেতে আমাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল, সে শহরের সবক-টা হাসপাতালেও নির্ঘাৎ জাল পেতে বসে থাকবে। আমি গুলিটা বের করতে গেলেই ওরা আমায় ধরে ফেলবে। তা হতে দিই কী করে? অগত্যা অতি কষ্টে গুলিটা নিজেই কেটেকুটে বের করেছি। একটু বেশি রক্তক্ষরণ হয়েছে ঠিকই। তা সত্ত্বেও আমাকে তা সহ্য করতে হবে। একটুও খোঁড়ানো চলবে না, কোনোরকম আঘাতের আভাস দেওয়া চলবে না। এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশি যন্ত্রণা তুমি আমার কপালে লিখেছিলে ঈশ্বর। এইটুকু যন্ত্রণা সইয়ে নেওয়ার শক্তি দেবে না? আমি পারব। পারতেই হবে যে।

মিথ্যে বলব না, এই অফিসারটিকে দেখলেই আমার একটা অদ্ভুত আফশোশ হয়। মনে হয়, ১৯৮৪ সালে এই মানুষটা কেন দিল্লিতে ছিল না! এরকম একজন পুলিশ অফিসারও যদি সেদিন দিল্লিতে থাকত তবে হয়তো অনেক নিরীহ মানুষের জীবন বেঁচে যেত। ওকে যত দেখছি, ততই আমার সরতাজের কথা মনে পড়ছে। সেই সরতাজ সিং! আমার জীবনের দ্বিতীয় নায়ক! আর সরতাজের কথা মনে পড়লেই অতীতের সেই কালান্তক দিনের স্মৃতি আমায় ঘিরে ধরে...!

৩১ অক্টোবরের রাত থেকেই গোটা দিল্লি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর শেষ ভাষণে বলেছিলেন যে তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু দেশের ঐক্যকে বহাল রাখবে, ভারতবর্ষকে

মজবুত করবে। কিন্তু বাস্তবেই যখন ওঁর রক্তবিন্দু ছড়িয়ে পড়ল, তখন সেই 'খুন কা এক এক কতরা' ভারতবর্ষকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে দিল। এইমস্ আর সফদরজঙ্গ হসপিটালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভিড়ের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, শিখ—সকলেই ছিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঈশ্বরের কাছে প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ ভিক্ষা করছিল। কিন্তু সে প্রার্থনা যখন ব্যর্থ হল, তখন দেখা গেল সেই ভিড় থেকে কখন যেন শিখেরা আলাদা হয়ে গিয়েছে। যে বেইমান শিখ দুটো গুলি চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে বেয়ন্ত সিংকে ওখানেই গুলি করে মেরেছিল ইন্দিরা গান্ধীর বাকি বডিগার্ডরা। সতবন্ত সিংকে গ্রেফতার করা হল। মজার কথা, ওদের পরিবারের গায়ে কিন্তু সামান্য আঁচড়টুকুও পড়েনি। উলটে বেয়ন্ত সিং-এর বিধবা বিমল কৌর উগ্রবাদীদের দলে নাম লিখিয়ে জেলে গেলেও পরে 'রোপার' থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিল এবং জিতেওছিল। ওর বাবা সুচা সিং ভাটিন্ডা থেকে 'চুনাও'লড়ে এম.পি. হয়েছিলেন! ওর মা-কে স্বর্ণমন্দিরের জ্ঞানী ও গ্রন্থীরা মিলে সম্মানিত করল, অন্যান্য পার্টির নেতারাও তাঁকে 'শহীদের মা' হিসাবে সম্মান জানাল। সতবন্ত সিং এর পরিবারেরও এমনই কাহিনি। ঘটনার পরেই তারা প্রচারে এল এবং দিব্যি 'এম.পি.ও হয়ে গেল। সতবন্ত এবং কেহর সিং এর ফাঁসি হলেও গোটা পাঞ্জাবে তারা বিপ্লবী ও শহীদের সম্মান পেল! বেয়ন্ত সিং এবং সতবন্ত সিং-এর মৃত্যুতে সেই 'অকাল তখতে' 'ভোগ'ও হল। ওদের পরিবারের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি দিল্লির বীরপুরুষেরা। পার্লামেন্টে ওদের স্থান নিয়ে কেউ প্রশ্নই তোলেনি। কেউ ওদের দিকে আঙুল তুলে বলেনি, "গদ্দারের বাপ-মা!"

অথচ আমরা কী পেলাম! যারা ষড়যন্ত্রের ত্রিসীমানায়ও ছিল না, সেই 'মাসুম' লোকগুলোর কী হল? যারা গুলি চালাল, তারা শহীদ। আর আমরা গদ্দার? ঐ বাহাত্তর ঘণ্টাতেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে ঐক্য নয়, ভারতবর্ষ ভেঙে আবার টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আর এবার দিল্লির মাটিতে বেঁচে থাকার অধিকার খোয়াল শিখেরা। এ কেমন দ্বিচারিতা! এ কেমন বিচার?

পয়লা নভেম্বরের ভোরে যখন ঘুম ভাঙল তখন চতুর্দিকটা কেমন যেন গুম্ মেরে রয়েছে। অসম্ভব একটা ভয়াবহ থমথমে পরিবেশ! কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনকি অন্যান্যদিনের মতো আকাশবাণীর সেই মিষ্টি সুরটাও শোনা যাচ্ছিল না। শোনা যাচ্ছিল না সরবজিত আর আমনপ্রীতের নিত্যনৈমিত্তিক 'তু তু ম্যায় ম্যায়।' স্টোভের কেরোসিন তেল পোড়ার মনমাতানো গন্ধটা অবশ্য অন্যান্যদিনের মতোই ভেসে আসছিল, কিন্তু বেবের চুড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম না! মঙ্গলপুরীর শিখ কলোনিতে তখন থেকেই যেন মহাশ্মশানের নীরবতা কায়েম ছিল। 'এমন নিস্তব্ধতা দমবন্ধ করে দেয়। একটা আট বছরের বালকও বুঝেছিল, এই নৈঃশব্দ একেবারেই স্বাভাবিক নয়। তবে সে এটা তখনও বোঝেনি যে এই নীরবতা মহাপ্রলয় আসার আগের ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা মাত্র!

বাপু সেদিন ঘরেই ছিলেন। আগের দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিল বলে আর বাইরে বেরোননি। আর বেরোতেনই বা কী করে? তাঁর অটো যে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তথাকথিত দেশপ্রেমীদের 'ভিড়'। বাপুর চিন্তিত, ফ্যাকাশে মুখে ভয়ের ছাপ দেখেছিলাম। কাল অনেক রাত অবধি তাওজির সঙ্গে নানারকম আলোচনা করছিলেন। গরীবের সংসারে একমাত্র রোজগেরে 'বান্দা'র রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলে বড়োই বিপদ হয়। অটোটা কিনতে বেবের গয়না বিক্রি করতে হয়েছে। তার সঙ্গে কিছু ধার-কর্জও ছিল। বেশিরভাগটাই চুকিয়ে দিলেও কিছু টাকা তখনও বাকি। তার ওপর যস্যিদিদির বিয়ের জন্যও প্রচুর খরচ হয়ে গিয়েছে। তার জন্য জমানো পুঁজি অনেকটাই খরচ হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে ধারও করেছিলেন বাপু। কিন্তু মাঝখান দিয়ে অটোটাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল, যস্যিদিদির বিয়েতেও বাধা পড়ল! তাঁর তো একুল, ওকুল-দুকুলই গেল। এখন কী করবেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কীভাবে দেনা শোধ করবেন, কীভাবে বাচ্চাদের মুখে দুটো রুটি তুলে দেবেন তা ভেবেই কূল পাননি। নতুন অটো কেনার মতো যথেষ্ট টাকাও নেই! আর তাওজি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বারবার বলছিলেন, "কোই না! সব ঠিক হয়ে যাবে।

কয়েকটা দিন সময় দে। আমি তো আছি।”

যে যা-ই বলুক, গরীব অটোওয়ালার অটোটাই চলে গেলে যে সংসারের কী অবস্থা হয় তা একমাত্র বাপুই বুঝতে পারছিলেন। তাঁর প্রশান্ত মুখে চিন্তার রেখাগুলো দৃঢ় হয়ে বসে যাচ্ছিল। আমি জানি, তিনি সারারাত ঘুমোননি। খালি ঘরের মধ্যে ওঁর অশান্ত পদক্ষেপের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। একটা গোটা রাত বাপু ছটফট করতে-করতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন। যতবারই ঘুম ভেঙেছে, তাঁর ছায়া দেখতে পেয়েছি। হয়তো বা তিনি আরও বড়ো সঙ্কটের অশনিসঙ্কেত পেয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কেউ তা বুঝিনি। তিনি বুঝতেও দেননি।

কিন্তু তখন কে জানত যে পরের দিনই সেই মহাপ্রলয় মার মার করতে করতে ধেয়ে আসবে! ‘গুমসুম’ ভোর আস্তে আস্তে বেলার দিকে চলল। কলোনির প্রত্যেকের মুখেই চিন্তার ছাপ। কেউই ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। কালকের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছে যে এই পরিস্থিতিতে বাইরে বেরোনো বিপজ্জনক। অন্যান্যদিন বাড়ির পুরুষেরা নিজেদের কাজে বেরিয়ে যায়। আজ বেশিরভাগই যায়নি। তারা নিজেদের মধ্যেই চাপা গলায় আলোচনা চালাচ্ছে। কংগ্রেস সমর্থক ও ইন্দিরা গান্ধীর অন্ধভক্তদের রাগ এখনও কমেনি। যতক্ষণ না তাঁর পার্থিব শরীরের অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে, ততক্ষণ হয়তো এই জনরোষ কমবেও না। এই কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তাঁর শূন্য আসনে ইন্দিরারই সুপুত্র রাজীব গান্ধী বসেছেন। এখন তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী। গতকালই মায়ের মৃত্যুর পরই শপথ গ্রহণ করেছেন। রাজীবের শান্তিপ্রিয় ও ঠান্ডা মেজাজের ওপর ভরসা ছিল সবারই। অনেকেই বলাবলি করছিল, আজ যদি সঞ্জয় গান্ধী জীবিত থাকতেন তবে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। সঞ্জয় অত্যন্ত প্রতিহিংসাপ্রবণ, বেপরোয়া ও গরম ‘দিমাগের’ মানুষ ছিলেন। কিন্তু রাজীব তেমন নন্। নয়তো এতক্ষণে দাঙ্গা লেগে যেত।

আমি সব টুকরো টুকরো কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে তখনও বিশেষ কিছু বুঝিনি। কে রাজীব, কে সঞ্জয় তাতে এক বালকের কিচ্ছু আসে যায় না। সে নিজের পরিবারের সঙ্গে আদরে, ভালোবাসায়, সুখাদ্য আর খেলায় মেতে থাকতে পারলেই খুশি। তার ‘ছুট্টি’ মঞ্জুর হলেও যস্যি দিদির বিয়েটা হল না, সেই দুঃখটা একটু ছিল।

কিন্তু বিয়ে শাদির আর কী! আজ হয়নি, কাল হবে। নভজ্যোত কিংবা যসমিত দিদি, কেউই পালিয়ে যাচ্ছে না। এই ইন্দিরাজি না কে একটা, তাঁর শেষকৃত্যের পরই সুযোগ সুবিধামতো বিয়েটাও হয়ে যাবে। তখন আমি নেচে নেচে ‘ঢোলকি' বাজাব।

বেলা একটু গড়াতে-না গড়াতেই মঙ্গলপুরীর চরম নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠল অনেক মানুষের কোলাহল। এমন শোরগোলের জন্য বোধহয় কেউই প্রস্তুত ছিল না। আমি নাশতা করে নিজের ঘরে বসে আপনমনেই ‘কঞ্চে' খেলছিলাম। এই নানারঙের মার্বেলগুলো বড়ো প্রিয়। সরবজিত ওর মার্বেলের শিশিতে হাতই দিতে দিত না। ‘কঞ্চেতে ও ওস্তাদ। প্রচুর রং বেরঙের মার্বেল জমিয়েছিল ও। তবে আমনপ্রীত প্রাজি সেদিক দিয়ে দরাজ মনের। সে তার মার্বেল আমাকে দিত। নিজেও খেলে খেলে কিছু জমিয়েছিলাম। সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। গভীর মনোসংযোগে একটা মার্বেলকে সবে তাক করেছি এমন সময়ই আকস্মিক চিৎকার চেঁচামেচিতে চমকে উঠলাম। এখন কারা এমন চেঁচাচ্ছে। কেনই বা চেঁচাচ্ছে!

ঘরের জানলা খোলাই ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই একরাশ বিস্ময় ও ভয় আমাকে ঘিরে ধরল। এত ধোঁয়া কোথা থেকে আসছে! আর সে কী কটু গন্ধ! নাকে এসে ঝাপটা মারতেই যেন দমবন্ধ হয়ে এল। এ তো স্বাভাবিক কাঠ-পাতা বা আবর্জনা পোড়ার গন্ধ নয়! কী পুড়ছে তবে?

“বাঁ-চা-ও...বাঁ-চা-ও।” একজন নয়, দু-জন নয়, হঠাৎই একরাশ কণ্ঠের আর্তচিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে কাঁপিয়ে দিল গোটা মঙ্গলপুরী, “সানু বাঁ-চা-ও!”

এ কলোনির প্রত্যেকেই কৌতূহলে ও সভয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখল একদল শিখ নর-নারী প্রাণপণে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে এদিকেই। তাদের মধ্যে কেউ রক্তাক্ত, কেউ আহত!

কারোর আবার হাতে পায়ে পুড়ে যাওয়ার দাগ। ভয়ে, নিঃসীম আতঙ্কে সবার চোখ বিস্ফারিত। মুখ কান্নাবিকৃত! চেঁচাতে চেঁচাতে, কাঁদতে কাঁদতেই চেঁচাচ্ছে, "আমাদের বাঁচাও...!"

"কী হৈয়া!...কী হয়েছে হ্যাঁ?"

সবার মধ্য থেকে সরতাজই এগিয়ে গেল তাদের দিকে। বাপুজিও দৌড়ে গেলেন ক্ষতবিক্ষত মানুষগুলোর কাছে। জানতে চাইলেন, "এ কী অবস্থা! কী করে হল?" উত্তরে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে তাদের এই অবস্থার কারণ বলতে শুরু করল। সেই শোরগোলের মধ্য থেকেই টুকরো টুকরো বাক্য ভেসে আসল কানে। শুনলাম, ওরা বলছে, "ওরা চারদিকের সবক'টা গুরুদ্বারায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে পা-জি। আগুন লাগিয়ে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। যে শিখেরা ভেতরে ছিল, তারা 'জিন্দা' পুড়ে মরেছে। গ্রন্থীজিকেও ধরে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমরা বাইরে ছিলাম। আমাদেরও মেরে ফেলত। কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি!"

ওদের মধ্যেই এক নারী কখনও অঝোরে কাঁদছে, কখনও থেকে থেকে ফিট পড়ছে আবার কখনও বা কপালে করাঘাত করতে করতে বিলাপ করছে, "আমার মরদ আর পুত্তরটা চোখের সামনে জিন্দা জ্বলে গেল ঈশ্বর... আমি কিচ্ছু করতে পারলাম না। 'রবজি' এ তোমার কেমন বিচার?... তোমার সামনে ওদের পুড়িয়ে মারল শয়তানরা! আমি শুধু ওদের চিৎকার শুনতে পেলাম... ওরা প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছিল আর চেঁচাচ্ছিল! ওরা... আরও শয়ে শয়ে মানুষ... বাঁচার জন্য আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছিল... বেরোনোর জন্য দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিল... কিন্তু কিচ্ছু হল না!...আমি এখনও সেই চিৎকার শুনতে পাচ্ছি... এখনও সেই চিৎকার... হায় রব্বা!"

বলতে বলতেই সে অবশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কলোনির মেয়েরা তাকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ততক্ষণে উগ্র কটু গন্ধ আর ধুমকুণ্ডলীতে ঢেকে গিয়েছে মঙ্গলপুরীর আকাশ! দিনের বেলাতেই বুঝি রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে! ধোঁয়ার মধ্যে নিঃশ্বাস নেওয়াও দায়। পরিস্থিতি বুঝে গোটা এলাকা উত্তেজিত ও ভয়বিহ্বল হয়ে উঠল। এই শিখের দল একদম অচেনা নয়। ওরা পাশের কলোনিরই মানুষ। ৩১ নম্বর ব্লকে থাকে সবাই। তবে এতটাই আহত ও রক্তাক্ত যে ঠিকমতো চেনা যাচ্ছিল না। ওদের মধ্যেই একজন ক্ষতবিক্ষত সর্দারজি মাথার জখম চেপে ধরে কোনোমতে বলল, "লোহার রড, চাকু, তরোয়াল আর কেরোসিন-গ্যাসোলিন-ডিজেল, 'সফেদ পাউডার' নিয়ে নেমে পড়েছে ওরা! হাতে জ্বলন্ত মশাল। যে সর্দারজিকে হাতের কাছে পাচ্ছে, তারই লাশ ফেলে দিচ্ছে। জগদীশ টাইটলার আর এইচ কে এল ভগতের পেটোয়া আদমি ওরা। শুনেছি, গান্ধীনগরেও শিখদের বস্তি ধরে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সুলতানপুরীকেও ঘিরে ধরেছে। পুরো কলোনিকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ পালাতে না পারে। সুলতানপুরী থেকে যাতে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে না পারে সেজন্য তরোয়াল হাতে 'নাকাবন্দি' করেছে। নারা দিচ্ছে, 'খুন কা বদলা খুনসে লেঙ্গে...!' ওরা আমাদেরও মারবে... আমাদের ঘরের দিকেও আসবে। ইন্দিরাজির 'মওতের' বদলা আমাদের থেকে নেবে। আমাদের বাঁচাও!"

এই পরিস্থিতিতে কে কাকে বাঁচায়। সেদিন উপস্থিত সব শিখ নারী-পুরুষের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেরাই কী করবে, কীভাবে নিজেদের বাঁচাবে সেটাই বড়ো চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার আশ্রয়প্রার্থীদেরও ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটা মানুষ বুঝেছিল যে 'দাঙ্গাই'রা যে-কোনোমুহূর্তে এখানেও এসে পৌঁছবে। এবং তাদের নিষ্ঠুরতার যা বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে তাতে প্রায় সবারই রক্তহিম হয়ে যায়। কিন্তু সরতাজের 'ফৌজি খুন' টগবগিয়ে উঠল। সে বলল, "খুন কা বদলা খুন! বললেই হল। দেশে পুলিশ আছে, ফৌজি আছে। স্বয়ং রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহ একজন শিখ। তিনি এয়ারফোর্স, নেভি ও আর্মিবাহিনীর প্রধান ও সর্বোচ্চ কম্যান্ডার। তিনি কিছু করবেন না?"

"তাঁর কিচ্ছু করার নেই পাজি।" একজন আহত মানুষ ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠল, "তুমি কি রেডিওতে সমাচার শোনোনি? ত্রিলোকপুরীতে কী হয়েছে জানো না? ওখানে আজ সকাল দশটা থেকেই তাণ্ডব হচ্ছে। তিনশো-চারশো লোকের ভিড় ব্লক নম্বর ছত্রিশের সামনে গুরুদ্বারা জ্বালিয়ে দিয়েছে। যারা গুরুদ্বারা জ্বালিয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পুলিশও ছিল। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। ত্রিলোকপুরীর অবস্থা খুব খারাপ। ঈশ্বরই জানেন ওখানে আর কী কী হচ্ছে আর এখানে কী হবে!"

"আর জ্ঞানী জৈল সিংই বা কী করবেন?" এবার বাপুজিই মুখ খুললেন, "কাল তো তাঁরই 'কাফিলা'র ওপরে দু-বার হামলা করেছিল দাঙ্গাইরা। 'কমল' সিনেমার সামনে তাঁরই কনভয়ের ওপর মশাল ছুড়েছে। এইমসের সামনে পাথরও ছুড়েছে।

অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন তিনি। ওদের একটাই কথা, 'সর্দার গদ্দার হ্যায়।" কিন্তু সরতাজ কিছুতেই হার মানবে না। চিরকালই তার 'জোশ' অন্যান্যদের থেকে বেশি। সে বলল, "এত সহজ! আমরাও এ দেশেরই বান্দা। এতদিন ধরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আছি। ভারতীয় আর্মির গর্ব শিখ রেজিমেন্ট। আমরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি, গুলি খেয়েছি, সে কি গদ্দার বলে? এক্ষুনি চলো তো থানায়। আমিও দেখে নেব, কোন্ শালার তরোয়ালে কত জোর।"

"একদম না পা'জি।" আক্রান্তদের মধ্যেই আর একজন মুখ খুলল, "পুলিশকেও বিশ্বাস নেই। সুলতানপুরীর ব্লক বি টু'র পার্কে আন্দাজ পাঁচশো-ছশো লোকের জমায়েত হয়েছিল সকালেই। আমি নিজের কানে শুনেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। ওখানে কংগ্রেস নেতা সজ্জনকুমার একেবারে গরমাগরম স্লোগান দিয়েছে, "সিখোঁ কো কাটো, মারো, আগ লগা দো...!" এমনকি এ কথাও বলেছে যে রওশন সিং আর ভাগ সিংকে যে মারবে তাদের সবাইকে নাকি একহাজার টাকা করে বকশিশ দেবে। অন্যান্য শিখদের মারলে পাঁচশো টাকা দেওয়া হবে। শিখদের মাথার বকশিস স্বয়ং সরকারই দিচ্ছে। তবু তুমি পুলিশের কাছে যাবে?"

"নয়তো কি চুপচাপ বসে থাকব?" সরতাজ গর্জে ওঠে, "অপেক্ষা করব যে কখন ওই পাঁচশো-ছশো লোক এখানে এসে আমাদের মারবে কাটবে-জ্বালাবে? তাছাড়া কয়েকজন কংগ্রেসি নেতার জন্য গোটা সরকারকেই সন্দেহ করা উচিত নয়। আমি এক 'টপ লেভেলের' আর্মি অফিসারকে চিনি। তিনি জ্ঞানী জৈল সিং-এর 'করিবি', ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। চলো, আমরা তাঁকেই গিয়ে ধরি। তার সঙ্গে পুলিশেও 'রপট' লেখাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই রায়ট বেশিক্ষণ চলবে না। জ্ঞানীজি বা রাজীবজি মিলিটারি নামিয়ে দিলেই দাঙ্গাইরা সরে পড়বে। চলো, চেষ্টা তো করি।"

তখনও শিখদের মনে বিশ্বাস ছিল যে রাজীব গান্ধীর সরকার তাদের বাঁচাবে। তাদের ধারণা ছিল, এটা নিতান্তই একটা ছোটোখাটো দাঙ্গা। দেশের আইন-প্রশাসনের ওপর ভরসাও ছিল। সকলেই বিশ্বাস করতে চাইছিল যে এসব বেশিক্ষণ চলবে না। একটু পরেই রাস্তায় নামবে আর্মি। গোটা শহর স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যাবে এই হত্যালীলাও। সরতাজ নিজেই আর্মির লোক হওয়ার দরুণ ভারতীয় আর্মির প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দুই-ই তার মনে ছিল। তারই নেতৃত্বে মঙ্গলপুরীর সমস্ত শিখেরা চলল নিকটবর্তী পুলিশ চৌকির দিকে। আমিও চুপচাপ বাপুর পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। সরতাজ আমায় দেখে ভুরু কোঁচকালো, "কাকে, তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

আমার পক্ষে তখন দাঙ্গা শব্দটার অর্থ বোঝা সম্ভব ছিল না। শুধু বুঝেছিলাম বিভিন্ন জায়গায় শয়ে শ'য়ে লোকের জমায়েত হচ্ছে। ওই যেমন বৈশাখীর মেলায় হয়। কিন্তু তার সঙ্গে গুরুদ্বারা পুড়ে যাওয়া বা এইসব আহত মানুষদের সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ওদের কথোপকথন শুনেও নির্বোধ বালক বুঝে উঠতে পারেনি যে এটা 'বৈশাখী'র মেলা নয়। ঐ আট বছরের শিশুর স্বপ্ন ছিল সরতাজের মতো জওয়ান অথবা পুলিশ হওয়ার। সে দেশসেবা করতেই চাইত যেমন ভগৎ সিং করেছেন, সর্দার উধম করেছেন। কিংবা সারাগড়ির সিপাইরা করেছে। সিপাই বা পুলিশ তার চোখে নায়কের সমান। সেজন্য সবাই পুলিশ চৌকি

যাচ্ছে শুনে সেই শিশুরও সাধ হয়েছিল পুলিশ স্টেশন দেখার! আমি সহজভাবেই বললাম, “আমিও তোমাদের সঙ্গে পুলিশ চৌকি যাব। বড়ো হয়ে আমিও পুলিশ হব, দেশের ফৌজি হব। দেশের জন্য জান দেব।”

সরতাজ নির্ঘাৎ সেদিনও মনে মনে বলেছিল, ‘গবেট!' কিন্তু মুখে কিছু বলেনি। পুলিশ আর ফৌজি দুটোই যে একসঙ্গে হওয়া যায় না সেটাও অপদার্থ শিশু জানত না। সে সস্নেহে আমার পাগড়িতে টোকা মেরে বলল, “নিশ্চয়ই হবি ক্কাকে। কিন্তু তার জন্য যে সাহসী হতে হবে। তুই সাহসী? হিম্মত আছে তোর?” আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, “আলবাৎ আছে।”

“তাহলে প্রমাণ কর।” সে ঝুঁকে পড়ে নীচু গলায় বলল, “দ্যাখ, কতগুলো দুষ্টু লোক আমাদের আর আমাদের ভাই-বোনদের মারতে আসছে। আমরা তাই থানায় যাচ্ছি। কিন্তু এই কলোনি আর তোদের ঘর, দিদি, বেবে আর বাকি মেয়েদের পাহারা দেবে কে? তাদেরও তো রক্ষা করতে হবে, তাই না?”

“বিলকুল।”

“তাহলে এই ছোটা সর্দার কি কলোনি রক্ষা করতে পারবে? আমরা যতক্ষণ না ফিরে আসছি, এই গড়ের সিপাহী হতে পারবে? হিম্মত আছে? তাকত আছে?” “হাঁ জি। আছে।” আমি কাঠি কাঠি হাতের মাসল্ ফোলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম, “রোজ আমি ইয়াব্বড় গ্লাসে দুধ খাই যে! তোমরা যাও, আমি কলোনি পাহারা দেব। কোনো দুশমনকে ঢুকতে দেব না।”

“সাব্বাশ। এই না হলে শিখের বাচ্চা।” সে আমার পিঠ থপথপিয়ে বলল, “যতক্ষণ না আমরা ফিরে আসছি, ততক্ষণ বীর নান্না সিপাহীরা সবাই বেবে আর দিদিদের পাহারা দেবে। তাদের একা ছেড়ে নড়বে না। তুই একজন সাচ্চা শিখ। শিখেরা সবসময় মেয়েদের যত্ন করে, সম্মান করে আর তাদের রক্ষা করে। তুই-ও করবি। কোই শ-ক্?”

“না জি!”

বাপু আর সরতাজ গোটা ভিড়কে নিয়ে পুলিশের সাহায্যপ্রার্থনা করতে গেল। আমি, সরবজিৎ আর আমনপ্রীত বাড়িতেই পাহারায় রইলাম। আমাদের হাতে কোনো তরোয়াল ছিল না। খঞ্জর, কৃপাণ, চাকু—এসব চালানোর অভিজ্ঞতাও নেই। থাকার মধ্যে ছিল শুধু কয়েকটা লাঠি। সেগুলোই হাতে নিয়ে শিশুবাহিনী কলোনি পাহারা দিতে শুরু করল। ওখানে যে ক-জন ছেলেপুলে ছিল তাদের প্রায় সবারই আদর্শ ছিল সরতাজ। তাই তার কথাকেই আদেশ হিসাবে মেনে নিয়ে বাচ্চারা সবাই নিজেদের পরিবারের মেয়েদের আগলে বসে রইল।

তখন মেয়েদের চোখে অসম্ভব ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা ফুটে উঠেছে। কলোনির গরীব মানুষদের সবার বাড়িতে রেডিওই ছিল না, টিভি তো দূর। একমাত্র নভজ্যোতদের বাড়িতে একটা সাদাকালো টিভি ছিল। গোটা কলোনিই প্রায় উপছে পড়ল ওদের বাড়িতে পরিস্থিতি দেখা বা শোনার জন্য। কিন্তু যত শুনছে, দেখছে এবং বুঝছে ততই আতঙ্কে কাঁপছে। আমিও শুনতে পাচ্ছিলাম সে খবর। টিভির পর্দায় দেখছিলামও। মোটামুটি চতুর্দিকে দৃশ্য একই। আচমকাই কোথা থেকে শ'য়ে শ'য়ে লোক এসে হাজির হচ্ছে। শিখ পুরুষদের কচুকাটা তো করছেই। তাদের গলায় জ্বলন্ত টায়ার পরিয়ে দিচ্ছে। এমনকি মেয়েদেরও ছাড়ছে না। তাদের ধরে ধরে গণহারে ‘বলাৎকার’ করা হচ্ছে। বাধা দিতে গেলে তরোয়াল দিয়ে পেট কেটে নাড়ি-ভুঁড়ি সব বের করে, তারপর গ্যাংরেপ করছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ত্রিলোকপুরীর। ওখানে এই হিংস্র ভিড় শিখদের কেটে টুকরো টুকরো করে তাদের মৃতদেহের ওপর কেরোসিন তেল ছড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বিধবারা তাদের প্রিয় মানুষদের মৃতদেহ তো দূর, ছাইটুকুও খুঁজে পাচ্ছে না! সঙ্গে সঙ্গে জ্বলছে তাদের ঘরও! হুড়হুড়িয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। একশো... দেড়শো...দুশো...!

সুলতানপুরীর মতো ত্রিলোকপুরীকেও শত্রুপক্ষ বেড় দিয়ে ঘিরে রেখেছে। ওই জ্বলন্ত শ্মশানভূমি থেকে বেরোনোর কোনো উপায়ই নেই। আর দাঙ্গাইরা একসঙ্গে সবাইকে মারছে না। একটু একটু করে, এক একটা ঘর ধরে ধরে, শিখদের বেছে বেছে মারছে। মেরে মেরে যখন নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন সাময়িক বিরতি দিচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে

এসেই ফের 'কতল-এ-আম্' চালাচ্ছে। ভয়ার্ত, হতভাগ্য মানুষগুলো বুঝতে পারছিল যে তাদের রক্ষা নেই। কিন্তু পালাবার পথ কই! যে রাস্তা দিয়েই পালাতে যাচ্ছে, সে রাস্তাতেই যমদূতরা অস্ত্র-শস্ত্র, জ্বালানি তেল, জ্বলন্ত টায়ার নিয়ে উপস্থিত। খুল্লা সড়কে কত শিখকে এমন দৌড় করিয়ে করিয়ে মারল তার হিসেব নেই। এমন নয় যে ত্রিলোকপুরীর বাসিন্দারা সবাই শিখ। ওদের মধ্যে কয়েকঘর হিন্দু কিংবা মুসলিমও ছিল। অথচ তাদের গায়ে কেউ হাত দেয়নি। ভিড় কোনো হিন্দু বা মুসলিমের ঘরে ঢোকেনি পর্যন্ত। তখনও বুঝিনি কোন্ যাদুতে ওরা অতবড়ো জনবহুল এলাকায় শুধুমাত্র শিখদেরই বেছে নিচ্ছিল। কী করেই বা জানছিল যে ঠিক কোথায়, কোন্ শিখ পরিবার বাস করে!

বেবে আর দিদির অবস্থা দেখে এই প্রথম আমিও ভয় পেয়ে গেলাম! বেবে উচ্চস্বরে কাঁদছিল আর বলছিল, "ওরা আমাদেরও মারবে! কেউ বাঁচবে না! আমার ছোটো ছোটো তিনটে ছেলে, জীবনের কতটুকুই বা দেখেছে। মেয়েটা বিয়ের স্বপ্ন দেখছিল, ওর সামনে গোটা জীবন-যৌবন। সবাইকে ওরা মেরে ফেলবে? তার চেয়ে রবজি, আমায় মেরে ফেলো, ওদের 'বখশ' দাও।"

যস্যিদিদি উচ্চস্বরে না কাঁদলেও তার চোখ বেয়েও জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। বাকি মেয়েদেরও অবস্থা শোচনীয়! আট বছরের জীবনে এই প্রথম আমিও জানলাম যে ভয় কাকে বলে! একটু আগেই যে বালক সাহসী ফৌজি হওয়ার দাবি করছিল, সে নিঃসন্দেহে সাহসী ছিল। শুধু একটা জিনিসই জীবনে কখনো টের পায়নি। মৃত্যুভয়! না, ঠিক মৃত্যুভয়ও নয়। তার চেয়েও বড়ো একটা আতঙ্কের মুখোমুখি সেদিন আমি হয়েছিলাম। তা হল নিজের অবধারিত মৃত্যুকে দেখতে পাওয়া! একটা মানুষের সামনে যদি আকস্মিকভাবে মৃত্যু এসে দাঁড়ায়, তবে সে আতঙ্কিত হওয়ার বিশেষ সময় বা সুযোগও পায় না। মরণযন্ত্রণাও তুলনামুলকভাবে সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আমরা সবাই জানতাম আমাদের 'কাল' ঠিক কোথা দিয়ে আসবে বা আসছে। ওই তিনশো মিটার লম্বা গলি দিয়ে ওরা আসবে! এ-ও জানতাম এই মৃত্যুফাঁদ থেকে বেরোনোর উপায় নেই। কোথায় যাব? কোথায়ই বা যেতে পারতাম? গোটা দিল্লিই যে জ্বলছে। গোটা শহরে এমন কোনো জায়গা ছিল না যেটা শিখদের জন্য নিরাপদ। তার সঙ্গে ঘিরে ছিল প্রবল অনিশ্চয়তা। শিয়রে শমন ঘনিয়ে আসছে তা জানা ছিল, তবে তা কখন এসে পড়বে তা জানতাম না। ফলস্বরূপ আমরা প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে মরছিলাম! এক একটা অনিশ্চিত লহমা আমাদের গায়ে জ্বলন্ত মশালের মতো ছ্যাঁকা দিয়ে যাচ্ছিল। হলফ করে বলতে পারি, ওই মুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকের সবক-টা ইন্দ্রিয় আরও অনেক বেশি প্রখর, অনেক বেশি 'চৌকন্না' হয়ে গিয়েছিল। সামান্য শব্দ পেলেও সবাই আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে! কোনোরকম পদধ্বনি শুনলে মনে হচ্ছে, 'ওই... ওরা আসছে।' একটু একটু করে ধোঁয়া আর পোড়া দুর্গন্ধ বাড়ছে! বুঝতে পারছি আশেপাশেই কোনো ঘর বা গুরুদ্বারা পুড়ছে। কোথাও শোরগোলের আওয়াজ শুনতে পেলেও সবাই ভাবছে, তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল বুঝি!

ওই এক-একটা সেকেন্ড আমার বয়েস একটু একটু করে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমার ভাবনাচিন্তার গণ্ডি আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছিল। আমি টেলিভিশনে দাঙ্গার বীভৎস রূপ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম—একই সময়ে,; একই সঙ্গে এতগুলো জায়গায় আলাদা আলাদা লোকের ভিড় কীভাবে উপস্থিত হচ্ছে? এত শয়ে শয়ে, হাজার হাজার 'খুংখার' লোক আদতে আসছে কোথা থেকে! তারা এত অস্ত্রশস্ত্রই বা পায় কী করে? এটা কি আদৌ কিছু ক্রুদ্ধ দেশবাসীর হামলা হতে পারে? সাধারণ দেশবাসী কি ঘরে তরোয়াল, জ্বলন্ত টায়ার, লোহার রড মজুত করে রাখে। যদি না রাখে, তবে এরা কারা? তাহলে কি গোটা দেশের মানুষই একজোটে শিখ প্রজাতিকে ধ্বংস করতে চায়? নাকি এ কারোর সুচিন্তিত পরিকল্পনা। একদম ঠান্ডা ও পাকা মাথার ষড়যন্ত্র!

তখন অবিকল এভাবেই ভাবিনি। কিন্তু এমনই কিছু একটা ভেবেছিলাম। মেয়েদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। হিমশীতল আতঙ্ক ওদের গ্রাস করে নিচ্ছিল। আর আমার রক্ত

গরম হয়ে উঠছিল। হাতে ধরা লাঠিটা আরও শক্ত করে কষে ধরেছিলাম। আমার চোখের সামনে বেবে, যস্যিদিদি, আমনপ্রীত, সরবজিৎ সহ সকলেই তখন থেকেই একটু একটু করে মরতে শুরু করেছিল। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুভয়ের নিষ্ঠুর ছুরি ওদের বুকের ভেতরটা কুপিয়ে যাচ্ছিল। সে যন্ত্রণা বলার নয়, সে রক্তক্ষরণ দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় যে ওরা সশরীরে মরার আগেই বীভৎস মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে।

আমার বুকের মধ্যে জোরে জোরে কে যেন নাগাড়া বাজাচ্ছিল। না, এ খুশির বা উৎসবের নাগাড়া নয়। বরং যুদ্ধের সরব ঘোষণা। ঠিক করেছিলাম, এখনই যদি ওরা এসে পড়ে, তবে মরার আগে কয়েকটাকে মেরেই মরব। আর কিছু না পারি মাথা ফাটিয়ে দেব। বাবা বলেছেন, আমিও 'জিদ্দি শিখ।' জিদ্দি শিখের বাচ্চা কী করতে পারে তা দেখিয়ে তবেই ছাড়ব। আবার পাশাপাশি ভীষণ কান্নাও পাচ্ছিল। বেবে, দুই প্রাজি, দিদি, ওদের কি তবে এই শেষবারের মতো দেখছি? জীবন ছোটো আর অনিশ্চয়তায় ভরা তা বাপু বলতেন ঠিকই। কিন্তু এত ছোটো? মাত্র আটবছর? "পরজাইজি... পরজাইজি...!"

এতক্ষণ ঘরের মধ্যে মেয়েদের চাপা কান্নাকাটির আওয়াজই শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎই কলোনির এক বাসিন্দা, কর্তার সিং সব ছাপিয়ে উচ্চস্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড়ে এল। সে প্রচণ্ড উত্তেজিত। উত্তেজনায় প্রায় কথাই বলতে পারছিল না। মেয়েরা সবাই, বিশেষ করে বেবে আর নভজ্যোতের মা জানতে চাইল, "কী হয়েছে?"

কর্তার সিং রেলস্টেশনে 'সামোসা' আর লস্যির একটা ছোট্ট স্টল লাগায়। আজও হয়তো লাগিয়েছিল। কোনোমতে বলল, "এইমাত্র রোক্ থেকে একটা ট্রেন এসেছে ভাবি! সেটা থেকে হাজার হাজার দাঙ্গাই লোহার রড, তরোয়াল আর সাদা পাউডার নিয়ে নামছে। ট্রেনের ভেতর থেকে একের পর এক সর্দারদের লাশ বের করছে ওরা। আমার চোখের সামনেই তিনটে বীভৎস কাটা লাশ ট্রলিতে চাপিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছিল। কোনোমতে 'ছুপছুপাকে' পালিয়ে এসেছি, কিন্তু আমার স্টলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।"

আমার অপরিণত মস্তিষ্কও সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে এই ভিড় শুধু সাধারণ জনতার নয়। যারা প্রিয় নেত্রীর মৃত্যুতে শোকার্ত তারা এমন 'দরিন্দগি' কীভাবে করতে পারে! এ শোকার্ত মানুষের রাগের বহিঃপ্রকাশ নয়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে দুষ্কৃতীরা একইভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিল, তা কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের ভিড়ের পক্ষে সম্ভব নয়। কর্তার সিং সেই সন্দেহকেই বাস্তব রূপ দিল। সে জানাল, "এদের স্পেশাল ট্রেন করে নিয়ে এসেছে দিল্লি সরকার। শুধু ট্রেন নয় পরজাইজি, স্টেট বাসে করেও নাকি সব আসছে। দিল্লি ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের সবক-টা বাসকে দাঙ্গাইদের জন্য নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনলাম, জেলের পেশাদার খুনি আর রেপিস্টদের ও নাকি এই কাজের জন্য বহাল করা হয়েছে। স্পেশাল ট্রেন আর বাসে ভরে 'হাথিয়ার' সমেত ওদের আমদানি করা হচ্ছে। আর সবকিছুর নেপথ্যে খোদ আমাদেরই সরকার!"

"কী বলছ।" বেবে কাতরস্বরে বলল, "এ অসম্ভব। রাজীব গান্ধী এমন করতেই পারেন না। তাছাড়া খোদ জ্ঞানী জৈল সিং এ দেশের রাষ্ট্রপতি। একজন শিখ হয়ে উনি শিখদের বাঁচাবেন না?"

বেবের তখনও ভারতবর্ষের সরকার ও জনগণের ওপর অটুট বিশ্বাস। কিন্তু তিনি তখনও অনেক কিছুই জানতেন না। আমরাও জানতাম না। জানলাম, যখন বাপু, সরতাজ সহ গোটা সর্দারদের দল হতাশভাবে, শূন্য হাতে ফিরে এল। ওদের ঘর্মাক্ত, ভয়ার্ত, হতাশায় ফ্যাকাশে মুখই বলে দিচ্ছিল যে পুলিশরা কোনো সাহায্যই করেনি। বাপু কোনো কথা না-বলে ঘরের ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সর্দাররা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কারোর মুখে কোনো কথা নেই। মেয়েরা বারবার উদ্বেগে প্রশ্ন করছে, "কী বলল পুলিশ? ওরা কি আমাদের বাঁচাতে আসছে?...জ্ঞানীজির সঙ্গে কথা কিছু হল? কী বললেন উনি?...সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না?...আর্মি কখন নামবে...?"

সরতাজ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত বলল, "আর্মি নামবে না পরজাইজি।

কেউ আমাদের বাঁচাতে আসবে না।”

“মতলব?” বেবের মাথায় কিছুই ঢোকেনি, “কেন আসবে না?”

সরতাজ কিছু বলার আগে নিজেকেই বোধহয় একটু গুছিয়ে নেয়। সে নিজেই অটুট বিশ্বাসে পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছিল। চেষ্টা করেছিল আর্মির এক বড়ো শিখ অফিসারের মাধ্যমে জ্ঞানীজির সঙ্গে যোগাযোগ করার। কিন্তু এখন তার ‘হুলিয়া’ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে বিশ্বাস তার চুরমার হয়ে ভেঙে গিয়েছে। কোনোমতে আঘাতটা সামলে নিয়ে সে যা জানাল তাতে উপস্থিত ভিড়ের শেষ আশাটুকুও বুঝি ধুক করে নিভে গেল!

প্রথমেই সরতাজরা গিয়ে পৌঁছেছিল পুলিশ চৌকিতে। সেখানে কয়েকজন 'হাবলদার’ আর অফিসার বসে নিজেদের কাজ করছিল। সমবেত শিখদের দেখেও তারা কোনোরকম উচ্চবাচ্য করেনি। গোটা কলোনিকে নেতৃত্ব দিচ্ছিল সরতাজ আর আমার বাপু। ওঁরা যখন দিল্লির এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কথা বলে সাহায্যপ্রার্থনা করলেন তখন থানার ‘দারোগাজি’ শান্তস্বরে বললেন, “এসব ‘আফওয়া’, গুজব কে রটাচ্ছে? এখানে কোনো অশান্তি নেই পা''জি। সব আন্ডার-কন্ট্রোল। তোমরা বাড়ি যাও-লস্যি টস্যি খাও। চিন্তার কোনো কারণ নেই।”

বলাই বাহুল্য ওদের সঙ্গে আক্রান্ত শিখরাও ছিল। তারা যখন সমস্বরে প্রতিবাদ করতে শুরু করল, তখন দারোগাসাহেব যেন একটু রেগেই গেলেন, “আরে, দাঙ্গা হচ্ছে বললেই হবে? কই, আমরা তো কিছু শুনিনি। তেমন কিছু চোখেও পড়েনি। তোমরা নিজেরা মাথাগরম পাবলিক, অল্পেস্বল্পতেই লাঠিসোঁটা নিয়ে মারামারি শুরু করে দাও। এসব তোমাদের নিজেদেরই ‘কর্তৃত।’ এখন দাঙ্গাইদের দোষ দিলে হবে?”

সরতাজের মাথায় ফের রক্ত চড়ে যায়, “আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন ওরা আহত! কীভাবে হাত পা পুড়ে গিয়েছে। তারপরও এফ.আই.আর. লিখবেন না? মঙ্গলপুরীর চারপাশের সবকটা গুরুদ্বারা জ্বলছে। সেখানে লুটপাট, খুন সব হচ্ছে। সেগুলোও কি আমরাই জ্বালিয়েছি? নিজেরাই নিজেদের গ্রন্থীকে মেরে নিজেদেরই ঈশ্বরের ঘর লুট করেছি? আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা আপনাদের ডিউটি! অথচ আপনি বলছেন, সব আন্ডার-কন্ট্রোল...!”

অফিসার তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “তুই আমাদের ডিউটি শেখাচ্ছিস? যাঃ! লিখব না এফ.আই.আর.। কী করবি? ক্যায়া উখাড় লেগা মেরা? তাছাড়া কীসের এফ.আই.আর.? যখন কোথাও কিছু হয়ইনি, শহরে শান্তি কায়েম আছে, তখন খামোখা এফ.আই.আর. লিখতেই বা যাব কেন? দু-চারটে গুরুদ্বারা জ্বলেছে তো কী হয়েছে! কত মন্দির, মসজিদ রোজ ভাঙছে, জ্বলছে তার ঠিক নেই, আমরা সব কাজ ফেলে কি এখন থেকে মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরুদ্বারার সামনে ডিউটি, দেব! ওসব কোনো রিপোর্ট-টিপোর্ট, এফ.আই.আর. লেখা হবে না। চলতা বন্!” সে আরও কিছু বলতেই যাচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণহীন রাগে, ক্ষোভে নির্ঘাত তেড়েফুঁড়ে গালাগালিই দিয়ে দিত। তার আগেই আহত শিখদের মধ্যে একজন তার কানে ফিশফিশ করে বলল, “পাজি, একটু তফাতে চলো। কথা আছে।”

সরতাজ তার আক্রোশ তখনকার মতো সামলে নিয়ে সেই লোকটির সঙ্গে একটু নিভৃত কোণে সরে গেল, “কী গল্ হ্যায়? দস্যো....!”

“পাজি, এই দরোগাসাবকে আমি চিনতে পেরেছি।” লোকটি সন্তর্পণে জানায়, “যখন গুরুদ্বারা জ্বালানো হচ্ছিল, সেই ভিড়ে এই লোকটাও ছিল!”

সরতাজের পায়ের তলা থেকে বুঝি মাটি সরে যায়। কোনোমতে বলল, “তুমি ঠিক দেখেছ? কোনো ভুল হচ্ছে না তো?”

“কোনো ভুল হয়নি।” সে বলে, “ও প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। তারপর শিখরা যখন জ্বলন্ত গুরুদ্বারা থেকে বেরিয়ে আসার শেষ চেষ্টা চালাচ্ছিল, তখন এই কুত্তার পিল্লা দলবল নিয়ে তাদের লাঠিপেটা করে, গুলি মারার ভয় দেখিয়ে ফের গুরুদ্বারার ভেতরে যেতে বাধ্য করেছিল। যারা আগুনে জ্বলতে জ্বলতে বাঁচার আশায় বাইরে ছুটে আসছিল,

তাদের শ্যুট করেছে। আমরা বাধা দিতে গিয়েছিলাম। তখনও এই শালাই আমাদের পুলিশি ডান্ডা দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আমি নিজের নাম ভুলে যেতে পারি, কিন্তু এই মুখ কোনোদিন ভুলব না। এই সেই শয়তান। আর ওর সঙ্গে 'হাবলদারগুলোও ছিল।"

সরতাজের মনে হল, এই মুহূর্তে তার গোটা বিশ্বটা যেন কোনো বাস্তবের পাথরের ধাক্কায় কাচের ঘরের মতো ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল। যে দেশের আইন-কানুনের ওপর তার ভরসা ছিল, আজ সেই দেশই প্রতিহিংসায় মত্ত হয়ে উঠেছে। যে রক্ষকের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সে যদি নিজেই ভক্ষক হয় তবে অসহায় মানুষ নিরাপত্তা কোথায় খুঁজবে! তার চতুর্দিকটা তখন কাঁপছে! রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়েও সে এত বিচলিত হয়নি, যতখানি আজ হচ্ছে।

বাপু তখনও দারোগাসাহেবের কাছে নম্র কণ্ঠে অনুনয় বিনয় করছিলেন। কিন্তু লোকটার সেই একই কথা, "কোথাও কিছু নেই, খামোখা এফ.আই.আর. করব কেন? প্রোটেকশনই বা কীসের? এখানে কোনো দাঙ্গা হচ্ছে না। তোমরা বাড়ি যাও।"

সরতাজ এবং বাপু স্পষ্ট বুঝেছিলেন, পুলিশ তাদের এফ.আই.আর. নেবে না! রাষ্ট্র যখন নিজেই হত্যালীলায় নেমেছে, তখন আইনও তাদের হাতের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁরা তখনও জানতেন না যে আগের রাতেই সবক-টা থানায় পৌঁছে গিয়েছিল নির্দেশ, "তোমরা কোনো অ্যাকশন নেবে না। কোনো থানায় কোনো এফ.আই.আর. নেওয়া হবে না।" এ তথ্যটা তখন কারোরই জানা ছিল না। আমিও অনেক পরে জেনেছিলাম। আন্দাজ বিশ বছর লেগেছিল এই ঘটনার বাস্তবতা জানতে।

কিন্তু বাস্তবচিত্র তখনও ওঁদের চোখের সামনে ছিল। বিফল মনোরথ হয়ে যখন সর্দারের দল থানার বাইরে বেরিয়ে আসছিল, তখনই থানার চৌহদ্দির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বড়ো প্রিজন ভ্যান চোখে পড়ল সবার। কিন্তু প্রিজন ভ্যানের মধ্যে কোনো বন্দি নেই। বরং গোটা ভ্যানটাতেই ঠাসাঠাসি করে রাখা আছে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। সর্দারদের লাশ। সেদিকে চোখ পড়তেই ভয়ে আঁতকে উঠলেন বাবা। অনেক সর্দার 'উলটি'ও করে ফেলল। সে কী বীভৎস দৃশ্য। কারোর মাথা নেই, মুণ্ডহীন ধড় থেকে তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। কেউ এমন পুড়ে গিয়েছে যে তাকে মানুষ বলে শনাক্ত করাই দায়! তার মধ্যে আছে এক নারীরও দেহ, যার দেহের গোপনাঙ্গ দিয়ে আভ্যন্তরীণ অঙ্গ, কিডনি, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, সব বাইরে বেরিয়ে এসে ঝুলছে। কোনোটার আবার চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, কারোর দুটো হাতই কাটা, কারোর পা নেই। থানার বাইরে ছড়িয়ে আছে শিখদের অজস্র বিকৃত মৃতদেহ। অথচ থানার বক্তব্য, "কোনো দাঙ্গাই হয়নি। এখানে শান্তি বজায় আছে।"

ওদের সবার মধ্যে একমাত্র সরতাজই শক্ত মনের মানুষ। সে ওই মুণ্ডহীন কবন্ধ, জ্বলে-ভুনে যাওয়া শব আর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিড়ের মধ্য থেকেই একটা কাতরোক্তি শুনতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল প্রিজন ভ্যানটার দিকে। যুদ্ধক্ষেত্রে সে নিঃসন্দেহে অনেক ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা দেখল তাতে তার 'রুহ' কেঁপে গেল! সার সার রক্তাক্ত, বীভৎস, কর্তিত শবের মধ্যে একটি দেহ তখনও নড়াচড়া করছিল। তার কাতর কণ্ঠ শুনতে না পেলে হয়তো তাকেও লাশই ভাবত সবাই। কিন্তু তখনও দেহটার ভেতরে প্রাণ আর হুঁশ—দুই-ই ছিল! সরতাজ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখল তার সামনে, ভ্যানের মধ্যে বড়ো অযত্নে পড়ে আছে এক পনেরো কি ষোল বছরের ছেলে! তার গলার অনেকটাই কাটা! শুধু কয়েকটা শিরা আর নার্ভ তখনও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি বলে দেহ থেকে মাথাটা খসে পড়েনি, ঝুলছে। বুক আর পেটের মাংস, পেশি কেটে একেবারে হাট করে খুলে দিয়েছে হত্যাকারীরা। যেমন বায়োলজি ক্লাসের ছাত্ররা ব্যাঙ কেটে তার আভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রদর্শন করে, ঠিক তেমনই যেন ওকেও জ্যান্ত ডিসেকশন টেবিলে শুইয়ে কেটেছে কিছু মানুষ। সরতাজ তার ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী সব দেখতে পাচ্ছিল। একটা রক্তের মোটা স্রোত তার শরীর থেকে বেরিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিশোরটির তখনও জ্ঞান ছিল। সে সরতাজকে দেখতে পেয়ে ফিশফিশ করে নিস্তেজ স্বরে বলল,

"পানি...পানি....!"

পুলিশ চৌকির ভেতরেই জলের কল ছিল। সে দৌড়ে গিয়ে এক আঁজলা জল ভরে এনে মৃত্যুপথযাত্রী ছেলেটির মুখে দিল। তার কণ্ঠস্বর ক্রন্দনবিকৃত হয়ে আসছিল। এ তো একটা বাচ্চা ছেলে! সবে মুখে নরম নরম গোঁফদাড়ি দেখা দিতে শুরু করেছে। ওইটুকু কিশোরকে এরকম নারকীয় মৃত্যু দিতে চেয়েছে আততায়ীরা! তাছাড়া এখনও তো ছেলেটা বেঁচে আছে। এখনও হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো অকালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে না সে। পুলিশরা কি এটাও দেখেনি যে ছেলেটার মধ্যে এখনও 'জান' বাকি আছে?

"কাকে, তুই এখানে কী করছিস? পুলিশদের বল্, তোকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে।"

সরতাজের ব্যাকুল আর্দ্র কণ্ঠস্বর শুনে ছেলেটার চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ল। অতিকষ্টে বলল, "গত তিনঘণ্টা ধরে বলছি জনাব... চিৎকার করে করে বলেছি...! কিন্তু কেউ শুনছে না....তিনঘণ্টা ধরে আমাকে এখানেই ফেলে রেখেছে.... এখন আর পারছি না... আর পারছি না... ওরা সবাইকে মেরেছে... বাপু, তায়া, ফুফা, মামা—সবার লাশ এখানেই... আমিও...আমিও...।"

বলতে বলতেই প্রবল একটা হেঁচকি ওর বাক্যরোধ করল। গত তিনঘণ্টা ধরে ও কোনোমতে প্রাণটাকে ধরে রেখেছিল। এমনকি সাহায্যের আশায় চিৎকারও করেছে। কিন্তু আর যুদ্ধ করতে পারল না। হয়তো এই জলটুকুর জন্যই ওর প্রাণটা আকুলি-বিকুলি করতে করতে অপেক্ষা করছিল। তৃষ্ণা মিটতেই সে-ও দেহ ছেড়ে যাত্রা করল মৃত্যুর দিকে। ষোল বছরের কিশোরের সমস্ত সংঘর্ষ শেষ হল।

সরতাজের চোখে জল আর রক্ত দুই-ই জমছিল। সে স্পষ্ট দেখতে পেল ছেলেটার দেহের দৃশ্যমান হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফুসফুসও নড়াচড়া বন্ধ করেছে। শুধু একজোড়া করুণ জলভরা চোখ তখনও অনেক প্রশ্ন নিয়ে নিষ্ঠুর পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিল। হয়তো জিজ্ঞাসা করছিল-আমি কী অপরাধ করেছিলাম? কেন তিনঘণ্টা ধরে আমায় এখানেই ফেলে রাখা হল। কেন চিকিৎসার সামান্য সুযোগটুকুও পেলাম না? কেন...?

সরতাজ ছেলেটার চোখ দুটো হাত দিয়ে বন্ধ করে দিল। তারপর ফিরে এল নিজের দলের কাছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও বাকিরা সবটাই হৃদয়ঙ্গম করেছিল। বাপু জিজ্ঞাসা করেন, "ওরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল না কেন? ও তো বেঁচে ছিল!"

"তিনঘণ্টা সময় যথেষ্ট ছিল। এখান থেকে হাসপাতাল মাত্র পাঁচমিনিটের দূরত্বে। কিন্তু বাঁচিয়ে রাখবে না বলেই নিয়ে যায়নি।" সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "এরা যেমন বলেছে দাঙ্গা হয়নি, তেমন এটাও বলবে যে ছেলেটা আগেই মরে গিয়েছিল। তোমরা ঠিকই বলেছিলে। পুলিশ অন্ধ ও বধির হয়ে বসে আছে। ওদের দিয়ে কিছু হবে না।" "তবে?"

এই প্রশ্নটার উত্তর সরতাজেরও জানা ছিল না। সে শুধু দেখছিল অগুনতি অসহায়, কাতর চোখ ওর দিকেই অনিমেষে তাকিয়ে আছে। তাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি জানতে চাইছে, তবে কি বাঁচার কোনো উপায়ই নেই? সে মনে মনে অসহায়বোধ করলেও হাল ছাড়ল না। দলের সবাইকে বলল, "তোমাদের কাছে টাকা আছে? তাহলে চলো, এক আর্মি অফিসারকে ফোন করি।"

তখন সদ্য সদ্যই পি.সি.ও. বস্তুটি ভারতবর্ষে এসেছে। তাও সর্বত্র নয়। তবে দেশের রাজধানী হওয়ার দরুণ দিল্লিতে হাতে গোণা কয়েকটা ফোন বুথ ছিল। ফোন করাটাও সাধারণ মানুষের কাছে বিলাসিতা। পথেঘাটে এমন মুড়ি-মুড়কির মতো ফোনবুথও পাওয়া যেত না। তা সত্ত্বেও কপালগুণে অনেক খুঁজে পেতে একটা বুথ পাওয়া গেল। সেখান থেকেই সরতাজ আর্মির এক রিটায়ার্ড কর্নেল অমৃতপাল সিংকে ফোন করল। অমৃতপাল যা জানালেন, তাতে তাদের সবার হাতে বোধহয় শেষ সম্বল খড়কুটোটুকুও রইল না। তিনি নিজেই ব্যাকুলস্বরে বললেন, "সরতাজ, আমি সকাল থেকেই জ্ঞানীজিকে ফোন করছি। একা আমিই নই, রাষ্ট্রপতিভবনে মিনিটে মিনিটে হাজার হাজার ফোন ঢুকছে। গোটা দেশে যত শিখ আছে, সবাই ওঁর কাছে দরবার করছে, বাঁচানোর আর্জি পেশ করছে। উনিও আপ্রাণ

চেষ্টা করেছেন রাজীবজির সঙ্গে আলোচনা করার। সকাল থেকে অগুনতিবার জ্ঞানীজি রাজীব গান্ধীকে ফোন করেছেন।"

"রাজীবজি কী বলছেন? আর্মি নামবে?"

সরতাজের প্রশ্ন শুনে করুণ হাসলেন অমৃতপাল, "না। রাজীবজি জানিয়েছেন যে এখনই আর্মি নামানোর মতো এমার্জেন্সি কিছু হয়নি। পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণেই আছে। পুলিশই সামাল দিতে পারবে। এগুলো নিতান্তই বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সামান্য জনরোষ মাত্র। এর জন্য আর্মি নামানোর কোনো মানে হয় না।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সে। অমৃতপাল সিং-এর কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না! অথবা শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না। রাজীব গান্ধী বলেছেন, পুলিশই সামাল দিতে পারবে! পুলিশ কেমন সামাল দিচ্ছে তা স্বচক্ষেই দেখেছে! কোনোমতে স্খলিত স্বরে বলে, "জ্ঞানীজি কিছু বলেননি এর উত্তরে?"

"জ্ঞানীজি বলবেন কী? তিনি তো তখনই বলতে পারবেন যখন রাজীবজি ওঁর ফোন ধরবেন! এই কয়েকটা কথা বলেই উনি ফোন কেটে দিয়েছেন। তারপর থেকেই জ্ঞানীজি পাগলের মতো ওঁকে বিস্তারিত অবস্থা বলার জন্য ফোন করছেন। কিন্তু ফোন বারবার কেটে যাচ্ছে। ওপ্রান্ত থেকে কোনো উত্তরই নেই। ফোনই ধরছে না কেউ!" "তাহলে উপায়?"

"জানি না সরতাজ।" তিনি অসহায়ভাবে বলেন, "আমার বাড়ির সামনেও 'মক্' অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পাথর ছুড়ে জানলার কাচ ভাঙছে। স্লোগান দিচ্ছে, 'গদ্দারকো মারো।' আমি নিজেই কী করব বুঝতে পারছি না। হাজারবার পুলিশ স্টেশনে ফোন করেছি। ওরা স্রেফ বলছে, 'দেখছি।' এখনও পর্যন্ত দেখার সময় করে উঠতে পারেনি। আমাকে তো ছাড়ো। শুনেছি, গ্রুপ ক্যাপ্টেন মনমোহনবীর সিং তলোয়ারের প্যাটেল নগরের বাংলোয়ও 'মব' ঢুকেছে। ওঁর বাড়ি ভাঙচুর করেছে। এমনকি ফ্রন্ট লনে ঢুকে পড়ে বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টাও করেছে। গ্রুপ ক্যাপ্টেন তলোয়ার অবশ্য ছাড়ার পাত্র নন। উনি টুয়েলভ বোরের লাইসেন্সড গান হাতে রেখেছেন। আর ওঁর ছেলেরা হকি স্টিক নিয়ে বসে আছে। দরকার পড়লে ফায়ারও করবেন।" বলতে বলতেই তাঁর স্বর কেঁপে গেল, "আমিও রাইফেল নিয়ে বসে আছি। মরতে ভয় পাই না। দরকার হলে শালাদের লাশ ফেলে দেব। কিন্তু তোমার 'ভাবি'র জন্যই ভয় লাগে। তোমার আশেপাশে কোনো হিন্দুদের ঘর আছে? তবে সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারো। অন্তত প্রাণটা বাঁচবে। এইটুকু পরামর্শই দিতে পারি।"

সরতাজ ফোনের লাইনটা কেটে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অমৃতপাল সিং এর মতো একজন আপাদমস্তক দেশভক্ত মানুষ, আর্মির রিটায়ার্ড কর্নেলকে ওরা 'গদ্দার' বলছে! লোকটা জীবনের প্রায় সব কিছুই দিয়ে দিয়েছে ইন্ডিয়ান আর্মিকে। জীবন-যৌবন-খুন-পাসিনা, এমনকি সন্তানও! ওঁর বড়ো ছেলে কয়েক মাস আগেই সিয়াচেনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। কুড়ি বছরের জোয়ান ছেলে ছিল সে। তা সত্ত্বেও অমৃতপাল এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেননি। উলটে বলেছেন, "আমার আফসোস যে রবজি আমায় মাত্র দুটো ছেলে দিয়েছেন। দেশ একজনের সেবা গ্রহণ করেছে। আর একজনকেও আমি দেশের নামেই উৎসর্গ করব। যদি আরও একশোটা ছেলে থাকত, তারাও দেশের জন্যই শহীদ হত।"

অমৃতপাল কথা রেখেছেন। মাসখানেকের মধ্যেই তাঁর ছোটো ছেলেও আর্মিতে জয়েন করল। সেই মানুষ কিনা আজ 'বেইমান!' আর মনমোহনবীর সিং তলোয়ারের বাড়িতেও ঢুকে পড়েছে এই নির্লজ্জ জনতা। উইং কম্যান্ডার তলোয়ার 'সরগোঢ়া' বম্বিং-এর জন্য বিখ্যাত। ইন্দো-পাকিস্তান ওয়ারের বীর যোদ্ধাকে এই দেশই তাঁর বীরত্বের জন্য 'মহাবীরচক্র' সম্মানে ভূষিত করেছিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই তাঁকে 'বীরের' সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। অথচ আজ কতগুলো শয়তান তাঁরই ঘরে হামলা চালাচ্ছে। তাঁকে দেগে দিচ্ছে 'গদ্দার' বলে। মহাবীরচক্র পাওয়া বীর যোদ্ধা আজ সবার চোখে দেশদ্রোহী! এ কী জাতীয় বিচার?

সরতাজের অভিজ্ঞতা শোনার পর কলোনির বাসিন্দাদের অবস্থা আরও খারাপ হল।

যেটুকু আশা নিয়ে বসেছিল সবাই, তাও রইল না। ওদিকে ততক্ষণে মঙ্গলপুরীর বাইরের দিকের শিখ-বসতিতে সম্ভবত আগুন লাগানো হয়েছে। অসহায় মানুষগুলোর চিৎকার, মরণ আর্তনাদ ও ভিড়ের নৃশংস উল্লাসধ্বনি এখান থেকেই স্পষ্ট শোনা যায়। ক্রমাগতই সে আওয়াজ বাড়ছে। ওরা আসবে... ওরা এদিকেও আসবে। কানে এল ওদের স্লোগান, "খুন কা বদলা খুন! এক ভি গদ্দার বচনা নেহি চাহিয়ে...!" আমার ছোট্ট বুকের ভেতরটা যেন তখনই পুড়ে যাচ্ছিল। মাত্র আটবছরেই সব কিছু বুঝতে পারছিলাম। এক ধাক্কায় অতখানি সমঝদার কী করে হয়ে গেলাম, তা নিজেই জানি না। ওইদিনই কালান্তক দুটো নাম— ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী, আমার মাথায় একদম আঠার মতো সেঁটে গেল। এই দুটো নামের ভার আমি এখনও বয়ে চলেছি। হয়তো আমৃত্যু এই দুটো নাম আমায় ছাড়বে না। কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল, ক্রমাগতই একটা হিংস্র মাংসাশী প্রাণী একটু একটু করে আমায় জ্যান্তই কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে! যন্ত্রণায় ছটফট করছি, তবু কিছু করার নেই!

"কোই না!" সরতাজের মুখ কঠিন হয়ে আছে, "কেউ যদি সাহায্য না-করে তবে আমরা নিজেরাই লড়ব। আমরাও টিট্ শিখ। একশো, দুশো, পাঁচশো-হাজার, কত আসবে আসুক। দেখে নেব। আমি যাচ্ছি আমার ঘর থেকে রাইফেল নিয়ে আসতে। বাকি পুরুষেরাও হাতের কাছে যা পাও, লাঠি, চাকু, খঞ্জর, তরোয়াল, কৃপাণ, সব নিয়ে এসে হাজির হও। এত সহজে মরব না। আমরাও লড়ব।"

তার কথার মধ্যে এমনকিছু ছিল যা উপস্থিত সবার রক্ত গরম করে দিল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যে যার বাড়িতে যত অস্ত্র পেল, সব নিয়ে এসে হাজির। শিখ জাতিরা নিরীহ হলেও সবসময়ই ঘরে ছোটোখাটো কিছু অস্ত্র রাখে। আমাদের মধ্যে দু-তিনজন মাংসের দোকানেও কাজ করত। তারাও তাদের মাংস কাটার বড়ো বড়ো 'চপার' নিয়ে এল। কেউ কেউ 'কুলহারি' অর্থাৎ কুড়ুলও নিয়ে এসে হাজির। সঙ্গে কৃপাণ, লাঠি, তরোয়াল তো ছিলই। আর ছিল সরতাজের বিশ্বস্ত রাইফেল!

বাপু এতক্ষণ বাড়ির ভেতরেই ছিলেন। এবার তিনি আর তাওজি তরোয়াল আর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সরতাজ বাচ্চা ছেলে ও মেয়েদের দিকে তাকিয়েছে, "তোমরা সবাই যে যার ঘরে চলে যাও। ভেতর থেকে একদম কুন্ডি লাগিয়ে দাও। যতক্ষণ না আমরা বলব, কেউ বেরোবে না।"

"আমিও লড়ব!"

আমার কথা শুনে সে ওই পরিস্থিতিতেও হেসে ফেলল। বলল, "লড়বি বৈ কি! তুই বাঘের বাচ্চা। লড়বি না তা কি হয়? তাই সবচেয়ে শক্ত লড়াইটাই লড়তে হবে তোকে। আমরা গড়ের বাইরে পাহারা দিচ্ছি। তোরা ভেতরে পাহারা দিবি। শত্রু বাড়ির ভেতরে ঢুকলেই মারবি। কিন্তু এখন ভেতরে যা ছোটো জওয়ান। এখানে যা-ই ঘটুক বেরোবি না। দরজা খুলবি না। ডটকে সর্দারা!"

কথাটা আমার পছন্দ না হলেও সরতাজের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা ছিল না। সময়ও খুব কম। তাই বেবে, যস্যিদিদি, সরবজিত, আমনপ্রীত, তাইজি— সবাই বিনাবাক্যব্যয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বাকিরাও তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে চলে গিয়েছে।

বেবে ভেতর থেকে দরজায় কুন্ডি লাগিয়ে দিল। কিন্তু আমিও বড়ো জিদ্দি' ছিলাম। ওরা যখন বাড়ির ভেতরে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে, তখন সবাইকে লুকিয়ে চুপচাপ ছাতে উঠে গেলাম। সেখান থেকে চতুর্দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমি সেখান থেকেই দেখতে পেলাম শয়ে শয়ে খ্যাপা কুকুরের মতো লোক এদিকেই ছুটে আসছে। তাদের হাতে মশাল জ্বলছে। জ্বালানি তেলের ডিব্বা হাতে। আরও কত অস্ত্র-শস্ত্র। চতুর্দিকে শুধু 'ধুঁয়া' আর 'ধুঁয়া'। হু হু করে জ্বলছে শিখ কলোনির সব বাড়ির ছাত! কলোনির রাস্তার দিকে তাকিয়ে প্রথমে বুঝতেই পারলাম না, আচমকা রাস্তাটা অমন লাল হয়ে গেল কী করে। যেদিকেই তাকাই, শুধুই লাল রঙের স্রোত! পরমুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝে আমার হৃৎপিণ্ড প্রায় স্তব্ধই হয়ে গেল। ওটা রক্ত! রাস্তাটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে! শুধু তাই নয়, তার মধ্যে ঠাসাঠাসি করে

পড়ে আছে অগুনতি মৃতদেহ। গলিতে পা রাখার জায়গাই নেই। ওরা শিখদের কাটতে কাটতে, মারতে মারতে, তাদের মৃতদেহ পায়ের তলায় পিষতে পিষতে আসছে!

আমার মনে হল, এখনই মাথা ঘুরে ছাত থেকে পড়ে যাব। এ কী দেখছি! এর চেয়ে বোধহয় নরকের দৃশ্যও ভালো। সরতাজের মুখে যখন বিবরণ শুনছিলাম, তখন আন্দাজ করেছিলাম যে ঠিক কী পরিমাণ বীভৎসতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন বুঝলাম, আমার কল্পনা বাস্তবের এক শতাংশও ছিল না! ছাতে ওঠার দরুণ যেমন মৃতদেহ দেখতে পাচ্ছিলাম, তেমন মঙ্গলপুরীর অন্যান্য ব্লকের ওপর ওদের আক্রমণও আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। দাঙ্গাইয়ের দল গোটা মঙ্গলপুরীকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে এগিয়ে আসছে। ওরা এক সর্দারজির ওপর সাদা পাউডার ছুড়ে মেরে আগুন ধরিয়ে দিল। সেই সর্দারের অন্তিম আর্তনাদও আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম আগুন হিংস্র, পৈশাচিক নাচ নাচতে নাচতে লোকটাকে গ্রাস করছে। জ্বলন্ত মানুষটা পুড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে! আপ্রাণ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভানোর প্রয়াস চালাচ্ছে দেখে আততায়ীর দল এবার পাউডারের ওপরে পুরো কেরোসিনের ডিব্বাই উলটে দিল। মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার ফলে আগুনের আক্রোশ যেটুকু কমেছিল, নতুনভাবে আরও ইন্ধন পেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল! আর বাঁচার রাস্তাই নেই!

জ্বলন্ত মানুষটার গলা দিয়ে যে চিৎকারটা বেরোলো, বোধহয় সে আওয়াজ কোনো মানুষের গলা দিয়ে বেরোবে না। বাপু বলত নরকের পিশাচদের যখন গরম তেলে ফোটানো হয় তখন তাদের আর্তনাদে ত্রিভুবন কাঁপতে থাকে। সে চিৎকার যে শোনে সে হয় মারা যায়, নয় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। আজ এই আর্তনাদ শুনে মনে হল, সেই পিশাচেরাও বোধহয় এত যন্ত্রণা পায় না, যা এই জ্বলন্ত শিখ পাচ্ছে। হয়তো আমিও মারা যাবো, নয়তো পাগল! ওর চিৎকার শুনলে ভয় হয়, গোটা ফুসফুসটাই বুঝি এবার বেরিয়ে আসবে ওর মুখ দিয়ে। অথবা ওর গলার সব ক-টা শিরা একসঙ্গেই ছিঁড়ে যাবে!

এমনই ভয়াবহ দৃশ্য ক্রমশই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যেদিকেই তাকাই, আগুন-রক্ত-শবদেহ! এক অন্তঃসত্ত্বা নারী একজন আক্রমণকারীর পা আঁকড়ে ধরে হয়তো স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করছিল। কিন্তু তারা তখন নারীটির স্বামীর গলায় টায়ার পরিয়ে দিতেই ব্যস্ত। অন্যদিকে তাকানোর সময়ই নেই। শিখটিও তখন বারবার হাতজোড় করে কী যেন বলছে। তার ভরা পোয়াতি স্ত্রী ওদের পায়ের ওপর গড়াগড়িই খাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। ওরা টায়ারের ওপরে ভালো করে তেল ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল! আগুন একেবারে দাউদাউ করে জ্বলে উঠে তার বুক, মুখ সাপটে ধরেছে। লোকটা আপ্রাণ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দু-হাত দিয়ে টায়ারটা খোলার শেষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে দেখে ভিড়ের মধ্য থেকে এক তরোয়ালধারী এসে মুহূর্তের মধ্যে দু-কোপে তার দুটো হাতই কেটে নিল। হাত না থাকলে টায়ার খোলার সম্ভাবনাই নেই। তবু মানুষটা বাঁচার জন্য ছটফট করে এলোপাথাড়ি দৌড়োদৌড়ি করছিল। হাত কেটে গেলেও পা তো আছে! দাঙ্গাইরা তার এই প্রচেষ্টায় বড়োই বিরক্ত হয়ে উঠে প্রথমে আগুন নেভাল। তারপর তাকে শুইয়ে ফেলে একে একে পা দুটোও কেটে নিল এবং ফের টায়ারে আগুন ধরিয়ে দিল। আর তার কিছু করারই নেই! আগুন প্রথমে উর্ধ্বমুখী হয়েছিল, এবার কোনোরকম বাধা না পেয়ে দুরন্ত গতিতে ছড়িয়ে পড়ল।

গর্ভবতী নারীটি এখন আর কোনোরকম প্রচেষ্টা করছে না। গড়াগড়িও খাচ্ছে না। তাকে দেখলে মনে হয়, বুঝি সে পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। হয়তো তখনই তার আত্মা মরে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে দেহ থেকেও মুক্ত করার তাড়া হামলাকারীদের ছিল। তারা বিন্দুমাত্রও দেরি না করে হতভাগিনীর পেটে চালিয়ে দিল তরোয়াল। একের পর এক আঘাতে ফালাফালা করে দিল তার গর্ভ! আমি ভয়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলাম, গর্ভবতীর কাটা পেট থেকে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট মাংসপিণ্ড! রক্তে মাখামাখি একটা ভ্রূণ। একজন খচ্ করে সেই শিশুভ্রূণকে তরোয়ালে গেঁথে নিল। হিংস্র তরোয়াল তখন এক ভ্রূণের রক্তে স্নান করছে। এক নবজাতকের রক্ত, যার কোনো ধর্ম নেই, কোনো পাপ নেই, কোনো নাম নেই! সেই

অবস্থাতেই নগ্নশিশুদেহ সমেত তরবারি আকাশের দিকে তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল, "ইন্দিরা গান্ধী অমর রহে।"

ইন্দিরা গান্ধী অমর রহে। আজকের দিনটাই ইন্দিরা গান্ধীকে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। যাঁকে 'অমর' করে রাখার জন্য এই বাহিনী নেমেছে, তাঁকে কী করে ভুলতে পারি? প্রচণ্ড একটা কান্না একরাশ কাঁপুনির সঙ্গে এসে আমার বুকে ধাক্কা মারছে। আমার পরিবারেরও তবে এই অবস্থাই হবে। নিজে মরতে মানুষ অত ভয় পায় না, যতটা নিজের ভালোবাসার মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনাকে পায়। আমি ভয়ে শিউরে উঠে চোখ বুজে ফেলি। আমারও শরীরে যেন লেলিহান আগুনের জ্বালা, কয়েকশো তরোয়ালের ক্ষত! বিকট ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে চাইছি, পারছি না। গোটা দেহে ভয়ের অদম্য কাঁপুনি। আসছে... ওরা আসছে ...! অন্যদিকে সরতাজ আর বাপুর ইশারায় এবার শিখের দলও হাতা গোটাল। আমার

শান্ত স্বভাবের নরম বাপু, যিনি কখনও সামান্য ঝগড়াও করেননি কারোর সঙ্গে, সেই তিনিই তরোয়াল তুলে বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন, "বোলে-এ-এ সো নিহা-আ-আ-ল!"

সরতাজ সমেত সমস্ত শিখও গর্জে ওঠে, "সৎ শ্রী অ-কা-ল!"

আমিও ওদের সঙ্গে চোখ বুজে বুকের ওপর হাত রেখে শব্দটা উচ্চারণ করলাম। বাপুর গল্পে যতবার এই 'নারা' শুনেছি, ততবারই গরম রক্ত টগবগিয়ে ফুটে উঠেছে! আজ তো বাস্তবেই এই গর্জন শুনলাম। ওইটুকু বয়েসেই বুঝে নিলাম—চমকৌর বা সারাগড়ির মতো এখানেও এবার মরার আর মারার পালা শুরু হবে! আজ ওরা সবাই ঈশর সিং, ওরাই গুর্মুখ সিং। অসম যুদ্ধ হলেও আমৃত্যু লড়ে যেতে শিখরা জানে। বোলে সো নিহাল, সৎ শ্রী অকাল!...

আজ আমার সামনেও যুদ্ধ কঠিন হচ্ছে! গুলিতে পা-টা জখম হয়েছে। রক্তপাত হয়েছে। কিন্তু তবু আমায় সহ্য করতে হবে। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী। তাদের লোকবল আছে। আমি একা! আহত, রক্তাক্ত, ক্লান্ত। তবুও লড়ে যেতে হবে। তাই... 'ডটকে সর্দারা!'

* * ****

(১১)

বাকি রাতটা নির্বিঘ্নেই কাটল।

মিস্ বোস আর পবিত্র-র জিম্মায় পি সি চৌধুরীর বাড়িতে অর্ণবকে রেখে অধিরাজ স্বয়ং চলে গিয়েছিল আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তার আর্বানার ফ্ল্যাটে। ওখানে মিস্ আত্রেয়ী দত্ত সদাজাগ্রত প্রহরায় ছিল। অধিরাজ তাকে ফোন করতেই সে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করে দরজা খুলে দিয়েছে। বাড়ির সবাই তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। কোথাও কোনো অঘটনের চিহ্ন নেই। সে সযত্নে তাকে লিভিংরুমেই বসাল। এমনিতে আর্বানা যথেষ্ট সুরক্ষিত। এখানে ঢুকে অনায়াসে গোটা ফ্যামিলিকে মেরে চলে যাওয়া কোনো বহিরাগতের পক্ষে অসম্ভব। সিকিউরিটি অত্যন্ত সতর্ক ও টাইট। এখানে সব ভি.আই.পি, মন্ত্রী-সান্ত্রী, ফিল্মস্টার ও সেলিব্রিটিদের বাস। তাই নিরাপত্তাব্যবস্থাও প্রায় নিশ্ছিদ্র। তা সত্ত্বেও অধিরাজের সতর্ক চোখ এই লোহার বাসরঘরে সামান্য একটা ছিদ্র, একটা লুপ হোল খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বার্নিং শিখকে বিশ্বাস নেই। তার চাতুর্যের যেটুকু উদাহরণ পেয়েছে, তাতে হয়তো ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সে তার হুলিয়া সম্পূর্ণ বদলে নিয়ে এই সিকিউরিটি গার্ডদের মধ্যেই ভিড়ে যেতে পারে। অথবা হয়তো ভূপেন্দ্র দত্তার আশেপাশের কোনো ফ্ল্যাটেই ঘাপ্টি মেরে থাকতে পারে। এই দুটো ক্ষেত্রে সে নিরাপদে খুনগুলো করতে পারে। এছাড়া আরও একটা সহজ ও মোক্ষম রাস্তা আছে। একেবারে পরিবারের মধ্যেই চাকর বা অন্য কোনো পেশা নিয়ে ঢুকে যাওয়া। কিন্তু তৃতীয় সম্ভাবনাটা বাতিল করতেই হয়। কারণ মিস্ দত্ত ইতোমধ্যেই জানিয়েছেন যে ও বাড়িতে একজন নেপালি চাকর ছাড়া কেউ নেই। এবং সে-ও চব্বিশ ঘণ্টা ঐ বাড়িতেই থাকে। ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া শোওয়া সব ওখানেই। ভূপেন্দ্র নিজে, জামাতা বিরূপাক্ষ ও মেয়ে সোনালি, প্রত্যেকেই ড্রাইভিং করতে পারেন। তাই আলাদা করে ড্রাইভার রাখার কোনো গল্প নেই। কাঁচা বাজার থেকে গ্রসারির বাকি জিনিসপত্র অনলাইনেই আসে। এমনকি তাজা মাছ-মাংসও আজকাল বাড়িতে অর্ডার দিয়ে আনানো যায়। সুতরাং কাঁচা বাজারের দায়িত্বও নেই। নেপালি চাকর 'জুজুৎসু' বাড়ি থেকে নিতান্তই দায়ে না পড়লে বেরোয়ই না। তাকে ফ্যামিলি মেম্বার হিসাবে ধরাই যায়। তাই তার 'বার্নিং শিখ' হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

"কেন?" প্রণবেশ লাহিড়ী বেশ কনফিউজড, "বার্নিং শিখ চব্বিশঘণ্টা কারোর বাড়িতে থাকতে পারে না?"

"না।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, "সেক্ষেত্রে সে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে একাধিক মাস মার্ডার করতে পারবে না। ওর টেকনিকটা দেখুন। যাদের ও টার্গেট করে সে বাড়িগুলোয় হঠাৎই ঢোকে না। কোনো-না কোনোভাবে অনেক আগেই প্রবেশাধিকার নিয়ে নেয়। একটু একটু করে নিজের ইমেজ বানায়। দিল্লির কেসগুলোই দেখুন। ফাদার স্টেফানো মাইনো, ড্রাইভার কেহর সিং ও রাঁধুনী বিরজুর বন্ধু নাথুরাম—তিনজনই কিন্তু প্রায় একই সময়ে, একই টাইম পিরিয়ডে তিনটে ফ্যামিলিতে ঢুকেছিল কিংবা উপস্থিত ছিল। এবং কেউ হোল টাইমার নয়। প্রত্যেকের টাইমিং আলাদা আলাদা। কেহর সিং এর ডিউটি টাইমে ফাদারকে দেখা যায়নি। এবং ফাদার ও কেহর সিং এর টাইমিং-এ কখনও নাথুরামের উপস্থিতি ছিল না। অন্য দুই শহরেও একই টেকনিক। একসঙ্গেই একাধিক ফ্যামিলিতে তার যাওয়া আসা। কিন্তু প্রত্যেকবার টাইমিং আলাদা। কলকাতাতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুকে তেনজিং এর সঙ্গে সর্বক্ষণ দেখা যেত না। অথচ তিনি প্রায়ই আসতেন। অর্থাৎ বাকি ফ্যামিলিগুলোতেও তিনি কোনো না কোনো রূপে ঢুকে বসে আছেন। কিন্তু একটা ফ্যামিলিতে চব্বিশ ঘণ্টাই যার ডিউটি, সে অন্যত্র হাজিরা দেবে কী করে? মিস্ দত্ত'র বয়ান অনুযায়ী, জুজুৎসু বাড়ি থেকে বেরোনোর নামই নেয় না। তবে সে অন্য দুটো ফ্যামিলিতে কীভাবে উপস্থিত থাকতে পারে? ও 'বার্নিং শিখ, শ্রীকৃষ্ণ নয় যে একই সময়ে গোপিনীর বাড়িতেও মাখন চুরি করবে আবার যশোদার

ঘরেও ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোবে। একই সময়ে রাধারানি সমেত গোপিনীদের সবার সঙ্গে ঐ একটি ব্যক্তিই একাধিক ক্লোন নিয়ে উপস্থিত থাকতে পারতেন। আর কেউ পেরেছে বলে জানা নেই।"

প্রণবেশ অধিরাজের থিয়োরি কতদূর বুঝলেন কে জানে। একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, "কিন্তু চাকরের নাম জুজুৎসু কেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর তখনও অধিরাজের কাছে ছিল না। কিন্তু শেষ রাতে মিস্ দত্ত'র কাছে যখন সে পৌঁছল তখন কথা প্রসঙ্গে আত্রেয়ীই জানায়, "আরে, ওর নাম জুজুৎসুই নয়। ও ব্যাটার আসল নাম সন্দেশ গুরুং। কিন্তু কথায় কথায় 'জুজুৎসুর প্যাঁচের ডেমো দেখাতে চায় বলে ওর নামই 'জুজুৎসু' হয়ে গেছে। সন্দেশ দাবি করে যে ও নাকি জুজুৎসু জানে। এই অবসেশনের কারণেই ওটাই শেষপর্যন্ত নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"সন্দেশ।" অধিরাজ মৃদু হাসল, "সুইট নেম। আর কিছু জানতে পারলেন? আশেপাশের বাসিন্দাদের কোনো বিশেষ খবর?"

আত্রেয়ী চাপা স্বরে বলে, "মোটামুটি সব প্রতিবেশীদেরই দেখেছি। ওদিকের 'বি' ফ্ল্যাটটায় দুই মহিলা থাকেন। মা ও মেয়ে। প্রিয়দর্শিনী ও শ্রীদর্শিনী বসু। মেয়ে শ্রীদর্শিনীর বয়েস খুবই কম। সুন্দরী, স্মার্ট। পড়াশোনা শেষ করে গ্ল্যামার জগতে ঢুকেছে। শুনেছি মডেলিং-এর পাশাপাশি সিরিয়ালে অভিনয়ও করে। ইনফ্যাক্ট শুধু শুনিনি, ওকে টিভির পর্দায় দু-একটা অ্যাড আর মেগাসিরিয়ালে দেখেওছি। একটা ওয়েবসিরিজেও লিড রোলে অভিনয় করেছে। ওর পরিচয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট জেনুইন। শ্যুটিং এর টাইমের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কলটাইমের ওপর নির্ভর করে সে কখন বাড়ি থেকে বেরোবে। অনেকসময় তো রাতের পর রাত বাড়িও ফেরে না। মা প্রিয়দর্শিনী বহুবছর আগেই বিধবা হয়েছেন। মেয়ে অভিনেত্রী বলে টাকার বিশেষ অভাব নেই। তাও মহিলা সময় কাটানোর জন্য নানারকম পার্টি অর্গানাইজ করেন। ঐ আজকাল বেরিয়েছে না? শখের ইভেন্ট ম্যানেজার, ডেকোরেটর— হ্যান-ত্যান। ঐসবই। জাস্ট টাইমপাস। মধ্যবয়েসী, কিন্তু তিনিও বেশ সুন্দরী। মেয়ের এই উদ্ভট জীবনযাত্রায় বেশ আপত্তি। তবে মা এবং মেয়ে, দু-জনেই পি-এন-পি-সি তে এক্সপার্ট। শ্রীদর্শিনী অবসর সময়ে এসে ভূপেন্দ্র দত্তার সঙ্গে জমিয়ে দাবা খেলে আর গুজগুজ ফুসফুস করে। আর প্রিয়দর্শিনী প্রায় রোজই বিকেলে এসে এ বাড়ির গিন্নী শালিনীর সঙ্গে টপ্পা মারেন। একটু স্ক্যান্ডাল-প্রেমী হলেও হার্মফুল নন। ওদের বাড়িতে কোনো মেইড বা সার্ভেন্ট নেই। নেই বলা উচিত নয়—আসলে প্রিয়দর্শিনীর খুঁতখুঁতে স্বভাব আর শুচিবাইয়ের জ্বালায় টেকে না। অগত্যা দু-জনের সংসার মা-ই সামাল দেন।" অধিরাজের ভুরু আলতো উঠে যায়, "স্ক্যান্ডাল!"

আত্রেয়ী হাসছে, "সে প্রসঙ্গেই আসছি স্যার। এই ফ্লোরের প্রায় সবক-টা ফ্ল্যাটেই স্ক্যান্ডালের বীজ রয়েছে। 'সি' ফ্ল্যাটে এক বৃদ্ধ থাকেন। নাম বসন্ত কুমার মিত্র। বেশ শৌখিন স্বভাবের মানুষ। টাকার কুমীর বললে কম বলা হয়। সত্তর বছর বয়েসে আচমকা এক বাইশ বছরের মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছেন। তিতলি নামের মেয়েটি দারুণ সুন্দরী। প্রথমে তো আমি ওকে বসন্তকুমারের নাতনি ভেবেছিলাম। পরে শুনি-বৌ! মজার কথা হল, কর্তা যখন বাড়িতে থাকেন না তখন গিন্নীর গাড়ির ড্রাইভার শোভন ওপরে উঠে আসে। ফ্ল্যাটেই থাকে। ঠিক সন্ধে ছটা নাগাদ সে নেমে যায়। সাতটায় কলিংবেলে 'বসন্ত এসে গেছে' ঘোষণা শুরু হয়। অর্থাৎ বসন্ত মিত্র ফিরে আসেন। তখন আবার গিন্নীর ইভনিং ওয়াকের সময় হয়। ইভনিং ওয়াকটাও অবশ্য শোভনের সঙ্গেই। মানে নিজেরই বিলাসবহুল গাড়িতে চড়ে।"

"চমৎকার!" সে একটু হাসল, "অকালে বসন্ত এলে এমনই অশোভন ব্যাপার স্যাপার ঘটে।"

আত্রেয়ী একটু দম নেওয়ার জন্যই থেমেছিল। এবার বলল, "দাঁড়ান স্যার। এরপর আরও গল্প আছে। যেই তিতলি বেরিয়ে যায়, অমনিই ও বাড়ির কুক কাম কাজের মেয়ে 'কোকিলা' আসে। তার আসা যাওয়ার টাইমিং খুব ইন্টারেস্টিং। সকাল সকাল এসে কর্তা-গিন্নীর

ব্রেকফাস্ট বানিয়ে, লাঞ্চ রেডি করে, ঘরের সব কাজ সেরে সে চলে যায়। আবার রাত আটটায় এসে হাজির হয়। তখন বাবু-বিবিদের 'ডিনার' বানানোর জন্য আসে। ডিনারে কী বানায় জানি না, তবে কোনোদিনই রাত এগারোটার আগে ফ্ল্যাট থেকে বেরোয় না। এখানে গুজব, তার পে-প্যাকেজও নাকি রীতিমতো স্পেশাল। তার সঙ্গে দামি গয়না গাঁটি-হীরের 'নোজপিন' ইত্যাদি বোনাস। আমরা খামোখাই এত খেটে মরি স্যার। তার চেয়ে এখন দেখছি, এরকম কোনো বাড়িতে কুকের কাজ নিলেই ভালো হত। অন্তত হীরের নাকছাবি, দুল পেতাম।"

ছদ্ম হতাশায় আত্রেয়ীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। অধিরাজ তার নকল আফসোস দেখে ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলে উঠল, "এখনও অপশন আছে কিন্তু মিস্ দত্ত। আপনি অলরেডি সেরকম চাকরিতেই জয়েন করেছেন। যদিও টেম্পোরারি, তবে পার্মানেন্ট হওয়ার সুযোগও আছে। এটাতে বেশি লাভ দেখলে সি.আই.ডি.-র চাকরিটা ছাড়তেও পারেন। আমার ধারণা কোকিলার থেকেও অনেক ভালো কুক আপনি। অন্তত অর্ণবের পেট ও জিভ তেমনই সাক্ষী দেয়। ভেবে দেখতে পারেন।"

"রক্ষে করুন।" তার মুখে একটু লাজুক হাসি, "আমি বাহাত্তর ঘণ্টার জন্যই ঠিক আছি।"

"বসন্তে কোকিলা ডাকবে এটাও তো স্বাভাবিকই।" অধিরাজ বলল, "কিন্তু কোকিলা নামটা ঠিক বাঙালি নয়।"

"মেয়েটাও বাঙালি নয় স্যার। বাংলা বলতে পারে ঠিকই, কিন্তু অবাঙালি টান আছে। দেখতে আহামরি সুন্দরী নয়, বরং বেশ কাঠ কাঠ। মানে মেয়েদের মতো সহজাত কোমলতা নেই। হুড়ুম দুড়ুম করে হাঁটে। গলার স্বর শুনলে হাঁড়িচাচাও অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু বসন্ত ঐ কোকিলেই মজেছেন। তাই নিয়ে কর্তা-গিন্নী মাঝেমধ্যেই নিজেদের মধ্যে 'ক্যাটস্ অ্যান্ড ডগস্' মারপিট করেন। গিন্নীর অভিযোগ কোকিলার পেছনে কর্তা কোটি কোটি টাকা উড়িয়েছেন। তিনি এ-ও দাবি করেন যে সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীদর্শিনীর সঙ্গেও নাকি তার অ্যাফেয়ার চলছে। যদিও সত্যতা জানা নেই। আর কর্তার বক্তব্য, তার সুন্দরী তরুণী স্ত্রী মদ ও সিগারেটের পেছনে তিনমাসে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হাপিশ করেছেন! সর্বক্ষণ এই নিয়ে লেগেই আছে। তবে দু-জনেরই এ বাড়িতে অবাধ যাতায়াত। সুযোগ পেলেই হয় দেবা নয় দেবী এসে হাজির হয়। বসন্তের দাবা খেলার নেশা। ভূপেন্দ্র তার পার্টনার। আর তিতলির সঙ্গে সোনালির খুব জমেছে। সোনালিকে সে অনেক মনের, প্রাণের কথা বলে। এ-ও বলেছে যে বসন্তকুমার পুরুষ হিসেবে কোনো কম্মের নন। ঐ তো বুড়ো বর, তাকে নিয়েও এত সন্দেহ! কোকিলার আবার জুজুৎসুর সঙ্গে খুব ভাব। তাকেও এ বাড়িতে প্রায়ই দেখা যায়। সেজন্যই নোজপিনের রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। কোকিলার দাবি বসন্তকুমার কোকিলে নন, আসলে 'শ্রী' তথা শ্রীদর্শিনীতে ফিদা। কোকিলার মোটা পে-প্যাকেজ আর দামি উপহার 'নজরানা' নয়, আসলে কর্তার অ্যাফেয়ার চেপে যাওয়ার ঘুষ!" "বড়োই গোলমেলে কেমিস্ট্রি দেখছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গোলমেলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মদ ও সিগারেট!" সে কপালে চোখ তুলে ফেলেছে, "মহিলা কোন ব্র্যান্ডের সিগারেট খান? আমার ব্র্যান্ডের একটা প্যাকেটের দাম মাত্র তিনশো ষাট টাকা। যদি মাসে ম্যাক্সিমাম ত্রিশ প্যাকেটও লাগে তবে সর্বসাকুল্যে খরচ দশহাজার কী আর একটু বেশি। তিন মাসে ত্রিশ হাজার। পঞ্চাশ লক্ষ তো দূর, পঞ্চাশ হাজারও নয়। উনি তো তৈরি পাবলিক দেখছি! ইনফ্যাক্ট মিয়াঁ-বিবি দু-জনেই তৈরি পাবলিক।" "দাঁড়ান স্যার, এরপরের প্রতিবেশীর জন্যও কিছু বিশেষণ রাখুন।"

"আরও আছে?" অধিরাজ শ্বাস টানল, "প্লিজ প্রসিড।"

"ডি তে একজোড়া পাঞ্জাবি কাপল থাকে। আমনদীপ আর গুরশীল...।"

"ওয়েট... ওয়েট।" অধিরাজ তাকে থামিয়েছে, "কাপল মানে? দু-জনেই পুরুষ?" "না স্যার।" আত্রেয়ী ফিক করে হেসে ফেলে, "একজন পুরুষ, অন্যজন নারী।"

"কিন্তু আমনদীপ আর গুরশীল—দুটো নামই তো ছেলেদের! এরমধ্যে নারী কোনজন?"

সে বিস্মিত—“কী কনফিউশন্!”

“শিখদের নামের এটাই প্রবলেম।” লেডি অফিসার বুঝিয়ে দেয়, “কে ছেলে, কে মেয়ে তা নাম শুনে বোঝাই যায় না। তবে আমনদীপ হল পুরুষটির নাম, আর গুরশীল মহিলা। প্রথমে আমি ওদের স্বামী স্ত্রী-ই ভেবেছিলাম। গুরশীল ছ'মাসের প্রেগন্যান্টও বটে। কিন্তু তারপর শুনলাম যে ওরা দু-জনে আদৌ স্বামী-স্ত্রীই নয়। আমনদীপ আর গুরশীল লিভ-ইনে আছে। শুধু তাই নয়—দু-জনেই বিবাহিত, তবে অন্য পুরুষ ও স্ত্রীয়ের সঙ্গে! আমনদীপের বউ আর গুরশীলের বর মাঝেমধ্যেই এখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে যায়। এটা দু তরফ থেকেই পুরোপুরি পরকীয়া কেস। আগে বিবাহিতদের প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে লিভ ইন করার উপায় ছিল না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দয়ায় এখন সম্ভব। ওরা দু-জনে এখন একসঙ্গে থাকে ও খুব তাড়াতাড়ি বাবা-মাও হতে চলেছে। এই কালের অন্য কোনো ত্রুটি থাকুক বা না থাকুক, এমনিতে খুব হাসিখুশি আর ফ্রেন্ডলি। এরাও ভূপেন্দ্র দত্তার ঘরে যাতায়াত করে। আমনদীপের বাঙালি মাছের ঝোলের ওপর খুব লোভ। ব্যাটা আজ লাঞ্চে এসে হানা দিয়েছিল, আর আমার আঙুলে চুমু খেতে চাইছিল! ওদিকে শালিনী দত্তাকে গুরশীল খুব তেল মারে। এবং শ্রীদর্শিনী ও প্রিয়দর্শিনীর ওপর দেখলাম দু-জনেরই খুব রাগ! গুরশীলের মতে, মা ও মেয়ে, দুটোই সমান চরিত্রহীন।”

“চমৎকার। প্রত্যেকেই এখানে চালুনি হয়ে সুঁচের পেছনে লাগে। এইজন্যই আমার মা ফ্ল্যাট কালচার একদমই পছন্দ করেন না।” অধিরাজ যেন একটু অন্যমনস্ক, “কিন্তু এই আমনদীপ এবং গুরশীল কোন ভাষায় কথা বলেন?”

“বাংলাতেই কথা বলে।” মিস দত্ত'র স্মার্ট উত্তর, “আমনদীপ তো পুরো খাঁটি বাঙালিদের মতো গড়গড়িয়ে বাংলা ভাষা বলে। তার চেহারা দেখলেও শিখ বলে চেনা যায় না। পাগড়ি পরে না। চুল ছোটো করে ছাঁটা, ক্লিন শেভড। শুধু হাতে একটা “কড়া' পরে। এছাড়া আর কোনো চিহ্নই নেই। গুরশীলও যথেষ্টই আধুনিকা। হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি, পাঞ্জাবি, সবই ফ্লুয়েন্টলি বলে।”

“বুঝলাম।” সে একটু চিন্তিত, “কিন্তু মিস্ দত্ত, কোনো প্রেগন্যান্ট লেডির যদি দেহতল্লাশি, বা বডি চেকিং করতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন?”

মিস্ দত্ত'র চোখে একটু বিপন্নতা, “স্যার, বাইরে থেকে যতখানি সাবধানে চেকিং করা যায়, করা যেতে পারে। কিন্তু প্রেগন্যান্ট লেডির ক্ষেত্রে তো খুব বেশি চেক করা সম্ভব নয়। মেটাল ডিটেক্টরে অবশ্য চেক করা যেতে পারে। বাট্, এখানে একটা খটকা আছে।”

“আমি এমনই কিছু আশা করছিলাম।” অধিরাজের দৃষ্টি চিন্তান্বিত, “বলুন।”

“গুরশীলের মেটাল ডিটেক্টরে খুব আপত্তি। যদিও মেটাল ডিটেক্টর তেমন ক্ষতিকর নয় বা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন দেয় না, তবু সামান্য হলেও একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো তৈরিই করে। গুরশীল এতটাই সতর্ক যে সেই সামান্য রিস্কটাও নেবে না। সে আর্বানার ম্যানেজমেন্টকে রীতিমতো চিঠি দিয়ে আবেদন করে রেখেছে যে ডিউরিং প্রেগনেন্সি তাকে যাতে মেটাল ডিটেক্টরের ভেতর দিয়ে পাস না করতে হয়। আর্বানার ম্যানেজমেন্টও মেনে নিয়েছে। অথচ যে নিজের প্রেগনেন্সি নিয়ে এত খুঁতখুঁতে সে দিব্যি এই অবস্থাতেও গাড়ি চালিয়ে রোজ অফিসে যায়! এখনও প্রেগনেন্সি লিভ নেয়নি!”

“স্ট্রেঞ্জ! যদিও আমার প্রশ্নটা করা একেবারেই উচিত নয়, তবু ভদ্রতা সভ্যতার মাথা খেয়েই বলি, গুরশীলকে দেখতে কেমন?”

“ওটাও ভারি অদ্ভুত স্যার।” আত্রেয়ী জানায়, “আমার ধারণা ছিল পাঞ্জাবি মেয়েরা লম্বা-চওড়া আর সুন্দরী হয়। কিন্তু গুরশীল একদম উলটোটা! কোকিলা তবু ঠিক আছে। কিন্তু গুরশীল যদি প্রেগন্যান্ট না হত, তবে ওকে দেখে বুঝতেই পারতাম না যে ও ছেলে না মেয়ে! ও মাল প্রেগনেন্সির মধ্যেই আবার হুশহাশ করে সিগারেটও টানে। সে বেলায় কোনো দোষ নেই। আমনদীপ যে ওর মধ্যে কী দেখেছে ভগবানই জানেন। বাকি রইল একটাই ফ্ল্যাট। ‘ই।' সেটাতে যিনি আছেন, তাঁকে আমরা সবাই চিনি। লাহিড়ী স্যার। একমাত্র ওখানেই

কোনো স্ক্যান্ডাল নেই।”

“গুরশীলের মধ্যে কী আছে সেটা আমনদীপের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।” অধিরাজ সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা স্টিক ঠোঁট দিয়ে টেনে বের করে এনে বলল, “বাট, আই মাস্ট অ্যাডমিট মিস্ দত্ত, এজন্যই মহিলাদের আলাদা করে গোয়েন্দা হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইনফ্যাক্ট আমার মতে, যে কোনো দেশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হেড একজন মহিলা হলে কোনো কেসই আনসলভড় থাকবে না।”

আত্রেয়ী ফের হেসে ফেলল। হাসিটা তার একেবারে মধুক্ষরা, “কেন স্যার?”

“কারণ মহিলারা বর্ন ডিটেকটিভ। জন্ম থেকেই গোয়েন্দা। আলাদা করে কোনো ট্রেনিং এর দরকারই নেই। নিজেকেই দেখুন। এখানে এসেছেন এখনও চব্বিশ ঘণ্টা হয়নি। অথচ পুরো ঠিকুজি কুলুজি সহ সবার হাঁড়ির খবর একেবারে কালি সমেত বের করে ফেলেছেন। আমাদের এই সব সংবাদ বের করতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। তাও এত ডিটেইলসে বের করতে পারতাম কিনা সন্দেহ আছে। ইনফ্যাক্ট আমাদের টপ খবরিরাও এদের প্রত্যেকেরই পেছনে লেগে আছে, কিন্তু এত খবর এখনও বের করতে পারেনি।”

আত্রেয়ী প্রশংসা পেয়ে একটু লাজুক হাসল। যত দিন যাচ্ছে, টিম আর টিমের টপ বসকেও তার ক্রমাগত ভালো লাগছে। অধিরাজকে সে এমনি এমনিই শ্রদ্ধার চোখে দেখে না! মানুষটা সবাইকে সম্মান দিতে জানে। ভালো কাজ করলে বাহবা দিতে একটুও কুণ্ঠিত নয়। সচরাচর টপ বসরা বসিং বেশি করেন, প্রশংসা কম। কিন্তু এ লোকটার কোনো ইগো নেই। নিজে যেমন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন, তেমনই অন্যের পরিশ্রমকেও মর্যাদা দেন। সে তবু একটু লাজুক স্বরে বলে, “কী যে বলেন স্যার! এ তো সবাই পারে।”

অধিরাজ সিগারেটটা ধরিয়ে মাথা নাড়ল, “ছেলেরা পারে না। আপনি একবার নিজের জায়গায় প্রণবেশদা বা পবিত্রকে বসিয়ে দেখুন। ওরা কেউ অ্যাডজাস্ট করতেই পারবে না। প্রণবেশদাকে যদি এক কাপ কফি বানাতে কেউ অর্ডার করে উনি তো তারই এনকাউন্টার করে দেবেন। পুরুষেরা মেয়েদের পি এন পি সি নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা করে। কিন্তু আপনি যদি খুব মন দিয়ে মেয়েদের পরনিন্দা পরচর্চা শোনেন, তাহলে আলাদা করে তদন্ত করার প্রয়োজনই পড়ে না। পুরো তল্লাটের খবর পেয়ে যাবেন। আগাথা ক্রিস্টি মিস মার্পলকে হাওয়া থেকে আমদানি করেননি। পোয়ারো বা শার্লক হোমস ক্রাইম স্পটে গিয়ে যা তথ্য সংগ্রহ করতেন, মিস মার্পল ইজিচেয়ারে বসে উল বুনতে বুনতে তার থেকেও বেশি খবর পেয়ে যেতেন। হাউজ ম্যানেজমেন্টের কথা ছেড়েই দিলাম, ইনফ্যাক্ট গোয়েন্দাগিরিতেও নারী-দি-বস্। এখানে অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।”

আত্রেয়ী লাজুক হাসল, “থ্যাংকস স্যার। আপনি কিছু খাবেন? কুকের কাজ করলেও নিজের প্রয়োজনীয় খাবার, চা, কফি সব আমি একদম নিজের সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। এ বাড়ির জলটুকুও খাই না, নিজেই বাইরে বেরিয়ে দোকান থেকে সিলড্ মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে আসি। আমার ব্যাগে সব মজুত থাকে আর তার আশেপাশে কাউকে ঘেঁষতে দিই না। তাই চা-কফি বা মিড নাইট স্ন্যাকস — সব সেফ!”

“সত্যিই আপনি অতুলনীয়া মিস্ দত্ত।” সে বলে, “আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু আপনার স্পেশাল চায়ের ভক্তটিকে বঞ্চিত করে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। ইনফ্যাক্ট আমি ভেবেছিলাম, অর্ণব হয়তো এখানেই আসতে চাইবে। আজ আপনার হাতের চা ওর দরকার ছিল। আমাদের সঙ্গে পরপর যা ঘটেছে....!”

অধিরাজ তাদের অভিজ্ঞতা সবটাই খুলে বলল। আত্রেয়ী কিছুটা শুনেছিল। কিন্তু অর্ণবের গাড়ির ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টের কথা জানত না। সে প্রায় শিউরে উঠেছে, ভয়ংকর! অফিসার সরকার ঠিকঠাক আছেন তো? আপনি কাঁধের এই অবস্থা নিয়ে এখানে আসতে গেলেন কেন! তাই ভাবি, আপনার হাত এভাবে ব্যান্ডেজ করা কেন! এরকম একটা ইনসিডেন্টের পর তো একটু রেস্ট নেওয়া উচিত ছিল আপনাদের।”

“অর্ণবের ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা উড়ে গেছে, আর দুটো হাত ভাঙা কাচে

একটু কেটে গেছে। এছাড়া শারীরিক কোনো জখম হয়নি।” অধিরাজ জানায়, “রেস্ট নেওয়ার সময় নেই মিস্ দত্ত। খুনি নিজে ইনজিওর্ড হয়েও রেস্ট নেওয়ার নাম করছে না, তবে আমরা কী করে বিশ্রাম নিই? আপনিও সবসময়ই হাই অ্যালার্টে থাকবেন। খুনি কতখানি ডেসপারেট সে তো বুঝতেই পারছেন। একটা সামান্য ভুলই কিন্তু মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। আমরা ওকে চেজ করছি, কিন্তু আপনার আর মিস্ বোসের রোল কিন্তু এ কেসে সবচেয়ে ভাইটাল। আপনারা দু-জনেই সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছেন। একদম সাইক্লোনের কেন্দ্রবিন্দুতে। আপনাদের রিস্ক আমাদের থেকেও কয়েকগুণ বেশি। তাই পদে পদে সাবধান।”

আত্রেয়ীর কপালে চিন্তার রেখা প্রকট হয়ে ওঠে। সে বলল, “ইয়েস স্যার।”

“এ বাড়ির সদস্যদের কেমন বুঝছেন?”.

“বাকিদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। শালিনী, সোনালি তো খুবই ভদ্র ও নম্র। সোনালির বর বিরূপাক্ষ বিজনেসের কাজে মাঝেমধ্যেই কলকাতার বাইরে যান শুনেছি। তবে উনি শ্বশুরের সঙ্গে থাকলেও একদমই টিপিক্যাল ঘরজামাই নন। ভদ্রলোকের ভীষণ পার্সোনালিটি। ঘরজামাই হওয়ার মেটিরিয়ালই নন। ওঁকে ভূপেন্দ্রও যথেষ্ট সমঝে চলেন। শালিনীর স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়। আর ভূপেন্দ্র অসম্ভব স্বার্থপর লোক। স্ত্রীয়ের জন্য তাঁর সময়ই নেই। তাই অসুস্থ মায়ের দেখাশোনা করার জন্যই সোনালি আর বিরূপাক্ষ এখানে থাকেন। ওদের চারবছরের একটা ছেলে আছে, আয়ান। সে ভীষণ শান্ত আর কিউট। আর মেয়েটা একবছরের। একদম একটা পুতুলের মতো দেখতে। ওর নাম তানিশা। দু-জনেই শালিনীর প্রাণ। আয়ান তো ঠাকুমাকে ছেড়ে থাকতেই পারে না। সে শালিনীর গায়ে সর্বক্ষণ লেগে থাকে। তানিশাও ঠাকুমার কাছেই খায়, তাঁর কোলেই ঘুমোয়। এরা মোটামুটি নর্মাল। কিন্তু প্রবলেম চাইল্ড এখানে একজনই।”

“আই নো।” অধিরাজ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মাথা ঝাঁকায়, “স্বয়ং আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তা! কপুর মিত্তল কমিটির রিপোর্টে ওঁর চরিত্রের ব্যাখ্যান আগেই শুনেছিলাম। ইনফ্যাক্ট, যে পার্টিতে উনি ঢুকেছেন, সেই বিজেপির লোকেরাও ভদ্রলোকের অভদ্র স্বভাবের জন্য চরম বিরক্ত। এতটাই নেগেটিভ ইমেজ ওঁর যে পার্টি যে কোনোদিন ওঁকে কান ধরে বের করে দেবে। কথায় কথায় লোককে শাসিয়ে বেড়ান।”

“ভীষণ রুড টাইপের লোক উনি।” আত্রেয়ী বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বলল, “এ বাড়িতে একমাত্র ভূপেন্দ্র-ই আমার আসল পরিচয় জানেন। তা সত্ত্বেও খাটিয়ে মারেন। দিনে অন্তত পঞ্চাশবার কফি খাবেন। এক সেকেন্ড দেরি হলেই মা-বাপ তুলে গালাগালি চালু হয়ে যায়। আমি নাকি সাজগোজ বেশি করি। ইনকমপিটেন্ট আর অলস! আর ভীষণ অপমানজনক কথাও বলেন। একা আমাকে নয়, জুজুৎসুকেও। জুজুৎসু ওঁর ওপর এতটাই চটা যে এর মধ্যেই আমায় বলেছে, মালিক না হলে জুজুৎসুর প্যাঁচ মেরে ওঁর ঠ্যাং ভেঙে দিত! নিজের বউকে তো মানুষ বলেই গণ্য করেন না। উনি যদি সত্যিই কাউকে ভালোবাসেন, তা হল মেয়ে সোনালি, আর দুই নাতি-নাতনি। লোকটার একমাত্র দুর্বলতা ওখানেই। দৈত্যের প্রাণভ্রমরা ওখানেই রয়েছে। তবে বার্নিং শিখের হুমকি শোনার পর থেকে নাকি আরও বেশি খিটখিটে আর ফেরোশাস হয়ে গিয়েছেন। মুখে প্রকাশ না করলেও রীতিমতো ভয় পেয়েছেন। সবসময়ই হাতের কাছে লাইসেন্সড গান রাখেন।”

“হুম।” অধিরাজের চোয়াল একমুহূর্তের জন্য শক্ত হয়ে উঠল, “বাইরের আর কোনো লোক আসে? পার্টির লোক?”

“আসে। তবে তারা এ ফ্ল্যাটে ঢোকা তো দূর, ধারেকাছেই আসে না। ভূপেন্দ্র পার্টির মিটিং এর জন্য এখানেই একটা হল বুক করে রেখেছেন। তারা ওখানেই মিটিং করে, ওখান থেকেই ফিরে যায়। আর উনি নিজে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাইরে বেরোন। সোনালি পলিটিক্স পছন্দ করে না তাই!”

“আচ্ছা।” তাকে থামিয়ে অধিরাজ বলল, “আপনি কী একটা লাইটের কথা বলছিলেন না?

যেটা আপনার ফিশি লেগেছে? আমাকে একবার দেখানো যায় কি?”

“শিওর স্যার।”

এতক্ষণ এ ঘরে মৃদু আলো জ্বলছিল। আত্রেয়ী উঠে গিয়ে একটা সুইচ টিপে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সাদা আলোর বিচ্ছুরণ এতই জোরদার যে রীতিমতো চোখে লাগে। অধিরাজ কয়েক সেকেন্ড দেখে নিয়েই চাপা স্বরে বলল, “এবার অফ করে দিন মিস্ দত্ত। নয়তো বাড়িসুদ্ধ সবার ঘুম ভেঙে যাবে।”

“এটা লিভিংরুমের বলে আলোটা বেশি পাওয়ারের।” আত্রেয়ী আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে, “বেডরুমেরগুলো অনেক কম পাওয়ারের। কিন্তু জিনিস একই। এই আলোটা দুপুরের সানলাইটের মতো খটখটে। বেডরুমেরগুলো নরম, এইটুকুই পার্থক্য।”

“বুঝেছি।” অধিরাজ বলল, “নিজের চোখে দেখার পর বুঝতে পারছি যে এ জিনিস আমাদের বাড়িতেও আছে। শুধু এর বিশেষত্ব আর নামটা জানা ছিল না। আমার বাবার গার্ডেনিং এর খুব শখ। তিনি সম্প্রতি রুফ টপ গার্ডেন করেছেন। তাতেও ক্ষান্ত হননি। ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর ডেকে গোটা বাড়িতেই একেবারে ডিজাইন করে নানারকমের লতা পাতা, ফুলগাছ লাগিয়ে বসে আছেন। সেগুলো দেখতে এতই সুন্দর, আর ঘরের শোভা বাড়াতে এতটাই ওস্তাদ যে আমার বেডরুম অলমোস্ট মুঘল গার্ডেন হয়ে গেলেও আপত্তি করিনি। মা-ও ফুল ভালোবাসেন। তাই বাবা মহানন্দে ঘরের মধ্যেই নানারকম রং-বেরঙের অর্কিড, লিলি, গোলাপ চাষ করছেন। আর মজার কথা, এই আলোটা দেখার পর বুঝতে পারলাম, আমাদের বাড়ির সবকটা আলোই এই পদার্থ। পার্থক্য শুধু পাওয়ারের। কোনোটা জোরালো, কোনোটা মোলায়েম। তবে মাল একই। ইভেন এই ভিবজিওর আল্ট্রাভায়োলেট এল.ই.ডি. আমি জ্যোতিপ্রকাশ ত্রিপাঠীর বাড়িতেও দেখেছি। কিন্তু এর কোনো ক্ষতিকর এফেক্ট দেখিনি। আমি বাড়িতে কম থাকলেও বাবা-মা তো ঐ আলোর নীচেই আছেন। বাবার অফিসেও এই লাইটগুলোই আছে।”

“এর কোনো ক্ষতিকর এফেক্ট নেই স্যার।” আত্রেয়ী সহমত, “শুধু সানলাইটের এফেক্টটুকু দেওয়া ছাড়া এর আর কোনো ফাংশনই নেই। যারা গ্রীনহাউজ রাখে, তারা অষ্টপ্রহর এর আলোতেই কাজ করে। দিন হোক কী রাত, গাছগুলো যে কোনোসময়ই সালোকসংশ্লেষ চালিয়ে যেতে পারে। ইভেন অনেক বাড়িতেও আজকাল এই লাইট থাকে। যত সময় যাচ্ছে, মানুষ সূর্যালোকের সংস্পর্শে কম আসছে। কোভিডের সময় তো একদমই গৃহবন্দি ছিল সবাই। হয়তো সেটাও এই ধরনের লাইটের জনপ্রিয়তার বিশেষ কারণ।”

“হতে পারে।” সে সিগারেটের অবশিষ্টাংশটা কোথায় ফেলবে বুঝতে পারছিল না। আত্রেয়ী সেটা লক্ষ্য করেই বলল, “অ্যাশট্রেতেই গুঁজে দিন স্যার। এখানে কেউ লক্ষ্য করে না, অ্যাশট্রেতে ক-টা সিগারেটের বাট আছে। এ বাড়িতে শালিনীকে ছেড়ে দিলে কমবেশি সকলেই স্মোকার।”

“অ্যাজ ইউ উইশ মাই লেডি।” অধিরাজ অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা গুঁজে দিতে দিতে বলে, “আর একটা কথা জিজ্ঞাস্য ছিল।”।”

“বলুন

“এখানে যারা যারা আসে তাদের মধ্যে কেউ কি লেফটি?”

প্রশ্নটা শুনে আত্রেয়ীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল, “অনেস্টলি স্পিকিং, এর মধ্যে অতখানি লক্ষ্য করার সুযোগ পাইনি। জুজুৎসু যে লেফটি সেটা আমি জানি। কিন্তু বাকিদের সঙ্গে এখনও অতটা কানেকশন গড়ে তোলার সুযোগ পাইনি। আমার কাজ বেশিরভাগ সময়ই কিচেনে থাকে। তবু যতদূর আবছাভাবে মনে পড়ছে, শ্রীদর্শিনীও বোধহয় লেফটি। ওকে দাবার চাল বাঁহাতে দিতে দেখেছি।”

“হুম।” সে একটু ভেবে বলল, “আপনি একটু গায়ে পড়ে বাকিদের সঙ্গেও ভাব জমান। যেহেতু আপনি কুক, সেহেতু গজল্লা করতে যারা আসেন, বা লাঞ্চের জন্য ছোঁক ছোঁক করেন, তারা কোন হাতে চায়ের কাপ, সিগারেট বা চামচ ধরেন সেটা একটু লক্ষ্য করবেন।

দরকার পড়লে জুজুৎসুকে সার্ভ করতে দেবেন না, নিজেই সার্ভ করবেন। আর আবারও বলছি, বি অ্যালার্ট। কাল একটু কায়দা করে নজর রাখবেন ওদের মধ্যে কেউ খোঁড়াচ্ছে কিনা! যদিও সে সম্ভাবনা খুব কম। তবু খেয়াল করবেন।" বলতে বলতেই অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, "এই ফ্ল্যাটটা ভালো করে একবার তল্লাশি করা দরকার। আজ রাতটা যদি নিরুপদ্রবে কাটে তবে কাল একেবারে দলবল নিয়ে এসে সার্চ করব। ডঃ চ্যাটার্জি মার্ডার ওয়েপনটা বের করতে না পারলেও সন্দেহ করছেন সেটা কোনো গ্যাস বা বিষাক্ত ধোঁয়া হতে পারে। তাই চোখ-কান খোলা রাখবেন। খুনি যে কোথা দিয়ে সেটা ইনসার্ট করে তাও বোঝা দরকার। একটা লুপ হোলই যথেষ্ট। তাই ভালো করে দেখতে হবে।"

বলতে বলতেই সে ঘড়ির দিকে তাকায়, "পাঁচটা প্রায় বাজতে যায়। এ বাড়িতে কে কখন ওঠে জানেন?"

"ছ-টার সময়ে জুজুৎসু ওঠে। তারপর শালিনী।" আত্রেয়ী বলল, "বাকিরা লেট রাইজার।"

"তার মানে আরও একঘণ্টা আমি এখানে থাকতে পারি। জুজুৎসু যদি এসে দেখে আপনার সঙ্গে আমি বসে গল্প করছি, তাহলে স্ক্যান্ডালের সংখ্যা আরও একটা বাড়বে। আমি সেটা একেবারেই চাই না।"

মিস্ দত্ত হাসল, "জুজুৎসুর নাক এখনও ডাকছে স্যার। আপনি নিশ্চিন্তে বসুন। ও এখন উঠবে না।"

সত্যি কথা বলতে কী আত্রেয়ীর এই নিভৃত আলাপচারিতা ভালোই লাগছিল। অর্ণবের সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কখনো কখনো সময় কাটিয়েছে সে। কিন্তু অধিরাজের নাগাল পাওয়া অত সহজ নয়। ওর সম্পর্কে একটা সম্ভ্রম মিশ্রিত কৌতূহল রয়েছে তার। অপরাধ ও অপরাধীর ব্যাপারে লোকটার যতটা কৌতূহল, বহির্জগত সম্পর্কে ততটাই উদাসীন! আত্রেয়ীর সঙ্গে খুব সুন্দর একটা সম্পর্ক ও বোঝাপড়া তৈরি হওয়ার দরুণ মিস মুখার্জির অনুরাগ কোন দিকে তা বুঝতে কষ্ট হয়নি তার। এখন আবার আইভি ও কৌশানী এসে পড়ায় আহেলি একটু বিপন্নবোধও করছে। অন্য লেডি অফিসাররাও এই লোকটির ওপর ফিদা। কিন্তু তারা কেউই জোরদার কম্পিটিটর নয়। বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে তারা শুরু থেকেই যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট, কাছে যাওয়ার সাহস নেই। কিন্তু এই দু-জনকে তার বিপজ্জনক মনে হয়েছে। অথচ সবকিছুর কেন্দ্রে যে পুরুষ, তার মনের হদিশ পাওয়াই দায়! আত্রেয়ী এই সুযোগটা হাতছাড়া করল না। খুব সহজভাবেই বলল, "বাই দ্য ওয়ে, কাঁধের স্টিচটা সামলে রাখবেন স্যার। অলরেডি দু-বার সেলাই পড়েছে। আবার যদি কেটে যায় তবে কিন্তু...!"

"ওরে বাবা!" অধিরাজ প্রায় আঁতকে ওঠে, "মিস্ দত্ত, ইউ আর স্কেয়ারিং মি! আমি মরে গেলেও এই স্টিচ কেটে যেতে দেব না! অলরেডি দু-বার মিস্ মুখার্জির অত্যাচার সহ্য করেছি। ভদ্রমহিলা ওয়ার্ক এডুকেশনে যতরকমের সেলাই করা শিখেছিলেন, রান, হেম—না কীসব যেন, মোটামুটি আমার ওপরেই সব প্র্যাকটিস করে ফেলেছেন! রক্ষে করুন, আমার কাঁধটা অত এম্ব্রয়ডারি নিতে পারবে না। শুধু সেলাই নয়, তার সঙ্গে আবার ঝাড় ফ্রি! এত বকা আমি স্কুলজীবনেও খাইনি।"

আত্রেয়ী কুলকুল করে হেসে ফেলল, "আপনি মিস্ মুখার্জিকে অত ভয় পান কেন?"

তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, "এটা বোঝানো একটু কষ্টকর। তবে উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝবেন। সাপোজ, স্টিভেন স্পিলবার্গের জুরাসিক পার্ক দেখে কোনো বিজ্ঞানী সত্যি সত্যিই ওরকম একটা ডাইনোসরের পার্ক তৈরি করে ফেললেন। আপনিও মহানন্দে সেখানে ট্যুর করতে গেলেন। দিব্যি স্টেগোসরাস, ব্রন্টোসরাস দেখে বেড়াচ্ছেন, ঠিক এমন সময়ই আপনার চোখ পড়ল, একটা টিরানোসরাস রেক্স পাশের এনক্লোজার দিয়ে চুপ করে আপনার দিকে কটমট করে তাকিয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে। আপনি কি ভয় পাবেন না?"

আত্রেয়ী হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না, "মিস মুখার্জি টিরানোসরাস রেক্স!" অধিরাজ

কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, “নো। নট এগজ্যাক্টলি। আই মিন, ঈশ্বর না করেন, ঐ ট্যুরে যদি মিস্ মুখার্জিও আপনার সঙ্গে থাকেন, এবং ভুলবশত টি-রেক্সের এনক্লোজারে পড়ে যান, তবে হয় আপনাকেই দৌড়োতে হবে, নয়তো আমাদের এস.ও.এস. মেসেজ পাঠাতে হবে।”

“মিস্ মুখার্জিকে ডাইনোসরের হাত থেকে বাঁচাতে আসবেন আপনি?” এবার আত্রেয়ী মজা পেয়েছে।

“আমি আর অর্ণব দু-জনেই একেবারে এমার্জেন্সি মোডে পড়িমরি করে ছুটে আসব। তবে টি-রেক্সটাকে বাঁচাতে।” সে নির্বিকার, “ডাইনোসরটা প্রথমে তো খুদকুড়ি প্রাণীটাকে দেখতেই পাবে না। যদি বা ওঁর বকাঝকা খেয়ে দেখেও ফেলে, তবু প্রথমে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাবে। নাক দিয়ে একবার শুঁকে দেখবে এটি কী পদার্থ! আদৌ পদার্থ না অপদার্থ! জিভ দিয়ে অল্প একটু চেটেও দেখবে। তারপর ওঁকে খাওয়ার জন্য পেল্লায় হাঁ করে তেড়ে আসবে। বিরাট চেহারার প্রাণী। নড়তে চড়তেও সময় লাগে। এত কাণ্ড করতে যেটুকু সময় লাগবে, তার মধ্যেই আমাদের মিস্ মুখার্জি সুঁচ-সুতো দিয়ে ও বেচারির মুখটাই কষে সেলাই করে দেবেন! ডাইনোসর যদি হাঁ-ই না করতে পারে, তবে খাবেটা কী? তাছাড়া ওর গোণাগুনতি কয়েকটা ধারালো দাঁতই আছে। যতদূর জানি, মেরে কেটে পঞ্চাশ কী ষাটটা। কিন্তু মিস্ মুখার্জির একেকটা বাক্যই ধারে -রেক্সের দাঁতের বাবা! ওঁর সঙ্গে পাঙ্গা নিতে গেলে ডাইনোসরটারই ফসিল হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি। সো, মিস্ মুখার্জি কোনোভাবেই টি-রেক্স নন! আমি বরং বেচারা টি-রেক্সের পক্ষ নিতেই রাজি আছি।”

আত্রেয়ী হাসি চাপতে গিয়েও পারল না। হেসে উঠে বলল, “আহেলি দিদিভাই এত ভয়ংকর সেটা আমার জানা ছিল না! আচার্য স্যার কিংবা অফিসার সরকারও তো ওঁকে এত ভয় পান না।”

“ভালো মনে করেছেন।” অধিরাজও মুচকি হেসে প্রসঙ্গান্তরে গেল, “অর্ণব আর পবিত্র-র কথা যখন উঠলই তখন একবার দেখেই নিই ওদিককার খবর কী।”

অর্ণব ততক্ষণে মিস্ বোসের সঙ্গে সেট হয়ে গিয়েছে। এখন অনেকটা চনমনে লাগল তাকে। সে ওখানকার পরিস্থিতি অধিরাজকে সবিস্তারেই জানায়। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, মেয়েদের পি এন পি সি নামক বস্তুটি সত্যিই খুব কাজের। কৌশানী ও ইতিমধ্যে অনেকরকম তথ্য জোগাড় করে ফেলেছে। অর্ণব জানাল, “এ বাড়িতে বাইরের লোক বিশেষ আসে না। এ বাড়ির লোকেরা নিজেরাই নিজেদের মতো থাকেন। আসার মধ্যে দুধ, ব্রেডওয়ালা, সব্জিওয়ালা, প্লাম্বার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান, কেবলওয়ালা, এদেরই যাতায়াত বেশি। তবে স্যার, বাইরের কাউকে দরকার নেই। এ বাড়ির মেম্বাররাই এন্টারটেইনমেন্টের জন্য যথেষ্ট!”!”

“সে কী

“আপনি মিস্ বোসের কাছ থেকেই শুনে নিন।

মোবাইল ফোনটা হস্তান্তরিত হল। মিস্ বোস প্রথমেই ঝঙ্কার দেওয়া সুললিত কণ্ঠে উদ্বেগের সুরে জানতে চাইল, “আপনি ঠিক আছেন স্যার? এত বড়ো একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেল...!”

“আই অ্যাম পারফেক্টলি অলরাইট মিস্ বোস।” অধিরাজ মূল প্রসঙ্গে আসে,

“আপনি কী বুঝছেন? হাওয়ার গতিক কেমন?”

“হাওয়া মোটামুটি ঠিকঠাকই।” মিস্ বোস জানান, “তবে এরা অদ্ভুত টাইপের একটা ফ্যামিলি। সচরাচর বাঙালিরা মিশুকে হয়। কিন্তু এইরকম আনসোশ্যাল আর ইনকমিউনিকেটিভ ফ্যামিলি আমি জীবনে প্রথম দেখছি। স্বার্থ ছাড়া এরা একটি লোককেও অ্যালাউ করে না! যেমন অফিসার সরকার বললেন, দুধওয়ালা, রুটিওয়ালা, সব্জিওয়ালা, কেবলওয়ালা, আর নিতান্তই দরকার পড়লে ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্লাম্বার কিংবা অন্য কেউ আসে।

প্রতিবেশীদের সঙ্গে এরা কোনো কথাই বলে না। আমি পাশের বাড়ির মহিলার সঙ্গে একটু কথা বলেছি বলে সোমলতা চৌধুরী আমায় যা তা বলেছেন! মহিলা শয্যাশায়ী, কিন্তু মুখের কোনো আগল নেই। পৃথিবীসুদ্ধ সব লোকই সোমলতার মতে বদমায়েশ ও ধান্দাবাজ। ইনফ্যাক্ট আমাকেও তিনি এদের মধ্যেই ফেলেছেন। বিশ্বাস তো করেনই না, উপরন্তু মনে হয় একটু সন্দেহও করছেন। ভাবছেন, আমি বুঝি ওঁর বুড়ো বরকে নিয়ে পালিয়ে যাব!"

"সেরেছে!" অধিরাজ বিষম খেতে খেতে বাঁচল, "তেমন কোনো চান্স আছে কি?"

"মনে হয় না।" কৌশানী একটুও ইতস্তত না করে বলে, "বুড়ি যত খিটখিটে, বুড়ো তুলনায় নরমসরম! আমি বোধহয় ওকে একটু ভুল বুঝেছি। বডিমাসাজের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সেটা অন্য অর্থে নয়। প্রথমে অনেক কিছুই ভেবেছিলাম। পরে শুনলাম লোকটা আর্থ্রাইটিসের ব্যথায় মাঝেমধ্যেই খুব ভোগে। কে যেন তাকে বলেছিল বডিমাসাজ করলে ব্যথা কমে। সেজন্যই আগুপিছু কিছু না ভেবে দুম করে বলে ফেলেছেন। নিজের জীবন ও পরিবারের প্রতি ওর খুব যত্ন। তার সঙ্গে শরীরের যত্ন নেওয়ার জন্য যে যা বলে, সেইসব টোটকা নিজের ওপরেই এক্সপেরিমেন্ট করেন। তার জন্য ভুলভাল কাজও করে ফেলেন। কে যেন ওকে বলেছিল চুনের জল খেলে হাড় শক্ত হয়। ব্যস, উনি গপাৎ করে হাফ কাপ চুনের জল খেয়ে নিয়েছিলেন। তার পরদিনই ওকে হসপিটালে অ্যাডমিট করতে হয়। ডাক্তাররা প্রায় মারতে বাকি রেখেছেন। অতখানি চুনের জল খেয়ে ওর যে পাকস্থলী বা অন্ত্র ফুটো হয়ে যায়নি এই অনেক! তবু ভদ্রলোকের শিক্ষা হয়নি। এখন যেন আবার কার পরামর্শে সকালে উঠে খালি পেটে কাঁচা হলুদ, রসুন আর কীসব কচকচ করে খান। এমনকি সর্ষের তেল থেরাপিও শুরু করেছেন। সর্ষের তেল মাখেন, নাকে টানেন, অয়েল পুলিং করেন এমনকি ডেইলি টু টি স্পুন কাঁচা তেল খেয়েও নেন। তাতে নাকি ওর সর্দি ও হজমের সমস্যা একদম হাওয়া হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ইউটিউবের কোন ডাক্তারের অ্যাডভাইস শুনে রেইকি আর বডিমাসাজের পেছনে পড়েছেন। শুধু আমাকে নয়, শিবুকে, শিখাকে এমনকি বুড়ি থুড়থুড়ি কমলাকেও মাসাজ করার অনুরোধ করেছিলেন। অর্থাৎ, এটা ওর চারিত্রিক দোষ নয়, বাতিক!"

"যাক। আপনি তবে সেফ আছেন।" সে একটা শ্বাস ছাড়ল, "বাকিরা?"

"ছেলে পরিমল আর পুত্রবধূ মেঘনা, এরা আবার সত্যযুগের অবতার। পরিমলের কোনো বন্ধু নেই। তার হার্ডওয়্যারের বেশ বড়ো বিজনেস। পয়সার অভাব নেই। সে সকালবেলা বাবা-মাকে ঘটা করে প্রণাম করে অফিসে যায়। আবার অফিস থেকে ডাইরেক্ট বাড়িতেই ফিরে এসে আবার প্রণাম করে। পিতৃ-মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা। মেঘনাও তাই। দিনে কতবার শ্বশুর-শাশুড়ির পা ছোঁয় তার ঠিক নেই। আধুনিক শিক্ষিত মেয়ে। অথচ তার গোপালভক্তি বোধহয় মীরাবাঈকেও টেক্কা দেয়। বাবা-মা যখন উঠতে বলবে, তখন উঠবে, বসতে বললে বসবে! ওরা পার্টিতে যায় না, ডিস্কোতে যায় না, বার, নাইটক্লাব, রেস্টোর‍্যান্ট, নিদেনপক্ষে চায়ের ঠেকেও যায় না। বাইরের খাবার খায় না। সিনেমা, থিয়েটার দেখতেও যায় না। বাড়িতে টিভি আছে, কিন্তু ফিল্ম বা সিরিয়ালের তুলনায় ভক্তির চ্যানেলগুলোই বেশি চলে। সর্বক্ষণই ভজন, কোনো বাবার প্রবচন বা জ্যোতিষীর পরামর্শ চলছে! এত বেশি ভক্তি দেখলে মনে হয় সত্যযুগে ফিরে গেছি! একদম সুবোধ ছেলে। বাবার খুব প্রিয়ও বটে। বাবার অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করে না। এই একটি জায়গায় পি সি চৌধুরী সবচেয়ে দুর্বল। পরিমল ওঁর প্রাণ। শিখা গল্প করছিল যে ছেলে হেঁটে গেলেও বোধহয় বুড়োর প্রাণে লাগে। একবার শেভ করতে গিয়ে পরিমলের গাল অল্প একটু কেটে গিয়েছিল। এক-দু বিন্দু রক্ত পড়েছে কী পড়েনি, চৌধুরী সাহেব পুরো বাড়ি মাথায় তুলে, তিনজন ডাক্তারকে একসঙ্গে কল দিয়ে, নিজেই দৌড়ে গিয়ে টিটেনাস ইঞ্জেকশন এনে টেনে ধুন্ধুমার করে ছাড়লেন। লোকটা শয়তান, খুনি, সব কিছু হতে পারে। কিন্তু আদর্শ বাবা এবং শ্বশুরও বটে। কেউ বাবা-ছেলের কেমিস্ট্রি দেখলে বিশ্বাসই করবে না যে পরিমল মিঃ চৌধুরীর নিজের রক্ত নয়, অ্যাডপ্টেড। শাশুড়ি আর বউমা বাইরে যাই দেখাক, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেউ কাউকে

দেখতে পারে না। অথচ মেঘনা শ্বশুরের ভীষণ ন্যাওটা। পুত্র ও পুত্রবধূর প্রতি ওর ভালোবাসা অকৃত্রিম। সোমলতা এতটাই শুচীবায়ুগ্রস্ত যে কিচেনে জুতো পরে ঘুরে বেড়ানো একদমই অ্যালাউ করতেন না। কিন্তু মেঘনার আবার সর্দির ধাত। মিঃ চৌধুরী নিজে তার জন্য শীতকাল হলেই ঘরে পড়ার জুতো আলাদা করে কিনে আনেন। সোমলতার সঙ্গে রীতিমতো মারপিট করে তার জুতো পরে কিচেনে ঢোকার পারমিশন আদায় করেই ছেড়েছেন। তবে কমলার ধারণা, মেঘনা যতটা ভালোমানুষি দেখায় আদতে ততটা নয়। শ্বশুরের চেয়ে শ্বশুরের সম্পত্তিই তার বেশি প্রিয়। তবে একটা বিষয়ে শাশুড়ি ও বউমা, দু-জনেই একমত। তাদের পরিবারের চারজন মানুষ ছাড়া বাইরের লোকজন সবাই শয়তান! মেঘনাও বাইরের কারোর সঙ্গে মেশে না। প্রচণ্ড দাম্ভিক এবং কাজের লোকদের মনুষ্যপ্রজাতি ভাবে না।"

"হুঁ।" অধিরাজ চিন্তান্বিত স্বরে বলল, "লাভিং ফাদার হওয়ার জন্যই উনি বার্নিং শিখের ফেভারিট টার্গেট! বাড়ির কাজের লোকদের সম্পর্কে কিছু জানা গেল?"

"শিবু এখানে বারো ঘণ্টা সার্ভিস দেয়। সকাল আটটা টু রাত আটটা। খুব পাংচুয়াল কাজেও চটপটে। কিন্তু মহিলা দেখলেই একটু গলে পড়ে। আমায় একটু বেশিই হেল্প করতে চাইছে। শিখা ভীষণ মেজাজি। এক্ষেত্রে মিসেস চৌধুরী একটুও বাড়িয়ে বলেননি। সে সত্যিই ফাঁকিবাজ। দেরি করে আসে আর তাড়াতাড়ি যেতে পারলে বাঁচে। তবে ওকে 'এবিপি আনন্দের' হিউম্যান ভার্সানও বলা যায়। এ তল্লাটের সব খবর রাখে। এ পরিবারের খবরও ওর নখদর্পণে। কোন্ জিনিসটা কোথায় থাকে, তা বোধহয় চোখ বুঁজে বলে দিতে পারবে। এ বাড়ির কেউ যদি কোনো জিনিস খুঁজে না পায়, শিখাকেই জিজ্ঞাসা করে নেয়। ওর সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই আমি অনেক কিছু জেনেছি। যেমন শিখা অদ্ভুত একটা কথা জানিয়েছে, যেটা আমার একটু মিস্টিরিয়াস লেগেছে স্যার।" ,

"পি সি চৌধুরী দশ বছর আগে কলকাতায় আসেন। পরিমলকে তিনি তার অনেক আগেই অ্যাডপ্ট করেছিলেন। পরিমলের বয়েস এখন আটত্রিশ কী উনচল্লিশ। কিন্তু শিখার সন্দেহ সে কোনোমতেই বাঙালির সন্তান নয়। চৌধুরী সাহেব দিল্লিতেই তাকে অ্যাডপ্ট করেছিলেন। তাকে দেখতেও ঠিক তথাকথিত বাঙালিদের মতো নয়। যথেষ্ট লম্বা-চওড়া, ফর্সা, কাটা কাটা মুখ, ক-টা চোখ আর বাদামি চুল। মুখের আদলটাও সাধারণ বাঙালির ছেলের সঙ্গে মেলে না। তার ওপর দিল্লি থেকে অ্যাডস্টেড। সুতরাং তার রক্তে অবাঙালি-মা বাবার জিন থাকার চান্স প্রবল।" মিস্ বোস বলল, "আর পরিমলের বয়েস যদি আটত্রিশ বা উনচল্লিশ হয়ে থাকে, তবে তার জন্ম উনিশশো চুরাশি সালে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তার অ্যাডপশনের পেছনে যদি বিশেষ কোনো কাহিনি থাকে তবে আশ্চর্য হব না।"

"ব্রিলিয়ান্ট ডিডাকশন মিস্ বোস!" অধিরাজ খুশি হয়ে বলল, "আই অ্যাম রিয়েলি ইমপ্রেসড। সেই কাহিনিটা আমরাই না-হয় খুঁজে বের করে নেব। বাট রিয়েলি গুড ওয়ার্ক। শিখার চশমার পাওয়ার কত?"

'কমসে কম মাইনাস ফাইভ হবেই।" তার সপ্রতিভ জবাব, "বেশ ভারি পাওয়ারের চশমা। তবে মহিলা চূড়ান্ত অলস। সে নিজের কাজটাও পারলে কমলার ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। এককথায় পটের বিবি।"

গ্রেট। এবার কমলা সুন্দরী সম্পর্কে একটু আলোকপাত করুন।"

"ও মহিলার প্রায় মরার বয়েস হয়েছে। বয়েস প্রায় আশির কাছাকাছি।" কৌশানী জানাল, "ধীরগতিতে কাজ করাটা ওর ইচ্ছাকৃত নয়। এই বয়েসে স্পিডে কাজও করা যায় না। তবে রান্নার হাত খাসা। ওর সম্পর্কে বলার মতো তেমন কিছুই নেই। সাতে পাঁচে থাকে না। মুখরোচক আলোচনা পেলে অবশ্য জমে যায়। তবে শিখার মতো অত কৌতূহলী স্বভাবের নয়। কানে একটু কম শোনে। বাদবাকি সব ঠিকঠাক।" সে একটু থেমে ফের যোগ করে, "ওঃ স্যার, মাই ফল্ট। আমি এটা মিস্ করে গেছি। আর একটা লোকও এ বাড়িতে কিন্তু আসে। আই মিন, শুনেছি তিনি সপ্তাহে দু-দিন করে আসেন। রোজ আসেন না। কাল তার

আসার কথা আছে। এলে স্বচক্ষে দেখতে পাব।"

"কে তিনি?"

"মিসেস চৌধুরীর ফিজিওথেরাপিস্ট। মিঃ রাজীব চন্দ। তাঁর নামই শুনেছি শুধু। বিশেষ কিছু জানি না। খুব বেশি দিন হল রিক্রুটেড হননি। ভদ্রলোকের সম্পর্কে মিসেস চৌধুরী জানিয়েছেন যে তিনি খুব ভালো ফিজিওথেরাপিস্ট। আর মিঃ চৌধুরী একটু খার খেয়ে বসে আছেন। কারণ অ্যাজ ইউজুয়াল রাজীবকেও তিনি বডিমাসাজের অফার দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজীব জানিয়েছেন যে উনি ফিজিওথেরাপিস্ট, থাইমাসাজ গার্ল নন। তাতে ভদ্রলোক প্রচণ্ড চটেছেন!"

"এদের মধ্যে কেউ লেফটি?"

"না স্যার।" মিস্ বোস আত্মবিশ্বাসী, "আমি শুরুতেই সেটা নোটিস করেছি। এদের মধ্যে কেউ লেফটি নয়। শিখা মাঝেমধ্যে লুকিয়ে বিড়ি ফোঁকে, তবে সেটা ডানহাতে ও ঝাড়ুও ডানহাতেই ধরে। কমলা হাতা-খুন্তি সব ডানহাতে নাড়ে। শিবু ও সব কাজ ডানহাতেই করে। মিঃ আর মিসেস চৌধুরী, পরিমল ও মেঘনা, এরাও ডানহাতি। তবে মিঃ রাজীব চন্দ সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। এখনও দেখিনি তাঁকে।"

তথ্যটা জেনে একটু যেন হতাশ হল অধিরাজ, "আর যারা নিয়মিত বাড়িতে আসে? যাদের আসা-যাওয়া থাকলেও তাদের অস্তিত্বের তেমন গুরুত্ব নেই? যেমন দুধওয়ালা, ব্রেডওয়ালা, খবরের কাগজওয়ালা বা বাকিরা?"

"তাদের ঠিক লক্ষ্য করিনি স্যার। ওদের মধ্যে কেউ লেফটি হলেও হতে পারে।" "এবার থেকে ভালো করে লক্ষ্য করবেন।" সে দৃঢ় স্বরে বলল, "বার্নিং শিখ যে কোনো রূপে থাকতে পারে। প্রতিবেশীরা বা বাইরের লোক ওদের ঘরে আসে না, এটা একটা ভালো খবর। কিন্তু এমনও হতে পারে, সে ভেতরেই ঢুকে বসে আছে। ও বাড়ির একজন কাজের লোকও চব্বিশঘণ্টার নয়। সর্বোপরি যারা প্রত্যহ আসে, দুধ, ব্রেড, কাগজ, সবজির বিক্রেতা কিংবা প্লাম্বার, ইলেক্ট্রিশিয়ানের মতো এমার্জেন্সি সার্ভিস দেওয়ার লোক, তাদের ওপরও নজর রাখুন। তাদের মধ্যেও যে কেউ হতে পারে। প্রত্যেকটি অচেনা মুখকে জরিপ করে নেবেন। কাউকে বিশ্বাস নেই। আর কাল লক্ষ্য রাখবেন ওদের মধ্যে কেউ খুঁড়িয়ে চলছে কিনা।

"ওকে স্যার।"

"থ্যাংকস।" অধিরাজ একটু শ্বাস টানল, "অর্ণব কোথায়?"

মোবাইলটা ফের অর্ণবের কাছেই ফিরে গিয়েছে। অধিরাজ চিন্তিত স্বরে জানতে চায়, "তোমার পায়ের নখটার কী অবস্থা? হাতের ব্যথা কি একটু কমেছে?"

অর্ণব কী বলবে বুঝে পায় না। যে লোকটার কাঁধে চোট, হাতে চোট, সে কিনা তার ছোটোখাট জখম নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সে আস্তে আস্তে বলল, "ব্যথা এখন নেই স্যার। ডঃ চ্যাটার্জি পেইনকিলার দিয়ে দিয়েছেন। আপনি এর মধ্যে মনের সুখে আস্ত একটা প্যাকেটই ধোঁয়া করে দেননি তো?"

"না না...!" সে হাসছে, "মিস্ দত্ত সাক্ষী আছেন। মাত্র একটা সিগারেট খেয়েছি।

তবে গুরু, এবার একটু ঢিল দাও। আই মিন, এত স্ট্রেস, এত চাপ, রাত জাগা, একটু বেশি তো টানতেই পারি। অন্তত যতক্ষণ না বার্নিং শিখ নামের ফাঁড়াটা কাটছে...?" অর্ণব একটু চুপ করে থাকে। কথাটা ভুল নয়। যে পাহাড়প্রমাণ চাপ আর টেনশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা, তার মধ্যে যে কোনো স্মোকার একটু বেশিই স্মোক করবে। তার ওপর গত দু-রাত ওরা না ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। বার্নিং শিখও কম ঘোল খাওয়াচ্ছে না। ইন্ধন তো একটু লাগবেই। সে নিজেই তো কাপের পর কাপ চা-কফি খেয়ে চলেছে। স্যার আবার অত চা বা কফি খান না।

"ওকে। ডান।" সে সস্নেহ ভঙ্গিতে বলে, "কিন্তু তাই বলে দিনে চার পাঁচ প্যাকেট উড়িয়ে দেবেন না।"

"প্রশ্নই ওঠে না।" বলতে বলতেই অধিরাজ আবার অন্যমনস্ক, "তুমি হয়তো আমাকে

পাগল ভাবতে পারো। কিন্তু একটা জিনিস আমার খুব আনক্যানি লাগছে।"

"কী জিনিস?"

"ওখানে তুমি আর মিস্ বোস ঠিকঠাক আছ। পি সি চৌধুরীর ফ্যামিলিও ঠিকঠাক আছে। এদিকেও নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি। পবিত্র আর প্রণবেশদাও চুপচাপ। চতুর্দিকে এত শান্তি, সেটাই সবচেয়ে আনক্যানি।"

অর্ণব বিস্মিত, "এতে আশ্চর্যের কী আছে স্যার? বার্নিং শিখ হয়তো আজ আর অ্যাটাক করবে না। হয়তো দু-বার ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"উঁহু। ওখানেই ভুল করছ তোমরা।" সে মাথা নাড়ল, "ও পাবলিক হাল ছাড়ার লোকই নয়। ওর দেওয়া টাইম লিমিটের মধ্যে অলরেডি ও দু-বার অ্যাটাক করেছে। ওর প্ল্যানিং ছিল আজ রাতেই কোনো একটা ফ্যামিলিকে মারার। তার জন্যই টায়ার নিতে এসেছিল। কিন্তু সে প্ল্যানে আমরা জল ঢেলে দিয়েছি। তার রি-অ্যাকশনও দেখো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তোমার ওপর অ্যাটাকটা অলমোস্ট ফুলপ্রুফ ছিল। অথচ সেটাও ব্যর্থ। আজকাল ইন্টারনেট ও মিডিয়ার কল্যাণে সব খবরই ইনস্ট্যান্ট পাওয়া যায়। মাঝরাতেও যদি এনকাউন্টার হয়, তবে তার নিউজ রাত থেকেই ভাইরাল হতে থাকে। ইনফ্যাক্ট, এনকাউন্টার, অ্যাক্সিডেন্ট, মার্ডার তো ছাড়ো, আজমল কাসভ বা আফজল গুরুর ফাঁসি একদম চুপচাপ হয়েছিল। জেলের হাতে গোণা কয়েকজন অফিশিয়ালস ছাড়া কেউ জানতই না। আজমল কাসভকে তো প্রাইভেসির জন্য আর্থার রোড জেল থেকে ইয়েরওয়াড়া জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পর্যন্ত। কিন্তু কোনো না কোনো মিডিয়া, চ্যানেল ঠিক শুঁকে শুঁকে পৌঁছে গেছে ও ব্রেকিং নিউজ বানিয়ে ফেলেছে। আর একটা চ্যানেল যদি এক্সক্লুসিভ কোনো খবর দেয়, তবে বাকি

চ্যানেলগুলোও উঠে পড়ে সেই নিউজটাকেই কভার করে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হলেও দেখবে তার দশ মিনিটের মধ্যেই ওয়েব পোর্টাল আর নিউজ চ্যানেলে খবরটা পৌঁছে গেছে। এই অবস্থায় যদি তার প্ল্যানিং সাকসেসফুল হত, আর আমাদের টাইমিং এ একটু এদিক ওদিক হত, তবে এতক্ষণে সেটা বিরাট খবর হয়ে যেত। কারণ সাংবাদিকরাও সবাই হাই অ্যালার্টেই আছে। যেহেতু বার্নিং শিখ: এখন গরমাগরম ইস্যু, এবং এখনও কোনো পুলিশ অফিসারের অ্যাক্সিডেন্টের খবর কোনো পোর্টাল বা চ্যানেল দেয়নি, সুতরাং সে নির্ঘাত বুঝেছে যে তার প্ল্যান ফের ফ্লপ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ও আবার একটা অ্যাটাক করবেই। কারণ ওর হাতেও সময় কমছে। তার মধ্যেই ওকে পুলিশকে চাপে রাখতে হবে, ফ্যামিলিগুলোকে ভয় দেখাতে হবে, আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম রাখতে হবে, তারপর একে একে ওদের মারতে হবে। হারতে সে জানেই না! বাধা পেলে বাধাকে গুঁড়িয়ে দেওয়াই তার সাইকোলজি। পুলিশকেও ছাড়ছে না। অথচ সেই লোকটা কিনা হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে আছে!" অধিরাজের চোখে দুশ্চিন্তা, "এতটা শান্তিপ্রিয় সে আদৌ নয়। আমার মন কু গাইছে। আজকের রাতটা এত শান্তভাবে কাটার কথা নয়। অ্যাটাক আসবেই অর্ণব। কোনো না কোনোদিক থেকে সে আবার আক্রমণ করবে। এত সহজে থামবে না। এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি মোটেই স্বাভাবিক নয়..!"

অর্ণব ফোনে কথা শুনতে শুনতেই একটা বিপ্ বিপ্ শব্দে সচকিত হয়ে উঠল। একটা ফোন ঢুকছে। সে একঝলক ফোনের স্ক্রিনটা দেখে নেয়। অফিসার পবিত্র আচার্যের ফোন। অর্ণব সে কথা অধিরাজকে জানাতেই সে বলল, "কনফারেন্সে নিয়ে নাও।" অর্ণব পবিত্রকে কনফারেন্স কলে নিয়ে নিল। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসে তার অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বর, "অর্ণব, রাজা আছে লাইনে?"

অধিরাজের চোখে আশঙ্কা, "আছি পবিত্র। এনি ব্যাড নিউজ?"

পবিত্র কোনোরকম ভূমিকা না করেই বলল, "এইমাত্র সি.আই.ডি. ব্যুরো থেকে ফোন এল। আমাদের অফিসের একটু সামনেই বস্তার মধ্যে একটা লাশ ফেলে গিয়েছে কেউ। লাশ বলা অবশ্য ভুল, লাশের একগাদা টুকরো বললে ঠিক হয়। তবে টুকরো করা ধড়ের সঙ্গে মাথাটাও আছে বলে শনাক্ত করতে কোনো অসুবিধে হয়নি। লাশটা খবরি ইসমাইলের!"

“হো-য়া-ট!”

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবরটা এসে আঘাত করল ওদের। পুরো বিলো দ্য বেল্ট অ্যাটাক! এতদিন বার্নিং শিখ পুলিশদের খুন করছিল। এবার খবরিও তার টার্গেটে। এই আশঙ্কাটা একদমই করেনি অধিরাজ। সে ভিকটিম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের নিয়েই বেশি চিন্তিত ছিল। ইনফর্মারদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা একবার-দুবার মনে আসেনি যে তা নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইনফর্মারদের আসল পরিচয় হাতে গোণা কয়েকজন ছাড়া কেউ জানেই না। এমনকি সবসময় ওদের পরিবারও জানতে পারে না যে তাদের বাড়ির একজন সদস্য পুলিশের খবরি। পুলিশেরাই সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য খবরিদের টাকা দিয়ে একটা সাইড বিজনেসও খুলে দেয়। সাধারণ মানুষ ওদের কাউকে পানের দোকানি, হকার, চা-ওয়ালা কিংবা সব্জিওয়ালা হিসেবেই চেনে। ইসমাইলের পানের দোকান ছিল। এতটাই সে সতর্ক যে ওর বউও এই পেশার খবর রাখত না! শেষপর্যন্ত সেই ইসমাইল। অসম্ভব চতুর ও সতর্ক খবরি। সি.আই.ডি.-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইনফর্মার।

অধিরাজ বিস্ময়ের ধাক্কায় হতবাক হয়ে পড়েছিল। সে কিছু বলার আগেই পবিত্র ফের বলল, “শুধু তাই নয়, ঘণ্টাখানেক আগে রকির ডেডবডিও পাওয়া গিয়েছে। ওকে পুড়িয়ে মেরেছে। নেকলেসিং নয়। কেরোসিন গায়ে ঢেলে দিয়েছিল। লাশের এতটাই খারাপ অবস্থা যে চেনাই যাচ্ছিল না। নেকলেস, ব্রেসলেট আর পিঠের ট্যাটুটা কোনোমতে বেঁচে গিয়েছে বলে শনাক্ত করা গিয়েছে। দুটো লাশই ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দিতে বলেছি।”

সি.আই.ডি.? অফিসারদের অতিবিশ্বস্ত পঞ্চপান্ডবের টিমের মধ্যে দু-জন শেষ। ওদের দু-জনকেই পি সি চৌধুরী আর ভূপেন্দ্র দত্তার বাড়িতে আসা সমস্ত অতিথি, চাকরবাকরদের স্টক করতে বলেছিল অধিরাজ। দুই পরিবারের সদস্যদের ইতিহাস, বন্ধু-শত্রুদের খবরও নিতে বলেছিল। আজ সকাল সাতটাতেই খবরিদের জড়ো হওয়ার কথা। অন্যতম অভিজ্ঞ ও দক্ষ খবরিরা নিশ্চয়ই কিছু জানাত। কিন্তু তার আগেই...

অধিরাজ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “এই দুই ফ্যামিলিতে আজ আর কিছু হবে না। ভোর হয়ে যাবে। অর্ণব, তুমি ওখান থেকে বেরিয়ে স্ট্রেট পবিত্র-র কাছে গিয়ে বসে থাকো। যতক্ষণ না আমি পৌঁছচ্ছি, কেউ কাউকে একা ছাড়বে না। আমি তোমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে ব্যুরোয় ফিরব। ততক্ষণ এক সেকেন্ডের জন্যও বাড়ির বাইরে বেরোবে না। গট ইট? পবিত্র, বি অ্যালার্ট!”

তার কণ্ঠস্বরে ভয় স্পষ্ট। ঘড়িতে তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। পূর্বদিকে আলো দেখা দিয়েছে। আজকের রাতটা শেষ হল ঠিকই। কিন্তু কালরাত্রির অন্ধকার এখনও কাটেনি। কে জানে, আরও কত বলি নেবে এই কালান্তক বাহাত্তর ঘণ্টা!!

*** * *

(১২)

সি.আই.ডি. ব্যুরোর অবস্থা দেখলে মনে হয় এখানে সদ্যই কেউ হাইড্রোজেন বম্ব ফেলে দিয়ে গিয়েছে।

গোটা অফিসে কোনো আওয়াজই নেই। অফিসারদের মুখে আতঙ্ক ও সংশয় স্পষ্ট রকি ও ইসমাইলের এই পরিণতি সবাইকেই জোরদার ধাক্কা দিয়েছে। এমন নয় যে ইনফর্মারদের প্রাণের আশঙ্কা একদমই থাকে না। তাদের পরিচয় জানতে পারলে হিস্ট্রিশিটাররা ছেড়ে কথা বলবে না। কিন্তু রকি এবং ইসমাইল দু-জনেই প্রচণ্ড সাবধানী। বহু বছর ধরে এই পেশাতেই ছিল। তাদের কপালে শেষমেষ কিনা এমন বীভৎস মৃত্যু! একজনের দেহ অগুণতি টুকরোয় এল, অন্যজন পুড়ে ছাই! ওদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। ইসমাইলের আম্মি ছেলের বডি দেখেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ওর স্ত্রী যেন মুক ও বধির! কেমন বোবার মতো ভাষাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল স্বামীর লাশের টুকরোগুলোর দিকে। যেন কোনো অনুভূতিই নেই! ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়ে আছে, কিছু বুঝতেই পারছে না।

রকির অসহায় স্ত্রীয়ের কান্না থামানোই যাচ্ছিল না। ওর বড়ো ছেলে মাকে আপ্রাণ সামলানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু কোনো সান্ত্বনাই এমন পরিস্থিতিতে যথেষ্ট নয়। সে স্বামীর ঐ পোড়া শরীর আঁকড়ে ধরে বুকফাটা হাহাকার করে চলেছিল। কিছুতেই রকির দেহ ছাড়বে না। দুই ছেলে কোনোমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষমেষ তাকে সরাতে পেরেছে। আপাতত দুটো লাশই ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এসব কিছুই অধিরাজ আর অর্ণবের চোখের সামনে ঘটছিল। অধিরাজের মুখ অসম্ভব কঠিন। সে শুধু আর্দ্র কণ্ঠে বলেছিল, "ওদের ফ্যামিলিকে আমি কী জবাব দেব!"

অর্ণব নীরবে তাকিয়েছিল তার দিকে। অধিরাজের মতো একজন বড়ো দরের অফিসারের একজন সামান্য খবরির মৃত্যুতে এত বিচলিত হওয়া হয়তো উচিত নয়। রকি ও ইসমাইল যার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কাজ করত, সেই প্রণবেশ লাহিড়ীও এতখানি কষ্ট পাননি। কিন্তু অর্ণব জানে, অধিরাজ বাকি সবার মতো নয়। গোটা টিমটাই তার কাছে আস্ত একটা পরিবার! সে অফিসারই হোক কী ইনফর্মার। তার কাছে সবাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

যে মুহূর্তে এই দুঃসংবাদ পেয়েছিল অধিরাজ, সেই মুহূর্তেই সে পাগলের মতো ঘন্টু, গুল্লু আর যাদবকে ফোন করছিল। তার ভয় ছিল যে ওদের সঙ্গেও কোনোরকম ট্র্যাজেডি না ঘটে যায়। কিন্তু তিনজনই ঠিকঠাক আছে জেনে একটু স্বস্তি পেয়েছে। তার কথামতো অর্ণব পবিত্র-র কাছে গিয়ে অপেক্ষা করছিল। দু-জন দু-জনকেই একমুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করেনি। অধিরাজ স্বয়ং তাকে বাইকে তুলে নিয়ে এসেছে। পবিত্র ও প্রণবেশ লাহিড়ীকে পইপই করে বলেছে লেডি অফিসারদের কনস্ট্যান্ট মনিটরিং করে যেতে। অধিরাজ বিড়বিড় করেই আপনমনে বলছিল, "আমার মন বলছে, এরপরের অ্যাটাক এই দু-জনের কারোর ওপরই হবে। বুঝতে পারছি, ওদের চরম রিস্কের মুখে ঠেলে দিয়েছি আমি। আরও দুটো রাত... আরও দুটো রাত বাকি আছে। আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে... আমি অনুভব করতে পারছি যে সে কোথায় আছে... কিন্তু প্রমাণ করব কী করে?..এ তো শুধু থিওরি।...আমি তার অ্যাকচুয়াল পরিচয় না পেলেও আন্দাজ করতে পারছি তার অস্তিত্ব... কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়... আমার ভুলও হতে পারে... আর ভুল হলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে.. যা-ই হোক, রাতে অন্তত লেডি অফিসারদের একা থাকতে দেওয়া যাবে না... কিছুতেই না...।"

অর্ণব তার এই স্বগতোক্তি শুনে স্তম্ভিত। কী বললেন স্যার। বার্নিং শিখ কোথায় আছে তা তিনি জানেন! তবে তাকে ধরছেন না কেন? এইভাবে হাতে হাত রেখে বসে থাকার মানে কী! এতে বিপদ বাড়ছে বৈ কমছে না।

প্রশ্নটা করতেই মাথা নাড়ল অধিরাজ, "লাভ নেই অর্ণব। আমরা যদি ফেলুদা, ব্যোমকেশ

বা শার্লক হোমসের মতো প্রাইভেট ডিটেক্টিভ হতাম, তবে পুলিশকে বলে দিতাম, 'ঐ আপনার খুনি।' এরপর প্রমাণ করা, বা সাক্ষ্য-সাক্ষী জোগাড় করা, চার্জশিট তৈরি করা পুলিশের দায়। সেটা গোয়েন্দার কাজের মধ্যে পড়ে না। তারপর অপরাধী শাস্তি পাক, কী বেকসুর খালাস, তাতে আর যা-ই হোক, কোর্ট এবং মিডিয়ার ভর্ৎসনা তাকে শুনতে হয় না। কপাল দোষে আমাদের সে সুযোগ নেই। আমি এক্ষুনি গিয়ে লোকটাকে ধরতে পারি। কিন্তু কোর্টে জজসাহেব যখন জিজ্ঞাসা করবেন, 'কীসের ভিত্তিতে আপনি ওকে গ্রেফতার করেছেন? ইনিই যে বার্নিং শিখ, তার প্রমাণ কী?' আমি কোনো জবাবই দিতে পারব না। আর যদি নিজের থিওরিটা বুঝিয়েও বলি, তবে জজসাহেব আর উকিলদের তো ছাড়ো, কোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছাগলটাও হ্যা হ্যা করে হাসবে! কারণ শুরু থেকেই আমি তার যে প্যাটার্ন লক্ষ্য করছি, তার ভিত্তিতেই তার উপস্থিতি টের পাচ্ছি। অথচ, সেটা আইনের চোখে এতটাই অযৌক্তিক, যে কোর্টে আদৌ কোনো প্রমাণ হিসাবে গণ্যই হবে না। বরং সবার একটা উদ্ভট, গাঁজাখুরি ও হাস্যকর থিওরি মনে হবে। এছাড়া হাতে অন্য কোনো প্রমাণও নেই।

লোকটার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, কিংবা ডি.এন.এ. স্যাম্পল আজ পর্যন্ত কোনো ক্রাইম স্পটে পাওয়া যায়নি। কী দিয়ে মার্ডার করে, তাও অজানা। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কেউ নেই, একমাত্র মদন ছাড়া। তাও সে ওকে মেক-আপ ছাড়া দেখলে চিনতেই পারবে না। সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সও যথেষ্ট নেই। সবাই ভাববে অধিরাজ ব্যানার্জি পেগলে গেছে। তাছাড়া সবসময়ই যে সে প্যাটার্ন বজায় রাখবে এমন কোনো কথা নেই। তার শিকারদের মধ্যে এতদিন ইনফর্মাররা ছিল না। এখন তারাও লিস্টে ঢুকেছে। আর যদি একবারও সে বুঝতে পারে, তার এই প্যাটার্নটাও আমি বুঝতে পেরেছি, তবে সে পুরো প্যাটার্ন চেঞ্জ করে হাওয়া হয়ে যাবে। এখন অন্তত চোখের সামনে আছে। আমি তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে সেটুকুও পাব না! এটা আরও বেশি রিস্কি হবে অর্ণব।" সে আফসোসে মাথা নাড়ে, "আমার অবস্থা ঢাল নেই-তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দারের মতো। বুঝতে পারছি সবই। শত্রুকে চিনতেও পারছি। কিন্তু তাকে ঠেকানোর অস্ত্র নেই আমার কাছে। তার মন পড়তে পারছি। অথচ আইনের কাছে তা মূল্যহীন। এই পরিস্থিতিতে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো চয়েস নেই।" ¡

"স্যার..." অর্ণব জানতে চায়, "ইসমাইল বা রকি কি কোনো তথ্য পেয়েছিল?"

"নির্ঘাৎ পেয়েছিল।" সে আফসোসে মাথা নাড়ে, "হয়তো সেটা আমাদের জন্য ব্রেক-থ্রু হতে পারত। ওরা সবার ঠিকুজি-কুলুজি বের করছিল আর সবার যাতায়াতের ওপর নজর রাখছিল। কিছু না কিছু বুঝতে পেরেছিল ঠিকই। কিন্তু এখন সেটা জানার উপায়ও নেই! অ্যাকচুয়ালি এখানে একে অপরকে নিরস্ত্র করার খেলা চলছে! আর এই গেমটা ও জিতল!"

"মানে?"

"শুরুতে আমরা ওকে নিরস্ত্র করেছি। ওর অ্যাসিড বাল্ব ছিনিয়ে নিয়েছি। তিনটে তোমাকে লক্ষ্য করে ছুড়েছিল। চারটে ওর চোলার তলায় ছিল যেগুলো আমি বের করে নিয়েছিলাম। টোট্যাল সাতটা অ্যাসিড বাল্ব। হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড কিলোদরে কেউ জোগাড় করতে পারে না। আস্ত একটা অ্যাসিডের কনটেনার নিয়ে সে বসে আছে, এটা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং মোস্ট প্রব্যাবলি, তার কাছে এই মুহূর্তে আর অ্যাসিড বাল্ব নেই। সম্ভবত বম্বও নেই। একটা ছিল, সেটা ব্যর্থ হয়েছে। যদি এ দুটোর একটাও থাকত, তবে খবরিদের ওপর প্রয়োগ করত। রকিকে সে পুড়িয়ে মেরেছে। তার জন্য কেরোসিনের থেকে হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড বা বম্ব অনেক বেশি সহজ অপশন। ডক যখন পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেবেন, তখন দেখবে ইসমাইলের মার্ডারে তরোয়াল, আর রকির মার্ডারে কোনো ঘুমের ওষুধ বা ড্রাগসের সঙ্গে কেরোসিনের ইউজ হয়েছে। তার স্টকে অ্যাসিড বা বম্ব থাকলে এটা হত না।"

"এমনও তো হতে পারে যে সেগুলো সে আমাদের জন্য রেখেছে?" "নিশ্চয়ই রাখত।

যদি সে এই দুটো আক্রমণের একটাতেও সাফল্য লাভ করত। ও মাল বুঝেছে যে কলকাতা পুলিশ ওর অ্যাসিড অ্যাটাক আর বম্বের বিষয়ে অ্যালার্ট হয়ে আছে। অতএব ও আমাদের তরোয়াল নিয়ে কাটতে আসতে পারে, কিংবা অজানা মার্ডার ওয়েপন দিয়েও মারতে পারে। কিন্তু অ্যাসিড আর বম্বের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করবেই। ও জানে আমরা সতর্ক হয়ে আছি এবং ওর স্টাইল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। এখন টিমের কেউ ফোর-হুইলার ইউজ করছে না, সবাই বাইকে যাতায়াত করছে। ইভেন মিস্ দত্ত এবং মিস্ বোসও পবিত্র বা প্রণবেশদার বাইকে যাতায়াত করছিলেন। বাইক ফোর-হুইলারের মতো ঢাকা-চাপা দেওয়া জিনিস নয় যে ইঞ্জিনে বম্ব ফিট করবে। বাইরে থেকেই বোঝা যায় যে কিছু গোলমাল আছে কিনা। তার ওপর ছোটোখাট জিনিস বলে সিকিউরিটির নাকের ডগাতেও পার্ক করা যায়। তাই ওটায় বম্ব সেট করা মুশকিল। বার্নিং শিখ হাড়ে হাড়ে বুঝেছে, যে ওর আক্রমণ পুলিশের কাছে স্টিরিওটাইপড আর ভীষণ প্রেডিক্টেবল হয়ে গেছে। তাই এবার অন্য অস্ত্র আমদানি করবে।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলল, "লোকটাকে মোটেই মূর্খ ভেবো না। পুলিশ অ্যালার্ট আছে, কিন্তু ইনফর্মাররা নয়। সুতরাং অ্যাসিড বা বম্ব ওখানেই ইউজ করত। যখন করেনি, তখন বুঝতে হবে ও দুটো জিনিস এই মুহূর্তে তার স্টকে নেই। দু-কদম এগোনোর পর ওকে চারকদম পেছোতে হল। তার শোধ তুলল দু-জন এক্সপার্ট খবরিকে খুন করে। পুলিশের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র ইনফর্মার। খুনি এবার সেই অস্ত্র ছিনিয়ে নিল আমাদের কাছ থেকে। ইন শর্ট, আমরাও চারকদম পিছোলাম। ও খবরি মহলে আতঙ্ক ছড়াতে পেরেছে। এটাই ওর সবচেয়ে বড়ো জয়!"

"তাহলে এখন কী করব?"

অধিরাজ ঘড়ি দেখল, "একটু পরেই ঘন্টু আর যাদবের সঙ্গে মিটিং আছে। তার আগে মদনকে ইন্টারোগেট করে নিই। আমাদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বলতে শুধু ও-ই আছে।"

"যদি মুখ না খোলে?"

তার মুখ শক্ত হয়ে ওঠে, "ইন দ্যাট কেস, দু-নম্বর গানের সবকটা গুলিই আমি ওর মাথায় ঢুকিয়ে দেব। ও এমন কিছু সাধু সন্ত নয় যে কাজে না লাগলে ওকে বসিয়ে বসিয়ে জেলের ভাত খাওয়াতে হবে। অকাজের আবর্জনা রাখার কোনো মানেই হয় না!"

অর্ণব বুঝল যে বার্নিং শিখের এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে অধিরাজের মেজাজ চূড়ান্ত খারাপ হয়ে আছে। একদিকে যেমন রাগ, দুঃখ, যন্ত্রণা, অন্যদিকে তেমন অসহায়তায় ভুগছে সে! তার নিজের জীবন নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কিন্তু গোটা টিমের ওপর এখন মৃত্যুর করাল ছায়া পড়ছে। যে কেউ, যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। ওদিকে আত্রেয়ী দত্ত, কৌশানী বোস, অন্যদিকে পবিত্র আচার্য, প্রণবেশ লাহিড়ী এমনকি অর্ণবও বিপন্ন। কোন্ দিকে দৌড়বে তা সে বুঝতেই পারছে না। 'বি-অ্যালার্ট" শব্দটা অন্য কোনো কেসে এতবার ওকে বলতে শোনেনি কেউ। বারবার ঐ শব্দটা বলার একটাই কারণ। সে নিজেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বার্নিং শিখ শেষ রাতে ওস্তাদের মার দিয়ে দিয়েছে। অধিরাজকে সে কনফিউজ করতে পেরেছে। একমাত্র উপায় ছিল আর্মি নামিয়ে গোটা শহরকেই স্তব্ধ করে দেওয়া। কিন্তু বার্নিং শিখ যদি সত্যিই ভেতরে ঢুকে বসে থাকে, যেটা ওর মোডাস অপারেন্ডিও বটে, তাহলে আর্মির বাবাও ওকে ঠেকাতে পারবে না! মাঝখান দিয়ে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি।

মদনকে ওরা চুপি চুপিই নিজেদের কাস্টডিতে রেখে দিয়েছে। মিডিয়া এখনও এই খবরটা জানে না। তারা বার্নিং শিখকে নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে 'কাটার মদন' তাদের মাথাতেই নেই। তাই মদন যে সি.আই.ডি.-র হেফাজতে তা ওদের জানা নেই। অধিরাজ তাকে অফিশিয়ালি অ্যারেস্টও করেনি। তবে যেহেতু সে প্রত্যক্ষদর্শী তাই ব্যুরোতেই তাকে কড়া সুরক্ষায় রাখা হয়েছে। অত বড়ো একটা গ্যাংস্টার এখনও একটা ছোট্ট শিশুর মতো কথায় কথায় ভয় পাচ্ছে। ঠিকমতো কথাও বলতে পারছে না! এতটাই শকড্ যে জবানবন্দিও দিতে পারেনি। সি.আই.ডি. ব্যুরোয় থাকার দরুণ এখন একটু স্বস্তি পেয়েছে বটে, তবে তা

সাময়িক। বার্নিং শিখ আর যা-ই হোক, ব্যুরোয় ঢুকে ওকে ভয় দেখাতে আসবে না। কিন্তু তা আর কতক্ষণ? কখনও-না কখনও তাকে বাইরে বেরোতেই হবে। যদি এরাই এনকাউন্টার করে ফেলে, তবে গল্প শেষ। যদি না করে, তবে হাজতবাস অবধারিত। কোর্টেও যেতে হবে! তখন যদি ঐ লোকটা এসে ফের হাজির হয়...!

অর্ণব ভেবেছিল, হয়তো মদন এ বিষয়ে কথা বলতেই চাইবে না। অথবা কথা বলার মতো অবস্থাতেই থাকবে না। কিন্তু অধিরাজকে দেখেই সে আবার কথা নেই, বার্তা নেই তাকে খপাৎ করে জাপটে ধরে হাঁউমাউ করে বলল, "প্লিজ স্যার, আপনি আমাকে বাঁচান! আপনি যা বলবেন, তাই করব। সাক্ষী লাগবে না, আমি নিজেই সব দোষ কবুল করব। জেলে ঢুকে বসে থাকব, ফাঁসিতে ঝুলে যাব, যাবজ্জীবন হলে মাটি কোপাব, পাথর ভাঙব, তারপর যদি আদালতের দয়ায় কোনোক্রমে ছাড়াও পাই তবে আলু, পটল বেচতে বসে যাব কিংবা ভিক্ষা করে খাব। তবু জীবনে আর খুন-জখম কিছু করব না! আর নিতান্তই যদি আপনার মর্জি হয়, তবে এনকাউন্টারই করে দিন। চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মতো গুলি খেয়ে মরতেও রাজি আছি, কিন্তু ঐ ভূতটার হাত থেকে আমায় বাঁচান!"

মদনের আতঙ্ক দুই অফিসারেরই অগাধ বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে লোক নিজেই একটা আস্ত রাক্ষস, সর্বক্ষণ অটোম্যাটিক রাইফেল নিয়ে লোককে ঝাঁঝরা করে বেড়াচ্ছে, সে কিনা বার্নিং শিখের ভয়ে এতটাই ভীত যে ফাঁসি বা এনকাউন্টারই তার ইপ্সিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্তত এই দুটো ক্ষেত্রেই মৃত্যু তুলনামূলক কম যন্ত্রণাদায়ক তার কাছে।

ওদিকে ফের মদন ঘাড়ের ওপর এসে পড়ায় অধিরাজ বিরক্ত হয়ে তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে নিজেকে আলিঙ্গন মুক্ত করল, "তুই শুরুটা করেছিস কী? এখানে কি 'চিপকো' আন্দোলন চলছে, না আমি তোর গার্লফ্রেন্ড যে কথায় কথায় জড়িয়ে ধরছিস? তোর কোনটা গেছে? মাথা না চরিত্র।"

"আপনি মা-বাপ হুজুর!" তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে, "রাখলে আপনিই রাখবেন, মারলে আপনিই মারবেন। কিন্তু দয়া করে ঐ রাক্ষসটাকে ঠেকান.... ও আমায় মারবে...! আমি জানি... ও আমায় মারবে। আপনার পায়ে পড়ি... ওর হাতে তুলে দেবেন না।"

বলতে-বলতেই সে ফের অধিরাজের পা জড়িয়ে ধরতে গেল। অধিরাজ প্রায় লাফ মেরে পিছিয়ে যায়। গর্জন করে ওঠে, "ডোন্ট টাচ মি! আই সে-ই-ড ডোন্ট টা-চ আর একবারও যদি আমার ঘাড়ে এসে পড়িস, তবে বার্নিং শিখকেই তোর নামের সুপারি দিয়ে দেব।"

অর্ণব অধিরাজের এই প্রতিক্রিয়াই আশা করেছিল। বার্নিং শিখের নাম শুনে মদন ভয়ের চোটে চুপ করে গেল। অর্ণব এবার একটু সহজ কণ্ঠে বলে, 'তুই বিকাশ দুবের শিষ্য হয়ে একটা সাধারণ খুনিকে ভয় পাচ্ছিস?"

"সাধারণ! কে বলেছে ও সাধারণ।" সে শুকনো ঠোঁট চেটে নেয়, "আমি মানুষের সঙ্গে লড়তে পারি, ভূতের সঙ্গে নয়! আর ও ভূতও নয়, সাক্ষাৎ পিশাচ! কী ভয়ানক মুখ...! ওঃ!"

অধিরাজ সজোরে একটা শ্বাস টেনে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে। সে নিজেও বুঝতে পারছে যে এভাবে রি-অ্যাক্ট করাটা ঠিকও নয়। দুনিয়ায় সবাই একরকম নয়। নিজেকে ক্রমাগতই বুঝিয়ে চলেছে। তবু মাঝেমধ্যে নিজের অজান্তেই একটু বেশি রি-অ্যাক্ট করে ফেলে। জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার দরুণ তার উত্তেজনা একটু প্রশমিত হল। এবার তুলনামূলক ঠান্ডা গলায় বলল, "দ্যাখ, আমাদের কপালদোষে তুই-ই লোকটাকে সবচেয়ে কাছ থেকে দেখেছিস। অর্থাৎ আই-উইটনেস। সেজন্যই এখনও বেঁচে আছিস। সে রাতে কী কী দেখেছিলি যদি ঠিকঠাক বলতে পারিস, তবে এ যাত্রা তোর এনকাউন্টার হবে না। আর যদি মনে না থাকে, তবে তুই কোনো কম্মের না।"

"মনে নেই মানে!" সে রাতের স্মৃতি মনে করেই শিউরে উঠল মদন, "সব মনে আছে। ও মুখ কখনও ভোলা যায় না। কী খতরনাক ...!"

"ও মুখ আমরাও দেখেছি। তাও আবার লাইভ।" সে এবার একটু বিরক্ত, "তুই শুধু এইটুকু বল..., ও বাড়িতে ঢোকার পর থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ঠিক কী কী দেখেছিস ও

কী কী শুনেছিস...! কোনো পয়েন্ট মিস করবি না। তার আগে আর পরে কী হয়েছে তা আমরা জানি। তাই রিপিট করার দরকার নেই।”

মদন একটু ভেবে নেয়। তারপর বলতে শুরু করে, “স্যার, আপনারা যখন আমায় চেজ করছিলেন তখন আমি জান বাঁচানোর জন্য ওদিকেই দৌড়েছিলাম। কিন্তু কোন্ বাড়িটায় ঢুকব তা বুঝতে পারিনি। তখনই চোখে পড়ল ঐ বাড়িটার দরজা হাট করে খোলা! ভাবলাম, আজ আমার জ্যাকপট লেগেছে। ও বাড়িতে ঢুকতে পারলে কিছু মানুষকে ‘হোস্টেজ বানিয়ে পালিয়ে যাব। তাই ওদিকেই দৌড়োলাম। কিন্তু তখন কে জানত যে ওর ভেতরে কী জিনিস বসে রয়েছে!”

বলতে বলতেই বোধহয় তার গলা শুকিয়ে আসে। সে সামনের জলের গ্লাসটার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকাতেই অর্ণব বিনাবাক্যব্যয়ে জলের গ্লাসটা তার দিকে এগিয়ে দেয়, “তারপর?”

একটু গলা ভিজিয়ে নিয়েই সে ফের বলতে শুরু করে, “বাড়িতে ঢোকামাত্রই পোড়া মাংসের গন্ধ আর ধোঁয়ায় নাক, চোখ একেবারে জ্বলে উঠল। মিথ্যে বলব না স্যার, নিজে এত খুন করেছি, লোককে জ্বালিয়েছি যে গন্ধটা পাওয়ামাত্রই বুঝেছিলাম যে এখানে কিছু গোলমাল হয়েছে। এমন গন্ধ লাইফে অনেকবার পেয়েছি। ওটা যে ক্রাইম স্পট, সেটাও সন্দেহ হয়েছিল। তবু ভয় পাইনি। তখন নিজের প্রাণের দায় এতটাই বেশি ছিল যে কোথায় কে কাকে খুন করছে তা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। খুনি যদি আমার সামনে পড়েও যেত, তবে তাকেও দু-ঘা লাগিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু...!” এবার তার চোখে অকৃত্রিম ভয় ফুটে উঠেছে। এটা আর যা-ই হোক, অভিনয় নয়।

তার কণ্ঠস্বরও কাঁপছে, “একটু ভেতরের দিকে যেতেই দেখতে পেলাম ছ-ছ'টা লাশকে কেউ নেকলেসিং করে জ্বালিয়েছে। আর কিছু বোঝার আগেই সে পাবলিক একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। সে রূপ আর নতুন করে কী বলব! আগুনের আলোয় তার মুখ দেখে স্যার, আমার খারাপ অবস্থা। ও লোকটা কিছুতেই মানুষ হতে পারে না। শুনেছিলাম অনেক কালাযাদু করনেওয়ালা তান্ত্রিক ভয়াবহ সব পিশাচ আমদানি করে। জীবনে এই প্রথম চোখের সামনে জ্যান্ত পিশাচ দেখলাম! বীভৎস মুখ, অদ্ভুত একটা পাঞ্জাবি ড্রেস! অথচ তার হাতের চামড়া অদ্ভুত রকমের মসৃণ!”

“হাত মসৃণ মানে?” অধিরাজের ভুরু কুঁচকে গেল, “হাত স্বাভাবিক ছিল না? চোলা পরেছিল তো? তবে হাতটা দেখলি কী করে?”

“কবজি থেকে হাতের পাতা অবধি দেখেছি স্যার।” মদন বলে, “মা কালীর দিব্যি, আপনার আর আমার হাতের মতোই নয়। যতখানি বীভৎস মুখ, ততটাই সুন্দর তার হাত! মানে, আপনার হাতও ভীষণ সুন্দর, একেবারে নারায়ণ ঠাকুরের মতো। কিন্তু ছেলেদের হাতের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের হাতে লোম থাকে। কিন্তু ওর হাত দুটোয় কোনো লোমই ছিল না। এমনকি ওর মুখের বা গলার চামড়ার রঙের সঙ্গে হাতের রঙের কোনো মিলই নেই। হাতদুটো একদম মোমপালিশ ‘আইটেম’দের মতো মসৃণ একেবারে মাখনের মতো ফর্সা রং আর আগুনের আলোয় রীতিমতো চকচক করছিল।”

“তুই ঠিক কী ধরনের চরিত্রহীন রে!” অধিরাজ ধমকে ওঠে, “একটা বীভৎস নৃশংস খুনি তোর সামনে দাঁড়িয়েছিল, সামনে ছ'টা পোড়া লাশ পড়ে ছিল, আর তুই কিনা তার ‘আইটেম গার্ল' মার্কা মাখনের মতো হাত দেখছিলি!”

“মানছি আমি পয়লা নম্বরের লুচ্চা।” সে একটুও প্রতিবাদ না করে বলে, “কিন্তু তখন ওটা আমার চোখে পড়েছিল। আমি ভয়ও পেয়েছিলাম, অবাকও হয়েছিলাম অমন বীভৎসমুখো লোকটার বিশ্বসুন্দরীর মতো ওয়াক্স আর ম্যানিকিওর করা হাত দেখে। তবে তারপর যা ঘটল, তাতে আমার প্রায় হার্টফেলই হয়ে যাচ্ছিল। লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ‘হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে এইসব বলে একেবারে তেড়ে গালাগালি দিতে শুরু করল। জানি না স্যার, আমি ওর কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। সে মাল সোজা

তেড়েফুঁড়ে আমায় মারতে এল। বলল, 'তোকেও শালা জ্বালিয়ে মারব।' আমি আর অপেক্ষাই করিনি। দৌড়ে ওখান থকে বেরিয়ে এসেছিলাম। ঠিকমতো হুঁশই ছিল না কী করছি। যখন হুঁশ ফিরল, দেখলাম আপনারা সামনে..!"

"কোন্ ভাষায় কথা বলছিল? বাংলায়?"

অধিরাজের প্রশ্নে মাথা নাড়ল মদন, "না স্যার। হিন্দিতে। গালাগালিও হিন্দিতেই দিচ্ছিল।" এক মুহূর্ত থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, "স্যার... হিন্দিতে বলছিল ঠিকই। তবে ওর হিন্দিটা সাধারণ হিন্দি নয়।"

"মানে?"

সে একটু বুঝিয়ে বলে, "যেমন আমাদের এখানে বাংলার অনেকরকম টাইপ আছে, তেমন হিন্দিরও অনেক ভার্সান আছে। কলকাতার বাংলা একরকম, আবার ঘটিদের বাংলা আর বাঙালদের বাংলার মধ্যে একটু হলেও পার্থক্য আছে। মেদিনীপুরে গেলে একরকম বাংলা শুনবেন, আবার সুন্দরবনের টান অন্যরকম। তেমনই হিন্দি ভাষাটারও অনেকধরনের টাইপ পাওয়া যায়। বাঙালির হিন্দি আপনি বুঝতে পারবেন, উচ্চারণেই বোঝা যায়। মুম্বাইয়ের হিন্দি একটু রাফ। হায়দ্রাবাদ বা লখনৌয়ের হিন্দিতে আবার উর্দুর ইউজ বেশি। আর এতটাই নরম আর মিষ্টি যে খিস্তি দিলেও মনে হবে 'শের বা শায়েরি' বলছে। তেমনই আবার উত্তরপ্রদেশের হিন্দি অন্যরকম। অমিতাভ বচ্চনের সুদ্ধ ও সুন্দর হিন্দিটা এলাহাবাদের।"

"তাতে কী হয়েছে?"

"সেই লোক বা পিশাচ, যা-ই বলুন সে যে হিন্দি ভাষায় গালাগালি দিচ্ছিল, সেটা একেবারে খাঁটি দিল্লির হিন্দি। এমনকি স্ল্যাংগুলোও দিল্লির।"

"ইন্টারেস্টিং।" অধিরাজ একটু অন্যমনস্কভাবে প্যাকেট থেকে সিগারেটের স্টিক বের করতে-করতে বলল, "আরও একটু এক্সপ্লেইন কর। এমনিতে আমি তো তেমন কিছু বুঝলাম না। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা এসব তো মোটামুটি ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গোয়েজ। বাঙালিরাও বলে। এর মধ্যে দিল্লি কোথা থেকে এল!"

"দিল্লির লোকেরা কথায় কথায় স্ল্যাং বলে। তবে তারও টাইপ আছে। বিশেষ কিছু 'লব্জ' ওরা বলে থাকে। ঐ পিশাচ আমায় রাম গালাগালি দেওয়ার পর বলেছিল, 'তু সালা একনম্বর কা চোমু! আজ তেরা সারা ভসড় ইয়েহি খতম করতা হু।'"চোমু' আর 'ভসড়' শব্দটা একমাত্র দিল্লির লোক ছাড়া অন্য কোনো প্রদেশের লোক বলবেই না! আর এগুলোই ও একদম কোট-আনকোট বলেছিল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ও ভূত, পিশাচ বা মানুষ যা-ই হোক, দিল্লিরই মাল।"

"তুই জানলি কী করে যে এগুলো দিল্লিতে ইউজ হয়?" অধিরাজের মুখে সিগারেটটা গোঁজা হলেও সে এখনও আগুন ধরায়নি। বরং উলটে এবার কৌতূহলী ভঙ্গিতে স্টিকটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে হাতের দুই আঙুলের মধ্যে নিয়ে বলল, "গিয়েছিস কখনও দিল্লিতে?"

"নয়তো এতদিন গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম কোথায়?" মদন মাথা চুলকে বিষণ্ণ বদনে বলে, "লাহিড়ীসাহেব তো আমাকে খরচ করার বন্দোবস্ত প্রায় পাকাই করে ফেলেছিলেন! সে রাতের শ্যুট-আউটের পর আর কলকাতায় থাকার সাহসই ছিল না! জানতাম, লাহিড়ীসাহেব আমার অবস্থা সত্যিই বিকাশ দুবের মতোই করে ছাড়বেন। আমি ভয়ের চোটে ইউপি-তে চলে গিয়েছিলাম। প্রথমে প্রয়াগরাজ, তারপর দিল্লি। কিন্তু সেখানেও আপনারা পুলিশকে আমার 'থোবড়া' সমেত ডিটেলস পাঠিয়ে দিলেন। দু-বার প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচেছি। দিল্লি পুলিশ তো পুরো নেটওয়ার্কে আমার ছবি সার্কুলেট করেছিল। আপনাদের কল্যাণে দিল্লির লোকেরাও আমায় চিনেছে। কোথায় যাব বুঝতে না পেরে শেষে তিনদিনের জন্য কলকাতায় ফিরে এলাম। কিন্তু...!"

"হ্যাঁ, কলকাতাতেই তোর কবর খোঁড়া হত, যদি না তুই সেদিন ক্রাইম স্পটে গিয়ে পড়তি।"

মদন ফের হাতজোড় করে ফেলেছে, "বরং সেটাই ভালো হত! পিশাচটা যেভাবে তেড়ে

এসেছিল, তাতে ভাবতেই পারিনি যে বেঁচে ওখান থেকে বেরোতে পারব। ভেবেই পেলাম না, ওর আমার ওপর এত রাগ কেন! আমি ওর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি?”

“মই দিয়েছিস মানে? তোর তো শ্লা মইয়েরই ফ্যাক্টরি।” অধিরাজ ধমক দিয়ে ওঠে, “লজ্জা করে না বলতে? খুন, এক্সটর্শন, রেপ, কিছুই তো বাকি রাখিসনি! বাঁশের ঝাড় কেটে পাবলিকের পেছনে দিয়েছিস! শুধু পুলিশ কেন, তোকে টপকালে গোটা পশ্চিমবঙ্গই খুশি হবে।”

“পশ্চিমবঙ্গ খুশি হলে বুঝতে পারি।” সে মুখ কাঁচুমাচু করেছে, “কিন্তু মাইরি বলছি, দিল্লিতে আমি কিচ্ছু করিনি। ওখানে স্রেফ গা ঢাকা দিয়ে বসেছিলাম। কিন্তু তবু দিল্লি পুলিশ আমায় কুত্তার মতো দৌড় করিয়েছে।”

“বেশ করেছে। এবার আর একটু ব্রেনে জোর দে। আরও কিছু মনে করার চেষ্টা কর। এমন কিছু যা স্বাভাবিক নয়। কিংবা তোর খটকা লেগেছে এমন কোনো ঘটনা?” মদনের চোখ সরু হয়ে যায়। সে কিছু ভাবার চেষ্টা করছে। হয়তো ফের প্রত্যেকটা মুহূর্ত মস্তিষ্কের মধ্যে ফিরিয়ে এনে খুঁজছে, কোনো কিছু অস্বাভাবিক সেখানে ছিল কিনা! এক দেড় মিনিট ভাবার পরেই তার চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে, “হ্যাঁ। আর একটা জিনিস মনে পড়েছে। তবে সেটার কোনো গুরুত্ব আছে কিনা জানি না।”

“কীরকম?”

“ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে একদম প্রথমে আমি অন্য একটা গন্ধও খুব হালকাভাবে পেয়েছিলাম। পরে আর সেটা পাইনি।”

“কী ধরনের গন্ধ?”

মদন কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, “সেটা আপনাদের মতো শহুরে মানুষকে বোঝানো বহুত মুশকিল। গ্রামের মাঠে যারা খেলা করে, বা চাষবাস করে, সেখানেই এরকম গন্ধ পাওয়া যায়। আমার জন্ম প্রত্যন্ত গ্রামে। বাপ গরীব চাষি ছিল। তাই মাঠেঘাটে খেলে, গড়াগড়ি খেয়ে বেড়াতাম। এ গন্ধটার সঙ্গে আমার আজন্মের পরিচয়। আপনারা কখনও কোনো মেঠো গন্ধ, বা তাজা খড় কেটে নিলে যে বাসটা পাওয়া যায়, সেটা শুঁকে দেখেছেন?”

অধিরাজ এবার একটু রেগেই গেল, “আমাদের কি কুকুর পেয়েছিস যে ঘাস-পাতা, মাঠ, খড়, সব শুঁকে বেড়াব? তাছাড়া এখানে মাঠই বা কোথায়, খড়ই বা কই?”

‘সেজন্যই তো বলছি। গন্ধটা বোঝানো খুব মুশকিল।” সে ফের বিষণ্ণ হয়ে বলল, “আমি আপনাকে ঠিকভাবে বোঝাতে পারব না। কিন্তু স্মেলটা অবিকল নতুন কাটা খড়ের গন্ধের মতো ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, এইমাত্র বুঝি কেউ খড় কুচিয়েছে, বা কেটেছে। কিন্তু পরে আর সেটা পাইনি।”

অধিরাজের গোল্ডেন ব্রাউন চোখের তারায় এবার যেন একটু দ্বন্দ্ব দেখা দিল, “তুই শিওর?”

“হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার!” মদন আত্মবিশ্বাসী, “ঐ গন্ধ জীবনে আমি ভুলব না। চোখ বন্ধ করেও ঠিক চিনে ফেলব। ঐ মেঠো গন্ধ আমার মা-বাবা দু-জনের গায়ে অষ্টপ্রহর লেগে থাকত। আমি যখন মাঠে গড়াগড়ি দিতাম, তখনও পেতাম। একদম ঐ বাসটাই আমার নাকে ভক্ করে প্রথমে লেগেছিল। যদি আমি একটুও ভুল বলি, তবে ঐ আপনার বুলেট, আর এই রইল আমার মাথা!”

মদনের আত্মবিশ্বাস দেখে দুই অফিসারই ঘাবড়ে গেল। যদিও আগুনকে আরও বেশি লেলিহান করে তোলার জন্য অনেকসময় খড় ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ক্রাইমসিনে তো কোথাও খড়ের ট্রেসও পাওয়া যায়নি! লাশগুলোর গায়ে স্রেফ জ্বলন্ত টায়ার আর কেরোসিন তেল পাওয়া গিয়েছিল। আচমকা এর মধ্যে খড় কোথা থেকে এসে পড়ল। অর্ণব তো জানতই না যে খড়ের আদৌ কোনো গন্ধ থাকে! অধিরাজের অবস্থা আরও তথৈবচ। সে বিড়বিড় করে বলে, “এই খড়ের ধাঁধাটা আবার কী? ক্রাইমসিনে খড়-ঘাস কিছুই তো ছিল না! তবে...!”

অর্ণব বুঝল যে মদনের স্টেটমেন্ট গোটা ব্যাপারটাকে আরও ঘোরালো করে তুলেছে। সে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে মদনকে টেনে তোলে, "ঠিক আছে। আপাতত চল। পরে দেখছি তোর কী ব্যবস্থা করা যায়।"

"যাই করুন স্যার।" সে ফের অধিরাজের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়, "আমায় ঐ পিশাচটার থেকে দূরে রাখুন... ও আমায় মেরে ফেলবে!"

তাকে এগিয়ে আসতে দেখেই অধিরাজ দ্রুত এক পা পিছিয়ে গেল, "আপাতত তুই আমার থেকে দূরে থাক। নয়তো পিশাচ তো তোকে পরে মারবে, আমিই তোকে আগে খুন করব... লুচ্চা, লম্পট কোথাকার।"

মদন অধিরাজের এ জাতীয় প্রতিক্রিয়ার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝল না। তবে সে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। অর্ণব তাকে যথাস্থানে রেখে ফিরে এসে দেখে অধিরাজের হাতের সিগারেটটায় তখনও অগ্নিসংযোগ হয়নি। সে লম্বা স্টিকটাকে অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করছে। একবার মুখে গুঁজছে, আবার পরক্ষণেই কী ভেবে যেন হাতে নিয়ে নিচ্ছে। সে আলতো স্বরে ডাকল, "স্যার?"

অধিরাজের চোখের ঘন পাতা সামান্য থিরথির করে কাঁপল। উজ্জ্বল বাদামি অর্ধনিমীলিত চোখে সোনালি রোদ খেলা করছে। দৃষ্টি এখনও অন্যমনস্ক, "একজন প্রতিভাবান ক্রিমিনালের দৃষ্টি আর তুখোড় গোয়েন্দার নজরের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই অর্ণব। গোয়েন্দা বা পুলিশ যেভাবে ক্রাইম সিন খুঁটিয়ে দেখে, একজন ধুরন্ধর অপরাধীও অবিকল তাই করে। পার্থক্য একটাই। পুলিশ ক্লু খোঁজে আর ক্রিমিনাল দেখে নেয়, তার নিজের জন্য কোনো বিপদ ওঁত পেতে আছে কিনা। তাই নিজেদের প্রাণের দায়েই ছোটো ছোটো ডিটেইলসও ওরা মিস্ করে না। এক্ষেত্রে মদনের স্টেটমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওর ফাঁড়াটা শুধু এই স্টেটমেন্টের জন্যই কেটে গেল।"

"কিন্তু স্যার.....।" অর্ণব একটু অবাক হয়েই বলে, "আমি তো আরও বেশি কনফিউজ হয়ে গেলাম! বার্নিং শিখের হাত মেয়েদের মতো গ্ল্যামারাস। লোকটা সত্যিই পুরুষ তো?"

"জেনেটিক্যালি পুরুষই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।" এতক্ষণে অধিরাজ সিগারেটটা ধরিয়েছে, "কিন্তু এখন কিছু বলা মুশকিল। আজকাল মেডিক্যাল সায়েন্সের দৌলতে ছেলেরা যে হারে মেয়ে হচ্ছে, আর মেয়েরা ছেলে, তাতে ওর শরীরটা ট্রান্সফর্মড হলেও হতে পারে। মদন রীতিমতো নারীপ্রেমী। কত মেয়ের হাত ধরে লীলাখেলা করেছে তা বোধহয় নিজেও গুণে রাখেনি। ওর অভিজ্ঞতা মিথ্যে বলবে না। ও যদি বলে থাকে লোকটার হাত মেয়েদের মতো মসৃণ আর গ্ল্যামারাস ছিল, তবে তা-ই ছিল। কিন্তু শরীরে যা-ই হোক, আসলে ও পুরুষই। এতখানি গ্রুসাম খুন, লোককে ধরে ধরে কচুকাটা করা, একজন নারীর পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।"

"বার্নিং শিখ ওকে তেড়ে কেন গিয়েছিল, সেটা অবশ্য বুঝেছি।" সে বলল, "প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কোনো ক্রিমিনালই রাখতে চায় না। আমরা যদি না থাকতাম, তবে নির্ঘাৎ মদনও পুড়ে মরত, বা কয়েক পিসে ছড়িয়ে থাকত।"

"হ্যাঁ। ওর খুন হওয়ার চান্স প্রবল ছিল। আরও একটা ভাইটাল পয়েন্ট, লোকটা দিল্লি স্পেশ্যাল হিন্দিতে কথা বলছিল। এই অঞ্চলের সঙ্গে ভাষার হেরফেরের ব্যাপারটা আমিও জানতাম। তবে মদন অনেক বেশি স্পেসিফিকালি বলল। ওর এই ডিডাকশনটাও মিথ্যে নয়। প্রতিভাবান বদমায়েশ হওয়ার এটাই সুবিধা। তারা অনেক বেশি খবর রাখে ও জানে। ভাষাটা যদি দিল্লির হয়, তবে লোকটাও দিল্লিরই।" অধিরাজের মুখে চিন্তার ছাপ, "মদনের বয়ানটা একদম নিখুঁত। এমনকি যে স্মেলের কথা বলেছে, সেটাও। কিন্তু এখন সেটাই খুব বড়ো হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মদনের পরই তুমি আর আমি ক্রাইমসিনে ঢুকেছিলাম। আমরা দু-জনেই স্বচক্ষে দেখেছি সেখানে কোনো খড়-বিচালি অথবা কুশপুত্তলিকা জাতীয় কিছুই ছিল না! শুধু সেখানেই নয়, দিল্লি, কানপুর, বেঙ্গালুরুর কোনো ক্রাইমসিনেই ঘাস, খড়, পাতা, কোনও কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। সবক-টা মার্ডার শহরাঞ্চলে ঘটেছে, আশেপাশে

মাঠও ছিল না। জ্যোতিপ্রকাশ ত্রিপাঠীর বাড়ির সামনে অবশ্য অনেকটা ফাঁকা জায়গা ছিল, কিন্তু সেটাকে মাঠ ঠিক বলা যায় না। তবে মদনা যে স্মেলটার কথা বলছে, সেটা এল কোথা থেকে!”

“বার্নিং শিখ লোকগুলোকে পোড়াতে ইউজ করেনি তো?” অর্ণব একটু ভেবে বলে, “খড় কিন্তু জ্বালানি হিসাবে মারাত্মক।”

“হ্যাঁ। কিন্তু যেখানে হাতের কাছে কুড়ি লিটার কেরোসিন মজুত আছে, টায়ারও ইউজ হচ্ছে সেখানে কেউ খড়-বিচালি ইউজ করবে কেন? কোনো লজিক নেই!” সে মাথা নাড়ল, “অত সহজ ব্যাপার মোটেই নয়। তবে ‘স্মেল’ শব্দটা আমায় সত্যিই ভাবাচ্ছে!”

“স্মেল?”

“ইয়েস অর্ণব।” অধিরাজ ধোঁয়ার রিং বানাতে বানাতে আস্তে আস্তে বলে, “ডক বারবার জানতে চাইছিলেন, ক্রাইম স্পটে আমরা কোনো সন্দেহজনক স্মেল পেয়েছিলাম কিনা। লাইক ক্লোরিন বা ব্লিচিং পাউডার, কিংবা অন্য কিছু। যথারীতি আমি ‘না’-ই বলে বসে আছি, কারণ সত্যিই আমরা তেমন কোনো গন্ধ পাইনি। যদি পেতামও তবু তুমি বা আমি গন্ধটাকে আইডেন্টিফাই করতেই পারতাম না! তুমি কখনও দেখেছ কিনা জানি না, আমি খড় তেমন দেখিইনি, গন্ধ তো দূর। কিন্তু মদন হালকা হলেও একটা স্মেল পেয়েছিল, এবং ও সেটাকে শনাক্তও করেছে। তোমার মনে হয় না, এটা আমাদের এই মুহূর্তেই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের জানানো উচিত?”

“কিন্তু একটা গ্যাংস্টারের ছোট্ট একটা কথার ওপর বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? ওর তো ভুলও হতে পারে।”

“হ্যাঁ। তার সম্ভাবনা আছে।” তার গভীর দৃষ্টি কিছু যেন খুঁজছে, “তবু একটা চান্স নিয়েই দেখি। কারণ এখন আটচল্লিশ ঘণ্টারও কম সময় হাতে আছে। ঠিক হোক কী ভুল, প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো ডিটেলিং আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের হাতে সময় নেই ঠিকই, ফরেনসিকের হাতে আরও সময় নেই! একটা বডিকে ডিটেইলস পোস্ট-মর্টেম করতেই কমসে কম চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগে। আমাদের টাক-বাবু অনেক দ্রুত কাজ করেন বলে অনেক কম সময়েই কাজ সেরে ফেলেন। কিন্তু যেখানে একের পর এক লাশ ঢুকেই যাচ্ছে এবং মেইন মার্ডার ওয়েপনই অজানা সেক্ষেত্রে তিনজন বিশারদের অবস্থা একবার ভেবে দেখো। প্রত্যেকটা লাশের টপ টু বটম একটার পর একটা টেস্ট চালিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা। প্রত্যেকে যদি সুপারম্যানের মতো দ্রুতবেগেও কাজ করেন, তবুও আটচল্লিশ ঘণ্টা এনাফ নয়।” বলতে বলতেই সে অর্ণবের দিকে তাকায়, “ভিডিও কলে ধরো তো ডঃ চ্যাটার্জিকে। উনিই বারবার স্মেলের কথা জানতে চাইছিলেন। ওঁকে বলে দেখি।”

অর্ণব সামান্য নড করে ডঃ চ্যাটার্জিকে ভিডিও কল করল। প্রথমবার উনি ফোনটা ধরলেনই না। সে নাছোড়বান্দার মতো আবারও ট্রাই করে। এবার কাজ হল। ওপ্রান্তের দৃশ্য মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠল ঠিকই, কিন্তু যা উঠল সেটা দেখে দুই অফিসারই প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল। স্বাভাবিকভাবেই ডঃ চ্যাটার্জির ভয়াবহ মুখ দেখতে পাওয়ার কথা। অথচ স্ক্রিনে একটা চকচকে পদার্থ! সেটা যে কী ভগবানই জানেন। অধিরাজ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “ডক, এটা কী! ফরেনসিক ল্যাবে কি অ্যালিয়েন আক্রমণ হয়েছে? এত অবিকল ইউ এফ ও'র মতো কী যেন একটা!”

ওপ্রান্ত থেকে ডঃ চ্যাটার্জির গজগজানি ভেসে এল, “তোমরা যা শুরু করেছ তাতে অ্যালিয়েনের বাবাও এখানে আসবে না! ছ-টা লাশ কি কম পড়েছিল যে আরও দুটো পাঠিয়ে দিয়েছ? একে খিদের চোটে নাড়িভুঁড়ি কীর্তন করছে, তার মধ্যে গোটা পলাশীর প্রান্তরই তুলে পাঠিয়েছ। একজনের যা অবস্থা, তাতে গোটা বডি সাইজে আনার জন্য বাবা মোস্তাফার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় দেখছি না! এ তো পুরো স্লাইস! এত বছরের কেরিয়ারে এই প্রথম ফরেনসিক টিম ডেডবডি কাটাছেঁড়া করছে না, উলটে জোড়া লাগাচ্ছে। হরি হরি!”

“চিন্তা করছেন কেন?” সে শান্তস্বরে বলল, “বাবা মোস্তাফা না থাকলেও বেবি মোস্তাফি

আপনার ল্যাবেই আছেন। মিস সেলাই এক্সপার্ট। তাঁকেই ধরুন না!” “তিনিই ইসমাইলকে সাইজ করার চেষ্টা করছেন।”

তিনি জানালেন। তবে এবার স্ক্রিনে ইউ-এফ-ওর জায়গায় চাঁদ ভেসে উঠেছে দেখে অধিরাজ কপাল চাপড়ে বলল, “হে ঈশ্বর। ডক, আপনি ফোনটাকে টাকের ওপরে ধরেছেন কোন আক্কেলে? তাই ভাবছি, আপনার চাঁদমুখের বদলে চাঁদমারি ভাসছে কেন!”

“টাক!” ডঃ চ্যাটার্জির ভয়ার্ত স্বর ভেসে এল, “তোমরা ফোনের মধ্য দিয়ে আমার টাক দেখছ কী করে!”

“দেখতে পাচ্ছি কারণ এটা ভিডিও কল।”

ভদ্রলোক প্রায় অসহায়ের মতো ডাকলেন, “আহেলি, ব্রকোলি, লিটল হেল্প প্লিজ!” দুই অ্যাসিস্ট্যান্টের মধ্যে কেউ এল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু এক মিনিট দশ সেকেন্ড পর মোবাইলটা একটু নড়ল। এখন ইউ-এফ-ও বা গ্রহ-উপগ্রহ নেই ঠিকই, কিন্তু দু-খানা বড়ো বড়ো গুহা দেখা যাচ্ছে। মোবাইল মহাকাশ থেকে নামলেও কোনো পর্বতে-কন্দরে আটকে গিয়েছে। বেচারি অধিরাজের কপালে হাত, “টাকের বদলে এখন নাক! ইনফ্যাক্ট নাকও নয়, নাকের ফুটো। মোবাইলটাকে মুখে না লাগিয়ে একটু দূরে রাখুন। নয়তো আমরা দু-জনেই আপনার নাকের গর্তে সেঁধিয়ে যাচ্ছি।”

“এইসব পেজোমি বন্ধ করো!” ডঃ চ্যাটার্জির বিরক্তিমাখা স্বর শোনা গেল, “এই যে, মিস্ ব্রকোলি। ক্যামেরাটা তাক করার জন্য আপনি আমার নাকটাকেই পেয়েছিলেন?” “স্যরি... এক্সট্রিমলি স্যরি স্যার....!” আইভি'র নার্ভাস কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, “আমি বুঝতে পারিনি...!”

এবার ক্যামেরা যথাস্থানে এল। ডঃ চ্যাটার্জির খানদানি বদন দেখা যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অধিরাজ, “যাক, পজিশনে এসেছে। ওদিককার খবর কী?”

“ইসমাইলের ব্লাডে কড়া সেডেটিভের ট্রেস আছে। রকিরও তাই। মানে সেই পুরোনো মেথড আর কী।” ভদ্রলোক বললেন, “রকিকে অজ্ঞান অবস্থাতেই কেরোসিন ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। ওর মৃত্যুতে আর কিছু ইউজ হয়নি। তবে ইসমাইলের পেটে অ্যালকোহলও পাওয়া গিয়েছে। ও পাবলিক ড্রিঙ্ক করছিল। দেশি মাল। তবে ড্রিঙ্কের মধ্যে সেডেটিভ ছিল না। কীসে ছিল এখনও বুঝতে পারিনি। বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার পর অ্যাজ ইউজুয়াল প্রথমে গলা ধড় থেকে নামিয়ে দিয়েছে, তারপর বাকিটা। যেভাবে দিল্লিতে সিকিউরিটি গার্ডদের মারা হয়েছিল, সেম স্টাইল। বাট রাজা, দুটো মৃত্যুই খুব বেশিক্ষণ আগে হয়নি। রকির খুন হয়েছে সাড়ে তিনটে নাগাদ। আর ইসমাইলের মার্ডারটা হয়েছে আন্দাজ চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। তার আগেই ও বাদাম আর ডালমুট খেয়েছিল যেগুলো হজম হয়নি। ইনফ্যাক্ট ওর পাকস্থলীতেও কিছুটা আনডাইজেস্ট অ্যালকোহল এখনও রয়েছে। তবে এতটাও নয় যে নেশায় বেহুঁশ হবে। সম্ভবত অজ্ঞান হওয়ার কারণ চড়া মাত্রার সেডেটিভই।”

“কিউরি-অ-সা-র অ্যান্ড কিউরি-অ-সা-র।” অধিরাজের মুখে চিন্তার মেঘ, “বাদাম বা ডালমুট মদের সঙ্গেই লোকে স্ন্যাকস হিসাবে খায়। হজম যখন হয়নি, তার মানে মদ খাওয়ার পরপরই ও মারা গিয়েছিল। তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় ও বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার পর খুনি আর অপেক্ষাই করেনি। তৎক্ষণাৎ মেরেছে।”

“হ্যাঁ। এতে আশ্চর্যের কী আছে?”

“আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সময়টা। চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে ডেথ হলে মদ ও ঠিক ঐ সময়েই খেয়েছিল। যেহেতু স্টমাকের মধ্যেও অ্যালকোহল আছে, তার মানে মৃত্যুর আগেও সে মদ্যপান করছিল। মানে, চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যেই হয়তো মদের লাস্ট পেগটা খেয়েছে। এখানে আপনার খটকা লাগছে না?”

“খটকার কী আছে?” তিনি গজগজ করেন, “মাতালদের মদ খাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো টাইমিং নেই। ওদের কাছে সকাল, দুপুর, রাত, সবসময়ই অ্যালকোহল আওয়ার।”

“অন্যান্য মাতালদের না-ই থাকতে পারে। কিন্তু ইসমাইলের ব্যাপার আলাদা। ও ড্রিঙ্ক করে সেটা আমি কেন, অফিসের সবাই জানে। কোন দেশি মদের ঠেকে বসে মাল টানে

তাও বলতে পারি। ওর বাড়ির কাছেই 'জন্নত' নামের একটা দেশি মদের ঠেক আছে। সেখানেই ও রাতের বেলা খুব পরিমিত নেশা করে। আপনি যে ওর পেটে প্রচুর অ্যালকোহল পাননি সেটাই স্বাভাবিক৷ প্রণবেশদা ওখানেই ওর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিট করেন। ইসমাইল এতটা ওভারলোডেড কখনোই হয় না যে বেহুঁশ হয়ে যাবে। সতর্ক মদ্যপায়ী। তার ওপর জন্নত রাত এগারোটার পর বন্ধ হয়ে যায়। তবে ও মদটা কোথায় বসে খাচ্ছিল? তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে ওখান থেকে বোতল নিয়ে অন্যত্র বসে খাচ্ছিল, সেক্ষেত্রেও ঐ ভোরের সময়টায় ও মদ খাবেই না।"

"কেন খাবে না শুনি?" ডঃ চ্যাটার্জি ভুরু কুঁচকেছেন, "ইন্ডিয়ান পিনাল কোডে লেখা আছে বুঝি?"

"আই পি সি সেকশনে লেখা না থাকলেও এটা অলমোস্ট অলিখিত নিয়ম। ইসমাইল জাতে মুসলিম। আর ভোরের বা ফজরের আজানের টাইমিং ঠিক ঐ সময়ের আশেপাশেই। সাড়ে চারটে টু পৌনে পাঁচটার মধ্যেই ভ্যারি করে। শুধু ইসমাইল কেন, অতি বড়ো বজ্জাত, মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল ইসলামধর্মীও ঐ টাইমিং-এ কিছুতেই মদ স্পর্শ করবে না! তবে ইসমাইলের পেটে অ্যালকোহল কেন?"

এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ডঃ চ্যাটার্জি। বিভ্রান্ত স্বরে বললেন, "তাই তো এটা তো ভাবিনি! যতই মদ্যপ বা লম্পট হোক, কোনো মুসলিম ভোরের আজানের ঠিক আগেই মদ খায় না। ইন ফ্যাক্ট, মদ্যপান ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী 'হারাম'। কিন্তু তারপরও অনেকেই সুরার সেবন করে। তবে আজান বা নামাজ পড়ার আগে কেউ মাল টেনে বসে আছে তা অন্তত আমি কখনও শুনিনি। তবে? কেসটা কী হল?"

"কেসটা গড়বড় ডক।" অধিরাজের চোখ যেন জ্বলছে, "ওর দেহ তো কয়েক টুকরোয় পাওয়া গেছে। পাকস্থলীটা পুরোপুরি আস্ত ছিল? পেটটা কি আস্ত রয়েছে?"

"অলমোস্ট।" তিনি ইতিবাচক মাথা নাড়লেন, "বুক আর পেটের দুটো টুকরো হয়েছে। তবে ভেতরের অর্গ্যানগুলো আস্তই আছে। হার্ট, লাংস, স্টম্যাক, কিডনি, সবই এক পিসেই রয়েছে। সবচেয়ে বেশি টুকরো হয়েছে হাত আর পা। আহেলি সেগুলোকে নিয়ে লড়ে যাচ্ছে। গোটা দেহটা রি-কনস্ট্রাক্ট করতে পারলে হয়তো আরও কিছু বলতে পারব।"

"মিস্ মুখার্জি গোটা বডিটাকে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেটা ভালো সংবাদ।" অর্ণব লক্ষ্য করল অধিরাজের কণ্ঠস্বরে প্রবল সংশয়, "কিন্তু আমার মনে হয় না তিনি সেটা পেরে উঠবেন!

"রাজা!" ডঃ চ্যাটার্জি ধমক দিলেন, "তুমি পার্সোনালি মিস্ মুখার্জিকে অ্যাংরি বার্ড, বাবা মোস্তাফা, যা খুশি বলো। কিন্তু মেয়েটার যোগ্যতার ওপর সন্দেহ করতে পারো না। শি ইজ আ ভেরি গুড ফরেনসিক এক্সপার্ট।"

"ডক, আমি মিস্ মুখার্জির যোগ্যতা নিয়ে আদৌ সন্দেহ প্রকাশ করছি না!" তার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ, "ইনফ্যাক্ট ওঁর সেলাই করার দক্ষতা তো প্রশ্নাতীত। কিন্তু উনি পুরো বডিটা তখনই জোড়া লাগাতে পারবেন, যখন বডি পার্টসগুলো একটাই মানুষের হবে।" "কী!"

ফরেনসিক বিশারদ যেন কয়েকমুহূর্তের জন্য প্রস্তরীভূত হলেন। একটা শব্দও তাঁর মুখ থেকে বেরোচ্ছে না। কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, "তুমি বলতে চাও, এটা একটা বডি নয়? একাধিক লাশ?"

, "ইয়েস ডক।" তার কণ্ঠস্বরেও চাপা আতঙ্ক, "যদি আমি ভুল করে না থাকি, তবে অন্তত পেটসহ স্টমাকের পোর্শনটা ইসমাইলের নয়। ওটা অন্য কারোর। আমরা ভাবছি দুটো খুন হয়েছে। আসলে দুটো নয়, তিনটে খুন হয়েছে। তারও বেশি হতে পারে...।"

"স্যা-র!"

অধিরাজ আরও কিছু বলার আগেই স্ক্রিনে ভেসে উঠল উত্তেজিত আহেলি মুখার্জির চেহারা। প্রায় ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হয়েছে সে। তার মুখের অবস্থা দেখলেই বোঝা যায় যে মেয়েটি ঠিক কী পরিমাণ বিচলিত। হাতের গ্লাভস খুলতে খুলতে সে ডঃ চ্যাটার্জিকে

বলল, "ও বডিকে জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। ওটা একজনের লাশ নয়, একাধিক লোকের লাশের পিস।"

"হোয়াট!" ডঃ চ্যাটার্জি তার দিকে তাকিয়েছেন, "তুমি শিওর?"

"ড্যাম শিওর।" সে বিচলিত স্বরে জানায়, "ইসমাইলের বুকের সঙ্গে পেটের সাইজের কোনো মিলই নেই। ওর ছাতির সাইজ অনুযায়ী পেট আর কোমর যতখানি চওড়া হওয়ার কথা, এই পেটের টুকরোটা তার থেকে অনেক কম। ইসমাইল যদি অফিসার ব্যানার্জির মতো গ্রীক গড মার্কা পারফেক্ট ভি শেপড় কোমরও রাখে, তাও ওর কাঁধ, বুকের অনুপাতে বডি স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী কোমর আরও কয়েক ইঞ্চি চওড়া হবে। কিন্তু এই কোমরের সাইজটা অলমোস্ট জিরো ফিগারের নায়িকাদের কোমরের চেয়েও বেশি পাতলা। হিউম্যান অ্যানাটমি আর ফিজিওলজি অনুসারে ইসমাইলের হওয়া অসম্ভব। বুকের সঙ্গে যাচ্ছেই না!"

আহেলি মুখার্জি খেয়াল করেনি যে দুই অফিসারই ভিডিও কলে আছে ও সবই তারা দেখতে বা শুনতে পাচ্ছে। 'গ্রীক গড মার্কা পারফেক্ট ভি শেপড কোমর' শুনে অর্ণব জুলজুল করে অধিরাজের দিকে তাকাল। অধিরাজ অবশ্য কথাটা শুনতে পেলেও অগ্রাহ্য করল। সে গম্ভীর স্বরে বলে, "আর কিছু গোলমাল মিস্ মুখার্জি?"

এতক্ষণে আহেলি ব্যাপারটা খেয়াল করল। কয়েক মুহূর্তের জন্য অপ্রস্তুতও হয়েছে। তার মুখে লজ্জার একটা রক্তিমাভা দেখা দিলেও সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, "হ্যাঁ। দুটো হাতের মধ্যেও কোনো মিল নেই। একটা হাত মোটা আর বেঁটে, অন্যটা রোগা আর লম্বা। একটা লোকের দুটো হাতের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। ইভেন কাঁধের সঙ্গে লেফট হ্যান্ডটা ফিটই হচ্ছে না! পায়েও গোলমাল। দুটো পায়ের মধ্যে একটা ইসমাইলের। অন্যটা কার তা আমার জানা নেই।"

"মাই গড়!" ডঃ চ্যাটার্জি বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সব শুনছিলেন। এবার বললেন, "তোমার ডিডাকশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট রাজা! আদতে তবে ক-টা লোকের বডি পার্টস আছে ওখানে?"

অধিরাজ কিছু বলার আগেই আহেলি বলে উঠল, "মোস্ট প্রব্যাবলি দু-জন। শিওরলি বলা মুশকিল, কারণ ডিটারমিন করার জন্য ডি.এন.এ. টেস্ট করতে হবে। তবে পেট, লেফট হ্যান্ড আর রাইট লেগের মালিক সম্ভবত একজনই। কারণ এই তিনটে পার্টের মালিকই অসম্ভব রোগা, ব্লাড স্যাম্পলে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অত্যন্ত কম, মাত্র সিক্স পয়েন্ট নাইন। ইসমাইলের বয়েস আন্দাজ পঞ্চান্ন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির বয়েস কোনোমতেই চল্লিশের বেশি নয়। ইসমাইলের হাতের নখে এক চিলতে পানের আঁশ, চুনের দাগ পেয়েছি। আবার এই আননোন ব্যক্তিটির হাতে কাঁচা ডিম আর পিঁয়াজের তীব্র গন্ধ আছে। সোজা কথায় খুন হওয়ার আগে সে রান্না করছিল বা রান্নার প্রিপারেশন নিচ্ছিল। লেফট হ্যান্ডের পামে এখনও গুঁড়ো তামাক এবং নিকোটিনের ট্রেস আছে। সে খৈনি খেয়েছিল। তারপর যখন মদের বোতল নিয়ে বসেছিল তখনও হাত ঠিকমতো ক্লিন করেনি। যদি লোকটা চারটে নাগাদ বোতল নিয়ে বসে থাকে, তবে তার আগেই সে রান্না করে এসেছিল বা রান্নার সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস রেডি করেছিল। আর আলো ফোটার আগে যারা রান্না সেরে নেয়, তারা সাধারণ মানুষ বলে আমার মনে হয় না। ইভেন প্রোফেশনাল কুকরাও এত তাড়াতাড়ি ডিউটিতে যায় না। অবশ্য হসপিটালের কুক হলে অন্য কথা। সেক্ষেত্রে হাতের হাইজিনও তার বজায় রাখার কথা, এক্ষেত্রে তা ছিল না!"

আহেলির বক্তব্য শুনে ফিজিক্যালি ও ভার্চুয়ালি উপস্থিত সকলেরই মুখে বিস্ময়মিশ্রিত বিহ্বলতা। ডঃ চ্যাটার্জি কোনোমতে বললেন, "এর মানে কী! দুটো লোকের বডি টুকরো টুকরো একসঙ্গে মিশিয়ে খোদ পুলিশকেই প্রেজেন্ট করার অর্থ কী! পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে চায়?"

"না ডক!" অধিরাজের চোখ যেন জ্বলছে, "ইনি রীতিমতো জিনিয়াস মার্ডারার। সে জানত যে পুলিশ আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ ফারাক বুঝবে না, এবং যেহেতু মাথাটা ইসমাইলের, সেহেতু

ওটা ইসমাইলের বডি হিসাবেই ধরে নেবে। কিন্তু তার সঙ্গে সে এটাও জানে যে এই গোঁজামিল দেওয়া লাশটা যে একজনের নয় তা ফরেনসিক এক্সপার্টরা খুব সহজেই ধরে ফেলবেন, যেমন মিস মুখার্জি বুঝেছেন। পুলিশকে এভাবে বোকা বানানো সম্ভব। কিন্তু ফরেনসিক এক্সপার্টদের নয়!”

“তাহলে খামোখা একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের লাশ ঢুকিয়ে দেওয়ার মানে কী!” তিনি মাথা নাড়ছেন, “দুটো খুন অলরেডি করেছে। তিননম্বরটা করলেও পুলিশ তার থেকে বেশি শকড হবে না। একটা অপরিচিত ব্যক্তির লাশ নিয়ে ফরেনসিক বা কী করবে?”

“অপরিচিত ব্যক্তির লাশ নিয়ে কিছু করার নেই।” তার কণ্ঠস্বর আশঙ্কিত, “কিন্তু লাশটা যদি অপরিচিত ব্যক্তির না হয়?”

ফোনের ওপ্রান্ত থেকে তিন ফরেনসিক এক্সপার্টের বিস্মিত কণ্ঠ একসঙ্গে ভেসে এল, “মানে?”

“বার্নিং শিখ আজ পর্যন্ত কোনো খুন বিনা কারণে করেনি। সে যাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়, তাদের অ্যাটাক করে। যারা তার শত্রুকে নিরাপত্তা দেয়, তাদেরও খুন করে। এমনকি এবার সে খবরিদেরও ছাড়েনি। সোজা কথায়, ইনভেস্টিগেশনে যারা কোনো না কোনোভাবে যুক্ত বা তার মিশনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদেরই রাস্তা থেকে সরাচ্ছে। তার জন্য সে প্যাটার্নও ভাঙছে, বিলো দ্য বেল্ট হিটও করছে। সে সি.আই.ডি. হোমিসাইডকে আতঙ্কে রাখার জন্য, রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সব করবে, কিন্তু যার এ সবের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, পথচলতি কোনো পথিককে র‍্যান্ডম কচুকাটা করবে না। তাতে কোনো লাভ নেই। শহরে বড়োজোর আতঙ্ক ছড়াতে পারে, তার বেশি কারোর কিছু হবে না। টোট্যালি মিনিংলেস। এরকম অর্থহীন কাজ বার্নিং শিখ খামোখা করতেই বা যাবে কেন!” অধিরাজ নীচু স্বরে বলে, “আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, তৃতীয়জন আমাদের একেবারেই অপরিচিত নয়। ইনফর্মারদের মৃতদেহ সে পুলিশকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। তার সঙ্গে আরও একটা জোরদার ধাক্কা দিয়েছে যেটা পুলিশ বা আমাদের জন্য নয়।”

“যাচ্চলে! তবে কার জন্য?”

অধিরাজের মুখ বিষাদে অচ্ছাভ। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, “এই ট্যুইস্টটা আপনাদের জন্য স্যার। সে জানত যে পুলিশ গোটাটা ইসমাইলের বডি ভেবে সোজা ফরেনসিক ল্যাবেই পাঠাবে। আর এটাই লোকটা চেয়েছিল। সে শুধু দেহাংশই পাঠায়নি, গোটা ফরেনসিক টিমকেই মেসেজ পাঠিয়েছে।”

“আমি স্টিল কনফিউজড!” ডঃ চ্যাটার্জি বিহ্বল, “কী বলতে চাইছ তুমি?”

সে আরও কয়েক মুহূর্ত থেমে থাকল। যেন ভেতরে ভেতরে শক্তিসঞ্চয় করে নিল।

তারপর বলল, “মিস্ মুখার্জি আর মিস ভট্টাচার্যের বাড়ির সবাই ঠিক আছেন তো?” কথাটা শোনামাত্রই যেন ল্যাবে বিস্ফোরণ হল। আহেলি আঁতকে উঠেছে, “কী বলছেন আপনি। এই জাস্ট দু-মিনিট আগে আমি মা-বাবার সঙ্গে কথা বলেছি।”

“ওকে ফাইন। ডোন্ট ওরি। মিস্ ভট্টাচার্য?”

আইভির মুখ ফ্যাকাশে। সে ভীষণ ত্রাসে বলল, “বাড়িতে এখনও ফোন করিনি। বাট আমার বাবা-মা, ঠাম্মি-দাদাই, কাকু-কাকিমা, ওরা কেউ আর্লি রাইজার নন বা আর্লি ব্রেকফাস্ট করেন না। দশটার আগে ওঁদের ঘুমই ভাঙে না। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলির সবাই অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য। ডিম বা মদ খাওয়া তো দূর, স্পর্শই করেন না! আমি নিজেও ভেজ খাই।”

ব্রকোলির রহস্য কিছুটা হলেও বোঝা গেল। কিন্তু অধিরাজ এবার মর্মান্তিক দৃষ্টিতে ডঃ চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি সেটা লক্ষ্য করেই ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠলেন, “তুমি আমার দিকে ওভাবে তাকাচ্ছ কেন রাজা? আমি একা মানুষ। থাকার মধ্যে আছে এক ভাই আর ভাইপো। কিন্তু অসিত কয়েকদিন আগেই ইউ.এস.এ. তে একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেছে। কুক্কুও ওর বাবার সঙ্গেই আমেরিকা ঘুরছে। ওরা কেউ হতেই পারে না!”

“ঈশ্বরের অশেষ কৃপা যে তৃতীয় ব্যক্তিটি ওরা কেউ নন। আপনার আধপাগল ভাই আর যা-ই হোক, দেশি মদ বা খৈনির মতো জিনিস খান না। তাঁর স্বাস্থ্যও আপনার মতোই, সুতরাং জিরো ফিগারের কোমর হতেই পারে না। আর কুক্কু তো বাচ্চা ছেলে।” সে সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে বলল, “কিন্তু একটু আগেই আপনি বললেন যে আপনার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সেটা তো হওয়ার কথা নয় ডক! আপনি তো সকাল ছ-টার মধ্যেই ব্রেকফাস্ট সেরে নেন। আর এখন প্রায় সাতটা বাজতে যায়!”

কথাটা শোনামাত্র হতবাক হয়ে যান ডঃ চ্যাটার্জি। অধিরাজ সত্যি কথাই বলছে। বার্নিং শিখের মোডাস অপারেন্ডি দেখে এই মুহূর্তে সবাই খাদ্য ও পানীয় নিয়ে চরম সতর্কতা অবলম্বন করছে। পবিত্র আর প্রণবেশ লাহিড়ী রেস্টোর্যান্টের খাবার খান ঠিকই, কিন্তু খাবার প্রিপারেশনের সময় কুকের নাকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর কখনোই রেস্টোর্যান্ট রিপিট করেন না। ব্রেকফাস্ট এক জায়গায় করলে লাঞ্চ অন্যত্র, ডিনারও অন্য জায়গায়। বসে খাওয়ার গল্পই নেই, প্যাক করিয়ে নিয়ে দু-জনেই নিজেদের ডেরায় ফেরেন। অর্ণব আর অধিরাজকেও বাইরে খেতে হলে ওরাও সতর্ক থাকে। চা-কফি খেলেও র‍্যান্ডম কফি শপ বেছে নেয়। সিলড মিনারেল ওয়াটারের বোতল ছাড়া জল খায় না। মিস্ বোসের খাবারের যোগান পবিত্রই দেয়। আর আত্রেয়ী দত্ত নিজেই ওস্তাদ কুক। নিজের খাবার সে নিজেই বানিয়ে নেয়। কফি, দুধের প্যাকেট বা বিভিন্ন রেডি টু কুক স্ন্যাকস জাতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী সে নিজের একটা ঢাউস ব্যাগে রাখে। বাকি যা রইল, চাল, ডাল, তেল বা কাঁচা বাজার, সেগুলো নিয়ে চিন্তা নেই। কাঁচা সবজি বা চালে কেউ সেডেটিভ মেশায় না। ফরেনসিক এক্সপার্টদের মধ্যে আহেলি আর আইভি ক্যান্টিনেই খেয়ে নেয়।

ব্যতিক্রম শুধু ডঃ চ্যাটার্জি। তিনি সতর্কতার বিষয়ে আরও এককাঠি সরেস। তাঁর ব্রেকফাস্ট থেকে লাঞ্চ, ডিনার, স্ন্যাকস, সবই বাড়ি থেকে আসে। তাঁর বহুবছরের বিশ্বস্ত কুক এবং সর্বক্ষণের কম্বাইন্ড হ্যান্ড সনৎ একদম টাইম টু টাইম খাবার নিয়ে আসে ফরেনসিক ল্যাবে। ডঃ চ্যাটার্জির সংসার এবং স্বয়ং ভদ্রলোকটিকেও সে-ই সামলায়। অসম্ভব প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত এই মানুষটি একাধারে ফরেনসিক বিশারদের সন্তানসম, অন্যদিকে গার্জিয়ানও বটে। তার হাতের রান্না ছাড়া অসীম চ্যাটার্জির মুখে অন্য কিছু রোচে না! তিনি যখন দিনের পর দিন ল্যাবেই থাকেন, তখন সনৎই তাঁকে একদম সময়মতো খাবার দিতে আসে। কোনোদিন সময়ের এদিক ওদিক হয় না। অথচ আজ সে এখনও এসে পৌঁছয়নি।

তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তখনও মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আহেলির বলা কথাগুলো তাঁর কানে ভাসছে। শীর্ণ দেহের মানুষ!... রক্তাল্পতায় ভোগা শরীর।... কাঁচা ডিম ও পেঁয়াজের গন্ধ!...ডঃ চ্যাটার্জির অভ্যাস ব্রেকফাস্টে ব্রেড, সসেজ আর বড়োসড় একটা ওমলেট খাওয়ার... হাত ঠিকমতো না ধোওয়ার অভ্যাস... ছেলেটাকে বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছেন তিনি... চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস... দেশি মদ...! নরমে গরমে অনেক বুঝিয়েও ছাড়াতে পারেননি... সুযোগ পেলেই দেশি মদ খেতে বসে যায়... ঘণ্টায় ঘণ্টায় খৈনি খাওয়ার অভ্যাস...! মিলে যাচ্ছে... একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। ওঃ.... ঈশ্বর।।

কয়েকমুহূর্তের স্তব্ধতা। পরক্ষণেই হাহাকার করে উঠলেন ডঃ চ্যাটার্জি, “সনৎ...স-ন-ৎ। ওঃ...।”

পরক্ষণেই তিনি হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ক্যামেরার ফ্রেম থেকে। অধিরাজ ভিডিও কলটা অফ করে দিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল, “চলো অর্ণব, এক্ষুনি ডঃ চ্যাটার্জির বাড়িতে পৌঁছতে হবে। কু-ই-ক!”

দুই অফিসারও তড়িঘড়ি প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল ব্যুরো থেকে। ব্যুরোর বাকি অফিসাররা তাদের অবস্থা দেখে অবাক। দু-জনেই এমন পাগলের মতো দৌড়চ্ছে কেন, তা তাদের মাথায় ঢোকেনি। বাইকে বসতে বসতে অধিরাজ বলল, “কে জানে, ডক একাই

গিয়েছেন, না সঙ্গেও কেউ গেল। মিস্ মুখার্জিকে ফোন করো তো... ইমিডিয়েটলি...!"

খুব বেশি কথা বলার সুযোগ না পেলেও আহেলি সংক্ষেপে জানাল যে ডঃ অসীম চ্যাটার্জির সঙ্গে ওরা দু-জনেই আছে। ডঃ চ্যাটার্জির গাড়ি নেয়নি, র‍্যান্ডম ট্যাক্সি হায়ার করেছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ কিছু বলার মতো পরিস্থিতিতেই নেই। শুধু বিড়বিড় করে বলছেন, "সনৎ... হোয়াই?...ওকে কেন ....?"

"আমরাও স্পটে আসছি।" অর্ণব বলল, "ডঃ চ্যাটার্জি এখন কিছু বোঝার বা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই। কিন্তু প্লিজ, আপনারা মনে রাখবেন, ওটা এখন ক্রাইমসিন হতে পারে।"

"ইয়েস, অফকোর্স।"

(১৩)

ডঃ চ্যাটার্জির বাড়ির অবস্থা দেখে ওদের দু-জনেরই বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল। অধিরাজের অবস্থা দেখলে মনে হয়, কেউ তাকে শূলে চড়ালেও বোধহয় এত কষ্ট পেত না। তার চোখের সামনে বারবার ফিরে আসছিল আরও একটা ক্রাইমসিন যার দুঃস্বপ্ন সে এখনও দেখে! আর অর্ণব নিজেই বুঝি কয়েক সেকেন্ডের জন্য বেহুঁশ হয়ে যাচ্ছিল। সামনের দৃশ্যটা দেখে আর একটু হলেই টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনোমতে নিজেকে সামলেছে!

রাস্তায় তখন ট্র্যাফিকের রাশ ছিল না। আটটা থেকে মোটামুটি অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়। একেই রাস্তা ফাঁকা, তার ওপর প্রয়োজনের সময় ট্র্যাফিকের ইশারা অগ্রাহ্য করাই অধিরাজের নিয়ম। ব্যুরো থেকে ডঃ চ্যাটার্জির বাড়ি প্রায় একঘণ্টার রাস্তা। কিন্তু সেই দূরত্ব অর্ধেক সময়ে অতিক্রম করল অধিরাজ। এর মধ্যে অর্ণবের সঙ্গে তার একটি বাক্যও বিনিময় হয়নি। অধিরাজের মুখ অসম্ভব গম্ভীর। অর্ণবের অন্তরাত্মা কাঁপছে। এ কেমন খুনি যে নৃশংসতার সব মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে সনতের মতো একজন গরীব, নিরীহ মানুষকে এভাবে খুন করার মানে কী! এবং শুধু তাই নয়, এই দেহ সে ব্যুরোর সামনেই ডাম্প করেছিল। ও জানত, ডেডবডিটা পুলিশের মাধ্যমে ডঃ চ্যাটার্জির কাছেই পৌঁছবে। এবং ওঁর সেটা বুঝতে বিশেষ সময় লাগবে না! একজন ফরেনসিক এক্সপার্টকে এভাবে ব্যথা দেওয়ার পেছনে তার উদ্দেশ্য কী? সে কি আদৌ সনৎকেই মারতে চেয়েছিল, না তার লক্ষ্য স্বয়ং ডঃ অসীম চ্যাটার্জিই ছিলেন? সনৎ হয়তো বেঘোরেই মারা গেল।

এই সম্ভাবনার কথা মনে আসতেই অর্ণবের হৃৎস্পন্দন যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে যায়৷ একটা রাতের মধ্যেই খুনি অর্ণবকে তিনবার অ্যাসিড অ্যাটাক করেছে, অধিরাজের গলা কেটে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, অর্ণবকে উড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত প্রায় করেই ফেলেছিল সে, সেখানে ব্যর্থ হয়ে ইসমাইল আর রকিকে মেরেছে। এখানেও ক্ষান্ত হয়নি। হয়তো ডঃ চ্যাটার্জিকেও খুন করার পরিকল্পনা ছিল তার! মাঝখান দিয়ে মারা পড়ল সনৎ! এরকম রক্তপিপাসু খুনি সে আগে কখনও দেখেনি। এর তুলনায় হয়তো 'সার্জিক্যাল স' কিলারও নিতান্তই শিশু! একের পর এক তার আক্রমণ এসেই চলেছে। সে যুদ্ধে বিরতি দিতে জানে না, কাউকে ছাড়ে না, কিছুতেই তার শান্তি নেই। এ কী জাতীয় মনুষ্যরূপী দানব! সময় যত কমছে, ততই যেন লোকটা হিংস্র থেকে হিংস্রতর হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও কী কী করবে সে? সি.আই.ডি. হোমিসাইডের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কষতে কতদূর যাবে?

ডঃ চ্যাটার্জির বাড়ির অবস্থা ওরা যতখানি কল্পনা করেছিল তার চেয়েও খারাপ। ঢোকার মুখে দরজার সামনেই তাজা রক্তের ধারা দেখে অর্ণবের গায়ের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে যায়। রক্তের স্রোত ভেতর থেকে বাইরে এসে পড়েছে। ঘরের ভেতরের দৃশ্য আরও ভয়ানক। একদম সামনের হলের মেঝেটা রক্তে ভাসছে। যেন মার্বেলের ফ্লোরের ওপরে লাল তরলের গালিচা। তার মধ্যেই ইতস্তত টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দুটো হাত আর দুটো পা অজস্র টুকরোয় কেটে সাজিয়ে দিয়েছে খুনি। অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো সবই বাইরে ছড়িয়ে আছে। অধিরাজ বুঝতে পারছিল না এগোবে কোন্ পথে! গোটা মেঝে রক্তে পিচ্ছিল। কোথাও অন্ত্র পড়ে রয়েছে, কোথাও ফুসফুস কিংবা পাকস্থলী। রক্তের দুর্গন্ধে, দৃশ্যের বীভৎসতায় অর্ণবের গা গুলিয়ে ওঠে। এমনকি সনতের মাথাটাও অক্ষত নেই। খুনি ওর মাথার ওপর কোনো ভারি বস্তু দিয়ে এত আঘাত করেছে যে মাথা ফেটে চৌচির। রক্তের সঙ্গে ওর মাথার হাড়ের টুকরো, ঘিলুও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে চতুর্দিকে। তবে মুখটা চিনতে কষ্ট হচ্ছে না। এটা সনৎ-ই। ওকে খুনি বেহুঁশ করেনি। ডঃ চ্যাটার্জিই একটু আগে বলছিলেন যে ওর পাকস্থলীতে যতটুকু মদ ছিল তাতে লোক মাতাল হয় না। ঘুমের ওষুধও পাকস্থলীতে ছিল না। সর্বোপরি ওর যন্ত্রণাবিকৃত মুখ বলে দেয়, মরার আগে ও সম্পূর্ণ জ্ঞানেই ছিল।

ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, লণ্ডভণ্ড অবস্থায় থাকা আসবাবপত্র সাক্ষ্য দেয়, সে ফাইট ব্যাক করার আপ্রাণ চেষ্টাও করেছিল। আর এবার মার্ডার ওয়েপন একটা পেল্লায় হাতুড়ি সেটাও ঐ রক্ত, মাংস, ঘিলুর মধ্যেই পড়ে রয়েছে।

অধিরাজ নিশ্চিত, ইসমাইলের মতো মাথাটা সনতের হলেও দেহাংশগুলো সব ওর নয়। এর মধ্যে ইসমাইলের শরীরের অংশও আছে। এখান থেকে ইসমাইলের ডেরা মাত্র পনেরো মিনিটের দূরত্বে। খুনি দুটো খুনই পরপর করেছে। বড়োজোর মাঝখানে কুড়ি কী পঁচিশ মিনিটের ফারাক ছিল। রক্তের প্রাবল্য সাক্ষী দিচ্ছে যে দুটো বডিকে টুকরো টুকরো এখানেই বসে করেছে সে। দুটো শরীরের পিসগুলোকে মিশিয়ে একটা সেট ব্যুরোর সামনে ফেলেছে, অন্যটা ডঃ চ্যাটার্জিকে উপহার দেওয়ার জন্য বাড়িতেই রেখে গিয়েছে।

আবার তার মনে পড়ে গেল সেই ভয়ানক দৃশ্য। 'সার্জিক্যাল স' কিলারও প্রায় এমনই একটা নৃশংস রক্তাক্ত ক্রাইমসিন উপহার দিয়েছিল অধিরাজকে। কিন্তু সেখানে অন্তত ভেতরের অঙ্গ বাইরে ছড়ানো থাকত না! কিন্তু সেই খুনিটি আজও তাকে তাড়া করে বেড়ায়। কখনও সচেতনে, কখনও বা অবচেতনে। মৃতরা তার খুব ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল না। ওরা তার সিকিউরিটি গার্ড ছিল যাদের হয়তো সবাইকে সে ভালোভাবে চিনতও না। অথচ সনৎ ডঃ চ্যাটার্জির নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী! ওঁর বিয়ে ডঃ চ্যাটার্জি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দিয়েছিলেন। দেশে পাকা বাড়ি করার জন্য টাকাও দিয়েছেন। সে ওঁর সন্তানতুল্য...।

এই ভয়ানক ক্রাইমসিনের একপাশে চুপ করে বসেছিলেন ডঃ চ্যাটার্জি। তার পাশে আহেলি এবং আইভি। আহেলির একটা হাত সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে ভদ্রলোকের কাঁধ পরম মমতায় স্পর্শ করে আছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের মুখে একটিও শব্দ নেই, অথচ চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে। ওঁর মনের অবস্থা অধিরাজ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল। সে নিজেও এই যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়েছে। এই প্রবল যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধু যার ওপর দিয়ে যায়, সে-ই বোঝে! সেদিক দিয়ে অধিরাজ ডঃ চ্যাটার্জির সমব্যথী। ওঁর ভেতরে যে কী চলছে, তা একমাত্র অধিরাজই অনুভব করতে পারে। জীবিকার খাতিরে এরকম অথবা এর থেকেও বীভৎস লাশ দেখে তিনি অভ্যস্ত। শয়ে শয়ে মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করাই তাঁর পেশা। বিকৃত মানবদেহ, কাটা ফাটা শবদেহ তাঁকে কখনোই বিচলিত করে না। কিন্তু নিজের প্রিয় মানুষ, বা স্নেহের পাত্রটি যখন আচমকা লাশ হয়ে যায়, তখন অতি বড়ো পাষাণহৃদয় মানুষও তা মেনে নিতে পারে না!

আহেলি এবং আইভি'র মুখ বিবর্ণ হলেও ওদের দু-জনেরই হাতে গ্লাভস। আইভি-র পাশে ফরেনসিক কিট বক্স আর এভিডেন্স ব্যাগও নজর এড়াল না। অধিরাজ বুঝল, ওরা দু-জনেই ইতিমধ্যে ক্রাইম সিন পরীক্ষা করেছে। কিন্তু কী বলবে, বা বলা উচিত তা বুঝতে পারছিল না। চতুর্দিকের শোচনীয় নীরবতা বুকের ওপর মারাত্মক ভার হয়ে চেপে বসছিল। সেই অসহ্য নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করলেন স্বয়ং ডঃ অসীম চ্যাটার্জিই। নীচু স্বরে বিড়বিড় করে বললেন, "প্রথমে একের পর এক হাতুড়ির বাড়ি মেরেছে মাথায়। ততক্ষণ অবধি মেরেছে, যতক্ষণ না খুলি ভেঙে ব্রেইন বাইরে না আসছে। ভিকটিম ফাইট ব্যাক করার চেষ্টা করেছিল। মৃত্যুর পর কোনো ধারালো বস্তু দিয়ে টুকরো করা হয়েছে বডিটাকে। কোনো চপার বা ছুরি নয়। খুব ধারালো তরোয়াল জাতীয় কিছু। ইসমাইলের ক্ষেত্রেও তরোয়ালই ইউজ হয়েছে। অন্তত শরীরের কাটগুলো তেমনই বলে। দরজায় কোনো ফোর্সড এন্ট্রির চিহ্ন নেই। নো ফিঙ্গারপ্রিন্ট, নো ডি.এন.এ., নাথিং। তবে খুনি যখন ওর মাথায় হাতুড়ির বাড়ি মারছিল, তখন বাঁ হাত ব্যবহার করেছে। সনতের মাথার সব ক-টা আঘাত রাইট সাইডে। ভেঙেছেও ডানদিকেরই স্কাল। কিন্তু ডেডবডির কাট বা স্ল্যাশগুলো লেফট টু রাইট। তরোয়াল দিয়ে কাটার সময় ডানহাত ....।" বলতে বলতেই তাঁর স্বর কান্নাবিকৃত হয়ে ওঠে, "বড়ো কষ্ট হয়েছে ছেলেটার... বড়ো ব্যথা পেয়েছে... বারবার বলেছি, ভোর ভোর মদ গিলে বসে থাকিস না। কথাই শুনত না। বলত, এটা ওষুধ, আমার ইঞ্জিনের তেল...কতবার বলেছি অচেনা লোক দেখলে দরজা খুলবি না...! ও মরে গেল... আমার জন্য মরে গেল... ওর

মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী রাজা... দেশের বাড়িতে ওর বউ আছে... ছোট ছোটো ছেলে-মেয়ে.... বার্নিং শিখ নয়, আমিই ওকে খুন করলাম...।”

কথার সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাঁকে দখল করে নিল। অমন জাঁদরেল মানুষটা আর সহ্য করতে না পেরে বেসামাল কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অধিরাজ জানত, এর কোনো সান্ত্বনা নেই! এ ক্ষত'র কোনো মলম হয় না! ডঃ চ্যাটার্জিকে এখন কিছু বলার মতো সাহসও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। শুধু দু-চোখে অদ্ভুত এক অনুতাপ আর রাগ! দাঁতে দাঁত পিষে বলল, “শুয়োরের বাচ্চাটাকে ছাড়ব না আমি!”

“আমি সি.আই.ডি. ব্যুরো থেকে আসছি... অ্যাঁ... আমি সি.আই.ডি. ব্যুরো থেকে এসেছি...!”

একটা কড়কড়ে গলার শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ওরা সবাই। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল যে সনৎ ছাড়াও আরও একটি সদস্য এ বাড়িতে আছে। সে ভেতরের ঘরে ছিল বলে কারোর মনোযোগ তার ওপর পড়েনি। এবার তার কণ্ঠস্বর শুনে সবারই খেয়াল হল। অধিরাজ অস্ফুটে বলল, “ড্রিঘাংচু!”

ডঃ চ্যাটার্জির পোষ্য কাকাতুয়া ড্রিঘাংচু অবশ্য ভেতরের ঘরেই সুরক্ষিত আছে। খুনি তার কোনো ক্ষতি করেনি। হয়তো তার অস্তিত্বই জানত না। জানলে ও বেচারির প্রাণটাও যেত। সে প্যাটপ্যাট করে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, “আমি সি.আই.ডি. ব্যুরো থেকে এসেছি স্যার...!”

অধিরাজ ও অর্ণব পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে। ড্রিঘাংচু অসম্ভব বুদ্ধিমান একটি প্রাণী। তার আই কিউ-ও প্রখর। যে কোনো শব্দ বা বাক্য একবার শুনলেই সে দিব্যি কপি করে নিতে পারে। এই মুহূর্তে তার ডায়লগ স্পষ্ট করে দিল যে বার্নিং শিখ এ ঘরে প্রবেশাধিকার কীভাবে পেয়েছিল। সনৎ এমনি এমনিই তাকে দরজা খুলে দেয়নি। এটাই ফোর্সড এন্ট্রি না হওয়ার রহস্য। ও বেচারি হয়তো কলিংবেলের আওয়াজ শুনে আগন্তুকের পরিচয় জানতে চেয়েছিল। তার উত্তরে এই বাক্যটাই উচ্চারিত হয়েছে যেটা এখন ড্রিঘাংচু বলছে। সনৎ ভাবতেও পারেনি বাইরে সি.আই.ডি. নয়, তার মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

“ড্রিঘাংচু কথাটা বাংলায় বলছে।” অধিরাজের চোখ উত্তেজনায় চকচক করে ওঠে, “তার মানে লোকটা বাংলায় কথা বলছিল। একটু আগেও মদন বলছিল যে সে হিন্দিভাষী! কিন্তু ড্রিঘাংচু শুধু কপি করতে পারে, ভাষান্তর করা ওর পক্ষে অসম্ভব। কপিড লাইনটা বাংলায়। তার মানে আমার অ্যাসাম্পশন সঠিক। লোকটা বাংলাও বলতে পারে। একাধিক ভাষা ওর দখলে!”

আইভি এতক্ষণ পেছনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার অধিরাজের মুখোমুখি এসে ক্ষীণস্বরে বলল, “কিন্তু চিঠিটা সে হিন্দিতেই লিখেছে।”

“চিঠি!” অধিরাজ বিস্মিত, “খুনি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে?”

“হ্যাঁ।” আইভি মাথা নাড়ল, “আমরা যখন এসে পৌঁছলাম, সনতের দেশি মদের বোতল আর গ্লাস তখনও হলঘরের টেবিলেই রাখা ছিল। বাদামের প্লেটও। চিঠিটা বোতলের নীচে চাপা দিয়ে গিয়েছিল সে। তাই প্রথমেই আমাদের চোখে পড়েছে। গ্লাস, ডিশ, বোতল, সবই এভিডেন্স হিসাবে তুলে নিয়েছি। শুধু ভাবলাম, চিঠিটা আপনার দেখা প্রয়োজন। তাই এখনও এভিডেন্সব্যাগে ঢোকাইনি।”

“কী লিখেছে?” অধিরাজ হাত বাড়িয়ে দেয়, “দেখি।”

চিঠিটা দেবনাগরী হরফে আপাদমস্তক হিন্দিতে লেখা। বক্তব্য খুব বেশি কিছু নয়। বাংলায় অনুবাদ করলে কিছুটা এমন দাঁড়ায়,

“শ্রদ্ধেয় ডাক্তারবাবু,

আশা করি আমার সারপ্রাইজ গিফট আপনার খুব ভালো লেগেছে। ‘বান্দার তরফ থেকে‘খাতিরদারিতে কোনো ত্রুটি হয়নি নিশ্চয়ই। আপনার সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর নিয়ে

জানলাম, আপনি জ্যান্ত মানুষের চেয়ে মরা মানুষ বেশি পছন্দ করেন। সেজন্যই এমন 'ভেট' দিলাম। তবে এটাই হয়তো শেষ নয়। এরপর আপনার জুড়ুয়া ভাই, ভাইপোও তো আছে! কে বলতে পারে, কখন কী ঘটে যায়। মানুষের জীবনের কোনো ঠিক নেই। এই আছে, এই নেই। এই 'সওগাত'টা অবশ্য শেষও হতে পারে, যদি আপনি আমার রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ান। আপনার বুদ্ধির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস।

আপনার 'প্রশংসক

অধিরাজ চিঠিটা পড়ে আইভিকে ফেরত দিল। আস্তে আস্তে বলল, "লোকটা ইসমাইল বা সনৎকেই শুধু টুকরো টুকরো করেনি। আমাদেরও একটু একটু করে কেটে টুকরো করছে। আমার সন্দেহ আছে, ইসমাইল আর রকির অবস্থা দেখে বাকি ইনফর্মাররা কেউ কাজ করার সাহস পাবে কিনা। ইনফর্মাররা আমাদের ডান হাত। আর ফরেনসিক আমাদের মস্তিষ্ক! লোকটা আমাদের হাত আর মস্তিষ্ক, দুটোই কেটে নিল! ফরেনসিক ল্যাব সাময়িক বন্ধ করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। সে যা বলেছে, সেটাই মেনে নিতে হবে। নয়তো আরও কতগুলো নিরপরাধ মানুষের প্রাণ যাবে। আর কোনো অপশন নেই আমাদের কাছে। ডঃ চ্যাটার্জির মানসিক অবস্থাও খারাপ ওঁর হেল্প আমরা অন্তত আগামী কয়েকদিনের জন্য পাব না। এক্সপেক্ট করাটাও অমানবিক।" বলতে বলতেই সে আইভি'র দিকে তাকিয়েছে, "আপনিও বাড়ি চলে যান মাদমোয়াজেল। যতদিন না এই কেসটা ক্লোজ হচ্ছে বাড়িতেই থাকুন। বেরোনোর প্রয়োজন নেই। সাবধানে থাকুন। আমরা ডক, আপনার আর মিস্ মুখার্জির পরিবারের পুলিশ প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করছি। আপাতত ফরেনসিক ল্যাব বন্ধ থাক।"

"না!"

পেছন থেকে একটা জোরাল আওয়াজ ভেসে আসায় ওরা প্রত্যেকেই চমকে উঠে পেছন দিকে তাকায়। ঠিক তাদের পেছনে কখন যেন আহেলি সবার অজান্তেই এসে দাঁড়িয়েছে। এরকম রূপে তাকে আগে কখনও দেখেনি ওরা। চোখদুটো জলে ভেজা তবুও যেন দপদপ করে জ্বলছে। চির পরিচিত আদুরে, কোমল মুখ অসম্ভব শক্ত। সে দৃঢ় গলায় বলল, "ডঃ চ্যাটার্জির মানসিক অবস্থা খুব খারাপ ঠিকই। ওঁকে আর ফরেনসিক ল্যাবে না পাঠানোই ভালো। আইভিও চাইলে ছুটি নিতে পারে। কিন্তু ল্যাবের কাজ বন্ধ হবে না!"

অধিরাজ যতটা বিস্মিত, ঠিক ততটাই বিপন্ন, "মিস্ মুখার্জি, চোখের সামনে এত কিছু দেখার পরও আপনি এই কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ।" আহেলির সেই পরিচিত আহ্লাদি, ন্যাকা ন্যাকা কণ্ঠস্বর কোথায় যেন গায়েব হয়ে গিয়েছে, "লোকটা স্যারকে থ্রেট করেছে। আমাকে করেনি। আমি এই ক-দিন ফরেনসিক ল্যাবের বাইরেই বেরোব না। আপনি শুধু আমার ফ্যামিলিকে প্রোটেকশন দিন। আমি স্যারের মতো জিনিয়াস নই, কিন্তু কাজটা জানি। এর শেষ দেখে তবেই ছাড়ব।"

অধিরাজ আহেলির দিকে সবিস্ময়ে অনিমেষে তাকিয়ে ছিল। তার দৃষ্টিটা দেখলে মনে হয়, আহেলি মুখার্জি নামের প্রাণীটিকে সে জীবনে এই প্রথমবারই দেখছে বা সদ্যই আবিষ্কার করেছে। অর্ণবও যেন আজ নতুন আলোয় আহেলিকে দেখল। এই মেয়েটিই ডঃ চ্যাটার্জির ধমক খেয়ে কতবার ফোঁচ ফোঁচ করে কেঁদেছে তার ঠিক নেই। এই মেয়েটাই একসময়ে ভয়ে ভয়ে কথা বলত, অধিরাজের ব্যাপারে অসম্ভব পজেসিভ, তার অবহেলায় কতবার বেদনাবিধুর হয়ে উঠেছে তার হিসেব নেই। এই মেয়েটাই 'সার্জিক্যাল স'কিলারের তাণ্ডব দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। একেই একসময় টিপিক্যাল ন্যাকা একটা মেয়ে মনে হত তার। হ্যাঁ... এই মেয়েটাই! অথচ কত আলাদা!

অধিরাজের সপ্রশ্ন দৃষ্টি এবার আইভি-র দিকে ফিরল। আইভি মাথা হেঁট করেছে, "নিজের প্রাণের ভয় পাই না স্যার। কিন্তু আমার ফ্যামিলিটা বড়ো...।"

তার কথার মধ্যেই উত্তর স্পষ্ট। অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়, "রাইট। আই ক্যান

আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনি বরং ডঃ চ্যাটার্জিকে নিয়ে ওঁর ভাই অসিত চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে চলে যান। ওঁর কাছে ঐ ফ্ল্যাটের আর একটা চাবি আছে। আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। ক্যাবও বুক করে দিচ্ছি। ওখানে ডককে ড্রপ করে স্ট্রেট বাড়ি যাবেন। একঘণ্টার মধ্যে আপনাদের তিনজনের বাড়িতেই সিকিউরিটির বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। যা-ই হয়ে যাক, বাড়ির বাইরে বেরোবেন না, অজানা কাউকে বাড়িতে অ্যালাউ করবেন না। যে গার্ডরা যাবে, সবার আইডি কার্ড দেখে নেবেন। তবে আমার ধারণা, আগামী কিছুদিন ল্যাবে না এলে ও লোকটা আপনাদের ওপর আক্রমণ করবে না।"

আইভি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, "ওকে স্যার।"

অধিরাজ ও অর্ণব ফের ফিরে গেল ডঃ চ্যাটার্জির কাছে। ভদ্রলোক এখনও অঝোরে কেঁদে যাচ্ছেন। কিন্তু অধিরাজের প্রস্তাব শুনে প্রথমেই প্রবল আপত্তি করলেন, "না। এটা হয় না। আমি একটা শয়তানের ভয়ে পালাব না রাজা। তোমরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ডিউটি করবে, আর আমি ওর ভয়ে পালিয়ে যাব। আই অ্যাম নট অ্যান এসকেপিস্ট।"

সে পরম মমতায় ভদ্রলোককে বোঝানোর চেষ্টা করে, "ডক, আপনি এসকেপিস্ট নন তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু থ্রেটটা আপনার চেয়েও অনেক বেশি আপনার ভাই ও কুক্কুর ওপরে। লোকটা সব জানে। ও আমাদের ওপর রীতিমতো রিসার্চ করেই যুদ্ধে নেমেছে। সনৎ আপনার জন্য কী ছিল, তা আমরা জানি। কিন্তু আর কারোর সম্পর্কে না হোক, কুক্কুর কথা একবার ভাবুন। বার্নিং শিখ বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরও রেয়াত করে না। কুক্কু দুনিয়ার কতটুকু দেখেছে? ওর কথা ভাববেন না আপনি?"

"এক পরিবারের জন্য আর এক পরিবারকে ছেড়ে দেব?" কোনো যুক্তিই শুনবেন না তিনি, "রিস্ক কার নেই? তোমাদের নেই? তোমার অসম্ভব ব্লাড লস হয়েছে। কাঁধে দু-বার সেলাই পড়েছে। এখন তোমার হসপিটালের বেডে শুয়ে আরাম করার কথা। তারপরও তুমি লড়ে যাচ্ছ। অর্ণব দু-বার মরতে মরতে বেঁচেছে। তাও পালায়নি। আর আমি এত সহজেই হাল ছেড়ে দেব?"

"স্যার।" সস্নেহে তার হাত জড়িয়ে ধরে অধিরাজ, "হাল ছাড়তে আপনাকে কেউ বলছে না। আজকাল ভিডিও কলে, কনফারেন্সে, ল্যাপটপের মাধ্যমে ঘরে বসেও কাজ করা যায়। তেমন দরকার পড়লে আমরা নিজেরাই আপনার শরণাপন্ন হব। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আপনার অসিত চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে চলে যাওয়াই সবচেয়ে সঠিক কাজ হবে। ওঁরা ইউ-এস-এ থেকে ফিরছেন কবে?"

"আজই ফিরবে। রাতে এসে পৌঁছোনোর কথা।" তিনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত, "কিন্তু ফরেনসিক রিপোর্টগুলো....!"

"সব ঠিক হয়ে যাবে। আর কয়েকঘণ্টারই তো ব্যাপার।" সে নরম সুরে বলল, "আপনি ওঁদের সঙ্গে থাকুন। সাবধানে থাকুন। আর দুটো রাতই তো বাকি আছে। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপর আবার চলে আসবেন।"

যুক্তিটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সত্যিই ভেঙে পড়েছিলেন। উপর্যুপরি অধিরাজের অনুরোধে ও যুক্তির ধাক্কায় শেষপর্যন্ত একরকম বাধ্য হয়েই বললেন, "আচ্ছা।"

আইভি শোকার্ত, যন্ত্রণাকাতর ডঃ চ্যাটার্জিকে নিয়ে চলে গেল। অধিরাজই ওদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছিল। ডঃ চ্যাটার্জি যেন ঠিকভাবে হাঁটতেও পারছিলেন না। ঋজু মেজাজি মানুষটা একটু ঝুঁকে পড়েছে। মাত্র কয়েকঘণ্টার মধ্যেই যেন ওঁর বয়েস অনেক বেড়ে গিয়েছে। সঙ্গে দ্রিঘাংচুও গেল। এখন সে-ই ডঃ চ্যাটার্জির একাকীত্বের একমাত্র সঙ্গী। আইভি তার খাঁচাটা ধরে সযত্নে গাড়ির মধ্যে রাখে। অধিরাজ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে। এই মুহূর্তে যাঁর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই মানুষটার সাহায্যই হারাতে হচ্ছে। এটা যে সি.আই.ডি., হোমিসাইডের টিমের জন্য কতবড়ো ক্ষতি তা অধিরাজ ও অর্ণব দু-জনেই বুঝতে পারছিল। অধিরাজ অসহায় স্বরে বলল, "একে একে নিভিছে দেউটি। কেসটা

শেষপর্যন্ত অন্ধকারেই না তলিয়ে যায় অর্ণব।" অর্ণব তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। সে আবার একটা সিগারেট বের করে এনেছে প্যাকেট থেকে। হাবেভাবেই স্পষ্ট, ভীষণ নার্ভাস। স্নায়ুযুদ্ধে এখনও টিকে থাকলেও হয়তো কিছুটা ক্লান্তি তাকেও অধিকার করেছে। একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাওয়া অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। চিরপরিচিত হাসিটা ফের গায়েব হয়ে গিয়েছে। সে গম্ভীর মুখে একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আপনমনেই বলে, "ছোটোবেলায় প্রচুর গোয়েন্দা গল্প পড়ার শখ ছিল। শার্লক হোমস, আর্কিউল পোয়ারো থেকে শুরু করে ব্যোমকেশ, ফেলুদা, কাউকে বাদ দিইনি। আমার পুলিশে আসার পেছনে এই ক্যারেক্টারগুলোরও অবদান কম নয়।" বলতে বলতেই একটু থেমে বলল, "কিন্তু আমি বোধহয় ওদের মতো সাহসী নই অর্ণব। হোমস, ফেলুদা বা ব্যোমকেশ কখনও বিচলিত হননি, কখনও ভয় পাননি। ওঁদের নার্ভের জোর অমানুষিক। কিন্তু আমি রক্তমাংসের মানুষ! আমি ওঁদের মতো অবিচলিত থাকতে পারি না! আমারও ভয় আছে, দুর্বলতা আছে...! লোকে সুপারকপ বলে ঠিকই... কিন্তু কখনো-কখনো আমিও বড্ড অসহায়....!"

অর্ণব জানে এর উত্তর দেওয়াই বাহুল্য। স্যার এখন নীরবতাই চাইছেন। সে চুপ করে থাকলেও মনে মনে ভাবে, ভাগ্যিস হোমস, পোয়ারো, ব্যোমকেশ বা ফেলুদা এই জাতীয় হিংস্র ক্রিমিনালের পাল্লায় কখনও পড়েননি। নয়তো দেখা যেত, তাঁরা ঠিক কতখানি 'আয়রনম্যান।' তাদের আমলের অপরাধী ও বর্তমানকালের অপরাধীদের মধ্যে আকাশ পাতাল ফারাক। এখন মানুষ অনেক বেশি ধূর্ত, অনেক বেশি নৃশংস! কথায় কথায় খুন করে বসে থাকে। মার্ডারটা যেন জলভাত। প্রোফেসর মরিয়ার্টি বা মগনলাল মেঘরাজের মতো দশটাকে এরা জল দিয়ে গুলে খেতে পারে।

"অফিসার ব্যানার্জি...!"

আহেলির মিষ্টি অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বরে সম্বিত ফিরল দু-জনেরই। সে আস্তে আস্তে ওদের দিকেই এগিয়ে এল, "আমি অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছি। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই এসে যাবে। ডেডবডি ল্যাবে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা কি আলাদা করে আর একবার লাশ বা ক্রাইমসিন এগজামিন করতে চান?"

"আপনারা কি আগে দেখে নিয়েছেন?"

অধিরাজের প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়ল আহেলি, "আমরা এখানে পৌঁছোনো মাত্রই ইনভেস্টিগেট করেছি। স্যার প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেলেও উনিই গোটা স্পট তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। সনতের ক্ষেত্রে মার্ডার ওয়েপন ঐ হাতুড়িটাই। এবং স্যার আপনাদের যা বলেছেন, প্রতিটা শব্দই সঠিক। কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা কোনোরকম ক্লু পাওয়া যায়নি। মদের গ্লাসে একটা ফিঙ্গারপ্রিন্টের স্যাম্পল আছে ঠিকই। তবে সেটা সম্ভবত সনতেরই। মার্ডার ওয়েপনেও কোনোরকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ডি.এন.এ. নেই।"

"সেটাই স্বাভাবিক।" অধিরাজ মাথা নাড়ল, "ও পাবলিক ক্রাইমসিনে কোনো ক্লু ছেড়ে যাবে সেটা ভাবাই মূর্খামি। আমরাই বা নতুন করে কী ইনভেস্টিগেট করব। স্বয়ং ডঃ চ্যাটার্জিই যখন কিছু পাননি, আমরা তো আরও পাবো না। তাছাড়া ও দৃশ্য আমি অতীতেও দেখেছি, এখনও দেখছি। বারবার দেখার ইচ্ছে নেই।"

তার পিঙ্গল বিষণ্ণ মুখ বুঝিয়ে দেয় যে 'সার্জিক্যাল স' কিলারের ভয়াবহ ক্রাইমসিনের কথা বার্নিং শিখ তাকে ফের মনে করিয়ে দিয়েছে। আততায়ী ওদের সম্পর্কে যে পরিমাণ রিসার্চ করেছে, তাতে হয়তো এটাই তার ইপ্সিত ছিল। পুরোনো জখমে ফের আঘাত লেগেছে। লোকটা শুধু নিষ্ঠুরই নয়, আশ্চর্য একটা মনস্তাত্বিক খেলায় নেমেছে। প্রতি মুহূর্তে ওদের ওপর সাইকোলজিক্যাল প্রেশার একটু একটু করে বাড়িয়েই যাচ্ছে। যেন দেখতে চায়, কতখানি চাপ সহ্য করতে পারে তথাকথিত 'সুপারকপ'।

"আপনি ল্যাবে ফিরবেন তো?" অধিরাজ আহেলির দিকে তাকিয়েছে, "ফিরবেন কীসে?"

"আমি অ্যাম্বুলেন্সেই চলে যাব।"

"ঠিক আছে।" সে একটু থেমে ধোঁয়া গিলে নিয়ে বলল, "আমি আর অর্ণবও আপনার

অ্যাম্বুলেন্সের পেছন পেছন ল্যাব অবধি যাব। আপনি সেফলি ল্যাবে ঢুকে গেলে ব্যুরোয় ফিরব।" বলতে বলতেই এবার তার চোখ অর্ণবের দিকে ফিরেছে, "অর্ণব, কালকের ঐ অপদার্থ নাইটগার্ডটিকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করো। তবে তার জায়গায় নতুন কোনো অপরিচিত গার্ড চাই না। ব্যুরো থেকেই কোনো দু-জন জাঁদরেল লেডি অফিসারকে ওঁর সিকিউরিটির জন্য লাগিয়ে দাও। ওঁদের অর্ডার দাও যেন আজ রাত থেকেই ছায়ার মতো মিস্ মুখার্জির সঙ্গে লেগে থাকেন। একটুও যদি ঢিলেমি দেয়, তবে ওঁদেরও সাসপেন্ড করতে আমি দু-বার ভাবব না! আমাদের টিমের লেডি অফিসারদের পাওয়া যাবে না। প্রণবেশদার টিম থেকে নিয়ে নাও। ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলে নেব।"

"ওকে স্যার।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল। প্রণবেশ লাহিড়ীর মতো ডেয়ারডেভিল অফিসারও সমস্ত খবর শুনে আঁতকে উঠলেন। লেডি অফিসারের ব্যাপারে কোনো আপত্তি তো করলেনই না উলটে বললেন, "আমি দুই অফিসারকেই বলে রাখছি সন্দেহজনক কাউকে দেখলে যেন এক সেকেন্ডও অপেক্ষা না করে ডাইরেক্ট শ্যুট করে দেয়। ইনফ্যাক্ট তোমরা মিস্ টুইঙ্কল অরোরাকে নিয়ে নাও। নামেই লেডি অফিসার, আসলে ব্যাটাছেলেরও বাবা। অনেকে ওকে আড়ালে আমার ফিমেল ভার্সানও বলে।"

"টুইঙ্কল অরোরা!" অধিরাজ আমতা আমতা করে, "ইনি তো বাঙালি নন। ইনফ্যাক্ট পাঞ্জাবি নামই মনে হচ্ছে। শিখও হতে পারেন।"

"শিখই। মহম্মদ ঘোরি বা বাবরের আমলে ওর কোনো পূর্বপুরুষ পাঞ্জাবে থাকত। তবে বিগত চার পুরুষ ধরে ওরা কলকাতাতেই থাকে। টুইঙ্কলের বাবা রীতিমতো কালীপুজো করেন। ওঁর মেয়েও সাক্ষাৎ চণ্ডীর থেকে কম কিছু নয়। মেয়েটার চেহারায় পাঞ্জাবি ছাপ আছে ঠিকই, কিন্তু এছাড়া পাঞ্জাবের 'প'-ও নেই। আমার মনে হয়, ওকে টিমে নিয়ে নিলে ভালোই হবে। ও মুখে বিশেষ কথা বলে না, হাতে বলে।"

"ওকে।"

অর্ণব প্রণবেশের ফোন কাটতে-না কাটতেই অধিরাজের ফোন সশব্দে বেজে উঠল। ঘন্টু ফোন করছে। ও আর যাদব কথামতো অনেকক্ষণ আগেই ব্যুরোয় পৌঁছে গিয়েছে। প্রায় ঘণ্টাদেড়েক হল, ওখানেই বসে অপেক্ষা করছে। ঘন্টু একটু সতর্ক স্বরে জানতে চায়, "স্যার, আপনারা কোথায়? সব ঠিক আছে তো? আপনি তো কখনও এত লেট হন না! তার ওপর দেখছি ব্যুরোর বাইরে প্রেসের লোক গিজগিজ করছে....!"

"কিচ্ছু ঠিক নেই।" অধিরাজ তাকে বলল, "তোরা আর একটু অপেক্ষা কর। জরুরি কথা আছে। আমাদের ফিরতে আরও একটু দেরি হবে। ততক্ষণ কোনোভাবে টাইমপাস করে নে...!"

"আপনারা যখন ব্যস্ত আছেন তাহলে দুপুরের দিকে আসি?" সে হালকা স্বরেই বলে, "বাড়ি গিয়ে, দুটো রুটি খেয়ে, একটু ঘুম দিয়ে আসি তবে। আপনারাও ফিরে আসুন।"

অধিরাজ এবার ধমক দিয়ে ওঠে, "তোর রুটি আর ঘুমের নিকুচি করেছে। ব্যুরো থেকে এক পাও বেরোবি না! তুই যে এখনও বেঁচে আছিস তা তোর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য! রতিবৌদিকে বিধবা, আর পুপুলকে যদি পিতৃহীন না করতে চাস, তবে পেটে কিল মেরে ওখানেই বসে থাক। যাদবকেও বেরোতে বারণ কর। আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি!"

"ওকে স্যার।"

ঘন্টু আর কথা না বাড়িয়ে ফোন কেটে দেয়। অধিরাজ বুঝল, এখনও ইসমাইল আর রকির খবর ওদের কানে পৌঁছয়নি। ওরা সবাই আলাদা আলাদা কাজ করে। নেটওয়ার্কও আলাদা। মুখ চেনা, ঐ অবধিই। কারোর সঙ্গে কারোর সম্পর্ক বা নিতান্তই পেশাদারি বন্ধুত্বটুকুও নেই। কেউ কারোর খবর বিশেষ রাখে না। নিজেদের কাজের পেছনেই এত বেশি ব্যস্ত থাকে যে অন্য কারোর খবর নেওয়ার সময়ও পায় না। তাছাড়া ইনফর্মারদের মৃত্যুর খবর এখনও লিকড হয়নি। মিডিয়ার কাছে হয়তো খবর আছে যে আজ ভোরে বার্নিং

শিখ দুটো লাশ ফেলে দিয়েছে, সেজন্যই ব্যুরোর বাইরে অত ভিড় জমিয়েছে। কিন্তু মৃতদের পরিচয় এখনও জানতে পারেনি।

সে ফোনটা বুকপকেটে রাখে। তার চোয়াল এখন লৌহকঠিন। হোমিসাইড এক পা এক পা করে ক্রমাগতই পেছোচ্ছে! কিন্তু আর পেছোতে দেওয়া যাবে না। এবার বার্নিং শিখকে ব্যাকফুটে নিয়ে যাওয়ার পালা। অনেক ধাক্কা মেরেছে সে, এবার পালটা ধাক্কা ওকে দিতেই হবে। তার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত অধিরাজ। ছলে, বলে, কৌশলে যে করেই হোক থামাতেই হবে লোকটাকে।

অ্যাম্বুলেন্স ততক্ষণেও এসে পৌঁছয়নি। ড্রাইভার জানিয়েছে; আরও চার-পাঁচ মিনিট হয়তো লাগবে। ওরা তিনজন ডঃ চ্যাটার্জির বাড়ির সামনেই চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এই পরিবেশে আর যা-ই হোক, খোশ-গল্প বা খেজুরে আলাপ করা যায় না। তবু অর্ণব মিস্ মুখার্জির সঙ্গে যতটা ফ্রি, অধিরাজ একেবারেই নয়। তৎস্বত্ত্বেও সে যেন কিছু ভেবে দু-একবার মুখ খুলতে গেল। বেশ কয়েকবার ওষ্ঠাধর ফাঁক হল ঠিকই, কিন্তু কী ভেবে যেন বারবার আটকে যাচ্ছে ও। আহেলি সেটা লক্ষ্য করেই জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কিছু বলবেন অফিসার ব্যানার্জি?"

সে একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "যদিও এখন এসব আলোচনা করার সময় নয়। অ্যাকচুয়ালি, মাথার ওপরে বাহাত্তর ঘণ্টার খাঁড়াটা না থাকলে হয়তো বলতামও না। কিন্তু আজ সকালে মদনের স্টেটমেন্টে একটা অদ্ভুত কথা জেনেছি। সেটা আপনাদের জানাবার জন্যই ফোন করেছিলাম... অথচ...!"

"কী কথা?"

অধিরাজ একটু আড়ষ্টভাবে হলেও সবই খুলে বলল। অবিকল মদন যেমন বর্ণনা দিয়েছিল। মেঠো গন্ধ, খড় কাটার সুবাস। শুনতে শুনতেই আহেলির চোখ চকচক করে উঠল। সে জানতে চায়, "মদন যখন ক্রাইমসিনে গন্ধটা পেয়েছিল, তখন বা তার আগে কি ওর নাক-চোখে ইরিটেশন হচ্ছিল? কোনোরকম জ্বালা জ্বালা ভাব?"

বিদ্যুৎ চমকের মতো মদনের কথাগুলো ঝলসে উঠল অধিরাজের মস্তিষ্কে। সে উত্তেজিত, "হ্যাঁ। ও বলেছিল ধোঁয়ায় ওর চোখ আর নাক খুব জ্বালা করছিল। যদিও

তখন কথাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি.....!"

"মাই গড!" আহেলি সবিস্ময়ে আপনমনেই বলল, "এটা আগে আমরা ভাবিনি কেন। ইনফ্যাক্ট মাথাতেই আসেনি!"

"কোনটা?"

"ফসজিন!"

"ফসজিন?"

"হ্যাঁ।" মেয়েটা প্রচণ্ড এক্সাইটেড, "মিঃ ব্যানার্জি, স্যার সেদিন আপনাকে অসোউইক ফোর্টের গল্প বলছিলেন না? যেখানে ক্লোরিন আর ব্রোমিনের কেমিক্যাল অ্যাটাক হয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"স্যার তখনও কনফার্ম করতে না পারলেও আসল মার্ডার ওয়েপনের খুব ক্লোজ চলে গিয়েছিলেন।" সে একনিঃশ্বাসে বলে যায়, "ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ানে কেমিক্যাল ওয়েপন হিসাবে তিনটে গ্যাস বেশি ইউজ হয়েছিল। ক্লোরিন, ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাস। ক্লোরিনের তুলনায় ফসজিন অনেক বেশি বিধ্বংসী। ফসজিন একাই তো প্রায় এক মিলিয়নের কাছাকাছি লোক মেরেছিল। আর একমাত্র ওর গন্ধটাই অবিকল মেঠো গন্ধ কিংবা খড়ের গন্ধের মতো! প্রথমে এতটাই হালকা আর ন্যাচারাল লাগে যে বোঝাই যায় না। যতক্ষণে বোঝা যায়, ততক্ষণে কিছু করার উপায়ই থাকে না। অলমোস্ট সাইলেন্ট কিলার।"

"এটাই তবে মার্ডার ওয়েপন! ফসজিন!"

অধিরাজ স্তম্ভিত। কী লেভেলে প্ল্যানিং করেছে খুনি! কয়েকঘণ্টা আগেও আইভি-র ধারণা ছিল যে হয়তো এটা নতুন কোনো মারণাস্ত্র। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল 'পুরোনো চালই ভাতে বেড়েছে!' অস্ত্রটা নতুন নয়, বরং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলের! এত পুরোনো অস্ত্রকে কেউ আধুনিক সময়ে ব্যবহার করবে সেটা ওদের ভাবনা চিন্তারই বাইরে ছিল। এ তো রীতিমতো জিনিয়াস প্ল্যান।"

"মেইন অস্ত্রটা ফসজিনই।" আহেলি একটু চিন্তা করে বলে, "কার্বনিল ক্লোরাইড। সেইজন্যই আইভি বডি ফ্লুইডে কার্বাময়েল ক্লোরাইডের মাত্রা বেশি পেয়েছিল। বাট, আমার আশঙ্কা ফসজিনের সঙ্গে খুনি মাস্টার্ড গ্যাসের কম্পাউণ্ডও কিছুটা মিশিয়েছে। শিওর নই। তবে শ্বাসনালীর মারাত্মক কেমিক্যাল বার্ন দেখে আমার ইনস্টিংট বলছে। ফসজিন একাই একটা মারাত্মক প্রাণঘাতী গ্যাস। লাশের যা অবস্থা দেখেছি, তাতে বোঝা যায় যে সে ফ্যাটাল ডোজের চেয়েও অন্তত কয়েকগুণ বেশি 'পিপিএম' ফসজিন ইউজ করেছে। খুব তাড়াতাড়ি কাউকে মারতে হলে কুড়ি বা ত্রিশ পিপিএম একেবারে 'রামবাণ।' কিন্তু আমি অবাক হব না, ওটার পরিমাণ যদি তারও অনেক বেশি হয়। কার্বনিল ক্লোরাইড বা ফসজিন এককথায় চোকিং গ্যাস। বার্নিং সেনসেশন দেয়। তার সঙ্গে লাংসের ভেতরে ফ্লুইডও ডেভলপ করে যার জন্য মানুষ নিঃশ্বাস নিতে না পেরে হাঁকপাঁক করতে করতে মরে। আমরা মৃতদেহের লাংসে ফ্লুইডও পেয়েছি। ওটা প্রচুর পরিমাণে ইনহেল করলে শ্বাসনালীর সফট্ টিস্যুগুলো পুড়তেই পারে। তার ওপর হাওয়ায় যদি জলীয় বাষ্প থাকে, তবে বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে ফসজিন কিছুটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও তৈরি করে, যেটা মানুষকে ভেতর থেকে পোড়াতে থাকে এবং মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। ফসজিনের আরও একটা মারাত্মক এফেক্ট, এটা ইনহেল করলে ফুসফুস ফুলতে থাকবে, মনে হবে কেউ লাংসটাকে ছিঁড়ে নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই লাংসের সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড ভেসেলগুলোও ফুলবে, এবং একসময় ফেটে গিয়ে ইন্টারনাল ব্লিডিং শুরু করবে। ফলস্বরূপ ব্লাড ভমিটিং হতে বাধ্য। কিন্তু ডেডবডিগুলোর ফুসফুস আর রেস্পিরেটরি ট্র্যাকের যা অবস্থা তাতে মনে হয়, ফসজিনকেই মাস্টার্ড গ্যাসের কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টসের সঙ্গে সামান্য ব্লেন্ড করে আরও বেশি মারাত্মক করে ছাড়া হয়েছে। মাস্টার্ড গ্যাসও মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে ওস্তাদ! ইন ওয়ান ওয়ার্ড, কিলার নতুন বোতলে পুরোনো মদ পাঞ্চ করেছে। সেখানে মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট ফসজিন, তার সঙ্গে মাস্টার্ড গ্যাসের কিছু কেমিক্যালও রয়েছে। বাঁচার কোনো সুযোগই নেই!"

"যদি ফসজিনই লেথাল হয়, তবে মাস্টার্ড গ্যাস কেন মিশিয়েছে? আর মাস্টার্ড গ্যাসও যথেষ্ট মারাত্মক, তবে ফসজিনের দরকার কী ছিল!"

"দুটো গ্যাসই ভয়াবহ।" আহেলি বুঝিয়ে বলে, "কিন্তু মাস্টার্ড গ্যাস এক্সপোজার প্রচণ্ড পেইনফুল হলেও মর্টালিটি রেট মাত্র দু থেকে তিন পার্সেন্ট। কারণ মাস্টার্ড গ্যাস ফসজিনের মতো কালারলেস নয়। ওটার একটা ইয়েলোইশ কালার রয়েছে যেটা সাদা চোখেও ধরা পড়ে। গন্ধটাও সর্ষে, পিঁয়াজ বা রসুনের মতো ঝাঁঝালো। তার ওপর প্রথমেই ওটা চামড়ার ওপর কেমিক্যাল বার্ন দিয়ে বসে থাকে। অনেক সময় থার্ড ডিগ্রি বার্নও দেয়। তবে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। আপনিই ভাবুন, কেউ যদি হালকা মাস্টার্ড কালারের একটা ধোঁয়া চোখের সামনে দেখতে পায়, উগ্র গন্ধ পায় এবং হাত-পায়ের চামড়ায় ফোস্কা পড়তে দেখে, তবে কি সে ওখানে আরও বেশি পুড়ে মরার জন্য বসে থাকবে? দেহ কিছুটা পুড়ে গেলেও প্রাণ বাঁচাতে জায়গা ছেড়ে পালাবে। বেশিমাত্রায় যন্ত্রণাদায়ক হওয়ার কারণেই এটা মানুষকে অ্যালার্ট করে। এই কেমিক্যাল বার্ন আবার কিওর-ও করা যায়। তবে অদূর ভবিষ্যতে ঐ কেমিক্যাল বার্ন থেকে ক্যান্সার হতে পারে। তার জন্য হয়তো কয়েক বছর বা কয়েক দশক লাগবে। বার্নিং শিখ কি ততদিন অপেক্ষা করবে? কবে রাম রাজা হবে, তবে সীতা বনে যাবে!"

"না। তা সে করবে না।" সে একটু ভাবল, "তবে সেক্ষেত্রে মাস্টার্ড গ্যাসকে সিনে আনার দরকার কী? ফসজিনই তো যথেষ্ট!"

“ফসজিন যথেষ্ট। কিন্তু ওটা আবার এইরকম মারাত্মক কেমিক্যাল বার্ন দেয় না। খুনি মৃত্যুটাকে চরম যন্ত্রণাদায়ক, ফাস্ট আর গ্রুসাম করার জন্যই দুটোর কম্বিনেশন ইউজ করেছে। তবে বেসটা নিঃসন্দেহে ফসজিন। ফসজিন একটু দেরিতে কাজ শুরু করে। খুব বেশি পরিমাণ হলেও অনেক সময় মরতে কমসে কম তিন চার ঘণ্টা, ক্ষেত্র বিশেষে ছ-ঘণ্টা লাগেই। অনেক কেসে দেখা গেছে, লেথাল ডোজ এক্সপোজারের পরও ভিকটিম চব্বিশ ঘণ্টা অবধি সার্ভাইভ করেছে। সেইজন্যই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো মাস্টার্ড গ্যাসটাকেও সে মিলিয়ে নিয়েছে। দুটো গ্যাসই পোড়ায়। মাস্টার্ড গ্যাসটাকে সে এমনভাবে ব্যবহার করেছে যাতে সেটা স্কিনের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট না করে শুধু রেস্পিরেটরি ট্র্যাকটা পোড়ায়। আমার ধারণা, সেকেন্ড গ্যাসটা তুলনায় অনেকটাই কম মাত্রায় ছিল। যার জন্য ওটা শুধু নাক আর লাংসের মিউকাস মেমব্রেন আর সফট টিস্যুকেই পুড়িয়েছে। আমাদের বডির স্কিন তুলনামূলকভাবে পুরু। তাই আউটার স্কিনে বিশেষ কিছু হয়নি। একবার ভেবে দেখুন, জ্যান্ত পুড়ছিলেন ওরা সবাই, তার মধ্যে ফসজিন লাংসে ফ্লুইড ডেভলপ্ করে পুরো চোকিং এফেক্ট দিচ্ছিল, ফুসফুসটাকে ফুলিয়ে প্রায় ছিঁড়েই ফেলছিল। আপনার ভেতরে আগুন লেগেছে, তার ওপর কেউ আপনার গলা টিপে ধরেছে। কেমন লাগবে!”

অধিরাজ প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারল না। সমস্ত শব্দ, বিশেষণই সে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু বলল, “গ-ড!”

“শুধু তাই নয়, ফসজিন সহজে ধরা পড়ে না। ইনফ্যাক্ট বাহাত্তর ঘণ্টায় তো প্রায় অসম্ভব।” সে জানায়, “নেহাৎ আপনার আই-উইটনেস স্মেলটা ডিটেক্ট করে ফেলেছে। নয়তো আমরা স্রেফ হাতড়ে বেড়াতাম, ততক্ষণে কিলার বাজি মাত করে বেরিয়ে যেত! আপনি আমায় একটু সময় দিন। আমি ল্যাবে ফিরেই আবার

ডেডবডিগুলোর ইনফেক্টেড টিস্যু ফ্লুইড এর হাই পারফরম্যান্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি, মাস স্পেকট্রাল স্টাডি করে যত তাড়াতাড়ি আমার পক্ষে সম্ভব, আপনাকে কনফার্ম করছি। আজ রাতের মধ্যেই জানাতে পারব আশা করি।”

“ওকে ফাইন।” অধিরাজ একটু চিন্তিত স্বরেই বলে, “এর কোনো অ্যান্টিডোট আছে? আমাদের দুই লেডি অফিসার প্রবাবল ক্রাইমসিন পাহারা দিচ্ছেন। ওদের জীবনও বিপন্ন।”

“না। ফসজিনের কোনো অ্যান্টিডোট নেই।” সে মাথা নাড়ল, “ইনফ্যাক্ট সালফার মাস্টার্ড বা মাস্টার্ড গ্যাসেরও নেই। আপনাদেরই প্রচণ্ড অ্যালার্ট থাকতে হবে অফিসার। যতদূর বুঝেছি, যদি এই ভয়াবহ কম্বিনেশন ইনহেল করার দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভিকটিমদের বের করে আনতে না পারেন, বা গ্যাসটাকে থামাতে না পারেন তবে ওদের মৃত্যু স্বয়ং ঈশ্বরও ঠেকাতে পারবেন না! গ্যাস মাস্ক ইউজ করতে পারেন ঠিকই, তবে ভিকটিমরা যদি চব্বিশ ঘণ্টাই সবাই গ্যাস মাস্ক পরে ঘুরতে শুরু করে তবে বার্নিং শিখ অন্য কোনো মার্ডার ওয়েপন বেছে নেবে। তাছাড়া ঘরের মধ্যে লোকে গ্যাস মাস্ক পরে আছে, সেটাও ঠিক প্র্যাকটিক্যাল নয়।”

“না। সেটা সম্ভবও নয়।” অধিরাজ বলে, “বরং প্রাণ বাঁচানোর জন্য আর কী কী করণীয় সেটাই বলুন।”

“প্রথমত, দশ থেকে পনেরো মিনিটের ডেডলাইনটা মনে রাখবেন। দ্বিতীয়ত, অ্যাটাক হওয়ার পর প্রথমেই ভিকটিমদের টেনে খোলা জায়গায় নিয়ে আসবেন এবং সারা গায়ে জল ঢেলে দেবেন। যাতে ওদের স্কিনে লাগা ফসজিন ক্লিন হয়ে যায়। আইদার, বাড়ির সমস্ত দরজা জানলা খুলে ফ্যান চালিয়ে দেবেন, আগে ভিকটিমদের স্ট্রেট বাড়ির বাইরে, খোলা হাওয়ায় নিয়ে যাবেন। নিজেরা মাস্ক ইউজ করবেন। ফসজিনের ডেন্সিটি আর মলিকিউলার ওয়েট ক্লোরিনের চেয়েও অনেক বেশি। ক্লোরিন যেখানে হাওয়ার তুলনায় আড়াই গুণ ভারি, সেখানে ফসজিনের ডেন্সিটি তিন, সাড়ে তিন, এমনকি তারও বেশি হতে পারে। কিন্তু ক্লোরিনের তুলনায় ফসজিন অনেক ভদ্র গ্যাস।”

“মানে?” সে একটু কনফিউজড, “আগের দিন ডকও বলেছিলেন যে ক্লোরিন ভারি বলে

ওটার কিছু ড্র-ব্যাক আছে। আবার আপনি বলছেন ফসজিন ক্লোরিনের চেয়েও ভারি, অথচ ভদ্র! এক্ষেত্রে হেভি হওয়ার ড্র-ব্যাক কোথায় গেল?”

“আপনার যুক্তিও সঠিক। আবার আমার যুক্তিটাও। একটা গোদা উদাহরণ দিয়ে বললে আপনি খুব সহজেই বুঝবেন।” আহেলি একটু হাসল, “আমি জানি না, আপনারা ট্রেনে খুব একটা যাতায়াত করেন কিনা। কখনও ট্রেনের হকার, বা গানওয়ালা ভিখিরিদের দেখেছেন?”

“আজ্ঞে।” অধিরাজ জানায়, “ওটা খুবই কমন দৃশ্য। ওটা দেখার জন্য ডেইলি ট্রেনে যাতায়াত না করলেও চলে।”

“গুড।” সে বলল, “সচরাচর এইসব হকার বা গানওয়ালাদের মধ্যে দুটো প্রজাতি থাকে। প্রথম জাতের হকার বা ভিখারিরা খুব স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজে যাতায়াত করে। তারা জিনিসপত্র বিক্রি করতে করতে বা গান গাইতে গাইতে আরামসে এক কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য কম্পার্টমেন্টে চলে যায়। যাত্রীদের ঘাড়ে চড়ে বসে না। হয়তো চেহারায় তারা হেভিওয়েট। কিন্তু নিজের বক্তব্য বা গান শেষ হলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তারা নিজে থেকেই চলে যায়। এবং শেষপর্যন্ত নিজের স্টপে চুপচাপ নেমেও পড়ে।” আহেলির বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত চোখে রোদ্দুর ঝিলিক দিল, “কিন্তু আর একদল হকার বা ভিখিরি আছে যারা হয়তো আদৌ হেভিওয়েট নয় বা তুলনামূলক কমজোরি। অথচ তারা কিছুতেই সহজে নড়তে চাইবে না! কম্পার্টমেন্টের প্রত্যেকটি মানুষের কানের কাছে চেঁচিয়ে বারবার ঘ্যানঘ্যান করে নিজের বক্তব্য পেশ করবে। পারলে ঘাড়ে উঠেই টাকা আদায় করে। যতক্ষণ না আপনি বিরক্ত হয়ে তাকে তেড়েমেড়ে গাল দিয়ে বা চড় থাপ্পড় মেরে তাড়াচ্ছেন, ততক্ষণ সে অন্য কামরায় যেতেই চাইবে না। ফসজিন হল প্রথম প্রজাতির হকার বা গানওয়ালা যারা ভারি হলেও সহজে চলে যায়। কিন্তু ক্লোরিন আবার দ্বিতীয় প্রজাতির মতো। যতক্ষণ না আপনি অতিষ্ঠ হয়ে তাকে গাল দিচ্ছেন বা অর্ধচন্দ্র প্রদান করছেন, ততক্ষণ সে নড়ার নামই করে না। মলিকিউলার ওয়েট বা ডেন্সিটি ফসজিনের তুলনায় কম হলেও ক্লোরিন সর্বক্ষণই কিছু না কিছুর সঙ্গে বিক্রিয়া করার জন্য অস্থির হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। হাওয়ায় বা পরিবেশে যতরকম যা পাবে, সবকিছুর সঙ্গেই সে কিছু না কিছু বিক্রিয়া করে বসে থাকবে। রি-অ্যাকশন দেবে। এই বদখত স্বভাবের জন্যই সে ঐ বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের উপস্থিতি টিকিয়ে রাখে, এবং সেটা লোকে টেরও পায়। কিন্তু ফসজিনের সে বদভ্যাস নেই। তার বিচরণ অনেক সহজ। জানলা দরজা খুলে দিলেই সে বেরিয়ে যাবে। ফ্যান চালিয়ে দিলে তো আরও ভালো। ক্লোরিনের মতো নিজের অস্তিত্বকে যেন তেন প্রকারেণ টিকিয়ে রাখার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। ফসজিন সহজে নিউট্রালাইজও হয়ে যায়। তার ওপর এখানে বার্নিং শিখ ডাবল মাস্টারস্ট্রোক খেলে বসে আছে।”

“কীরকম?”

“জানলা দরজা খুলে তো দিয়েইছে, উপরন্তু লোকগুলোকে পোড়ানোর জন্য সে আগুনও জ্বেলেছে। কিছুটা ফসজিন যদি ঘনত্বের জন্য মেঝের দিকে থিতিয়েও পড়ে, তবে যে মুহূর্তে আগুন জ্বলল সেই মুহূর্তে তাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ আগুনের হিটে ফসজিন ডিকম্পোজ হয়ে যায়। স্রেফ কার্বন মনোক্সাইড, সামান্য ক্লোরিন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং কার্বন টেট্রাক্লোরাইডে ভেঙে যায় যেগুলো বাতাসের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওর অস্তিত্বই রাখে না!”

“ব্রিলিয়ান্ট।” অধিরাজ বলল, “হ্যাঁ। তারপর যা বলছিলেন বলুন। ফ্যান খুলে দেব। তারপর?...'

“হ্যাঁ। ফ্যান অন করবেন। ফ্যানের হাওয়ায় গ্যাসটা খোলা দরজা জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবে। পুরোটা যদি নাও যায়, তবে নীচে থিতিয়ে পড়বে। ঐ অবস্থায় ওটা হার্মফুল নয়। বার্নিং শিখের মতো আগুনও জ্বালাতে পারেন। তাছাড়া এখন শীত। ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেলে ফ্যাটাল থাকবে না। অন্যান্য কম্পাউণ্ডের সঙ্গে মিশে নিউট্রালাইজড হয়ে যাবে। যেহেতু শীত, আশেপাশের বাড়ির জানলা দরজা বন্ধ থাকার দরুণ অন্য কোনো বাড়িতেও

ঢুকবে না। এরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভিকটিমদের হসপিটালাইজ করতে হবে। নয়তো ক্যাজুয়ালটি অবধারিত। আর সম্ভব হলে লেডি অফিসারদের হাতের পাঁচ, একটা করে গ্যাস মাস্ক দিয়ে দিতে পারেন যাতে প্রয়োজনের সময় তারা আত্মরক্ষা করতে পারেন।"

"ওকে।" অধিরাজ আপনমনেই বিড়বিড় করে, "কিন্তু মালটা ঘরের ভেতরে ঢুকছে কী করে? কোন্ রাস্তায় এ জাতীয় বিষাক্ত গ্যাস ঢোকানো সম্ভব।"

"এটা আমি বলতে পারব না।" সে চিন্তায় পড়েছে, "আমিও বুঝতে পারছি না যে কেউ দু-দুটো গ্যাসকে মিক্স করে কী করে বন্ধ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না! এটা একরকম ইম্পসিবল যার জন্য আমরা ক্লোরিনের কথা বললেও ওরকম কোনো ওয়েপনের কথা ভাবিনি। ক্লোরিন সহজলভ্য, কিন্তু বাকি দুটো অত সহজে পাওয়া যায় না! ওগুলো কেমিক্যালি তৈরি করতে হয়, কোনো গ্যাসই প্রাকৃতিক নয়! তাছাড়া মাস্টার্ড গ্যাসের কম্পাউণ্ডের অস্তিত্ব যদি থাকেও তবু সেটা রুম টেম্পারেচার বা নর্মাল টেম্পারেচারে কাজই করবে না। অ্যাকচুয়ালি রুম টেম্পারেচারে ওটা লিকুইড সালফার মাস্টার্ড হয়ে যাবে, গ্যাস ফর্মে থাকবেই না। সেক্ষেত্রে ইনহেল করার কোনো গল্পই নেই। ওর জন্য হিট মাস্ট। মেইনলি ওটাকে ভেপোরাইজ করার জন্যই দুশো কুড়ি থেকে দুশো আঠাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হিট প্রয়োজন। যদি ধরেও নিই যে মাস্টার্ড গ্যাসের পরিমাণ খুবই কম ছিল, সেক্ষেত্রেও দেড়শো থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস হিট তো লাগবেই। আবার ফসজিন সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস রুম টেম্পারেচারেই। সেভেন্টি ডিগ্রি ফারেনহাইটেই ওটা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। মানে ধরুন ওই একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেটা মোটামুটি রুম টেম্পারেচার। একটাই ঘরের মধ্যে রুম টেম্পারেচার একই সঙ্গে বাড়ছে, কমছে, এটাই বা কীভাবে সম্ভব! কলকাতার শীতে বাড়িতে কেউ হিটার জ্বালাচ্ছে, এমন তো শুনিনি। তবে একই সঙ্গে একই জায়গার উত্তাপ একুশ ডিগ্রি আর মিনিমাম দেড়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস কী করে হয়? দুটো গ্যাস তবে মিক্স হচ্ছে কী করে?"

"মিক্স হয়তো হচ্ছেই না। খুনি আলাদা আলাদা দুটো গ্যাসকেই ঐ ঘরে ছেড়ে দিয়েছে। একটা নয়-ইন দ্যাট কেস তার কাছে দুটো গ্যাসের কন্টেনার ছিল। একটা ফসজিনের, অন্যটা মাস্টার্ড গ্যাসের।" সে একটু ভাবল, "কিন্তু তার থেকেও বড়ো চিন্তার বিষয়, লোকটা নিজে ক্রাইম স্পটে ঢুকছে কী করে?"

আহেলি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়, "কেন? প্রত্যেক কেসেই তো ও কোনো না কোনো রূপে ফ্যামিলিগুলোর সঙ্গে অ্যাটাচড থাকছে। ঘরের ভেতরে যার অবাধ যাতায়াত, সে তো যে কোনো সময়ে সাবানে বা অন্য কিছুতে চাবির ছাপ তুলে নিয়ে একটা ডুপ্লিকেট কী বানিয়ে নিতেই পারে।"

"নিশ্চয়ই পারে।" সে সহমত, "কিন্তু বেডরুমেরও ডুপ্লিকেট কী বানাবে? মানে বেডরুমের দরজা লোকে বন্ধ করে ঠিকই, কিন্তু একেবারে তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে এমন শুনিনি। এই কেসে যাদের ওপর অ্যাটাক হয়েছে, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেছিলেন। সেটা ল্যাচের মাধ্যমে হতে পারে, পাতি ছিটকিনির মাধ্যমেও হতে পারে। ইন দ্যাট কেস, খুনি মেইন ডোর ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে খুলে ঢুকতেই পারে। কিন্তু বেডরুমের ল্যাচ বা ছিটকিনি খুলেছে কী করে! কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বডিগুলোকে এক জায়গাতেই পাওয়া গিয়েছে। বেডরুমে নয়, হয় হলঘরে, নয়তো অন্য কোনো ঘরে। মৃতদেহগুলো একসঙ্গে ছিল ও তাদের নেকলেসিং করা হয়েছিল। লাশগুলোকে টেনে এনে নেকলেসিং করতে হলে তো বার্নিং শিখকে প্রত্যেকটা বন্ধ বেডরুমের মধ্যে ঢুকতে হবে। সেটা সে করল কী করে?"

"এমনও তো হতে পারে যে ভিকটিমরা বেডরুমে ছিলেন না। বা গ্যাসটা অন্য কোথাও ছিল?"

"বোধহয় না।" অধিরাজ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে, "দিল্লি, কানপুর বা বেঙ্গালুরুতে যে ক-জন সার্ভাইভার ছিলেন, প্রত্যেকেরই বয়ান একইরকম। তাঁরা দেখেছিলেন যে তাঁদের পুত্র-

পুত্রবধূ বা কন্যা-জামাতা, স্ত্রী ও নাতি-নাতনি ডিনারের পরেও দিব্যি ঘরের মধ্যে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছিলেন। অর্থাৎ, আফটার ডিনারও তাঁরা বেঁচে ছিলেন। জীবিত মানুষটি তাঁদের শেষ দেখেছেন, যখন তাঁরা নিজেদের বেডরুমে গিয়ে ল্যাচ, বা ছিটকিনি তুলে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেছেন। আপনার থিওরি যদি মেনে নিই, তবে ফসজিন ও মাস্টার্ড গ্যাসের ডুয়াল কম্বিনেশন প্রথম দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই তাদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। আমার যতদূর ফসজিন সম্পর্কে জ্ঞান, তাতে ওই গ্যাসটায় মৃত্যু হতে হলে গোটা সময়টাই ওটাকে ইনহেল করতে হয়। ওটার আওতা থেকে বেরিয়ে গেলে মরার চান্স কমে যায় বা ইনস্ট্যান্ট ডেথ হয় না। সেটা হতে গেলে ভিকটিমদের জন্য বেডরুমটাকেই গ্যাস চেম্বার হতে হয়, যেখান থেকে বেরোনোর সময় বা সুযোগ কোনোটাই তাঁরা পাননি। কারণ নিশ্চয়ই তাদের হলঘরে বা সংলগ্ন অন্য কোনো রুমে এসে ঘুমোনোর কোনো প্ল্যান ছিল না। আর অন্য কোথাও গ্যাসটা থাকলে বৃদ্ধ মানুষটিও নিস্তার পেতেন না। গ্যাস তো স্থির হয়ে থাকে না। কখনও না কখনও ঐ বৃদ্ধের ঘরেও চলে যেত। তবে মৃতদেহগুলো অন্যরুমে এসে পৌঁছল কী করে? যদি ধরে নিই, যে তারা ছটফট করতে করতে কোনোমতে হলঘর বা অন্য কোনো ঘর অবধি নিজেরাই এসে পৌঁছেছিলেন, তবে অন্তত তেমন কোনো চিহ্ন থাকত! তেমন কিছুই নেই। ডঃ চ্যাটার্জির বর্ণনা যদি মেনে নিই, তবে দৌড়ে বেরিয়ে আসা তো দুর, স্পট থেকে নড়াচড়ার মতো শক্তিও তাঁদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তাহলে একটাই সলিউশন, মরে যাওয়ার পর ডেডবডিগুলোকে টেনে আনা হয়েছিল। বার্নিং শিখ নিজেই প্রত্যেকটা বেডরুমে ঢুকে লাশগুলোকে বের করে এনেছিল। এটা কী করে সম্ভব? মেইন ডোর না হয় চাবি দিয়ে খুলল, বেডরুমের ল্যাচ, ছিটকিনি বাইরে থেকে কোন্ ম্যাজিকে সে খুলেছিল?”

“ভিকটিমরা দরজা খুলে বা ভেজিয়েও তো শুতে পারেন?”

অর্ণবের প্রশ্ন শুনে এই প্রথম একটু হাসির রেখা দেখা দিল তার মুখে, “বোধহয় না। কারণ জীবিত ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই তাঁদের ল্যাচ টেনে দেওয়ার শব্দ স্বকর্ণে শুনেছিলেন। আর দরজা খোলা থাকলে তাঁদের মৃত্যুই হত না। গ্যাস খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেত। যায়নি বলেই বার্নিং শিখকে সমস্ত দরজা-জানলা খুলে দিতে হয়েছিল। গ্যাসটাকে বের করার যে রাস্তা জাস্ট এইমাত্র মিস্ মুখার্জি বললেন, সেটাই সে অবলম্বন করেছে। নয়তো ঐ ঘরে যে ঢুকত, সেই মরত। ইভেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বার্নিং শিখ নিজেও গ্যাস মাস্ক পরেই তবে ও ঘরে ঢুকেছে।”

আহেলি একটু ভেবে জবাব দেয়, “তবে হয়তো ল্যাচ বাইরে থেকে কেটে বা দরজা ভেঙে ঢুকেছে।”

“সরি সেনোরিটা।” অধিরাজ মাথা নাড়ল, “প্রত্যেকটা স্পটে দরজা, দরজার লক, ল্যাচ, সবই অক্ষত ছিল। নো ফোর্সড এন্ট্রি।”

“তবে?”

“এরকম অনেক তবে'র অ্যানসার আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।” অধিরাজ একটু দ্বিধাগ্রস্ত, “আপনার কোনো ভুল হচ্ছে না তো মিস্ মুখার্জি? ফসজিনটাই আপনি বেস বলছেন। কিন্তু তার সঙ্গে মাস্টার্ড গ্যাসের মিশেল আছে সে বিষয়ে কি আপনি নিশ্চিত?”

“টেস্ট না করা পর্যন্ত কোনো বিষয়েই আমি নিশ্চিত নই। হাতে সময় নেই, তাই প্রবাবিলিটিটা বলছি। আজ রাতের আগে সবটা কনফার্ম করা অসম্ভব।” এবার আহেলির মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ, “তবে যা-ই হোক, আপনারা জাস্ট আগুন নিয়ে খেলছেন! এভাবে দুটো মারাত্মক গ্যাসকে একদম নিখুঁতভাবে মিক্স করা কোনো সাধারণ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইভেন গ্যাস আইডেন্টিফায়েড হলেও সেটা সবার অজান্তে কী করে একটা বদ্ধ ঘরে ঢুকে যায়, সে প্রশ্নের উত্তর আমার কাছেও নেই। যদি অন্য কোনো উপায়ে ঢোকে তবে একটা রুমের টেম্পারেচার একই সঙ্গে একুশ ডিগ্রি এবং ন্যুনতম দেড়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস কীভাবে হয় তাও বলতে পারছি না! ওটা আপনাদেরই খুঁজে বের করতে হবে।”

অধিরাজ অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে তাকায়। রোদটা এখন অনেকটাই প্রখর! বেলা ক্রমশই বাড়ছে এবং সময় ক্রমশই কমছে! সে আস্তে আস্তে বলে, "এই ক্লোজড ডোর মিস্ট্রির হদিশ তো একমাত্র আমাদের জিনিয়াস কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারই দিতে পারেন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। যে করেই হোক, এই গেমটা আমাদের জিততেই হবে!"

* ***

(১৪)

একের পর এক দুঃসংবাদগুলো শুনতেই যাদব আর ঘন্টুর মুখ আর বুক দুই-ই শুকিয়ে গেল। ওরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু এরকম বীভৎস মৃত্যু কখনোই কাম্য নয়। অর্ণব ওদের দিকে তাকিয়েই নিশ্চিত হয়ে গেল, এই কেসে ওদের সাহায্যও আর পাওয়া যাবে না।

ওদিকে সি.আই.ডি. ব্যুরোর সামনে দমবন্ধ করা ভিড়। অধিরাজ আর অর্ণব যতক্ষণে আহেলিকে নিরাপদে ল্যাবে পৌঁছে দিয়ে ব্যুরোয় ঢুকল, ততক্ষণে গোটা কলকাতার মিডিয়া প্রায় ছেঁকে ধরেছে বিল্ডিংটাকে। সানগ্লাস পরা অধিরাজকে ঢুকতে দেখেই প্রায় সকলেই বুম আর ক্যামেরা নিয়ে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। অর্ণব ভিড়টাকে সরানোর চেষ্টা করতে করতে হিমশিম খাচ্ছে। চতুর্দিক দিয়ে ধেয়ে আসছে প্রশ্নের বাণ, "স্যার... আজ সকালেই নাকি বার্নিং শিখ আরও দুটো খুন করেছে।... তারা কারা?...শুনেছি ফরেনসিক এক্সপার্টের বাড়িতেও নাকি হামলা হয়েছে?... কাল রাতে অফিসার সরকারের গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টও হয়েছিল কি?...এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কী?...কী স্টেপ নিচ্ছেন আপনারা?... একটা লোক কিলোদরে খুন করে বেড়াচ্ছে আর আপনারা এখনও তাকে ধরতে পারছেন না?... প্রব্যাবল ভিকটিম কারা?...তাদের সিকিউরিটির কী ব্যবস্থা করেছেন?... স্যার, প্লিজ, একটা বাই....!"

যথারীতি অধিরাজ উদ্ধত ভঙ্গিতে গটগট করে কোনো দিকে না তাকিয়েই চলে যাচ্ছিল। ভিড়ও তার পেছন পেছন দৌড়চ্ছে। সে বিশেষ পাত্তাও দেয়নি। আচমকাই ভিড়ের মধ্য থেকে একটা চাপা কাতরোক্তি ভেসে আসতেই তার দৃষ্টি প্রেসের দিকে ফিরল। এক বয়স্ক ভদ্রলোক, সম্ভবত কোনো চ্যানেলের রিপোর্টারই হবেন, ধাক্কাধাক্কির চোটে পড়ে গিয়েছেন। অন্যান্য রিপোর্টারদের সেদিকে কোনো হুঁশই নেই। তারা এখনও একে অপরকে ঠ্যালা মেরে চলেছে। ভূপতিত মানুষটিকে দিব্যি পদপিষ্টও করে চলেছে। খেয়ালই নেই যে একজন প্রৌঢ় তাদের পায়ের নীচে পড়ে ব্যথায় কাতরাচ্ছেন।

"স্ট-প ই-ট।"

আচমকাই থমকে দাঁড়াল সে। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে সজোরে ধমকে উঠল, "কী শুরু করেছেন। একটা বাইট নেওয়ার জন্য মানুষ খুন করবেন? এখান থেকে সরুন... স-রু-ন বলছি।"

ধমক খেয়ে ভিড় যেন একটু তটস্থ হয়ে সরে দাঁড়ায়। অর্ণব এবং অধিরাজ দু-জনেই প্রায় ছুটে গেল বয়স্ক সাংবাদিকটির দিকে। তিনি তখনও ভূ-লুণ্ঠিত। হাত-পা কেটে ছড়ে গিয়েছে। চোখের চশমাটা ভিড়ের পায়ের চাপে ভেঙে টুকরো টুকরো। আস্তে আস্তে উঠে বসার চেষ্টা করছেন ভদ্রলোক। মুখে একটা অপ্রস্তুত হাসি। অধিরাজ তাঁকে সযত্নে হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। নরম স্বরে জানতে চায়, "আপনি ঠিক আছেন? আপনার তো চোট লেগেছে দেখছি! চশমাটাও ভেঙে গেল...।"

"না না! ঠিক আছে...।" ভদ্রলোক একটু হাসার চেষ্টা করেন, "আসলে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি তো! ধাক্কা সামলাতে পারিনি।"

"অর্ণব।" সে অর্ণবের দিকে ফিরল, "ওঁকে ব্যুরোর ভেতরে নিয়ে যাও। ফার্স্ট-এইড দেওয়ার বন্দোবস্ত করো।"

অর্ণব মাথা ঝাঁকিয়ে আহত মানুষটিকে নিয়ে চলে গেল। এবার অধিরাজ প্রেসের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করেছে, "একটা স্কুপ বা নিউজের জন্য একে অপরকে খুন করবেন আপনারা! শেম অন ইউ! কী জানতে চান? হ্যাঁ, আজ ভোরে বার্নিং শিখ আরও দুটো খুন করেছে। ভিকটিম দু-জন আমাদের ইনফর্মার। তাদের ফ্যামিলির প্রাইভেসির জন্য তাদের নাম বলতে পারব না। আমাদের ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের বাড়িতেও সে হামলা

করেছে। আপাতত আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে পার্টিকুলার এই কেসটা যতক্ষণ না সলভ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইনফর্মার নেটওয়ার্ক ও ফরেনসিক টিম এই তদন্তে কাজ করবে না। ওদের সাহায্য ছাড়াই আমাদের এগোতে হবে।"

"কেসটা কি আদৌ সলভ হবে? তাও ফরেনসিক ও ইনফর্মারদের সাপোর্ট ছাড়া!" একজন বলে উঠল, "দিল্লি, কানপুর বা ব্যাঙ্গালোরের পুলিশ তো সবরকম সাপোর্ট থাকা সত্ত্বেও পারেনি। আপনারা পারবেন কি? তাছাড়া অফিসারদের নিজেদের জীবনই যেখানে বিপন্ন সেখানে তাঁরা অন্যদের নিরাপত্তা দেবেন কী করে?"

"নো কমেন্টস।" কঠিন স্বরে উত্তরটা ছুড়ে দিয়ে ফের গটগট করে এগিয়ে গেল অধিরাজ। পেছন থেকে ক্যামেরার ঝলসানি ভেসে আসছে। অজস্র ভিডিও ক্যামেরা তার ফুটেজ তুলতে ব্যস্ত। রিপোর্টাররা চেঁচাচ্ছে, "স্যার... আর একটা প্রশ্ন...।"

অধিরাজ থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে অদ্ভুত সুন্দর অথচ উদ্ধত গ্রীবাভঙ্গি করে বলল, "নো মোর কোয়েশ্চেন্স প্লিজ।"

শুধু ঐ কয়েক সেকেন্ডের পোজ, ঐ একটা মুহূর্তকেই তোলার জন্য ব্যস্ত ক্যামেরার শাটারের শব্দে আর ফ্ল্যাশের চোখ ধাঁধানো আলোয় গোটা চত্ত্বর সরগরম হয়ে ওঠে।

অধিরাজ কয়েক সেকেন্ড তাদের ফ্রেমবন্দি করে নেওয়ার সময় দিল। পরক্ষণেই ফের লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল ভেতরের দিকে। তার এখন কথা বলতে ভালো লাগছে না।

অর্ণব ততক্ষণে আহত রিপোর্টারটিকে ফার্স্ট এইড দিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক অধিরাজকে দেখে একটু হতাশ ভঙ্গিতেই বললেন, "আমিই শুধু আপনার বাইট পেলাম না।"

সে রোদচশমা খুলে নিয়ে মানুষটিকে আপাদমস্তক ভালো করে দেখল। তিনি তার বাবার সমবয়েসীই হবেন। হয়তো বা সামান্য বড়োও হতে পারেন। বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন'র মধ্যে। একমাথা কাঁচা পাকা চুল। ছোটোখাটো চেহারা। কিন্তু চোখের ধারালো দৃষ্টি বলে দেয়, ইনি রীতিমতো অভিজ্ঞ ক্রাইম রিপোর্টার। অধিরাজ সহৃদয় স্বরে জানতে চায়, "আপনার নাম কী স্যার?"

ভদ্রলোক একটু কুণ্ঠিত হয়ে বলেন, "আমায় স্যার বলবেন না। আমি নিতান্তই সামান্য একজন ক্রাইম রিপোর্টার। আমার নাম রমানাথ চক্রবর্তী। ইন্ডিয়ান ডেইলি মেল, কলকাতার ক্রাইম বিট আমিই দেখি।"

"ওকে মিঃ চক্রবর্তী।" সে মৃদু হাসল, "আপাতত আপনাকে খালি হাতেই ফেরাতে হচ্ছে। তবে এই কেসটা শেষ হলে আমি আপনাকে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ দেব। চলবে?"

রমানাথ প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, "চলবে মানে? উড়বে।"

"ওকে ফাইন।" সে ফের অর্ণবের দিকে তাকায়, "ওঁর কন্ট্যাক্ট নম্বরটা নিয়ে নাও। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন। দেখো, যদি কিছু জলখাবার...!"

তিনি মাথা নাড়েন, "না স্যার। আমার আর কিছুর প্রয়োজন নেই। এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ'র আনন্দেই আমার পেট ভরে গেছে।"

"কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে।" অধিরাজ আন্তরিক স্বরে বলে, "ইন্ডিয়ান ডেইলি মেলের ব্রাঞ্চ আমি যতদূর জানি গোটা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে আছে, রাইট?"

"ইয়েস স্যার।" ভদ্রলোক বললেন, "কলকাতায় লিড করতে না পারলেও অন্যান্য জায়গায় আমাদের রেপুটেশন ভালো।"

"ইন দ্যাট কেস, আপনাকে আমার একটা উপকার করতে হবে।" সে বলল, "অ্যাকচুয়ালি এটা কোনো অভিজ্ঞ মিডিয়া পার্সনের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু এখনকার ছেলে ছোকরাদের দিয়ে হবে না। আমার এমন একটি লোককে দরকার যিনি ইন্দিরা গান্ধীর ওপর পুরোপুরি অবসেসড! ওঁর জীবনের ফুল লেংথের ডকুমেন্টারি বানিয়েছেন বা যাঁর কাছে ওঁর সব ভাষণ, মিটিং বা র‍্যালির সমস্ত ফুটেজ এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। অন্তত শেষ কয়েকবছরে উনি যত ভাষণ দিয়েছেন, তার রেকর্ডিং, অডিও ফাইল জাতীয় কিছু যদি পাওয়া যায় তবে সোনায় সোহাগা। পুলিশ কিংবা ইনফর্মাররা এই জাতীয় লোকদের খবর

রাখে না। একমাত্র মিডিয়া পার্সনরাই এমন মানুষদের চেনেন। আপনি কি কোনোভাবে আমায় সাহায্য করতে পারেন?”

“নিশ্চয়ই।” রমানাথ সপ্রতিভভাবে বলেন, “কিন্তু সে তো স্যার আপনারা ইউটিউব থেকেই পেয়ে যাবেন। বিবিসি থেকে শুরু করে এখনকার সমস্ত টপ চ্যানেলগুলোর কাছেই সেসব রাখা আছে। এবিপি নিউজ, আজতককেও পাবেন।”

“না।” সে বলে, “ইউটিউবের সাউন্ড কোয়ালিটি একদমই ভালো নয়। তাছাড়া ওঁদের কাছে ঠিক ততটুকু ফুটেজই পাবো, যতটুকু ওঁদের নিজেদের প্রয়োজন। বেশিরভাগই ইন্টারভিউ। আমি ইন্টারভিউর অডিও বা ভিডিও ফুটেজ চাইছি না। ইন্দিরা গান্ধীর স্পিচ বা ভাষণ চাইছি। আপনি জানেনেই, আমাদের হাতে সময় খুব কম। এর মধ্যে বিবিসি, এবিপি নিউজ, আজতক, টাইমস নাও বা অন্যান্য চ্যানেলকে এক এক করে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়। যদি সম্ভবও হয়, তবে সি.আই.ডি. হোমিসাইড, কলকাতা যে এই জাতীয় অডিও বা ভিডিও ফাইল খুঁজছে, সেটা নিয়েই ওঁরা ব্রেকিং নিউজ বানিয়ে ফেলবেন। কারণ গোটা দেশ জানে যে বার্নিং শিখ এখন কলকাতায়। আমি একেবারেই চাই না যে, আজ রাতেই সুমন দে, অর্ণব গোস্বামী কিংবা শামস তাহির খান এটা নিয়ে আলোচনায় বসে যান। আমরা যে এগুলো খুঁজছি, সেটা কাকপক্ষীতেও জানবে না। দূরদর্শনের কাছে চাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের ডেটে চাইলে বছর খানেকের আগে সে জিনিস পাওয়া যাবে না। অথচ একসঙ্গেই মোটামুটি সব স্পিচগুলোই ইমিডিয়েটলি হাতের কাছে পাওয়া প্রয়োজন। একটা একটা করে জোগাড় করার সময় একদমই নেই।

“উঁ।” রমানাথ একটু চিন্তা করে খুব ধীরে ধীরে বললেন, “স্যার, এরকম একটা লোককে আমি অল্পবিস্তর চিনি। ইনফ্যাক্ট দিল্লিতেই একটা কনফারেন্সের সময় ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়। আপনি যেমন বলছেন, অবিকল তেমনই। ইন্দিরা গান্ধীর ওপরে ওঁর অসম্ভব অবসেশন। দু-চারটে বইও লিখেছেন ইন্দিরার জীবন নিয়ে। চিরঞ্জীব জয়সওয়াল। সিনিয়র মানুষ। এখন ওঁর বয়েস প্রায় আশির ওপরে তো হবেই। নাম শুনেছেন কি?”

অধিরাজ নেতিবাচক মাথা নাড়ল, “নাঃ। বললাম তো, এরকম মানুষদের খবর পুলিশেরা রাখে না।”

“তাও বটে।” তিনি হেসে ফেললেন, “ইনি একবার গল্প করেছিলেন, যে যৌবনে ইন্দিরার এমনই পাগল ভক্ত ছিলেন যে রীতিমতো ওঁকে আবেগে ভরা শের ও শায়েরি সমেত আস্ত প্রেমপত্রই লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কপাল ভালো যে প্রধানমন্ত্রী তার জন্য ওঁকে জেলে না ভরে স্রেফ পালটা চিঠিতে দুটো বাক্য লিখেছিলেন, “ইউ আর ভেরি নটি। থ্যাঙ্কস ফর দ্য পোয়েট্রি।” কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা ও সলিড। উনি দাবি করেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ইন্দিরা যত র‍্যালি করেছেন, যত স্পিচ দিয়েছেন, হিন্দি, ইংরেজি ভাষায় যত ইন্টারভিউ দিয়েছেন, সব অরিজিনাল এবং ফুল রেকর্ডিং তাঁর লাইব্রেরিতে আছে। এমন অনেক স্পিচের রেকর্ডিংও আছে যা এককথায় দুষ্প্রাপ্য। কোনো চ্যানেলের কাছেই নেই। ইনফ্যাক্ট, ইন্দিরা গান্ধীর ওপর একটা বিরাট লাইব্রেরিও আছে ওঁর। সবাইকে অ্যালাউ করেন না, আমাকেও করেননি। তবে আপনি যদি বলেন, তবে ভদ্রলোককে বলে দেখতে পারি। ওঁর সঙ্গে আমার এখনও মাঝেমধ্যে কথা হয়। কপাল আর ওঁর মেজাজ ভালো থাকলে যা চাইছেন তা পেয়ে যেতেও পারেন।” রমানাথ একটু ডিফেন্সিভ খেললেন, “তবে আমি শিওর শট কিছু বলতে পারছি না। পুরোটাই ওঁর বলা কথা। যেমন বলছিলাম, লাইব্রেরিটা আমি নিজেও দেখিনি। তাই কনফার্ম নই। তবে চিঠিটার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ইন্দিরার সেই বহু পুরোনো চিঠিতে দুটো লাইন, এবং হস্তাক্ষর স্বচক্ষে দেখেছি। মিঃ জয়সওয়াল আবার গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সাজিয়ে চিঠিটাকে রুপোর ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছেন।”

“চিঠিটা যদি সত্যি হয়, তবে বাকি দাবিটাও সত্যি হওয়ার চান্স আছে। আপনি একবার ওঁকে রিকোয়েস্ট করে দেখুন। তবে স্পেসিফিক্যালি আমার ইন্দিরা গান্ধীর স্পিচগুলোই চাই। ইন্টারভিউর প্রয়োজন নেই। আর একথা যেন কোনোভাবেই...!”

“কেউ জানবে না স্যার।” রমানাথ অধিরাজকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই বললেন, “মিঃ জয়সওয়াল নিজে ভীষণ প্রচার বিমুখ লোক। আমি তো বলবই না। এই কেসটা শেষ হলে বরং আপনি এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউতে ‘বার্নিং শিখ' কেসের অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন। ডিল?”

“জেন্টলম্যানস ডিল।” সে বলল, “কত তাড়াতাড়ি পেতে পারি ওগুলো?”

“কালকের আগে পাবেন না। মিনিমাম একটা দিন তো লাগবেই ওঁকে ভজাতে।” তিনি জানালেন, “একবার রেকর্ডিংগুলো পেয়ে গেলে আমাদের দিল্লি অফিসের এক ছোঁড়াকে বলে দেব। সে কালেক্ট করে সমস্ত অডিও, ভিডিও মেইল করে পাঠিয়ে দেবে। আজকাল টেকনোলজি এগুলো অনেক সহজ করে দিয়েছে।”

“কাল সকালে বা দুপুরে পেলেও চলবে। তার বেশি দেরি হলে সমস্যা হবে। প্রতি মুহূর্তই এখন আমাদের কাছে ইম্পর্ট্যান্ট।”

“আপনার ইন্টারভিউ'র সওয়াল স্যার। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট।”

“ইন্টারভিউ’র থেকেও বেশি, অনেকগুলো মানুষের প্রাণের সওয়াল।” সে মিষ্টি হাসল, “থ্যাংকস। কিপিং মাই ফিঙ্গারস ক্রসড।”

ভদ্রলোক হেসে সেখান থেকে চলে গেলেন। অর্ণব গোটা ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ নিয়ে ঠিক কী হবে? তাছাড়া শুধু ভাষণই বা কেন? ইন্টারভিউ হলে তবু বোঝা যেত যে তার মধ্যে কিছু ইনফর্মেশন থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর আগে ইন্দিরা জানবেনই বা কী করে যে তাঁর মৃত্যুর পরে এতবড়ো একটা হত্যাকাণ্ড হবে! তবে তাঁর স্পিচে কী খুঁজছে অধিরাজ? প্রশ্নটা করতেই অধিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলল, “দেখি, যা খুঁজছি তা পাই কিনা। তারপর সব বুঝিয়ে বলব।”

“স্পিচই কেন? ইন্টারভিউ হলেও তো চলত।”

“কারণ ইন্টারভিউতে কেউ উত্তেজিত হয়ে হাঁউমাউ করে বা চড়া সুরে কথা বলে না। সেজন্যই স্পিচই প্রয়োজন, ইন্টারভিউ নয়।”

বলতে বলতেই সে দ্রুত কনফারেন্স রুমের দিকে এগিয়ে গেল। যাদব আর ঘন্টু ওখানেই অপেক্ষা করছে। বলাই বাহুল্য যে অধিরাজের বক্তব্য অর্ণবের মাথায় কিছুই ঢুকল না। কিন্তু তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে তার পেছন পেছন গেল। দেখা যাক, খবরিরা কোনো প্রয়োজনীয় খবর দিতে পারে কিনা।

তবে খবরের আগেই নাকের সামনে হাজির হল আস্ত একটা জমকালো লাল টুকটুকে কার্ড। ঘন্টুর ছেলে পুপুল, তথা সত্যজিৎ দাসের বিয়ের কার্ড! অধিরাজ কার্ডটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। একটু বুঝি নিজেকে স্বাভাবিক করার জন্য সময়ও নিল। সামনেই ঘন্টুর ছেলের বিয়ে। কী সুন্দর বিয়ের কার্ড করেছে! একটাই সন্তান, তাই বড়ো আদরেরও বটে। ওদের স্বামী-স্ত্রীয়ের মধ্যে সম্পর্কও খুব ভালো। যদিও অন্যদের মুখে শুনেছে যে রতি বউদি আসলে হিন্দু নন, মুসলিম। ওঁর আসল নাম আয়েশা। ঘন্টেশ্বরবাবুর সঙ্গে আয়েশা খাতুনের প্রেমের গল্প সি.আই.ডি. ব্যুরোয় বেশ জনপ্রিয়। ঘন্টুর মায়ের এ বিয়েতে প্রবল আপত্তি ছিল। কিন্তু পরিবার, সমাজ, ধর্ম সবার বিরুদ্ধে গিয়ে ওরা বিয়ে করেছে। বিয়ের পর শুধু হিন্দু নামই নয়, হিন্দু ধর্মটাকেই আপন করে নিয়েছেন আয়েশা। এখন তিনি সকলের রতি বউদি। তাঁর মাথার চওড়া সিঁদুর, শাঁখা-পলা পরা হাত আর সাবেকি ঢঙে শাড়িপরা দেবীমূর্তিটি দেখলে কেউ বলবে না যে তিনি কোনোকালে অন্য কোনো ধর্মের ছিলেন। ভালোবাসা এমনই জিনিস যা ধর্মের রক্তচক্ষুকেও মাত দেয়। আবার ধর্ম এমনই বস্তু যা ভালোবাসা, বিশ্বাস, সবকিছুই পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। ১৯৮৪ সালের রক্তাক্ত ইতিহাস, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা থেকে শিখ জেনোসাইড পর্যন্ত পুরোটাই তার সাক্ষ্য বহন করে।

অধিরাজ বিয়ের কার্ডটা অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করছিল। যে এত সাধ করে, হয়তো ক্ষমতারও বাইরে গিয়ে ছেলের বিয়ে দিচ্ছে, তাকে কি আদৌ এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে সামিল করা যায়? কাল যদি ইসমাইল বা রকির মতো ঘন্টুরও ভয়াবহ কোনো পরিণতি

হয় তবে পুপুল বা রতির সামনে কোন মুখে দাঁড়াবে ওরা! সে ঘন্টুর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকায়। তার মুখের অবস্থা দেখে বোধহয় ঘন্টুও কিছু আঁচ করেছে। সে বলল, "স্যার? কী হল?"

"অনেক কিছু হয়ে গেছে ঘন্টু। যাদব, তুই-ও মন দিয়ে শোন।"

কোনো কিছুই বিন্দুমাত্রও গোপন না করে সে সব কিছুই ওদের খুলে বলে। কাল রাত থেকে আজ ভোর পর্যন্ত যা যা হয়েছে, সবই সবিস্তারে বলল। ইসমাইল, রকি এবং সনতের করুণ পরিণতির কথাও জানাল। খুব গম্ভীর ও বিষণ্ণ গলায় বলে সে, "আমি আর মৃত্যুর দায় নিতে পারব না। অলরেডি দু-জন ইনফর্মার মারা গিয়েছে। ফরেনসিক ল্যাব আপাতত বন্ধ। আমার মনে হয়, এ কেস থেকে তোদেরও সরে যাওয়া উচিত। অন্তত পার্টিকুলার এই কেসটায় কিছু করতে যাওয়া মানেই অলমোস্ট মরতে যাওয়া। আমাদের উপায় নেই, তাই প্রাণ হাতে নিয়ে ডিউটি করতেই হবে। কিন্তু তাও ভাবছি প্রত্যেকের বাড়ির লোকদের জন্য সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করব। সরি টু সে, তোদের জন্য সেটা করা যাবে না। কারণ যে মুহূর্তে পুলিশগার্ডরা তোদের বাড়িতে সিকিউরিটির জন্য যাবে, সে মুহূর্তেই সবাই জানতে পারবে যে তোরা সাধারণ লোক না। ঘন্টু যে আসলে চায়ের দোকানি নয় বা যাদব যে সব্জিবিক্রেতা নয়, পুলিশের খবরি, সেটা তোদের প্রতিবেশী থেকে আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোক অবধি সবাই বুঝবে। তাতে রিস্ক বাড়বে বৈ কমবে না। ইন মাই ওপিনিয়ন, তোদের এই কেস থেকে সরে যাওয়াই ভালো। বাকিটা তোদের মর্জি।"

কথা শেষ করে সে দু-জনের দিকেই তাকায়। যাদবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। ঘন্টুর চোখে মুখেও ভয় স্পষ্ট। দু-জনেই নীরবে একে অপরকে দেখছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। অধিরাজ আর অর্ণবও নীরবে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। যে সিদ্ধান্তই ওরা নিক, মেনে নেবে। এখানে কোনো 'ব্লেম গেম' এর জায়গাই নেই।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষপর্যন্ত নীরবতা ভাঙল যাদবই। মুখ নীচু করে খুব মৃদুস্বরে বলল, "স্যার... আমার ছোটো ছোটো দুটো বাচ্চা আছে। ছেলেটার বয়েস মাত্র দুই বছর, আর মেয়েটা ছ-মাসের...। ভাইরাও সবাই ঠিকঠাক মতো কামায় না। মাধব আর কেশব উলটোপালটা ব্যাবসার স্কিম বানায় আর প্রতিবারই ফেল পড়ে। উদ্ধব একটা ওষুধের দোকানে কাজ করে। আমদানি বেশি নয়...। আমিই একমাত্র ঠিকঠাক কামানেওয়ালা...!"

এইটুকু বলেই ফের চুপ করে গিয়েছে সে। বাকিটা বলার আর প্রয়োজন নেই। ইঙ্গিত স্পষ্ট। সে সরে দাঁড়াল। এটাও আর একটা জোর ধাক্কা। কিন্তু তার জন্য ওকে দায়ী করা যায় না। অধিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বুঝেছি। নো প্রবলেম।"

"সরি স্যার!" যাদব আত্মগ্লানিভরা কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, "কিছু মনে করবেন না।"

"মনে করার কোনো গল্পই নেই যাদব। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোর জায়গায় আমি থাকলে এই সিদ্ধান্তটাই নিতাম।" বলতে বলতেই তার দৃষ্টি ফিরল ঘন্টুর দিকে, "তুই কী ঠিক করলি?"

"জানি না স্যার।" ঘন্টু দ্বিধাগ্রস্ত, "একবার মনে হচ্ছে এই বিপদের সময়ে আপনাদের হাত ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আবার বউ আর ছেলের কথাও মনে পড়ছে। আমার মরতে ভয় নেই। কিন্তু রতি অগাধ জলে পড়বে। পুপুল সবে চাকরিতে ঢুকেছে। ওর বিয়েটাও যতটা সম্ভব জাঁকজমক করে দিতে চাই!"

'সেক্ষেত্রে. তোরও যাদবের মতোই সরে যাওয়া উচিত। সেটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। পরের মাসেই পুপুলের বিয়ে। সেটা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।"

ঘন্টু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ণভাবে বলল, "ঠিক। তাই হবে স্যার।"

অধিরাজ একটা শ্বাস টানে। সেটা স্বস্তির না উৎকণ্ঠার তা বলা মুশকিল। একদিকে যেমন খবরিদের প্রাণের আশঙ্কা কমল, অন্যদিকে সি.আই.ডি. হোমিসাইড আরও কিছুটা শক্তিহীন হয়ে পড়ল। কিন্তু মনোভাব যা-ই হোক, আপাতত প্রকাশ করল না সে। শান্তভাবেই বলল,

“লাস্ট খবর কিছু পেয়েছিস? থাকলে দিয়ে যা।”

এবারও যাদবই প্রথমে মুখ খুলল, “স্যার, কেরোসিন ব্ল্যাক মার্কেট থেকে আর কেউ তোলেনি। তবে কাল শেষরাতে কেউ বে-আইনি পেট্রোল তুলেছে। তাও আবার পনেরো বোতল।”

“বে-আইনি পেট্রোল।” অধিরাজ বিড়বিড় করে বলল, “ফের ওয়েপন চেঞ্জ। যদিও এটার আশঙ্কা আমিও করছিলাম। কারণ ১৯৮৪ সালেও শিখদের জ্যান্ত জ্বালাতে কেরোসিনের পাশাপাশি পেট্রোলও ইউজ করেছিল মব। কোনো না কোনোদিন এটা সে করতই। সেই সময়ে যে মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেগুলোই ব্যবহার করছে। তাছাড়া এখন ও জানে কেরোসিনের ব্ল্যাক মার্কেটগুলোয় সাদা পোষাকের পুলিশ কিংবা খবরিরা ঘুরছে। তাই ওদিকে আর যাবে না, যেমন নেকলেসিং করার জন্য টায়ার তুলতেও যাবে না। যা-ই হোক, পেট্রোল কোথা থেকে কিনেছে?”

উত্তরে যাদব জানাল যে আজকাল রাস্তার পাশে অনেক ছোটোখাটো দোকানেই এক লিটারের বোতলে খুচরো ইল-লিগ্যাল পেট্রোল বা ডিজেল কিনতে পাওয়া যায়। অনেকেই প্রয়োজন মতো গাড়িতে দু-এক বোতল পেট্রোল বা ডিজেল রাখে। যশোর রোডের ধারে তেমনই একটি দোকান থেকে কাল শেষ রাতে পনেরো বোতল পেট্রোল নিয়েছে কেউ। বিক্রেতার নাম রবি কুণ্ডু। মোটামুটি শেষরাত থেকেই সে খুচরো বে-আইনি পেট্রোল বা ডিজেলের পসরা সাজিয়ে বসে। এক দু-বোতল বেচাকেনা হলে দোকানি ক্রেতাকে মনেও রাখে না। কিন্তু এই বিশেষ মানুষটি রবিকে বলেছিল, “একটা দুটোয় আমার কিস্যু হবে না। তোমার কাছে যতগুলো বোতল আছে, আমায় দাও।”

রবির কাছে তখন পেট্রোলের মাত্র পনেরোটা বোতলই ছিল। অর্থাৎ পনেরো লিটার। সে এমন আবদার শুনে অবাক; “এত লিটার তেল নিয়ে কী করবেন? এমার্জেন্সির জন্য এক্সট্রা পেট্রোল রাখতে হলে দু-লিটার বা পাঁচ-লিটারই তো যথেষ্ট! পনেরো লিটার তেল নিতে হলে পেট্রোল পাম্পে যান না!”

“আমি দু-লিটার নিই বা পনেরো লিটার, তাতে তোমার কী?” ক্রেতাটি ধমকে উঠেছিল, “তেল নিয়ে কী করব তা নিয়ে মাথাব্যথাই বা কীসের? আমি গাড়িকে খাওয়াব, দরকার হলে ঢকঢক করে নিজেই খাব। তুমি দেবে কিনা বলো।”

এই অবধি শুনেই অধিরাজ গম্ভীর স্বরে বলে, “আর রবিও এককথায় পনেরো লিটার পেট্রোল দিয়ে দিল! বার্নিং শিখের মাস মার্ডারের খবর এখন একটা বাচ্চা ছেলেও জানে! সেক্ষেত্রে ক্রেতা যখন এতটা পেট্রোল চাইছে, তখন লোকটার একটুও সন্দেহ হল না?”

“সন্দেহ হয়েছিল বলেই তো খবরটা পেলাম স্যার।” যাদব জানায়, “তবে তখনই সন্দেহ হয়নি। কারণ খবরের কাগজে বার্নিং শিখকে একজন মাঝবয়েসী পুরুষ বলা হয়েছে। কিন্তু কাল যিনি পনেরো লিটার পেট্রোল কিনেছেন, তিনি একজন সুন্দরী মহিলা। তাই তখনই কিছু মনে হয়নি। পরে অবশ্য খটকা লেগেছে যে শেষরাতে কোন ভদ্রঘরের সুন্দরী মহিলা রাস্তায় বেরোয় ও পনেরো লিটার পেট্রোল, পেট্রোল পাম্পে না গিয়ে বে-আইনি দোকান থেকে তোলে।”

অধিরাজের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে যায়, “আই সি! আর কিছু?”

যাদব বলল, “হ্যাঁ। আরও আছে। রবি অত্যন্ত শয়তান পাবলিক। তার ওপর এইসব বিজনেসের আগে মালটা হিস্ট্রিশিটার ছিল। আমাদেরই পুরোনো ইয়ার। তাই বুকের পাটা আছে। মহিলা যেই গাড়ি করে পেট্রোল নিয়ে চলে গেল, অমনি পেছন পেছন রবিও ওর স্কুটার নিয়ে মহিলাকে ফলো করেছিল। একে শাঁসালো খদ্দের, তার ওপর ওরকম সুন্দরী! আর মেয়েছেলে দেখলেই ও কাত। সঙ্গে কিছুটা সন্দেহ তো ছিলই। তাই ও মেয়েটার পেছন পেছন গিয়ে ওর ঘাঁটিটাও দেখে এসেছে।” সে বুক পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করল, “এই হল মালটার ঠিকানা!”

“জ্যাকপট!” অধিরাজ উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিরকুটটা নিয়ে নেয়, “৪৫, যশোর রোড,

ইটালগাছা, মোতিলাল কলোনি। এই লোকেশন তো দমদম এয়ারপোর্টের কাছে।”
“মোতিলাল কলোনি, রাজবাড়ি!”

ঘন্টু প্রায় লাফিয়েই ওঠে, “স্যার, আমার কাছেও একটা খবর আছে। সেটাও প্রায় এই লোকেশনেই।”

“বলে ফ্যাল।”

“মোতিলাল কলোনিতে নাকি বেশ কিছুদিন ধরেই লোকেরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করছে! ওখানেই আশেপাশে বেশ কয়েকটা গুরুদ্বারাও আছে। মোতিলাল কলোনি, ইটালগাছাতেই গুরুদ্বারা শিখ সঙ্গত আছে। ঐ অঞ্চলে প্রচুর শিখও থাকে স্যার। আমি কেরোসিন মার্কেট ছাড়াও কলকাতার শিখ কলোনিগুলোয় ফিল্ডিং দিচ্ছিলাম। কারণ আমার মন বলছিল, বার্নিং শিখ সম্পর্কে এখানকার শিখেরা কিছুই জানবে না, তা অসম্ভব। শিখ কমিউনিটির আবার ‘বিরাদরির ওপর খুব টান। তাই লোকাল শিখদের আলাপ আলোচনা শুনছিলাম। যদি কিছু শোনা যায়। বা যদি নতুন কারোর আসার খবর পাওয়া যায়। নিজে তো ঘুরছিলামই, ছেলেপুলেদেরও নামিয়ে দিয়েছিলাম।”

“ব্রিলিয়ান্ট।” অধিরাজের চোখে প্রশংসা, “এইজন্যই তোকে খবরিদের সুপারস্টার বলে। বলার আগেই কাজ নামিয়ে দিস। কোনো খবর পেলি?”

“নিশ্চয়ই।” ঘন্টু কান এঁটো করা হাসি হাসল, “আমি ঠিকানাটা বলতে পারব না। তবে ইটালগাছা, রাজবাড়ির শিখেরা বলছিল, ঐ এলাকারই এক বড়োলোক মহিলা কোমল কৌরের বাড়িতে নাকি নতুন ‘মেহমান' এসেছে। কোমল কৌরের ম্যালা পয়সা। আশেপাশের গরীব লোকদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। তবে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে যে ও বাড়ির রাঁধুনিকে নাকি এখন আরও একজনের রান্না এক্সট্রা করতে হচ্ছে। রাঁধুনি ছাড়া কোমল কৌরের বাকি চাকর বাকরদের সাতদিনের জন্য ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের!”

“কেন?”

“গত দশবছরে ও মহিলা কখনও চাকর-বাকরদের মাসে-দু মাসে একদিনের বেশি ছুটি মঞ্জুর করেনি। বহুত বজ্জাত মেয়েছেলে। একদিন ছুটি দিলেও টাকা কেটে নেয়। ও নিজে নাক উঁচু হলেও ওর চাকর-দাসীরা লোকালিটির সঙ্গে মেশে। তারাই বলে বেরিয়েছে যে, মালকিন এমনই হোঁৎকা যে কুটোটিও নাড়তে পারেন না। বিয়ে থা ও করেননি। তাদের ভাষায় ‘কুচ্ছিত, মোটা-আইবুড়ি।' তিনকূলে কেউ নেই! অথচ তিনিই নাকি সব চাকর-বাকরদের মোটা টাকা দিয়ে লম্বা ছুটিতে পাঠিয়েছেন। নেহাৎ পেটের দায়ে কুকটি রয়ে গেছে। কুক না থাকলে উনি না খেয়ে মরবেন। রাঁধুনীর রীতিমতো সন্দেহ, যে ও বাড়িতে আরও কেউ আছে। নয়তো যেখানে আগে মালকিন তিনটে পরোটার বেশি রাতে খেতেনই না, এখন কিনা আটটা পরোটা খাচ্ছেন। কিন্তু কোমল কুক-মহিলাকে কিচেন ছাড়া অন্য কোথাও যেতেই দেন না। বিশেষ করে বাড়ির দোতলায়।”

“এক্সট্রা পাঁচটা পরোটার হিসাব বেশ গোলমেলে। কোমল কৌরের ডায়েট চার্টটার খবর নেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।”

“শুধু তাই নয়। কখনও ভোরে, কখনও রাতে ওখানকার লোকেরা প্রায়ই সেই বিখ্যাত শিস শুনতে পাচ্ছে। অনেকেই বলেছে যে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই রাতের বেলায় বা ভোর রাতে কেউ ‘গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই' গানটা শিস দিয়ে ভাঁজতে-ভাঁজতে চলে যায়। অনেকে আবার বেরিয়ে এসে দেখার চেষ্টাও করেছে যে কোন্ ব্যাটা পাগল, কিংবা মাতাল মদ-গাঁজা ফুঁকে ভন্ড হয়ে অসময়ে সিটি বাজাচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি।”

“এই কোমল কৌর ঠিক কী করেন?”

ঘন্টু মাথা নাড়ল, “স্যার, সে বিষয়ে কোনো খবর পাইনি। শুধু এইটুকু শুনেছি যে মহিলার বিজনেস আছে। আরও একটু সময় পেলে ডিটেলস বের করে ফেলতাম। কিন্তু...।”

“ঠিক আছে। ছাড়।” অধিরাজ তাকে সান্ত্বনা দেয়, “আমরা না-হয় বাকিটা খুঁজে নেব। মহিলার ঠিকানা জানিস?”

“না। একেই আমি অপরিচিত বলে লোকে একটু নজর করছিল। তার ওপরে একজন মহিলার ঠিকানা চাইতে গেলে হয়তো মেরে টেরেই দিত। শিখদের আমি ভীষণ ভয় পাই। ওদের মেয়েদের সম্পর্কে বেশি কৌতূহল দেখালে আবার তেড়ে আসে ব্যাটারা। তবে যাদবের দেওয়া ঠিকানার আশেপাশেই হতে পারে।”

“রাইট।” অধিরাজ স্মিত হাসছে, “মেয়েদের ব্যাপারে ওরা একটু কনজার্ভেটিভ। হওয়াও উচিত। প্রত্যেকেরই উচিত মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা। দুঃখের বিষয়, সবাই এটা বোঝে না। শিখরা অন্তত বোঝে।”

ঘন্টু প্রত্যুত্তরে একটু বিষণ্ণ হাসল। তাকে যে এভাবে সরে যেতে হচ্ছে সেটাই হয়তো তার মনখারাপের কারণ। যাদবের মুখও একই কারণে ম্লান। ওরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত দক্ষ ইনফর্মার। লম্বা রেকর্ড এক-একজনের। অত্যন্ত অভিজ্ঞও। কেউ কুড়ি বছর ধরে সার্ভিস দিচ্ছে, কারোর বা পঁচিশ বছর হয়ে গেল। কখনও প্রয়োজনের সময় এভাবে সরে দাঁড়াতে হয়নি। অথচ এইবার ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। অধিরাজ ওদের দু-জনের হাতেই টাকার অনেকগুলো নোট ধরিয়ে দিয়েছে, “চল। আপাতত গুডবাই। নেক্সট কেসে ফের দেখা হবে। যাদব আর ঘন্টু, তোরা দু-জনেই সলিড খবর দিয়েছিস। গ্রেট ওয়ার্ক। আর হ্যাঁ, পেছনের দরজা দিয়ে বেরোবি। সামনে এখনও প্রেস ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।”

দু-জনেই আর কোনো কথা না বাড়িয়ে স্যালুট করে চলে গেল। অধিরাজের মুখে ফের চিন্তার ছায়া ঘনায়, “দুটো ইনফর্মেশনই মারাত্মক। এবং আশ্চর্যভাবে লোকেশনটাও প্রায় একই। আমি আশ্চর্য হব না যদি ৪৫, যশোর রোড, ইটালগাছা, মোতিলাল কলোনির অ্যাড্রেসটা কোমল কৌরের হয়। ভদ্রমহিলার পরোটার গল্পটা কী সেটা না-জানলেও বুঝতে পারছি, ও বাড়ির দোতলায় কোনো খিচুড়ি আছে!”

“কিন্তু স্যার...।” অর্ণব সংশয়ান্বিত স্বরে বলল, “অ্যাকর্ডিং টু রবি যে মেয়েটি পেট্রোল কিনেছে সে সুন্দরী। আবার ঘন্টুর ইনফর্মেশন অনুযায়ী কোমল কৌর মোটা এবং বিচ্ছিরি। রবির চোখে যদি কোনোরকম প্রবলেম না থাকে তবে সেই সুন্দরী আর যেই হোক স্বয়ং কোমল হতে পারেন না!”

“তিনি না-হলেও তাঁর গেস্ট হতে পারেন।”

“তা হতে পারেন।” সে আমতা আমতা করে বলে, “কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সুন্দরী মহিলাকে পাঁচটা পরোটা খেতে দেখেছেন আপনি? তার ওপর কোমল কৌর আবার শিখ। মেডিক্যাল কলেজে আমার এক পাঞ্জাবি বন্ধু ছিল। একবার ওদের বাড়িতে লাঞ্চে গিয়েছিলাম। পরোটায় যে কী পরিমাণ ঘি দেয় ওরা তা আপনি ভাবতেও পারবেন না! সেই পাঞ্জাবি পরোটা দুটো খেতেই আমার ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই ভীম-পরোটা কোনো সুন্দরী গপগপ করে পাঁচটা খেয়ে নিচ্ছেন এটা ভাবতে পারেন আপনি?”

“ওয়েল...!” অধিরাজ হেসে ফেলল, “ইন দ্যাট কেস সেই মহিলাকে মেরি কম, করনাম মালেশ্বরী বা গীতা ফোগাতের মতো হেভিওয়েট সুন্দরী হতে হবে। তবে আমারও মনে হয় না যে গীতা ফোগাতও পাঁচটা পরোটা একসঙ্গে ডিনারে বা লাঞ্চে খেয়ে থাকেন। গীতার বাবা অবশ্য খেতেই পারেন। পরোটা তো ছাড়ো, পাঞ্জাবিরা রুটিতেও একগাদা ঘি দেয়।”

“তবে কোমল কৌরের বাড়িতে ক-জন আছেন? অথবা সেই সুন্দরী মহিলা কি আদৌ মহিলা!”

“ব্রিলিয়ান্ট।” অধিরাজ অর্ণবের পিঠ চাপড়ে দেয়, “হান্ড্রেড পার্সেন্ট চান্স আছে যে তিনি আদৌ মহিলা নন। তার ওপর একটা জিনিস লক্ষ্য করলে? ঘন্টু বলল যে কোমলের এক্সট্রা ডায়েটটা রাতেই হয়। লাঞ্চে বা ব্রেকফাস্টে নয়, শুধু ডিনারে। যে গেস্টই এসে থাকুন, তিনি শুধু রাতেই ও বাড়িতে ভোজন করেন। শিসটাও রাতে কিংবা ভোরের দিকে শুনতে পাওয়া যায়। তাহলে সেই বিখ্যাত অতিথি সকাল ও দুপুরের ভোজনটা কোথায় সারছেন?”

আরও একটা খটকা! অধিরাজের কথাতেই স্পষ্ট যে কোমল কৌরের অতিথি দিনে অন্য কোথাও থাকেন। তিনি হয়তো নারীও নন। অর্ণবের যুক্তি সম্পূর্ণ সঠিক। পাঞ্জাবিদের ঘি দেওয়া প্রমাণ সাইজের পরোটা পাঁচটা খেয়ে নেওয়া কোনো সুন্দরীর পক্ষে সম্ভব নয়। যদি খেতেও পারেন, সেক্ষেত্রেও মহিলা তথাকথিত 'সুন্দরী' থাকবেন না, বরং ঘন্টুর বর্ণনা অনুযায়ী 'হোঁৎকা' হয়ে যাবেন। পরোটা তো দূর, এই পরিমাণে পাঞ্জাবি ঘি-মাখন দেওয়া ফুলকা খেতে থাকলেও তিনি নিজেই কিছুদিন বাদে ফুলকাতে পরিণত হবেন।

"আমরা কি এখন কোমল কৌরের পরোটার খবর নিতে যাব স্যার?"

অর্ণবের প্রশ্নে সামান্য আত্মমগ্নভাবে বলল সে, "সে তো যেতেই হবে। তবে তার আগে নিজেরাই দুমুঠো ভাত সাঁটিয়ে নিই। উনি তো আমাদের আর লাঞ্চ অফার করবেন না। কাল রাতের পর থেকে শুধু ধাক্কার পর ধাক্কা ছাড়া আর কিছুই খাইনি। ওদিকে বারোটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। গুল্লুও এসে পড়বে। দশ মিনিট হাতে আছে। চলো, ক্যান্টিন থেকেই ভাত আর মাংসের ঝোল গিলে নিই। আজ সারাদিন আর কিছু জুটবে বলে মনে হয় না।"

"ওকে স্যার।"

ক্যান্টিনের খাবার মোটামুটি ভালোই। অর্ণব আবার এখানকার মা খুব পছন্দ করে। তাই তার অনারে অধিরাজ ভাত আর মাটন কারিই অর্ডার করল। কিন্তু অন্যান্যদিনের মতো রসিয়ে খাওয়ার সময় নেই। অধিরাজ বুকপকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে বলে, "যতক্ষণে লাঞ্চ এসে পৌঁছয়, ততক্ষণে আমরা বার্নিং শিখ সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তার একটা সাম আপ করে ফেলি। প্রথমে তুমিই পয়েন্টগুলো একে একে বলো। এখনও পর্যন্ত কী কী নোটিস করেছ?"

অর্ণব একটু ভেবে বলে, "লোকটার বয়েস পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কাছাকাছি। চেহারা একেবারেই সাদামাটা। টিপিক্যাল শিখদের মতো একেবারেই নয়। বরং ছোটোখাটো আর বৈশিষ্ট্যহীন। এতটাই সাধারণ যে অনায়াসেই নিজেকে হাইড করতে পারে।" সে একটু থেমে বলল, "স্যার, আমাদের কোনো ভুল হচ্ছে না তো? পাঞ্জাবি, বিশেষ করে শিখদের চেহারা কিন্তু একটু অন্যরকম হয়। এত সাদামাটা একেবারেই হয় না!"

"এখানেই তো ভুল করছ ডার্লিং।" সে প্রথম পয়েন্টটা নোট ডাউন করতে করতে বলে, "শিখ বললেই তোমাদের চোখের সামনে দারা সিং-এর চেহারাটা ভেসে ওঠে। কিন্তু তোমরা ভুলেই যাও আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও একজন শিখ। ওঁর চেহারাটা একবার ভেবে দেখো! যদি ভদ্রলোকের মাথার পাগড়িটা সরিয়ে নেওয়া হয় আর গোঁফ দাড়ি, চুল সব কেটে দেওয়া হয়, তবে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কি ওঁকে শিখ বলে মনে হবে? একদম নরম সরম, মিতভাষী, ছোটোখাটো চেহারার মানুষ। হাঁটার ধরণ বা কথা বলার স্টাইল, কোনোটাই অ্যাগ্রেসিভ নয়। ইনফ্যাক্ট সঞ্জয় বারুর মতে, ভদ্রলোক ভাষণ দিতে গেলেও তোতলাতেন। যতই উত্তেজক স্পিচ লিখে দেওয়া হোক না কেন, ওঁর মিনমিনে কথা বলার স্টাইলে সেটা প্রায় এক্সপ্রেশনলেস হয়ে যেত। বাট স্টিল হি ইজ আ শিখ। তাই চেহারায় বৈশিষ্ট্য খুঁজো না। নেক্সট?"

"লোকটা মেক-আপে ওস্তাদ। যে কোনো রূপে, যে কোনো মূর্তিতে থাকতে পারে। আদতে পুরুষ হলেও সেক্স চেঞ্জ করলেও করতে পারে।"

"রাইট। এর সঙ্গে আরও একটা অল্টারনেটিভ অ্যাড করছি।" সে লিখতে লিখতেই বলল, "পুরুষের পাশাপাশি সে মেয়েদের রূপও ধরতে পারে। এই প্রব্যাবিলিটিটাও আছে। কারণ কেউ তাকে পুরুষের রূপে দেখেছে, কেউ আবার সুন্দরী নারী হিসাবে দেখেছে। প্রস্থেটিক মেক-আপে অলমোস্ট মাস্টার লোক, যে মেক-আপের সাহায্যে অনায়াসেই নিজের বয়স বাড়ায় বা কমায়, জেন্ডারও পালটে ফেলে। তবে ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার চান্সটাও ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। কন্ট্রাডিক্টরি পয়েন্ট। থার্ড?"

"লোকটা লেফটি।"

"না অর্ণব।" এবার অধিরাজ সখেদে মাথা নাড়ল, "আজ ভোরেও আমার ধারণা ছিল

লোকটা লেফটহ্যান্ডার। কিন্তু সনতের লাশ দেখে ডঃ চ্যাটার্জি কী বলেছিলেন মনে আছে?”

এবার অর্ণবের ডঃ চ্যাটার্জির কথাগুলো মনে পড়ল। কথাগুলো মাথার মধ্যে ফ্ল্যাশ করামাত্রই সে বলল, “এগেইন কন্ট্রাডিকশন স্যার! সনতের মাথায় হাতুড়ির বাড়ি বাঁ হাত দিয়েই মারা হয়েছে। কিন্তু তরোয়াল দিয়ে যখন কেটেছে তখন খুনি তরোয়ালটা ডানহাতেই ধরেছিল। কারণ সনতের হেড ইনজুরিটা রাইট সাইডে, কিন্তু ডেডবডির কাট বা স্ল্যাশগুলো লেফট টু রাইট!”

‘এককথায় তিনি অ্যাম্বিডেক্সট্রাস, তথা সব্যসাচী। দু-হাতই সমানভাবে ব্যবহার করতে পারেন। আর আমরা খামোখাই লেফ্টটি খুঁজে মরছি।” অধিরাজ হতাশ, “এই লিডটাও গেল।”

“বার্নিং শিখ দিল্লিরই লোক। মদন বলছিল, তার হিন্দিটা দিল্লির কলোকিয়াল স্টাইল। কয়েনেজগুলোও খাস দিল্লির। কিন্তু এখানেও ফের কন্ট্রাডিকশন। কোথাও সে হিন্দিতে কথা বলেছে, কোথাও বাংলায়। লোকটা বাংলাও বলতে পারে। ইনফ্যাক্ট একাধিক ভাষা তার আয়ত্তে।”

“এক্সেলেন্ট পয়েন্ট অর্ণব।” সে মাথা ঝাঁকাল, “নোটেড।”

“খুনি অন্যান্য সিরিয়াল কিলারদের মতো নয়। দরকারে সে প্যাটার্নও পালটায়।”

“প্যাটার্ন নয়, ওয়েপন পালটায়।” অধিরাজ আত্মমগ্ন, “এমন সব ওয়েপন সে চুজ করছে যেগুলো হয় মানুষকে কেটে টুকরো টুকরো করে, নয় মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সেটা কেরোসিন, পেট্রোল, ডিজেল হতে পারে, বম্ব হতে পারে, অ্যাসিড হতে পারে, এমনকি ফসজিন বা মাস্টার্ড গ্যাসের মতো জিনিসও হতে পারে। প্যাটার্নটা সেই উনিশশো চুরাশির মাস কিলিং এরই। সেখান থেকে নড়চড় হয়নি।”

“ওকে। খুনির শিস দেওয়ার অভ্যাস আছে। আর একটা গানই সে গায় বা সেটার সুরেই শিস দেয়।”

“গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই। এটা সে জেনেশুনে করে না অর্ণব।” অধিরাজের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, “এই গানটা তার অবচেতনে ঢুকে গেছে। বার্নিং শিখ এতবড়ো মূর্খ নয় যে জোরে জোরে শিস দিয়ে সবার দৃষ্টি বা মনোযোগ, তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। তা সত্ত্বেও সে শিস দিচ্ছে। সবসময় নয়, যখনই সে মার্ডার বা মার্ডার অ্যাটেম্পট করছে, তার আগে বা পরে। তার চোখদুটো নিবিড় ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে, এবং বেছে বেছে এই শিসটাই দিচ্ছে। এটা তার ফেভারিট গান হতে পারে। আবার তার থেকেও বেশি কিছু হতে পারে।”

“মানে?”

“গুমনাম ফিল্মটা রিলিজ হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। তার উনিশ বছর বাদে শিখ জেনোসাইড হয়। কিন্তু লতা মঙ্গেশকরের এই গানটা এতটাই বিখ্যাত ছিল যে তার বহুযুগ পরেও লোকের মুখে মুখে ঘুরত।” অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে, “এমন নয়তো, যে ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই গানটার কোনো যোগ আছে? লতা মঙ্গেশকর আজীবন এমন ক্রিপি গান আরও অনেক গেয়েছেন। একটা সময়ে তো হন্টিং গান থাকলেই সুরকাররা লতা মঙ্গেশকরকেই পাকড়াও করতেন। আয়েগা আনেওয়ালা, গুমনাম, মেরা সায়া, কহি দীপ জলে কহি দিল, ঝুম ঝুম ঢলতি রাত, উয়ো ভুলি দাস্তাঁ, ন্যায়না বরসে রিমঝিম কিংবা জরা সি আহট। আমার মনে হয়, যখন বার্নিং শিখের সঙ্গে ট্র্যাজেডিটা ঘটছিল, তখন তার আততায়ীদের মধ্যে কেউ হয় এই পার্টিকুলার গানটা গাইছিল, অথবা শিস দিচ্ছিল। এই গানটা তার শৈশব থেকেই সর্বনাশের সুর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। যখনই সে ধ্বংসাত্মক মূর্তি ধরে, তখনই তার অবচেতন মন এই গানটাকেই বেছে নেয়। সেজন্যই সে নিজেরই অজ্ঞাতে শিসটা দিয়ে ফেলে। ইনফ্যাক্ট ও সবদিক দিয়েই ১৯৮৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের ঐ ক-টা দিনকেই রিক্রিয়েট করছে। সেই অ্যাসিড অ্যাটাক, নেকলেসিং, কেটে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। সেই মোক্ষম বাহাত্তর ঘণ্টা, যে বাহাত্তর ঘণ্টায় দিল্লির শিখ পরিবারগুলো কোথায় পালাবে, কীভাবে নিজেকে বাঁচাবে ভেবে পাচ্ছিল না! কী প্রচণ্ড আতঙ্কে তারা

ভুগেছিল, তা একবার কল্পনা করে দেখো। সেই আতঙ্ককেই ফিরিয়ে আনার জন্য তার কী ভয়াবহ প্রচেষ্টা! আমাদের ভিকটিমরা কেউ শান্তিতে আছে বলে তোমার মনে হয়? তাদের ছাড়ো, আমরাই সর্বক্ষণ আতঙ্কে কাঁটা হয়ে আছি। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, আবার বুঝি আঘাত এল! আর এই গানটার সঙ্গে তার ঐ ব্যক্তিগত বাহাত্তর ঘণ্টার অভিজ্ঞতার কোনো একটা সম্পর্ক থাকা অসম্ভব নয়।"

অর্ণবের মনে হল, খুনি সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। এই মুহূর্তে কলকাতার রাস্তার গোটা ভিড়কেই অ্যারেস্ট করলে হয়তো রিস্ক ফ্যাক্টর কমবে। সে কাজটাও অবশ্য দিল্লি পুলিশ করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। কথাটা মনে পড়তেই 'সে বলে ওঠে, "বার্নিং শিখ প্রয়োজন ছাড়া শিখের মূর্তি ধরে না। লাল পাগড়ি, চোলা বা অন্যান্য জিনিসগুলো সে শুধু ছদ্মবেশেই ধারণ করে। অন্য সময় এর একটাও তার গায়ে থাকে না।"

"এর থেকে ভালো নিউজ আর হতেই পারে না।" অধিরাজ করুণ হাসল, "শিখকে যদি শিখ হিসাবে চেনাই না যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সে সব ধর্মের মানুষের ছদ্মবেশ সেইজন্যই নিতে পারে। তবে আমার একটা প্রশ্ন তুমি খেয়াল করোনি। গ্যাসটা সে বদ্ধ ঘরে কোন উপায়ে ঢোকায়? নকল চাবি না-হয় বুঝলাম, কিন্তু ডোর ল্যাচ খুলে বেডরুমগুলোয় ঢোকে কী করে?"

অর্ণবের মাথায় একটা আইডিয়া খেলে যায়, "স্যার, পুলিশেরা বা আমরা দরজায় ফোর্সড এন্ট্রির ছাপ খুঁজেছি। জানলার দিকে কেউ লক্ষ্যই করেনি কারণ সব জানলাই হাট করে খোলা ছিল। ইন এনি কেস, সে জানলা দিয়ে ঢোকেনি তো? ফোর্সড এন্ট্রিটা হয়তো দরজা দিয়ে নয়, জানলা দিয়েই হয়েছিল!"

"ভ্যালিড পয়েন্ট।" সে একটু চিন্তা করে বলল, "কিন্তু তবে জানলার কাচ তো ভাঙতে হত। গ্রিলই বা খুলল কী করে?"

"আজকাল লোকে আর গ্রিলওয়ালা জানলা লাগায় না স্যার। বেশিরভাগই স্লাইডিং কাচওয়ালা জানলা লাগায়। বাইরে থেকে গোটা কাঠামোটাই যদি স্ক্রুসুদ্ধ খুলে নেওয়া যায়, তাহলে একদম ফাঁকা মাঠ। আর যদি নিদেনপক্ষে গ্রিলও যদি থাকে, তবে এখন আর সেই আগের মতো লোহার শিকওয়ালা গ্রিল থাকে না। ওটাকেও পুরো প্যানেলসুদ্ধ খোলা যায়।"

"সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিটা বেডরুমের জানলা একটা একটা করে খুলে একের পর এক বেডরুমে ঢুকতে হবে।" অধিরাজ হেসে ফেলল, "কারণ বেডরুমগুলো একটাও একটার সঙ্গে আর একটা ইন্টারকানেক্টেড ছিল না। যদি ধরেও নিই যে কোনো একটার জানলা দিয়ে সে ঢুকেছে, তবে একটা রুমের অ্যাক্সেস অন্তত পাবে। ঐ বিশেষ ঘরের দরজা খুলে ভেতর থেকে বাইরেও সে বেরোল কিন্তু অন্য বেডরুমগুলোয় ঢুকতে গেলে আবার সেই একই ল্যাচ বা ছিটকিনির প্রবলেম। তবে কি সে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে আবার অন্য বেডরুমের জানলাগুলো একটা একটা করে খুলে ঢুকেছে? শুধু তাই নয়, কাজ শেষ করার পর আবার গ্রিল, জানলা, সবই একটা একটা করে লাগিয়েছে! পুলিশ জানলার পাল্লা খোলা পেয়েছে, পুরো জানলাটাই খোলা পায়নি। উইন্ডো অক্ষত ছিল। উইন্ডোর লকে একটিও আঁচড় ছিল না। অর্ণব, একটা প্যানেলসুদ্ধ জানলা খুলতে কত সময় লাগে তোমার আন্দাজ আছে? যদি অত্যন্ত দক্ষ মিস্ত্রিও হয়, তবু কমসে কম পুরো জিনিসটা খুলতে তার মিনিমাম একঘণ্টা লাগবে। একাধিক জানলা হলে আরও দু-তিনগুণ টাইম প্রয়োজন। এবার কাজ শেষ করে ফের একটা একটা করে জানলা লাগাতে হবে তাকে। যদি দুটো বেডরুমেও সে ঢুকে থাকে, তবে শুধু জানলা খোলা, আর ফের লাগানো, এইটুকু কাজ করতেই তার মিনিমাম চারঘণ্টা লাগার কথা! এই চারঘণ্টা ধরে সে জানলা নিয়ে লড়ে যাচ্ছিল, অথচ কেউ তাকে দেখল না!" সে থেমে যোগ করল, "আর সব ক-টা ক্রাইমস্পটই কিন্তু গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ছিল না। বরং বেশিরভাগই সেকেন্ড কিংবা থার্ডফ্লোরে ছিল। দু-তিনটে কেসে তো সাত-আটতলাতেও

ছিল। বার্নিং শিখ মুখে একটা পেল্লায় গ্যাস মাস্ক পরে, দু-দুটো গ্যাসের ক্যানিস্টার সঙ্গে নিয়ে, আস্ত একটা টুলবক্স হাতে সাত-আটতলার পাইপ চড়ে অতবড়ো পেল্লায় জানলাগুলো খুলে ভেতরে ঢুকেছিল বলছ?”

অধিরাজ বলতে-বলতেই এবার সজোরে হেসে উঠল, “দেন কনগ্র্যাচুলেশনস। বার্নিং শিখ হয় স্পাইডারম্যান, নয় রজনীকান্ত। নয়তো এ অসম্ভব কাজ আর কারোর দ্বারা সম্ভব নয়! হ্যাঁ, জেমস বন্ডও অবশ্য পারেন। তার কাছে প্রচুর অদ্ভুত সব গ্যাজেট থাকত। তিনি গাড়ি অদৃশ্য করতে পারতেন, বুলেটপ্রুফ কাচ আংটি দিয়ে ভাঙতে পারতেন, ইভেন পেনের মধ্যে বম্ব নিয়েও ঘুরতেন শুনেছি। এবার তুমিই বলো, কাকে গ্রেফতার করি? স্পাইডারম্যান, রজনীকান্ত না জেমসবন্ডকে?”

অর্ণব তার বোকামি বুঝতে পেরে নিজেই হেসে ফেলল। তারপর বলল, “তাহলে আর কী উপায় হতে পারে স্যার?”

“তোমার কি একবারও মনে হল না যে বার্নিং শিখের ব্যাকগ্রাউণ্ডে তালাচাবিওয়ালার পেশা থাকলেও থাকতে পারে? সে একজন লকস্মিথ হতে পারে? যদি তার কাছে লকস্মিথের টুলবক্স থাকে তবে নকল চাবি তৈরি করা, বন্ধ ঘরের ল্যাচ, ছিটকিনি অক্ষতভাবে খুলে ফেলা জাস্ট বাঁ হাতের কাজ। একজন পেশাদার লকস্মিথের টুলবক্সে ভারি মজাদার কিছু জিনিস আছে যেগুলোকে ল্যাচ বাইপাসিং টুল বলে। সেগুলো এতই উন্নত যে বন্ধ ঘরের ল্যাচ বা ছিটকিনির লোকেশন যদি জানা থাকে তবে একটা আঁচড়ও না কেটে মাত্র কুড়ি থেকে ত্রিশ সেকেন্ডেই বাইরে থেকে সে যে কোনো ল্যাচ, লক বা ছিটকিনি খুলে ফেলতে পারবে। চারঘণ্টা ধরে জানলায় ঝোলার চেয়ে এটা বেটার অপশন নয়? ও পাবলিক যেভাবে বাড়িতেই ঘাঁটি গেড়ে ফেলে, তাতে দরজার ল্যাচ, ছিটকিনি কোথায় তা তার অজানা থাকার কথা নয়। তুমি কী বলো?” অর্ণব অপ্রতিভ হয়ে মাথা চুলকোচ্ছে, “মোস্ট প্রব্যাবলি দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে স্যার।

একদম সহজ। সেক্ষেত্রে এটা আর একটা ক্লু।”

“সহজ কথা ঠিক অতটা সহজ নয়।” তার চোখে ফের উদ্বেগ, “ইনি নিজেই হয় হাইটেক চাবিওয়ালা, অথবা কোনো লকস্মিথের সঙ্গে কানেকশন আছে, যার কাছ থেকে টুলবক্সটা নিয়েছেন। যাই হোক না কেন, লকস্মিথের ব্যাকগ্রাউণ্ড এখানে আছেই। সঙ্গে চেরি-অন-টপ এনার পুলিশ কানেকশনও আছে।”

“হোয়াট।”

অর্ণবের মাথায় এবার যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ল! বার্নিং শিখের সঙ্গে পুলিশের আঁতাত! মানে সর্ষের মধ্যেই ভূত?

“এটা তো তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল ডার্লিং।”

ততক্ষণে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত আর গরম গরম পাঁঠার মাংসের ঝোল চলে এসেছে। অধিরাজ আঙুল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, “নয়তো বেঙ্গালুরুতে কোন্ ‘সেফ হাউসে’ কোন্ ফ্যামিলিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটা সে জানল কী করে? সেফ হাউসের তথ্য পুলিশের টিম ছাড়া আর কেউ জানত না। কোন্ পুলিশ অফিসারের কোথায় দুর্বলতা, কে কখন অফিসে আসে বা যায়, কোন্ গাড়িটা কার, এসব তথ্য তার কাছে যায় কী করে? বাকিদের কথা বাদ দাও, আমাদের খবরও ওর কাছে আছে। তোমার আমার খবর শুধু নয়, খবরিদের ডিটেলস, ব্যুরোর লোকেশন, ফরেনসিকের লোকেশন, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের বাড়িতে কে কে আছে, কোন্ অফিসার কেমন চরিত্রের, তার স্ট্রেংথ, উইকনেস, সব রিসার্চ করে মাঠে নেমেছে। শুধু এখানেই নয়, দিল্লি, কানপুর আর বেঙ্গালুরুতেও তার রিসার্চ মারাত্মক লেভেলের ছিল। যদি টানা একবছর ধরে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তথ্য সংগ্রহ করেও থাকে, তবুও এই ডিপার্টমেন্টের ভেতরের লোকের সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্ভবই নয়।”

“কিন্তু... ডিপার্টমেন্টের লোক...!” অর্ণবের মাথা ঘুরছে। তার বিশ্বাসের গোড়ায়

একেবারে মোক্ষম কুঠারাঘাত পড়েছে, "তা কী করে হয় স্যার।"

"পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আর আর্মিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কারা থাকে জানো?" সে বলে, "শিখেরা। কারণ ওদের থেকে সাহসী, শক্তিশালী আর ডেডিকেটেড প্রজাতি খুব কমই হয়। আর শিখেরা সর্বত্র আছে। এই তো দেখো, কলকাতাতেই টুইঙ্কল অরোরা নামক এক অফিসার প্রণবেশদার টিমেই বসে আছেন। এমন খুঁজলে আরও অনেক পাওয়া যাবে। তাছাড়া ডিপার্টমেন্টের লোক বলতে শুধু অফিসাররাই নয়, কনস্টেবল, ক্লার্ক, আন্ডারকভার এজেন্টস, দরোয়ান, ড্রাইভার সমেত ক্যান্টিনের লোকও ইনক্লুডেড। সাইবার ক্রাইম বা মোবাইল ট্র্যাকিং এক্সপার্ট, ডেস্কে যারা অষ্টপ্রহর কাজ করে, এমনকি যে চা-ওয়ালা রোজ আমাদের চা দিয়ে যায়, সে-ও আমাদের সব ডিটেলস জানে। ইনফ্যাক্ট ইনফর্মাররাও আছে। আর ইনফর্মার তো একজন দু-জন নয়। মেইন লিডার একজন থাকলেও তার আন্ডারে গোটা একটা নেটওয়ার্ক থাকে। জালের মতো গোটা শহরেই ছড়িয়ে আছে। অর্ধেককে তো আমরা চিনিই না। কতজনকে ট্র্যাক করবে তুমি। নিশ্চিন্ত থাকো, বাইরে থেকে নয়, ডিপার্টমেন্টের ভেতর থেকেই তার কাছে ইনফর্মেশন যাচ্ছে। হয় ব্রেনওয়াশের মাধ্যমে, নয়তো অজ্ঞাতেই। কারণ ১৯৮৪ এর দাঙ্গাটা শুধু দিল্লিতে নয়, গোটা দেশেই হয়েছিল। তাই ভুক্তভোগীরাও গোটা দেশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা ওকে সাপোর্ট করতেই পারে। আবার বিরাদরির প্রেমে, পরম বিশ্বাসে অনেকে আবেগপ্রবণ হয়ে তথ্য দিয়েও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা নিজেরাই জানে না যে কপালদোষে যাকে 'ব্রাদারহুডে'র অন্ধবিশ্বাসে সব কথা বলছে সে-ই আসলে মূর্তিমান সর্বনাশ।"

অর্ণবের মাথায় তখন একটা নামই ঘুরছে। গুলাব সিং, তথা গুল্লু। জাতে শিখ। ঘন্টু ও যাদবের মতোই সি.আই.ডি.-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ খবরি। শুধু তাই নয়, টুইঙ্কল অরোরাকে টিমে নেওয়া কি ঠিক হচ্ছে? তার মনে হল গোটা দুনিয়াটাই বুঝি এক মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তার বিশ্বাসের ভিতের ওপর যেন কেউ অ্যাটমবম্ব ফেলে দিয়েছে। সে নিজের অজান্তেই ক্যান্টিনের অল্পবয়েসী বয়দের মেপে নিতে শুরু করল। এই মুখগুলো সবই কি চেনা? কখনও তো এদের ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কবে এসেছে ওরা। কোন্ জাতের? হিন্দু, মুসলিম, না শিখ?

"কী ভাবছ?" অধিরাজ তাকে তাড়া দেয়, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। গুল্প এখনই এসে পড়বে।"

গুল্লুর নাম শুনেই অদ্ভুত একটা আতঙ্ক তাকে ঘিরে ধরল। এই ইনফর্মারটি অসংখ্যবার ব্যুরোয় এসেছে বা অন্য কোনো জায়গায় দেখা করেছে। ইনফ্যাক্ট, ঘন্টু, যাদব আর গুল্লু তখন থেকে সি.আই.ডি. হোমিসাইডের সঙ্গে আছে, যখন অধিরাজ কিংবা অর্ণব নিতান্তই বাচ্চা! অনেক বড়ো বড়ো সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে ওরা যখন কাজ করছিল তখন হয়তো অধিরাজ, অর্ণবরা স্কুলব্যাগ, ওয়াটারবটল নিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। এত পুরোনো খবরিদের সন্দেহ করার কোনো মানেই হয় না। তবু গুল্পর নাম শুনলেই কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে!

সে আর কোনো কথা না-বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। নামেই খাওয়া, আসলে কোনোমতে নাকে মুখে গোঁজা! কিন্তু এখন আর তার কোনোদিকে খেয়ালই নেই।

ভীষণ অবিশ্বাস, নীরবতা ঘিরে ধরেছে তাকে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন ফের কেবিনের দিকে ফিরছে, তখন সারা রাস্তায় অর্ণবের মনে হচ্ছিল একজোড়া অনভিপ্রেত চোখ ওদের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। নিজেদেরই ডিপার্টমেন্টের লোক, জুনিয়র অফিসাররা যখন পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তখনই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠছে। কেউ তার দিকে তাকিয়ে হাসলে, মনে হচ্ছে, এই মুখ টিপে হাসির পেছনে কি কোনো অর্থ আছে? কোনোদিন অফিসের সবার মুখ ঠিকমতো দেখে না৷ আজ প্রত্যেকটা মুখ ভালো করে দেখছিল সে। সব ক-জন অফিসারকে কি চেনে? ওদের মধ্যে অনেক নতুন মুখও তো আছে। এরা কবে জয়েন করেছে? দরোয়ান কিংবা পিওনদেরও তো ঠিকমতো চেনে না! এর মধ্যে যে কোনো অচেনা মুখই বিশ্বাসঘাতকের মুখ হতে পারে! অফিসারদেরই সবার ধর্মই

তো জানত না ওরা। টুইঙ্কল অরোরার ব্যাপারে প্রণবেশ না বললে তো জানাই যেত না যে একজন শিখ অফিসারও ওদের অফিসে আছে! এমন হয়তো আরও অনেকে আছে। তাদের মধ্যে কার সঙ্গে বার্নিং শিখের লিঙ্ক আছে? কার সঙ্গে থাকতে পারে?

ভাবতে ভাবতেই শীতের মধ্যেও ফোঁটা ফোঁটা ঘামের বিন্দু জমা হল তার কপালে। এ কী অদ্ভুত পরিস্থিতির শিকার হয়েছে সে। কাউকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না! প্রত্যেকটা মুখ বড়ো বেশি যেন অপরিচিত! মনে হচ্ছে একটা মুখের মধ্যেই হয়তো আরও অনেক মুখ লুকিয়ে আছে, যারা কোনোদিন প্রকাশ্যে আসেনি। এটা সি.আই.ডি. ব্যুরো নয়, শত্রুশিবির হলে বুঝি হাঁফ ছেড়ে বাঁচত অর্ণব। অন্তত সেক্ষেত্রে জানা থাকত, ওরা সবাই শত্রু। কিন্তু এখানে বন্ধুবেশে শত্রু কোথায় লুকিয়ে আছে তা বোঝা অসম্ভব।

নিজের কেবিনে ঢুকে প্রথমেই পি সি চৌধুরী এবং ভূপেন্দ্র দত্তা'র বাড়ির আপডেট নিল অধিরাজ। মিস্ দত্ত এবং মিস্ বোস দু-জনেই ঠিকঠাক আছেন। এখনও পর্যন্ত কোনো আক্রমণ তো দূর, ভয় বা আশঙ্কার কারণ দেখা যায়নি। তবে একটু আগেই টিভিতে বার্নিং শিখের নিষ্ঠুর খুনগুলোর খবর শোনা পর্যন্ত দুটো পরিবারই চরম আতঙ্কে ভুগছে। চ্যানেলওয়ালারা দায়িত্ব নিয়ে জানিয়েছে একের পর এক সাপোর্ট হারিয়ে ক্রমাগতই শক্তিহীন হয়ে পড়ছে সি.আই.ডি. হোমিসাইড। সেটা জানার পর থেকেই বাড়ির মহিলারা কান্নাকাটি করছেন। পুরুষদের মধ্যেও এতটাই ভয় ঢুকে গিয়েছে যে কেউ ঘর থেকে বাইরে বেরোননি। এমনকি ভূপেন্দ্র দত্তা'র মতো 'খড়ুস' লোকও একদম নীরবতা পালন করছেন। তিনি নিজের ঘরে নিজেকেই ঘরবন্দি করেছেন। শালিনী চোখের জল ফেলছেন আর বলছেন, "আমাদের তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। পা তো বাড়িয়েই আছি। কিন্তু তানিশা আর আয়ানের কী অপরাধ? সোনালি আর বিরূপাক্ষই বা কী দোষ করেছে? তখন তো মেয়েটার জন্মই হয়নি। 'বাপের দোষে শেষে কি ওর প্রাণটা যাবে। সে তো কাউকেই ছাড়বে না। আমরা সবাই মরব।...সবাইকে সে মারবে।" সোনালি তার বাপের কাণ্ডকীর্তি জানত না। কন্যারত্নের কাছে সবটাই চেপে গিয়েছিলেন ওঁরা। এতদিনে সে মায়ের মুখ থেকে জানতে পেরেছে যে আই.পি.এস. দত্তা ঠিক কী কী কাণ্ড করেছিলেন। তারপর থেকেই গুম্ মেরে বসে আছে। এ বাড়ির কেউ এখনও পর্যন্ত মুখে কুটোটিও কাটেনি। বাচ্চাগুলোকে আত্রেয়ী কায়দা করে খাইয়ে দিয়েছে, তবে বড়োরা সকলেই অনশনে আছেন। সর্বক্ষণই ভয় পাচ্ছেন। ব্যতিক্রম একমাত্র জুজুৎসু। সে বলেছে যে বার্নিং শিখকে হাতের কাছে পেলে জুজুৎসুর প্যাঁচে ওকে নাকানি-চোবানি খাইয়েই ছাড়বে।

"এই আর এক সাহসী প্রজাতি! গোর্খা!" অধিরাজ মন্তব্য করল, "অসম্ভব বিশ্বস্ত ও দুঃসাহসী। মিস্ দত্ত, আপনি জুজুৎসুর সঙ্গে সঙ্গে থাকুন। ওর কাছে কুকরি আছে?"

"আছে স্যার।" আত্রেয়ীর সপ্রতিভ জবাব, "আমাকে ও দেখিয়েও রেখেছে।"

"বেশ।"

অন্যদিকে প্রচণ্ড সন্ত্রাসে কাঁপছে পি সি চৌধুরীর পরিবারও। সোমলতা ইতিমধ্যেই মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছেন। পি সি চৌধুরী-ও শান্তিতে নেই। শুধু ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছেন, "এর চেয়ে আমাকেই ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও প্রভু। আমার ছেলে-ছেলের বউটা অন্তত বাঁচে।" বাড়ির তিনজন চাকর ও দাসী এখনও এসে পৌঁছয়নি। শিবু মোবাইলে জানিয়েছে, তার নাকি অসুখ করেছে। সে আপাতত ক-দিন আর আসবে না। শিখা আর কমলা এখনও আসেনি। শিখার নাকি কোন কুটুম এসেছে। সে দেরি করে আসবে ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে। কমলার লেট হওয়া নিয়ে অবশ্য কেউ বিশেষ চিন্তিত নয়। তার ঝোলানোর অভ্যাস চিরকালীন। হয়তো এক-দু ঘণ্টা পর হেলতে দুলতে আসবে। যদিও তার আসার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ দত্তা পরিবারের মতো চৌধুরী পরিবারের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নেই। পরিমল ও মেঘনা নিজেদের ঘরে বসে কী গুজগুজ করছে কে জানে! কিন্তু সব মিলিয়ে মিস্ বোসের ভাষায়, "টেরর লুমড লার্জ।"

"এগজ্যাক্টলি এটাই বার্নিং শিখ চেয়েছিল!" অধিরাজ ফোনটা কেটে দিয়ে বলল, "কী

অদ্ভুত কো-ইনসিডেন্স দেখো! ১৯৮৪ সালের পয়লা নভেম্বর থেকে তেসরা নভেম্বর অবধি প্রত্যেকটা শিখ পরিবারই ঠিক একথাই হয়তো ভেবেছিল। আমি একবার একটা ডকুমেন্টারিতে দেখেছিলাম এক শিখ মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এই কথাগুলোই বলেছিলেন, যা আজ ওঁরা বলছেন। এখনও মনে পড়ছে ওঁর ডায়লগ, —উয়ো বোল রহে থে, ইয়ে লোগ কিসিকো নেহি ছোড়েঙ্গে...বচ্চোঁ কো ভি নেহি। ... সব কো মারেঙ্গে... সব মরেঙ্গে। ক্যায়া গুনাহ কিয়া হামলোগোনে?' মনে হচ্ছে, অবিকল ঐ বাহাত্তর ঘণ্টারই রি-ক্যাপ দেখছি। বার্নিং শিখের মিশন অন্তত এইট্টি পার্সেন্ট সাকসেসফুল।"

"এইটি পার্সেন্ট?"

"হ্যাঁ অর্ণব।" তার মুখে চিন্তার ছায়া, "খুনি শুধু ফিজিক্যালি অ্যাগ্রেসিভ নয়, অদ্ভুত একটা সাইকোলজিক্যাল গেমও খেলছে। বিড়াল যেমন খেলিয়ে খেলিয়ে ইঁদুরকে শিকার করে! ঐ বাহাত্তর ঘণ্টায় শিখ পরিবাররা মরার আগেই মরছিল। তারা পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। প্রতি মুহূর্তে ভাবছিল, কখন তাদেরও ভিড় এসে মারবে। এটা মৃত্যুর চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক। এখন সেই একই চরম সাইকোলজিক্যাল প্রেশার সে তার ভিকটিমদের ওপরও চাপিয়ে দিতে পেরেছে। একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গেও স্নায়ুযুদ্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক খেলা খেলছে, অন্যদিকে তার শিকারদেরও আধমরা করে ফেলেছে। লোকটার জয়ের পাল্লা ক্রমাগতই ভারি হচ্ছে।"

"আসব স্যার?"

পরিচিত গলার স্বর শুনে অধিরাজ ভাসাভাসা চোখে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকায়। গুল্লু, তথা গুলাব সিং এর শরীরের অর্ধেকটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মারছে। সে ইতিবাচক ইশারা করে, "ভেতরে আয়।"

গুল্লুকে দেখেই ফের অর্ণবের বুকের ভেতরটা গুড়গুড়িয়ে ওঠে। তার মনের মধ্যে সন্দেহের মেঘ জমছে। ও কতক্ষণ ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে? এই এল? নাকি আগেই এসেছে! এতক্ষণ আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনছিল কি? গুল্লু জাতে শিখ! প্রয়োজনের সময় সে কি জাতভাইকে সাহায্য করবে না? ও ঠিক কতটা বিশ্বাসযোগ্য? নাকি বার্নিং শিখের সঙ্গে মিলে সে-ও কোনো ফাঁদ পাতছে!

অধিরাজ যাদব আর ঘন্টুকে যা বলেছিল গুল্লুকেও তাই বলল। যাদব আর ঘন্টু নির্বিবাদে তার কথা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল গুল্লু অনেক বেশি জেদি। সে কোনো কথা, কোনো যুক্তি শুনতেই রাজি নয়। বরং উলটে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, "না সাহেব। সে যতই ভয় দেখাক, আমি নিজের জায়গা থেকে এক পা-ও নড়ছি না। বার্নিং শিখ যদি 'ঠিঠ শিখ" হয় তবে আমিও হেতপাল কৌর আর জর্নেল সিং সোটির 'বাচ্চা।' খাঁটি শিখের খুন আমার রক্তেও আছে। যদি ওর হিম্মত থাকে তো একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াক। ওয়াহেগুরুর ওয়াস্তা, মরার আগে ওকেও মেরেই মরব। খবরি, তাই পাগড়ি, কড়া পরি না। চুল, দাড়ি রাখি না। কিন্তু কৃপাণ তো আমার কাছেও আছে। তরোয়াল আমিও চালাতে জানি।"

সে তার শার্টটা তুলে কোমরে গোঁজা কৃপাণটা দেখায়। অর্ণব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কৃপাণটাকে দেখে নেয়। এটা অবিকল বার্নিং শিখের কৃপাণটার মতোই না? যদিও রাতের আলো-আঁধারিতে সেটা খুব স্পষ্ট দেখতে পায়নি। তবু ওর মনে হল, সেটাও অবিকল গুল্লুর কৃপাণের মতোই দেখতে। তার কপালের চিন্তার ভাঁজ আরও গাঢ় হয়।

"তোর বউ আর ছেলের কথাও ভাববি না?"

অধিরাজ শেষবারের মতো তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সে কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। স্পষ্ট বলল, "হলিনও শিখের বেটি। আমার 'পুত্তর' গোল্ডিও বাঘের বাচ্চা। ওরা জানে আমি পুলিশের খবরি। এ-ও জানে যে কাজটায় প্রাণের ঝুঁকি আছে। আমার কিছু হয়ে গেলে ওরা জলে পড়বে না। আমার নাম গুলাব সিঞা হতে পারে, কিন্তু 'কাঁটে কা টক্কর' আমিও দিতে পারি সাব। ও হারামজাদার বাপকেও ভয় পাই না। এভাবে

আমায় সরাতে পারবে না। যতক্ষণ না মরছি, 'আখরি সাঁস তক' আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। যা করার করে নিক।”

অধিরাজ কতটা স্বস্তি পেল জানা নেই, কিন্তু অর্ণবের মনের আশঙ্কা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। গুল্লু একটু বেশিই কনফিডেন্ট নয়? বার্নিং শিখের সঙ্গে হাতাহাতি করতেও তার আপত্তি নেই। এটা দুঃসাহস না অন্য কিছু?

“বেশ।” অধিরাজ মৃদু হাসল, “বল, কী খবর এনেছিস?”

“সারা কলকাতা চষে বেরিয়ে সব ছোটোবড়ো গুরুদ্বারায় খবর নিয়েছি সাব।” সে জানাল, “সবাই বলে কলকাতায় নাকি মাত্র পাঁচটা গুরুদ্বারা আছে! ‘মুরখ’দের গোটা শহরের ট্যুর করানো উচিত! ছোটো বড়ো মিলিয়ে যে কত গুরুদ্বারা আছে তার হিসাব নেই। আমি মোটামুটি সবগুলোতেই ঢুঁ মেরেছি। ওখানে সব নিজেদেরই লোক আছে। গ্রন্থীজিদেরও চিনি। ওঁরা বললেন, তেমন কোনো নতুন মুখ গত একবছরে ওখানে আসেনি। কোভিডের পর থেকে কোনো নতুন সর্দারের দেখা পাওয়া যায়নি। যারা আসে, সব পুরোনো মুখ। আমি আপনার দেওয়া বার্নিং শিখের সবক-টা চেহারার ফটো ওঁদের দেখিয়েছি। শুধু ওঁরাই নয়, আমার কিছু ছেলেপুলেও সবখানেই ফিট করা আছে যারা ছোটোখাটো দোকান দিয়েছে গুরুদ্বারার আশেপাশেই। কেউ ওকে চিনতে পারেনি সাব।” গুল্লু একটু থেমে বলে, “কিন্তু মহাত্মা গান্ধী রোডের এক গুরুদ্বারার সামনে এক ভিখারি দিন রাত থাকে। গুরুদ্বারা মুনি লাল শিখ সঙ্গতের ঠিক সামনেই ও ব্যাটা অষ্টপ্রহর থাকে। ও বলছিল যে কিছুদিন যাবৎ এক সর্দারজি শেষরাতের দিকে গুরুদ্বারার সামনে আসে৷ কিন্তু ভেতরে ঢোকে না। চুপ করে শুধু তাকিয়ে থাকে। দু-হাতজোড় করে বলে, ‘মৈনু মাফ করো ওয়াহেগুরু।' তারপর চলে যায়। ওকে ফটো দেখানোর কোনো মানেই নেই। কারণ লোকটা রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যেই আসে। অন্ধকারে কোনোদিনই ওর মুখ দেখতে পায়নি সে। কিন্তু রোজ ঐ সময়ের মধ্যেই সে আসে, এটা একদম ঠিক খবর। সে বার্নিং শিখ হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটার কোনো গ্যারান্টি নেই।”

“ফাইন।” অধিরাজ অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে, “সেকেন্ড খবরটা নিয়েছিস?”

“হ্যাঁ সাব। সে খবরও নিয়েছি বলেই দেরি হল।” সে বলল, “পেট্রোল পাম্পের মালিক কয়েকজন শিখ আছে বটে, কিন্তু তারা কয়েকপুরুষ ধরে কলকাতাতেই আছে। দিল্লিতে ওদের বাপ-দাদা-নানা কেউই কোনোদিন থাকত না। ব্যাকগ্রাউণ্ডে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংও নেই। সাদাসিধা ব্যবসায়ী লোক। এক ‘বান্দা’র খবর পেয়েছি অবশ্য। জগদীপ সিং ভাট্টি। ছোটোখাট ফার্মাসিউটিকলস কোম্পানির মালিক। আপনার দেওয়া প্রোফাইলের সঙ্গে বসছে। মালটার বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ। ওর পরিবার ১৯৮৪, সালের আগে দিল্লিতেই থাকত। পরে চলে এসেছে। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডিগ্রিও আছে।”

“ইন্টারেস্টিং।” অধিরাজ একটু উত্তেজিত, “ঠিকানা এনেছিস? লোকটাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?”

“ওর কোম্পানির অফিসেই পাবেন।” গুল্লুও একটা চিরকুট এগিয়ে দেয়, “এই রইল ঠিকানা।”

সে চিরকুটের ঠিকানাটা দেখে বলল, “মিন্টো পার্কের অ্যাড্রেস। অর্ণব, লোকাল পুলিশকে বলো ইমিডিয়েটলি এই লোকটাকে তুলে নিতে। গ্রেফতার যেন না করে। জাস্ট জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যেন তোলে। তারপর দেখছি।”

“ওকে স্যার।”

অর্ণব সঙ্গে সঙ্গেই নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে ফোন করে তাদের ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিতে বলে দেয়। যদিও গুল্লুকে সে এই মুহূর্তে একটুও বিশ্বাস করছে না। তবু অধিরাজের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তার নেই।

“এই এক বান্দা আছে।” গুল্লু কন্টিনিউ করে, “আর একজনও আছে স্যার। তবে বান্দা

নয়, 'বান্দি।' এই মহিলা একটু ডেঞ্জার। অনেকে বলে তিনি নাকি একসময়ে উগ্রবাদীদের খুব সাপোর্ট করতেন। পরে অবশ্য বুঝেছেন যে খালিস্তানি সাপোর্টারদের সঙ্গে ওর নীতি মেলে না। এখন অবশ্য বয়েস হয়েছে। ওর পুরো ফ্যামিলি ১৯৮৪ সালের দাঙ্গাতেই খতম হয়ে গিয়েছিল। কলকাতাতেই ওর এক 'ফুফু-ফুফা' থাকত। সে-ই অনাথ মেয়েটাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে মানুষ করে। ফুফার পয়সা ছিল। ওদের নিজেদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। তাই ওই মেয়েটাকেই নিজেদের 'ঔলাদের' মতো মানুষ করেছে। মহিলা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মহারথ! ওর ফার্মাসিউটিকলস আর ইলেক্ট্রিকাল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি দুটোই আছে। নাম কোমল সিং ভল্লা।"

অধিরাজ নামটা শুনে একটুও বিস্মিত হল না। বরং সে যেন এটার প্রত্যাশাই করছিল। খুব ঠান্ডা স্বরে জানতে চাইল, "ঠিকানা?"

"৪৫, যশোর রোড, ইটালগাছা, মোতিলাল কলোনি, রাজবাড়ি।"

অধিরাজ আর অর্ণব পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে। এটাও ওরা অনেক আগেই আন্দাজ করেছিল। শুধু কনফার্মেশনের অপেক্ষাতেই ছিল। অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল, "থ্যাংকস গুল্লু। কিপ ইন টাচ। চোখ কান খোলা রাখ। আর পারলে আজ রাত তিনটে নাগাদ মহাত্মা গান্ধী রোডের গুরুদ্বারার সামনে ফিল্ডিং দিবি। কিচ্ছু করতে হবে না। শুধু ঐ সর্দারজিকে দেখতে পেলেই আমায় ফোন করবি। ব্যস।"

অর্ণবের হৃৎস্পন্দন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। এটা কি আদৌ ইনফর্মেশন, না কোনোরকম ট্র্যাপ? স্যার কেন গুল্লুর ওপর এতটা আস্থা রাখছেন? বিশ্বাস নেই, কাউকে বিশ্বাস নেই!

* *

(১৫)

প্রণবেশ লাহিড়ী অফিসার টুইঙ্কল অরোরা হিসাবে যা বলেছিলেন তার সবটাই একদম সঠিক। বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি করেননি তিনি। সত্যিই মেয়েটির হাত ওর মুখের চেয়ে বেশি চলে। সে প্রথম দর্শনেই শুধু মৃদু স্বরে বলল, “অফিসার টুইঙ্কল অরোরা রিপোর্টিং স্যার। বিগ ফ্যান।”

সে যে অধিরাজের মুগ্ধ ভক্ত সেটা যতটা না তার মুখে প্রকাশ পেল, তার থেকেও বেশি বোঝা গেল করমর্দনে। অধিরাজ তার দিকে সৌজন্যবশত হাত বাড়িয়ে দিতেই এমনভাবে খপ করে চেপে ধরেছে তার হাত যে অর্ণবের মনে হল, স্যারের হাতটাই বুঝি ভেঙে গেল! নিজের পরিচয় যতটা সংক্ষেপে দিল মিস্ অরোরা, ঠিক ততটাই দীর্ঘ তার করমর্দন! ঐ লম্বা হ্যান্ডশেকের ঠ্যালায় অর্ণবেরই প্রায় দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়! ম্যারাথন হ্যান্ডশেক করতে করতেই মিস্ অরোরা বললেন, “আপনার সঙ্গে কাজ করা আমার স্বপ্ন স্যার। বলুন কী করতে হবে।”

অধিরাজ অসহায়কণ্ঠে বলল, “আমি তখনই আপনাকে কিছু বলতে পারব সেনোরিটা, যখন আপনি আমার হাত ছাড়বেন।”

“ওঃ। স্যরি.....!” টুইঙ্কল তার হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, “স্যরি স্যার, আমি আসলে ওভার এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম। বাট আই মাস্ট সে, আপনার হাত অসম্ভব নরম! আর এত বড়ো সাইজের, এত চোখ ধাঁধানো হীরে আমি জীবনে এই প্রথম দেখছি। আপনার সুন্দর আঙুলে চমৎকার মানিয়েছে দুটোই।”

এরকম কমপ্লিমেন্ট পেয়ে অধিরাজের খুশি হওয়া উচিত না দুঃখিত, তা ভেবে পেল না সে। দুই হাতের দুটো হীরের আংটিই তার বাবার দেওয়া। এতে তার নিজস্ব কোনো কৃতিত্ব নেই। এর মধ্যে একটা হীরে এখন সম্ভবত দুর্মূল্য। এটা বংশানুক্রমে এ বাড়ির পুরুষেরা ধারণ করে আসছে। বাবার মুখে শুনেছে, যখন তাদের কোনো এক পূর্বপুরুষ এই হীরেটি কিনেছিলেন, তখনই এর দাম লক্ষ টাকারও বেশি ছিল। বাবার আঙুলে আংটি স্যুট করে না বলে তিনি নিজে কখনও পরেননি। কিন্তু সম্প্রতিই সেটাকে তিনি আধুনিক স্টাইলের আংটিতে বসিয়ে ছেলেকে পাকড়াও করে পরিয়ে দিয়েছেন। টুইঙ্কল ঠিকই বলেছে। এত বড়ো সাইজের হীরে এখন চট করে দেখা যায় না। আর অন্য হাতের লোটাস ডায়মন্ডটিও বাবারই কাজ। ওঁর মতে, হীরে নাকি পজিটিভ এনার্জি দেয়। তাই যত রাজ্যের পজিটিভ এনার্জি ছেলেকেই দিয়ে রেখেছেন। দুটোই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলতে থাকে। সে এ বিষয়ে কী বলবে ভেবে না পেয়ে স্মিত হেসে বলল, “অ্যান্ড ইউ হ্যাভ আ ভেরি স্ট্রং গ্রিপ।”

“থ্যাঙ্ক ইউ।”

টুইঙ্কলকে ভালোভাবে মেপে নিচ্ছিল অর্ণব। মেয়েটি আত্রেয়ী বা কৌশানীরই সমবয়েসীই হবে। কিন্তু ওকে দেখে প্রথমেই ছেলে না মেয়ে সেটাই বুঝতে পারেনি সে। একদম ছোটো করে ছাঁটা তামাটে চুল। চওড়া কাঠামোর একটু কঠিন মুখ। পুরুষালি চৌকো চোয়াল তার স্বভাবের দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। টুইঙ্কল ফুলহাতা শার্ট পরে থাকলেও শার্টের তলা থেকেই তার পেশিগুলো বেশ বোঝা যায়। চওড়া বাইসেপস যে কোনো পুরুষকেও লজ্জিত করবে। দৈর্ঘ আন্দাজ পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। ওজন পঁচাশি কেজি তো হবেই। তারও বেশি হতে পারে। রীতিমতো দারা সিং এর মহিলা ভার্সান। মেয়েদের দৈহিক বাঁকগুলো প্রায় নেই, তাই কোমলতাও নেই। ইনি কোনোভাবেই সানি লিওনির গোষ্ঠির নন বরং সানি দেওলের গোত্রে পড়েন। বসের হাত ও হীরে নিয়ে তার যা ইন্টারেস্ট, কেস স্টাডিতে তার দশ পার্সেন্ট থাকলেও কাজ হত।

“আমরা এখনই কোমল কৌরের বাড়ি যাব। কোমল কৌরের হিস্ট্রি অর্ণব আপনাকে ব্রিফ করে দেবে। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে মিস্ অরোরা। আমাদের লেডি

অফিসাররা অন্যত্র ব্যস্ত আছেন। তাই আপনাকেই একটু কষ্ট করতে হবে। তবে তার পাশাপাশি আপনার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজও আছে। সেটা পরে জানাচ্ছি।" অধিরাজ সিগারেটের প্যাকেটটা বের করতে-করতেই দেখল টুইঙ্কল অবিকল মেছো বিড়ালের মতো জুলজুল করে সেদিকেই তাকিয়ে আছে। সে ব্যাপারটা বুঝে প্যাকেটটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই মিস্ অরোরা মাথা নাড়ল, "না স্যার। আমি সিগারেট স্মোক করি না। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি একটা চুরুট খেতে চাইব। ওটাই আমার ব্র্যান্ড। সঙ্গেই আছে। তবে আমি কি আপনার সামনে স্মোক করতে পারি? কারণ লাহিড়ীস্যার একদমই অ্যালাউ করেন না তাই...।"

অধিরাজ খুব নম্রভাবেই বলল, "ইয়েস...ইয়েস...অফকোর্স। ইউ ক্যান।"

অর্ণবের বিস্ময়মিশ্রিত দৃষ্টির সামনে টুইঙ্কল তার চুরুটের বাক্স বের করল। তারপর ইয়া মোটাসোটা একটা চুরুট মুখে দিয়ে লাইটারের খোঁজে প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজ সসম্মানে নিজের লাইটারটা জ্বেলে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, "লেট মি হেল্প ইউ সেনোরিটা।"

টুইঙ্কল রীতিমতো অবাক হল। সচরাচর কোনো পুরুষের কাছ থেকে এমন স্বাভাবিক ব্যবহার সে কখনও পায়নি। কিন্তু চুরুটটা নির্বিবাদে ধরিয়ে সে খুব সাবধানে ধোঁয়া ছাড়ল।

আর যা-ই হোক, টপ বসের মুখে ধোঁয়া ছাড়াটা ভদ্রতা নয়। একটু শ্রদ্ধামাখানো আন্তরিক স্বরে বলল, "এতদিন শুধু শুনেছিলাম। এখন স্বচক্ষে দেখছি। আপনি সত্যিই অসাধারণ।"

"অসাধারণত্বের কিছুই নেই মাদমোয়াজেল।" সে নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নির্বিকারভাবেই বলে, "অর্ণব আর মিস্ দত্ত ছাড়া আমরা সকলেই স্মোকার। অর্ণব আগে তবু স্ট্রেস-রিলিফের জন্য মাঝেমধ্যে একটা দুটো টেনে দেখত। পোষায়নি, তাই আর আমাদের মতো নেশা বাঁধায়নি। ইনফ্যাক্ট যিনি আপনাকে স্মোক করতে অ্যালাউ করেন না, সেই প্রণবেশ লাহিড়ীও নিজেই একজন চেইন স্মোকার। আমরা সকলেই জানি যে অভ্যাসটা আমাদের কারোর পক্ষেই ভালো নয়। তবু নিকোটিন ছাড়া এতখানি ধকল নেওয়াও চাপের। বারবার অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। আপনি শান্তিতে স্মোক করতে পারেন। টি বা কফি, কিছু নেবেন?"

"নো থ্যাঙ্কস।"

টুইঙ্কল একটু হেসে নিজের প্রমাণ সাইজের চুরুটে মন দেয়। হাবেভাবেই স্পষ্ট যে সে মাড়ু স্মোকার। তাকে হুশহুশ করে চুরুট টানতে দেখে অর্ণবের চক্ষু চড়কগাছ। সে ঢোঁক গিলে অধিরাজকে আস্তে আস্তে বলে, "নন স্মোকারদের দলে কৌশানী বোসের নাম বলতে আপনি ভুলে গিয়েছেন স্যার।"

"ভুলিনি অর্ণব।" অধিরাজ মুখ টিপে হাসছে, "তোমায় কে বলল মিস্ বোস তোমাদের দলে?"

"মানে?" সে চোখ ব্রহ্মতালুতে তুলে ফেলে, "উনিও ...!"

"বেশ কয়েকবার ব্যুরোর ছাতে ওঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে স্মোক করতে দেখেছি। ব্র্যান্ডটা সম্ভবত মার্লবোরো। আমার কোনো প্রবলেম ছিল না। কিন্তু যতবার উনি ধূমপানরত অবস্থায় আমার মুখোমুখি হয়েছেন, ততবারই হাতটা হয় আড়াল করেছেন, নয়তো সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।" সে দেবশিশুদের মতো পেটেন্ট হাসিটা হাসল, "আমার মনে হয়েছে, হয়তো উনি আমাকে নিজের স্মোকিং এর বিষয়টা জানাতে চান না। তাই আমিও ওঁকে জানাইনি যে আমি ব্যাপারটা জানি, কিংবা ওঁর গা থেকে ধোঁয়ার গন্ধটাও পেয়েছি। যে জানাতে চায় না, তাকে বিব্রত করার কী দরকার?"

"তা ঠিক।" অর্ণব আর কথা বাড়ায় না। মিস্ বোসের সিগারেটের ব্র্যান্ড জানার তার কোনো ইচ্ছে নেই। তবে বেশিরভাগ পুরুষদের মতো সে-ও মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখলে খুব অস্বস্তিতে পড়ে। এর বিশেষ কোনো কারণ নেই। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, ধূমপায়ী নারীদের একটু এড়িয়ে চলতেই ভালোবাসে। এই সোশ্যাল ট্যাবুটা সে

কিছুতেই কাটাতে পারে না। তাই প্রসঙ্গ পালটাল, "কোমলজির বাড়ির সার্চ ওয়ারেন্ট আর অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট এসে গিয়েছে স্যার। লোকাল পুলিশকে ফোন করব?"

"হ্যাঁ। ওদের টিমের ব্যাক-আপও লাগবে। রেডি থাকতে বলে দাও।"

অর্ণব মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একজন মহিলা টপ বসের নাকের সামনে বসে হুশহাশ করে ধোঁয়া ছাড়ছে, এটা তার অসহ্যই ঠেকছিল। তাই সুযোগ পেয়ে মোবাইল নিয়ে কেবিনের বাইরেই চলে গেল। টুইঙ্কল সাবধানে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "কখন বেরোতে হবে স্যার?"

"আপনার চুরুটটা শেষ হলেই বেরিয়ে পড়ব।"

"ইন দ্যাট কেস, আই অ্যাম ডান।"

অর্ধদগ্ধ চুরুটটাকে সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে যাচ্ছিল টুইঙ্কল। তার তৎপরতা দেখে মুচকি হাসল অধিরাজ, "সাউন্ডস গ্রেট। কিন্তু ওটাকে ফেলে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। এনজয় দ্য পাফ। আপনি রাস্তাতেই আরাম করে ওটা টেনে নিতে পারেন। মৌতাত অসম্পূর্ণ রাখার কোনো দরকার নেই।" বলতে বলতেই সেস সিগারেট হাতেই উঠে দাঁড়িয়েছে, "লেটস গো। কিন্তু আপনি কি জানেন যে আমরা এখন ফোর হুইলার ইউজ করছি না?"

"জানি স্যার।" টুইঙ্কলের দ্রুত জবাব, "আমি আঠেরো বছর বয়েস থেকেই বাইক চালাই। লং ট্রিপও করি। লাহিড়ীস্যার আমাকে আগেই বলেছেন।"

অধিরাজ মিষ্টি হাসল, "ওয়াও।"

সারা রাস্তা আর বিশেষ কোনো কথা হল না। অর্ণব কোনোদিনই বাইকে খুব কমফর্টে নয়। সে ফোর হুইলার চালাতেই ভালোবাসে। কিন্তু একজন মহিলা হাতে ধূমায়িত সিগার নিয়ে পাল্লা দিয়ে বাইক চালাচ্ছেন দেখে সে ইমপ্রেসড হবে না চটে লাল হবে বুঝতে পারছে না। একরকম বিরক্তিমাখানো সুরেই অধিরাজকে বলল, "স্যার, ইনি তো দিব্যি স্মোক করতে করতে বাইক চালাচ্ছেন!"

অধিরাজ নির্বিকার, "তোমার কোনটায় অসুবিধে হচ্ছে? স্মোকিং-এ না বাইক চালানোয়?"

"আমার কেমন যেন অকওয়ার্ড লাগছে!"

নিজের অস্বস্তির কথা বলেই ফেলল অর্ণব। শুরু থেকেই এই লেডি অফিসারটিকে তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। প্রণবেশ লাহিড়ী আর কাউকে রেফার করার জন্য খুঁজে পেলেন না। এই 'শিখনী'কেই তার পছন্দ হল। হবে না-ই বা কেন? তিনি নিজেও যেমন তথাকথিত 'রাবণ', তেমন 'হিড়িম্বা'-ই তো ওঁর ফেভারিট হবে।

"তোমার এইজন্য অকওয়ার্ড লাগছে, কারণ উনি একজন মহিলা। নয়তো আমিও তো স্মোক করতে-করতেই বাইক চালাচ্ছি।" অধিরাজ খুব শান্তভাবেই সিগারেটটায় শেষ সুখটান মেরে রাস্তার পাশের একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল, "সোশ্যাল ট্যাবু এখনও তোমার মধ্যে এখনও একটু রয়েই গিয়েছে ডার্লিং। ওঁর হ্যাবিটে কী আসে যায়? উনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তার কারণ উনি একজন ভালো অফিসার। লেডি না ল্যাডা, স্মোকার না ননস্মোকার, তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। তাছাড়া আমরা সবাই জানি যে ইউনিফর্মে স্মোক করা বারণ। কিন্তু ইউনিফর্ম আমরা কালেভদ্রেই পরি। আপাতত কেউ ইউনিফর্মে নেই, তাই বে-আইনি কিছুও করছেন না। ফরগেট ইট।"

অধিরাজ যত সহজে 'ফরগেট ইট' বলে হেলমেটটা টেনে দিয়ে অনায়াসেই নির্লিপ্তির সঙ্গে ব্যাপারটা গ্রহণ করল, অর্ণব ঠিক ততটা পারল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বসেই রইল। আপাতত টুইঙ্কলের চুরুটের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোমল কৌরের বাড়ি। খবরিদের সমস্ত টিপই ওই ভদ্রমহিলার দিকে ইশারা করছে। ভাবতেই অর্ণবের বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে। না জানি তিনি কী বস্তু হবেন! বার্নিং শিখ নিজে যে লেভেলের ডেঞ্জারাস, তার সঙ্গীও হয়তো কিছু কম যান না। কে জানে, তার বাড়িতে কী অপেক্ষা করছে।

পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশি সমস্যা হল না। অর্ণব লক্ষ্য করছিল যে কলোনির বেশিরভাগ লোকই কোমল সিং ভল্লাকে চেনে। এখানে শুধু পাঞ্জাবি বা শিখদের বসতি নয়, অন্যান্য অবাঙালি বাসিন্দারাও দিব্যি মিলেমিশে রয়েছে। তবে ওদের দেখে সকলের চোখেই একটা কৌতূহল ফুটে উঠছিল। বাড়ির কাছাকাছি যেতে-না যেতেই চোখে পড়ল পুলিশের জিপ। লোকাল পুলিশও তবে চলে এসেছে।

কোমল কৌরের বাড়িটা বিরাট। দেখলেই বোঝা যায় যে প্রচুর টাকার মালকিন। কিন্তু কেমন যেন বেখাপ্পা টাইপের। বাড়ির প্ল্যানিং খুবই খারাপ! কোনোরকম ঢক-পদ নেই। দেখলে বাড়ি কম, একটা বিটকেল দুর্গ বলেই বেশি মনে হয়। সবচেয়ে যেটা বিরক্তিকর, অত বড়ো বাড়িটায় মাত্র হাতে গোণা কয়েকটা জানলা! তা-ও সাইজে এত ছোটো যে হাওয়াও ঢোকার আগে পাঁচবার ভাববে যে ঢোকা উচিত হচ্ছে কিনা! জেলের সেলগুলোর জানলার আকারও বোধহয় এর দ্বিগুণ। সামনের লোহার গেট আর উঁচু পাঁচিল দেখে অর্ণবের ডঃ চৌধুরীর মেন্টাল অ্যাসাইলামের গেটটার কথা মনে পড়ে গেল। এই গেট আর পাঁচিল স্বয়ং প্রভু হনুমানও ডিঙোতে পারবেন কিনা সন্দেহ স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের ওসি সূর্যনারায়ণ মল্লিক তাঁর দলবল নিয়েই অপেক্ষা করছিলেন। অধিরাজকে দেখেই সহাস্যে এগিয়ে এলেন। প্রাথমিক সৌজন্যপর্ব খুব সংক্ষেপে সেরে নিয়ে তিনি জানালেন, "আমরা কোমলের সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত তথ্য জেনেছি। ১৯৮৪ সালে যখন দাঙ্গাটা হয় তখন ওঁর বয়েস দশ বছর ছিল। ঐ সালেই উনি কলকাতায় আসেন। নিজের পিসি ও পিসেমশাইয়ের সঙ্গে থাকলেও তিক্ত অতীতের স্মৃতি ওঁকে কখনোই ছাড়েনি। যারা যারা ভদ্রমহিলাকে চেনে, তাদের সকলেরই একটাই মতামত। কোমল সিং ভল্লা অত্যন্ত পিকিউলিয়ার টাইপের মানুষ। এত বছর ধরে কলকাতায় আছেন, পড়াশোনা করেছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়েছেন, দুরন্ত রেজাল্টও করেছেন, গোটা যৌবন কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জীবনে একটিও বন্ধু বা বান্ধবী নেই। এখানকার পুরোনো বাসিন্দারা বলছিল, কোনোদিন ওরা ওঁকে হাসতে দেখেনি। যখন কোমলের পরমাত্মীয় পিসি ও পিসেমশাইয়ের দেহান্ত ঘটেছিল, তখন তিনি একফোঁটা চোখের জলও ফেলেননি! এমনকি ওঁর চাকর-বাকরেরাও বলে, ম্যাডাম কখনও হাসেন না, কখনও কাঁদেনও না। সবসময়ই অদ্ভুত নির্বিকার মুখ। আর সবসময়ই কী একটা রাগে যেন জ্বলছেন। বাড়ির মেড, সার্ভেন্টরা ওঁর মুখের চোটে টিকতে পারে না।"

"বাপ রে।" অধিরাজ ফের অন্যমনস্ক, "ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার!"

"শুধু তাই নয়।" অফিসার মল্লিক কন্টিনিউ করলেন, "সম্ভবত ভীষণ প্যারানয়েডও। বাইরের লোক ওঁর বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারবে এটা একেবারেই পছন্দ করেন না। ঐ যে ছোটো ছোটো খুপরিমার্কা জানলা দেখছেন, ওগুলো আগে ছিল না। একদম বড়ো বড়ো চওড়া এবং খোলা জানলাই ছিল। এবং সংখ্যায়ও অনেক বেশি ছিল। পিসির মৃত্যুর পর কোমল মিস্ত্রি ডেকে নাইন্টি পার্সেন্ট জানলাই সিল করে দিয়েছেন। অত বড়ো বাড়িটায় ন্যূনতম অক্সিজেন ঢুকতে যতখানি স্পেস লাগে, ততখানি চওড়া ছোট্ট সুড়ঙ্গ টাইপের জানলা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর নাকি ভয়, বেশি জানলা থাকলেই প্রতিবেশীরা বাড়ির মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারবে। ভেতরে কী কী আছে দেখে ফেলবে। দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করেন না। যাতে তাঁকে কেউ না দেখে ফেলে, বা তাঁর আসা-যাওয়ার ওপর কেউ নজর রাখতে না পারে, সেজন্য রাতেই বেরোন। দিনের আলোয় লোকে ওঁকে বহুবছর দেখেনি। ওঁর পার্সোনাল মেড বা সার্ভেন্টদের কাছ থেকে যতটুকু বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে, তাতে বোঝা গেছে যে ভদ্রমহিলা ওবেসিটির পেশেন্ট। ওজন প্রায় দুশো কুড়ি কেজির কাছাকাছি। ডাক্তাররা আল্টিমেটাম দিয়ে দিয়েছেন যে আরও কিছুটা মোটা হলে উনি আর এই ধরাধামেই থাকবেন না। তাতে কিঞ্চিৎ খাওয়ার পরিমাণ কমেছে বটে, কিন্তু নড়াচড়া করার ব্যাপারে প্রায় শালগ্রাম শিলা। আপনার মনে হয়, এ জাতীয় চরিত্র বার্নিং শিখের পৃষ্ঠপোষকতা করবে বা তাকে বিশ্বাস করবে?"

"শুধু মনেই হয় না অফিসার...।" সে দৃঢ়স্বরে বলল, "চরিত্রটি শোনার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই জাতীয় মানুষই একমাত্র বার্নিং শিখকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে সাপোর্ট করবে। চলুন, আর দেরি না করে যাওয়া যাক। আশা করি পুলিশকে দেখে উনি আর যা-ই হোক, চোর ভেবে বাইরে বের করে দেবেন না। মন্দিরে এসে শালগ্রাম শিলার দর্শন করাটা আবশ্যিক।"

কিন্তু বাড়ির ভেতর ঢুকতে যাওয়ার আগেই বাধা। বাইরের গেটে পেল্লায় একটা তালা ঝুলছে। কোনো গেটকিপারও নেই। সম্ভবত সে-ও ছুটিতে গিয়েছে। অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকায়, "তুমি তো তালা স্পেশালিস্ট। জিনিসপত্র আছে কিছু?"

অধিরাজের কথা সম্পূর্ণ সত্যি। একটুকরো তার, পিন বা মেয়েদের চুলের কাঁটা জাতীয় কোনো পদার্থ পেলে অর্ণব অনায়াসেই যে কোনো তালা খুলে ফেলতে পারে। সে অধিরাজের কথার উত্তরে কিছু বলতেই যাচ্ছিল, তার আগেই একটা প্রচণ্ড আওয়াজ! গেটের প্রমাণ সাইজের তালা ভেঙে দু টুকরো হয়ে পড়ে গেল। ওরা সবিস্ময়ে দেখল টুইঙ্কল তার ধোঁয়া ওঠা আগ্নেয়াস্ত্রে ফুঁ মারছে, "তালা ছিল। এখন আর নেই স্যার!"

এই মহিলা বোধহয় মশা মারার জন্য বোফর্স কামান আমদানি করেন! অধিরাজ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে ভেতরের দিকে গটগট করে হাঁটা মারল। তার পেছন পেছন পুলিশবাহিনী। টুইঙ্কলের এই আচমকা দিদিগিরি আর দুমদাম কাজ করা দেখে অর্ণব মর্মান্তিক চটেছে! একটা সামান্য তালা খোলার জন্য বুলেট নষ্ট করার কোনো মানে হয়! আর পাখি যদি ভেতরে ঘাপ্টি মেরে বসেও থাকে, তবে ফায়ারিং এর আওয়াজ শুনেই পালিয়ে যাবে। কলোনির লোকেরাও হয়তো আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। খামোখা আনতাবড়ি ফায়ার করে মানুষকে অতিষ্ঠ করাটা কী ধরনের স্টাইল। আপনমনেই গরগর করতে-করতে সে অধিরাজের পশ্চাদ্ধাবন করে। অফিসার মল্লিকের টিমেও দু-জন মহিলা কনস্টেবল ছিল। অধিরাজ একটু পিছিয়ে এসে তাদেরই আগে যেতে দিল, "আপনারাই লিড করুন। কোমল কৌর যেহেতু একজন নারী, তাই তার সঙ্গে লেডি অফিসাররাই আগে কথা বলে নিক।"

"প্রয়োজনে চড়-থাপ্পড় মারা অ্যালাউড?" টুইঙ্কল বলল, "যতটুকু শুনলাম, মনে হয় না সোজা আঙুলে ঘি উঠবে।"

তার কথা শুনে অধিরাজ হেসে ফেলল, "আপনার হাত আটকে রাখবে, এমন লোক এখনও জন্মায়নি। তবে প্রথমে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করাই ভালো।"

কোমল কৌরের বাড়িতে ঢোকা সত্যিই কঠিন। প্রথমেই গেটে ওরকম জগদ্দল একটা তালা। তার ওপর বেশ কয়েকবার বেল বাজিয়েও কোনো সাড়া মিলল না। এমনিতেই পুলিশদের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার অভ্যাস নেই। ডোরবেল বাজিয়েও যখন কাজ হল না, তখন টুইঙ্কলই অধৈর্য হয়ে গুমগুম করে দরজার গায়ে কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিল। তার ধাক্কাধাক্কির ঠ্যালায় মরা মানুষও বোধহয় উঠে এসে দরজা খুলে দেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে-ও ব্যর্থ।

বেশ কয়েকবার দরজায় ধাক্কা আর ঘুষি মেরে শেষে মহাবিরক্ত হয়ে মিস্ অরোরা বলে, "দরজা ভেঙে দেব?"

রীতিমতো বিধ্বংসী মহিলা। অধিরাজ খুব শান্তভাবেই মাথা নাড়ে, "না সেনোরিটা। আর একটু অপেক্ষা করি। একেই ঘরে কোনো চাকর-বাকর নেই। তার ওপর ভদ্রমহিলার ওজন প্রায় দুশো কুড়ি। অতখানি ওয়েট নিয়ে নড়াচড়া করতেও তো সময় লাগবে! আপনার হাত যদি নিতান্তই সুড়সুড় করে, তবে কলিংবেলটার সঙ্গেই একটু 'কুচুপুচু' করে নিন।"

কুচুপুচু আবার কী! অর্ণব এবার সত্যিই রেগে লাল। এই মেয়েটাকে এত লাই দেওয়ার কী হয়েছে! ওর কাণ্ড দেখেই তো মেজাজ গরম হয়ে যায়। কথা নেই বার্তা নেই, দুমদাম ফায়ারিং করে! সবসময়ই ভাঙাভাঙির তালে আছে। আর স্যার ওকে সহ্যই বা করছেন কী করে? শুধু সহ্যই নয়, রীতিমতো প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তার প্রশ্রয় পেয়েই টুইঙ্কল ফের ডোরবেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তার বেল দেওয়ার চোটে পুলিশদেরই কানে তালা লাগার জো! কলিংবেলটার প্রাণ থাকলে সে এতক্ষণের অত্যাচারে স্রেফ পালিয়ে যেত।

একটা অদ্ভুত সন্দেহে অধিরাজের ডান ভুরুটা একটু ওপরে উঠে গেল। ভদ্রমহিলা বাড়িতেই আছেন তো? নাকি কোথাও কেটে পড়েছেন? সে সন্দেহ প্রকাশ করার আগেই এই প্রথম ভেতর থেকে এক কড়কড়ে নারী কণ্ঠস্বর ধমকে উঠল; "আরে খোওেয়া। জান লেগা ক্যায়া! আতি হুঁ।"

অধিরাজ আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, "ওঃ ঈশ্বর। কলিংবেলের আওয়াজ অবশেষে ওনার কানে গেল!"

আরও মিনিট দুয়েকের অপেক্ষা। তারপর খট করে দরজা খোলার আওয়াজ। সামনে যিনি প্রকট হলেন, তাকে দেখে রীতিমতো ভয়ই করে। নিঃসন্দেহে ইনিই কোমল সিং ভল্লা! কারণ খোদ কলকাতার বুকে এমন গন্ধমাদন একটার বেশি আমদানি হয় না। উনি পাঁচটা কেন, দশটা পরোটা খেলেও অর্ণব আশ্চর্য হত না। তিনটে পরোটাই বরং ওর জন্য অস্বাভাবিক! পাখির আহার!

অধিরাজ একদৃষ্টে কোমলের দিকে তাকিয়েছিল। টকটকে ফর্সা রং। বহুদিন সূর্যের আলো যে ওঁকে স্পর্শ করেনি তা পান্ডুর ফ্যাকাশেভাবেই স্পষ্ট। তাঁর চোখ মুখের আদল বলে দেয় যে যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। এখনও হয়তো দেখতে ওঁকে এতটা অদ্ভুত লাগত না, যদি ওঁর মুখে মিনিমাম এক্সপ্রেশনটুকুও থাকত। পৃথুলা, অথচ সুন্দরী মহিলার সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু এমন ভাবলেশহীন চেহারা রোবটের হতে পারে, মানুষের হওয়া অসম্ভব। বড়ো বড়ো চোখদুটোর দৃষ্টি পাথরের মতো কঠিন ও শীতল। মুখে একটাও ভাঁজ নেই। "ওবেসিটি' ওঁর রোগ হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে 'এক্সপ্রেশনলেস' হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

কোমল কৌর দেহে 'মোটা' হতে পারেন, কিন্তু আদপেই মাথামোটা নন। বরং উর্দিধারী আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে এবার কড়কড়ে কণ্ঠস্বরটাকে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বললেন, "পুলিশ।"

"আপনার বাড়ির সার্চ ওয়ারেন্ট আছে ম্যাডাম।" কোনোরকম বাড়তি কথায় না গিয়ে টুইঙ্কল বলল, "আপনার বাড়ি সার্চ করার অর্ডার আছে।"

কোমল সবাইকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। টুইঙ্কলের কথার উত্তরে ঠান্ডাস্বরে বললেন, "অর্ডার যখন আছে, তখন সার্চ করুন।"

"আপনার কোনো আপত্তি নেই তো?"

মিস্ অরোরা একটু যেন বিস্মিত। সে ভেবেছিল কোমলের দিক থেকে নিশ্চয়ই বাধা আসবে। কিন্তু সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন তিনি, "আপত্তির কী আছে? আপনারা পুলিশ! চোর তো নন যে আমার টাকাপয়সা, জুয়েলারি হাতিয়ে নেবেন!" উপস্থিত পুলিশ টিমের দৃষ্টি এবার অধিরাজের দিকে নিবদ্ধ। সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাতেই পুলিশকর্মীরা বাড়ির ভেতরে ঢুকে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকজন দোতলার দিকেও গেল। অধিরাজ, অর্ণব আর অফিসার মল্লিক বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন। কোমল ভাবলেশহীনভাবেই বললেন, "আপনারা ভেতরে আসতে পারেন।"

এতখানি উদারতা অবশ্য ওরা কেউই আশা করেনি। কিন্তু বিস্ময়কে চেপে রেখেই ওরা নিশ্চুপে ঘরের ভেতরে পদার্পণ করল। বাইরের মতোই ভেতরের অবস্থাও একই। সবই আছে, অথচ বড়ো অগোছালো! দেওয়ালে বিরাট টিভি, দামি দামি ফার্নিচার, সোফা, শোকেস, দামি কার্পেট, অপূর্ব সব শো-পিস, একজন ধনী ব্যক্তির বাড়িতে যা যা থাকার কথা, সবই উপস্থিত। তবু দেখলে মনে হয়, কেউ বুঝি অনাদরে, অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখেছে।

কোমলের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে অধিরাজের ওপরে। অস্ফুটে বললেন, "আপনাকে আমি চিনি। কলকাতা পুলিশের হিরোই বটে। বাঙালিদের চেহারার প্রশ্নই ওঠে না। ভারতীয়দের মধ্যে তো দূর, বিদেশিদের মধ্যেও খুব কমই এমন নিখুঁত চেহারা পাওয়া যায়। রবজি'র অপূর্ব সৃষ্টি। তার সঙ্গে খাঁটি রাজপুতি ঔদ্ধত্য আর তেজ। আপনি শিওর যে আপনি বাঙালিরই সন্তান? বাই এনি চান্স, অ্যাডপ্টেড নন তো? আমাদের মতো?"

“না।” অধিরাজ তাঁর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। মহিলা শুরু থেকেই মেন্টাল গেম খেলতে নেমে পড়েছেন, “আমার বাপ-ঠাকুর্দা চোদ্দপুরুষই বাঙালি। অ্যাডপ্টেড হওয়ার গল্পই নেই। তবে বহু পুরুষ আগে যদি কেউ অবাঙালি থেকে থাকেন, তবে সেটা আমার জানা নেই।”

“বুঝলাম।” কোমল অতি কষ্টে হেঁটে গিয়ে সোফার ওপর বসলেন। নরম সোফা প্রায় বিদ্রোহই করে উঠল। সেটাকে পাত্তা না দিয়েই বললেন, “আমার চোখ কিন্তু খুব একটা ধোঁকা খায় না। আপনাদের লেডি অফিসারটি নির্ঘাৎ শিখ! ‘পাঞ্জাবি কুড়ি ছাড়া ওরকম চেহারা হয় না।”

“হ্যাঁ। উনি শিখ।” অধিরাজ শান্তস্বরেই বলল, “আপনার কোনোরকম আপত্তি আছে?”

“না না।” তিনি মাথা নাড়লেন, “শিখ মানে উনি আমার ধর্মবোন। কিন্তু এমনই কপাল খারাপ যে আপনাদের আদর-আপ্যায়ণও করতে পারছি না। আমার শরীরটা আজ সকাল থেকেই বেশ ভোগাচ্ছে। নয়তো সকালেই আমার কাছে আপনাদের আসার খবর এসে গিয়েছিল। কিন্তু তবিয়ত খারাপ বলে আপনাদের খাতির করার সুযোগটুকুও পাইনি। কুকটাও চলে গেছে।”

“আদর-আপ্যায়ণের জন্য তো আপনার গেস্টই আছেন।” সে সতর্কদৃষ্টিতে চতুর্পাশটা দেখে নেয়, “কিন্তু তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না! আপনার অতিথি কি বিদায় নিয়েছেন?” এতক্ষণে একটা অদ্ভুত বদমায়েশি হাসি ফুটে উঠল কোমলের মুখে, “আপনারা কি তাঁকে খুঁজতে এসেছেন?”

“না খুঁজে উপায় কী? তিনি গোটা শহরকে যেভাবে নাচিয়ে ছাড়ছেন, তাতে তাঁর খোঁজ তো করতেই হত।” অধিরাজ যেন আরও শীতল, “বাই দ্য ওয়ে, কে হন্ তিনি আপনার?”

“আমার বোন।” কোমলের চোখের পলকও পড়ল না, “দিল্লিতে থাকে। কিছুদিনের জন্য এসেছে।”

“হ্যাঁ। সম্ভবত বাহাত্তর ঘণ্টার জন্য। তাঁর টাইমিংও ভারি অদ্ভুত। দিনের বেলা কী করেন তিনি? কলকাতা দর্শন?”

“ধরে নিন তেমনই কিছু।”

“নাম?”

“সোনম কৌর।” এবার তিনি একটু ব্যঙ্গাত্মক, “বয়েস বেয়াল্লিশ। আনম্যারেড। যদিও আপনার থেকে বয়েসে অনেক বড়ো, তবু বেশ সুন্দরী। ঠিকানা বা ফোন নম্বর লাগবে?”

“পেলে ভালোই হত। তার চেয়েও ভালো হত মুখোমুখি সাক্ষাত হলে।”

“ডিনার ডেটে নিয়ে যেতে চাইলে আমার দিক থেকে আপত্তি নেই। সোনমও আপনার মতো বেহদ ‘হাসিন' পুরুষ দেখলে খুশিই হবে।”

অর্ণবের মনে হচ্ছিল দু-জন দক্ষ যোদ্ধা যেন তরোয়াল দিয়ে একে অপরকে মেপে নিচ্ছে। দুটো শাণিত তরবারি যেন একে অপরকে আঘাত করছে, কিন্তু যোদ্ধারা কেউই কাউকে পরাজিত করতে পারছে না। কখনও আক্রমণে যাচ্ছে, কখনও বা ডিফেন্সিভ। তবু কেউ কাউকে ছুঁচ্ছে না। অধিরাজ এমন ভয়াবহ কমপ্লিমেন্ট পেয়েও বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, “তিনি যখন নেই, তখন আপনাকেই ডিনারে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছি। দুঃখের বিষয় জেলে পরোটা পাওয়া যায় না।”

“হুঃ।” কোমল একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, “আপনাদের আইন ব্যবস্থার মতো জেলের অবস্থাও শোচনীয়!”

সে তার উত্তরে কিছু বলতেই যাচ্ছিল, তার আগেই টুইঙ্কল অরোরার জোরালো গলা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল, “স্যা-র।”

অধিরাজ পূর্ণদৃষ্টিতে শব্দের উৎসের দিকে তাকায়। টুইঙ্কল সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে আসছে। তার গ্লাভস পরা দু-হাতে দুটো বিরাট কন্টেনার। যেভাবে অনায়াসেই সে অমন ভারি কন্টেনারগুলোকে টেনে আনছে তাতে মনে হয় মেয়েটা জিমে রীতিমতো লোহা-লক্কড়,

ডাম্বেল-বার্বেল তোলে! ওয়েট লিফটিং করলেও আশ্চর্য হবে না অর্ণব।

"ইয়েস মিস?"

যথারীতি মিস্ এর পর পদবীটা মিসিং। পাশ থেকে অর্ণব বলে দেয়, "অরোরা।" টুইঙ্কল অবশ্য তার সম্পূর্ণ নাম উচ্চারিত হওয়ার অপেক্ষা করেনি। সে হাতের কন্টেনারদুটো তুলে দেখাল, "হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড স্যার।"

"হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড? এই দুটো কন্টেনারই আছে?"

"না। টোট্যাল বারোটা। দোতলার স্টোররুমে রাখা ছিল।" টুইঙ্কল নীচে নেমে এসে কন্টেনারদুটো অধিরাজদের সামনে রেখে দিয়ে বলে, "বাকিগুলো ওরা নিয়ে আসছে।"

সে প্যান্টের পকেট থেকে একটা বিল বের করল, "সঙ্গে এটাও পেয়েছি। বারোটা হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিডের কন্টেনার আজ সকালেই এখানে ডেলিভারড হয়েছে। টোট্যাল অ্যামাউন্ট বা অন্যান্য সব ডিটেলস বিলেই আছে। আমি কন্টেনারগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়েছি। সবক-টাই ভালোভাবে সিলড। কোনোটার সিলই ভাঙা হয়নি।"

অধিরাজ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বার্নিং শিখের হাতে তবে এখনও হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড পৌঁছয়নি। নয়তো অন্তত একটা কন্টেনার মিসিং থাকত বা কোনোটার সিল খোলা থাকত। টুইঙ্কলের কর্মতৎপরতায় সে বেশ খুশি হল। মেয়েটা শুধু শক্তিই রাখে না, বুদ্ধিও আছে। সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে। সে সপ্রশংস ভঙ্গিতে বলে, "গুড ওয়ার্ক মিস্ অরোরা।" তার দৃষ্টি এবার কোমলের দিকে ফিরল, "এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?"

"বক্তব্যের আবার কী আছে?" তিনি রীতিমতো বিরক্ত, "কৌনসা তীর মার লিয়া আপনে? আমার বিজনেসে হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড সবসময়ই লাগছে। ওটা আমার ফ্যাক্টরিতে লাগে। আমার কাছে পারমিট আছে।"

"অ্যাসিড বাল্ব তৈরি করার পারমিটও নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?" অধিরাজ ইস্পাতকঠিন স্বরে বলল, "তার সঙ্গে বম্ব বানানোরও পারমিশনটাও কি নিয়ে নিয়েছেন?"

"আমি বম্ব বানাই এ খবরটা আপনাকে কে দিল?" কোমলের মুখও শক্ত, "প্রমাণ ছাড়া এভাবে অ্যালিগেশন আপনি লাগাতে পারেন না।"

"প্রমাণ আছে স্যার।"

কয়েকজন কনস্টেবল একতলাটা তন্ন তন্ন করে সার্চ করছিল। তারা এবার কয়েকটা কার্ডবোর্ড বক্স নিয়ে ফিরে এসেছে। অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল তার মধ্যে নানারকমের ডিভাইস এবং বম্ব বানানোর জিনিসপত্র। বেশ কিছু আউটার কেসিং এবং ইনার এক্সপ্লোসিভ কেমিক্যালও রয়েছে। তার মধ্যে একটা দুটো আস্ত বম্বও চোখে পড়ল। যদিও এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ফিউজ আর সার্কিট লাগানো এখনও বাকি! তবু দেখলেই চেনা যায়, বম্বই বটে।

সে অফিসার সূর্যনারায়ণ মল্লিককে বলল, "এগুলোকে ইমিডিয়েটলি বম্ব স্কোয়াডের কাছে পাঠিয়ে দিন।"

"ইয়েস স্যার।"

অধিরাজ এবার কোমলের দিকে তাকাল, "এবার কী বলবেন কোমলজি? নিশ্চয়ই এগুলো আপনি নিউ ইয়ারে আতশবাজি করার জন্য বানাননি?"

"নিউ ইয়ার অবধি অপেক্ষা করবেন কেন?" কোমল মুখ টিপে হাসলেন, "আমার আতশবাজি কি আপনারা অলরেডি দেখেননি? খুব খারাপ ছিল না নিশ্চয়ই।"

এবার বোধহয় টুইঙ্কলের ভদ্রমহিলার ঔদ্ধত্য আর সহ্য হল না। সে সপাটে এক চড় বসিয়ে দিয়েছে কোমলকে, "শরম নেহি আতি? একগাদা বম্ব তৈরি করে একটা রাক্ষসের হাতে তুলে দিয়েছিস তুই। সে সারা শহরে যাকে পারছে বম্ব মেরে ওড়াচ্ছে, যাকে খুশি অ্যাসিড বাল্ব ছুড়ে মারছে। তরোয়াল দিয়ে কুচিকুচি করে নিরীহ মানুষগুলোকে মারছে, পোড়াচ্ছে, আর তুই হাসছিস? বজ্জাত ঔরত। শিখের নামে কলঙ্ক।"

কোমলের ফর্সা মুখে পাঁচ আঙুলের ছাপ বসে গিয়েছে। তাঁর ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত

পড়ছিল। কিন্তু এতক্ষণে দু-চোখে যেন ধ্বক করে দাবানলের আগুন জ্বলে উঠল। তিনি আঙুল দিয়ে রক্তের বিন্দু মুছে নিয়ে প্রচণ্ড রাগে বললেন, “নেহি আতি শরম! দু-চারটে লোককে উড়িয়েছে, পুড়িয়েছে, কেটে টুকরো টুকরো করেছে, তাতে কী হয়েছে? ক্যায়া গুনাহ কিয়া? আর এই যে সেদিনের ছুকরি, একটা লোক....মাত্র একটা লোক কয়েকটা মানুষকে মেরেছে, কেটেছে, তাতেই তোর এত জ্বলছে! তাকে তুই রাক্ষস বলছিস। আর এমনই হাজার হাজার ‘রাক্ষসের টোলি' দিল্লির রাস্তায় নেমে কতগুলো নিরীহ শিখকে ধরে সবার সামনে জ্বালিয়েছে, কেটেছে, অ্যাসিডে পুড়িয়েছে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাদের কী বলবি? একজন আজ ঐ একই কাজ করছে বলে সে সিরিয়াল কিলার! আরেঃ, এমন হাজার সিরিয়াল কিলারে ভরে গিয়েছিল দিল্লির রাস্তা। তোর আইন তাদের ছুঁতেও পারেনি, শা-লা কঞ্জার সব। শুধু তাই নয়, যে মেয়েগুলোর চোখের সামনে স্বামীদের জ্বালিয়েছে, কেটেছে, সেই বিধবাগুলোকে পর্যন্ত ছাড়েনি। ধরে ধরে গ্যাং রেপ করেছিল তোর সরকারের পোষা গুণ্ডাগুলো। ‘দরিন্দগির' সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তারা। আজ সেই রাক্ষসগুলোই সব মুনিঋষির ভেক ধরে বসে আছে, সবাই ভুলেছে, কিন্তু আমরা ভুলিনি।”

টুইঙ্কল ফের হাতা গুটিয়ে তেড়েমেড়ে যাচ্ছিল। তাকে চোখের ইশারায় শান্ত করল অধিরাজ, “আপনার সঙ্গী এখন কোথায়?”

“বলব না! মরে গেলেও বলব না।” গর্জন করে উঠলেন তিনি, “যা করার করে নিন আপনারা। আজ আপনাদের ‘দুখতি রগে' হাত পড়েছে বলে খুব ব্যথা করছে, তাই না? এতদিনে জেনেছেন যে আপন মানুষগুলোর এমন দুর্দশা, এমন ‘ওয়াহিয়াত মওত' হলে কেমন লাগে! এখন নিজেদের ঘরে আগুন লেগেছে বলে পোড়ার জ্বালা টের পাচ্ছেন!” বলতে বলতেই উত্তেজনায় নিজের বুকের ওপর হাত দিয়ে জোরে আঘাত করলেন কোমল, “আমরা সেই জ্বালা নিজেদের ছাতিতে এতদিন ধরে বয়ে বেরিয়েছি। আমায় জিজ্ঞাসা করুন, চোখের সামনে নিজের বাপ-দাদা-জ্যেঠাকে জ্যান্ত পুড়ে মরতে দেখলে কেমন লাগে? আমায় প্রশ্ন করুন, একটা দশ বছরের মেয়ের চোখের সামনে তার মাকে দশজন একসঙ্গে বলাৎকার করে যখন তার ‘আঁতরি' বের করে ফেলে তখন কী মনে হয়! জানতে চান, যে দশ বছরের একটা নরম মেয়েকে যখন কতগুলো দরিন্দা রেপ করে, তখন তার কতটা রক্তক্ষরণ হয়! জানেন আপনারা? কিচ্ছু জানেন না! যে নরকের একঝলক আপনারা দেখছেন, সেই নরকের গোটাটা আমি দশ বছর বয়েসেই দেখে নিয়েছি। নিজের চোখে নিজের সুখের সংসার জ্বলতে দেখেছি। যখন শয়তানগুলো আমার ওপর আশ মিটিয়ে অত্যাচার করে, আধমরা অবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল, তারপর আমি ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে আমার বাবা-মা, দাদা-জ্যেঠু সবার লাশ খুঁজে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। গোটা গলিতে শুধু রক্তমাখা কতগুলো কাটা অঙ্গ, আর ছাইয়ের স্তূপ পড়েছিল। একটা দশবছরের মেয়ে তার মধ্যে অন্তত একটা পরিচিত মুখ খুঁজছিল, একটা আপন মানুষকে....! কিন্তু সেখানে ছাই-ভস্ম আর রক্ত ছাড়া কিছু ছিল না। কোই নেহি মিলা... কোই নেহি মিলা মুঝে... ম্যায় রাতভর টুন্ডতি রহি, রোতি রহি, মা-বাপু কো পুকারতি রহি, কোই নেহি থা ওয়াহাঁ... কোই নেহি...!” বলতে-বলতেই ভদ্রমহিলার চোখ রাগে, দুঃখে লাল টকটকে হয়ে গিয়েছে, “ওদের শেষ দেখার সুযোগটুকুও দেয়নি শয়তানগুলো! আমি আপনজনের লাশগুলোকে জড়িয়ে ধরে শেষবারের মতো চিৎকার করে কাঁদতে চাইছিলাম। কিন্তু ওখানে শুধু কতগুলো পোড়া হাড় ছিল! কাউকে চিনতে পারিনি...। ....কোই নেহি মিলা...!”

সেই কোমল কৌর, যাকে কেউ কখনও কাঁদতে বা হাসতে দেখেনি সেই ইস্পাতকঠিন মানুষটারই চোখ বেয়ে এবার নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তাঁর মুখটা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। যেন প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্পকে কোনোমতে আটকানোর চেষ্টা করছেন। অধিরাজ কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যিই এখানে কিছু কি তার আদৌ বলার আছে! এই নারীকে সান্ত্বনা দেওয়ার সাহসও তার নেই। কিন্তু তার কর্তব্য তাকে করতেই হবে। পুলিশের কর্তব্য কখনো কখনো বড়ো অমানবিক। তবু...। সে কিছুটা সময় ওঁকে দিয়ে কিছুক্ষণ

নীরবতা বজায় রাখল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, “বার্নিং শিখ এইমুহূর্তে কোথায়? তার আসল পরিচয় কী? এরকম ব্রিলিয়ান্ট মার্ডার ওয়েপন নিশ্চয়ই তার মাথা থেকে বেরোয়নি। ওটা আপনার মতো জিনিয়াসের পক্ষেই সম্ভব। কীভাবে গ্যাসটাকে ইনসার্ট করছে সে?”

“বার্নিং শিখ কে?” তিনি বিড়বিড় করে বললেন, “সে আমার পরমাত্মীয়। আমার একমাত্র সমব্যথী। সে ছাড়া এ জীবনে আমার আর আপন কেউ নেই। তার সঙ্গে বেইমানি করতে বলছেন? মরে গেলেও বলব না।”

ততক্ষণে বাকি পুলিশকর্মীরাও সার্চ শেষ করে ফিরে এসেছে। নামিয়ে আনা হয়েছে সবক-টা অ্যাসিডের কন্টেনার। দু-জন মহিলা কনস্টেবলও ফিরে এসেছেন। একজন বললেন, “পুরো বাড়ি সার্চ করেছি স্যার। উনি ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। কুকও নেই। সে দুপুরের লাঞ্চ বানিয়ে টেবিলের ওপর ঢাকা দিয়ে চলে গেছে।”

অধিরাজ চিন্তিত দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল, “কোনোরকম গ্যাসের কন্টেনার পেয়েছেন আপনারা? বা পেট্রোলের বোতল?”

প্রত্যেকেই নেতিবাচক মাথা নাড়ছে, “না স্যার।”

“ফাইন।” সে টুইঙ্কলের দিকে তাকায়, “এঁকে অ্যারেস্ট করুন। দেখা যাক জেলের খাবার খেয়ে ওঁর পেট থেকে সব খবর বেরোয় কিনা।”

কোমলের চোখে কৌতুক আর বিদ্রূপ ভেসে ওঠে, “আপনাদের জেলে তো এসি নেই বোধহয়। আমি আবার মোটাসোটা মানুষ। অল্পেতেই ঘেমে যাই। গরম লাগে। শেষবারের মতো একটু এসির হাওয়া খেয়ে নিই। কেমন?”

এই শীতে এসি। অর্ণব অবাক। মহিলা কি মেন্টাল পেশেন্ট। সে অধিরাজের দিকে তাকায়। অধিরাজের চোখে গভীর সন্দেহ। সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কোমলের দিকে তাকিয়ে আছে। কোমল ইতিমধ্যেই টেবিলের ওপরে রাখা একটা ছোট্ট রিমোট তুলে নিয়েছেন। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সেদিকে তাকিয়ে থাকল অধিরাজ। পরক্ষণেই অসম্ভব ত্রাসে উন্মত্তের মতো চেঁচিয়ে উঠল, “এভরিবডি! আ-উ-ট! আ-উ-ট! বাইরে চলে যান, ইমিডিয়েটলি।”

উর্দিধারীরা কিছু বুঝল কিনা কে জানে। কিন্তু তারা প্রাণপণে দুড়দাড় করে ছুটে গেল বাইরের দিকে। অফিসার মল্লিকও দৌড় লাগালেন বাইরে। টুইঙ্কলও জ্যা মুক্ত তীরের মতো সবেগে ছুটেছে দরজার দিকে। অর্ণব তখনও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! সে সভয়ে দেখল কোমল রিমোটের একটি বিশেষ বোতাম টিপতে চলেছেন। শুনতে পেল, তাঁর উন্মাদের মতো খলখল হাসি! কী ভয়াবহ সে হাসি...! কী ভয়ংকর!

“অর্ণব...!” তার হাত ধরে প্রচণ্ড জোরে টান মারল অধিরাজ, “দেখছ কী! ওটা এসির রিমোট নয়! রা-ন...!”

এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেল অর্ণব। দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আপ্রাণ দৌড় মারল বাইরের দিকে। তার পেছনে অধিরাজও। দৌড়োতে দৌড়োতেই শুনতে পেল কোমলের অট্টহাসি। ডাইনির মতো খলখলিয়ে হেসেই চলেছেন তিনি। হাসির তালে তালে কেঁপে কেঁপে উঠছে তাঁর দেহের থরে থরে নেমে আসা মেদ। হাসতে হাসতেই চেঁচিয়ে উঠে বললেন, “টেন... নাইন... এইট... সেভেন...।”

পুলিশের টিম লেডি কনস্টেবল ও অফিসারদের সমেত সবে বাড়ির গেট অবধিই পৌঁছতে পেরেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই পেছন থেকে একটা জোরালো বিস্ফোরণের শব্দে যেন মাটি থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। অর্ণব শুনতে পেল অধিরাজের আর্তস্বর, “...লাই ডাউন... টেক কভার... লাই ডাউন...।”

উপস্থিত সকলেই সটান মাটির ওপরেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। ওদিকে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ হয়েই চলেছে! চতুর্দিক প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিঃশ্বাসে ধোঁয়ার কটু গন্ধ! অর্ণবের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কভার দিয়েছে অধিরাজ। টুইঙ্কল দেওয়ালের সেফ সাইডে কভার নিয়ে শুয়ে পড়েছে। তার সঙ্গেই লেডি কনস্টেবলরা রয়েছে। বাকিরাও মাথা আর কান দু-হাত দিয়ে ঢেকে ভূমিশয্যা নিয়েছে।

পেছনের অট্টালিকা তখন মুহুর্মুহু বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত। বেশ খানিকটা অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙেও পড়ল! আগুনের হল্কা ভলকে ভলকে খোলা দরজা দিয়ে, ছোটো ছোটো জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। গোটা কাঠামোটাই একটু একটু করে ধ্বসে পড়ছে। বাকিটাকে গ্রাস করে নিচ্ছে লেলিহান আগুনের শিখা। সেই বিস্ফোরণ থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। হয়তো ঐ ভাঙা খণ্ডহরের মধ্যে, আগুনের জ্বালাময়ী আলিঙ্গনেই হাসতে হাসতে হারিয়ে গেলেন কোমল। তবুও মুখ খুললেন না!

অধিরাজ এবার অর্ণবের ওপর থেকে সরে যায়। এক্সপ্লোশনের ইমপ্যাক্টে তার গায়ে বাড়ির দু-চারটে ইঁটের টুকরো ছিটকে এসে লেগেছে। মাথার একদিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু অর্ণবের গায়ে আঁচটুকুও লাগেনি। বাকিরা প্রাণে বাঁচলেও সম্পূর্ণ অক্ষত নেই। কারোর মাথা ফেটেছে, কারোর বা বিস্ফোরণের ধাক্কায় সামান্য হলেও হাত, পা পুড়েছে। গোটা টিমটাই যখন উঠে দাঁড়াল, তখন দেখে মনে হল ওরা বুঝি এইমাত্রই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছে।

অর্ণব কোনোমতে বলল, “উনি আগেই জানতেন আমরা আসব। এটা ট্র্যাপ ছিল স্যার!”

অধিরাজ আলগোছে কপালের রক্ত মুছল। তার চোখে সংশয় ও সন্দেহ স্পষ্ট। গম্ভীর মুখে শুধু বলল, “হুঁ।”

* *

(১৬)

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ডায়েরি

চোখটা বড্ড জ্বালা করছে। হয়তো কয়েক ফোঁটা চোখের জল বেরিয়ে এলে একটু শান্তি পেতাম। কিন্তু বহুবছর আগেই কান্না জিনিসটা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে। এই পোড়া খটখটে চোখদুটো তো কাঁদতেও জানে না। 'জল' নামের জিনিসটার অস্তিত্ব আর টের পাই না। সেখানে এখন শুধু আগুন! শুধু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া একটা লাভা আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়। একটা অদৃশ্য আগুনের লেলিহান শিখা বুকের ভেতরটা খাঁক করে দিয়েছে। সেখানে অশ্রু, দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ, ব্যথা, কোনো অনুভূতিই নেই! শান্তি, নেই, স্বস্তি নেই, সুখ নেই! কিচ্ছু নেই!

তবুও কখনো কখনো কষ্ট হয়। তবু যন্ত্রণা হয়। এই মুহূর্তে টিভিতে খবরের হেডলাইন হিসাবে স্ক্রিনে বারবার ভেসে উঠছে কোমলদিদির বাড়ি। না, ভুল হল। বাড়ি নয়, বরং বিধ্বস্ত, ভাঙাচোরা একটা ধ্বংসস্তূপ! আগুনের লকলকে জিহ্বা এখনও লাফিয়ে লাফিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে। কেউ দেখলে বলবে না, ওটা কয়েক মুহূর্ত আগেও একটি মানুষের বাসস্থান ছিল। রিপোর্টাররা গায়ের জ্বালায় যা খুশি তাই বলে চলেছে ওর সম্পর্কে! কেউ বলছে, 'বার্নিং শিখের হেল্পার', কেউ বলছে 'উগ্রবাদী-খালিস্তানি', 'টেররিস্ট', কেউ বা ওর সঙ্গে আমার প্রেমের 'রিশতা'ও জুড়ে দিচ্ছে। এরা কেউ কোমলদিদির সম্পর্কে কিছু জানে না, কিচ্ছু বোঝে না! অথচ অর্থহীন প্রলাপ বকেই চলেছে। কোমল কৌর যখন বেঁচে ছিল, তখন তার যন্ত্রণার কথা, জ্বালার ইতিহাস কেউ শোনেনি। কেউ ওর ভেতরের আগুনকে স্তিমিত করার চেষ্টা করেনি। গোটা জীবনে একবিন্দু ভালোবাসাও পায়নি কোমল কৌর। সবাই তার বাইরের রূপ নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে, মেজাজ নিয়ে যা তা বলেছে। সবকিছু দেখেছে, শুধু ওর ভেতরের কষ্টটাকে কেউ বোঝেনি। কেউ বোঝেও না...!

কিন্তু আমি তো জানতাম! আমি দিদিকে বহুবার বলেছি, কখনো না কখনো পুলিশ ঠিক শুঁকে শুঁকে ওর কাছে পৌঁছে যাবে। দিদি হেসেই উড়িয়ে দিত। বলত, "আসল সময়েই এল না, এখন আর এসে কী করবে? যদি এসেও পড়ে, তবে দেখা যাবে।" এমনকি আমাকেও 'ওয়াহেগুরুর ওয়াস্তা' দিয়ে রেখেছিল, কোনোদিন যেন ভুলেও ওকে ফোন না করি। প্রয়োজন পড়লে যেন সোজা ওর বাড়িতেই যাই। কারণ কোমল কৌর ধরা পড়লে ওর 'কল ডিটেইলস রেকর্ড' খুঁজে দেখবে পুলিশ। দিদি চায়নি, সি ডি আরের মাধ্যমে কোনোমতেই ওরা আমার কাছে এসে পৌঁছক। আমি জানি, ওরা পারবেও না। কোমলদিদি নিজেকে সমেত সব কিছুই উড়িয়ে দিয়েছে। মানুষটা তো ঠিকমতো হাঁটতেও পারত না! জানত, কোনোমতেই ও পালাতে পারবে না। তাই নিজেকে আগুনের মধ্যেই সঁপে দিল। আগুনেই জ্বলে গেল সব দুঃখ, রাগ, কষ্ট। না জানি, 'জিন্দা' জ্বলেপুড়ে যেতে ওর কত কষ্ট হয়েছে। কে জানে, লেডি অফিসাররা ওর ওপর কোনো অত্যাচার করেছে কিনা! এখনও ফায়ার ব্রিগেড আপ্রাণ চেষ্টা করছে ঐ ধ্বংসাত্মক আগুন নেভানোর। রিপোর্টাররা জানাচ্ছে, ঐ বিধ্বংসী বিস্ফোরণের আওতা থেকে পুলিশেরা নিজেদের বাঁচাতে পারলেও কোমল কৌরকে বের করে আনা সম্ভব হয়নি। হয়তো ঐ খণ্ডহরের মধ্যেই পড়ে থাকবে দিদির পার্থিব শরীরের 'রাখ। আত্মা, মন তো কবেই পুড়েঝুড়ে গিয়েছিল। ১৯৮৪ সালেই ও মরে গিয়েছিল। বাকি ছিল শুধু খাঁচাটা। সেটুকুর ছাইও আমার ভাগ্যে জুটল না! কোমলদিদি...। আমার দিদি...! সে ও চলে গেল...! আমার জন্য শেষ হয়ে গেল ও! আর এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই! কেউ না!

টিভির পর্দায় এখন সি.আই.ডি. হোমিসাইডের হিরোর ছবি ভেসে উঠেছে। যতবার ওকে রিপোর্টাররা প্রশ্ন করছে, একটাই উত্তর দিচ্ছে, "নো কমেন্টস।" কপালের ধার বেয়ে এখনও রক্ত পড়ছে, অথচ কী তেজি! কী উদ্ধত! কাঁধের জখমটা ওকে থামাতে পারেনি। কপালের

ক্ষতও থামাতে পারবে না। কোমলদিদি হাসতে হাসতে বলেছিল, “এবারে ভুল লোকের সঙ্গে পাঙ্গা নিয়েছিস ভাই। ওর মুখের তেজ দেখেছিস? তিখি মির্চি! এ ব্যাটাকে হারাতে তোর দাঁত ‘খট্টা’ হয়ে যাবে। সাবধানে থাকিস, নয়তো নাঙ্গা করে দেবে।”

সত্যিই ‘নাঙ্গা’ করে দিচ্ছে! এক এক করে ছিনিয়ে নিচ্ছে আমার সব হাতিয়ার। টায়ার আর কেরোসিন আগেই গিয়েছিল। পেট্রোল তোলাটাই বোধহয় কাল হল। কোমলদিদিই ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো জোর। কিন্তু সেখানেও জোরদার ধাক্কা! আমার একমাত্র আশ্রয়টুকুও ছিনিয়ে নিল ও। দিদির সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্যান্য হাতিয়ারগুলোও গেল! এখন হাতে আর অ্যাসিড বাল্ব নেই, বম্ব নেই, এমনকি ঘুমের ওষুধ বা অন্য কোনো ড্রাগ সাপ্লাই করার লোকও নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই লোকটা শহরের সমস্ত ফার্মাসিগুলোকে অ্যালার্ট করে দেবে যাতে বিনা প্রেসক্রিপশনে কেউ ঘুমের ওষুধ কিনতে না পারে, অথবা কিনলেও বড়জোর দু-দিনের কোটা। অথবা হয়তো ফরমানই জারি করবে যে আগামী দু-দিনের মধ্যে যেন কেউ কোনো সেডেটিভ বা স্ট্রেস ফ্রি জাতীয় ড্রাগস না বিক্রি করে। দ্বিতীয়টার সম্ভাবনাই প্রবল। যেমন আমি ওদের ওপর একের পর এক হামলা করে ওকে দুর্বল করার চেষ্টা করছি, তেমনই ও আমাকেও একটু একটু করে দুর্বল করছে। সকালের খবরে বলা হচ্ছিল যে ফরেনসিক আর ইনফর্মার নেটওয়ার্কের সাহায্য সি.আই.ডি. আর পাবে না। আর এই মুহূর্তের খবর, কোমল কৌরের মৃত্যুর পর বার্নিং শিখ প্রায় নিরস্ত্রই হয়ে পড়েছে। সি.আই.ডি. যেমন কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়েছিল, তেমন বুঝতে পারছি, আমিও কিছুটা পিছিয়ে গেলাম।

কোই না। এখনও আমার কাছে আসল অস্ত্রটা আছে। আসল তুরুপের তাস। কোমলদিদি নেই, কিন্তু ওর তৈরি করে দেওয়া মারণাস্ত্রটা এখনও প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। সেগুলো ওরা পায়নি। পাবেও না। আপ্রাণ বিশ্বাস করতে চাইছি যে, ‘মিশন কালরাত্রি' অবশ্যই সফল হবে। কিন্তু তবুও এই প্রথমবারের জন্য, একটা অদ্ভুত সংশয় আমার মনে মধ্যে বারবার ঘুরে মরছে। এই প্রথমবার নিজের ওপরেই সন্দেহ হচ্ছে, ‘কাবলিয়তের’ ওপরেও সন্দেহ হচ্ছে!

এখনও পর্যন্ত যতবার আমার এবং আমার শিকারদের মধ্যে যারা এসেছে, তাদের মেরে, কেটে, জ্বালিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। এখানেও তার অন্যথা হয়নি। ফরেনসিককে সরিয়েছি, ইনফর্মার নেটওয়ার্ককে সরতে বাধ্য করেছি। শিকার ও পুলিশের ওপর নিজের আতঙ্ক বা ‘দহশত' কায়েম করতে সফল হয়েছি। কিন্তু আই জি অধিরাজ ব্যানার্জি নামের ব্যাটসম্যানটি যতক্ষণ ক্রিজে ‘নট আউট’ হয়ে আছে, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। কোমলদিদি ঠিকই বুঝেছিল। এ লোকটা যতক্ষণ টিকে থাকবে, ততক্ষণ আমায় গলদঘর্ম করে ছাড়বে। আশ্চর্য মানুষ একটা। মাঝেমধ্যে রীতিমতো সন্দেহ হচ্ছে, ও কি কোনো মন্ত্রবলে আমার মাথার ভেতরে ঢুকে বসে আছে? এতদিন একতরফা মেন্টাল গেম আমিই খেলে এসেছি। এ লোক তো দেখছি আমাকেও টেক্কা দিচ্ছে! খবরি বা ফরেনসিক নেহাতই অস্ত্র। অস্ত্রটা তখনই ভীষণ রূপ ধরে যখন তাকে চালাবার হাতটা এবং তার পেছনের মস্তিষ্কটা ‘মারাত্মক’ হয়। ঔজারটা কেড়ে নিলেও সেই শক্তিশালী হাত আর মস্তিষ্ক এখনও রয়েছে, ও আমার প্রতিটা পদক্ষেপ বুঝে নিচ্ছে। এর থেকে বিপজ্জনক আর কিছু হতেই পারে না।

প্রথম ঝট্‌কাটা তখনই খেয়েছিলাম, যখন দেখলাম এই গোটা কলকাতা শহরে আমি ঠিক কাদের ওপর আক্রমণ শানাবো, সেটাই ও বুঝে বসে আছে। বাকি তিনটে শহরে পুলিশ নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু এবার অধিরাজ ব্যানার্জি আমায় পড়ে ফেলল, আর আমারই ‘বেস অব অপারেশনে' ওদের দল এসে ঘাঁটি গাড়ল। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধটা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। তবুও অতটা অবাক হইনি। কারণ দ্বিতীয় ঝটকাটা খাওয়া তখনও বাকি ছিল। আমি আশা করেছিলাম, যদি বুঝেও থাকে সেক্ষেত্রে বড়ো বড়ো চেহারার পুরুষ উর্দিধারীরা এসে উপস্থিত হবে। আর অমন উর্দিধারীদের কুপোকাত করার মন্ত্র আমার জানা আছে!

কিন্তু আমার সেই কনফিডেন্স চুরমার হয়ে গেল যখন দেখলাম, কোনো লম্বা চওড়া উর্দিধারী নয়, বরং নেহাৎই শান্তশিষ্ট দুই লেডি অফিসার এসে হাজির। প্রথমে নির্বোধের মতো হেসে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল, অধিরাজ ব্যানার্জি নামের সুপারকপ এত বড়ো

গবেট যে যুদ্ধক্ষেত্রে একদল শক্তিশালী সিপাইয়ের বদলে স্রেফ দুটো মেয়েকে মরতে পাঠিয়ে দিল। যে এতগুলো ভীমভবাণীর মতো চেহারার সিকিউরিটি গার্ডকে নির্বিবাদে কেটে ফেলতে পারে, তার সামনে দুটো 'হাল্কাফুল্কা' মেয়ে! এ কি ফাজলামি হচ্ছে? নাকি 'বার্নিং শিখ'-এর 'কেহরের' ভয়ে মেয়েদের পেছনে লুকোচ্ছে!

মূর্খ। কতবড়ো মূর্খ ছিলাম আমি যে নিজেই নিজেকে বুঝতে পারিনি। গবেট ঐ সুপারকপ নয়, আসল গবেট আমি নিজে! আমার অজান্তেই যে কখন ও আমাকে মেপে নিয়েছে, আর দুটো শক্তিশালী কবচকে কাজে নামিয়ে দিয়েছে তা আমার চিন্তাভাবনার অতীত! আমি মেয়েদের শক্তিকে হেয় করেছিলাম। কিন্তু অধিরাজ ব্যানার্জি বিন্দুমাত্রও সেই ভুলটা করেনি। পুরুষদের চরিত্রের গঠন এমনই যে তারা খুব সহজে সবার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারে না। নিজেকে দিয়েই বলতে পারি, ছেলেরা একটি পরিবারের সব কিছু, তথা ঘরের ডেকোরেশন থেকে শুরু করে চরিত্রগুলোর কেমিস্ট্রি, কিছুই লক্ষ্য করে না। পুরুষেরা চিরকালই উদাসীন। যতখানি তাদের বলা হয়েছে, ততখানিই করবে, তার বাইরে সব কিছু গোল্লায় যাক। আবার দলে ভারি ও শারীরিকভাবে সবল হওয়ার কারণে পুরুষদের মধ্যে ওভার কনফিডেন্স থাকে। এই যেমন আমার মধ্যে আছে। তারা চট করে বাইরের একটা চা-ওয়ালাকেও বিশ্বাস করে ফেলে। ওদের খাবার, জল, চা-কফি বা অন্যকিছুর মধ্যে ঘুমের ওষুধ বা নেশার কিছু মিলিয়ে দেওয়া আমার বাঁ হাতের খেল।

আর ঠিক এইখানেই অধিরাজ আমায় মাত দিয়ে দিয়েছে। বলা ভালো, চার থাপ্পড় মেরে বুঝিয়ে দিল, 'গাধা, মেয়েদের ক্ষমতা বোঝার বুদ্ধিও তোর নেই!' সত্যিই নেই। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি যে ঐ তথাকথিত দুর্বল 'লেডি অফিসাররাই কী প্রচণ্ড শক্তিশালী দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার সামনে। মেয়েরা সবার সঙ্গে মিশতে পারে, দুনিয়ার সব খুঁটিনাটি জিনিস লক্ষ্য করে। এমনকি ঘরের ডাস্টবিনে কী আছে, ঘরে কী কী ফার্নিচার আছে, তাদের কোনটার রং কীরকম, সিলিংফ্যানটা কোন ব্র্যান্ডের, কোথায় কী জাতীয় আলো জ্বলছে, কোন্ বেডরুমের বিছানার বেডকভার বা পর্দার রং কী, সব ডিটেইলসে বলে দেবে। ঈশ্বর একটা অতিরিক্ত ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে ওদের পাঠিয়েছেন। যার জন্য দুনিয়ার সব কিছু ওরা নোটিস করে, সবার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারে, এবং আশেপাশে কারা আছে, তাদের মধ্যে কী চলছে, কোনোটাই ওদের চোখ এড়ায় না। ওরা এত দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ করে নিতে পারে যা আচ্ছা আচ্ছা ইনফর্মাররাও পারে না!

সবচেয়ে ভয়ের কথা, মেয়েরা সবসময়ই স্বাবলম্বী। তারা নিজের প্রয়োজনীয় খাবার, পানীয়, নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারে। একজন লেডি অফিসার তো জলটুকু খাওয়ার আগেও বোতলের সিল পরীক্ষা করে নেন। অন্যজন নিজের খাদ্য, পানীয় নিজেই বানিয়ে নেন। ওদের কোনো হেল্পিং হ্যান্ডের প্রয়োজনই পড়ে না। বাইরের কোনো জিনিস স্পর্শও করেন না। এবং মেয়েদের আরও ভয়াবহ একটা স্বভাব আছে, ওরা পুরুষদের মতো সহজে কাউকে বিশ্বাস করে না। সবসময়ই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে। আমার বেবে, দিদি বা কোমলদিদিকে দেখেই বুঝেছিলাম, মেয়েরা যাকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে, তাকে চিরদিনই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই বিশ্বাসটুকু অর্জন করতে ঘাম বেরিয়ে যায়। এই শিক্ষাটা পেয়েছিলাম ঠিকই, তবু বুঝিনি। অধিরাজ ব্যানার্জি আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, *তুলো জিনিসটা শুনতে বা দেখতে যতটাই নরম, ধুনতে ততটাই প্রাণ যায়!*

বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, এই কয়েকঘণ্টার মধ্যে আমি দুই লেডি অফিসারের ওপর অন্তত দু-বার আক্রমণ করেছি। কিন্তু ওঁরা নিজেদের অজান্তে অনায়াসেই সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। একজনের চায়ে নেশার দ্রব্য মিশিয়ে খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার সব নিশ্চিন্তি হাওয়ায় উড়ে গেল, যখন দেখলাম সেই চা তিনি স্পর্শও করলেন না। উলটে নিজের ব্যাগ থেকে অন্য চায়ের শিশি বের করে হেসে বললেন, "আমি নিজের ব্র্যান্ড ছাড়া অন্য চা খাই না।" ওর ব্যাগটা হাসিল করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি, ভদ্রমহিলা অষ্টপ্রহর সেটাকে নিজের চোখের সামনেই রাখেন। ওটা হাতানোর চেয়ে টাওয়ার অফ লন্ডন থেকে

কোহিনূর হীরে চুরি করাও অনেক সহজ। শুধু তা-ই নয়, নিজের সমস্ত কিছু নিজেই করেন! এতটাই সতর্ক যে আশেপাশে কাউকে ঘেঁষতেই দেন না!

অন্যজন তো আরও ভালো। সে যে কখন খায়, কী খায়, কোথা থেকে তার খাবার আসে তা ঈশ্বরও জানেন না! বাড়ির গিন্নী তাঁর জন্য অন্য একটা নির্দিষ্ট জলের বোতল, খাবার প্লেট, বাটি, চামচ মজুত করে রেখেছেন। স্বাভাবিক! বাইরের একজন নার্সকে কেউ নিজের বাড়ির ডিনার সেটে খাবার দেয় না। একবার সেই নির্ধারিত জলের বোতলে চড়া দাগের সেডেটিভ মিশিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপরই হাঁ করে দেখলাম, তিনি একটা সিলড মিনারেল ওয়াটারের বোতল ব্যাগ থেকে বের করে ঢকঢকিয়ে জল খাচ্ছেন। আশায় ছিলাম, যখন কিছুটা খেয়ে রেখে দেবেন, তখন ঐ বোতলের বাকি মিনারেল ওয়াটারে ওষুধ গুলে দেব। কিন্তু আমার সমস্ত প্ল্যানে মিনারেল ওয়াটার ঢেলে দিয়ে তিনি বাকি জলটা বেসিনে ঢেলে স্রেফ বোতলটা ফেলে দিলেন। বুঝলাম, সিলড মিনারেল ওয়াটারের বোতল ছাড়া মহিলা জলই খাবেন না। যেই মুহূর্তে সিল ভাঙা হল, বাকি জলটাও বোতল সুদ্ধ খরচের খাতায়। এবার সিলড বোতলের জলে কারিকুরি কীভাবে করতে পারি। কিছু করতে হলে বোতলের সিল ভাঙতে হবে, আর সেটা অবধারিতভাবেই চোখে পড়বে। ফলস্বরূপ তিনি ঐ জল ছোঁবেনও না।

তবু হাল ছাড়িনি। ওঁর খাবার প্লেটে কিছুটা লিকুইড ড্রাগ মিশিয়েছিলাম। আশা ছিল, অন্তত যা-ই খান, ঐ প্লেটে বা বাটিতেই তো খাবেন। ওমা! উনি তো আরও এককাঠি সরেস! কোথা থেকে থার্মোকলের বাসন আমদানি করেছেন কে জানে! একদম ইউজ অ্যান্ড থ্রো। ঐ বাসনেই যা খাওয়ার তা খান। খাওয়ার শেষে ধরে ফেলেও দ্যান। পরের বার আবার নতুন আর একটা থার্মোকলের প্লেট ও বাটি এসে হাজির হয়।। সম্ভবত ওঁর ব্যাগেই থাকে। কিন্তু প্রথমজনের মতো এই মহিলারও ব্যাগ অবধি পৌঁছোনো অসম্ভব। কারণ দু-জনেই নিজেদের ব্যাগের ওপর গুপ্তধনের বাক্স পাহারা দেওয়া কেউটের মতো ফণা উঁচিয়ে বসে থাকেন। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মেয়েদের প্রকৃতি এভাবেই তৈরি করেছে। তারা সবসময়ই সদাসতর্ক, সবাইকেই অবিশ্বাস করে, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সবকিছুই লক্ষ্য করে। কেউ কেশে উঠলে বা বিষম খেলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে যান ওঁরা। ভালোভাবে চেক করে দেখেন যে কাশি বা হাঁচিটা স্বাভাবিক কিনা। এক কথায় অধিরাজ ব্যানার্জি সিকিউরিটি গার্ড পাঠায়নি, বরং দুটো জলজ্যান্ত অসম্ভব সাবধানী সিসিটিভি ক্যামেরা পাঠিয়ে দিয়েছে, যাদের অতিক্রম করা একরকম অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে!

তার চেয়েও বড়ো কথা, আমি নিজেই নিজেকে বুঝতে পারিনি। বেবে, বাপু, গুরশরণ তাওজি বা সরতাজ, ওঁরা প্রত্যেকেই বারবার মনে করিয়ে দিতেন আমি সাচ্চা শিখের বাচ্চা। সাচ্চা শিখ মেয়েদের গায়ে হাত তোলে না, তাদের সম্মান করে। উপরন্তু সেই অভিশপ্ত দিনটাতেও সরতাজ আমায় বলে গিয়েছিল সাচ্চা শিখের মতো মেয়েদের পাহারা দিতে, তাদের সুরক্ষার জন্য মোতায়েন থাকতে। শব্দগুলো আমার মাথায় একদম গেঁথে বসে গিয়েছিল। আমি আমার প্রতিশোধের জন্য অনেক মেয়েকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি। কী করব! উপায় ছিল না! আমার মারণাস্ত্রটাই এমন যে বদ্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলে সে নারী-পুরুষ নির্বিচারে মারতে থাকে। বেছে বেছে পুরুষদের মেরে মেয়েদের ছেড়ে দেয় না। ছেলেকে মারতে গেলে সঙ্গে ছেলের বউও মরবে, জামাইকে মারলে মেয়েও! নাতিকে শেষ করতে গেলে সঙ্গে হয়তো নাতনিও শেষ হবে। আর আমার শিকারদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐ শয়তান বুড়োগুলোর হয় স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিল, নয় তাদের স্ত্রীয়েরা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে একই ঘরে থাকত। আমার উদ্দেশ্যই ছিল গোটা পরিবারটাকেই মারা। কী করে ছেড়ে দিতাম? কিন্তু আমার বিবেক তার জন্য প্রত্যেকদিন সহস্রবার চাবুক মারে। যদিও আমি নারীদের গায়ে হাত তোলা তো দূর, ওদের মৃতদেহকেও কোনোরকম অসম্মানও করিনি। চাইলে হয়তো করতেই পারতাম। তবু করিনি কারণ 'শিখ' নিজের প্রতিশোধের জন্য সবকিছু করতে পারে, জান নিতে পারে, দিতেও পারে, তবু মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করতে পারে না। আমার রক্তে এই শিক্ষা মিশে গিয়েছে। জানি যা করছি সেই পাপের জন্য

'ওয়াহেগুরু' কোনোদিন ক্ষমা করবেন না। তবু এইটুকু সান্ত্বনা, অন্তত মেয়েদের দেহ বা আত্মার সঙ্গে কোনোরকম অমর্যাদা করিনি।

এটা আমার মনের অবচেতনেই ছিল। কিন্তু ঐ হতভাগা অধিরাজ ব্যানার্জি কী করে এই দুর্বলতাটা বুঝে ফেলল কে জানে! 'মর্দানা শক্তি'র বদলে 'জনানি নজাকত পাঠিয়ে দিল! মর্দ হলে মারার আগে দু-বারও ভাবতাম না। কিন্তু সামনে যে দু-জন নারী! ওরা পুলিশ ঠিকই, তবুও নারী যে! ওদের গায়ে হাত তুলব কী করে? যে শিক্ষা আমার পরিবার আমায় দিয়েছিল, তাকে অগ্রাহ্য করা যে অত সহজ নয়। যখন মেয়ে পুলিশ দেখে আমি হাসছিলাম, তখন বোধহয় ঐ আই জিও মনে মনে হাসছিল। আর বলছিল, "একা শুধু তুই-ই মানুষের মন নিয়ে খেলবি? দ্যাখ, আমিও খেলতে পারি। হারামজাদা, তুই নিজেকেই ততটা চিনিস না, যতটা আমি চিনেছি।" যে পদক্ষেপকে আমি মূর্খামি ভাবছিলাম সেটা আদৌ বোকামি নয়, বরং খুব ঠান্ডা মাথায় তৈরি করা সুচিন্তিত পরিকল্পনা! আমার প্রতিপক্ষ জানে, বার্নিং শিখ পুরুষ সিকিউরিটি গার্ডকে কেটে ফেলতে পারে, কিন্তু একজন মেয়েকে কাটতে হলে, তার দেহকে 'নাপাক ইরাদায়' স্পর্শ করতে হলে সে কিছুক্ষণের জন্য হলেও থমকে যাবে। তার হাত কাঁপবেই কারণ সে জাতে একজন ধর্মভীরু 'শিখ!' আর সত্যিই আমার হাত কাঁপছে।

চিরদিনই আমার স্নায়ু ইস্পাতে গড়া। কখনও ভয় পাইনি। কিন্তু এবার পাচ্ছি। জানি, ঐ লেডি অফিসার দু-জনকেও শেষপর্যন্ত মারতেই হবে, আমি নিরুপায়, তবু এই প্রথমবার আমার বুক কাঁপছে! ভাবছি, আর কত নীচে নামব। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য শেষে এতটা নীচ হতে হবে আমায় 'রবজি!' এ কোন্ ধর্মসঙ্কটে ফেলেছ! ওদের অজ্ঞান করে কাজ হাসিল করতে পারছি না, আবার শিখ হয়ে কতগুলো মেয়ের সঙ্গে হাতাহাতি করব কোন্ লজ্জায়। বুঝতে পারছি, এই দ্বিধা আমায় ক্রমাগত পিছিয়ে দিচ্ছে... সময় এগিয়ে যাচ্ছে... হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বালির মতো... তবু এখনও আমি অদ্ভুত দ্বিধায়! ...এসবই ঐ অধিরাজ ব্যানার্জির চক্রান্ত।

অথচ সম্ভবত এই প্রথম আমি প্রতিপক্ষকে ঘৃণা করতে পারছি না! সে আমার অস্ত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে, শেষ আশ্রয়, সাহস, আত্মবিশ্বাস সব ছিনিয়ে নিচ্ছে! ওর জন্য আমার কোমলদিদি চলে গেল। আমাকে চূড়ান্ত ধর্মসঙ্কটে ফেলে কনফিউজ করে রেখেছে, তাও আমি রাগ করতে পারছি না। ও যে অবিকল সরতাজের মতো! তেমনই নির্ভীক, তেমনই বীর, তেমনই বুদ্ধিমান। সরতাজের মতো সিংহবিক্রমে এই লোকটাও বুক চিতিয়ে 'খুংখার শের' এর সামনে চরম সাহসে দাঁড়িয়ে পড়েছে...! অবিকল সরতাজ যেমন কতগুলো পাগল খুনির সামনে দাঁড়িয়েছিল...! আজও আমার মনে পড়ে সেই 'নারা।' 'সেই দৃশ্য...'– 'বো-লে সো নি-হা-ল। ...

কয়েকশো কণ্ঠ গর্জন করে উঠল, "সৎ-শ্রী-অ-কা-ল!"

...আট বছরের বাচ্চা ছেলেটা ভীষণ ভয়ে দেখছিল, কতগুলো নৃশংস খুনি এদিকেই এগিয়ে আসছে। আর পিঁপড়ের মতো পিলপিল করে ছুটে আসছে কতগুলো মানুষ। হাতে রক্তাক্ত তরোয়াল, লাঠি, হুক, চপার! অজস্র, অগণিত নেকড়ে বুঝি দল বেঁধে ছুটে আসছে রক্তপিপাসায়! কলোনির চতুর্দিক থেকে তীব্র আর্তনাদ, মরণ চিৎকার ক্রমাগতই বাড়ছে। আশেপাশের বাড়িগুলোয় আগুন জ্বলছে। তার ধোঁয়ায় চোখ-নাক ভীষণ জ্বালা করছে। চতুর্দিকের এই বীভৎস 'মনজ' দেখে আট বছরের শিশুর আত্মা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, দুর্বল স্নায়ু ও মনের ওপর আর এই চাপ সে নিতে পারবে না। এখনই বুঝি ছোট্ট কলজেটার ধুকপুকুনি থেমে যাবে। তবু তার কৌতূহলী চোখদুটো দেখার চেষ্টা করছিল, এই কলোনিতে ঠিক কী হচ্ছে। কী হতে চলেছে তার আপনজনদের পরিণতি!

শিখদের দলে সবার সামনে রাইফেল নিয়ে 'সিনা তানকে' দাঁড়িয়েছিল সরতাজ। ভিড়টা যখন ওদের থেকে মাত্র দশ গজ দূরত্বে, তখনই রাইফেলটাকে আকাশের দিকে তুলে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করল সে। তার কান ফাটানো গর্জনে মুহূর্তের মধ্যে শিকারীদের দলটা থমকে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন সামান্য হলেও ভয় পেল। এতক্ষণ তারা নিরস্ত্র শিখদের

অবলীলায় মেরে, কেটে এসেছে। কোথাও কোনো বাধা পায়নি। কিন্তু শিকারদের মধ্যেও যে কেউ রাইফেল নিয়ে এসে রুখে দাঁড়াবে, তা ভাবতেই পারেনি। আগ্নেয়াস্ত্রর গর্জনে তারা থেমে গেল। এবার ঠিকভাবে চোখে পড়ল সামনের দৃশ্যটা। মঙ্গলপুরীর শিখরাও হাতা গুটিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জোটবদ্ধ হয়েছে তাদের ঠেকানোর জন্য। ওরা নিজেরাও বুঝতে পারল, এবার যুদ্ধটা সহজ হবে না

সরতাজ ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে, "আমরা বিনা কারণে রক্তপাত চাই না।। তোমরা যেমন এ দেশের মানুষ, তেমন আমাদের রক্তেও ভারতবর্ষের মাটি মিশে আছে। তোমরা যেমন ইন্দিরা গান্ধীকে 'মা' মানো, তেমন উনিও আমাদের 'মা'। বেয়ন্ত সিং বা সতবন্ত সিং এর সঙ্গে 'দূর দূর তক' আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ইন্দিরা গান্ধীর মওতে যতটা তোমরা দুঃখিত, আমরাও ঠিক ততটাই শোকার্ত। তাই ফিরে যাও। আমরা কেউ বেইমান বা গদ্দার নই। এখানে সবাই খেটে খাওয়া মানুষ দাঙ্গা চাই না, শান্তি চাই। তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ, যে রাস্তা দিয়ে এসেছ, সেই রাস্তা দিয়েই চুপচাপ চলে যাও। নয়তো নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে আমাদেরও বাধ্য হয়ে লড়তে হবে। আমরা তা চাই না!"

"আচ্ছা?" ওদের মধ্যে একজন ব্যঙ্গ করে বলল, "তোরা ইন্দিরাজির মৃত্যুতে শোকার্ত। এতই শোকার্ত যে এখান থেকেই ঘিয়ের মিঠাইয়ের খুশবু পাওয়া যাচ্ছে! ঘরে আবার আলোর রোশনাই সাজিয়ে রেখেছিস। এটা তোদের কী ধরনের শোক প্রকাশের স্টাইল? ইন্দিরাজির মৃত্যুর আনন্দে মিঠাই 'বাটছিস', আলো দিয়ে ঘর সাজাচ্ছিস, উৎসব করছিস, তাই না? আবার বলছিস তোরা গদ্দার না!"

এটাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলব! এ কলোনিতে তো বিয়ের উৎসব হওয়ার কথা ছিল। বহুদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তার প্রস্তুতি। কলোনির পুরুষেরা বলেছিল, "আমাদের ঘরেরই ছেলে-মেয়ের শাদি, কলোনি একটু সাজাব না?" তাই সরতাজ সমেত অনেকে মিলেই কলোনিতে রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত করেছিল। নভজ্যোতদের বাড়িও আলো আর ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে কয়েকদিন আগেই। ওদের ঘরেও অনেক অতিথি এসে পৌঁছেছে। নানারকমের রসমের জন্য মিঠাইও এসেছে। কিন্তু তখন কে জানত যে এর মধ্যেই এমন দুর্ঘটনা ঘটবে। এই 'সাজাওয়ট' তো ঘটনার অনেক আগেকার। ইন্দিরাজির 'দর্পনাক' খুনের পর সে বিয়ের অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়েছিল। কিন্তু অত মিঠাই লোকে ফেলেই বা দেয় কী করে! সাজসজ্জা খুলে ফেলার কথা তাড়াহুড়োয় মাথাতেও আসেনি। এই মারাত্মক টালমাটাল অবস্থায় গোটা দেশই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। শিখেরা তো আরও বেশি হতবাক হয়েছিল। তার মধ্যে ফুল, আলো, মিঠাইয়ের মতো ছোটোখাটো জিনিসের কথা মাথায়ই আসেনি। অথচ এরা সেগুলো দেখেই ভাবছে যে আমরা ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে উৎসব করছি।

এইরকম ভ্রান্ত ধারণা দেখে এবার বাপুজি মুখ খুললেন, "ও জি, এটা তোমাদের 'গলতফ্যায়মি।" এখানে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না। আমার মেয়ে যসমিতের শাদি অনেক আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তারই 'রসম' চলছিল কয়েকদিন ধরে। তোমরা তো জানোই, পাঞ্জাবী কুড়ি বা মুন্ডার শাদির রসম অনেকদিন ধরেই চলে, একটু জমকালোও হয়। যে আলো আর মিঠাইয়ের কথা তোমরা বলছ, সেগুলো যস্যির বিয়ের জন্যই এনেছিলাম আমরা। কিন্তু ইন্দিরাজির মৃত্যুর পর বিয়ের অনুষ্ঠান আপাতত বাতিল হয়ে গেছে। এত তাড়াহুড়োর মধ্যে আলো আর মিঠাইয়ের কোনো ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি, সেটা আমাদেরই ভুল। আমরা হাতজোড় করে নিজেদের ভুল স্বীকার করছি, আর যদি তোমরা চাও এই সমস্ত 'সাজাওয়ট' এখনই খুলে দিচ্ছি, মিঠাইও ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু তা বলে তোমরা আমাদের গদ্দার বলতে পারো না। তোমরাও শান্তিতে ফিরে যাও, আমাদেরও শান্তিতে থাকতে দাও।"

"আচ্ছা বাহানা থা! অজুহাতটা নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু কাজে লাগবে না।" ভিড়ের মধ্য থেকে একজন মুষকো লোক চোখ পাকিয়ে ধমকে ওঠে, "শান্তিতে তো তোদের থাকতেই

হবে। একেবারে চিরশান্তির দেশেই পাঠাব তোদের। সা-লা, মাদারচোদ, আপারেশন ব্লু-স্টারে একটা গুরুদ্বারা জ্বলেছে, ভেঙেছে বলে তোদের খুব জ্বলছিল না? লেঃ, সবকটা গুরুদ্বারাই জ্বালিয়ে দিয়েছি। কী করবি অ্যাঁ, বেয়ন্ত সিং আর ভিন্দ্রানয়ালের নাজায়জ ভাই? মারবি? আয়, দেখি তোদের তরোয়ালে কত জোর।"

আবার সশব্দে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করল সরতাজ, "খবর্দার! কেউ এগোবে না। আবারও বলছি, বেয়ন্ত সিং আমাদের কেউ নয়। তোমাদের চোখে ও গদ্দার। আমাদের চোখেও ও 'নমকহারামই'। একই বিরাদরির মধ্যে হলেও সে কিংবা ভিন্দ্রানয়ালে, দু-জনেই আমাদের চোখে সমান ঘৃণার পাত্র। ইন্দিরা গান্ধী আমাদের কাছে 'দেবী দুর্গার' মতোই শক্তির প্রতীক। আমি নিজেই একাত্তরের যুদ্ধ লড়েছি। তাই তাঁকে শতবার স্যালুট করি। তোমাদের সামনে শুধু একটাই 'বেয়ন্ত সিং' আছে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী নিজেও জানতেন, যতবার এ দেশের ওপরে শত্রুর নজর পড়েছে ততবারই শিখ ব্যাটেলিয়নের হাজার হাজার 'সিং' পদবীধারী জওয়ান ভারতমাতার নামে হাসতে হাসতে নিজের প্রাণের বলি দিয়েছে। তাঁরও বিশ্বাস ছিল, যে মাটি তাঁর বিশ্বস্ত শিখ জওয়ানেরা রক্ষা করছে, সে মাটির দিকে কুদৃষ্টি দিতে 'দুশমন' কেন, সাক্ষাৎ শয়তানও ভয় পায়৷ তাদের নাম কি আদৌ তোমরা জানো? তিরাশির বিশ্বকাপে কপিল পা-জির কাপ জিতে নিয়ে আসায় উৎসব করোনি তোমরা? সেই দলে কতজন সর্দার ছিল তাদের নাম কি মনে রেখেছ? আজাদির জঙ্গের 'ভগৎ সিং, উধম সিং, বলদেব সিং, কর্তার সিং সারাভা, বিবি অমর কৌর, বাবা গুরদিত সিং, সর্দার অজিত সিংকে চেনো না? আরে, আজাদির লড়াইয়ে যে একশো একুশটা লোক ফাঁসিতে চড়েছিল তার মধ্যে তিরানব্বই জনই শিখ। যে দু-হাজার ছশো ছাব্বিশ জন আজীবন কারাবাসে গিয়েছিল তাদের মধ্যে দু-হাজার একশো সাতচল্লিশ জনই শিখ ছিল। অথচ গোটা ভারতবর্ষের জনসংখ্যা অনুযায়ী শিখের সংখ্যা তখন মাত্র দেড় পার্সেন্ট ছিল। কিন্তু শহীদির ক্ষেত্রে সেই সংখ্যাটাই নব্বই পার্সেন্ট। সেই সর্দারজিদের মনে রাখোনি? কুছ তো শরম করো। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরবখশ সিং, লেফটেন্যান্ট হরদিত সিং মালিক, মেজর জেনারেল শাবেগ সিং, মনমোহন সিং, ফ্লাইং অফিসার নির্মল জিৎ সিং, সুবেদার যোগিন্দর সিং সহনান, এয়ার কমোডোর মেহর সিং বা মেহর বাবা, বাবা হরভজন সিং, এদের নাম জীবনেও কখনও শুনেছ? ভারতে আজ পর্যন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে, এরা বাঘের মতো দেশের জন্য লড়েছে। কেউ শহীদ হয়েছে, কেউ মহাবীরচক্র পেয়েছে। বাবা হরভজন সিং নাথুলা বর্ডারে একাই চীনে শয়তানগুলোর ওপর ভারি পড়েছিল। বাইশ বছর বয়েসে লোকটা দেশের জন্য মরে গেল, অথচ আজও লোকে বিশ্বাস করে যে সেই অমর শহীদ এখনও অক্লান্তভাবে নিজের ডিউটি করে যাচ্ছে। আর্মি থেকে শুরু করে ক্রিকেট, হকি, দৌড়, ভারতের সমস্ত লড়াইয়ে অন্তত একজন শিখ থাকবেই। মিলখা সিং, বলবিন্দর সান্ধুকে দেখোনি? এরা সর্দার নয়? শুধু বেয়ন্ত আর সতবন্তের মতো দুটো 'হারামজাদা'কে দিয়ে সমস্ত সর্দারকে চিনেছ? আর মূর্খের মতো বলছ 'সর্দার গদ্দার হ্যায়"!"

"ইন্দিরাজি-ও এই ভুলই করেছিলেন!" সেই ষণ্ডামার্কা লোকটা চেঁচিয়ে বলল, "তোদের ওপর ওঁর শেষমুহূর্ত অবধি বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমরা সেই ভুল করব না! তোরা তাঁর বিশ্বাসের সম্মান রাখতে জানিস না গদ্দার কঁহিকা! আমরা তোদের ঠিকই চিনেছি। আর বেয়ন্তের সঙ্গে আজ তোদেরও জাহান্নমে পাঠিয়ে ছাড়ব।" বলতে বলতেই সে অন্যদের দিকে তাকায়, "কী হল? চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছো কেন? ওদের বক্তৃতা শোনা বন্ধ করো। মারো, মারতে থাকো, টুকরো টুকরো করে দাও, জ্বালিয়ে রাখ করে দাও ভাইয়েরা! এক ভি সর্দার বচনা নেহি চাহিয়ে!"

শুধু এইটুকুই শোনার অপেক্ষা। শয়ে শয়ে দাঙ্গাই তরোয়াল, লাঠি, মশাল নিয়ে লাফিয়ে পড়ল শিখদের ওপরে। সরতাজ এবার গর্জন করে ওঠে, "বো-লে সো নি-হা-ল!" "সৎ-শ্রী-অকাল!"

শিখের ভিড়ও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপরে। যার হাতে যে অস্ত্র ছিল, তাই

দিয়েই বেদম মার মারছে দুর্বৃত্তদের! এতক্ষণ ধরে নিরীহ মানুষগুলোকে যারা ধরে ধরে মারছিল, কাটছিল আর জ্বালাচ্ছিল, এবার তারাও টের পেল যে সর্দাররা রুখে দাঁড়ালে ঠিক কী হয়। আমি সবিস্ময়ে দেখলাম বিশাল চেহারার গুরশরণ তাওজি'র হাতে লাঠি বনবন করে ঘুরছে! বাপুর মুখে শুনেছিলাম যে তাওজি'র একসময়ে কুস্তি আর লাঠি খেলার খুব শখ ছিল। কিন্তু আজ তাঁর হাতে যেভাবে লাঠি কথা বলছিল, তাতে মনে হচ্ছিল শুধু লাঠির জোরেই বুঝি সবাইকে শুইয়ে দিতে পারেন তিনি। ওঁর হাতের লাঠিটাকে ঠিকমতো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। মারতে মারতে শত্রুকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছেন, আর চেঁচাচ্ছেন, "খোওেয়া কঁহিকা। সর্দারের তরোয়ালের জোর 'নাপতে' চাস? তরোয়াল তো পরে, আগে এই লাঠির সামনা করে দেখা।"

সরতাজের রাইফেলও বেশ কয়েকজনকে ধরাশায়ী করেছে। তবে সে কাউকেই প্রাণে মারেনি। সরতাজ যেরকম নিশানায় দক্ষ ছিল, তাতে অনায়াসে ওদের ধরে ধরে উড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু সব গুলিগুলোই সে শত্রুর কাঁধে বা পায়ে মারছে। অনেকে ওকে নিরস্ত্র করার চেষ্টাও করছে। উলটোদিক থেকে একটা তরোয়াল ওর পিঠ চিরে দিল। কেউ একটা ওর মাথাতে লোহার রডের বাড়িও বসিয়ে দিয়েছে। সরতাজের মাথা বেয়ে রক্ত পড়ছে, জামাটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে শয়তানরা। তবু ও অদ্ভুত কৌশলে লড়ে চলেছে তাদের সঙ্গে। লাথি, ঘুষি মেরে ছিটকে ফেলছে দুশমনবাহিনীকে। কখনও তুলে আছাড় মেরে ফেলছে মাটিতে। চতুর্দিক দিয়ে ওকে ছেঁকে ধরেছে ওরা। এলোপাথাড়ি আক্রমণ করছে। উত্তরে এক দেশপ্রেমী জওয়ানের হাতের থাপ্পড়, ঘুষি কিংবা লাথি খেয়ে উলটে পড়ছে সবাই! হুঃ! এমনই সব বীর। সরতাজের এক 'মুক্কা' খেয়ে সেই মুষকো এমন লাট খেয়ে কাটা কলাগাছের মতো ধড়াস করে পড়ল যে রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম, ব্যাটা মরেই গেল বুঝি! গোলা-গুলি নয়, তরোয়াল, লাঠি নয়, স্রেফ একটা হাত পড়েছে, তাতেই এই দশা। এরা আবার বড়ো মুখ করে শিখের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে আসে।

সরতাজের সিংহবিক্রম দেখে সেদিন বুঝলাম, সিপাহী হওয়ার আসল অর্থ কী। যেহেতু তার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল, সেজন্য তাকেই নিশানা বানিয়েছিল ওরা। অথচ কী অবলীলায় তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিল সে। একের পর এক মার এসে পড়ছে, তবু একবারের জন্যও মনে হচ্ছে না যে ওর কোনো কষ্ট হচ্ছে। আবার ঐ মারদাঙ্গার মধ্যেই সে প্রমাণ করে দিল, সত্যিই ও দেশপ্রেমিক। লোকগুলোকে মারছে ঠিকই, কিন্তু প্রাণে মারছে না। নিজের দেশবাসীদের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার আর কত বড়ো প্রমাণ দিতে হবে? ওর হাতের রাইফেল কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই পটাপট লাশ ফেলে দিতে পারত। অথচ সরতাজ সচেতনভাবেই সেটা করছে না। ওর মাথায় এটাও আছে, শত্রুরাও এই দেশের মাটিরই সন্তান। তাদের কীভাবে প্রাণে খুন করতে পারত সে।

তবে সবচেয়ে অবাক করলেন আমার বাপু। চিরকালই নিরীহ, শান্ত মানুষটা যেরকম সংহার মূর্তি ধারণ করল তাতে আমি অবাক! তাঁর হাতে সাবলীলভাবে খেলা করছে তরোয়াল। ওঁর হাতে এত জোরও ছিল! অথচ কোনোদিন তাঁকে একটা মশাও তো মারতে দেখিনি। উলটো দিকের লোকেরা তাঁকেও ছাড়ছে না। ঘাড়ে, পিঠে রডের বাড়ি এসে পড়ছে মুহুর্মুহু। তবু বাপুর মুখে একটুও যন্ত্রণার লেশমাত্রও নেই। যেভাবে সাঁই সাঁই করে তরোয়াল চালাচ্ছেন তাতে ওঁকে আমিই চিনতে পারছি না। ইনি কি আমার বাপু? না ঈশর সিং বা গুর্মুখ সিং-এর মতো কোনো বীর! শত্রুকে আহত করছেন, ক্ষতবিক্ষত করছেন, অথচ চাইলেই এককোপে ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দিতে পারতেন তিনি। সেটা আদৌ করছেন না! বিদ্যুৎবেগে কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে ফিরে দাঙ্গাইদের মারছেন। তাঁর চোখদুটোয় বুঝি ধ্বকধ্বক করে আগুন জ্বলছে। 'কাতিলদের এলোপাথাড়ি মারছেন আর বলছেন, "আমাদের গদ্দার বলা। লেঃ; এই লেঃ। তরোয়ালের ধার বুঝে নে! ক-ঞ্জা-র। অকল কা দুশমন!"

বাকিরাও থেমে নেই। 'অকল কা দুশমন'দের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই দিয়েই পেটাচ্ছে। ভিড়টা এইবার প্রচণ্ড ভয় পেল। যতখানি রণং দেহী মূর্তিতে তেড়ে এসেছিল তারা, তার থেকেও বেশি সংহার মূর্তি ধারণ করেছে শিখেরা। তারা কাউকে প্রাণে মারছে না ঠিকই, কারণ ওরা কেউ নিষ্ঠুর খুনি নয়। কিন্তু একজন সর্দারের তরোয়াল তো দূরে থাক, লাঠির বাড়ির জোর কী জিনিস তা ওদের গোদা মাথায় ঢুকে গেছে। তবে প্রত্যাঘাত তখনও চালিয়ে যাচ্ছে। একজন মশালধারী পেছন থেকে লড়াইয়ে ব্যস্ত গুরশরণ তাওজির কুর্তায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তাওজি আর একটু হলেই আগুনে পুড়ে যেতেন, তার আগেই সরতাজ লাফিয়ে পড়ে দু-হাত দিয়ে ঘষে ঘষে নিভিয়ে দিয়েছে আগুন। ওর হাত নিশ্চয়ই পুড়েছে। তাও থামানো গেল না তাকে। উঠে দাঁড়িয়ে মশালধারীর কানের নীচে সপাটে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় মারতেই সে মশাল-টশাল সমেত উলটে পড়ে গেল। সরতাজ তাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পেটাতে পেটাতে বলে, "শুয়োরের বাচ্চা। কায়রের মতো পেছন থেকে আক্রমণ করতে পারিস! ক্ষমতা থাকলে সামনা-সামনি লড়ে দেখা!" আমি তখন লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখছিলাম আর আতঙ্কে কাঁপছিলাম! একটা আটবছরের ছোট্ট শিশু যুদ্ধের কী বোঝে? সে বাপুর মুখে অনেক যুদ্ধের কাহিনি শুনেছে। কিন্তু স্বচক্ষে কখনও কাউকে মারতে দেখেনি, কাউকে মরতেও দেখেনি। দাঙ্গাইদের চিৎকার, তাদের ভয়াল মূর্তি, গান শট, ফায়ারিঙের শব্দ, রাইফেল, আগুন, তরোয়াল, লাঠি, কোনোটাই তার রূপকথাময় জীবনে কখনও আসেনি। বাড়ি পুড়ে যাওয়ার ধোঁয়া, নিজের মানুষদের জীবন বাঁচানোর আপ্রাণ সংগ্রাম, আপনজনদের শরীরের রক্তপাত, কোনোকিছুই তার অভিজ্ঞতায় ছিল না। গুরশরণ তাওজি'র কুর্তায় যখন পেছন থেকে 'আগ' লাগিয়ে দিল, তখন ভীষণ ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলাম। তখনই মনের মধ্য থেকে কে যেন বলল, "চেঁচাস না কাকে। ওদের নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে দিস না। একদম বোবার মতো চুপ করে থাক।" আমি নিজেই নিজের মুখ চেপে ধরে থরথর করে কাঁপছিলাম। আমার ভেতর থেকে একটা প্রবল কান্না আর চিৎকার বাইরে বেরিয়ে আসার দুর্দম প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, আর আমি নিজেকে চুপ করিয়ে রাখার অসম্ভব 'কোশিশ' করে যাচ্ছিলাম। সেটাও কোনো ভয়াল যুদ্ধের থেকে কিছু কম নয়। ভয় পাচ্ছিলাম ভীষণ ভয়...! আমার দেহ যেন অবশ হয়ে আসছে...! বুঝতে পারছি না, কতক্ষণ এই অসহ্য যুদ্ধ চলবে! আর আমার ভালোবাসার মানুষগুলো...? কী হবে তাদের...

সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত বোধ আমার মাথায় এসেছিল। ঐ ছোট্ট বয়েসে এমন চিন্তা আসার কথাই নয়। কিন্তু পরিস্থিতিই আমায় একটা নিষ্ঠুর সত্য বুঝিয়ে দিল। পাশের বাড়ির লোকটা ভগৎ সিং, উধম সিং বা ঈশর কিম্বা গুর্মুর্খ সিং হলে গর্ববোধ হয়। তাদের বীরত্বের কাহিনি ভালোও লাগে। কিন্তু নিজের বাপু, দাদা, তাওজি বা সরতাজের মতো স্বপ্নের নায়ক যদি ওঁদের মতো কেউ হয়, তবে গর্ব বা ভালোবাসার আগেও যে বোধটা গ্রাস করে তার নাম আতঙ্ক! আমি আপ্রাণ চাইছিলাম, বাপু, তাওজি, সরতাজ বা কলোনির একটাও পরিচিত মুখ যেন ঈশর সিং বা গুর্মুখ সিং না হয়! ওদের যে প্রশান্ত মুখের শান্তিময় হাসিটা দেখেছি, সেটাই যেন বাস্তব হয়। বাকিটা দুঃস্বপ্ন!

ওদিকে তরোয়াল আর লাঠির যুদ্ধ ক্রমাগতই বাড়ছে। দুটো তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শাণিত ধাতব শব্দ যেন ঠং ঠং করে মাথার ভেতরে বাড়ি মারছিল। লোহার রডের সঙ্গে পাঞ্জা কষছে লম্বা আর মোটা লাঠি। কেউ কুড়ুল দিয়ে শত্রুনিধন করতে ব্যস্ত, আবার কারোর চপার হিংস্র আনন্দে রক্তের স্বাদ উপভোগ করছে। দাঙ্গাইরা যেন পারলে ছিঁড়ে খেয়ে নেয় প্রতিপক্ষকে। তাদের হাতের অস্ত্র নিষ্ঠুর ও আক্রমণাত্মক। অন্যদিকে সর্দারদের 'ঔজার' কিছুটা রক্ষণাত্মক। তারা নিজেদের বাঁচাতেই মূলত লড়ছে। শত্রুর প্রাণ নেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যারা প্রাণ নিতেই শিখেছে, ও খুন করার উদ্দেশ্যেই এসেছে, তারা সহজে থামবে কেন। তাদের মার তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে! ওরা বুঝতে পেরেছে যে শিখদের মানসিক

জোরের মূল উৎস সরতাজের বন্দুক। তাই তাকেই 'ভেড়িয়া'র মতো ছেঁকে ধরছে তারা। এবার সরতাজ বন্দুকটা এক হাতে চেপে ধরে অন্যহাতে কৃপাণ নিয়ে আক্রমণ শানালো। উন্মত্তের মতো সে যেন তাণ্ডবনৃত্য করতে শুরু করেছে। তার হাতের কৃপাণ আততায়ীদের একজনকে জখম

করল, অন্যজনের মুখে একটা বিরাট কাটাচিহ্ন উপহার দিল। লোকটা রক্তাক্ত মুখ চেপে ধরে কোনোমতে সেখান থেকে সরে পড়ল। বাকিরা এবার বেগতিক দেখে ওকে একসঙ্গে মারছে। বাপুর মুখে অনেক গল্পের পাশাপাশি মহাভারতের গল্পও শুনেছিলাম। সরতাজকে দেখে মনে হচ্ছিল, চক্রব্যূহের মধ্যে যুদ্ধরত অভিমন্যু। ওর ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই দিয়েই আঘাত করছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে। দাঙ্গাইরা ওর বন্দুকধরা হাতের ওপর দমাদ্দম রডের বাড়ি মেরে চলেছে! বুঝি হাতটাই ভেঙে দিতে চায়। একটা মার এমন মোক্ষমভাবে এসে পড়ল যে রাইফেলটা ওর হাত থেকেই পড়ে গেল। টের পেলাম, আমার হৃৎপিণ্ডটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে। কী নিষ্ঠুরভাবে ওকে মারছে ওরা সবাই। কিন্তু সরতাজও ছাড়ার পাত্র নয়। সে বিদ্যুৎবেগে একটা মস্ত বড়ো আধলা ইট তুলে নিয়ে লোকটার মাথায় বসিয়ে দিল। আমি প্রচণ্ড ভয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছিলাম। সরতাজ কি এই চক্রব্যূহ থেকে আদৌ বেরোতে পারবে? না তারও পরিণতি অভিমন্যুর মতোই হতে চলেছে।

"আ-গ!...বাঁ-চা-ও!"

এতক্ষণ ধরে লড়াইটা সমানে সমানে চলছিল। আচমকা একটা ভয়াবহ চিৎকারে আমার রক্তহিম হয়ে গেল! আমাদেরই কলোনির লোক, কর্তার সিং, যে স্টেশনে নেহাৎই 'সামোসা' বিক্রি করত, সে অসহ্য যন্ত্রণায়, প্রায় গলার শিরা ছিঁড়ে চিৎকার করছে! কেউ কিছু বোঝার আগেই সে পাগলের মতো এদিক ওদিক দৌড়োতে শুরু করল। তারপরই ধড়াস করে পড়ে গেল মাটিতে! তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে অদ্ভুত সাদা সাদা ধোঁয়া! অদ্ভুত রঙের একটা আগুন জ্বলছে গোটা দেহে। কাটা পাঁঠার মতো যন্ত্রণায় দাপাচ্ছে ওর সমস্ত শরীর। আমি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখলাম তার গায়ে কে যেন 'সফেদ পাউডার' ছড়িয়ে দিয়েছে। মশাল দিয়ে কেউ আগুন ধরায়নি, তবু আগুন ধরল কী করে! ধারে কাছে কোনো মশালধারী নেই, ওর গায়ে কেরোসিন তেলও বিন্দুমাত্রও কেউ ঢালেনি। কিন্তু তবু জ্যান্ত জ্বলে যাচ্ছে কর্তার সিং! তার চামড়া গলে গলে খসে পড়ছে পিঁয়াজের খোসার মতো! আশেপাশের মানুষগুলো কী করবে, কী করা উচিত বুঝে ওঠার আগেই, ফের একরাশ পাউডার গিয়ে ছিটকে পড়ল আর একজনের ওপরে। কেউ বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কখনও একটা জ্যান্ত মানুষের চোখকে কেউ জ্বলে গলে যেতে স্বচক্ষে দেখেছে? আমি দেখেছিলাম! যাকে 'সফেদ পাউডার' ছুড়ে মারা হয়েছিল, তার মুখের চামড়া যেন স্রেফ একটা রাবারের মতো গলে গেল। আর বেশিরভাগ পাউডার পড়েছিল মানুষটার চোখে! আমি স্পষ্ট দেখলাম, ওর চোখের গোলকদুটো সমস্ত শিরা-উপশিরা সমেত সাদা ধোঁয়া আর আগুনের সঙ্গে জ্বলে পুড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তখনও পুরোটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। সরু সরু 'নস'গুলোর সঙ্গে বাইরে ঝুলছে দুটো চোখ! সে বীভৎসতার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। লোকটার শূন্য অক্ষিকোটর বেয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে অক্ষিকোটর। ওকে মানুষ নয়, তখনই একটা বীভৎস পোড়া প্রেত বলে মনে হচ্ছিল। অন্ধ, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটার চিৎকারে বোধহয় অকাল তখতও সেদিন কেঁপে উঠেছিল।

তখন শুধু আমিই নই, কেউই বুঝতে পারেনি ঐ সাদা সাদা পাউডারটা আসলে কী কীভাবেই বা চোখের নিমেষে আগুন ধরাচ্ছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে মানবদেহ। আমরা কখনও দেখিনি যে কোনোরকম 'চিঙ্গারি" বা মশালের 'শোলা' ছাড়া এভাবেও আগুন ধরতে পারে! এ কী জাতীয় অদৃশ্য আগুন, কীভাবে এটাকে থামানো যায় তা কেউ বুঝতেই পারছিল না। কয়েকজন আপ্রাণ ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করছিল। তারা মরিয়া হয়ে পাগলের মতো দৌড়ে কল থেকে জল এনে হতভাগ্য মানুষদুটোর গায়ে ছড়িয়ে দিল, তবু সে 'আগ' আর সাদা 'ধুঁয়া' থামল না। বরং একটু থেমে বুঝি দম নিল। তারপরই আরও ইন্ধন পেয়ে সর্বগ্রাসী হয়ে উঠল। লোকগুলো চেঁচাতেই থাকল.... চেঁচাতেই থাকল...! অবশেষে এমন একটা মুহূর্তও এল যখন ওরা আপ্রাণ চেঁচিয়ে যাচ্ছে, অথচ মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজই বেরোচ্ছে না! সেই বোবা চিৎকার শোনার বা বোঝার জন্য কেউ ছিল না। আগুন ওদের স্বরনালী সমেত গলাটাও পুড়িয়ে দিয়েছে। তার কিছুক্ষণ পরে ওদের সেই বোবা আছাড়িপিছাড়ি ছটফটানিও কমল। লোকগুলো মরে গেল। তখনও আগুন ওদের শবদেহ জ্বালিয়ে চলেছে।

ওটা কী জিনিস ছিল তা তখন বোঝা যায়নি। ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পরে আমি জানতে পেরেছিলাম ঐ 'সফেদ পাউডার' আসলে কী। সাদা ফসফরাস। যা বাতাসের সংস্পর্শে আসামাত্রই জ্বলে ওঠে। আর একটা গোটা মানুষের হাড়গোড় সুদ্ধ কুরে কুরে পুড়িয়ে খেতে থাকে। 'হোয়াইট ফসফরাস' তখন ভারতে ব্যানড প্রোডাক্ট ছিল। শুধু ভারতে নয়, তখন বহু দেশেই সাদা ফসফরাস পাউডার নিষিদ্ধ। কারণ এটাকে মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে মৃত্যু অবধারিত। হোয়াইট ফসফরাস বাতাসের স্পর্শে জ্বলে ওঠে। এটাকে থামানোও সহজ নয়। তখন আমাদের কারোরই জানা ছিল না, কিন্তু এখন জানি, শুধু সামান্য পরিমাণ জল ঢেলে ওটাকে থামানো যেত না। তার জন্য বরফঠান্ডা পানিতে মানুষগুলোকে পুরো চুবিয়ে দিতে হত। অথবা 'দলদলে' নিয়ে ফেলতে হত। আগুন নেভানোর জন্য যে ফায়ার ফাইটিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয়, সেগুলো ওকে নেভাতে পারত না। কারণ ও পেট্রোল, ডিজেল বা কেরোসিন থেকে নয়, বাতাসের অক্সিজেন থেকে ইন্ধন নেয়। জল ঢাললে ঐটুকু সময়ের জন্য হয়তো নির্বাপিত হয়, কিন্তু জল ঢালা বন্ধ হলেই পরক্ষণে দপ করে ফের জ্বলে ওঠে। এই আগ যতই নেভাও না কেন, বারবার জ্বলে উঠবেই। সাধারণ আগুন প্রথমে চামড়া পোড়াতে কিছুটা হলেও সময় নেয়। কিন্তু হোয়াইট ফসফরাসের আগুন খুব দ্রুত চামড়া পুড়িয়ে গভীরে ঢুকে মাংস পেশী পোড়াতে শুরু করে। ও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা আস্ত মানুষকে গলিয়ে পুড়িয়ে কঙ্কাল বানিয়ে দিতে পারে। এই পাউডার এতটাই 'ঢিঠ' যে চামড়ায় আর পোষাকে একবার লেগে গেলে তাকে সরানো অসম্ভব। একদম 'চিপকে থাকে। আর যতক্ষণ না জ্যান্ত মানুষটাকে হাড়গোড় সমেত খেয়ে ফেলছে, ততক্ষণ ছাড়ে না। আশ্চর্যের ব্যাপার, যে জিনিসটা বাজারে পাওয়াই যায় না, তথাকথিত 'নিষিদ্ধ বস্তু'র লিস্টে পড়ে, সেটা অত পরিমাণে দাঙ্গাইদের হাতে এল কী করে? কে তুলে দিয়েছিল? খোদ ভারত সরকার ছাড়া এত ফসফরাস পাউডার কে-ই বা আমদানি করতে পারে! এরকম সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও সাজিশ কোনো গোদা মাথার খুনি বা কতগুলো দাঙ্গাইদের হতেই পারে না! যদি কেউ সন্দেহ করে যে এর পেছনে তৎকালীন ভারত সরকারেরই হাত ছিল, তবে কি সে খুব অন্যায় করবে?

শিখরা তখনও কেউ সাদা পাউডারের মহিমা অতটা জানত না। ফলস্বরূপ আরও দু-জনের গায়ে এসে পড়ল সেই কালান্তক সফেদ পাউডার। তাদের মরণ-আর্তনাদ শুনে হয়তো ঈশ্বরের চোখেও জল এসেছিল সেদিন। হয়তো একবারের জন্য হলেও তিনি আফসোস করেছিলেন, মানুষের নামে কী ভয়াবহ জিনিস সৃষ্টি হল তাঁরই হাত দিয়ে। কিন্তু দাঙ্গাইরা এতেও সন্তুষ্ট হল না। আমি 'সফেদ পাউডারের' ধ্বংসলীলা দেখে একদম নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। চোখের সামনে আজন্মপরিচিত মানুষগুলো জ্যান্ত জ্বলছে, অথচ কিছু করতে না পারার অসহায়তা বোধহয় ঐ আগুনের চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক। আমার ভেতরে তখন ভয় নামক পদার্থটিও সহ্যশক্তির চরম সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যে কোনো অনুভূতি

অনুভবের সমস্ত সীমা ছাড়ালে মানুষ অনুভূতিহীন পুতুলে পরিণত হয়। আমিও তখন তাই হয়েছিলাম। এক হাতে নিজের মুখ প্রাণপণে চেপে ধরে কাঁপতে কাঁপতে দেখছিলাম দুর্বৃত্তরা কয়েকজনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দিয়ে এখন কলোনির বাড়িগুলোর ওপর চড়াও হয়েছে। যখন কলোনির পুরুষেরা তাদের সঙ্গে লড়তে ব্যস্ত ছিল, ঠিক তখনই ওদের আর একটা 'টুকরি' পেছন দিক দিয়ে লুকিয়ে এসে সবার অজান্তেই কলোনির বাড়িগুলোয় আগুন ধরানোর চেষ্টা করল! সামনা-সামনি লড়তে পারবে না বুঝতে পেরেছিল ওরা। তাই এই কৌশল! আমি দেখলাম, নভজ্যোতদের বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! ভেতর থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ। ফুলের কেয়ারি, সাজসজ্জা, আলোর মালা, সব কিছুই জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। বাড়ির মেয়েরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য গৃহবন্দি করে ফেলেছিল। কিন্তু এবার বোধহয় তাদেরও রক্ষা নেই। ঐ বাড়িতেই যাওয়ার কথা ছিল যস্যিদিদির। ওটাই ওর ঘর হতে যাচ্ছিল! কম স্বপ্ন সাজায়নি দিদি ওর শ্বশুরঘর নিয়ে। অথচ বিনা কারণেই সেই স্বপ্ন সমেত জ্বলে যাচ্ছে ওর সুখের ঘর!

"বেবে... দিদি... পরজাইজি...!"

নভজ্যোত সরতাজের পাশাপাশি সমানতালে লড়ে যাচ্ছিল। রোগাসোগা গড়নের জিজুও যে এমন কাঁটার টক্কর দিতে পারে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তেই তার নিজের জ্বলন্ত বাড়িখানা চোখে পড়ল অমনিই সব ছেড়েছুড়ে সর্বহারার মতো ছুটে গেল সেই দিকে। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, "কোই বচাও! অন্দর বেবে, দিদি, ভাবি সব হ্যায় ... আগ বুঝাও কোই... বে-বে!"

ওর পেছন পেছন কলোনির কিছু লোকজনও ছুটে গেল। যে শয়তানগুলো চুপিসাড়ে আগুন লাগাচ্ছিল লোকে সরোষে তাদের উত্তম-মধ্যম দিতে শুরু করেছে। রাগের চোটে গোটা কয়েক লাঠিই বোধহয় ভেঙে দিল ওদের পিঠে আর মাথায়! কয়েকজন নভজ্যোতের বাড়ির আগুন নেভানোর চেষ্টায় তৎপর হল। কিন্তু ততক্ষণে অগ্নিকাণ্ড 'হা হা' করে লেলিহান রূপ ধারণ করেছে। দুর্বৃত্তরা বিপদ দেখে আর মারধোর খেয়ে কোনোমতে পালানোর চেষ্টা করল। তাদের পেছন পেছন লাঠি আর তরোয়াল নিয়ে কয়েকজন সর্দারজি রে রে করে তেড়েও গেল। বাকিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল আগুন নেভানোর কাজে। ভেতর থেকে তখনও ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের সম্মিলিত আর্তনাদ! আগুন ধ্বকধক করতে করতে ছড়িয়ে পড়ছে। ছাতে, জানলা, দরজায় এমনকি মুখ্য দ্বারেও একেবারে শেষনাগের মতো সহস্র ফণা ছড়িয়ে নাচছে দুরন্ত বহ্নি। নভজ্যোত কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সেই জ্বলন্ত দরজার দিকেই ছুটে গেল... "আরে..... নভজ্যোত... কী করছ!"

পেছন থেকে কয়েকজন এসে চেপে ধরল তাকে। একজন ধমকে উঠল, "অপনা জান দেগা ক্যায়া! দেখতে পাচ্ছিস না, সর্বত্র আগুন! ভেতর থেকে হল্কা বেরিয়ে আসছে। দরজা দাউদাউ করে জ্বলছে। এখানে ঢুকতে যাওয়া মানে সাক্ষাত মওতকে নেওতা দেওয়া!"

বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল নভজ্যোত, "ছেড়ে দাও আমায়... যেতে দাও... বেবে, দিদি, পরজাইজি...সবাই যে ভেতরে আছে। ওদের কী হবে...? আমায় ছেড়ে দাও...।" "নভজ্যোত।" আর একজন বলল, "সমঝা কর ইয়ারা। এ তোর কাজ নয়। এই দরজা ভাঙার জন্য হয় ফায়ার ব্রিগেডের লোক লাগবে, নয়তো আর্মির লোক। একমাত্র ওরাই এসব 'তরকিব জানে।"

ভেতর থেকে চিৎকারের আওয়াজ আরও জোরালো, আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। এত তীক্ষ্ণ যে মনে হয় এবার কানের পর্দা ফেটেই যাবে। নভজ্যোত নিজেকে ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতেই বলল, "আমি ওদের এভাবে একা ছাড়তে পারি না!...ওরা যে মরে যাবে...ছেড়ে দাও...!"

ওদের মধ্যেই একজন চেঁচিয়ে উঠল, "সরতাজ... একমাত্র সরতাজই পারবে। ও জানে জ্বলন্ত দরজা কীভাবে ভাঙতে হয়। কেউ সরতাজকে ডাকো...

ভিড়ের মধ্য থেকেই একজন ছুটে গেল সরতাজের কাছে। কিন্তু তখন তার ধারে কাছে

পৌঁছোনোর উপায় নেই! অন্তত পঞ্চাশটা লোক তাকে ঘিরে ধরেছে। একটা মানুষের পক্ষে কতক্ষণ সম্ভব এই অসম যুদ্ধ করা। তা সত্ত্বেও সে লড়ছিল। যে তাকে ডাকতে গিয়েছিল, সে শুধু চিৎকার করে বলল, "স-র-তা-জ। উধর দেখ!"

সরতাজ সামনের দুটো লোককে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে ছাতু করতে করতেই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের দৃশ্যটা একবার দেখল। যে মুহূর্তে আগুনের বিধ্বংসী রূপ ওর চোখে পড়ল সে মুহূর্তেই বুঝে গেল যে এবার যুদ্ধটা এখানেই থামাতে হবে। তার জন্য যদি কয়েকটা লাশও ফেলে দিতে হয়, তবুও সেটা তাকে করতেই হবে। নয়তো নভজ্যোতদের বাড়ির অগ্নিকাণ্ডে ওর পরিবারের মেয়েরা মারা যাবে। শুধু তাই নয়, ঐ আগুন যেভাবে বাড়ছে, তাতে আশেপাশের বাড়িগুলোকেও সাপ্টে ধরবে। এখনই কিছু করা দরকার।

এই প্রথম আমি সরতাজের মুখে একটা খুনির মুখ ভেসে উঠতে দেখলাম। তার ধৈর্যও এবার জবাব দিয়েছে। সে আর একটা কথাও না বাড়িয়ে এবার রাইফেলটাকে সোজা দাঙ্গাইদের দিকে তাক করল। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে এবার নিষ্ঠুর আঙুলে ট্রিগার টিপল সে। একবার... দু-বার... তিনবার...!

রাইফেল গর্জন করে উঠল। আমি দেখলাম ধুপধাপ করে কয়েকটা লোক পড়ে গিয়েছে। এতক্ষণে সরতাজ আর্মির 'শ্যুট টু কিল' পন্থা নিয়েছে। ওকে যারা এতক্ষণ আক্রমণ করছিল, এবার তারাও কয়েক পা পিছিয়ে গেল। বোধহয় বুঝে গিয়েছে, এই লোকটাকে সহজে পরাস্ত করা যাবে না। এবার কিছু করতে গেলেই লাশ ফেলে দেবে ওর রাইফেল। তার এই উগ্রমূর্তি দেখে বাকি শিখরাও রুদ্রমূর্তি ধরল। তাদের লাঠির বাড়িতে, তরোয়ালের আঘাতে এবার অসম্ভব রাগ স্পষ্ট। এতক্ষণ সামলে আঘাত করছিল। এবার সেটুকুও রইল না! আমার চোখের সামনেই দাঙ্গাইরা এবার ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। তারা এসেছিল নিজেদের গায়ের জ্বালা মেটাতে। কিন্তু তখন কে জানত মঙ্গলপুরীর মাত্র একটা কলোনির শিখেরা এভাবে তাদের নাস্তানাবুদ করে, ছাড়বে। দেখলাম, গুলির ভয়ে, লাঠির ঘায়ে, তরোয়াল আর চপারের আঘাতে রক্তাক্ত একদল খুনি প্রাণপণে দৌড়ে পালাচ্ছে! যারা প্রাণ নিতে এসেছিল, তারা এবার নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই দৌড়োল! এভাবে বাজি যে পালটেও যেতে পারে তা হয়তো ওরাও ভাবেনি। ফলস্বরূপ প্রবল প্রত্যাঘাতের ধাক্কায় হাল ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল তথাকথিত 'দেশপ্রেমিকরা। জখম এবং মৃত সাথীদের দেহ কোনোমতে তুলে নিয়ে 'দুম দবাকে' ভেগে গেল সব বীরপুরুষ!

সরতাজ ইস্পাতের মতো কঠিন মুখে একবার পলায়নপর শত্রুদের দিকে তাকাল। তারপর একটুও সময় নষ্ট না-করে দৌড়ে গেল নভজ্যোতদের বাড়ির দিকে। আগুন এবার অন্যান্য বাড়িগুলোর দিকেও লেলিহান জিহ্বা বাড়িয়ে দিয়েছে। সে একটা শব্দও উচ্চারণ না করে ঐ জ্বলন্ত দরজা অদ্ভুত কৌশলে দুটো জোরদার লাথিতেই ভেঙে ফেলল। বাকিরাও ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। সরতাজ আগুনকে সামলে দ্রুতগতিতে ঢুকে গেল জ্বলন্ত জতুগৃহের ভেতরে। কয়েকজন প্রায় প্রাণ হাতে নিয়ে তার পেছন পেছন ছুটল। আমি দমবন্ধ করে দেখছিলাম, এরপর কী হয়। বাইরে তখন বাপু, তাওজি সমেত গোটা ভিড়টা জমা হয়েছে। তারা যে যেদিকে পারল দৌড়োল। মুহূর্তের মধ্যে একদল লোক বালতিতে জল ভরে নিয়ে এসে পাগলের মতো ঢালতে শুরু করল জ্বলন্ত বাড়িগুলোয়। আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওরা আগুন নেভানোর। কিন্তু ঐ আগুন নেভানো কি সহজ কথা! বালতির পর বালতি শূন্য হচ্ছে। লোকগুলো প্রাণপণে দৌড়ে আবার জল নিয়ে আসছে। তবু যেন অগ্নিদেবের তৃষ্ণা মেটে না!

নভজ্যোত আতঙ্কে, দুশ্চিন্তায় বাপুকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছিল। বাপু তাকে দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। নভজ্যোতের দাদা আর বাপুও এতক্ষণ দাঙ্গাইদের সঙ্গে হাতাহাতি করতে ব্যস্ত ছিল। ওরা একটু সামনের দিকে থাকার দরুণ জানতেই পারেনি যে বাড়ির এই হাল! এবার দেখতে পেয়ে দু-জনেই পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছিল সেই অগ্নিকুণ্ডে!

তাদের বাকিরা হা হা করে উঠে থামিয়েছে। বাপু বললেন, "সরতাজ ভেতরে ঢুকেছে। আরও অনেকেই ঢুকেছে। ভিড় বাড়ানোর কোনো মানে হয় না। বরং তোমরা এই আগুন নেভানোর বন্দোবস্ত করো।"

"নভজ্যোতের দাদা পবনজ্যোত উত্তেজিতভঙ্গিতে বলল, "ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকব?" নভজ্যোতের বাপু তার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে দেখছেন। পবনজ্যোত কালকের সব ঘটনা এখনও জানে না! তার ওদের দোকান বা ব্যাবসা নিয়ে কোনো উৎসাহ নেই, তাই ফায়ার ব্রিগেডের কীর্তিটা অজানাই রয়ে গিয়েছে। তিনি কী উত্তর দেবেন ভেবে পেলেন না। শুধু তাঁর চোখ বেয়ে অসহায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। নভজ্যোত নিজে যেহেতু সেই সময়ে দোকানে ছিল এবং সমস্ত পরিস্থিতিটাই খুব ভালো করে জানে তাই সে-ই কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, "ফায়ার ব্রিগেড আমাদের ডাকে আসবে না রে। কাল যখন দোকানগুলো জ্বালাচ্ছিল, আজও যখন গুরুদ্বারা জ্বলছিল, তখনও ফায়ার ব্রিগেডকে অনেক লোক ফোন করেছে, খবর দিয়েছে।"

"ওরা আসেনি?"

এবার বাপু প্রশ্নটা করলেন। তিনিও এই তথ্যটা জানতেন না। সকৌতূহলে বললেন, "কী হয়েছিল বল তো পুত্তর? তোদের দোকানেও তো আগুন জ্বালিয়েছিল। তোরা ফায়ার ব্রিগেডকে জানিয়েছিলি?"

"সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়েছিলাম বাপু।" নভজ্যোত সজল দৃষ্টিতে তাকায়, "ওরা বলল, ওদের একটাও গাড়িতে নাকি ডিজেল নেই! শহরের কোনো পেট্রোল পাম্পেই নাকি ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ফায়ার ব্রিগেড আসতে পারবে না। শুধু কালকেই নয়, আজও যখন গুরুদ্বারাগুলো জ্বলছিল, তখন অজস্র লোক ওদের ডেকেছে। এমনকি কাছের অফিসগুলোতে গিয়েও ভিড় জমিয়েছে, শোর শরাবা করেছে। ওদের সবারই এক কথা। কোনো গাড়িতেই নাকি তেল নেই। গাড়িগুলো স্রেফ দাঁড়িয়ে আছে। তাই ওদের কিছু করার নেই। পারলে নিজেরাই আগুন নিভিয়ে নাও। লেকিন... "লেকিন?"

"আমাদের দোকানে যখন ওরা আগুন জ্বালাচ্ছিল, তখন ভুল করে দু-চারজন হিন্দুর দোকানেও আগ লেগেছিল। আগুন তো আর হিন্দু, মুসলিম বা শিখের রেয়াত করে না! আমাদের দোকানের আগুন ওদের দোকান অবধি ছড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা যখন ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকাডাকি করছি, তখন ঐ হিন্দুরাও ঐ একই চেষ্টা করছিল।" নভজ্যোতের চোখে বাষ্প, "বিশ্বাস করবে কি না জানি না। দু মিনিটের মধ্যে সাইরেন বাজাতে বাজাতে দমকলের গাড়ি এসে পৌঁছে গেল স্পটে! হিন্দুদের দোকানগুলোর আগুন খুব সহজেই জল টল মেরে নিভিয়েও দিল। আমাদের দোকান তখনও জ্বলছে। যখন আমরা ওদের অনুরোধ করলাম, তখন বলল, হিন্দুদের দোকানের আগুন নেভাতে গিয়ে ওদের ট্যাঙ্কে নাকি জল শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের দোকানের আগুন নেভাতে পারবে না। আমরা ওদের পায়ে পর্যন্ত ধরেছি। কিন্তু সেই এক জবাব, ট্যাঙ্কে আর জল নেই। আমাদের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ওরা নাচার!"

"এ কী জাতীয় ফাজলামি হচ্ছে!" বাপু এবার রেগে গেলেন, "দমকল একটা এমার্জেন্সি সার্ভিস। তাদের গাড়িতে তেল নেই। বললেই হল? যদি তেল না থাকে তবে হিন্দুদের এত্তেলায় এসে হাজির হল কী করে? তারপর আবার যেই শিখদের দোকানের আগুন নেভানোর প্রসঙ্গ এল, তখন আবার জল নেই! জীবনে কেউ শুনেছে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িতে তেল, জলের অভাব পড়েছে!" "কেউ শুনেছে কিনা জানি না।"

সকালে যারা কোনোমতে পালিয়ে এসে এই কলোনিতে হাজির হয়েছিল, তারা তখনও অন্যত্র চলে যায়নি। বরং এই শিখ কলোনির ঘরেই ওরা সবাই আশ্রয় পেয়েছিল। পুরুষেরা সরতাজদের সঙ্গে এতক্ষণ লড়েও যাচ্ছিল দাঙ্গাইদের সঙ্গে। ওদের মধ্যেই একজন জানায়, "তবে আমি শুনেছি পা-জি। সকালেও এই একই কাণ্ড। গুরুদ্বারার আগুন নেভানোর জন্য দমকলের কোনো গাড়িতেই ডিজেল ছিল না। আবার গুরুদ্বারার আগুন যেই পাশের

হিন্দুবসতির গায়ে ছ্যাঁকা দিল, অমনি ঐ তেলছাড়া গাড়িই এসে উপস্থিত! তখন যে কোথা থেকে ডিজেল এল কে জানে। ঘটনাও যথারীতি একই। হিন্দুবসতির আগুন নেভানোর পর গুরুদ্বারার জন্য ওদের ট্যাঙ্কেও জল ছিল না!

"এ অসম্ভব।" বাপু বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বাস করতে পারছেন না, "ওরা এমন করতে পারে না। এটা ভারতবর্ষ। এখানে এমন ভেদ-ভাও করা অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!"

"বিশ্বাস করতে শেখো পা-জি।" সেই লোকটিই জবাব দিল, "আরও একটা খবর 'কান খোলকে সুন লো।' সকালের অগ্নিকাণ্ডে আর পুলিশের মারে যারা আহত হয়েছিল, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এটাও তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, কিন্তু একটু চিকিৎসার জন্য গোটা দিল্লির সমস্ত হাসপাতাল চষে বেরিয়েছি আমরা! একা আমরা নই, বিভিন্ন জায়গার আহত শিখেরা সবাই প্রায় হাসপাতালগুলোর দেওয়ালে মাথা ঠুকছিল। কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। চিকিৎসা করা তো দূর, ফার্স্ট এইডটুকুও দেয়নি। যাদের অবস্থা সিরিয়াস, তাদের স্রেফ বাইরে কড়া রোদে মাটির ওপর ফেলে রেখেছে। ওরা বাইরে পড়ে পড়ে মরেছে, তবু একটা বেডও ওদের কপালে জোটেনি। সব হাসপাতালই শিখদের দেখলে তাড়িয়ে দিচ্ছে। গুজব শুনেছি, যে সরকারি থেকে বেসরকারি, সব হাসপাতালেই হুকুম করা হয়েছে, কেউ শিখদের চিকিৎসা করবে না। তাই ডাক্তাররাও আমাদের ছুঁতে ভয় পাচ্ছে!"

আমি ওদের থেকে অনেকটা দুরে থাকলেও যেহেতু ওরা উচ্চস্বরে কথা বলছিল, তাই সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার, তখনও আমার বোধশক্তি পরিপূর্ণতা পায়নি। তবু এক বৃদ্ধ মানুষের মতো সবই বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি, সরতাজ থানার ভেতরে, পুলিশ ভ্যানে যে ছেলেটিকে দেখেছিল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন। পুলিশ জানত, হাসপাতালও এখন হতভাগ্য শিখদের পরিত্যাগ করেছে। আমার বুকের মধ্যে ফের সেই অবুঝ কান্নাটা হাঁকপাক করে উঠল। 'ওয়াহেগুরু'ও কি তবে আমাদের ত্যাগ করেছেন? এমন কী করে হয় রবজি? সব দরজা একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্য পুলিশ নেই, আইন নেই, দমকল নেই। এমনকি ডাক্তারও নেই। তবে এই মানুষগুলো যাবে কোথায়? রবজির কাছেও দুঃখ, কষ্ট জানাতে যেতে পারবে না কারণ সব গুরুদ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। জাহান্নম ছাড়া তবে কি আর কোনো দরজা খোলা নেই? আর সব নষ্টের গোড়ায় বসে আছেন সেই ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর হত্যাকারী 'গদ্দার' বেয়ন্ত সিং!

আমার চোখ তখনও নভজ্যোতদের বাড়ির দরজার দিকে স্থির। ভেতর থেকে আগুনের গোলা যেন সব জ্বালা থেকে থেকেই উগরে দিচ্ছে বাইরে। দরজার আশেপাশে কেউ যেতেই পারছে না। কলোনির মানুষগুলোর প্রচেষ্টায় বাইরের আগুন খানিকটা স্তিমিত হলেও ভেতরটা এখনও অনির্বাণ জ্বালায় জ্বলছে। ঐ কয়েকটা মিনিট আমি শ্বাস নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমার হৃৎপিণ্ডটাও বুঝি থেমে গিয়েছিল। থেমে গিয়েছিল রক্ত চলাচলও। শিরার ভেতরে হিমশীতল জমাট রক্ত একটু উষ্ণতা, একটু স্বস্তি ও নিরাপত্তা খুঁজছিল। সরতাজরা তো ঐ জ্বলন্ত ফার্নেসের মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু এখনও কেউ বেরোচ্ছে না কেন? সরতাজেরও দেখা নেই। বাকিরাও যেন ঐ আগুনের মধ্যেই মিলিয়ে গিয়েছে। আদৌ কি কেউ বেরিয়ে আসবে? আর কতক্ষণ এই অসহ্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রতিটা 'লমহা' যেন এক একটা বছরের দৈর্ঘ নিয়ে কাটছিল। আর আমি অসহায়, উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম নভজ্যোতদের বাড়ির দিকে। এখন তো আর চিৎকার-চেঁচামেচিও শোনা যাচ্ছে না। এই নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা অসহ্য। এর চেয়ে কিছু তো ঘটুক। কেউ তো আসুক...!

"বেবে!...বেবে!"

নভজ্যোত আর পবনজ্যোত, দু-জনেই ব্যাকুল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। দেখতে পেলাম ঐ জ্বলন্ত দরজা দিয়েই নভজ্যোতের বেবেকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বেরিয়ে আসছে সরতাজ। তার পেছনে একে একে বাকিরাও। ওদের দু-হাতের মধ্যেই নভজ্যোতের দিদি ও পরজাইজি ঝুলছে। দিদি আর ভাবি মারাত্মক জ্বলে গেলেও তবু নড়াচড়া করছে। কিন্তু ওর

বেবেকে প্রায় চেনাই যায় না! মোটাসোটা চেহারার টুকটুকে ফর্সা রাশভারি মানুষটির এ কী হাল! এ কি আদৌ সেই হাসিখুশি কলোনির 'গওহর মা!' না একটা পুড়ে যাওয়া কাঠের তক্তা।

"আরে, পানি লাও...।"

সরতাজের মুখ বিষণ্ণ। তার পাগড়িতে আগুন জ্বলছিল। বাপু ক্ষিপ্রহাতে জলের বালতিটা তার মাথাতেই উপুড় করে দিলেন। ওর পাগড়ির আগুন নিভে গেলেও বেচারা আপাদমস্তক ভিজে গেল। কিন্তু সরতাজের সেদিকে খেয়ালই নেই। সে নভজ্যোতের বেবেকে সামনের চাতালে শুইয়ে দিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওদের বাপু ও দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়ল। তারপর মাথা হেঁট করে ফেলল।

সরতাজের ইশারাতেই স্পষ্ট, গওহর মা আর জীবিত নেই। নভজ্যোত পাগলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ল পোড়া কাঠের মতো লাশটার ওপরে। দু-হাতে জাপ্টে ধরল নিজের মাকে। বুকফাটিয়ে কেঁদে উঠল, "বেবে... বে-বে! আঁখে খোল... আঁখে খোল মা...তুঝে রব...জি কি কসম...মা...মা...অ্যায়সে ছোড়কে মত যা ....আঁখে খোল...!"

সরতাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর কাঁধে হাত রাখে। গওহর মায়ের নাক আর মুখে এখনও লেগে রয়েছে কালো কালো ছোপ! ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে শ্বাস নিতে পারেননি বয়স্ক নারীটি। হয়তো বা আগুনে পোড়ার আগেই মারা গিয়েছিলেন তিনি। তবে দিদি আর 'ভাবি' তখনও নড়াচড়া করছে। ভাবি ফিশফিশ করে স্তিমিত স্বরে বলছে, "পানি...পানি....।"

পবনজ্যোত পড়ি কী মরি করে ছুটে গিয়ে জল নিয়ে এল। নিজের স্ত্রী আর বোনের মুখে এক আঁজলা জল দিয়ে ব্যাকুল স্বরে বলল, "কোই না! চিন্তা করিস না পদ্মী। সব ঠিক হয়ে যাবে... সব ঠিক হয়ে যাবে...।"

সরতাজ চিন্তিত মুখে বলল, "এখনই হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। নয়তো বাঁচানো যাবে না।"

'হসপিটাল' শব্দটা শুনে প্রত্যেকেই এ-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। হাসপাতালের করুণ কাহিনি সরতাজ জানে না। একটু আগেও কেউ জানত না। কয়েক মুহূর্ত আগেই সেই বিভীষিকার কথা শুনেছে। এখনও বুঝি অনেকেরই বিশ্বাস হয়নি। তবুও সবাই বোবা দৃষ্টিতে সরতাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে বিস্মিত হয়ে বলল, কী হল! তোমরা আমায় এভাবে দেখছ কেন!"

বাপু খুব বিষণ্ণ স্বরে তাকে হাসপাতালের 'দর্পনাক' কাহিনি শোনালেন। সরতাজের দু-চোখে অবিশ্বাস, "সে কী! এমন কী করে হতে পারে। শিখদের চিকিৎসা করবে না বললেই হল? ডাক্তারদের কাছে আবার হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান বা শিখ আবার কী? ওরা যে কোনো পেশেন্টের চিকিৎসা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

"সেটা তুমি ওদেরই বোঝাও।" সেই লোকটিই এবার বলল, "বিশ্বাস না হলে নিজেই হাসপাতালে গিয়ে মনজরটা দেখো। প্রত্যেকটা হাসপাতালের সামনে একগাদা সর্দারজিদের ভিড় পাবে। কাটা, ছেঁড়া, পোড়া, সব হাসপাতালের সামনেই মাটিতে শুয়ে শুয়ে পচছে। গড়াগড়ি দিচ্ছে, যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। কেউ ওদের ফিরে দেখছেই না, ইলাজ করা তো দূর। এতক্ষণে বোধহয় প্রায় সবাই বিনা চিকিৎসায় মরে গিয়েছে। শুধু মরে গেলেই বডি তুলে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে মর্গে। তার জায়গায় আবার নতুন কেউ আসছে। সেও যতক্ষণ না মরবে ততক্ষণ অবধি হাসপাতালের লোকেরা তাকে ছোঁবেই না। এমনকি গুরু নানক হাসপাতালেরও একই অবস্থা।"

তার মুখে এবার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ছাপ। সে একবার তার সহযোদ্ধাদের দিকে তাকাল। এতক্ষণের যুদ্ধে তারাও রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত। কারোর বুকে তরোয়ালের আঘাত, কারোর মাথা ফেটে গিয়ে রক্তে চোখমুখ ভেসে যাচ্ছে। ঐ ভিড়ে একটা লোকও নেই যে অক্ষত। এদের কী হবে! সরতাজ নিজেও 'খুন সে লতপত।" একাধিক ক্ষত তারও দেহে। দাঙ্গাইরা আপাতত ভেগে গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই 'জখমি' মানুষগুলোর কি সামান্য চিকিৎসার

অধিকারটুকুও নেই ঈশ্বর! ওদিকে চারটে অগ্নিদগ্ধ লাশও যে পড়ে আছে। তাদের কী হবে?

একটা ভাবনা মাথায় আসতেই সরতাজের চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে আমাদেরই কলোনির একটি ছেলেকে ডেকে বলল, “সুন কাকে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে যা তো ‘এস’ ব্লকে গৌরীদিদির বাড়িতে। ওটা পুরোটাই হিন্দুদের কলোনি, কোনো শিখ পরিবার নেই। ওখানে দাঙ্গাইরা ঢুকবে না। আজ যা পরিস্থিতি তাতে গৌরীদি বোধহয় হাসপাতালে যায়নি। বাড়িতে থাকলে ওকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আয়।”

গৌরী দিদি বা গৌরী বিশ্বাসকে আমিও চিনতাম। এস ব্লকে, পোস্ট অফিসের কাছেই ওঁর বাড়ি। পেশায় গুরু নানক হাসপাতালের গ্রেড ওয়ান নার্স। আমাদের মতো গরীব মানুষরা কথায়-কথায় ডাক্তারের কাছে যেতে পারে না। তখন গৌরীদিদিই ভরসা। সামান্য জ্বর-জারি, পেটখারাপ, ইত্যাদির চিকিৎসা উনিই বিনামূল্যে করে দিতেন। খুব ‘হাসমুখ’ আর ভালোমানুষও বটে। ডাক্তারদের সঙ্গে এত বছর থেকে থেকে অভিজ্ঞ ও হয়ে গিয়েছেন। আপাতত তিনিই শেষ ভরসা।

অনেক ভরসা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সরতাজ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কপালগুণে তিনিও আজ বাড়িই ছিলেন। খবর পাওয়া মাত্রই যেটুকু ওষুধ, ফার্স্ট এইড বক্স আর ক্ষতস্থান সেলাই করার সরঞ্জাম ছিল, সব নিয়ে তড়িঘড়ি করে ছুটে এলেন। কিন্তু চতুর্দিকের অবস্থা দেখে তিনি হতবাক। বুঝতেই পারছেন না কী করবেন, কোথা থেকে চিকিৎসা এবং পরিচর্যা শুরু করবেন! সরতাজ বলল, “দিদি, তুমি আগে নভজ্যোতের দিদি আর পরজাইজিকে দেখো। দেখো কিছু করতে পারো কিনা।”

গৌরী নভজ্যোতের দিদি আর পদ্মী কৌরের অবস্থা দেখেই আঁতকে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত কথাও বলতে পারলেন না। তারপর চাপা স্বরে সরতাজকে বললেন, “ভাই, আমি একজন নার্স মাত্র। ডাক্তার নই। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, ওদের চিকিৎসা করা আমার সাধ্যের বাইরে। থার্ড ডিগ্রি বার্ন কেস। ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজ না করলে দু-জনের কেউ বাঁচবে না। ওদের হাতে সময় খুব কম। হসপিটালের বার্ন ইউনিট ছাড়া কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না। আর এখানে যত তোরা ফেলে রাখবি, ততই ইনফেকশন ছড়াবে। সাক্ষাৎ ভগবানও ওদের প্রাণরক্ষা করতে পারবে না। বাকিদের তবু আমি স্টিচ দিয়ে, ড্রেসিং করে ঠিক করতে পারব। কিন্তু এখানে আমারও কিছু করার নেই।”

“দেখো না দিদি, যদি তুমি কিছু করতে পারো।” পবনজ্যোত ভেজা গলায় বলল, “বেবেকে তো বাঁচাতেই পারলাম না। অন্তত যদি দিদি আর পদ্মী বাঁচে।”

গৌরী হতাশভাবে মাথা নাড়লেন, “হসপিটাল ছাড়া সম্ভবই নয় পবন। এ জাতীয় বার্ন কেসে অনেকরকম প্রোটেকশন লাগে। ইনফেকশন আটকাতে হয়। এটা ফুল থিকনেস বার্ন। সার্জিক্যাল হেল্প থেকে শুরু করে কভার, নানারকম ব্যান্ডেজ, অ্যান্টিবায়োটিকস, আরও অনেক কিছু লাগে যা একমাত্র হসপিটালই দিতে পারে। কথা না বাড়িয়ে এখনই ওদের হসপিটালে নিয়ে যা। যত তুই কথা বাড়াবি, ওদের বিপদ ততই বাড়বে।”

সরতাজ এবার বাধ্য হয়েই হাসপাতালের পরিস্থিতি গৌরীকে জানায়। গৌরীর দু-চোখে অবিশ্বাস, “কী বলছিস সরতাজ! এরকম কী করে হয়? হতেই পারে না। এসব গুজব!”

যে লোকটি এই তথ্যটা দিয়েছিল, সে এবার প্রতিবাদ করে ওঠে, “একদম একশো শতাংশ সত্যি কথা। আপনি নিজেই হসপিটালে গিয়ে দেখুন।”

“বেশ।” প্রবীণ নার্স উঠে দাঁড়ালেন, “চলো তোমরা আমার সঙ্গে। আমরা সবাই গুরু নানক হসপিটালেই যাব। বার্ন পেশেন্টদেরও নিয়ে চলো। আমিও দেখব, হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সত্যিই ট্রিটমেন্ট দিতে অস্বীকার করে কিনা। সরতাজ, তুইও চল।”

সরতাজ মাথা নাড়ল, “না দিদি, আমি গেলে চলবে না। আমার মন বলছে, শয়তানগুলো এবারের মতো পালিয়ে গেলেও আবার ঠিক ফিরে আসবে। এবার আরও বেশি ‘তাদাদে’। ‘বদজাত’রা যদি বাধা পায়, বা মার খায় তবে ওদের রাগ আরও বেড়ে যায়। তার ওপর ওদের সঙ্গীদের মধ্যেও কয়েকজন মরেছে। ওরা ছেড়ে কথা বলবে না, বদলা নিতে ফের

আসবে। এবার আরও বেশি সংখ্যায়, আরও বেশি 'ঔজার' নিয়ে। আমার এখানে থাকা দরকার। তুমি বরং তোমার ফার্স্ট এইড বক্স থেকে কিছু জিনিসপত্র আমায় দিয়ে দাও। আমি সিপাহী মানুষ। প্রয়োজনে নিজেই নিজেকে ফার্স্ট এইড দিয়ে দিতে পারি।"

"সরতাজ।" গৌরী ব্যাকুল স্বরে বললেন, "কেন খামোখা ওদের সঙ্গে পাঙ্গা নিচ্ছিস? নিজের অবস্থা তো দ্যাখ! এই অবস্থায় কতক্ষণ লড়বি। তার চেয়ে আমাদের কলোনিতে চল। ওটা হিন্দু কলোনি। কোনো ঝামেলা হচ্ছে না। ক-টা দিন না হয় আমার বাড়িতেই থাকবি। কেউ জানতে পারবে না। অন্তত যতক্ষণ না এসব ঝামেলা থামছে...!"

"লুকোতে বলছ?" সরতাজ করুণ হাসল, "কতজনকে তুমি আশ্রয় দেবে দিদি? এখানে কলোনির পর কলোনি শিখ! কতজনকে বাঁচাবে? ওদের যদি বাঁচাতেই না পারি তবে আমি একা মুখ লুকিয়ে, প্রাণ বাঁচিয়ে কী করব? আমি ফৌজি, লড়তে শিখেছি। ভাগতে শিখিনি। তুমি বরং দেখো ওদের হসপিটালে অ্যাডমিট করতে পারো কিনা। আমি আর আমার রাইফেল, দু-জনেই এখানেই বসে পাহারা দেব। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ লড়ে যাব।"

গৌরী বুঝলেন সরতাজকে তার সিদ্ধান্ত থেকে একচুলও সরানো যাবে না। অগত্যা তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বাকিদের নিয়ে চলে গেলেন।

আমি বাড়ির ছাত থেকে তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি তার দিকে। ওর বলা কথাগুলো আমার কানে তখনও বাজছে, "ওরা আবার ফিরে আসবে... আরও বেশি সংখ্যায়... আরও বেশি ঔজার নিয়ে... বদলা নিতে আসবে...।"

ভাবতেই আমার আট বছরের দেহটা বুঝি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অনড় হয়ে গেল। আবার আসবে ওরা! আবার হামলা করবে মনুষ্যরূপী পশুরা! খুন কা বদলা খুন! চক্রাকারে এই বদলা, প্রতিশোধ চলতেই থাকবে। এর কোনো বিরাম নেই! কতক্ষণ চলবে এই অকারণ নরমেধযজ্ঞ! যতক্ষণ না কলোনির সবাইকে মেরে ফেলছে, ততক্ষণ থামবে না ওরা! মারবে... কাটবে... জ্বালাবে! ব্যর্থ হলে বারবার ফিরে আসবে! আমাদের কাউকে ছাড়বে না। কাউকে না। কেউ বাঁচবে না... আমার বাপু, তাওজি, বেবে, দিদি, সরবজিৎ-আমনপ্রীত প্রা-জি, সরতাজ, নভজ্যোত, এমনকি আমিও না!

আমার ছোট্ট বুকটার মধ্যেই ভয়াবহ আতঙ্ক তাণ্ডব শুরু করল। প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে, তবু চোখের জলও বুঝি ভয়ে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। কেরোসিন তেল পোড়ার মিষ্টি গন্ধটায় আমার নেশা হত। গন্ধটা খুব প্রিয় ছিল। এখন চতুর্দিকে শুধু কেরোসিন তেল আর মাংসপোড়ার কটু গন্ধ! ঐ গন্ধটা যে এমন ভয়াবহ রূপ ধরতে পারে তা কে জানত! ঐ স্টোভের সুবাসে আমার বুক ভরে যেত। আর এই দুর্গন্ধে ভীষণ বমি আসছে। এই কেরোসিনের 'খুশবুতেও বুঝি ঘেন্না ধরে গিয়েছিল ঐ মুহূর্তেই। সহ্য হচ্ছে না! আর সহ্য হচ্ছে না এই 'বদবু।'

আমার চোখের সামনেই সরতাজ মৃত মানুষগুলোর পরিবারকে একে একে দুঃসংবাদ দিল। মেয়েরা সব ঘরের ভেতরে জানলা দরজা বন্ধ করে ছিল, তাই বাইরে কী হচ্ছে জানতে পারেনি। যখন জানল তখন গোটা কলোনি সচকিত হয়ে উঠল তাদের আকুলি-বিকুলি কান্নায়। সফেদ পাউডারে জ্বলে যাওয়া, জ্যান্ত গলে যাওয়া স্বামীদের পাশে বসে মাথা ঠুকে, বুক চাপড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল হতভাগিনীরা। ওদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল, যার কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে! তিনদিন আগেই সবে 'সুহাগরাত' কেটেছে। বউয়ের হাতের মেহেন্দি এখনও ফিকে হয়নি। অথচ যার নামের মেহেন্দি, সেই মানুষটাই পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে! আমি দেখলাম, সেই সদ্যবিবাহিতা মাটিতে হাত আছড়ে আছড়ে সযত্নে পরানো লাল টুকটুকে 'চুড়া' ভাঙছে। যে হাত মেহেন্দিতে লাল ছিল, সেই হাত চুড়ার ভাঙা কাচে কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। দু-হাতে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তবিন্দু দেখা দিল। কর্তার সিং-এর বউও কাচের চুড়ি কপালে মেরে মেরে ভাঙল। ওরও কপাল, হাত বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেসামাল কান্না সারা কলোনিতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! ওঃ! আর কত কান্না শুনতে চায় দিল্লির আকাশ

বাতাস! আর কত রক্তপান করবে দিল্লির মাটি।

এত কিছুর মধ্যেও প্রচণ্ড জেদে অনড় হয়ে বসে আছে সরতাজ সিং! চোখে ভীষণ সাহস! হাতে জাগ্রত রাইফেল। একাই পাহারা দিচ্ছে গোটা কলোনিটাকে! সেই সরতাজ...!

সরতাজ নাকি অধিরাজ? নাম আলাদা, রূপ আলাদা, অথচ মানুষটা একই। ও জানে, প্রত্যাঘাত আসবে, আরও জোরে, আরও দ্বিগুণ বেগে...! আততায়ী বারবার ফিরে আসবে। ওর সাথীদের মারবে, ওকেও মারবে। কিন্তু তবু অসম্ভব জেদে পাহারা দিয়ে চলেছে। সেই সিংহবিক্রম। সেই রাগ। সেই তেজ! সেই ঔদ্ধত্য!

নাঃ। আবার আক্রমণে যেতে হবে। আমারও যে ছুটি নেই! ঘড়ির কাঁটা একটু একটু করে এগোচ্ছে আর মনে করিয়ে দিচ্ছে, এ জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত অনিশ্চিত। কখন কী ঘটবে, কেউ জানে না। এরপরে কী হবে আমিও জানি না, অধিরাজ ব্যানার্জিও না।

“না ম্যায় জানু, না তু জানে, কিস ঘড়ি মেঁ, হোনা হ্যায় ক্যায়া। জিন্দেগি কি, ইস জুয়ে মেঁ, পানা ক্যায়া হ্যায়, খোনা হ্যায় ক্যায়া...!”

****

(১৭)

"অর্ণব, এবার আরও জোরালো মারের জন্য প্রস্তুত থাকো। কোমল কৌরের মৃত্যুর প্রতিশোধে কোনো-না কোনোদিক দিয়ে হামলা খুব তাড়াতাড়িই আসতে চলেছে। আজকের রাতটা বিপজ্জনক। আজ ও মরণকামড় দেবেই। লেডি অফিসারদের আজ রাতে একা ছাড়া চলবে না। শহরের সমস্ত মেডিক্যাল স্টোরগুলোর সামনে দরকার পড়লে গোটা কলকাতা পুলিশের টিমকেই নামিয়ে দাও। একটা দোকানও যেন আগামী দু-রাতের মধ্যে কোনোরকমের ড্রাগ বা সেডেটিভ বিক্রি না করে। দরকার পড়লে এডিজি সেনকে অনুরোধ করো যাতে উনি এই বিষয়ে প্রেস কনফারেন্স করেন। বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস অ্যাসোসিয়েশনকে ইনফর্ম করো, দ্য ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিকল অ্যাসোসিয়েশনকেও চেতিয়ে দাও। প্রয়োজন হলে সমস্ত অফিসাররা সব কাজ শিকেয় তুলে প্রত্যেকটা ইললিগ্যাল ড্রাগ সাপ্লায়ার, ড্রাগ পেডলারকে তুলে আনুক, রাউন্ড আপ করুক, কিন্তু আজ আর কাল রাতে কোনোমতেই যেন একটাও ঘুমের ওষুধ, কোনোরকম ড্রাগ, লিগ্যাল অর ইললিগ্যাল, বিক্রি না হয়।"

অধিরাজ দ্রুত গতিতে ফরেনসিক ল্যাব থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে নির্দেশ করল। তার মুখে স্পষ্ট দুশ্চিন্তার রেখা। ঘন অক্ষিপল্লবে ঘেরা অপূর্ব চোখদুটোয় অব্যক্ত আশঙ্কা। ঘেমে নেয়ে একসা হয়েছে। ওর নতুন শার্টটাও রক্তে ভিজে গিয়েছিল। মাথাটা অনেকটাই কেটেছে। ব্লাস্টের ইমপ্যাক্টে ইটটা সজোরে এসে মোক্ষম বেগে লেগেছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা আহেলি তার মাথার পরিচর্যা করে দিয়েছে। এই প্রথম মিস্ মুখার্জির স্পর্শে অধিরাজ আপত্তি জানায়নি, কোনোরকম ট্যাঁ ফোঁ-ও করেনি। বরং একটু সহজভাবে হাসার চেষ্টা করেই বলেছে, "থ্যাঙ্ক ইউ মিস্ মুখার্জি! এখন আপনিই আমাদের ভরসা!"

"এতে থ্যাঙ্কসের কিছুই নেই।" আহেলির মুখ গম্ভীর, "যে হারে আপনি নিজেকে কাটাছেঁড়া করতে শুরু করেছেন, ফলে বাবা মোস্তাফার ফেভারিট পেশেন্ট হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী!"

ওরে বাবা! পাটকেল। অর্ণব সভয়ে অধিরাজের দিকে তাকায়। অধিরাজ একটু অপ্রতিভ, "স্যরি।"

"ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। শুধু একটিই উপকার করুন আমার।" আহেলির কথায় শশব্যস্তে বলে উঠল অধিরাজ, "ইয়েস... ইয়েস। আপনার ফ্যামিলির প্রোটেকশনের ব্যাপারটা তো? অলরেডি গার্ডরা চলে গিয়েছে। আপনার পরিবার সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।"

"ওটা কোনোরকম উপকার নয়, আপনার ডিউটি।" সে খুব ঠান্ডা গলায় বলে, "ওটা করতে আপনি বাধ্য, তাই কোনোভাবেই আমায় উদ্ধার করছেন না। বাট আমার আর একটা ফেভার চাই।"

"শিওর, বলুন।"

আহেলির বড়ো বড়ো টানা টানা চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি ফুটে ওঠে, "আপনি কাঁধ কাটান, কপাল ফাটান, চাইলে হাত ফালা ফালা করুন। পায়েও গোটা কয়েক চিড়-ফাঁড়ও করতে পারেন। বাবা মোস্তাফা সবসময়ই সূঁচ-সুতো নিয়ে রেডি। কিন্তু দয়া করে মরবেন না! আহত-ক্ষতবিক্ষত সব চলবে। বাট কেসের শেষে অন্তত একপিসেই ফিরবেন। এই কৃপাটা করলে আমি নিজেই আপনাকে বিরিয়ানির ট্রিট দেব। সো প্লিজ, ডোন্ট ডাই!"

এটা সম্ভবত ভালোবাসা জানানোর চরম এক্সপ্রেশন। অর্ণবের এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল। এত কাণ্ড, খুনোখুনির মধ্যেও ভালোবাসা সবসময়ই তিরতির করে বয়ে যায়। ভয়াবহ কয়েকঘণ্টার মধ্যে একমুহূর্তের সুখ! প্রচণ্ড লু এর মধ্যে একপশলা ঠান্ডা হাওয়া। তবে লোকটার মাথায় ঢুকলে হয়!

"ইউ নো মিস্ মুখার্জি?..." সে মৃদু হাসল, আপনার ওষুধ প্রায় আপনার কথার মতোই

জ্বালাময়ী! কপালটা জাস্ট জ্বলে যাচ্ছে! বাট, থ্যাঙ্কস এগেইন! বাই দ্য বাই, দুটো ডেডবডি থেকে নতুন কিছু বেরোল?”

অর্ণব হতাশভাবে মাথা নাড়ে। হিন্দিতে একটা প্রবাদ আছে, গয়া ভঁইস পানি মেঁ! এ ব্যাটার কিছুতেই হবে না! হওয়ারই নয়। স্বয়ং কামদেবও ওনাকে বোঝাতে পারবেন না! উনি হায়ারোগ্লিফিক বুঝতে পারেন, রকেট সায়েন্স বুঝতে পারেন এমনকি ঠ্যালায় পড়লে জুলু, হিব্রু বা মার্শিয়ান কোডও বোধহয় বুঝবেন। কিন্তু প্রেমের ভাষা ওঁকে বোঝাতে পারে, এমন কেউ এ ধরাধামে জন্মায়নি।

আহেলি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, “খুব সাংঘাতিক লিড কিছু নয়। তবে হয়তো প্রয়োজনে লাগতে পারে। শেষমেষ সনৎ আর ইসমাইলের ডেডবডি মোটামুটি জোড়া লাগানো গেছে। দু-জনের মৃত্যুর সময় কাছাকাছিই। কয়েক মিনিট বা বড়োজোর আধঘণ্টার ডিফারেন্স হবে। অসম্ভব ব্রুটাল মার্ডার। ইসমাইলের শরীরে স্ট্রাগলের কোনো চিহ্ন নেই। পেটে মদও নেই। তবে সনতের মুখে এখনও অনেকটা না চেবানো খৈনি রয়েছে। এইখানে একটা পজিটিভ নিউজ আছে। সনৎ স্ট্রাগল করেছিল। আর মানুষ যখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য হাতাহাতি করে তখন অনেক সময়ে নখ দিয়ে আততায়ীকে আঁচড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আমি সেইজন্যই সনতের নখগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলাম। সব নখ ক্লিন হলেও একটা আঙুলের তর্জনীতে কিছুটা স্কিন স্যাম্পল পেয়েছি। তাতে খুব বেশি না হলেও কিছু কিছু জিনিস ক্লিয়ারলি বোঝা গিয়েছে।”

“ব্রিলিয়ান্ট।” সে বলল, “যেমন?”

“আপনি মদনের মুখে বার্নিং শিখের গ্ল্যামারাস মোমপালিশ হাতের কথা শুনে চিন্তায় পড়েছিলেন না, যে লোকটা পুরুষ না মহিলা নাকি ট্রান্সজেন্ডার! কিংবা ওরকম একটা ভয়াবহ খুনির অত মসৃণ ফর্সা হাত কী করে হয়?” আহেলি হেসে ফেলল, “আপনার মদন সত্যিই মদন! ও ব্যাটা বুঝতেই পারেনি যে বার্নিং শিখের অত সুন্দর ফ্ল লেস স্কিন আদৌ স্কিনই নয়। ব্যাটা অবিকল স্কিন কালারের ক্রসড্রেসিং সিলিকন গ্লাভস পরেছিল! এই জাতীয় গ্লাভস পারফর্ম্যান্স প্রপস হিসাবেও ইউজড হয়। দেখতে এতটাই ন্যাচারাল যে, যে কেউ ওটাকে আসল স্কিন বলে ভুল করবে। আপনাকেও যদি পরিয়ে দেওয়া হয় তবে যারা দেখবেন, তারা অবাক হয়ে ভাববেন আই জি সাহেবের হাত এমন মেয়েদের মতো ওয়াক্স ও ম্যানিকিওর করা কবে থেকে হল! কিন্তু ওটাকে গ্লাভস বলে চিনতে তাদের রীতিমস্ত কষ্ট হবে। এমনকি গ্লাভসগুলোয় ন্যাচারাল লুকিং নখও থাকে। তাই যে কেউ ভুল করবে! সনৎ ওর হাত আঁচড়ে দিয়েছিল বলে সিলিকন গ্লাভসের একচিলতে নকল স্কিনের টুকরো সনতের নখে ঢুকে গিয়েছে। আমি পরীক্ষা করেই বুঝতে পেরেছি।”

“আই সি।” অধিরাজের চোখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে ওঠে, “তার মানে লোকটা আপাদমস্তক একজন পুরুষ যে মেয়েদের মেক-আপ নিতেও সিদ্ধহস্ত। এবং যখন সে ক্রাইমসিনে উপস্থিত ছিল, সেই মুহূর্তেও মেয়েদের গ্লাভসটা খোলেনি। এইজন্যই কোথাও তার ফিঙ্গারপ্রিন্টও পাওয়া যায়নি। গ্লাভস সে পরেছিল, তা আগেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এমন অভিনব গ্লাভস পরার মানে কী! যে কোনো সস্তা দামের গ্লাভস পরলেই তো চলত।”

আহেলি মৃদু হাসল, “আপনার এই প্রশ্নের উত্তরেই আরও একটা ক্লু আছে। সেটা পুরুষেরা বুঝবে না, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে বোঝা সম্ভব।”

“প্লিজ, এক্সপ্লেইন।”

“এই জাতীয় সিলিকন গ্লাভস পরে যদি কোনো পুরুষ মেয়ের ছদ্মবেশ নেয়, তবে তাকে হাই সোসাইটি গার্লের ছদ্মবেশ নিতে হবে। পুরুষ ড্রাইভার, মজুর বা ফাদারের হাত এমন গ্ল্যামারাস হওয়া সম্ভবই নয়, তাই ও সম্ভাবনা বাদ। এবার আসি মেয়েদের কথায়। কতজন লো-প্রোফাইলের মেয়ে, যেমন বাড়ির রাঁধুনী, নার্স, আয়া, ঠিকা কাজের লোককে আপনি ওয়াক্স বা পেডিকিওরের মতো হাই-ফাই স্টাইল মারতে দেখেছেন? বাসন মাজা, রান্না করা বা ঘর মোছার হাতে ম্যানিকিওর করা মানে অর্থ ধ্বংস করা! কোনো ‘নিডি মেয়ে’ তা করে না।

ইভেন আত্রেয়ী বা মিস্ বোসও এভাবে রেগুলার পার্লার ভিজিট করার সময় পায় না, ওদের সময়ই নেই। আত্রেয়ী তো এসবের ধারই ধারে না, মিস্ বোস তবু করেন, তাও কালে ভদ্রে। তাই আপনার খুনি লো প্রোফাইলের মেয়ে নয়, নির্ঘাৎ হাই সোসাইটি 'বেবস'-এর ছদ্মবেশ ধরেন। কোনো কারণে ঐ রূপটাও তাকে ধরতে হয়। হয়তো ব্যস্তসমস্ত হয়ে ত্রিপাঠীসাহেবের বাড়িতে ফার্স্ট মাস-মার্ডার করার সময়ে এবং সনৎকে খুন করার টাইমে তিনি হাতের সিলিকন গ্লাভস খুলে ফেলার প্রয়োজন বোধ করেননি। এবং আমার ডিডাকশন যদি ভুল না হয়, তবে রাতের দিকে তিনি নারীর রূপেই থাকেন। পি সি চৌধুরীর বাড়িতে তিনি কোন বেশে আছেন জানি না, কিন্তু আর্বানায় তাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আত্রেয়ী ওভার ফোন আমায় যতটুকু বলেছে, তাতে ওখানে হাই সোসাইটি লেডিজদের ছড়াছড়ি! এমনকি ওদের কাজের মেয়েরাও অসম্ভব স্টাইলিশ! যে বাড়ির মেইড হীরের নাকছাবি, নেকলেস পরে, সেও হাই সোসাইটি লেডিদের থেকে কিছু কম যায় না। আপনি একটু কষ্ট করে আর্বানার মেয়েদের মধ্যে খুঁজুন, আমার ধারণা ওখানেই তাকে পেয়ে যাবেন।"

"ইউ নো মিস মুখার্জি।" অধিরাজ এবার উচ্ছ্বসিত, "ইউ আর আ জিনিয়াস। আর এর জন্য একটা রিটার্ন গিফট আপনার প্রাপ্য রইল। তবে সেটা পরে হবে। আপাতত আপনাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আমরা একজন লেডি অফিসারকে নিয়ে এসেছি। আরও একজন একটু পরেই আসবেন। প্রণবেশদার টিমের মেয়ে। প্রণবেশদা আপনাকে ফোন করে ছবি সহ তাঁর সমস্ত ডিটেইলস পাঠিয়ে দেবেন। আপাতত আপনি আমাদের নতুন টিমমেটটিকেও দেখে রাখুন। ইনি এখন এই কেসে আমাদের অ্যাসিস্ট করছেন। সন্ধ্যা সাতটার পর আপনার কাছে চলে আসবেন।"

"গ্রেট!" আহেলি এবার লাজুক হাসল, "কোথায় তিনি?"

"আপাতত বাইরে দাঁড়িয়েই পাহারা দিচ্ছেন। ব্লাস্টে সামান্য ইনজিওর্ডও হয়েছেন।" অধিরাজ জানাল, "আমরা ওঁকে একটু মেরামতির জন্য আমাদের সঙ্গেই আসতে বলেছিলাম। কিন্তু ওঁর আবার সিগারের নেশা আছে। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে একটা পাশবালিশের সাইজের চুরুট ফুঁকছেন।"

আহেলি একটু অবাক, "এতক্ষণ ধরে চুরুট ফুঁকছেন। আপনারা এসেছেন প্রায় একঘণ্টা হতে চলল। এরমধ্যেও তাঁর সিগার শেষ হয়নি? গোটা কার্টনটাই ফুঁকছেন নাকি।"

"আরে, তাই তো!" এতক্ষণে অধিরাজের খেয়াল হল। তার কপালে ফের চিন্তার ভাঁজ, "একটা সিগার টানতে তো এত সময় লাগে না। হল কী। চলো তো অর্ণব...!" দুই অফিসারই একরকম পড়িমরি করে দৌড়েই ল্যাবের বাইরে গেল। স্বাভাবিকভাবেই ওরা দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। বার্নিং শিখ যা খেল দেখাচ্ছে তাতে সে কখন কী করবে তার ঠিক নেই। কোন মুহূর্তে কী ঘটবে, কেউ জানে না। মিস্ অরোরা ডেয়ার ডেভিল ঠিকই, কিন্তু এই কেসে নতুন। সব কিছু ওর জানা নেই। তার কোনোরকম বিপদ হল না তো...!

একবুক ভয়াবহ আশঙ্কা ও আতঙ্ক নিয়ে অধিরাজ আর অর্ণব ল্যাবের বাইরে এল। কিন্তু কোথায় মিস্ অরোরা। একটু আগেও তো সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে সিগার টানছিল। অথচ এখন সে সেখানে নেই। সব ভোঁ ভাঁ! মেয়েটা যেন আচমকাই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। চতুর্দিকের শূন্যতা যেন ওদের দু-জনের অবস্থা দেখে নীরবে ব্যঙ্গ করছে। কোথায় গেল টুইঙ্কল! এই একটু আগেও তো কথা বলছিল, গল্প করছিল! উত্তেজিত ব্যাকুল কণ্ঠে অধিরাজ ডেকে ওঠে, "মিস্ অরোরা! ...মিস্ অ-রো-রা!" আতঙ্কে তার বুক প্রায় শুকিয়েই আসছিল। তবে আরও বেশি চিন্তায় পড়ার আগেই ছাতের দিক থেকে টুইঙ্কলের গলার আওয়াজ ভেসে এল, "এই তো স্যার। আমি এখানে, আসছি।"

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দু-জনেই। অর্ণব মনে মনে আরও খানিকটা চটেছে। এভাবে খামোখা ভয় দেখানোর কোনো মানে হয়? এই মেয়েটা একটুও কি সুস্থির থাকতে পারে না! এখনই হঠাৎ ছাতে যাওয়ার তার কী হল? টুইঙ্কলের বুটের খটখট আওয়াজ এখান থেকেই শোনা যাচ্ছিল। অর্থাৎ সে নীচের দিকে নেমে আসছে। ওরা দু-জনেই ওপরের

স্টেয়ারকেসের দিকে তাকায়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাদের সামনে মিস্ অরোরা প্রকট হল। কিন্তু তাকে দেখে একরকম ঘাবড়েই গেল অধিরাজ। অর্ণব আর একটু হলেই ফেইন্ট হয়ে যাচ্ছিল। কোনোমতে নিজেকে সামলেছে। টুইঙ্কল সম্পূর্ণ অক্ষত শরীরে আছে ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে সে একটা কাঁচা সাদা মুলো খেতে ব্যস্ত। আর একটা হাতে আরও গোটা দুয়েক মুলো আর গাজর ধরা রয়েছে।

"মিস্ অরোরা...।" অধিরাজ সবিস্ময়ে বলল, "আপনি এতক্ষণ ছাতে বসে মুলো খাচ্ছিলেন।"

"কী করব স্যার।" টুইঙ্কল একটু লজ্জিত। সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "বড়ো খিদে পেয়েছিল। আমার এই এক বদ অভ্যাস। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। লাহিড়ী স্যার আগেই আমায় সতর্ক করেছিলেন বাইরের কোনো খাবার যাতে না খাই। তাই মুলো আর গাজর দিয়েই কাজ চালাচ্ছি।" বলতে বলতেই সে আর একটা হাতে ধরা মুলো আর গাজর এগিয়ে দেয় অধিরাজের দিকে, "আপনিও খান না। ভয় নেই, আমি জাস্ট এখান থেকে বেরিয়ে সামনের সবজি মার্কেট থেকে কিনে এনেছি। ভালো করে ধুয়েও নিয়েছি। বার্নিং শিখ আর যা-ই হোক, মুলো বা গাজরে সেডেটিভ মেশাবে না।" অর্ণব এতক্ষণে বিরক্তিমাখা স্বরে বলে, "তাই বলে সবজি মার্কেটে আর কিছু পেলেন না? সাদা মুলো কেউ মেইন ডিশ হিসাবে খায়। তাও আবার কাঁচা!"

টুইঙ্কল অম্লানবদনে মুলোটায় এক কামড় বসিয়ে দিব্যি কচকচ করে খেতে খেতে বলল, "আমি তো ছোটোবেলা থেকেই খাই। এমনকি লাল মুলোও কাঁচা খেতেই বেশি ভালো লাগে। ইনফ্যাক্ট, রান্না করা মুলোই বরং কম খাই। খেতে খুব ভালো, স্বাস্থ্যকরও বটে। আপনিও ট্রাই করুন না স্যার!"

অর্ণব দাঁত কিড়মিড় করে সোজা তেলে পড়বে না জলে, ভেবে পাচ্ছিল না। তার আগেই অধিরাজ পরিস্থিতি সামাল দেয়, "ওয়েল সেনোরিটা, এতক্ষণে আমি নিশ্চিত বার্নিং শিখ আপনাকে কোনোভাবেই সেডেটিভ খাওয়াতে পারবে না। সে খাবারে ওষুধ মেশাতে পারে, কিন্তু আপনার ফেভারিট ডিশগুলো দেখলে হয়তো ও বেচারা দেওয়ালে মাথা ঠুকবে। বাই দ্য ওয়ে, আর কী কী আছে আপনার ফেভারিট কাঁচা ফুডের লিস্টে? আই মিন, মুলো আর গাজর ছাড়া?"

টুইঙ্কল হাতের মুলোটা শেষ করে অম্লানবদনে আরও একখানায় মনোনিবেশ করে বলল, "মাঝে-মধ্যে কাঁচা কপি খেতেও ভালো লাগে। বিশেষ করে বাঁধাকপি। এছাড়া মটরশুঁটি, চানা-ছোলা, মাঝেমধ্যে করলা, পুদিনা পাতা, আমলকি, শসা, কচি ভুট্টার দানা, নিতান্তই কিছু না পেলে কুমড়োর বীজ—এইসবই খাই।"

এমনিতেই কাঁচা মুলোর গন্ধে অর্ণবের পেট গোলাচ্ছিল। তার ওপর কাঁচা করলা শুনে প্রায় বমিই পেয়ে গেল। টুইঙ্কল ফের আর একটা আস্ত মুলো আর গাজর এগিয়ে দিয়েছে অধিরাজের দিকে, "টেস্ট করে দেখুন না স্যার। দারুণ খেতে।"

"আপনি যখন বলেছেন তখন নিঃসন্দেহে দারুণ।" অধিরাজ মোলায়েম হেসে বলল, "কিন্তু আই থিঙ্ক, আপনি সত্যিই ক্ষুধার্ত। আর মাত্র কয়েকটাই মুলো আর গাজরই বাকি আছে... ইয়ে মানে, আগে ক-টা ছিল?"

"ছ-টা মুলো আর আটটা গাজর ছিল। বাকিগুলো খেয়ে ফেলেছি।"

"হ্যাঁ। সেটাই স্বাভাবিক।" সে নিরীহ মুখেই বলে, "একেই এত কম পরিমাণ। তার ওপর আমরাও যদি ভাগ বসাই, তবে আপনার কম পড়ে যাবে। আপনি বরং এখানে দাড়িয়েই বাকিগুলো শেষ করুন। তারপর ডিউটির পর রাতে যাঁকে পাহারা দেবেন, সেই মিস্ মুখার্জির সঙ্গে আপনার আলাপটাও করিয়ে দেব। আপনার কি রাতেও এরকম খিদে পায়?"

টুইঙ্কল বড়োই লজ্জিত হয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, "কী করব স্যার। ছোটোবেলা থেকেই আমার এই এক দোষ। কিছুতেই খিদে কন্ট্রোল হয় না।"

"ইটস অলরাইট।" অধিরাজ একটু আতঙ্কিত দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায়, "তাহলে এখনই কয়েক ব্যাগ তরি-তরকারি রাতের জন্য মজুত করে রাখাই ভালো। কী বলো অর্ণব? মেয়েরা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। তাদের খালি পেটে রাখা একেবারেই উচিত নয়।"

অর্ণব কিছু বলার আগেই আচমকা পিলেচমকানিয়া ভয়ানক একটা আওয়াজে ব্যোমকে গিয়ে থেমে গেল। না, সাঙঘাতিক কোনো ঘটনা নয়। ফরেনসিক ল্যাবে বোমও পড়েনি। টুইঙ্কলের খাওয়া শেষ হয়েছে, এবং সে 'ঘুড়ুৎ' করে একটা পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলেছে। তাতেই বোধহয় গোটা ফ্লোরটাই কেঁপে উঠল। নিজেই ফের অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "স্যরি।"

"স্যরি বলার প্রয়োজন নেই মাদমোয়াজেল।" সে একটু হাসল, "পেট ভরে গেলে মানুষ যদি ঢেঁকুরই না তোলে, তবে বোঝা যাবে কী করে যে পেট ভরল কিনা। আশা করি আপনার পেট এখন শান্ত।"

"একদম স্যার।"

"তাহলে প্লিজ ভেতরে চলুন।" অধিরাজ ফরেনসিক ল্যাবের দরজাটা খুলে দিয়ে সসম্মানে দীর্ঘ দেহটাকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে, "আফটার ইউ।"

টুইঙ্কল গটগটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। অর্ণব অধিরাজের কানে ফিশফিশ করে, "স্যার, সিরিয়াসলি? কাঁচা মুলো, কপি আর করলা। ইনি মহিলা নন। সাক্ষাৎ হনুমান!"

"ওরকম বলে না ডার্লিং!" অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসছে, "হনুমান হতে যাবেন কোন দুঃখে। তবে বজরঙ্গবলীর ভক্ত হলেও হতে পারেন। তাছাড়া যেখানেই জন্মান না কেন, রক্তে পাঞ্জাবের মাটি আর শিখের জিন বইছে। পাঞ্জাবিদের ফেভারিট ডিশের মধ্যে কাঁচা মুলো ও গাজর অন্যতম। ছোটোবেলা থেকে অভ্যাস বেচারির। যতই কলকাতার প্রলেপ পড়ুক, জিন আর অভ্যাস কিছুতেই পেছন ছাড়ে না!"

বলতে বলতেই হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল সে। কিছু যেন তার মনে পড়ে গিয়েছে। একমুহূর্তের জন্য ঝকঝক করে উঠল গোল্ডেন ব্রাউন চোখের তারা। বিড়বিড় করে বলল, "তাই তো। মাই গড়....মা-ই গ-ড!"

অর্ণব থমকে যায়, "কী হল?"

অধিরাজ পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয়, "না। তেমন কিছু না। হঠাৎই একটা জিনিস মনে পড়ে গেল। যাক গে, চলো অর্ণব। মিস অরোরার সঙ্গে মিস মুখার্জির আলাপ করিয়ে দিই। তারপর অনেক কাজ বাকি আছে। সময় স্থির হয়ে থাকে না, আমাদেরও স্থির থাকার উপায় নেই।"

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল আহেলির সঙ্গে টুইঙ্কলের কয়েক মিনিটের মধ্যেই দিব্যি সদ্ভাব হয়ে গেল। আহেলি এই তথাকথিত টমবয়টিকে দেখে ভারি মজা পেয়েছে। মিস্ আত্রেয়ী দত্ত তার প্রিয় সখী ও বোনের মতো। তাকে নিয়ে কোনোদিনই সমস্যা ছিল না। কিন্তু কৌশানী বোসকে তার সহ্য হয় না। ক্লিওপেট্রা বা পদ্মিনীমার্কা সুন্দরীটির অ্যাটিটিউড ঠিক পছন্দ নয়। তার ওপরে সে অধিরাজকে দেখলেই যেমন হামলে পড়ে, তাতে আহেলির কিঞ্চিৎ রাগও আছে। কিন্তু টুইঙ্কলকে তার প্রথম দর্শনেই ভারি পছন্দ হল। অধিরাজ মিস্ অরোরাকে বুঝিয়ে বলল যে তাকে কী করতে হবে। সতর্ক করে দিয়ে বলল, "ওঁর পাশ থেকে এক সেকেন্ডের জন্যও নড়বেন না। সিগার খান, কলা-মুলো, যা খুশি খান, কিন্তু ধূমপান থেকে শুরু করে সব কিছু এখানেই করবেন। আমরা আপনার কাঁচা থেকে পাকা, সবরকমের খাবারই এখানে রেখে যাব। আপনার পছন্দের সিগারের কার্টনও এসে যাবে। এখানে মাইক্রোওয়েভও আছে। রান্না খাবারগুলো দরকার পড়লে গরম করে নেবেন। কিন্তু মিস্ মুখার্জিকে একচুলের জন্যও চোখের আড়াল করবেন না।"

"কিন্তু আমার যদি ওয়াশরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়?"

কথাটা আহেলি সকৌতুকেই বলেছিল। কিন্তু মিস্ অরোরা ভয়াবহ সিরিয়াস, "তবে আমিও আপনার পেছন পেছন যাব! আগে দেখে নেব ভেতরে কোনোরকমের গোলমাল আছে কিনা। তারপর আপনি ঢুকলে আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব। দু-মিনিট অন্তর

অন্তর জিজ্ঞাসা করব আপনি ঠিক আছেন কিনা। যদি ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর না পাই, তবে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যাব।"

অর্ণব আর অধিরাজ পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে। সুযোগ পেলেই টুইঙ্কল দরজা ভাঙার তাল করে। এ তো সি.আই.ডি.-র দয়ানন্দ শেঠির ফিমেল ভার্সন। অধিরাজ একটু ভয়ে ভয়েই বলে, "আর যদি বার্নিং শিখ অ্যাটাক করে?"

টুইঙ্কল তেজি স্বরে বলে, "তবে সে ব্যাটার মাথায় এই গোটা ল্যাবটাই ভাঙব আমি। ওর একটা হাড়ও আস্ত রাখব না।"

ফের ভাঙাভাঙি কেস এসে পড়েছে দেখে অর্ণব ফুসফুস করে, "এ তো পুরো বুলডোজার। শেষ পর্যন্ত কমলবনে মত্ত হস্তী না হয়ে যান!"

অধিরাজও চাপা স্বরে বলল, "বিকাশ দুবের মতো আর্চ ক্রিমিনালের ঘাঁটি ভাঙার জন্য বুলডোজারই লাগে অর্ণব। আর বার্নিং শিখ সব কিছু হতে পারে, তবে কিছুতেই 'কমলবন' নয়। সে আস্ত কার্গিল। তার বুকের ওপর উঠে হস্তী লাফালাফি করলে আমি খুশিই হব।"

"কিছু বললেন স্যার?" টুইঙ্কল সরলকণ্ঠে বলল, "এনি অর্ডার?"

"না। তেমন কিছু নয়।" সে শান্তস্বরেই বলল, "আপনি বার্নিং শিখের হাড় ভাঙলে আমার কোনো প্রবলেম নেই। তবে ল্যাবটা দয়া করে ভাঙবেন না। এই ল্যাবের যিনি আসল বস, ডঃ অসীম চ্যাটার্জি যদি এসে দেখেন তাঁর সাধের ল্যাব ভেঙেছে, তাহলে আমাদেরই ভেঙে রেখে দেবেন। উনি মানুষের চেহারায় আস্ত একটা অ্যাটম বম্ব। লোককে মারতে হাত-পা চালান না। জাস্ট চোখ আর কথার রেডিয়েশনের ঝাঁঝেই ভস্ম করে দেবেন। তাই ল্যাবটার যেন ক্ষতি না হয়।"

"ওকে স্যার। গট ইট!"

আর কথা বাড়ায় না অধিরাজ। রসালাপের আপাতত সময় নেই। কোনোমতে ফরেনসিক ল্যাবের বাথরুমেই রক্তাক্ত শার্টটা পালটে নিয়েছে। এখনই আবার পার্ক স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনে দৌড়োতে হবে। ওখানেই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন জগদীপ সিং ভাট্টি। কিছুক্ষণ আগেই পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে অফিসার বিমল রুদ্র ফোন করে জানিয়েছেন, "স্যার, এ মহা ট্যারা পাবলিক। আমরা জাস্ট ওঁকে ভদ্রভাবেই মিন্টোপার্কের অফিস থেকে নিয়ে এসেছি। এখনও পর্যন্ত জেরা তো দূর, আপনার নির্দেশমতো একটাও কড়া কথা বলিনি। এমনকি আদর করে বিরিয়ানি, রায়তা, চিকেন তন্দুর এমনকি লস্যিও খাইয়েছি। কিন্তু এ তো সঙ্গে সাইড ডিশ হিসাবে আমাদের ভেজাফ্রাই করেও খেয়ে ফেলছে! বলছে যে, অনেক নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। কমিশনার সাহেবকে ফোন করার ভয়ও দেখাচ্ছে! চাকরি খেয়ে নেবে!"
"বিরিয়ানি, চিকেন তন্দুর খাওয়ার পরেও উনি 'ভেজা' আর চাকরি খাওয়ার বায়না করছেন, এত ক্ষিদে তো বোধহয় বকরাক্ষসেরও ছিল না।"

অধিরাজ কপালে দুটো আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, "আপাতত ভেজাটিকে বাঁচানোর জন্য হেলমেট আর কানের মধ্যে তুলো ঠুসে রাখুন। বকরাক্ষসকে সোজা করার জন্য ভীমকে নিয়ে আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।"

ওপ্রান্ত থেকে অফিসার রুদ্র'র হাসির আওয়াজ ভেসে এল, "ওকে স্যার।" মিস্ মুখার্জির সঙ্গে মিস অরোরার সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ শেষ হতে-না হতেই প্রণবেশ লাহিড়ীর আর এক লেডি অফিসার মণীষা চক্রবর্তী ল্যাবে এসে রিপোর্ট করল। তার আই ডি, পরিচয় কনফার্ম করে ওখান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ফরেনসিক ল্যাব থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে যেতে যেতেই অর্ণবকে পরবর্তী নির্দেশ দিচ্ছিল অধিরাজ। তার মনে এখন গভীর শঙ্কা। কোমল কৌর যে 'বার্নিং শিখ'-এর উইক পয়েন্ট তা বুঝতে বাকি নেই। দুর্বল জায়গায় আঘাত পড়লে এই ধরনের ক্রিমিনালরা আরও বেশি প্রতিহিংসাপ্রবণ হয়ে ওঠে। কোমলের মৃত্যুর প্রতিশোধ সে নেবেই। অধিরাজ বুঝতে পারছিল, ঘা খাওয়া বিষাক্ত সাপ ফণা উঁচিয়ে বসে আছে। যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে বিষাক্ত ছোবল। বিশেষ করে লেডি অফিসারদের নিরাপত্তা নিয়েই চিন্তিত সে। অর্ণব একটু ভেবে বলল, "স্যার, লেডি অফিসারদের পাঠিয়ে দেওয়াটা

ভুল হল না তো! পুরুষ অফিসারদের অবস্থা বার্নিং শিখ যা করেছিল, তাতে লেডি অফিসারদের উড়িয়ে দেওয়া তো তার বাঁ হাতের খেল!”

এবার তার চিন্তিত মুখেও একটা দুষ্টু হাসি ভেসে ওঠে, “উঁহু অর্ণব। বরং উলটোটাই। লেডি অফিসাররা আছেন বলেই সে এতক্ষণেও দুই পরিবারের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। পুরুষ অফিসাররা থাকলে এর মধ্যেই তারা কচুকাটা হয়ে যেত ও দুটো ফ্যামিলিই মারা পড়ত, বাহাত্তর ঘণ্টাও লাগত না। মেয়েরা আছে বলেই ব্যাটা কিচ্ছু করতে পারছে না।”

অর্ণব বিস্মিত, “মানে?”

“মানে ছেলেরা যা পারে না একজন মেয়ে অনায়াসেই সেটা করতে পারে।” সে বলল, “আমার ইতিহাসে কিঞ্চিৎ ইন্টারেস্ট আছে। সেখান থেকেই একটা ভারি মজাদার তথ্য পেয়েছিলাম। একবার ঔরঙ্গজেব রেগেমেগে কুতুবশাহী সুলতানের দুর্গের ওপরে আক্রমণ করেছিলেন। গোলকোণ্ডা ফোর্ট, নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। কুতুবশাহী সুলতান এইসান বীরপুরুষ যে ঔরঙ্গজেবের ভয়ে স্রেফ পালিয়েই বেঁচেছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। ঐ মুহূর্তে ঔরঙ্গজেবের লেভেলের নিষ্ঠুর, বদমায়েশ, কুচক্রী ও ক্ষমতাশালী লোক প্রায় ছিলই না। তার ওপর একগাদা মোগল সৈন্যের সামনে ফোর্টের কমসংখ্যক সিপাহী কতটুকুই বা প্রতিরোধ করত। ভেবে দেখো, দুর্গে খোদ সুলতান নেই, তিনি পিট-টান দিয়েছেন, যথেষ্ট ফৌজ নেই, বাইরে ঔরঙ্গজেবের মতো রক্তপিপাসু এবং যুদ্ধবাজ একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। এই মুহূর্তে ঠিক কী হতে পারত বলে তোমার মনে হয়?”

“নিশ্চয়ই উনি দুর্গটা জিতে নিয়েছিলেন। এ তো ফাঁকা মাঠে গোল।”

অধিরাজ অর্ণবের কথা শুনে মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, “নাঃ। দুর্গ-জেতা তো দূর, যুদ্ধটাই হয়নি। ঔরঙ্গজেবই উলটে রণে ভঙ্গ দিয়ে দলবল নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। তুমি ফাঁকা মাঠ দেখছ ঠিকই, কিন্তু গোলকিপারটি তখনও গোলপোস্ট পাহারা দিচ্ছিলেন। একা তাঁর বুদ্ধির ঠ্যালাতেই ঔরঙ্গজেব লোক-লস্কর সমেত কুপোকাত এবং গোলকিপারটি কোনো পুরুষ নন, একজন নারী।”

অর্ণব প্রায় হাঁ! ঔরঙ্গজেবের মতো কুচুটে, বদমাশ বুড়োকে কিনা এক মহিলা হারিয়ে দিয়েছিলেন! ঐ হতভাগা মোগল শাসকের জীবনে এমন কোনো মহান পাপ নেই যা তিনি করেননি। শিবাজিই একমাত্র লোক যিনি ঔরঙ্গজেবকে উত্যক্ত করে মেরেছেন। তার ফলও অবশ্য তাঁকে হাতেনাতে ভুগতে হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহার মাশুলও গুণেছেন। শিবাজির সন্তানকে বহুবছর বন্দি করে রেখেছিলেন তিনি। শিবাজির হাত থেকে একাধিক ফোর্টও ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। শিবাজিপুত্র শম্ভাজিকে নারকীয় অত্যাচার করে শেষে মৃত্যু দিয়েছিলেন। অন্যদের কথা তো দূর, নিজের ভাইদের ও খোদ বাবাকেও ছাড়েননি! এরকম একটি নৃশংস, খুনি, শয়তান ও সাম্রাজ্যবাদী লোক কিনা স্রেফ এক নারীর খপ্পরে পড়ে হেরে গিয়েছিলেন!

প্রশ্নটা করতেই অধিরাজ হেসে ফেলল, “এইজন্যই তো বলছিলাম, মেয়েদের ক্ষমতাকে আন্ডার-এস্টিমেট কোর না। গোলকোণ্ডা ফোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে ঔরঙ্গজেব দাঁত কিড়মিড় করে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সুলতানকে কচুকাটা করার জন্য! ওটাই ওঁর ফেভারিট হবি। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল তা একদম আনএক্সপেক্টেড। দুর্গের দরজা খুলে এক সুন্দরী মহিলা বেরিয়ে এলেন। তিনি সুলতানের মা রাজমাতা হায়াত বক্সী বেগম ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন একপাল সৈন্য নিয়ে মা টা বাগিয়ে সুলতান তেড়ে আসবেন। তাঁর বদলে কিনা এক সুন্দরী মহিলা! এরকম ঘটনা ঘটতে পারে তা ভদ্রলোক অতি বড়ো দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। সামনে ভীমভবাণী পুরুষ যোদ্ধা থাকলে তরোয়াল বাগিয়ে মারপিট করা যায়, কিন্তু মহিলার সঙ্গে কী যুদ্ধ করবেন! আমার ধারণা সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে হায়াত বক্সী বেগমকে দেখে জাঁহাপনা বোধহয় ঘোড়া থেকে উলটেই পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অনেক দোষ ছিল। ভ্রাতৃহত্যার পাপ করেছিলেন, বাবাকে বন্দি করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের জন্য অনেক রাজ্য ছারখার

করেছেন, হাতে অনেক মাথা কেটেছেন, ছলে-বলে-কৌশলে সবকিছু আদায় করেছেন, হিন্দুদের ওপর অত্যাচারও কম করেননি। কিন্তু...!” অধিরাজ একটু থেমে বলল, “তাঁর চরিত্রে অনেক দোষের মধ্যেও একটি গুণ ছিল। তিনি একজন সাচ্চা ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মোগল সম্রাটদের মধ্যে শুধুমাত্র ঔরঙ্গজেবই এমন একজন লোক, যিনি দুশ্চরিত্র ছিলেন না বা মেয়েদের নিয়ে বিলাস-ব্যসনে ফূর্তি করে টাকা ওড়ানো পছন্দ করতেন না। নিজের জামা নিজেই সেলাই করতেন, বাদশাহী খাবারে বিশেষ রুচি ছিল না, নিরামিষাশী ছিলেন, মদ্যপানও করতেন না। সবচেয়ে বড়ো কথা, নারীদের সম্মান দিতে জানতেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো সমালোচক ছিলেন ওঁরই বড়ো বোন জাহানারা। কিন্তু আলমগীর তাঁর গালমন্দ, শাপ-শাপান্ত চুপচাপ সহ্য করতেন, এমনকি বাবার অবর্তমানে বিদ্রোহী দিদিটির যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য মোটা টাকার পেনশনের বন্দোবস্তও করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম নারীদের সঙ্গে মারপিট করতে শেখায় না। তাই প্রবল ধর্মসঙ্কটে পড়লেন তিনি। তরোয়াল টরোয়াল মাথায় রেখে একেবারে লক্ষ্মী ছেলের মতো সুড়সুড় করে হায়াত বক্সী বেগমের মধুর আহ্বানে আতিথ্য স্বীকার করলেন। খেলেন-দেলেন-ঘুমোলেন। তারপর কিছু উপঢৌকন নিয়ে শেষমেষ সন্ধি করে ফের দিল্লির পথ ধরলেন। যুদ্ধ তাঁর মাথায় উঠল। যাওয়ার আগে স্বীকার করে গেলেন, ‘এমন মহিলা আমি সারাজীবনে দেখিনি।' সাম্রাজ্যবাদী খুনি লোকটা স্রেফ এক নারীর সামনে পড়ে হেরে গেল! আর ঠিক এটাই বার্নিং শিখের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। সে আন্ডারটেকার, খলি-রকদের সঙ্গে হাতাহাতি করার জন্য বসে ছিল, কিন্তু তার জায়গায় এন্ট্রি নিলেন ছোটোখাটো চেহারার দুষ্টুমিষ্টি আলিয়া ভাট আর সুন্দরী দীপিকা পাড়ুকোন! এইটাই তার বুদ্ধি গুলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কী করবে সেই কনফিউশনেই ও কনফ্যুসিয়াস হয়ে গিয়েছে। তার ওপর সাচ্চা শিখ হওয়ার দরুণ মেয়েদের গায়ে হাতও দিতে পারবে না! যে পরিবারগুলোকে মেরেছে, সেখানে মহিলারাও ছিলেন ঠিকই। ও পাপটা সে বাধ্য হয়েই করেছে। মুশকিল হল ফসজিন বা মাস্টার্ড গ্যাস তো জেন্ডার বুঝে আক্রমণ করবে না! অগত্যা নারীরাও মারা গিয়েছেন, কিন্তু লোকটি তাদের মৃতদেহের সঙ্গেও কোনোরকম অসম্মান করেনি। ও ছেলেদের ধরে মারবে, অথচ মেয়েদের স্পর্শ করতে গেলেও পঞ্চাশবার ভাববে। এই আনপ্রেডিক্টেবিলিটি আর ধর্মসঙ্কটের জ্বালাতেই ও তিনদিনের মধ্যে অলমোস্ট দেড়দিন খরচ করে ফেলেছে। আর লেডি অফিসারদেরও কম ভেবো না। তাঁরাও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। ইনফ্যাক্ট তাঁরা আছেন বলেই ওই দুটো পরিবার এখনও টিকে আছে। মেয়েরা শক্তির প্রতীক অর্ণব। যাঁকে ঘিরে এত কাণ্ড, ১৯৮৪-এর রায়ট থেকে শুরু করে অধুনা বার্নিং শিখের তাণ্ডব, সেই ইন্দিরা গান্ধীও একজন নারীই ছিলেন, আয়রন-লেডি।”

“তাহলে তো চিন্তার কারণই নেই স্যার।” অর্ণব বলে, “মিস্ বোস আর মিস্ দত্তকেও ও আর যাই করুক, মারবে না।”

“চিন্তার কারণ আছে।” অধিরাজের মুখে ফের দুশ্চিন্তার মেঘ, “হাত দিয়ে মারবে না বা স্পর্শ করবে না। কিন্তু অন্য কোনো কৌশলে মারতে পারে বা সরিয়ে দিতে পারে। মেয়েদের পাঠানোর পেছনে আমার একটাই এজেন্ডা ছিল। যা ও একেবারেই আশা করেনি, তাই দিয়েই ওকে একটু হতবুদ্ধি করে দেওয়া। এবং তাতে আমি কিছুটা সফলও। দেড়দিন অবধি ওকে আটকে রেখেছি। কিন্তু কোমল কৌরের মৃত্যুর পর ওকে থামানো অসম্ভব। আজ কিছু ঘটবেই। এবং সেটা রাতেই। সেইজন্যই যা যা বললাম সেগুলো করে ফেলো, আর দুই লেডি অফিসারের খবর নিয়ে নাও। মিস্ বোসকে জিজ্ঞাসা কোরো মিসেস চৌধুরীর ফিজিওথেরাপিস্ট মিঃ রাজীব চন্দ আজ ঠিক ক-টায় উপস্থিত হবেন।”

“ওকে স্যার।”

অর্ণব বিনাবাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করল। এমনিতেই গোটা কলকাতা পুলিশ হাই অ্যালার্টে আছে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তারা কাজে নেমে পড়ল। এডিজি শিশির সেন ও খোদ কলকাতা পুলিশের কমিশনার সাহেব যুগ্মভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রেস কনফারেন্সের বন্দোবস্তও করে ফেললেন। ওঁরাই দায়িত্ব নিয়ে বেঙ্গল কেমিস্টস অ্যান্ড ড্রাগিস্টস

অ্যাসোসিয়েশন আর দ্য ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিকল অ্যাসোসিয়েশনকেও অর্ডার দিলেন। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ফার্মাসিতে মেইল ও ফ্যাক্স যেতে শুরু করল। সাদা পোষাকের পুলিশ যত ইললিগ্যাল ড্রাগ বিক্রেতা ও ড্রাগ পেডলারকে চটপট ধরে ধরে হাজতে ঢোকাচ্ছে। কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত অন্য কোনো কেসে পুলিশ এত দ্রুত অ্যাকশন নিয়েছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু 'বার্নিং শিখ'-এর কেসে তারা বিন্দুমাত্রও সময়ের অপচয় করছে না।

যতক্ষণে ওরা তিনজন পার্কস্ট্রিট থানায় গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণে মোটামুটি সব কাজই সেরে ফেলেছে অর্ণব। দুই লেডি অফিসারের খোঁজখবরও নেওয়া হয়ে গিয়েছে। দু-জনেই ঠিক আছে। তেমন বিপদের কোনো সঙ্কেতও নেই। মিস্ বোস জানিয়েছে যে মিঃ চন্দ আজ সন্ধে সাড়ে ছ-টায় আসবেন।

"সাড়ে ছ-টা!" অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়, "ফাইন।"

ওদের মধ্যে আর বিশেষ কোনো কথাবার্তার আদান প্রদান হয়নি। অধিরাজের চিন্তান্বিত গম্ভীর মুখই বলে দিচ্ছে যে সে রীতিমতো মানসিক আর স্নায়বিক চাপে আছে। একটু একটু করে যত সময় এগোচ্ছে, ততই তার টেনশন বাড়ছে। আজ ওরা অধিরাজের ফোর-হুইলারেই বেরিয়েছে। কোমল কৌরের মৃত্যুর পর বার্নিং শিখের হাতে আপাতত আর বম্ব নেই, এটাই ওদের সাময়িক নিশ্চিন্তির কারণ। তাও বেরোনোর আগে দু-জনেই ভালো করে চেক করে নিয়েছে সমস্ত কলকব্জা। অর্ণব ড্রাইভ করতে করতেই লক্ষ্য করল সে যেন আরও কিছু অজানা চিন্তায় ডুবে আছে। সেই অর্ধনিমীলিত চোখের ফাঁক দিয়ে প্রায় গভীরে ডুবে থাকা দুটো সোনালি-বাদামি চোখ! ঈষৎ স্ফুরিত ওষ্ঠাধর। দেখলেই বোঝা যায়, এই মুহূর্তে আশেপাশে কী ঘটছে সে বিষয়ে একেবারেই সচেতন নয়। মাথার চুল সামান্য অবিন্যস্ত। ফুরফুরে হাওয়া চুল এলোমেলো করে দিয়ে খেলা করছে। বিকেলের সূর্যের নরম রশ্মি মুখের একদিকে এসে অদ্ভুত একটা আলোছায়া মাখা পরিবেশ তৈরি করছে! অর্ণবের উত্তেজনা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। স্যার কি তবে কোনো লিড খুঁজে পেলেন? ঘটনা পরম্পরা এতই দ্রুত যে তার নিজের মাথাতেই বিশেষ কিছু ঢুকছে না। অথচ অধিরাজের এই অর্ধ-অচেতন রূপ তার অত্যন্ত পরিচিত! সে একটা হিসাব খুব নিখুঁতভাবে মেলাচ্ছে। একটা লম্বা ও কঠিন অঙ্ক ধাপে ধাপে কষে যাচ্ছে।

"খচাস।"

আচমকা একটা শাটার টেপার আওয়াজে হকচকিয়ে গেল অর্ণব। পেছনে ফিরে দেখল, অধিরাজের এই সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থার একটা ফটো তুলে নিয়েছে টুইঙ্কল! সে জানে, এই অবস্থায় কোনোভাবেই স্যারকে ডিস্টার্ব করা উচিত নয়। অথচ এই মহিলা কি নিজের বসকে তাজমহল পেয়েছে, যে খট খট করে শাটার টিপছে! অর্ণব রেগে উঠতে গিয়েও থেমে গেল। কানের কাছে চেঁচালে অধিরাজের ধ্যানভঙ্গ হবে যা কোনোমতেই অভিপ্রেত নয়। অগত্যা সে চাপা অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "এটা কী হল।"

"যা দেখছেন তাই হল।" টুইঙ্কল নিজের শিল্পকীর্তি দেখে ভারি খুশি হয়ে বলল, "বাঃ। ছবিটা পুরো ফাটাফাটি উঠেছে।" বলতে বলতেই সে নিজের ফোনটা অর্ণবের নাকের সামনে ধরে বলল, "দেখুন। ইনি তো বলিউড-হলিউডের সমস্ত হিরোকে এক থাপ্পড় মেরে বসিয়ে দেবেন।"

অর্ণব ড্রাইভ করতে করতেই একঝলক অধিরাজের ক্লোজ-আপ ছবিটা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল। স্যারকে বহুবার সে এই অবস্থায় দেখেছে। কিন্তু কোনোদিন লক্ষ্য করেনি এই আত্মমগ্ন অবস্থাতেও লোকটাকে কী অপ্রতিরোধ্য সুন্দর লাগে! মুখের ওপর সোনালি রোদের আলোছায়া লুকোচুরি খেলছে, অর্ধনিমীলিত রহস্যময় দৃষ্টি, চোখের তারায় নরম রোদ পড়ে সোনালি আভা ছড়িয়ে দিয়েছে, সারা মুখে ধ্যানস্থ মগ্নতা ছড়িয়ে, নিখুঁত 'জ' লাইন, থুৎনিতে অসম্ভব আকর্ষণীয় একটা কাটা দাগ, সামান্য দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠাধর ও উস্কোখুশকো চুলে একদম স্বর্গীয় সৌন্দর্য। এই মুহূর্তটাকে ধরে রাখার কথা কখনও তার মনে হয়নি। অথচ

এই মহিলা এসেই খটাৎ করে ছবি তুলে নিল।

"ইটস কল্ড ডিভাইন বিউটি।" টুইঙ্কল নীচু স্বরেই বলে, "একমাত্র ওয়াহেগুরুর চোখদুটোই এমন অপূর্ব সুন্দর। আমি ছোটোবেলায় বাবাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম, ওয়াহেগুরুর মতো অমন অপূর্ব চোখ কি কোনো মানুষের হয়? বাবা বলতেন, হয়। তবে কয়েকশো কোটিতে একটা। আর যার অমন সুন্দর চোখ থাকে সে মানুষটাও তার স্রষ্টার মতোই পবিত্র। সো, আই গট দ্য স্যাক্রেড মোমেন্ট! বিউটিফুল!"

এরকম উত্তরে অর্ণব রাগবে না খুশি হবে তা বুঝে পেল না। সে শুধু বলল, "নিজের বসকে বিউটিফুল বলে মনে হচ্ছে আপনার?"

টুইঙ্কল সরলভাবে উত্তর দিল, "ও ত্তেরি। বিউটিফুলকে বিউটিফুল মনে হবে না তো কী মনে হবে? আমি সামনে গোলাপফুল দেখলে গোলাপই তো বলব, থোড়াই ক্যাকটাস বলতে যাব!"

অধিরাজ নাকি গোলাপফুল। তবে ক্যাকটাসটা কে? অর্ণব? মনে মনে সে খেপে চিড়বিড় করতে শুরু করেছে। পারলে সত্যিই ক্যাকটাসের মতো কাঁটা ফুলিয়ে তাকে তাড়া করত। এই মহিলাকে কিছুক্ষণ সহ্য করাই দায়। এখন আরও দেড়দিন একে সয়ে যেতে হবে! উঃ, এ কী জাতীয় টর্চার! পৃথিবী গোল্লায় যাক, তবু মিস্ অরোরাকে কিছুতেই বিশ্বাস করছে না অর্ণব। এ পাবলিক মহা গোলমেলে!

সারাটা রাস্তা নিঃশব্দেই কাটল। ওদের গাড়িটা পার্কস্ট্রিট থানার কাছাকাছি আসতেই সচেতন হয়ে উঠল অধিরাজ। এই প্রথম তার চোখের পলক পড়ল। স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, "এসে গিয়েছি?"

"ইয়েস স্যার।"

তার মুখে একটা তীর্যক হাসি ভেসে ওঠে, "চলো, ভাট্টি সাহেবের ভাঁটার মতো চোখের সঙ্গে মোলাকাত করে আসি।"

ভাঁটার মতোই চোখ বটে! তার চেয়েও ভয়ানক তাঁর বজ্রনিন্দিত কণ্ঠস্বর। থানায় ঢুকতে-না ঢুকতেই শোনা গেল বাজখাঁই গলার ধমক, "আপনারা এভাবে আমার সময় নষ্ট করতে পারেন না। আমার কোম্পানির একটা বড়ো মিটিং ছিল। কোটি টাকার ডিল হওয়ার কথা। ইকোনমিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা সেটাও অ্যাটেন্ড করতে দিলেন না। তারপর আমার ডেন্টিস্টের সঙ্গেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। দাঁতের ব্যথায় অলমোস্ট মরে যাচ্ছি! মাড়ি ফুলে ঢোল। কমসে কম তিনমাসের আগে ওঁর অ্যাপয়েন্টমেন্টই পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে তাঁর ডেট পেয়েছিলাম। আপনাদের জন্য সব গেল। এর খেসারত আপনাদের দিতেই হবে।"

জগদীপ সিং ভাট্টিকে দেখে প্রথম দর্শনেই মনে হল, খোদ কিংকং বুঝি পর্দা থেকে নেমে এসে পাগড়ি পরে বসে আছে। দারা সিং-ও বুঝি ওঁকে দেখলে ভির্মি খেতেন। লম্বায় প্রায় অধিরাজেরই সমান। কিন্তু চার-পাঁচটা অধিরাজকে একসঙ্গে জুড়লে হয়তো ভদ্রলোকের বপুর কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যায়। তার ওপর গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে আর পাগড়ির জ্বালায় মুখ প্রায় বোঝাই যায় না। শুধু আগুনে দুটো চোখ দেখেই আন্দাজ করা যায় তিনি প্রবল চটে আছেন। মুখের একদিকে গালটাও বেশ ফুলে আছে। সত্যিই ভদ্রলোক দাঁত ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন।

অফিসার বিমল রুদ্র অধিরাজকে দেখে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন। বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বললেন, "অনেক বজ্জাত, শয়তানকে নিয়ে ডিল করেছি স্যার, কিন্তু এইরকম ট্রিমেন্ডাস গালি কখনও খাইনি। ভাট্টি সাহেব একেবারে হিন্দি, ইংরেজি, পাঞ্জাবি সব ভাষাতেই গালাগালি দিয়ে যাচ্ছেন। তার ওপর ফাউ হিসাবে শাপশাপান্ত। আমাদের সবার বাপ-মা চোদ্দগুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়ছেন!"

"বটে?"

অধিরাজ মৃদু হাসি ছুড়ে দিয়ে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল জগদীপ সিং ভাট্টির সামনে। বিনম্র গলায় বলল, "স্যরি মিঃ ভাট্টি। আমরা আপনার অমূল্য সময় নষ্ট

করছি, তার জন্য আগাম দুঃখিত। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনার বিজনেস এবং দাঁতের সমস্যার চেয়েও অনেক বড়ো সমস্যা আমাদের সামনে আছে। একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসাবে আপনার কো-অপারেশন চাই।"

মিঃ ভাট্টি অধিরাজকে কিছুক্ষণ বড়ো বড়ো চোখ করে দেখলেন। তারপর ফের ধমকে উঠলেন, "এই চিকনাটা আবার কে! কী 'খিচড়ি' পাকাচ্ছেন আপনারা? একবার ঐ অফিসার আসছেন, একবার এই হিরো এসে উপস্থিত। কথা নেই বার্তা নেই, অফিস থেকে তুলে আনলেন। হাতে পাওয়ার আছে বলে যাকে খুশি হ্যারাস করবেন? কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না! হোয়াটস গোইং অন?"

অধিরাজ তাঁর তাচ্ছিল্যের বিন্দুমাত্রও পরোয়া না করে শান্ত স্বরে আবার বলল, "প্লিজ কো-অপারেট।"

"তেরি কো-অপারেশন কি তো অ্যায়সি কি ত্যায়সি!" ভদ্রলোক যথারীতি মুখ খিস্তি শুরু করেছেন, "তেরি মা কি তো...!"

টুইঙ্কল অরোরা পেছনেই দাঁড়িয়েছিল। তার চোখ যেন ধ্বক করে জ্বলে ওঠে। সে এবার অধিরাজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে বলল, "আপনি সি.আই.ডি. হোমিসাইডের আই জি সাহেবের সঙ্গে কথা বলছেন। তমিজ সে বাত কিজিয়ে...।" "আরে আই জি গয়া তেল লেনে...।" তিনি আরও খেপে গিয়েছেন, "ওসব আই জি, ডি আই জি-রা আমার জুতোর তলায় থাকে, বুঝেছিস? একটা ফোন করব, উর্দি খুলে নিয়ে নাঙ্গা করে দেব তোদের। আমার হাত অনেক ওপরে আছে। এস পি, কমিশনার আমার পোষা কুত্তা। আর তুই কোথাকার দু-কড়ির মেয়েছেলে যে আমায় 'তমিজ' শেখাচ্ছিস...।"

আরও কিছু জ্বালাময়ী বাক্যও হয়তো এর পেছন পেছনই আসছিল। কিন্তু তার আগেই প্রবল একটা শব্দ! অর্ণব বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল টুইঙ্কলের ভারি হাত একেবারে বিদ্যুৎবেগে সপাটে গিয়ে পড়েছে ভাট্টিসাহেবের গালে। একেবারে ডাম্বেল ভাঁজা 'ঢাই কিলো' হাতের মোক্ষম দুশো বিরাশি সিক্কার চড়। জগদীপ সিং প্রায় 'আঁক' করে উঠে ঐ বিপুল কলেবরসুদ্ধই হুড়মুড়িয়ে চেয়ার সমেত ধড়াস করে উলটে পড়লেন। অর্ণব তাকিয়ে দেখল, অধিরাজের মুখ গম্ভীর, কিন্তু চোখে আলগা একটা দুষ্টু হাসির আভাস। সে যেন আগে থেকেই জানত এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বুকের ওপর দু-হাত জড়ো করে শুধু ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে ছদ্মবিস্ময়ে বলল, "উপপস।"

"লাতোঁ কে ভূত বাতোঁ সে নেহি মানতে! লঙ্গুর কি দুম! তোর হাত ওপরে তো আমার হাতও তোর গালে!...উঠ...সালে।"

টুইঙ্কল একেবারে চণ্ডীমূর্তি ধরেছে। কলার ধরে টেনে সে ঐ পেল্লায় লাশকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটার পর একটা চড় কষাতে কষাতে বলল, "আমাদের উর্দি খুলে নাঙ্গা করবি তুই অ্যাঁ? আমাদের বসকে জুতোর তলায় রাখবি? পুলিশ তোর পোষা কুত্তা?...আই জি গয়া তেল লেনে! আজ তোর তেল না বের করেছি তো আমিও এক বাপের মেয়ে নই...!"

একটা করে বাক্য, তার সঙ্গে একটা করে পেল্লায় থাপ্পড় ফ্রি! কোনো সন্দেহই নেই এই মেয়েটির বাবা মহাকালীর ভক্ত! স্বয়ং মহাকালীই খুশি হয়ে ডাকিনী-যোগিনীকে কম্বাইন্ড করে ওঁর মেয়ে হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন! ভাট্টিসাহেবের অবস্থা কী হচ্ছে ভগবানই জানেন। কিন্তু অর্ণব কাণ্ড দেখে প্রায় তৃরীয় দশায় পৌঁছে গিয়েছে। কোনোমতে ঢোঁক গিলে বলল, "স্যার, উনি তো ভাট্টিসাহেবের মুখের জিওগ্রাফিই বদলে দিচ্ছেন। আপনি কিছু বলুন।"

অধিরাজ মৃদু স্বরে বলে, "জয় গুরু, এনজয় গুরু। আমি আপাতত শো-টা এনজয় করছি। ভেবে দেখো, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের বল্লম ছিল, অর্জুনের তীর-ধনুক ছিল, নকুল-সহদেবের তরোয়াল আর কুঠারও ছিল। সর্বোপরি কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রও ছিল। কিন্তু দুর্যোধন আর দুঃশাসনের বারোটা বাজাতে ভীমের গদাটাই সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে।"

"উনি ভীম?"

"অফকোর্স। ইউনিসেক্স ভীম বলতে পারো।" অধিরাজের মুখে ফের সেই দুষ্টু হাসি,

"ইন্ডিয়ান পিনাল কোডে এটা লেখা আছে ঠিকই যে পুরুষ পুলিশ মেয়েদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। কিন্তু এটা কোথাও লেখা নেই যে মহিলা পুলিশ কোনো পুরুষকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাতে পারবে না। প্রণবেশ লাহিড়ী মেয়েদের পেটাতে পারবেন না। কিন্তু ইনি পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সবাইকেই পিটিয়ে আমসত্ত্ব করে দিতে পারেন। আই থিঙ্ক শি ইজ কাইন্ড অব কিউট!"

এই শ্রীমতি ভয়ংকরী কিনা কিউট। মার খাচ্ছেন জগদীপ সিং ভাট্টি, আর ঘেমে চলেছে অর্ণব। র‍্যান্ডম থাপ্পড়ের চোটে ভদ্রলোকের একটা দাঁত ছিটকে গিয়ে মেঝেতে পড়ল। সম্ভবত এটাই সেই দাঁত, যার জন্য তিনি ডেন্টিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলেন। অধিরাজ এবার মোলায়েম স্বরে যেমন শিক্ষক দুষ্টু ছাত্রকে সস্নেহে প্রশ্রয়মিশ্রিত বকুনি দেয়, তেমন করেই ডাকল, "মিস্ অরোরা... প্লিজ স্টপ!"

"ইয়েস স্যার।"

টুইঙ্কল.... থাপ্পড় মারা থামিয়ে এবার জগদীপ সিং ভাট্টিকে চেয়ারে ধপাস করে বসিয়ে দিল। অধিরাজ খুব শান্তভাবে শহীদ দাঁতটাকে তুলে নিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে জগদীপের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার প্রপার্টি!"

জগদীপ কী বলবেন বুঝে পাচ্ছেন না। তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। সম্ভবত দাঁতটাই সমূলে উৎখাত হওয়ার কারণে। অধিরাজ তাঁর দিকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে, "ব্যথা দাঁতটাই গেছে তো? না কাঁচা দাঁত গেল? রক্তটা একটু বেরিয়ে যেতে দিন। ওটা ইনফেক্টেড পুঁজ-রক্ত। বেরিয়ে গেলে পেইন কমবে।"

ভদ্রলোক কোনোমতে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ ব্যথা দাঁতটাই গিয়েছে। তিনি জল দিয়ে কুলকুচি করছেন দেখে অধিরাজ অফিসার রুদ্রর দিকে তাকায়, "আইসক্রিমের বন্দোবস্ত আছে? থাকলে কনস্টেবলকে বলুন বেশ বড়োসড় দেখে একটা আইসক্রিম আনতে। ওঁর দাঁতের ব্যথা আর ব্লিডিং এখনই কমে যাবে। একটু তুলো হলেও ভালো হয়।"

মুহূর্তের মধ্যেই এসে গেল আইসক্রিম। ভাট্টিসাহেব লজ্জিত, অপমানিত ও বিষণ্ণ মুখে একটু একটু করে আইসক্রিম মুখে দিচ্ছেন। অধিরাজ কোনো কথা বলছে না। সে অপেক্ষায় আছে আইসক্রিমটার শেষ হওয়ার। অর্ণব আস্তে আস্তে টুইঙ্কলকে বলল, "চড় মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়ার কী দরকার ছিল?"

টুইঙ্কল ফের নিরীহ মুখ করেছে, "আপনি শুধু দাঁত ভেঙে দেওয়াটাই দেখলেন স্যার? ওঁর ডেন্টিস্টের ফি-টা যে বেঁচে গেল সেটা দেখলেন না? জানেন, এরকম বড়োলোকেরা দু-হাজারি, তিন-হাজারি ডাক্তার ছাড়া দেখান না। আজ যে সেই টাকাটা খরচ করার দরকার পড়ল না তাতে ওঁর মুনাফা হল, না লোকসান?"

অর্ণব যুক্তির ধাক্কায় চুপ করে গেল। টুইঙ্কলের সঙ্গে কথা বলার কোনো মানেই হয় না! সে এখনও পর্যন্ত অনেক লেডি অফিসার দেখেছে। কিন্তু এইরকম নমুনা আর দ্বিতীয়টি দেখেনি। দেখার বিশেষ ইচ্ছেও নেই। একটাকেই সামলানো দুষ্কর, দ্বিতীয়তে কাজ নেই!

"দেখুন মিঃ ভাট্টি...!" অধিরাজ খুব শান্ত স্বরেই বলল, "আপনাকে বিরিয়ানি, রায়তা, চিকেন তন্দুর, লস্যি, সব খাওয়ানো হল। তারপরও আপনি কো-অপারেট করলেন না। শেষমেষ থাপ্পড়ও খেলেন। এখন আইসক্রিমও খাচ্ছেন। এতকিছু খাওয়ার পরও যদি আপনি কথা না শোনেন, তবে খাওয়ার লিস্ট আরও বাড়বে। এতক্ষণ মিস্ অরোরার হাত নিতান্তই 'কুচুপুচু' করছিল। অর্থাৎ, যে ট্রেলার দেখেছেন সেটা নেহাতই ওঁর আদর। প্রয়োজন পড়লে গোটা মুভিটাও উনি 'গোলুগোলু করে দেখিয়ে দেবেন! বিলিভ মি, এই লেডি অফিসারটির রাগকে চ্যালেঞ্জ করতে যাওয়াটা একদমই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই এবার কিছু প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?"

আইসক্রিমটা কোনোমতে শেষ করে মিঃ ভাট্টি বললেন, "জল!"

এবার ওঁর দিকে পুরো জলের জগটাই এগিয়ে দিয়েছে অধিরাজ। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "বার্নিং শিখ নামের যে উপদ্রবটি সম্প্রতি কলকাতায় নাচা-কোঁদা করছে, তিনি কি বাই

এনি চান্স আপনার কাছে এসেছিলেন?”

তিনি কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন। কিছুটা তুলো ছিঁড়ে নিয়ে রক্তাক্ত মাড়িতে গুঁজলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, “দেখুন, সে এসেছিল একথা সত্যি। কিন্তু আমি তাকে কোনোরকম সাহায্যই করিনি, এটাও সত্যি।”

“পুলিশকে ইনফর্ম করেননি কেন? এতদিন এই মূল্যবান তথ্যটি চেপে যাওয়ার কারণ কী?”

“আমি সাদামাটা ব্যবসায়ী লোক। পুলিশ, আইন, কোর্টের চক্করে পড়তে চাইনি।” মিঃ ভাট্টি জানালেন, “তাছাড়া কী-ই বা বলতাম? ও লোকটা তো নিজেই আপাদমস্তক 'ইম্পস্টার'। যে রূপে সে আমার কাছে এসেছিল, সেটাই ভীষণ কনফিউজিং! ঐ মুখ আর গেট আপ দেখে আসল লোকটাকে চেনা, স্বয়ং আমি কেন, রবজির পক্ষেও অসম্ভব। ঐ ‘বনাওয়াটি’ মেক-আপ করা মুখ দেখলে ঈশ্বরও কনফিউজ হয়ে যাবেন যে আসল চেহারাটা তিনি ঠিক কী বানিয়েছিলেন। আপনারা বার্নিং শিখকে কী রূপে দেখেছেন জানি না। তবে আমার কাছে যে এসেছিল, সে একটা কুঁজো হয়ে যাওয়া খুনখুনে বুড়ো। সাদা দাড়ি, সাদা গোঁফ। তবে হ্যাঁ, শিখের বেশেই ছিল। মাথায় পেল্লায় একটা পাগড়ি ছিল ঠিকই, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, ঐ পাগড়ির নীচে অরিজিনাল শিখদের পেটেন্ট লম্বা চুল ছিল না।”

“এটা আন্দাজ করলেন কীভাবে?”

এতক্ষণে তিনি অতিকষ্টে মুখ বেঁকিয়ে একটু করুণ হাসলেন, “আমার চোদ্দপুরুষ শিখ। শিখদের পাগড়ি আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। শিখ পুরুষদের মাথায় একঢাল চুল থাকে বলে কখনও তারা উঁচু করে খোঁপা বাঁধে, কখনও বা লম্বা বিনুনি বেঁধে পাকিয়ে নেয়। পাগড়ির মধ্যেই ঐ গোটা খোঁপা বা বিনুনিটা সেট করা থাকে বলে ‘পগ'টা ফুলে ফেঁপে ওঠে। এখানেই অন্যান্য প্রজাতির পাগড়ির সঙ্গে শিখদের পাগড়ির পার্থক্য। কিন্তু ওর পাগড়িটা অতটা ফোলা ছিল না। ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে বলা মুশকিল। তবে নিজেই একজন শিখ হওয়ার দরুণ পাগড়িটা দেখেই বুঝতে পেরেছি ওর তলায় লম্বা চুল নেই। ওর চুল সাধারণ মানুষের মতোই ছোটো করে ছাঁটা।”

“আচ্ছা। সে আপনার কাছে এসেছিল কেন?”

“আমার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য।” জগদীপ মুখ নীচু করে জানান, ‘বিরাদরির’ ‘ওয়াস্তা’ দিয়ে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছিল।”

“নিজের পরিচয় কিছু জানিয়েছে?”

“হ্যাঁ।”

তিনি জানালেন যে বার্নিং শিখ তাঁর কাছে কিছুই গোপন করেনি। যে লোকটাকে মিডিয়া ‘বার্নিং শিখ’ নাম দিয়েছে, তার আসল নাম গুলশন সিং ধিলোঁ। ডাকনাম গুরু। যখন ১৯৮৪ সালে অ্যান্টি-শিখ রায়ট হয়, তখন তার বয়েস মাত্র আটবছর ছিল। দিল্লির মঙ্গলপুরীর শিখ কলোনিতে সে সপরিবারে থাকত। কিন্তু দাঙ্গার ফলে সবাই মারা গিয়েছিল। সে নিজেও প্রায় মরতেই বসেছিল। আততায়ীরা তাকে মৃত ভেবে ফেলে রেখে চলে গেলেও, তখনও তার দেহে প্রাণ ছিল। ঐ মাত্র আট বছরের শিশু ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এতটাই অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছিল যে দেহের মারাত্মক যন্ত্রণাও সে টের পায়নি। আততায়ীরা তার ডান হাতের ওপর লাফালাফি করে হাতখানা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু তবু ঐ অসহায় শিশু থামেনি। সে কোনোমতে বাঁ হাতের ওপর ভর দিয়ে, বাঁ হাত দিয়েই রক্তাপ্লুত ক্ষতস্থান চেপে ধরে দৌড়োতে দৌড়োতে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছতে পেরেছিল। ডান হাতের হাড় এতটাই খারাপভাবে ভেঙেছিল যে ঐ হাতটা সারতে সারতে কয়েকবছর লেগে গিয়েছিল। অন্য কেউ হলে ভেঙে পড়ত। কান্নাকাটি করত। কিন্তু গুলশন সিং নিজের জেদে বাঁ হাত দিয়েই সমস্ত কাজ করতে শুরু করল। প্রচণ্ড মেন্টাল স্ট্রেংথ, ট্রেনিং ও চেষ্টার ফলে তার বাঁ হাতও ডানহাতের সমান শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এখন সে দুই হাতই সমানভাবে চালাতে পারে।

“আপনিও তো শিখ! আপনার পরিবারও নিশ্চয়ই সেই দাঙ্গার ফল ভুগেছে বা আপনিও

দেখেছেন। তা সত্ত্বেও নিজের ধর্মভাইকে সাহায্য না করার কারণ?”

“দেখুন অফিসার।” তিনি বললেন, “এ কথা সত্যি যে ঐ সময়টায় শিখদের ওপর অত্যন্ত অন্যায় অত্যাচার হয়েছিল। কিন্তু তখন আমিও নেহাত ছোটো। টেনেটুনে দশ কি বারো বছর বয়েস। তাছাড়া আমার পরিবারের ওপর দাঙ্গার ভয়াবহ আঁচও পড়েনি। আমার বাবার কাঠের ফার্নিচারের বড়ো বিজনেস ছিল। ওঁর দুই পার্টনার অর্জুন দেশমুখ ও সাকেত হোসেন আমাদের দিল্লিবাসী গোটা পরিবারকে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল। এক তারিখ সকাল থেকে ছ-তারিখ দুপুর অবধি আমরা ওঁদের বাড়িতেই ছিলাম। অর্জুন আর সাকেত কাউকেই জানতে দেয়নি যে ওদের বাড়িতে কোনো শিখ পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। তিন তারিখ আর্মি নামার পর আরও তিনদিন ওরা আমাদের রেখেছিল। তবে বাবা শুনেছিলেন, কলকাতা অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক নিরাপদ। তাই ছ-তারিখ রাতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে ওঁরা সবাই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। অর্জুন আর সাকেতের কৃপায় আমার গোটা ফ্যামিলির ‘বালও বাঁকা' করতে পারেনি কেউ। তাই আমার সঙ্গে তেমন কোনো ট্র্যাজেডি হয়নি। রবজির কৃপায় মা-বাবা, দাদা-দিদি, কাকু-জ্যেঠুসমেত কাজিন ব্রাদার, সিস্টাররা এখনও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছেন। তবে খামোখা আমি চুরাশির দাঙ্গার প্রতিশোধ নিতে যাব কেন! গুল্লুর ট্র্যাজেডির সঙ্গে আমি নিজেকে কানেক্ট করতেই পারিনি। তার ওপর আমি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বিনা কারণে নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে রাজি নই। গুল্লুর ইস্যু গুল্লু বুঝুক, তাতে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।”

“লোকটা শিখই তো? ওর মাথায় লম্বা চুল ছিল না বলছেন। শিওর হলেন কী করে যে ও শিখ?”

“ওর কথাতেই বুঝেছি। অন্য ধর্মের লোকেরা ‘গুরুবাণী” কাকে বলে, খায় না মাথায় মাখে তা জানে না। আমার বসার ঘরে একটা স্বর্ণমন্দিরের ছবির নীচে গুরুমুখী ভাষায় কিছু লেখা ছিল। ও দিব্যি সেগুলো পড়ছিল। কথাই শুরু করেছিল, “ওয়াহেগুরু জি কা খালসা, ওয়াহেগুরু জি কি ফতেহ' বলে। নিঃসন্দেহে লোকটা শিখই।”

খালিস্তানি সমর্থক? কনভার্সেশনে কী মনে হল আপনার?”

“এটাই খুব আশ্চর্যের ব্যাপার অফিসার।” জগদীপের চোখে অগাধ বিস্ময়, “শুনেছি ঐ দাঙ্গার পর অনেক শিখই ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে মনে করছিল না। ভারত সরকারের ওপর ঘৃণায়, রাগে অনেকেই খালিস্তানি উগ্রবাদীদের দলে নাম লিখিয়েছিল। গুরুও যদি তাই করত, তবে অবাক হতাম না। কিন্তু দেখলাম, ও খালিস্তানি জঙ্গীদের ওপর ‘আগ-ববুলা’ হয়ে আছে! আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ও খালিস্তানি কিনা। তাতে একেবারে খেপে গিয়ে বলল, ‘ঐ হারামজাদা ভিন্দ্রানয়ালে, কেহর সিং ও শুয়োরের বাচ্চা বেয়ন্ত সিংই হল যত নষ্টের গোড়া! এসব কিছুই হত না যদি না ঐ কুয়ো ভিন্দ্রানয়ালে খালিস্তানের দাবি করে হিন্দুদের কেটে ফালাফালা করত। যে লোক নিজেই স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে গোলাগুলি ঢোকায়, অকাল তখতের ওপর কব্জা করে, স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র সিঁড়ির ওপরই মানুষের লাশ ফেলে দেয়, সে হারামি কোথাকার সন্ত, আর তার শিখজাতির ওপর কী-ই বা শ্রদ্ধা! সে শালা নিজের স্বার্থে বকধার্মিক হয়েছে, ওর আসল লক্ষ্য ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতা। না ইন্দিরা মা ব্লু-স্টার অপারেশন করতেন, না বেইমান বেয়ন্ত সিং ইন্দিরা মা-কে উড়িয়ে দিত। শিখরা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়েছে! নয়তো 'আখরি দম তক' ইন্দিরা মা বিশ্বাস করেছিলেন যে বেয়ন্ত সিং তাঁর চরম ‘ওয়াফাদার।' শিখদের বীরত্ব ও ইমানদারি তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। ঐ শিখ জাতির কলঙ্ক ‘নমকহারাম 'টার জন্যই আমাদের এই দুর্দশা! আমরা শিখরা যুগ যুগ ধরে এই মাটিকে রক্ষা করে এসেছি যার নাম ‘হিন্দুস্তান।' সেই মাটিটা যদি বা বিদেশিদের হাত থেকে রক্ষা পেল, তবু এখন নিজেদের লোকেরাই এটার টুকরো টুকরো করছে। মুসলমানরা এটাকে ভেঙে পাকিস্তান করে ফেলল, গোর্খারা গোর্খাল্যান্ড বানানোর চেষ্টা করছে, শিখদের খালিস্তান চাই, এরপর বৌদ্ধ, জৈন, ক্রিশ্চানরাও নিজেদের আলাদা দেশের দাবিতে নেমে হিন্দুস্তানকেই লাটে তুলে দেবে। এ কি মাজাকি চলছে?' একদম কোট-আনকোট আপনাকে

বললাম। আমার মনে হয় না কোনো খালিস্তানি সমর্থক এ কথা বলবে। ওদের কাছে ভিন্দ্রানয়ালে 'সন্ত', বেয়ন্ত সিং অমর শহীদ। আর যা-ই হোক, এই কথাগুলো কোনো উগ্রবাদীর নয়।"

"হুঁ।" অধিরাজের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, "ও কি ইন্দিরা গান্ধীকে 'ইন্দিরা মা'-ই বলছিল?"

"হ্যাঁ অফিসার। ও যতবার ইন্দিরাজির নাম নিয়েছে, ততবারই 'ইন্দিরা মা' বলেছে। এমনকি ও তো এটাও বলেছে যে অতগুলো গুলি খাওয়ার পরও ইন্দিরা মা যদি কোনোক্রমে বেঁচে যেতেন, তবে শিখদের এমন দুর্দশা কখনোই হতে দিতেন না। হ্যাঁ, বেয়ন্ত সিং মরত, হয়তো সতবন্ত সিং আর কেহর সিং-এরও ফাঁসিই হত। ওদের মরাই উচিত। কিন্তু ঐ তিনটে 'বেইমানের' জন্য পুরো কৌমটাকে উনি কখনোই 'গদ্দার' বলতেন না।"

"ইন্টারেস্টিং... ভেরি ইন্টারেস্টিং...!" অধিরাজ বিড়বিড় করে আপনমনেই বলে, "মিলে যাচ্ছে। পুরো মিলে যাচ্ছে। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই...!"

অর্ণব এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার প্রশ্ন করল, "আর কিছু বলেছে ও? আর কোনোরকম তথ্য?"

"তেমন কিছু নয়। কিন্তু লোকটা ভারি অদ্ভুত।" জগদীপ জানালেন, "ও খালিস্তানি নয়, উগ্রবাদীও নয়, তা সত্ত্বেও এরকম নিষ্ঠুর হত্যা করে বেড়াচ্ছে। আমি বলেছিলাম, যে 'কখনো-না কখনো পুলিশ তোমায় ঠিকই ধরবে। আর ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমাকে। সে কথা ভেবে দেখেছ কি?' গুরু বলল, 'প্রা-জি, কোই না। আমি সবার কবর খোঁড়ার আগে নিজের কবরটাও খুঁড়ে এসেছি। "সর পে কফন" বেঁধেই এ কাজে নেমেছি। জানি, এ পাপের কোনো ক্ষমা নেই। আমার ঠাঁই নরকেও হবে না। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। কারণ বেশিরভাগ খুনিই মনে করে সে যা করছে, তা একদম ঠিক করছে। কিন্তু গুল্লু ভালোভাবেই জানে যে সে যেটা করছে সেটা ক্ষমার অযোগ্য পাপ। আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'যখন জানোই যে অন্যায় করছ, তখন এসব করার মানে কী?' ও শুধু একটা কথাই বলল। বলল যে, 'অনেক বছর ধরেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছি প্রা-জি। আমি নিজে নিজে রাক্ষস হইনি। কিন্তু এই 'অন্ধা-কানুন' আমার সমস্ত জ্বালা সহ্যের সীমার বাইরে নিয়ে গিয়েছে। আমি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে গিয়েছি। যারা এই ফ্ল্যাঙ্কেনস্টাইনকে তৈরি করেছে, তাদের তো ভুগতেই হবে। আমার সঙ্গে ওদেরও জ্বলতে হবে। আর এ রাক্ষসকে থামাবার সাধ্য আমার নিজেরও নেই। "

"কিউরি-অ—সার অ্যান্ড কিউরি-অ-সার।" তার চোখে যেন বিদ্যুৎ জ্বলছে, "অদ্ভুত মনস্তত্ব। একই সঙ্গে দুটো সত্ত্বা কিন্তু স্প্লিট পার্সোনালিটি নয়। ও জানে যে অন্যায় করছে, পাপবোধ আছে, অনুতাপও আছে। তবু থামছে না। ওর নিজের কথা অনুযায়ী, নিজেই নিজেকে থামাতে পারছে না! স্ট্রেঞ্জ!" বলতে বলতেই সে জগদীপের দিকে তাকায়, "যখন গুল্লু ইমোশনাল কথা বলছিল, বা অনুতাপের কথা জানাচ্ছিল, তখন ওর মুখের এক্সপ্রেশনটা লক্ষ্য করেছিলেন? কীভাবে কথাগুলো বলছিল? দুঃখে, বিষণ্নতায় কিংবা একটু কাঁপা স্বরে?"

"না।" জগদীপ বললেন, "হি ওয়াজ টোট্যালি এক্সপ্রেশনলেস! একবারের জন্যও চোখের পলক পড়েনি, চোখে জল আসেনি কিংবা গলাও কাঁপেনি। আমার তো মনে হয়, ওর কোনো এক্সপ্রেশনই নেই।"

"সম্ভবত আপনার আন্দাজই সঠিক।" সে একটু ভেবে বলে, "লোকটা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল কী করে? ফোন করেছিল? না নিজেই এসেছিল?"

"ফোন করেছিল প্রথমে। বলেছিল, ওর নাম গুলশন সিং ধিলোঁ। খুব অর্থকষ্টে আছে। আমি যদি ওকে ছোটোখাট কোনো কাজ দিতে পারি। আমিও ভাবলাম বিরাদরির লোক যখন তখন হেল্প তো করতেই হয়। তাই ওকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বাড়িতেই ডেকে নিয়েছিলাম।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, "তখন কি জানতাম একটা মার্ডারারকে 'নেওতা' দিচ্ছি!"

"নম্বরটা আছে আপনার কাছে?"

"হাঞ্জি!"

"প্লিজ আমাদের নম্বরটা দিয়ে দিন।"

বাক্যটা বলে সে উঠে দাঁড়ায়, "থ্যাংকস ফর দ্য কো-অপারেশন মিঃ ভাট্টি। আপনি যদি এখনও ডেন্টিস্টকে দেখাতে চান, তবে ডক্টরের নাম আর নম্বরটা দিতে পারেন। উনি জেনারেল পেশেন্টকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দিলেও পুলিশের হুড়ো খেলে আবার নতুন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিশ্চয়ই দেবেন। আর হ্যাঁ, আগামী দু-রাতের মধ্যে কলকাতা ছাড়ার চেষ্টা করবেন না। যদি গুলশন সিং আবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের খবর দেবেন।"

"ওকে। থ্যাংকস।"

জগদীপ বোধহয় ভাবেনইনি যে এত সহজে নিস্তার পাবেন। তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস টেনে ডাক্তারের নাম ধাম, গুল্লুর নম্বর, নিজের নম্বর-সব দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক দৃষ্টিপথের বাইরে যেতেই অধিরাজ নীচুস্বরে অফিসার রুদ্রকে বলল, "ওঁর পেছনে দু-জন সাদা পোষাকের পুলিশ লাগিয়ে দিন। আগামী দেড়দিনে মিঃ ভাট্টি কোথায় যাচ্ছেন, কী খাচ্ছেন, কখন ঘুমাচ্ছেন, কার সঙ্গে মিট করছেনসব খবর আমার চাই।"

"শিওর।"

অফিসার রুদ্র ত্রস্তব্যস্ত হয়ে জগদীপকে স্টক করার বন্দোবস্ত করতে গেলেন। অধিরাজ অন্যমনস্কভাবে স্খলিত পায়ে চলতে-চলতে থানার বাইরে এল। মোবাইলে কার নম্বর যেন টুকটুক করে ডায়াল করছে। বেশ কিছুক্ষণ ও প্রান্তে রিঙের একঘেয়ে শব্দ। তারপরই জাগ্রত হল আর একটি কণ্ঠস্বর, "ইয়েস স্যার।"

"শ্রীযুক্ত সাইবার বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিত বাবু মহারাজ।" অধিরাজ অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল, "দুটি কাজে আপনার হেল্প চাই।"

বিশ্বজিত হাসল, "তাই ভাবছি এতদিনেও আপনি একবারও হতভাগ্যকে স্মরণ করছেন না কেন! বলুন কী খিদমত করতে পারি?"

"দুটো নম্বর পাঠাচ্ছি। একটা জনৈক গুলশন সিং ধিলোঁর নম্বর। অন্যটি জগদীপ সিং ভাট্টির। দুটো মোবাইলের অন্তত একমাসের সি ডি আর, আর লোকেশন বের করে ফেলুন। আপনি তো পয়লা নম্বরের হ্যাকিং এক্সপার্টও বটে। সেই বিদ্যে মনে আছে? না বাল্মীকি হয়ে দস্যু রত্নাকরকে ভুলে মেরে দিয়েছেন?"

বিশ্বজিত হেসে ফেলল, "হ্যাকারদের গজনি ট্রিটমেন্ট দিলেও তারা নিজেদের নাম, ধাম, সব ভুলতে পারে, কিন্তু হ্যাকিং-এর শিল্পটি ভুলবে না স্যার। আনএথিক্যাল হ্যাকিং?"

"হ্যাকিং এথিক্যাল কবে ছিল? কিন্তু করতে হয়, নয়তো পিছিয়ে পড়তে হয়।" সে এবার সিরিয়াস, "দুটি মোবাইলের মধ্যেই ঢুকে পড়ুন। গুলশন সিং ধিলোঁর মোবাইলটি সম্ভবত পাওয়া যাবে না। যদি কপালগুণে পাওয়া যায় তো ভালো। না পেলে আরও ভালো। কিন্তু জগদীপ সিং ভাট্টির মোবাইলে অবশ্যই ঢুকবেন। তিনি কী করছেন, ফোনের ইন্টারনেট থেকে সানি লিওনি বা উর্ফি জাভেদকে দেখছেন কিনা, কিংবা তাঁর ফোনের ক্যামেরাটিকেও যদি হাত করতে পারেন, তাহলে তো সবচেয়ে ভালো। পারবেন?"

"ওয়েল!" বিশ্বজিতের হাসির শব্দ ভেসে আসে, "কাজটা মোটেই খুব সহজ নয়। ইনফ্যাক্ট কঠিনই। কিন্তু আপনি আমায় দিয়ে পাপকাজ না করিয়ে ছাড়বেন না। নম্বর দুটো দিন। আমি দেখছি কী করা যায়।"

"গ্রেট। হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি।"

"ওকে।"

বিশ্বজিতকে নম্বর দুটো হোয়াটসঅ্যাপ করে সে চিন্তিত মুখে বাইরে এসে দাঁড়ায়। তার পেছন পেছন অর্ণব এবং টুইঙ্কলও। অর্ণব এতক্ষণ যা শুনছিল তার মধ্যে একটা তথ্যই তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। যতবার সে নামটা শুনেছে, ততবার সন্দেহের বিষাক্ত ছোবল এসে পড়েছে তার মনে। এতক্ষণ বলার সুযোগ পায়নি। এইবার আস্তে আস্তে বলল, "স্যার, গুলশন সিং আর গুলাব সিং, দুটো নামের মধ্যে অদ্ভুত মিল। এমনকি দু-জনেরই

ডাকনাম 'গুল্লু'। এটা কি নেহাতই কো-ইনসিডেন্স?"

অধিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, "শুধু তাই নয়, চুরাশি সালে গুলশন সিং এর বয়েস যদি আট বছর হয়ে থাকে তবে এখন তার এগজ্যাক্ট বয়েস ছেচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশের কাছাকাছি। সে আমাদের গুলাব সিং-এরই সমবয়েসি। খবরিশ্রেষ্ঠ-র বয়েসও পঁয়তাল্লিশ থেকে আটচল্লিশের মধ্যে। দু-জনেই একই এজ গ্রুপের।"

"তাহলে?"

অর্ণবের কণ্ঠে গভীর আতঙ্ক। খাল কাটারও দরকার নেই, কুমীর কি নাকের ডগাতেই বসে লেজ নাড়াচ্ছে?

"গুলাব, গুলশন, গুলফাম, গুলমোহর, গুলাল, গুলশনবীর, সবই শিখদের মধ্যে খুব কমন নাম। আর মজার কথা, খুঁজলে দেখা যাবে যে এদের সবার ডাকনামই 'গুল্লু।' এটা খুব জোরদার কোনো পয়েন্ট নয়। ধোপে টিকবে না।"

"তাহলে কি বার্নিং শিখ নিজের নাম ভুল বলেছে? তার আসল নাম ধাম সব মিথ্যে?"

"না অর্ণব।"

অধিরাজের মুখে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। সে অস্ফুট স্বরে বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার পরিচয়টা সম্পূর্ণ সত্য। নামটাও। সে আদ্যোপান্ত সত্যি কথাই বলেছে।"

(১৮)

আস্তে আস্তে ফের নেমে এল অন্ধকার।

আজকাল সূর্যাস্ত হলেই কেমন যেন ভয় করে। কলকাতার চিরপরিচিত ব্যস্ত রাস্তাকেও অচেনা লাগতে থাকে। ল্যাম্পপোস্টের আলো এবং অন্ধকারের জাল মিলে মিশে কত যে আবছায়ার জন্ম দেয় তার ঠিক নেই। মনে হয়, ইহজগতের মানুষ শুধু নয়, এই আলো-আঁধারির রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক ছায়াশরীরও। ছড়িয়ে রয়েছে কত রক্তাক্ত ইতিহাসের আবছায়া মূর্তি! এই রাস্তা, এই শহর কত কিছুই না হতে দেখেছে। সেই ইতিহাসরা বুঝি আজও ঘুরে বেড়ায়। হালকা হালকা কুয়াশার মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকগুলো অনভিপ্রেত চোখ। যে কোনো মুহূর্তে কুয়াশার চাদর ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াবে কোনো ভয়াল মূর্তি। অথবা এই বুঝি শোনা গেল সেই মৃত্যুর সুর! সেই হাড় হিম করে দেওয়া শিস, গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই....!

অর্ণবের মনের ভেতরের আতঙ্ক মাঝেমধ্যেই তাকে একটা শিরশিরে অনুভূতি দিয়ে যাচ্ছে। কখনো-কখনো মনে হচ্ছে, এই বুঝি মাথায় পাগড়ি পরা কোনো একটা মানুষ সাঁৎ করে সরে গেল অন্ধকারের মধ্যে! সবসময়ই আশেপাশে অপরিচিত কোনো অস্তিত্ব টের পাচ্ছে সে। একঝলক ঠান্ডা হাওয়া ছুঁয়ে গেলেও চমকে উঠছে। এ কি সত্যিই হাওয়া? না ঘাড়ের কাছে কেউ শীতল নিঃশ্বাস ফেলছে! সন্দেহ নামের বিরাট একটা অজগর ক্রমশ আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরছে তাকে। গুলশন সিং, গুলাব সিং আর গুল্লু, এই তিনটে নামই বারবার তার মস্তিষ্কে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। বিশ্বাস নেই... কাউকে বিশ্বাস নেই। এমনকি এই টুইঙ্কল অরোরাটিকেও সে বিশ্বাস করে না। কার মনে কী আছে তা অন্তর্যামী ছাড়া কেউ জানে না। তাই কাউকেই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না...!

আপাতত অধিরাজের প্ল্যান মতোই এখন ওরা প্রব্যাবল ভিকটিমদের বাড়ি আর ফ্ল্যাট ভালো করে তল্লাশি করে দেখছে। প্রথমেই আর্বানায় ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাটে সে, অর্ণব আর মিস্ অরোরা গিয়ে হাজির। মিস্ আত্রেয়ী দত্ত-ও অকুস্থলে উপস্থিত, তবে চমৎকার অভিনয় প্রতিভায় ভাবটা এমন করল যেন ওদের চেনেই না! অধিরাজের মাথায় এখন একটাই চিন্তা। গ্যাসটা বেডরুমগুলোয় আসছে কোন্ পথে। কোথাও কোনো লুপ হোল, বা হিডন চেম্বার আছে কিনা। তাই সে নম্রভাবে মিঃ দত্তার কাছে অনুরোধ জানায় বেডরুমগুলো একটু সার্চ করে দেখার জন্য। কিন্তু ভূপেন্দ্র দত্তা চটে গিয়ে প্রায় লাফাতে শুরু করলেন, "আপনাদের সাহস তো কম নয়! বেডরুমটা মানুষের প্রাইভেট জিনিস। তার ওপর এ বাড়িতে আমার মেয়ে-জামাইও থাকে। আপনি আমাদের সকলের প্রাইভেসি এভাবে নষ্ট করতে পারেন না!"

"স্যরি স্যার।" অধিরাজ বিনীতভাবেই বলে, "আমি জানি যে কোনো মানুষের প্রাইভেসিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। কিন্তু এখন এটা আর আপনাদের প্রাইভেট ব্যাপার নেই। এটা এখন আমাদের এবং আপনাদের, উভয়েরই প্রাণের দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নয়তো আপনার বেডরুমে আপনি কোন সুন্দরীর ছবি রাখেন, রিভলবার রাখেন কিনা বা ইনারওয়্যারের ব্র্যান্ড কী, আপনার স্ত্রী লুকিয়ে লুকিয়ে পান-সুপারি-জর্দা খান কিনা, আপনার মেয়ে-জামাই কোন্ ব্র্যান্ডের সিগারেট খান অথবা কোকেন নেন কিনা, বিছানায় ক-টা টেডি বিয়ার শুয়ে থাকে, সেসব দেখার আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আমরা স্রেফ ডিউটি করছি।"

ভূপেন্দ্র এবার বেশ মেজাজের সঙ্গে বললেন, "শুনুন, আপনাদের ডিউটি হল ঐ পাগল কুত্তাটাকে ধরা আর শ্যুট্ করে দেওয়া। তাকে মারলেই গল্প শেষ। সেটা তো আপনাদের দ্বারা হচ্ছে না, উলটে আমাদেরই হ্যারাস করছেন। আমাকে ডিউটি দেখাতে আসবেন না! যখন আপনি জন্মাননি তখন থেকেই আমরা আমাদের ডিউটি করে আসছি। রীতিমতো

মাথার রক্ত ঘাম পায়ে ফেলেছি, আপনাদের মতো স্রেফ গায়ে হাওয়া লাগাইনি।”

অধিরাজ মসৃণ হাসল। তারপর একেবারে ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, তাঁর কাঁধে হাত রেখে নীচুস্বরে বিড়বিড় করে বলল, “আপনার সেই রক্ত ঘাম পায়ে ফেলা ডিউটির গল্প কপুর-মিত্তল কমিটির রিপোর্টে সবিস্তারে পড়েছি স্যার। কথায় আছে, সিনিয়রদের দেখানো পথেই জুনিয়রদের চলা উচিত। আপনি যদি বলেন, আপনার মতো ডিউটি তো আমিও করতে পারি। এ আর এমন কী কঠিন কাজ? লাইটার তো আমার কাছেও আছে। এখন শুধু বার্নিং শিখের আসার অপেক্ষা।”

তার কথা শুনে ভূপেন্দ্রর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এক লহমায় হুমদারি ভাব উধাও তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে আছেন। যা শুনলেন, তাতে যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। অধিরাজ এবার একটু সরে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হেসে বলল, “মে আই?”

“আপনাদের যা খুশি করুন।”

কথাটা ছুড়ে দিয়েই তিনি চলে যাচ্ছিলেন। ফের তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে অধিরাজ। যথারীতি নীচু স্বরেই বলল, “আরও একটা কথা। আপনার বাড়িতে যে ইনকম্পিটেন্ট, অপদার্থ রাঁধুনীটি আছেন, তিনি এখানে নিজের ডিউটিটাই মন দিয়ে করছেন বলে এখনও আপনার পরিবার বেঁচে-বর্তে আছে। তাঁর সতর্ক দৃষ্টির আওতায় আপনার মেয়ে জামাই নাতি নাতনি আছেন বলেই এখনও পর্যন্ত ওঁরা সুরক্ষিত। এখানে উনি আপনাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যই এসেছেন, পঞ্চাশবার আপনার কফি বানানোর অর্ডার আর গালাগালি খেতে আসেননি। সুতরাং এর পর থেকে ওঁর সঙ্গে সসম্মানে কথা বলবেন।”

রক্তাভ ক্রুদ্ধ চোখে অধিরাজের দিকে তাকালেন তিনি, “এটা কি অর্ডার? না ওয়ার্নিং?”

“আজকাল একটার সঙ্গে আর একটা ফ্রি চলছে।” তার মুখে চাপা হাসিটা খেলা করছে, “একসঙ্গে দুটোরই কম্বো অফার ভেবে নিন। ফের যদি আমাদের অফিসারের সঙ্গে মিসবিহেভ করেন, উনি পাততাড়ি গুটিয়ে স্রেফ এখান থেকে চলে যাবেন। তারপর আপনার মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনির লাশ বওয়ার দায়িত্ব একা আপনার।

“প্লিজ অফিসার!” আর থাকতে না পেরে এবার ভদ্রলোক অধিরাজের হাত চেপে ধরেন, “এভাবে আমায় মারবেন না। আমি জানি কী করেছি! যে মুহূর্ত থেকে সোনালি জানতে পেরেছে, সেই মুহূর্ত থেকে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলছে না। এতক্ষণে একবারও ও আমায় ‘বাবা” বলে ডাকেনি। ও, আয়ান, তানিশা, আমার প্রাণ! আমি ক্ষমা চাইছি। যদি আপনি চান, আমার পায়ে ধরেও ক্ষমা চাইতে আপত্তি নেই। প্লিজ, ওদের যেন কিছু না হয়। ওরা ইনোসেন্ট। প্লিজ...।”

অধিরাজ দেখল ভূপেন্দ্র দত্তার চোখে এবার জল জমেছে। সে সামান্য নড করল, “উইল ট্রাই মাই বেস্ট।”

তিনি এবার ক্লান্ত, পরাজিত সৈনিকের মতো ওখান থেকে চলে গেলেন। কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে তাঁর গর্ব, ঔদ্ধত্য, বদমেজাজ! পাহাড়প্রমাণ ইগো আর অহমিকা। একটা বিধ্বস্ত, ভয়ার্ত মানুষ আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হতে হতে চলে যাচ্ছে। তার কলঙ্কময় ইতিহাস জানার পর হয়তো ভালোবাসার মানুষগুলো মুখ ফিরিয়ে নেবে। সেটাই স্বাভাবিক। কেউ কারোর পাপের দায়ভার নেয় না। স্বয়ং দস্যু রত্নাকরের পরিবারও সে ভার নিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল, ভূপেন্দ্র তো সামান্য মানুষ!

অধিরাজ, অর্ণব ও মিস্ অরোরা ভালো করে বেডরুমগুলোকে পরীক্ষা করল। এখানে একটি বেডরুম স্বয়ং ভূপেন্দ্র-র। আর একটিতে শালিনী তানিশা ও আয়ানকে নিয়েই থাকেন। আর একটি বিরূপাক্ষ ও সোনালির জন্য মজুত। জুজুৎসুর জন্যও একটি ছোট্ট ঘরকে বেডরুম বানানো হয়েছে। সবমিলিয়ে তিনটে মাস্টার বেডরুম থাকলেও জুজুৎসুর জন্য একটি বেডরুম এক্সট্রা। মিস্ দত্তকে শালিনী তাঁর ঘরেই একটি ছোট্ট খাটের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন আপাতত। তবে সে ওখানে শোয় না। তাই তাকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ

নেই।

"ভূপেন্দ্র-র বেডরুমটা ছেড়ে দাও অর্ণব।" অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল, "আমার বিশ্বাস বার্নিং শিখ ওঁকে টার্গেট করবে না। বিপদটা ওনার মাথায় নয়, বাকিদের মাথার ওপরেই নাচছে। তাই জুজুৎসুকে নিয়ে তিনটে বেডরুমই চেক করে দেখি। গ্যাসটা ঐ তিনটে রুমেই আসবে। আসুন, মিস্ অরোরা।"

এই ফ্ল্যাটের বেডরুমগুলো দেখার মতো! যেমন সাইজে বিরাট, তেমনই প্রচুর যত্নের সঙ্গে সাজানো হয়েছে। দেখলে মনে হয়, ভূপেন্দ্র বুঝি ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরকে দিয়ে ঢেলে সাজিয়েছেন শয়নকক্ষগুলো। তবে আদতে তা নয়। এসবই শালিনী ও সোনালির কীর্তি। দু-জনেই বহুযত্নে, অর্থব্যয় ও রুচির সংমিশ্রণে সাজিয়ে নিয়েছেন তাদের বাড়ি। কার্পেট, আয়না, ড্রেসিং টেবিল থেকে শুরু করে জমকালো পর্দা, নানারকম শো পিস ও লাইটিং এর বর্ণাঢ্য ব্যবস্থায় প্রায় রাজকীয় শয়নকক্ষ বলা যেতে পারে।

অধিরাজ একটা গভীর শ্বাস টেনে বিড়বিড় করে বলল, "মিঃ ফসজিন অ্যান্ড মিঃ মাস্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়্যার ইউ আর! কোথা থেকে আপনারা এন্ট্রি নেবেন প্রভু? লেটস সি!"

তিনজনেই রীতিমতো তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করল গোটা বেডরুম। দুই পুরুষ অফিসার দেওয়ালের প্রত্যেকটা ইঁট প্রায় ঠুকে ঠুকে বাজিয়ে দেখছে কোথাও ফাঁপা অংশ আছে কিনা। টুইঙ্কলও তৎপর ভঙ্গিতে বিছানা, বালিশপত্র উলটে পালটে, গদির তলায়, এমনকি কিং সাইজের বক্স খাটের বক্স খুলে দেখছে কোথাও কোনো সন্দেহজনক জিনিস আছে কিনা! ভারি ভারি পর্দাগুলো সরিয়েও দেখছে পেছনে কী আছে। সে শুধু সেখানেই থেমে নেই। ড্রেসিং টেবিলে সাজানো ক্রিম, লিপস্টিক এমনকি পারফিউমও ভালো করে চেক করছে। পারফিউম স্প্রে করতেই মিষ্টি গন্ধ পেয়ে অর্ণব পেছন ফিরে তাকায়, "মিস্ অরোরা। আপনি ঘর সার্চ করতে এসে পারফিউম লাগাচ্ছেন? লিপস্টিক আর ক্রিম ঘাঁটাঘাঁটি করার দরকারটা কী? মার্ডার ওয়েপন দুটো গ্যাস, এর একটা জিনিসেও ওগুলো থাকতে পারে না।"

টুইঙ্কলের জবাবও হাজির, "স্যার, পারফিউমের বোতলের ওপর কিছুটা ফাঁকা অংশও তো আছে। গ্যাসটা ওর মধ্যেও থাকতে পারে। তাই স্প্রে করে দেখছি।"

"অ্যাকচুয়ালি শি হ্যাজ আ পয়েন্ট অর্ণব! ক্যারি অন মিস্ অরোরা।" বলতে বলতেই সে এগিয়ে গিয়েছে ঘরের এককোণে রাখা মসকুইটো লিকুইডের যন্ত্রটার দিকে, "আজকাল এই নতুন স্টাইল উঠেছে। কেউ এখন মশারি টাঙিয়ে ঘুমোয় না। বরং মসকুইটো লিকুইড চালিয়ে রাখে। এটা কোন্ ব্র্যান্ড?"

অর্ণব ভেবে পেল না এত কিছু থাকতে অধিরাজ মসকুইটো লিকুইডের ব্র্যান্ড দেখতে ব্যস্ত হয়ে কেন পড়েছে। সে মৃদু স্বরে বলল, "মর্টিন।"

"বটে?" অধিরাজ বোতলটাকে যন্ত্র থেকে বের করে এনে তার মুখের কালো স্টিকটা শুঁকল। পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে বলল, "নো ডাউট এটা মর্টিনই। এই মিষ্টি অথচ ইরিটেটিং গন্ধটা আমার একেবারেই সহ্য হয় না। তাছাড়া এটা বোধহয় একটু আগেও চলছিল। এখনও বেশ গরম। দেখো তো।"

অর্ণবও একটু শুঁকে দেখল। এই গন্ধ তার অত্যন্ত পরিচিত। ওর নিজের বাড়িতেই এই মসকুইটো লিকুইডগুলো ইউজড হয়। শিশিটা এখনও বেশ গরম। এবং যে কালো লম্বা অংশটা বেয়ে মশা মারার তেলটা বাইরে আসে সেটাও বেশ তেতে আছে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগেই এটা ব্যবহার করা হয়েছে। সে মাথা নাড়ল, "মর্টিনই স্যার। নো ফাউল প্লে অ্যাট অল!"

"বেশ। মিঃ লিকুইডেটরকে বেকসুর খালাস করা হল। যথাস্থানেই রেখে দাও।" সে আপন মনেই বলল, "পারফিউম, লিপস্টিক, মশার লিকুইড—এগুলো সবই খুব কমন জিনিস। হয়তো এদের পেছনে ধাওয়া করাটাই বোকামি। তবু কবিগুরু বলে গিয়েছেন, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পার মিঃ ফসজিন। তিনি যে

কোথায় ঘাপ্টি মেরে থাকবেন কে জানে!"

অর্ণবের চোখ হঠাৎই ঘরের একদিকে পড়ল। সে একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, "স্যার, ঐ দেখুন এয়ার পিউরিফায়ার

অধিরাজ অর্ণবের ইঙ্গিত লক্ষ্য করে দেখল সত্যিই একটা বড়োসড় এয়ার পিউরিফায়ার ঐ ঘরের এককোণে উপস্থিত। তার চোখ সন্দেহে কুঁচকে গেল। কেউ যদি ঘরে কোনোরকম গ্যাস ঢোকাতে চায় তবে এসি আর এয়ার পিউরিফায়ারের থেকে বেটার অপশন আর নেই। এয়ার পিউরিফায়ারের কাজই হল ঘরের বাতাসকে পরিষ্কার, দূষণমুক্ত রাখা। কিন্তু এর ভেতরে কিছুটা কারিকুরি করলে উলটোটাও করা যেতে পারে। যে এয়ার পিউরিফায়ার বাতাসের দূষণ, ধুলো-ময়লা টেনে নেয়, সে-ই আবার বিষাক্ত গ্যাসও ছড়িয়ে দিতে পারে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল এয়ার পিউরিফায়ারটার দিকে। বাইরে থেকে দেখে তো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে। তবে ভেতরে কী আছে তা বাইরে থেকে দেখে বোঝা সম্ভব নয়।

"হুঁ।" সে অর্ণবের দিকে তাকায়, "এটাকে ওঠাও। এ মালটাকে আমার সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। তার সঙ্গে এক কাজ করো তো। কায়দা করে জুজুৎসুকে এ ঘরে ডেকে নিয়ে এসো।"

সে মাথা ঝাঁকিয়ে নীরবে হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে মিস্ অরোরা শয়নকক্ষের কাবার্ডগুলো চেক করছে। ঠুকে ঠুকে দেখছে যে কাঠের প্যানেলগুলো সলিড কিনা। কিংবা কাবার্ডের ভেতরে কোনোরকম সন্দেহজনক কিছুর অস্তিত্ব আছে কিনা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে একটা ছোটোখাটো সাইজের মেশিন জাতীয় কিছু নিয়ে এসে হাজির হল, "স্যার, এটা দেখুন। অটোম্যাটিক এয়ার ফ্রেশনার। এটা কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর রুমে পারফিউম বা ঐ জাতীয় সুগন্ধি স্প্রে করে। ইনফ্যাক্ট এখনও স্প্রে করছে।"

অধিরাজ ভালোভাবে দেখছে যন্ত্রটাকে। এ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য একটা মিষ্টি গন্ধের উপস্থিতি টের পেয়েছিল সে। সম্ভবত সেটা এই এয়ার ফ্রেশনারেরই সুগন্ধ। তার দু-চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। এয়ার ফ্রেশনারের মাধ্যমেও ঘরে গ্যাস ছড়ানো যেতে পারে। তার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো ভেসে উঠল কয়েকটা ছবি। আজ পর্যন্ত যে ক-টা ক্রাইমসিনের ছবি দেখেছে সেখানে সর্বত্রই একটা করে এয়ার ফ্রেশনার আর এয়ার পিউরিফায়ার ছিল। এমনকি ত্রিপাঠী সাহেবের বাড়িতেও এই দুটো জিনিসের উপস্থিতি নোটিস করেছিল সে। ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রত্যেকটা বেডরুমেই একটা করে এয়ার পিউরিফায়ার ও এয়ার ফ্রেশনার ছিল।

অধিরাজ টুইঙ্কলের দিকে তাকায়, "গুড জব মিস অরোরা। এটাও প্রবাবল ওয়েপন হতে পারে। অন্য দুটো ঘরও চেক করে দেখুন তো সেখানে এয়ার পিউরিফায়ার বা অটোম্যাটিক এয়ার ফ্রেশনার উপস্থিত আছে কিনা!"

"ইয়েস স্যার।"

টুইঙ্কল মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল। ততক্ষণে অর্ণব জুজুৎসুকে নিয়ে এসেছে। অধিরাজ তার দিকে তাকিয়ে বলল, "জুজুৎসু, এই এসিটার মেইনটেনেন্স কে করে? সবসময়ই কি কোম্পানির লোক আসে? না তোমরা নিজেরাও ছোটোখাট কাজ করে নাও?"

"না সাব।" জুজুৎসু খুদে খুদে চোখ পিটপিট করে বলে, "সবসময়ই কোম্পানির লোককে ডাকা হয় না। ওরা শুধু বছরে দু-বার আসে। গরমের শুরুতে একবার এসে সার্ভিসিং করে যায়। এসি'র পুরোটাই খুলে ভেতরটা অবধি পরিষ্কার করে। গ্যাস কমে গেলে ভরে দেয়। তার ফুটো ফাটা আছে কিনা তাও চেক করে নেয়। তারপর চলে যায়। আবার 'জাড়'-এর 'মৌসম' এলে ফের আর একবার আসে। পুরো সিস্টেমটাই সার্ভিসিং করে চলে যায়। তবে এর মধ্যে এসির জালটা যখন নোংরা হয়ে যায়, তখন আমিই খুলে জল দিয়ে পরিষ্কার করে দিই। দেখে দেখে অনেকটাই শিখে নিয়েছি। ছোটোখাটো কাজ হলে আমিই সামাল দিতে পারি সাব। তবে যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলে তখন আবার কোম্পানির লোককেই ডাকতে হয়।"

“এবছর শেষ কবে সার্ভিসিং হয়েছে?” .

“এই তো। ঠান্ডা পড়ার আগেই। তারপর মাত্র কিছুদিনই এসি চলেছে। যেই ‘সর্দি’ পড়ল, তারপর থেকে এসিও অফ।”

“তুমি এসি খুলতে পারো। তাই না?”

“হাঁ সাব।”

“একটু খুলে দেখো তো। আমরাও দেখি ভেতরে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।”

“জি সাব।” জুজুৎসু সোৎসাহে বলল, “আমি আমার যন্ত্রপাতি নিয়ে আসি?”

“নিয়ে এসো।”

সে বেরিয়ে যেতে না যেতেই টুইঙ্কল একগাদা এয়ার পিউরিফায়ার ও এয়ার ফ্রেশনার নিয়ে এসে হাজির। সে একটু উত্তেজিত, “এ বাড়ির প্রত্যেকটা বেডরুমে এই দুটি পদার্থ আছে স্যার। এয়ার ফ্রেশনার তো একাধিক আছে। এমনকি অ্যাটাচড্ টয়লেটেও উপস্থিত। আমি সবগুলোই তুলে নিয়ে এসেছি।”

“এয়ার পিউরিফায়ারগুলো নিয়ে নাও অর্ণব। ওগুলোকে ল্যাবে নিয়ে গিয়ে দেখতে হবে।” তার চোখ এবার টুইঙ্কলের দিকে ফিরেছে, “এয়ার ফ্রেশনারগুলো কি এখনও স্প্রে করছে?”

“হ্যাঁ স্যার।” টুইঙ্কল বলল, “সবগুলো থ্রি হান্ড্রেড এম এল এর বোতল। শালিনীজি আর সোনালিজি বললেন, এগুলো গত সপ্তাহ ধরেই আছে। ওঁদের ঘরে সবসময়ই এগুলো মজুত থাকে। তবে আমার মনে হয় না এর মধ্যেও কোনো ফাউল প্লে আছে। সবক-টাকেই ভালো করে শুঁকে দেখেছি। রোজ আর জ্যাসমিনের সুন্দর গন্ধ। কোনো গ্যাসজাতীয় কিছু নেই। থাকলে ওরা এতদিন টিকতেন না কারণ এগুলো একসপ্তাহ ধরেই স্প্রে করছে।”

“তাহলে মিস্ এয়ার ফ্রেশনারকেও ক্লিন চিট দেওয়া হল। তবে মিঃ পিউরিফায়ারকে ছাড়া ঠিক হবে না। ওঁদের গ্রেফতার করো অর্ণব।”

“ওকে।”

অর্ণব নির্বিবাদে এয়ার পিউরিফায়ারগুলোকে বাজেয়াপ্ত করল। ততক্ষণে জুজুৎসুও যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে হাজির। অধিরাজের নির্দেশে সে এয়ার কন্ডিশনার মেশিনটাকে খুলল। ওটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল ওরা। এমনকি রিমোট দিয়ে চালিয়ে ও দেখা হল। কিন্তু কোথাও কোনো সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না। এসি দিব্যি শীতল ও তাজা হাওয়া ছড়িয়ে চলছে। ভেতরেও কোনো কারিকুরি আছে বলে মনে হয় না। “থ্যাঙ্কস জুজুৎসু।” অধিরাজ মিষ্টি হাসল, “এই বাড়ির ইলেক্ট্রিসিটির কাজ তুমিই করো তাই না? সত্যিই! কত কাজ করতে হয় তোমাকে! একসঙ্গে এত পরিশ্রম করা চাট্টিখানি কথা নয়।”

একে বলে খাঁটি সর্ষের তেলের সঙ্গে এয়ার কন্ডিশনের হাওয়া! জুজুৎসু একেবারে গলে গিয়ে বলল, “অত কিছু নয় সাব। ছোটামোটা কাজ পারি। শুধু ইলেক্ট্রিক নয়, প্লাম্বিং এমনকি ছোটোখাটো মেরামতির কাজও করে দিই। আপনার বাড়িতে কাজ থাকলেও বলবেন। করে দিয়ে আসব।”

“নিশ্চয়ই।” সে বলল, “তবে আর একটু কষ্ট করো। এ বাড়ির সবকটা বেডরুমের এসি, লাইটগুলো একটু খুলে দেখাবে? তোমাদের ঘরের লাইটগুলো আমার বড়োই পছন্দ হয়েছে।”

জুজুৎসু একগাল হাসল, “এগুলো সোনালি মেমসাব আর শালিনী মেমসাব শখ করে লাগিয়েছেন। আগের আলোগুলো এত ঝকঝকে ছিল না। শালিনী মেমসাবের চোখ কাটার পর পড়তে অসুবিধে হত বলে এই জোরালো আলোগুলো লাগানো হয়েছে। এখন মেমসাব দিব্যি বই পড়েন।”

“তাই? বাঃ।” অধিরাজ কৌতূহলী, “কতদিন ধরে আছে এই লাইটগুলো?”

সে একটু মাথা চুলকোল, “ঠিক মনে নেই সাব। তবে কয়েক মাহিনা তো হয়ে গেছেই। প্রথম প্রথম চোখে খুব লাগত। এখন সবার সয়ে গেছে। খুব ভালো লাইট। আপনিও লাগিয়ে

নিন।"

"নিশ্চয়ই।"

তার মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট, "আচ্ছা জুজুৎসু, এ ঘরে তো কোনো ফাঁক ফোঁকর দেখছি না। ঘুলঘুলি, ভেন্টিলেশন সিস্টেম তেমন কিছুই নেই। পুরোটাই সিলড্। ঘরে আলো-বাতাস আসে কী করে? এমন বন্ধ ঘরে দমবন্ধ হয়ে যায় না?"

"বদ্ধ ঘর কোথায় সাব?" সে একটু এগিয়ে এসে একটা ভারি পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। তার পেছনেই বিরাট একটা কাচে মোড়া জানলা। জুজুৎসু জানলাটা টেনে খুলে দিয়ে বলে, "প্রত্যেক বেডরুমেই এরকম বিরাট খিড়কি আছে সাবজি। সারা সকাল খোলা থাকে। তাজা হাওয়া-আলো বিকেল অবধি আসে। এখন সর্দির মৌসম চলছে না? তাই সন্ধে থেকে বন্ধ করে দিতে হয়। তাছাড়া সবাই বেডরুমে না-আসা পর্যন্ত সব ঘরের দরজা খোলা থাকে। শুধু ঘুমের সময়টুকুই সব বন্ধ হয়ে যায়।"

"জানলাটা বাইরে থেকে খোলা যায়?"

"না সাব।" জুজুৎসু জানায়, "এগুলো একদম ভেতর থেকে সিল্ড। বাইরে থেকে কেউ খুলতে পারবে না। এমনকি ব্যালকনি থেকেও খুলবে না। শুধু ভেতর থেকেই জানলাগুলো খোলে।"

"বুঝলাম।"

অধিরাজের চোখে দুশ্চিন্তা। সে আর কথা না বাড়িয়ে বলল, "চলো, বাকি ঘরগুলোও দেখা যাক।"

বাকি বেডরুমগুলোও প্রায় একইরকমের। শুধু জুজুৎসুর ঘরে এসি নেই। নয়তো এয়ার পিউরিফায়ার, অটোম্যাটিক এয়ার ফ্রেশনার, মসকুইটো লিকুইডেটর, সবই কমন। অর্ণব বইয়ে পড়েছে যে ক্রিমিনালরা সবসময়ই মার্ডার ওয়েপন এমন জায়গায় রাখে যার দিকে কেউ লক্ষ্যই করবে না। কিন্তু অধিরাজ অত সূক্ষ্ম তল্লাশিতে গেলই না। বরং রীতিমতো ফের দেওয়াল ঠোকাঠুকি করে সিক্রেট চেম্বারের অস্তিত্ব খোঁজা হল। প্রত্যেকটা লিকুইডেটর খুলে খুলে শুঁকে দেখে চোখ মুখ কুঁচকে বলল, "ওঃ! খাঁটি মর্টিন! অসহ্য!"

মিস্ অরোরা যথারীতি পর্দা সরিয়ে, খাট লণ্ডভণ্ড করে, প্রত্যেকটা ড্রয়ার খুলে, ক্যাবিনেট-কাবার্ড খুলে আচ্ছা করে ঠুকে, মেরে দেখল। কোথাও কিচ্ছু নেই! একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রও নেই যার ভেতর থেকে গ্যাসটা ঢুকতে পারে। জুজুৎসুও এসি আর লাইট খুলে দেখিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, বাইরে থেকেও ওরা পরীক্ষা করে দেখল যে এসি ডাক্টের মধ্য দিয়ে কোনোভাবে গ্যাস ইনসার্ট করা সম্ভব কিনা। এসি-র রিমোট, ক-টা রিমোট আছে, প্রয়োজনে কখনও একাধিক রিমোট ইউজ হয় কিনা তাও জিজ্ঞাসা করল। অথচ সেখানেও ব্যর্থতা। ওঁদের প্রত্যেকটা এসি-র একটা করেই রিমোট আছে। এইগুলো একেবারে শুরু থেকেই চলছে। আজ পর্যন্ত বিগড়ায়নি, তাই নতুন একাধিক রিমোটের প্রয়োজনও পড়েনি।

নাঃ, লোহার বাসরঘরে কালনাগিনীর ঢোকার কোনো সুযোগই নেই। অধিরাজ অ্যান্ড টিম কিছুই বাদ দেয়নি। এমনকি ওরা জানলা খুলে বাইরের দিকটাও তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। বাইরে থেকে জানলা টেনে খোলার চেষ্টাও করল। কিন্তু জুজুৎসুর কথাই সত্যি। একটা জানলাও বাইরে থেকে খোলে না। ঘরের ভেতরে কোনো হিডন চেম্বারও নেই যার মধ্যে থেকে গ্যাস পাস্ করা সম্ভব। তবে?

শালিনী, আয়ান আর তানিশার বেডরুম থেকে বেরোতে গিয়েও হঠাৎ থমকে গেল অধিরাজ। ওদের কিংসাইজ বেডের সাইডে অলশভাবে একটা বিরাট গোলাপি রঙের টেডি বিয়ার এলিয়ে পড়ে আছে। এমনিতে দৃশ্যটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে কোনো শিশুর ঘরে টেডি বিয়ার বা অন্যান্য পুতুল বা খেলনা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অধিরাজের মনে হল টেডি বিয়ারটা একটু বেশিই যেন বড়ো। এতটাই লম্বা চওড়া যে ওর ভেতরে একটা আস্ত মানুষও বুঝি ঢুকে থাকতে পারে। সে জুজুৎসুর দিকে তাকিয়েছে, "এই টেডি বিয়ারটা কার?"

"আয়ান বাবার।"

"আই সি!" অধিরাজ জানতে চায়, "ওটাকে কি খোলা যায়?"

"হাঁ সাব।" জুজুৎসু মাথা ঝাঁকায়, "আমিই তো ওটা নোংরা হলে খুলে কেচে দিই। ওর ভেতরে স্পঞ্জ রয়েছে। পুতুলটার পেছনের চেনটা খুললে ভেতরের স্পঞ্জগুলো বেরিয়ে আসে। ওগুলোকে বের করে খোসাটা কেচে আবার স্পঞ্জ ঢুকিয়ে ফিটফাট করে দিই।"

"ফাইন।"

সে আর কথা না বাড়িয়ে হলঘরে চলে এল। সেখানে শালিনী, সোনালি আর বিরূপাক্ষ-র সঙ্গে মিস্ দত্তও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের মুখেই চিন্তা ও আশঙ্কার মেঘ থমথম করছে। ব্যতিক্রম শুধু আয়ান ও তানিশা। তারা নিজেদের মধ্যে খেলা করতেই ব্যস্ত। অধিরাজ আয়ানের সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলে, "হ্যাল্লো মিঃ আয়ান।"

ফুটফুটে পুঁচকি ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল, "হাই হ্যান্ডসাম।" বোঝো ঠ্যালা! অর্ণব বিড়বিড় করে বলল, "তোর হবে বাবা। এই বয়েসেই 'হাই হ্যান্ডসাম'!"

পুঁচকুর ডায়লগ শুনে অধিরাজও এবার ঘাবড়ে গিয়েছে, "ও বাবা! তুমি হ্যান্ডসাম মানেও জানো।"

"হ্যাঁ।" শিশু সরলভাবে মাথা নাড়ল, "হ্যান্ডসাম মানে সুন্দর। এই তো একটু আগেই মা তোমাকে দেখে বলল 'অফিসার কী দারুণ হ্যান্ডসাম না!' বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম হ্যান্ডসাম মানে কী, বাবা বলল সুন্দর। তুমি খুব হ্যান্ডসাম আঙ্কল।"

সোনালি তখন সোফার পেছনে লুকোবেন কিনা ভাবছেন। একেবারে 'ধরণী দ্বিধা হও' অবস্থা। আজকালকার বাচ্চারা সব খেয়াল করে। তাদের সামনে কোনো বেফাঁস কথা বলে ফেললে রক্ষা নেই!

"তুমিও খুব হ্যান্ডসাম।" অধিরাজ সস্নেহে বলে, "বাই দ্য ওয়ে মিঃ হ্যান্ডসাম, তোমার ঘরে একটা বিরাট পিঙ্কি ডলি আছে। তুমি কি ওটা নিয়ে খেলা করো?"

"না।" আয়ান বলল, "ওটা খুব ভারি। আমি তুলতে পারি না। তাই ও আমার ফেভারিট নয়। পুঁচু, সিম্বা আর লিও আমার ফেভারিট ফ্রেন্ড। ওর নাম ঘুটু! ভীষণ পাজি। একদম নড়ে চড়ে না।"

"পুচু, সিম্বা আর লিও কে?"

"এসো, তোমায় দেখাচ্ছি।"

আয়ান অধিরাজের হাত ধরে টান মারল। অধিরাজও নির্বিবাদে চুপচাপ তার সঙ্গে ওদের বেডরুমে ঢুকল। আয়ান বিরাট টেডির পেছনে চাপা পড়ে থাকা তিনটে পুতুল বের করে এনেছে। রেড প্যান্ডাটার নাম পুঁচু, একটা বড়োসড় স্টাফড ব্যাঘ্রশিশুর পুতুলের নাম সিম্বা, আর ছোট্ট একটা সিংহের নাম লিও। তিনটে পুতুলই ভারি কিউট।

"এগুলো নিয়ে তুমি সবসময় খেলা করো?"

"হ্যাঁ। তবে ঘুটুকে আমি তুলতে পারি না।" আয়ান ঘাড় কাত করল, "মা বলেছে, রোজ দুধ খেলে একসময় আমি ঘুঁটুকেও তুলতে পারব।"

"দুধ খেতে ভালো লাগে তোমার?"

সে জিভ বের করে বলল, "ইয়াক! বিচ্ছিরি।"

"আমি একটু তোমার বন্ধুদের কোলে নিয়ে দেখব?"

আয়ান অত্যন্ত উদারমনস্ক। সে মাথা ঝাঁকায়, "হ্যাঁ। কোলে নাও না। ওরা খুব খুশি হবে।"

অধিরাজ একে একে পুঁচু, সিম্বা আর লিওকে পরীক্ষা করে দেখল। তিনটে পুতুলই ফাঁপা। ওগুলোকে সহজে খোলা যায়, ওয়াশও করা যায়। সে ঘুটুকেও নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখল। এর মধ্যে যে কেউ, যা কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। দৃষ্টি ধারালো। কিছু ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। সম্বিত ফিরল একটা কচি হাতের স্পর্শে। আয়ান তার বাইসেপস টিপে টিপে পরখ করছে। ভারি খুশি হয়ে বলল, "ওয়াও! তুমি কি রোজ দুধ

খাও?”

“ইয়েস মিঃ হ্যান্ডসাম।”

ওখানে আর বিশেষ সময় খরচ করল না ওরা। শুধু মিস্ দত্তকে সুযোগ পেয়ে একপাশে সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল অধিরাজ, “এই ফ্লোরে যত মহিলা থাকেন, তাঁদের হাত লক্ষ্য করেছেন কখনও? ওঁরা কেউ ম্যানিকিওর করেন?”

“সবাই করে স্যার। এমনকি নিয়মিতো স্পা-ও করে।”

“ফাইন। এদের মধ্যে কেউ খোঁড়াচ্ছেন কিনা সেটা দেখেছেন?”

“লক্ষ্য করেছি। কেউ খোঁড়াচ্ছে না। সব নর্মাল।”

“ফাইন। সুযোগ পেলে ওঁদের ছবি তুলে রাখবেন। আমরাও একটু সবার হুলিয়া দেখতে চাই। কিন্তু এখন বোধহয় অনেকেই উপস্থিত নেই।”

“না। এরা সব হাই সোসাইটির লেডি। কখন আসে, কখন যায়, কখন ইভনিং ওয়াকে বেরোয় তার ঠিক নেই। একটু আগেই দেখলাম গুরশীল হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন গেল। তিতলিও সেই সকালে কোন বান্ধবীর বাড়ি গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। প্রিয়দর্শিনীকেও সকালেই বেরিয়ে যেতে দেখেছি, আর শ্রী একটু আগেই শ্যুটিঙে গেল। কোকিলার এখনও আসার সময় হয়নি। তবে...” আত্রেয়ী মুখ টিপে হাসল, “নারী পুরুষ নির্বিশেষে এ ফ্লোরের সব নমুনার ছবি আমি সুযোগ পেয়ে আগেই তুলে রেখেছি। আপনাকে একটু পরেই হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি স্যার।”

“এক্সেলেন্ট ওয়ার্ক মিস্ দত্ত।” অধিরাজ খুব খুশি হয়ে বলল, “কখনোই আপনি নিরাশ করেন না! একটু রাতের দিকে অর্ণব আপনার স্পেশাল চা খেতে আসবে। আজ এখানে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব ওর। ও সঙ্গে একটা গ্যাস মাস্কও নিয়ে আসবে। ওটাকে হাতছাড়া করবেন না। আর তার সঙ্গে আরও একটা ডিউটি আছে আপনার।”

“বলুন।”

“প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের মহিলারা ফিরে এলে ওঁদের কাছে গিয়ে নুন, তেল, চিনি, খুশি চেয়ে নিন। কিংবা অন্য কায়দা অবলম্বন করুন। কিন্তু কাজটা এমনভাবে করবেন যাতে ওঁদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনি সহজেই পেয়ে যান। আপনার ব্যাগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাউডার বা ঐ জাতীয় কিছু আছে তো?”

“আছে।” সে একটু অবাক, “কিন্তু ম্যাচ করাতে গেলে তো ল্যাবে পাঠাতে হবে। আমি কি অফিসার সরকারকে স্যাম্পল দিয়ে দেব?”

“ম্যাচ করার ফান্ডা বিশেষ নেই।” অধিরাজ আত্রেয়ীকে খুলে বলল আহেলির বলা তথ্যগুলো। তারপর বলল, “ইন দ্যাট কেস, এই হাই সোসাইটি বেবসদের একজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনি পাবেন না। কারণ তিনি হাই কোয়ালিটির সিলিকন গ্লাভস পরে ঘুরছেন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসবে না। আমি সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টহীন নারীটিকেই খুঁজছি। কাউকে বাদ দেবেন না মিস দত্ত। গুরশীল, কোকিলাবেন, শ্রীদর্শিনী-প্রিয়দর্শিনী, তিতলি, কাউকে ছাড়বেন না। ফিঙ্গারপ্রিন্টের স্যাম্পল পরে ফেরার সময় অর্ণব নিয়ে

ল্যাবে চলে যাবে। কিন্তু কার হাতের ছাপ এল না, সেটাই জানার কৌতূহল আমার বেশি। যে মুহূর্তে জানবেন, আমায় জানাবেন।”

“ওকে স্যার।”

ওখান থেকে বেরিয়েই ওরা সোজা চলে গেল পি সি চৌধুরীর বাড়িতে। সেখানে এখন প্রায় সকলেই উপস্থিত। শিবু সকালে জানিয়েছিল যে সে আজ আসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সে দেরিতে হলেও এসে হাজির হয়েছে। মিঃ চৌধুরীকে জানিয়েছে যে এ চাকরি সে আর করবে না। আজই তার এ বাড়িতে শেষদিন। তার হিসাব যেন কর্তা চুকিয়ে দেন, এবং অন্য লোক দেখে নেন। চৌধুরী সাহেবও তেমন। বলেছেন, বকেয়া টাকা তিনি রাতের আগে দিতে পারবেন না। ঘরে অত ক্যাশ এই মুহূর্তে নেই। এটিএম থেকে তুলে আনতে হলে রাতের আগে সম্ভব নয়। আর রাত ন-টার আগে তিনি বাইরে বেরোবেন না। তাই সে এখনও

অপেক্ষা করছে। শিখা এবং কমলাও হাজির। ফিজিওথেরাপিস্ট রাজীব চন্দ সোমলতাকে নিয়ে ব্যস্ত। মিস্ বোস রাজীবকে হেল্প করছিল। তিনমূর্তিকে দেখে সে একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। টুইঙ্কলকে কৌশানী আগে কখনও দেখেনি। স্বাভাবিকভাবেই তার চোখে একটা কৌতূহল উঁকি মেরে গেল। পি সি চৌধুরী, পরিমল ও মেঘনা, প্রত্যেকেরই মুখ থমথমে। ওঁরা আজ কেউই বাইরে বেরোননি। দেখলেই বোঝা যায় মরার আগেই সবাই মরে আছেন। শিখা বিরাট একটা চশমা নাকের ওপর তুলে মন দিয়ে বাসন মাজছে। কমলা একটা চাকু দিয়ে খুব মন দিয়ে সবজি কাটছে। তার সামনে গ্যাসের ওপর একটা কড়াই বসানো। তাতে তেল গরম হচ্ছে। অল্প অল্প ধোঁয়াও উঠছে।

নিতান্তই একটা সাধারণ সংসারের ছবি। এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই নেই। শুধু সদস্যদের মুখগুলোই বড়ো অস্বাভাবিক। এঁরা সবাই যেন মুখে ভয়ের মুখোশ পরে আছেন। দু-চোখে করাল মৃত্যুর আতঙ্ক। পি সি চৌধুরীকে বেডরুমগুলো দেখার কথা বলতেই তিনি বিন্দুমাত্রও আপত্তি করলেন না। বরং স্তিমিত গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই দেখুন না। আপনার ডিউটিতে আমরা কেউ বাধা দেব না।"

ভূপেন্দ্র দত্তার বাড়িতে যা যা হয়েছিল, সেই একই কাণ্ড এখানেও শুরু হল। পি সি চৌধুরীর বেডরুম ছাড়া বাকি দুটো বেডরুমের দেওয়াল, মেঝে এমনকি ছাতও ঠুকে ঠুকে দেখা হল। যথারীতি কোথাও কোনো ফাঁপা জায়গা নেই। এখানেও এয়ার পিউরিফায়ার, অটোম্যাটিক এয়ার ফ্রেশনার, মসকুইটো ম্যাট, এসি, সবই উপস্থিত। অর্ণবের মনে হচ্ছিল, মোটামুটি সব বেডরুমেরই বুঝি নকশা ও আসবাবপত্র একই রকমের। সেই একই ডাবল বা সিঙ্গল বেডের বক্স খাট বা ডিভান, আয়না, ড্রেসিং-টেবল। ড্রেসিং টেবলের ওপরে যথারীতি লিপস্টিক, ক্রিম ও পারফিউম, যা নিয়ে মিস্ অরোরার কৌতূহলের অন্ত নেই। এ বাড়িতে কোনো বাচ্চা নেই, তবু বিছানার ওপর বেশ কিছু সফট টয় সাজানো। এটা বোধহয় পুত্রবধূ মেঘনার শখ। পরিমল ও মেঘনার বেডরুম তুলনামূলক অনেকটাই আধুনিক। তাই কাবার্ডের উপস্থিতি। সোমলতা অসুস্থ বলে তাঁর শয়নকক্ষও আলাদা। এই বেডরুমটা একটু প্রাচীন। এসি বা অন্যান্য জিনিসগুলোও আছে ঠিকই, তবে কাবার্ড বা ড্রেসিং টেবল নেই। বরং বিরাট একটা সেগুন কাঠের আলমারি শোভা পাচ্ছে। তাঁর খাটটাও বক্স-খাট নয়, ওটাও সেগুনের পুরোনো পালঙ্ক। আজকাল এই ধরনের পুরোনো ধাঁচের দামি কাঠের ফার্নিচার দেখতেই পাওয়া যায় না। প্রাচীনতা ও আভিজাত্যের ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে এই জাতীয় আসবাবপত্রে। সোমলতার ঘরে তেমন শো-পিস জাতীয়ও কিছু নেই। নিতান্তই সাদামাটা।

অধিরাজের নির্দেশে মিস্ অরোরা আলমারির চাবি চেয়ে নিয়ে ভেতরটাও তল্লাশি করে দেখল। সোমলতা ফিজিওথেরাপি করাতে করাতেই এমনভাবে টুইঙ্কলের দিকে তাকিয়েছিলেন যেন এখনই সে ওঁর 'আলিবাবার খাজানা' নিয়ে চম্পট দেবে। তবে শেষপর্যন্ত তেমন কোনো ট্র্যাজেডি ঘটল না। এখানেও যথারীতি এয়ার পিউরিফায়ারগুলোকে নিয়ে নেওয়া হল। অধিরাজ মসকুইটো লিকুইডের বোতল শুঁকে দেখে বিরক্ত হয়ে বলল, 'গুডনাইট!' টুইঙ্কল এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ 'ল্যাভেন্ডার আর 'স্যান্ডালউড' বলে শনাক্ত করল। জুজুৎসুর মতো শিবুও এসিগুলোকে খুলে-টুলে দেখাল। চালিয়েও দেখা হল। কোনোরকমের সন্দেহজনক কিছুই নেই।

তবে এখানে একটা পার্থক্য অধিরাজের চোখে পড়ল। এ বাড়িতে কোনোকালে ঘুলঘুলি নামক বস্তুটি ছিল। এখন সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সে কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়, "মিঃ চৌধুরী, এই ভেন্টিলেটরগুলো বন্ধ কেন?"

"অ্যাকচুয়ালি এসি যারা ইনস্টল করতে এসেছিল তারাই ওগুলোকে বন্ধ করতে সাজেস্ট করেছিল।" তিনি জানালেন, "নয়তো ঘর ভালো ঠান্ডা হচ্ছিল না। ওরা বলল এসির অর্ধেক ঠান্ডা হাওয়াই তো ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আমার ছেলে আর বৌমা আবার একেবারেই গরম সহ্য করতে পারে না। আমার স্ত্রীরও গরমের বাতিক। তাই দুটো বেডরুমেরই

ভেন্টিলেটর আর যত ফাঁক ফোঁকর ছিল, সব বন্ধ করে দিয়েছি। আমার অত গরম লাগে না। তাই আমার ঘরেরগুলো খোলাই আছে।"

"ওকে...বে...!"

কিছু একটা বলতে গিয়েও অধিরাজ থমকে গেল। তার চোখ গিয়ে পড়েছে আলোগুলোর দিকে। এই প্রথম তার খটকা লাগল। এখানেও সেই বিশেষ প্রজাতির আল্ট্রাভায়োলেট ভিবজিওর এল ই ডি লাইট উপস্থিত! সর্বত্রই এই বিশেষ আলোর উপস্থিতি কি নিতান্তই কো-ইনসিডেন্স? নাকি এখন সকলেই কিলোদরে এই লাইটগুলোই লাগাচ্ছে। নতুন ট্রেন্ড? নাকি অন্যকিছু? ভূপেন্দ্র দত্তার বাড়িতেও তো এই আলোগুলো বহুমাস ধরেই আছে। জুজুৎসু তো আলোগুলো খুলেও দেখাল। তেমন কিছুই তো চোখে পড়ল না। নিতান্তই সাধারণ লাইট। আর পাঁচটা সাধারণ এল ই ডি বাল্ব বা টিউবের থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্যই নেই। তার নিজের বাড়িতেই তো এই ধরনের লাইটিং সিস্টেম আছে। এর কোনো ক্ষতিকর এফেক্ট থাকলে এতদিন কি এই আলোয় সকলেই নিরাপদে ঘোরাফেরা করতে পারতেন?

তবু সন্দেহ যায় না। সে পি সি চৌধুরীর দিকে ফিরল, "স্যার, এই স্পেশাল লাইটগুলো কবে থেকে এখানে আছে?"

"এগুলো?" তিনি একটু ভেবে বললেন, "এগুলো আমার ছেলে লাগিয়েছে। মাস দুয়েক হয়ে গেল আছে। আগের বাল্ব আর টিউবগুলো বেশিদিন টিকত না। আলোও কমজোরি। কমলা এমনিতেই চোখে কম দেখে, তার ওপর কম আলোয় নুনের জায়গায় চিনি, চিনির জায়গায় নুন দিয়ে বসে থাকত। শিখারও চোখের প্রবলেম। চশমা খুলে ফেললে স্রেফ অন্ধ! আমার আর মিসেসেরও আই সাইট সুবিধের নয়। সেইজন্যই এই আলোগুলো আমদানি করা হয়েছে। সাধারণ লাইটের তুলনায় অনেক বেটার।"

"আই সি।"

অধিরাজ ঠোঁট কামড়াল। সচরাচর লাইট বা বাল্বের সঙ্গে গ্যাসের কোনোরকম সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু এই খুনিটিকে বিশ্বাস নেই। তার সঙ্গে কোমল কৌরের মতো জিনিয়াসের মস্তিষ্কের কারিকুরির সাপোর্ট আছে। সেই অবিশ্বাস্য টেকনিক যেভাবে সবাইকে ঘোল খাওয়াচ্ছে, তাতে নিরীহ থেকে নিরীহতর জিনিসও বিপজ্জনক হতে পারে। সে একটু চুপ করে থেকে বলল, "শিবুকে বলবেন একটু লাইটগুলো খুলে দেখাতে?"

"শিওর।"

যথারীতি শিবু বেডরুমের সব আলো একটা একটা করে খুলে নামিয়ে আনল। অধিরাজ ও অর্ণব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখছে। কোথাও কোনোরকম গোলমাল নেই! একদম পাতি এল ই ডি! এমনকি সকেটগুলোতেও কোনোরকমের অস্বাভাবিকতা নেই। পরিমল ও মেঘনার বেডরুমে একটা ছোট্ট শ্যান্ডেলিয়রও ছিল। সেটাকেও ছাড়ল না ওরা। কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও হাতে কিছুই এল না। সব এতই স্বাভাবিক যে দুই অফিসারেরই মাথা বোঁ বোঁ করতে শুরু করেছে। শেষপর্যন্ত ওরা কি ওয়াইল্ড গুজ চেজ করছে? নাকি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছে। কে বলতে পারে, হয়তো অধিরাজ ফালতু জিনিসের পেছনেই দৌড়ে মরছে আর বার্নিং শিখ ওদের গলদঘর্ম হতে দেখে স্রেফ মুখ টিপে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। এই দুই ফ্যামিলির এতগুলো বেডরুমে একটাও এমন জায়গা নেই, যেখান থেকে মারণ গ্যাসটা আসতে পারে। তবে এই বদ্ধ ঘরগুলোয় দু-দুটো গ্যাস একসঙ্গে ঢুকছে কী করে। কোনপথেই বা আসছে। ওরা ভূপেন্দ্র'র বাড়ির ভেতরে, বাইরে সব কিছু চেক করেছে। সেখানেও কিছু নেই। এখানেও কিছু নেই।

"চলো, বাইরেটা একটু দেখে আসি। মিস্ অরোরা, আপনি এখানেই থাকুন।"

অর্ণবের দিকে কথাটা ছুড়ে দিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল অধিরাজ। তার মুখে বিরক্তি। নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে। এখন একমাত্র ভরসা এই এয়ার পিউরিফায়ারগুলো। এছাড়া গোটা ব্যাপারটাই হেঁয়ালির মতো ঠেকছে। আদতে যে কী হচ্ছে

তা কিছুতেই বের করতে পারছে না। একটা লোক দু-দুটো গ্যাসের কন্টেনার এনে গ্যাসগুলোকে রিলিজ কী করে করছে? তাও একেবারে বেডরুমগুলোতেই! আজ দ্বিতীয় রাত। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা প্রায় পূর্ণ হওয়ার পথে৷ সে মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। বার্নিং শিখও হাত পা গুটিয়ে বসে নেই। সে কোনো-না কোনো বাড়িতে অ্যাটাক করবেই। কিন্তু কোথায়? কীভাবে?

ভেতরের মতো বাইরে থেকেও বাড়িটাকে আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখল ওরা। যদি কোথাও কোনোরকম গোপন ট্র্যাক থেকে থাকে। এসির আউটডোর ইউনিটটাও যথারীতি দেখল। ঘুলঘুলি কিংবা জানলাগুলো যদি বাইরে থেকে খোলা যায় সে চেষ্টাও করল ওরা। কিন্তু ভেন্টিলেটরগুলোকে ভেতর থেকে এমন এঁটে বন্ধ করে দিয়েছে যে খোলাই দায়। জানলাও বাইরে থেকে খোলে না। তবে?

শেষপর্যন্ত একরকম ঘেমেঘুমে অস্থির হয়ে হাল ছেড়ে দিল অধিরাজ। আশ্চর্য ব্যাপার। কোথাও কিচ্ছু নেই। এ বাড়িতে বাইরে থেকে গ্যাস ইনসার্ট করা অসম্ভব। ভূপেন্দ্র দত্তা'র ফ্ল্যাটেও তাই। তবে কি এবার কোনো নতুন ওয়েপন আমদানি হতে চলেছে। হয়তো গ্যাসের বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করবে সে। তাই বা কী করে হয়! এতখানি প্যাটার্ন চেঞ্জ ও করবে বলে মনে হয় না। অধিরাজ অন্যমনস্কভাবেই ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট থেকে একটা লম্বা স্টিক বের করে আনে। সেটাকে আপনমনেই ঠোঁটে গুঁজে আস্তে আস্তে বলল, "থিঙ্ক মিঃ ব্যানার্জি। থিঙ্ক। কী হচ্ছে আসলে... কী হচ্ছে? লাইটে কোনো গোলমাল নেই, ঘরে কোনো সিক্রেট প্যাসেজ বা হোল নেই, ভেন্টিলেটর দিয়েও গ্যাস ঢোকানো সম্ভব নয়... তাহলে লোকগুলো মরছে কী করে?" বেশ কিছুক্ষণ অস্থির পায়ে সে বাড়ির বাইরে হাঁটাহাঁটি করল। একটা আস্ত কিংসাইজ সিগারেট শেষ করতে যতক্ষণ সময় লাগে ঠিক ততক্ষণই উঠোনের এ মাথা থেকে ও মাথা ছটফট করতে করতে হেঁটে বেড়াল অধিরাজ। ঘড়ির কাঁটাও থেমে নেই। সময় এখন সাড়ে সাতটা ছাড়িয়ে পৌনে আটটার দিকে চলেছে। চতুর্দিকে চাপ চাপ অন্ধকার ছেয়ে আছে। ওঁত পেতে আছে কালরাত্রি। আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই এ বাড়ির লোকেরা ডিনার সেরে ঘুমোতে যাবে। কিন্তু সে ঘুম আর ভাঙবে কিনা সে বিষয়ে এখনও অনিশ্চিত! এতগুলো মানুষের প্রাণরক্ষা করার দায় তার ওপরে। অথচ সে নিজেই বিশ বাঁও জলে।

অন্ধকারে অধিরাজের মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল না অর্ণব। কিন্তু শুনতে পেল তার দৃঢ়স্বর। সে আপনমনে নিজেকেই বলছে, "ওকে ফাইন। যে অঙ্কটা মিলছে না, সেটা থাক। কিন্তু যেটা মিলবে, সেটাকেই ট্রাই করা যাক।"

কোন্ অঙ্কটা মিলবে! অর্ণব আকাশ থেকে পড়ে। এখনও পর্যন্ত সব অঙ্কই তার দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। কোনোটা মেলার সম্ভাবনা তো দেখাই যাচ্ছে না। তবে কোন্ অঙ্ক মেলাতে চায় অধিরাজ!

সে কিছু বলার আগেই অধিরাজ ফের মোবাইলে কার নম্বর যেন ডায়াল করল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ইয়েস, পবিত্র। কোথায় তুমি?"

ওপ্রান্ত থেকে পবিত্র-র কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "রাস্তার উলটোদিকের বাড়িটার গ্রাউণ্ড ফ্লোরে তাকাও মামা! আমি তোমার নাকের সামনেই বসে আছি। উঠোনে সিগারেট খেতে খেতে পায়চারি করছ, অথচ তোমার স্পেশাল ওয়ান কিছু বলছে না কেন, সেটাই ভাবছি। কাঁধের অলঙ্কারটি আগেই দেখেছিলাম, মাথারটা কি কোমল কৌরের বাড়ির ব্লাস্টে হল? বাই দ্য ওয়ে, লুকিং ট্রিমেন্ডাস হ্যান্ডসাম ইন ব্লু শার্ট।"

"থ্যাঙ্কস।" অধিরাজ সিরিয়াস, "যদি বউদি বা সানি লিওনিকে নিয়ে ব্যস্ত না থাকো, তাহলে তাড়াতাড়ি চলে এসো।"

"কিছু ঘটতে পারে?"

"হোপ সো। কাম শার্প।"

বলেই সে ফোনটা কেটে দিয়ে সিগারেটটা ফেলে গটগট করে পি সি চৌধুরীর বাড়ির

মধ্যে ফের ঢুকে গেল। তার চোয়াল শক্ত, কোনো অজানা সংকল্পে বদ্ধপরিকর। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা বসার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। সেখানে চৌধুরী সাহেব, পরিমল আর মেঘনা চিন্তিত মুখে বসেছিল। শিবুও নিজের বকেয়া টাকার অপেক্ষায় চুপচাপ বসে আছে। শিখার কাজ শেষ। সে বোধহয় বেরিয়ে যাচ্ছিল, তার আগেই তাকে আটকাল অধিরাজ, "দু-মিনিট পরে যাবেন। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

শিখা কোনো কথা না বাড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। টুইঙ্কলও সেখানেই উপস্থিত। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিখাকে দেখছে। রান্নাঘর থেকে গরম তেলের ঝাঁঝালো সুগন্ধ ভেসে আসছে, সঙ্গে হাতা-খুন্তির আওয়াজ। কমলা এখনও শ্লথগতিতে রান্না করছে। ফিজিওথেরাপিস্ট রাজীব চন্দও ততক্ষণে আজকের সেশন শেষ করে বাইরের ঘরে এসেছেন। তিনি নীচু স্বরে নার্সরূপী মিস্ বোসকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তাকেও আটকাল অধিরাজ, "প্লিজ, এখন ঘর থেকে কেউ বেরোবেন না। কয়েকটা রুটিন প্রশ্ন করে নিই।"

রাজীবের চোখে বিস্ময় ভেসে ওঠে, "আপনারা?"

"সি.আই.ডি., হোমিসাইড। প্লিজ কো-অপারেট।"

বলতে বলতেই সে তাকাল পরিমলের দিকে, "মিঃ জুনিয়র চৌধুরী, আপনার ব্যাবসাটা কীসের? হার্ডওয়্যারের না?"

"হ্যাঁ স্যার।"

পরিমল শান্তস্বরেই বলল। অর্ণব তাকে একদৃষ্টে দেখছিল। সত্যিই তার চেহারাটা টিপিক্যাল বাঙালি ছেলেদের মতো একেবারেই নয়। কোনো অবাঙালি মা-বাবার সন্তান হওয়ার চান্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট। যদি সে বাংলায় কথা না বলত, তবে তাকে অন্য কোনো প্রদেশের লোক বলেই ভুল হত। কৌশানী ঠিকই বলেছে।

"কতদিন ধরে হার্ডওয়্যারের বিজনেস করছেন?"

বন্দুকের গুলির মতো প্রশ্ন ছুটে গেল। পরিমল একটু অবাক হয়েই বলে, "বহুবছর এ লাইনে আছি। কেন?"

"আপনার শোরুমে তালা চাবি নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। সবই ব্র্যান্ডেড রাখেন না লোকালও থাকে?"

এই প্রশ্নগুলো করার অর্থ কী। পরিমলের চেয়েও বেশি অবাক হচ্ছিল অর্ণব। উত্তরদাতাকে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগও দিচ্ছে না অধিরাজ। এ যেন র‍্যাপিড ফায়ার কোয়েশ্চেনিং চলছে। কিন্তু সে মুখের স্বাভাবিকভাব বজায় রাখে। পরিমল ফের নম্রসুরে জানাল, "ব্র্যান্ডেড মালের পাশাপাশি লোকাল জিনিসও রাখতে হয় স্যার। সবাই তো ব্র্যান্ডেড লক্ অ্যাফোর্ড করতে পারে না। অনেকেই কম দামি জিনিস চায়। তাই লোক্যাল প্রোডাক্টও থাকে।"

"তা ঠিক।" অধিরাজ একদৃষ্টে তার চোখে চোখ রেখে বলল, "নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে অনেক লকস্মিথেরও কানেকশন আছে। তালা-চাবি যখন আপনার দোকানের অন্যতম প্রোডাক্ট, সেক্ষেত্রে অনেক সময় চাবি বানানোর জন্য বা লোক্যাল লক্-কি আনানোর জন্য লক্স্মিথদের শরণাপন্ন হতেই হয়, তাই না?"

এবার সে হেসে ফেলল, "হ্যাঁ। সেটাই স্বাভাবিক। অনেক কাস্টমার আবার একটা চাবিতে খুশি হন না, একাধিক চাবির ডিমান্ড করেন। সেজন্য তালা-চাবিওয়ালা, আই মিন লকস্মিথের শরণাপন্ন তো হতেই হয়। অনেকে আবার অত্যাধুনিক লক কিনে তালেগোলে ভেতরে চাবি রেখে বাইরে থেকে দরজা টেনে দেন। ব্যস, দরজা আটকে যায়। তখন আমাকেই দৌড়োতে হয় চাবিওয়ালা নিয়ে। অত দামি তালা তো কথায় কথায় ভাঙা যায় না! সেক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট কি-ই ভরসা।"

"আপনার লকস্মিথের নাম কি গুলশন সিং?"

এবার যেন চমকে উঠল পরিমল। একটু আমতা আমতা করে বলল, "পুরো নামটা জানি না। তবে ওকে গুল্লু নামেই চিনি। ওই নামটাই ও ইউজ করে।"

গুল্লু! নামটা শুনেই আঁতকে উঠেছে অর্ণব! এই কানেকশনটা বের করলেন কী করে স্যার! খুনি তো তবে একেবারে বাড়ির ছেলের কাঁধেই বেতাল হয়ে বসে আছে। অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার কী!

"কতদিন ধরে চেনেন তাকে?"

"প্রায় একবছর হল। খুবই ভালো লক স্মিথ। কাজেরও বটে। কম দামে সবরকমের কাজ উৎরে দেয়।"

"গুল্লু আপনার বাড়িতে কতবার এসেছে? ওকে কি আপনি কোনোরকমের আধুনিক লক বা ল্যাচ বাইপাসিং টুল গিফট করেছেন?"

এবার পরিমল একটু নার্ভাস হয়ে যায়, "গুল্লু বাড়িতে আসে না স্যার। ও আমার অফিসেই দেখা করে। কখনো-কখনো ক্লায়েন্টও নিয়ে আসে, তার জন্য পার্সেন্টেজ দিই ওকে আমি। আর আপনি ঠিকই বলেছেন। ওকে ল্যাচ বাইপাসিং টুলও দিয়েছি। কিন্তু এগুলো তো প্রোফেশনাল ব্যাপার....!"

সে আরও কিছু বলতেই যাচ্ছিল, তার আগেই অধিরাজ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল পবিত্রও দরজার সামনে এসে নীরবে দাঁড়িয়েছে। পরিমলকে কথাটা সম্পূর্ণ করতে না দিয়েই সে হঠাৎই চেঁচিয়ে ওঠে, "বো-লে সো নি-হা-ল!"

স্যারের এরকম উদ্ভট কাণ্ডে অর্ণব হকচকিয়ে যায়। বাড়ির লোকেরাও সবাই থতমতো খেয়ে গিয়েছে। আচমকা কথার মাঝখানেই অধিরাজ অপ্রাসঙ্গিকভাবে চেঁচিয়ে ওঠায় প্রত্যেকেই বিস্মিত। কী জন্য, কেন এই আকস্মিক চিৎকার তা কেউই বুঝে উঠতে পারেনি। মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য প্রত্যেকেই যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। কিন্তু বিস্ময়ের তখনও কিছু বাকি ছিল। এরপর যা ঘটল তাতে অর্ণব, পবিত্র, এমনকি মিস্ অরোরারও রক্তহিম হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অধিরাজের স্পেশাল 'ওয়ার ক্রাই" এর উত্তরে একটি পুরুষকণ্ঠ সিংহের মতো গর্জন করে উঠল, "সৎ-শ্রী, অকাল।"

ঘটনার আকস্মিকতায় উপস্থিত সকলের মাথাতেই যেন বাজ ভেঙে পড়ে। প্রত্যেকেই এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে যে এই উত্তরটা এল কোথা থেকে টুইঙ্কল ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "স্যার, আমি কিছু বলিনি।"

"আমি জানি আপনি কিছু বলেননি মিস্ অরোরা।" একমুহূর্তও সময় নষ্ট না করে অধিরাজ কিচেনের দিকে ছুটল, "আওয়াজটা রান্নাঘর থেকে এল।"

অর্ণব স্তম্ভিত। রান্নাঘর থেকে পুরুষকণ্ঠে শিখদের ওয়ার ক্রাইয়ের জবাব এল। তার মানে কমলা। ঐ চরম শ্লথ, কুঁজো হয়ে যাওয়া বুড়ি, গড।

আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে অর্ণব, পবিত্র ও টুইঙ্কলও দৌড়োল রান্নাঘরের দিকে। বিদ্যুৎগতিতে তিনজনের হাতেই উঠে এসেছে রিভলবার। একরকম হুড়মুড়িয়েই চারজন গিয়ে দাঁড়াল কিচেনের দরজার সামনে। কিন্তু...!

কেউ কিছু করার আগেই দেখা গেল, বয়েসের ভারে ন্যুব্জ, কুব্জ কমলা একেবারে সটান সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে! স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে ধুরন্ধর প্রতিদ্বন্দ্বীর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। অসতর্কতার মুহূর্তে মুখ দিয়ে ফস্ করে অভ্যাসবশতই বেরিয়ে গিয়েছে আজন্ম পরিচিত শব্দটা। অধিরাজের চালাকিটা ধরতে পারেনি সে। তার কোঁচকানো মুখে ভয়াবহ আফসোস এবং প্রচণ্ড রাগ ক্রুর রেখা টেনে দিল। পবিত্র তার দিকে এগিয়েই যাচ্ছিল, তার আগেই অধিরাজ চেঁচিয়ে উঠল, "না...না। সামলে ...।" পবিত্র চোখের পলক ফেলারও সময় পেল না। যাকে এতদিন চূড়ান্ত ঢিলে বলে জানত সবাই, সে-ই তড়িৎগতিতে গরম কড়াইটা তুলে নিয়ে ওদের দিকে এক কড়াই টগবগে ফুটন্ত গরম তেল ছুড়ে দিয়েছে। অধিরাজ পবিত্রকে হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিলেও সামান্য গরম তেল ছিটকে গিয়ে তার হাতের ওপর পড়ল। পবিত্র কাতরে ওঠে, "উঃ!"

রক্ষা পায়নি টুইঙ্কলও। কিছুটা ফুটন্ত তেল তারও পায়ের ওপর পড়েছে। কিন্তু বুট জুতোর কল্যাণে এ যাত্রায় বেঁচে গেল। সে দাঁতে দাঁত পিষল, "সা-লা। তেরি তো....!"

টুইঙ্কল আর অর্ণব এক পা এগিয়ে যেতেই কোণঠাসা বুড়ি এবার কিচেনের ওপর থেকেই কী যেন মুঠো করে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে ওদের দিকে। অর্ণব শুনতে পেল অধিরাজের নির্দেশ, “ডাক। ডাক।”

সে কথাটা শোনামাত্রই ডাক করল। কিন্তু লাল রঙের গুঁড়ো জিনিসটা মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিচ্ছে বুড়ি ওদের দিকে। পুরো কিচেনেই উড়ছে সেই লাল রঙের ঝাঁঝালো পাউডার। নাকে মুখে জ্বালা ধরছে। কিছুটা এসে অর্ণবের চোখের ওপরের পাতায় পড়া মাত্রই প্রবল জ্বালা করে উঠল। এক মুহূর্তের জন্য তীব্র দংশনের জ্বালা অনুভব করল সে। ঠিকমতো কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুখের নরম চামড়ায় আরও এক দফা রক্তিম পাউডার এসে ছিটকে পড়েছে। অসম্ভব জ্বলছে! অর্ণবের মনে হল, সে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখ খুলতেই পারছে না!

মিস্ অরোরার মুখেও এসে পড়েছিল সেই পাউডার। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, তার যেন কোনো অনুভূতিই নেই! সে হাত দিয়ে মুখের লাল পদার্থ মুছে বলল, “চেষ্টাটা ভালো ছিল। কিন্তু এর চারগুণ বেশি লঙ্কা আমি লাঞ্চে খেয়ে থাকি। অ্যান্ড ফর ইওর কাইন্ড ইনফর্মেশন, আই অ্যাম আ হাই ক্যাপসাইসিন টলারেন্ট। আমার সারা মুখে তিখি মির্চির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেও আমি কিছুই ফিল করতে পারি না। কিন্তু মির্চি লাগার টাইম এবার তোর।”

বলতে বলতেই সে এগিয়ে গিয়ে একটা জোরদার ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে তার চোয়ালে। কমলা সেই জোরদার পাঞ্চ খেয়ে বাসনপত্র সহ উলটে পড়ল কিচেনের মেঝেতে। হাত থেকে ছিটকে পড়ল লঙ্কাগুঁড়োর প্যাকেট। টুইঙ্কল উত্তেজিত, “লগি ক্যায়া?”

তার উত্তরে ওর মাথা লক্ষ্য করে একটা স্টিলের বড়ো ডেকচি ছুড়ে মারল কমলা নিখুঁত টিপ। ডেকচিটা একেবারে সজোরে এসে লাগল টুইঙ্কলের মাথার বাঁ দিকের রগে। একমুহূর্তের জন্য সে-ও চোখে অন্ধকার দেখল। সেই ফাঁকেই স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতোই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বৃদ্ধারূপী বার্নিং শিখ। সে হেসে বলল, “অব লগি।”

... কিচেনের জানলায় কোনোরকম শিক জাতীয় কিছু ছিল না। কাচের স্লাইডিং পাল্লা ওপরে তুলে দিয়ে ঐ লুজবুজে বৃদ্ধা যেভাবে ক্ষিপ্রবেগে জানলা গলে বাইরের দিকে লাফিয়ে পড়ল তা দেখেই অর্ণব হাঁ! ততক্ষণে কিচেনের শোরগোল শুনে কৌশানী বোসও চলে এসেছে অকুস্থলে। সে-ও কমলার লাফ দেখে ব্যোমকে গিয়েছে। অধিরাজও কমলার পেছনে দৌড়ে যেতে যেতে বলল, “যারা যারা ‘পার্কোর’ জানেন তারা আমার পেছনে আসুন। বাকিরা গলি দিয়ে চেজ করুন। ব্লু টুথে কনফারেন্সে কানেক্টেড থাকুন।”

বলতে বলতেই সে-ও নিজের দীর্ঘদেহটাকে প্রায় বিড়ালের মতো নমনীয়তায় কুঁকড়ে নিয়ে ভল্ট খেয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে ঠিক পাশের বাড়ির কার্নিশে লাফিয়ে পড়ল। পার্কোর একটা অদ্ভুত ধরনের স্পোর্টস। এর ট্রেনিং থাকলে যে কেউ উঁচু-নীচু, ট্যারা-ব্যাকা সারফেসের ওপর দিয়ে অসম্ভব দ্রুতবেগে চলে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, যেখানে দৌড়বার জন্য আদৌ কোনো পথ নেই, সেখান দিয়েও একজন পার্কোর এক্সপার্ট অনায়াসে বেরিয়ে যায়। নির্দিষ্ট কোনো রাস্তা নেই। স্রেফ এ পয়েন্ট থেকে বি পয়েন্টে প্রতিযোগীকে পৌঁছতে হবে। তার জন্য লং জাম্প, হাই জাম্প, মারাত্মক ভল্ট, সামার সল্ট, অ্যাক্রোব্যাটিকস, জিমন্যাস্টিক্স, সবই চলবে। এর জন্য রীতিমতো ট্রেনিং লাগে, আর লাগে সাহস। অধিরাজ নিজেই ‘পার্কোরে’ মহারথ হাশিল করে বসে আছে। অর্ণবও এই কলা কিছুটা জানে। তাই সে-ও পেছনে দৌড়োল। সবচেয়ে অবাক করল কৌশানী। অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল তার দেহটাও একেবারে মাপা স্পিডে মসৃণ একটা ভল্ট খেল। অর্থাৎ ইনিও পার্কোর স্পেশালিস্ট!

বার্নিং শিখ প্রথমে ভেবেছিল যে হয়তো এরা কেউ তাকে চেজ করতে পারবে না। কিন্তু এবার সে-ও সভয়ে দেখল ঐ আলো-আঁধারির মধ্যেই তিনজন অফিসার বাঘের মতো তাকে চেজ করছে। অধিরাজের দেহটা কখনও লাট্টুর মতো বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে শূন্যে উড়ছে, কখনও বা লম্বা লাফ মেরে অবলীলায় সমস্ত বাধা পেরিয়ে যাচ্ছে। সরু কার্নিশ বেয়ে

এমন স্বচ্ছন্দে দৌড়চ্ছে যেন ওটা কার্নিশ নয়, গড়ের মাঠ। এক মুহূর্তের জন্য সে মুগ্ধ হয়ে আপনমনেই বলে উঠল, "ওয়াঃ!" তারপরই সম্বিত ফিরে পেয়ে প্রাণ বাঁচাতে এক ছাত থেকে আর এক ছাতে লাফিয়ে চলে গেল। এই অঞ্চলটায় জনবসতির ঘনত্ব তুলনামূলক বেশি হওয়ায় একটা বাড়ি থেকে আর একটা বাড়ির ছাত কিংবা কার্নিশ বেশ কাছাকাছি। সেই সুযোগটাই নিল বার্নিং শিখ।

পবিত্র আর টুইঙ্কল পার্কোরে তেমন দক্ষ নয়। কিন্তু ওরাও হাল ছাড়েনি। টুইঙ্কলের মুখ এখনও চিলি পাউডারে লাল। পবিত্র'র হাতে ভীষণ জ্বালা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা সরু গলিঘুঁজি দিয়ে সমান বেগে দৌড়ে চেজ করছে অপরাধীকে। দৌড়োতে দৌড়োতেই পবিত্র চেঁচিয়ে বলল, "লোকেশন কী রাজা?"

"ছাত থেকে ছাতে লাফিয়ে লাফিয়ে সোজা যাচ্ছে।"

অধিরাজ একটা লম্বা লাফ মেরে এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য ছাতে অনায়াসে ল্যান্ড করে দৌড়োতে দৌড়োতেই বলল, "গো স্ট্রেট।" "আয় আয় স্কিপি...।"

পবিত্র ছুটন্ত অবস্থাতেই আগ্নেয়াস্ত্রটা ওপরের পলায়নরত খুনির দিকে তাক করল।

কিন্তু এভাবে ওকে শ্যুট করা প্রায় অসম্ভব। একেই রাতের অন্ধকার প্রেক্ষাপটে লোকটাকে ঠিকমতো দেখাই যাচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে একটা ছায়া স্রেফ এক বাড়ির ছাত থেকে অন্য বাড়ির ছাতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। বাড়িগুলোয় বা আশেপাশের স্ট্রিটলাইটের আলো নিশানা লাগানোর জন্য যথেষ্ট নয়। তার ওপর তার পেছনেই আরও তিনটে ছায়ামূর্তি ধাবমান। মুহূর্তের মধ্যেই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পজিশন। বার্নিং শিখের খুব কাছাকাছি রয়েছে অধিরাজ। সে একেবারে শিকারী চিতার মতো নমনীয় মসৃণ ভঙ্গিতে লোকটাকে চেজ করছে। কখনও শূন্যে ভল্ট খাচ্ছে, কখনও কার্নিশ থেকে কার্নিশে লাফিয়ে পড়ছে, আবার কখনও বা পাইপ বেয়ে বেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এগোচ্ছে। তার ছায়াদেহ জলের ট্যাঙ্কের ওপর থেকে নিখুঁত অঙ্কে লাফ মারছে অন্য বাড়ির ছাতে। মুহূর্তের ভুলে বুলেটটা তার গায়েও লাগার ঝুঁকি আছে। পবিত্র হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। এভাবে শ্যুট করা যাবে না!

জীবনে এই প্রথম রুফটপ চেজিং করল অর্ণব। এর আগে তার অভিজ্ঞতা ছিল না। সে সবিস্ময়ে দেখছিল, কমলা ওরফে বার্নিং শিখ কী দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির ছাত ক্রস করে চলে যাচ্ছে। দেখলে কেউ বলবে, যে আগের দিনই সে উরুতে একটা গুলি খেয়েছে! একটুও খোঁড়াচ্ছে না! তবে দৌড়োতে দৌড়োতেই একটু থেমে গেল। যে ছাতে এখন গিয়ে পড়েছে সেখান থেকে অন্য বাড়িটা একটু দূরে। সে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। পরক্ষণেই কোথা থেকে একটা মই জোগাড় করে দুই বাড়ির মাঝখানে রেখে তার ওপর দিয়ে অবিকল মাকড়সার মতো বেয়ে চলে গেল। অধিরাজের দেহটা জিমন্যাস্টিক শিল্পীদের মতো হাওয়াতেই দুটো মারাত্মক ভল্ট খেল। নিখুঁত টাইমিং এ অনায়াসেই ল্যান্ড করল মইটার ওপরে। বার্নিং শিখ তবু চার হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঐ দূরত্বটা অতিক্রম করেছিল। অধিরাজ সেসবের তোয়াক্কা না করে একটা লাফ মেরে ক্রস করে গেল মইটাকে। তার পেছন পেছন কৌশানী। সে লাফিয়ে না গেলেও এমনভাবে মইটার ওপর দিয়ে ছুটছে যেন ব্যাপারটা নিতান্তই জলভাত! অর্ণব মনে মনে তার প্রশংসা না করে পারল না! পার্কোর জিনিসটা অত সহজ নয়। মেয়েটা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে আচ্ছা আচ্ছা পুরুষ অফিসারদেরও চোখ কপালে উঠবে।

বার্নিং শিখ সোজা যেতে যেতেই আচমকা এবার বাঁদিকের একটা গাছে লাফিয়ে পড়েছে। অধিরাজের নির্দেশ ব্লু-টুথ ইয়ারসেটের মাধ্যমে পৌঁছে গেল সবার কাছে, 'টেক লেফট টার্ন।"

"কপি দ্যাট।"

অর্ণবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই অধিরাজ গাছের একটা ডালে লাফিয়ে পড়ল। পরক্ষণেই ফের আর একটা ডিগবাজি খেয়ে অন্য একটা বাড়ির জলের ট্যাঙ্কে। পেছন পেছন সমান তালে মিস্ বোসও। ওদের দু-জনকে দেখলে সন্দেহ হয় আদৌ ওদের দেহে একটাও হাড়

আছে কিনা! যেভাবে সাবলীল ছন্দে কখনও ভল্ট খাচ্ছে, কখনও জিমন্যাস্টিক এক্সপার্টদের মতো কার্নিশ বেয়ে, কখনও জানলা বেয়ে হাতের ভর দিয়ে উঠছে নামছে, লম্বা লাফ মেরে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে লাফিয়ে পড়ছে, তাতে মনে হয় এখানে ট্র্যাপিজের খেলা চলছে! অর্ণব নিজেও 'পার্কোর' জানে। কিন্তু সে স্বীকার করতে বাধ্য হল, এ বিষয়ে অধিরাজ ও কৌশানী মহাগুরু! স্পিডে সে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

বার্নিং শিখ এবার একটা বাড়ির কার্নিশ থেকে অন্য একটা বাড়ির মাথায় লাফিয়ে পড়তেই বিপত্তি ঘটল। অন্ধকারে সে বুঝতে পারেনি যে যে বাড়িটার ছাতে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে, সেখানে অন্যদের মতো ছাতই নেই। বরং বিদেশি স্টাইলে পুরোটাই শৌখিন টালি দিয়ে কভার করা। এবং বেশ ঢালু। ল্যান্ডিংটা ঠিকঠাকই করেছিল। কিন্তু ফ্যান্সি টাইলস্ তার ওজন আর চাপ নিতে না পেরে ভেঙে গেল। তার সামনের টালিগুলো চাপ খেয়ে আচমকাই সরে গিয়েছে। সে পা পিছলে ওখানেই উলটে পড়ল। ঠিকমতো উঠে দাঁড়ানোর আগেই তার ঠিক পাশেই এসে ল্যান্ড করল অধিরাজ। কোনোরকম রি-অ্যাক্ট করার আগেই কমলারূপী খুনিকে চেপে ধরল সে। হিংস্র গলায় বলল, "আর কত পালাবি! একটু তো নিজেদের ফ্যানদের দর্শন দিয়ে যা!"

কমলা সজোরে হেসে উঠে অধিরাজকে সপাটে এক ঘুষি মেরেছে। অধিরাজ ও ছাড়ার পাত্র নয়। সে হিটটাকে ডজ করে লোকটার টুটি চেপে ধরেছে। তার লৌহকঠিন বাহুর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়ানোর জন্য ছটফট করছে বার্নিং শিখ। দু-জনের হাতাহাতিতে ফ্যান্সি লাল টালির ছাত ভেঙে চুরে যাচ্ছে। সবচেয়ে বিপদের কথা, টালিগুলো এবার ধরধর সরসর করে নীচের দিকে পড়তে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে দু-জন মানুষও নীচের দিকে অনেকটাই নেমে যায়! এই বুঝি দু-জনেই জড়াজড়ি করে সপাটে নীচে আছড়ে পড়ল!

অর্ণব চেঁচিয়ে ওঠে, "আচার্য স্যার, ওঁরা দু-জনেই নীচে পড়ে যেতে পারেন। অ্যালার্ট থাকুন।"

"এগজ্যাক্ট লোকেশনটা বলো।" ও প্রান্ত থেকে পবিত্র-র গলা ভেসে আসে, "দুটো মারামারি কোথায় করছে?"

"লাল টালির বাংলোটা দেখুন।"

"গট ইট।"

লাল টালির বাংলোটাকে শনাক্ত করতে একটুও কষ্ট হল না ওদের। তার ওপর ছাত থেকে ধুপধাপ করে টালির সারি মাটিতে আছড়ে পড়ে সশব্দে ভেঙে খানখান হচ্ছে। সেই শব্দে বাড়ির লোকেরাও সচকিত হয়ে ব্যালকনিতে ছুটে এসেছে। তারা সকলেই সবিস্ময়ে ঘাড় উঁচু করে দেখল, বাড়ির ছাতে দুটো লোকের মরণপণ সংগ্রাম চলছে। কিন্তু দু-জনের কেউই ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারছে না, কারণ অস্থির, পিচ্ছিল টালি পিছলে পিছলে যাচ্ছে। পায়ের চাপে মটমট করে ভেঙে যাচ্ছেও বটে। ফলস্বরূপ দু-জনই ব্যালান্স রাখতে না পেরে বারবার পড়ে যাচ্ছে।

পবিত্র সভয়ে দেখল অধিরাজ একটুর জন্য পা ফস্কে নীচে আছড়ে পড়তে পড়তে কোনোরকমে একটা পাইপ আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচিয়েছে। তার পাশ দিয়ে নেমে এসেছে আইভি লতার বেশ মোটা ঝাড়। কোনোমতে লতার গোছা চেপে ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। ছ-ফুট চার ইঞ্চির লম্বা দেহটা আপাতত বিপজ্জনকভাবে শূন্যে ঝুলছে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, "রাজা!... সামলাও ...!"

বার্নিং শিখ এবার মুক্তি পেয়ে ফের উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু সেও ঐ ক্রমাগতই সরে যাওয়া টালির ওপরে পা রাখতেই পারছে না। ওদিকে নাছোড়বান্দা অধিরাজ হাতের ওপর জোর দিয়ে লতা বেয়ে ফের ওপরে ওঠার অদম্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে! আফসোসে ঠোঁট কামড়াল খুনি! হিসাবে বড্ড ভুল হয়ে গেল। কে জানত এই লোকটাও 'পার্কোর' এক্সপার্ট। এরকম রুফ টপ চেজিং, তাও রাতের অন্ধকারে মোটেই সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাও এই মানুষটা এবং তার টিম করে দেখাল। এখন তার 'জলে কুমীর ডাঙায়

বাঘ' পরিস্থিতি। ঘাড়ের ওপর অধিরাজ ব্যানার্জি নিঃশ্বাস ফেলছে। যে কোনো মুহূর্তে ফের নিজেকে সামলে নিয়ে চেপে ধরবে। ওদিকে সামনের ছাতে তার টিমমেটরা দাঁড়িয়ে আছে। নীচে লাফিয়ে পড়ারও উপায় নেই। সেখানেও দুই পুলিশ অফিসার আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে।

মরিয়া হয়ে শেষপর্যন্ত নীচেই লাফিয়ে পড়ল বার্নিং শিখ। অধিরাজও ততক্ষণে হাতের জোরে ঝুলতে ঝুলতে পৌঁছে গিয়েছিল ও বাড়ির ব্যালকনিতে। সদস্যদের দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রস্তুত স্বরে বলল, "স্যরি।"

আর স্যরি। বাসিন্দারা ততক্ষণে প্রায় ফেইন্ট হতে চলেছে। শব্দটা ছুড়ে দিয়েই সে যথারীতি মার্জার প্রজাতির প্রাণীদের মতো নমনীয় ডিগবাজি খেয়ে একতলার কার্নিশে ল্যান্ড করল। পরক্ষণেই আবার ভল্ট। এবার একদম মাটিতে, একেবারে বার্নিং শিখের ঘাড়ের ওপরে। নিষ্ঠুর লোকটা প্রমাদ গুণল। সামনে উদ্যত রিভলবার, পেছনে

অধিরাজের বজ্রমুষ্টি। সে দাঁতে দাঁত পিষল। অর্ণব সভয়ে দেখল ফের তার হাতে ঝিকিয়ে উঠেছে সেই মারাত্মক কৃপাণ। "পবিত্র ড-জ।"

পবিত্র তার আক্রমণকে ডজ করলেও তার গলার একপাশে আলতো করে চুম্বন করল ধারালো ইস্পাতের ফলা। সে কাতরোক্তি করে ওঠে। পরমুহূর্তেই একটা রক্তের রেখা ফুটে উঠেছে গলার ডানদিকে। মিস্ অরোরাও এগিয়ে আসতেই ফের কৃপাণ আক্রমণ শানালো। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী নারী বলে আঘাতটা মারাত্মক হয়নি। স্রেফ তার কবজির ওপরের কিছুটা অংশ চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল অস্ত্রটা।

অবিন্যস্ত সি.আই.ডি. টিম নিজেকে সামলে নিয়ে প্রত্যাঘাত করার আগেই, লোকটা এবার টেনে দৌড় মারল। অধিরাজ দেখল যে রাস্তা দিয়ে ও এখন দৌড়চ্ছে, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মেইন রোডে গিয়ে পড়বে। অন্যদিকে অর্ণব আর কৌশানীও নেমে এসেছে নীচে। দু-জনেই হাঁপাচ্ছে। একেই রুফ টপ চেজিং মোটেই সহজ ছিল না। তার ওপর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও লোকটাকে টার্গেটে কিছুতেই পাওয়া গেল না! প্রত্যেকেই ঘামে স্নান করেছে। পবিত্র এবং টুইঙ্কল আহত! হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ফায়ার করতে পারছে না, কারণ এটা লোকালয়। যে গলি দিয়ে ও দৌড়চ্ছে, সেটা আদৌ জনহীন নয়। যথেষ্ট মানুষজনও, চায়ের দোকানের ভিড়ও আছে! তারা একজন বৃদ্ধ মহিলাকে এভাবে পাঁই পাঁই করে দৌড়োতে দেখে অবাক! "শ্যুট করা যাবে না।" পবিত্র হতাশ স্বরে বলল, "চেজই করি।"

"লেটস গো।"

ফের দৌড়োল টিম অধিরাজ। একজন বৃদ্ধার পেছনে পাঁচজনের একটা দলকে দৌড়োতে দেখে আশেপাশের জনগণ বুঝি বিস্মিত হতেও ভুলে গেল! অধিরাজ দৌড়োতে দৌড়োতেই বলল, "নিন। আপনার কচ্ছপ এখন চিতার মতো ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগে দৌড়চ্ছে মিস বোস!"

কৌশানী দাঁতে দাঁত চেপে স্প্রিন্ট টানতে শুরু করল। তার মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট যে মাথায় খুন চেপে গিয়েছে। পবিত্র শুনতে পেল অধিরাজের স্বর, "লোকটা মেইন রোডের দিকে দৌড়চ্ছে কেন তা বুঝেছ?"

"ভিড়ে মিশে যাবে বলে?" সে হাঁফাচ্ছে, "দাঁড়াও, তার আগেই পাকড়াও করছি শালাকে।"

"না। তুমি না।" অধিরাজের স্পষ্ট নির্দেশ ভেসে আসে, "লেডি অফিসাররা লিড করুন। আমার ধারণা ওর প্ল্যানটা কিঞ্চিৎ অন্যরকম। ও যেহেতু মেয়েদের ছদ্মবেশে আছে, তাই পুরুষেরা ওর পেছনে দৌড়লে ও 'গুণ্ডা গুণ্ডা' বা ঐ জাতীয় কিছু বলে রাস্তার ভিড়কে খেপিয়ে দেবে। আমরা যে সি.আই.ডি. হোমিসাইডের লোক, সেসব খুলে বলার আগেই লোকে আমাদের ধরে পেটাতে শুরু করবে। মেয়েদের ওপর যে রেটে ক্রাইম হচ্ছে তাতে পাবলিক খেপে আছে। যতক্ষণে তুমি এক্সপ্লেইন করবে ততক্ষণে ভিড় তোমায় 'প্রহারেণ

ধনঞ্জয়' দিয়ে দেবে। ও সেই ফাঁকেই পালাবে। যদি আমি ভুল না করি, তবে এটাই ওর প্ল্যান।"

"তবে?" অর্ণব বিচলিত, "লোকটাকে যেতে দেব?"

"না।" অধিরাজ দৌড়োতে দৌড়োতেই বলল, "ও যেটা এক্সপেক্ট করছে আমরা সেটা করব না। এখানে আমাদের লেডি অফিসাররাই কিছু করতে পারেন।" সে একটু থেমে দম নিয়ে বলে, "মিস্ বোস আর মিস্ অরোরা, আপনারা লিডে যান। একটা পয়েন্টে এসে ও নির্ঘাত চেঁচিয়ে বলবে, 'গুণ্ডা... গুণ্ডা' বা 'বাঁচাও... বাঁচাও'। ঠিক তখনই আপনারা দু-জনেই পালটা 'চোর চোর' বলে চেঁচামেচি জুড়ে দেবেন। পাবলিক দেখবে সামনে এক শাড়ি পরা বৃদ্ধা দৌড়চ্ছে, তার পেছনে দুই সুন্দরী মহিলা! বুড়ির কথা বিশ্বাস করবে না সুন্দরীদের, তা নিয়েই ওরা নিজেরাই কনফিউজ হয়ে যাবে। তবে সুন্দরী যুবতীদের ক্ষেত্রে সবসময়ই পাল্লা ভারি। সেই সুযোগটা আমরা নেব। আপনাদের কাজ হচ্ছে জনগণকে পালটা ওর বিরুদ্ধেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া। ক্লিয়ার?" ঐ পরিস্থিতিতেও অধিরাজের বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না অর্ণব। বার্নিং শিখের পরিকল্পনাকে আঁচ করে খুব সহজেই যেভাবে বুমেরাং বানিয়ে দিল তাতে প্রশংসা না করে থাকা যায় না! এইজন্যই লোকটা 'সুপারকপ ...।

"ওকে গার্লস।" সে চেঁচিয়ে ওঠে, "ফাস্টার... ফাস্টার... চেজ হিম।"

টুইঙ্কল অরোরা স্পিড বাড়াল। পুরো শিকারী বাঘিনীর মতো ক্ষিপ্রবেগে, ছন্দে দৌড়ে যাচ্ছে সে। পাশাপাশি কৌশানীও বুঝি হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছে। দুই লেডি অফিসার একেবারে উল্কার বেগে 'রে রে' করে তেড়ে যাচ্ছে কমলাকে লক্ষ্য করে। পেছন থেকে অধিরাজ চেঁচিয়ে ওদের উৎসাহিত করল, "বাঘ!...বাঘ...। কাম অন টাইগ্রেসেস। গো...গেট হি-ম!"

কমলা অর্থাৎ বার্নিং শিখ পেছনের দিকে না তাকিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছিল। সে আশা করেছিল পুরুষ অফিসাররাই নিঃসন্দেহে তাকে চেজ করছে। সুতরাং যেটা অধিরাজ আন্দাজ করেছিল, ঠিক সেটাই করল সে। যে মুহূর্তে মেইন রোডের শোরগোলময় রাস্তায় পড়ল, ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁ-চা-ও...বাঁ-চা-ও! ওরা আমায় মারবে! বাঁ-চা-ও!"

উপস্থিত মানুষজন কৌতূহলী হয়ে পেছনের দিকে তাকায়। এই শাড়ি-পরা নারীমূর্তিটির পেছনে কোনো মুষকো গুণ্ডা বা খুনি, ধেয়ে আসছে? কিন্তু এখানেই গল্পে ট্যুইস্ট। তারা সবিস্ময়ে দেখল, গুণ্ডার বদলে নার্সের সাদা পোষাক পরা এক অতীব সুন্দরী নারী ও প্যান্ট-শার্ট পরা এক টমবয় গোছের যুবতী মেয়ে ঐ বুড়ির পেছনে দৌড়চ্ছে। কিছু বোঝার আগেই তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে, "চো-র। চো-র! ধরুন!"

একদমই অপ্রত্যাশিত নারীকণ্ঠের এই কলরব শুনে বার্নিং শিখ একঝলক ফিরে পেছনের দৃশ্যটা দেখল। দেখামাত্রই বুঝি সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য সে থতোমতো খেয়ে গেল! এ তো পুরো উলটো বুঝলি রাম! নিজের অস্ত্রে নিজেই ঘায়েল। পুরুষ অফিসাররা ধারে কাছেও নেই, বরং এই মুহূর্তে লেডি অফিসাররাই তাকে চেজ করছে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল তার নিজের চালটাই উলটে গিয়েছে। আফসোসে নিজের গালেই থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করল তার। চেঁচানোর আগে দেখা উচিত ছিল পেছনে আসলে কে বা কারা চেজ করছে! সুন্দরী ও যুবতীরা স্বাভাবিকভাবেই পাবলিক অ্যাটেনশন বেশি পাবে।

"ঐ নড়বড়ে বুড়ি চোর! বলেন কী!"

দুটি মেয়েকে ওভাবে পড়িমরি করে দৌড়োতে দেখে কিছু অল্পবয়েসী দরদী জনগণ তাদের পিছু নিয়েছে। একজন সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করতেই টুইঙ্কল তার 'ইনোসেন্ট' ভাবটা কাজে লাগায়। চোখ কুম্ভীরাশ্রুতে ভরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "আমার ব্রেসলেট ছিনিয়ে নিয়েছে। ছুরিও মেরেছে! এই দেখুন...!"

তার হাত কৃপাণে কেটে গিয়েছিল। সে হাত তুলে রক্তাক্ত জায়গাটা দেখায়। উলটো দিক দিয়ে কৌশানী বোসও হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "কোনো বয়স্ক মহিলাকে এত জোরে দৌড়োতে দেখেছেন কখনও? কোন অ্যাঙ্গেলে ওকে আপনাদের নড়বড়ে বুড়ি বলে মনে

হচ্ছে। হি ইজ আ থিফ ইন ডিসগাইজ!"

মেয়েদের যুক্তি, রক্তাক্ত ক্ষত ও সর্বোপরি আবেদন সম্পূর্ণ কাজে লাগল। বার্নিং শিখ আতঙ্কিত হয়ে দেখল যে এখন আর হাতে গোণা কয়েকজন নয়, একেবারে একটা হিংস্র ভিড় তার পেছনে 'চোর চোর' করতে করতে দৌড়ে আসছে। মুহূর্তের জন্য তার মনে পড়ে গেল উনিশশো চুরাশির সেই ভয়াবহ 'মব'কে! কিছুক্ষণের জন্য সে বোধবুদ্ধিহীন হয়ে পড়ে। মস্তিষ্ক কাজ করছে না। তার মনে এমন আতঙ্ক জন্ম নিয়েছে যে হাত পায়ের পেশী শিথিল হয়ে আসছে। ... সেই ভিড় সেই নির্বোধ ভিড়কে ফের তার পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে ওরা...! এর হাত থেকে নিস্তার নেই...! তার কল্পনায় ভেসে উঠল রড, তরোয়াল নিয়ে ছুটে আসা আততায়ীদের ভিড়টা.......ছুটে আসছে...নেকড়ের দল ছুটে আসছে...... রক্ষা নেই.... ।

যখন এদিকে এতকিছু ঘটছে, ততক্ষণে পুরুষ অফিসাররাও এসে পড়েছে মেইন রোডে। টুইঙ্কল ও মিস্ বোসের অ্যাক্টিং দেখে অধিরাজ হেসে ফেলল, "ওঁরা দু-জনেই অস্কার ডিজার্ভ করেন দেখছি!"

অবস্থা দেখে পবিত্র চোখ কপালে তুলে ফেলেছে, "এভাবে ওকে ধরব কী করে? মব তো ওকে কেলিয়ে 'কেলাস' বানিয়ে দেবে। মালটাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।"

"অত সহজ নয় পবিত্র।" অধিরাজ দাঁড়িয়ে পড়ে কোমরে হাত দিয়ে শ্বাস টানতে টানতে বলল, "এবার ও আরও মারাত্মক, আরও ফেরোশাস হয়ে উঠতে পারে। ভিড়টাকে দেখে ওর যদি দিল্লির সেই ভয়াবহ ক্রাউডটাকে মনে পড়ে, আমি আশ্চর্য হব না। অত সহজে ধরা পড়বে না।"

"তবে?"

"লেডি অফিসাররা মাস্টারস্ট্রোক খেলে দিয়েছে।" সে এবার উলটোদিকের ফুটপাথের দিকে দৌড়য়, "এবার আমাদের পালা। এসো অর্ণব।"

"কিন্তু উলটো দিকে কেন?"

পবিত্র'র কথার উত্তর না দিয়ে অধিরাজ লেডি অফিসারদের নির্দেশ দেয়, "আপনারা ওকে তাড়িয়ে নিয়ে মোড়ের মাথায় পেট্রোল পাম্পের উলটোদিকের সিগন্যালের কাছে নিয়ে আসুন। আমরা ওদিকেই যাচ্ছি।" "ওকে স্যার।"

ও-প্রান্ত থেকে কৌশানী বোসের কণ্ঠ ভেসে এল। আর কথা না বাড়িয়ে ওরা তিনজনেই ছুটতে শুরু করেছে। যতক্ষণে বার্নিং শিখকে মেয়েরা তাড়া করে মোড়ের মাথায় নিয়ে আসবে, তার মধ্যেই ওদের ওখানে পৌঁছে যেতে হবে। অধিরাজ উলটো দিকের ফুটপাথ পেরিয়ে একটা সরু গলি ধরল। সে জানে এটা শর্টকাট। এই গলিটা একদম গিয়ে পড়বে ঐ মোড়েই। বার্নিং শিখ এখন ভিড়ের তাড়া খেয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে সোজা ওদিকেই দৌড়বে। তার বিশেষ এদিক ওদিক যাওয়ার সুযোগ নেই। এখন তার সামনে অন্য কোনো এস্কেপ রুটও নেই। তাই অতখানি যেতে সে বাধ্য। তবে তারপর মোড় থেকে টার্নিং পয়েন্ট আছে। তার আগেই সেখানে পৌঁছে যেতে হবে ওদের তিনজনকে।

দৌড়োতে দৌড়োতেই অর্ণব শক্ত করে চেপে ধরেছে আগ্নেয়াস্ত্রটাকে। তার কপাল বেয়ে টপটপ করে শীতল ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। জামাটা ঘামে জবজব করছে!

এখনও পর্যন্ত হাতে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও একবারও শ্যুট করার সুযোগ পায়নি কেউই। লোকটা এমন ধূর্ত যে গুলি করার চান্সই দেয়নি। অর্ণব জানে যে নিঃসন্দেহে আগের দিনের মতোই ওর গায়ে একটা বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট আছে। সঙ্গে যদি বুলেটপ্রুফ প্যান্টও পরে থাকে, তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু আজ ওর মাথায় পাগড়িটা অনুপস্থিত। সে মনে মনে ঠিক করে নিল, আজ শয়তানটার মাথাতেই ছ'টা গুলি ভরে দেবে। গল্পই শেষ! আর ওকে বাড়তে দেওয়া যাবে না!

"মিস্ বোস... মিস্ অরোরা, কারেন্ট স্টেটাস প্লিজ।"

অধিরাজের প্রশ্নের উত্তরে কৌশানীর গলার স্বর ভেসে এল, "ডেস্টিনেশন থেকে

আন্দাজ পাঁচশো মিটার দূরে আছি।"

"ফাইভ হান্ড্রেড মিটারস। ও ব্যাটার স্পিড থাকলেও রেকর্ডধারী স্প্রিন্টার নয়। তার মানে দুশো মিটার দৌড়োতে কমসে কম পঁচিশ থেকে ত্রিশ সেকেন্ড লাগবে।" অধিরাজ মাথা ঝাঁকাল, "ওকে, গট্ ইট! আমরা মিনিট খানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব। তবে সাবধানে থাকবেন দু-জনেই। ভিড় দেখে ও কিন্তু মারাত্মক স্টেপ নিতে পারে।"

"অসম্ভব নয়।" কৌশানী জানায়, "লোকটা ভীষণ ভয় পেয়েছে।"

'সেটাই সবচেয়ে ভয়ের বিষয়।"

বলতে বলতেই অধিরাজ স্পিড বাড়িয়েছে। অর্ণব আর পবিত্রও সমানতালে দৌড়চ্ছে। প্রচণ্ড বেগে স্প্রিন্ট টানছে ওরা তিনজনেই। গলিটা একেবারেই প্রশস্ত নয়। আশেপাশের ঘনসন্নিবদ্ধ বাড়িগুলোর জানলা বন্ধ থাকায় দরুণ অন্ধকারও বটে। মেইন রোড পিচের হলেও এই সঙ্কীর্ণ গলির রাস্তা প্রচণ্ড এবড়ো খেবড়ো। মাঝেমধ্যেই গর্তে পা পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে। ইটের গুঁতো খাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই পা মচকে যাওয়ার উপক্রম। গোটা পরিবেশটাই প্রতিকূল! তবু তিন অফিসার থামল না। প্রায় চিতার মতোই দৌড়ে চলেছে ওরা! সাধারণ কোনো মানুষ এই গলি দিয়ে দৌড়লে হয়তো হাত পা-ই ভাঙবে। কিন্তু চেজিঙে এক্সপার্ট টিম-অধিরাজ তার মধ্য দিয়েই ছুটে চলল গন্তব্যের দিকে।

কিছুটা এগোতেই অন্ধকার গলির শেষপ্রান্তে আলোর রেখা দেখা গেল। কানে এল মানুষের উত্তেজিত কলরব, 'চো, র! চো, র!'উত্তেজনায় অর্ণবের প্রতিটা স্নায়ু, প্রতিটা পেশী টানটান হয়ে গেল। এইবার চরম মুহূর্ত। ফের শত্রুর মুখোমুখি!

"স্যার, রিচড ডেস্টিনেশন।" ইয়ারসেটে মিস্ বোসের কণ্ঠস্বর কড়কড় করে উঠল, "হি ইজ টেকিং দ্য রাইট টার্ন।"

"আমরা ওখানেই আছি মিস্ বোস!"

ওরা ততক্ষণে গলি থেকে বেরিয়ে ফের মেইন রোডে পড়েছে। শাড়িপরা বার্নিং শিখ ততক্ষণে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে নিজেকে বাঁচাতে। পেছনে একগাদা লোকের ভিড়। থেকে থেকে মুড়ি-মুড়কির মতো এসে পড়ছে ইট-পাথরের টুকরো। সে আশঙ্কায়, আতঙ্কে নীল হয়ে গিয়েছে। আর যেন দৌড়োতে পারছে না। দৌড়নোর ভঙ্গিটা ভীষণ ক্লান্ত। সজোরে শ্বাস নেওয়া, বুকের প্রবল ওঠানামা দেখলেই বোঝা যায় যে ওর দম প্রায় শেষ। আর বেশিক্ষণ পারবে না।

তার মনোযোগ পেছনের ভিড়ের দিকেই ছিল। সামনের দিকে তাকায়নি। এবার বিশেষ কিছু লক্ষ্য করার আগেই একটা মানুষের সঙ্গে সজোর ধাক্কা খেয়ে রাস্তার ওপরেই ছিটকে পড়ল সে। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল সামনে অধিরাজ, অর্ণব ও পবিত্র তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের হাতেই উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র ছোবল তুলেছে। অধিরাজ শান্ত গলায় বলল, "ম্যারাথন শেষ হয়ে গেলে এবার মামাবাড়ি যাওয়া যাক?"

বার্নিং শিখ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তার চোখে আতঙ্ক, রাগ ও দারুণ প্রতিশোধস্পৃহা একে একে ছায়া ফেলে গেল। পরক্ষণেই সজোরে হেসে ওঠে। তার হাসি দেখে সন্দেহে অধিরাজের ভুরু বেঁকে যায়। এই পরিস্থিতিতেও লোকটার হাসি পাচ্ছে কেন! অন্য কোনো প্ল্যানিং আছে নাকি। তার দৃষ্টি ওদের পেছনদিকে ন্যস্ত কেন?

সে শুধুমাত্র আঁচ করেছিল। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে ওঠার আগেই একটা বিরাট ট্রাক প্রবলগতিতে এগিয়ে এল ডানদিকের রাস্তা দিয়ে। ওটাকে দূর থেকেই দেখতে পেয়েছিল বার্নিং শিখ। এবার বিনাবাক্যব্যয়ে ক্ষিপ্রভঙ্গিতে লাফ মেরে উঠে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর পেছনের সামান্য বাইরে বেরিয়ে থাকা অংশের দিকে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল ট্রাকের পেছনটা। দ্রুতগামী ট্রাকের পেছনে অদ্ভুত কায়দায় নিজেকে আটকে নিয়েছে। অর্ণব দেখল, ট্রাকটা তাকে নিয়েই চলে যাচ্ছে দ্রুত! বেরিয়ে যাচ্ছে নাগালের বাইরে। এত কায়দা করে, এত প্ল্যান করে, রক্ত-ঘাম ঝরিয়েও ধরা যাবে না শয়তানটাকে?...ট্রাকটাকে দুই লেডি অফিসার, অধিরাজ আর পবিত্রও চেজ করছে। কিন্তু লোকটার মুখে অদ্ভুত একটা

হাসি। সে জানে, দৌড়েও আর তার নাগাল পাওয়া যাবে না তাদের। অর্ণবের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই ট্রাকটার পেছনে ধাওয়া করতে করতে তাক করল তার আগ্নেয়াস্ত্র।

"স্যা-র। ডোন্ট শ্যু-ট। ডোন্ট শ্যু-ট!"

অর্ণব শুনতে পেল টুইঙ্কল অরোরার চিৎকার। সে শ্যুট করতে বারণ করছে! তাতে তার রাগ বাড়ল বৈ কমল না। এই মেয়েটা সব ব্যাপারে আগে এসে টপকে পড়বে। কে বলেছে ওকে দিদিগিরি করতে? নাকি এই চেঁচিয়ে ওঠার পেছনে নিজের স্বজাতিকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা আছে। বিশ্বাস নেই... কাউকে বিশ্বাস নেই!

যথারীতি টুইঙ্কলের কথা অর্ণব গ্রাহ্যই করেনি। বার্নিং শিখ তার দিকেই তাকিয়ে ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হেসে হাত নেড়ে 'টাটা' করছে। এইটুকুই তাকে উত্তপ্ত করার জন্য যথেষ্ট। সে পাগলের মতো দৌড়োতে দৌড়োতে বার্নিং শিখকে লক্ষ্য করে একটার পর একটা ফায়ার করে চলেছে। কিন্তু সবগুলোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। অর্ণব দেখল শয়তানটা ঠিকই আছে। ঠং ঠং করে স্রেফ কিছু ধাতব শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একটা চেনা উগ্র গন্ধ। সে ব্লু টুথ ইয়ারসেটে শুনতে পেল অধিরাজের গলা। তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট আফসোস, "এটা কী করলে অর্ণব! ফায়ার করার আগে দেখবে তো কোথায় ফায়ার করছ। ওটা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের বারো হাজার লিটারের তেলের ট্যাঙ্কার!"

এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরে পেল অর্ণব। এইবার বুঝল, তার সঙ্গীরা কেন একবারও ফায়ারিং করেনি! কেন টুইঙ্কল শ্যুট করতে বারণ করেছিল। বার্নিং শিখ যে গাড়ির পেছনে ঝুলছে ওটা জ্বালানি তেলের ট্যাঙ্কার। চরম উত্তেজনায় সে হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের লোগোটাও লক্ষ্য করেনি। বোকার মতো একের পর এক ফায়ার করে গিয়েছে। এই জন্যই লোকটা ওকে তাতাচ্ছিল। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে জানত যে অর্ণব পরপর ফায়ার করতে থাকে! এটা হিন্দি ফিল্ম হলে গোটা ট্যাঙ্কারটাই ব্লাস্ট হত। কিন্তু বাস্তবে সাধারণ বুলেটের আঘাতে অমন সাঙ্ঘাতিক কিছু হয় না। তবু যা হয়েছে তাও কম বিপজ্জনক নয়। র‍্যান্ডম ফায়ারিঙের দরুণ তেলের ট্যাঙ্কার ফুটো হয়ে গিয়েছে। জ্বালানি তেল লিক করছে। তার গন্ধটা নাকে এসে ঝাপ্টা মারল অর্ণবের। সে সভয়ে দেখল, বার্নিং শিখ শাড়ির ভাঁজ থেকে একটা লাইটার বের করছে। ট্যাঙ্কারের যে অংশ থেকে তেল লিক করছিল, ঠিক সেখানেই একটু শাড়ির অংশ ছিঁড়ে নিয়ে লাইটারটা জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল লোকটা। জ্বালানি তেল প্রায় নিমেষের মধ্যেই ধরে নিয়েছে আগুন। গাড়ির পেছনে এক লহমায় ধকধকিয়ে জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা...! ঐ পরিস্থিতিতেই বার্নিং শিখ মুচকি হেসে শিস দিয়ে ওঠে, "গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই... কিসকো খবর, কৌন হ্যায় উয়োহ, অনজান হ্যায় কোই...!"

"শি-ট! শি-ট! পিছিয়ে যান.... পিছিয়ে যান সবাই!" পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল অধিরাজ, "আর আড়াইশো মিটারের মধ্যেই পেট্রোল পাম্প। গাড়িটা যদি পেট্রোল পাম্পে পৌঁছয় তবে পুরো এলাকাটাই উড়ে যাবে। অফিসারস, গাড়ির চাকায় শ্যুট করতে শুরু করুন। গাড়িটাকে আমাদের এখানেই আটকে রাখতে হবে... যেভাবেই হোক।... ফা-য়া-র!"

নির্দেশ শোনামাত্রই সব অফিসাররা গাড়িটার চাকাগুলোকে তাক করে 'তাবড়তোড়' ফায়ারিং শুরু করেছে। উপস্থিত জনতার ভিড় আগুন দেখেই পেছন দিকে সবেগে দৌড়েছে। কারোরই বুঝতে বাকি নেই যে এখানে খুব শীঘ্রই একটা বিস্ফোরণ হতে চলেছে। তাই যে যেদিকে পারল দৌড়োল। শুধু সি.আই.ডি. অফিসাররা সবাই ট্রাকের চাকাগুলোকে ঝাঁঝরা করে দিতে ব্যস্ত। ফায়ারিঙের আওয়াজে, বারুদ আর তেলের গন্ধে মুহূর্তের মধ্যে পুরো পরিবেশটাই যেন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সবাই মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারটাকে এখানেই আটকে রাখার! চাকা জখম হয়ে যাওয়ায় গাড়িটা স্লো হল ঠিকই, কিন্তু এখনও সোজা এগিয়ে যাচ্ছে পেট্রোল পাম্পের দিকেই। চরম আফসোসে, নিজের ওপর রাগে চোখ বুজে ফেলল অর্ণব। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকছে সে। ঐ জ্বলন্ত গাড়ি এই মুহূর্তে

আর মাত্র একশো কী দেড়শো মিটার দূরে... উলটোদিকের সিগন্যালে একরাশ গাড়ি আটকে আছে....! সামনে কালান্তক পেট্রোল পাম্প!...

বার্নিং শিখ এই হুড়োহুড়ি ও জনতার ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সুযোগটা নিয়ে টুক করে কখন যে ভিড়ে মিশে গেল তার দিকে কারোর খেয়ালই নেই। চাকাগুলো ফেঁসে যাওয়ার ফলে ট্রাকটা একটু স্কিড করল। ট্রাকের ড্রাইভার এবার জানলা দিয়ে মুণ্ডু বের করে জানতে চাইল, "আরে খোত্তে দা পুত্তর! ক্যায়া কর রাহা হ্যায় ...!"

ট্রাকটা যে মুহূর্তে স্লো হয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই অধিরাজ ঐ জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারের পেছন পেছন পাগলের মতো দুরন্ত গতিতে দৌড়চ্ছিল। তার দৌড় দেখলে বুঝি মিলখা সিং-ও লজ্জা পাবেন। সর্বশক্তি দিয়ে স্প্রিন্ট টানছিল ও। যেই মুহূর্তে ড্রাইভার মুণ্ডুটা জানলা দিয়ে বের করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই সে লাফিয়ে চলন্ত গাড়ির জানলা ধরে ঝুলে পড়ল। ড্রাইভারটি হাঁ হাঁ করে ওঠার আগেই এক ধাক্কায় জানলা সপাটে খুলে দিয়ে লোকটার কুর্তা ধরে টেনে বাইরে বের করে এনেছে তাকে। বেচারি শিখ ড্রাইভারটিকে একরকম বাইরে ছুড়ে ফেলেই বলল, "পা'-জি, এতক্ষণে তোমার টনক নড়ল! যদি চিকেন তন্দুর না হতে চাও তবে চুপচাপ ওখানেই থাকো।"

ড্রাইভারটির কোমরে বেজায় লাগলেও সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল অধিরাজ জানলা দিয়েই ঐ জ্বলন্ত ট্রাকের ভেতরে আধখানা শরীর গলিয়ে দিয়েছে। স্টিয়ারিং হুইলটাকে ধরে একদিকে টেনে রেখেছে সে। ঐ বিশালদেহী ট্যাঙ্কার এবার বাঁদিকে গোঁত্তা খেল। ঐদিকটায় বিশেষ দোকানপাট নেই। বরং বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা এখনও পড়ে আছে। এবং একদম সামনেই বিরাট একটা জলাশয়। অর্ণব অধিরাজের প্ল্যানিংটা পরিষ্কার বুঝতে পারল। সে ট্যাঙ্কারটাকে তেলসুদ্ধই ঐ জলাশয়ে ফেলতে

চায়। সেইজন্যই অমন পাগলের মতো স্টিয়ারিং এক্সট্রিম রাইটে ঘুরিয়ে দিয়েছে। জ্বলন্ত ট্যাঙ্কার এবার জখম চাকা ও স্টিয়ারিঙের নির্দেশে পুরোপুরি বাঁদিকে ঘুরে গিয়েছে। দাউদাউ করে জ্বলছে ঠিকই, তবে বিস্ফোরণের মতো অবস্থায় এখনও আসেনি। ফুটপাথকে একরকম পিষে দিয়েই তার দৈত্যাকৃতি দেহ বড়োসড় ঝিলটার দিকেই ঘুরল। গাড়িটা যদি সোজা এগিয়ে যেত তবে আর পঞ্চাশ মিটার দূরত্বেই পেট্রোল পাম্প ছিল। কিন্তু অধিরাজের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তার মুখ ঘুরে গেল সম্পূর্ণ উলটো দিকে। অর্ণব শুনতে পেল পবিত্র বিড়বিড় করছে, "গড হেল্প হিম!"

ঐ মুহূর্তে বাকিরাও বুঝি একই প্রার্থনা করছিল। ঈশ্বরও সেই সমবেত ঐকান্তিক প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ট্যাঙ্কারটা অধিরাজের নির্ভুল হিসাবমতোই সোজা হুড়মুড়িয়ে বিরাট জলাশয়ে পড়েছে। 'ঝপাস' করে ঐ ভীমদেহী ট্রাকের জলে পড়ার সজোর আওয়াজ! ঝিলের জল যেন প্রবল উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠে চতুর্দিক ভিজিয়ে দিয়েছে। অধিরাজ তার আগের মুহূর্তেই লাফ মেরে সরে যেতে পেরেছিল। সে ছিটকে পড়েছে ঠিক জলাধারের পাশেই। কোনোমতে তাকিয়ে দেখল, আস্তে আস্তে জলে ডুবে যাচ্ছে তেলের জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারটা। বারোহাজার লিটার তেল আগুন সমেত জলেই গেল! আর এক মিনিটও যদি দেরি হত, সামান্য সময়ের হেরফেরও হত, তবে এখানে হয়তো লাশের স্তূপ পড়ে থাকত। গাড়িটা যদি রাস্তাতেই উলটে যেত তবে রাস্তার ওপরেই জ্বালানি তেল ছড়িয়ে পড়ত, আগুনও সেই তেলের সাহায্যে কতদূর ছড়িয়ে যেত তার ঠিক নেই। মেইন রোডের একদিক দিয়ে গাড়িও চলাচল করছিল, কিছু গাড়ি সিগন্যালে আটকেছিল, আর ডানদিকে সেই পেট্রোল পাম্প! বারোহাজার লিটার জ্বলন্ত তেল লাভার মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাটাকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারত! এক চুল!... স্রেফ এক চুলের জন্য বেঁচে গিয়েছে ওরা সবাই। ট্রাকটা যদি ঠিক সময়ে জলে না পড়ত তবে যে কী হত তা ঈশ্বরই জানেন৷

অধিরাজ তখনও ক্লান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মাটিতে। এতক্ষণের উত্তেজনা, পরিশ্রম,

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা, নির্ঘুম রাতের ধকলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য যেন চোখে অন্ধকার দেখল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সে প্রায় বেহুঁশের মতো টানটান হয়ে শুয়েছিল। অর্ণব প্রায় তার ওপর হুমড়ি খেয়ে অনুতপ্ত স্বরে ডাকল, “স্যার স্যার।”

“আমি ঠিক আছি।” অধিরাজের মুখ ক্লান্তিতে, হতাশায় ম্লান। সারামুখে স্বেদবিন্দু গর্জন তেলের মতো চকচক করছে। সে তার দিকে তাকায়, “কিন্তু তোমার কী হয়েছে অর্ণব? তুমি তেলের ট্যাঙ্কারের ওপর র‍্যান্ডম ফায়ারিং করে বসলে।”

পবিত্র, মিস্ বোস ও টুইঙ্কলও ততক্ষণে চলে এসেছে ওখানে। পবিত্র প্রায় কড়া ধমক দিয়ে বলে, “একটা লোককে মারতে গিয়ে গোটা এলাকার মানুষদেরই উড়িয়ে দিচ্ছিলে তুমি। মাথা টাথা খারাপ হয়েছে নাকি? মিস্ অরোরা চিৎকার করে বারণ করছিলেন, শোনোনি? না মাথার সঙ্গে কানটাও গেছে।”

পবিত্রকে কোনোদিন এত রাগতে দেখেনি অর্ণব। সে তাপে মাথা হেঁট করল। নিজের বোকামি বুঝতে পেরে তার চোখে বাষ্প জমছে! নির্বুদ্ধিতা, অবিশ্বাস আর ইগোর ধাক্কায় আজ সে তার প্রিয়তম মানুষটাকেও চরম বিপদে ফেলেছিল। কোনোমতে বুজে আসা কণ্ঠে বলল, “স্যরি স্যার!”

অধিরাজ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে অর্ণবের মুখের দিকে। তার মনে একটা অদ্ভুত দুশ্চিন্তা আঁচড় কাটছে। অর্ণব তো কখনও এমন করে না! তবে কি ও টুইঙ্কল অরোরাকে সন্দেহ করছে? নাকি আশেপাশের কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছে না? যদি তাই হয়ে থাকে তবে বার্নিং শিখ তার মেন্টাল গেমে ওকে ফাঁসাতে সফল হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অবিশ্বাসের ব্যূহ থেকে অর্ণবকে বের করতেই হবে। এর জন্য ধমক নয়, অন্য ট্রিটমেন্ট দরকার।

“হোয়াট স্যরি?... তোমার জন্য আজ লোকটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল...!”

পবিত্র আরও জোরে ধমক দিতে যাচ্ছিল। তাকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছে অধিরাজ। আস্তে আস্তে বলল, “যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। কারোর কোনো ক্ষতি তো হয়নি। ফরগেট ইট! আর রইল মরা আর মারার গল্প। সে তো চলতেই থাকবে যতক্ষণ না কোনো একপক্ষ শেষ হচ্ছে। ডোন্ট ওরি, ও পাবলিক ফের ফিরে আসবে তখন ফের ধরার চেষ্টা করব।”

অর্ণবের ভীষণ কান্না পেয়ে গেল! এত বড়ো ভুলের পরও স্যার তাকে প্রোটেক্ট করছেন! এর চেয়ে দুটো চড় মারলেও বুঝি শান্তি পেত। কোনোরকমে আবার অবনত মুখে বলল, “আই অ্যাম স্যরি...।”

“ইটস ওকে অর্ণব।” অধিরাজ সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখে, “ইটস ওকে ডার্লিং। টেক আ চিল পিল।” বলতে বলতেই সে কোনোমতে উঠে বসেছে। বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বলল, “ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমি কি এখন একটু ফোঁকাফুঁকি বিজনেস করতে পারি?” অর্ণব এত দুঃখেও হেসে ফেলল।

(১৯)

"আপনার কি মনে হয় না যে আজকের যে মারাত্মক ব্লান্ডারটা করেছেন, তারপর আপনার এই কেস থেকে সরে যাওয়া উচিত?"

"স্যার... আপনি হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের ট্যাঙ্কারের ওপর কী ভেবে র‍্যান্ডম ফায়ার করছিলেন? বারোহাজার লিটারের তেলের কন্টেনার ছিল ওটা। বুলেটের ঘর্ষণের ফলে অনেক সময় স্পার্ক হয়। আপনার ধারণাও আছে ঐ সামান্য স্পার্কেই কী ঘটতে পারত?"

"অফিসার সরকার, আজ আপনার হিরোইজমের ধাক্কায় কয়েকশো মানুষের প্রাণ চলে যাচ্ছিল। এই হঠকারিতাকে কীভাবে জাস্টিফাই করবেন? এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?"

"আপনি কি রিজাইন দেবেন?"

একের পর এক বাক্যবাণ ছুটে আসছে। সি.আই.ডি. ব্যুরোর সামনে আবার ভিড় জমিয়ে ফেলেছে রিপোর্টাররা। ট্র্যাফিক সিগন্যালের সিসিটিভি ফুটেজে, উপস্থিত জনতার মোবাইলে ধরা পড়া অর্ণবের হঠকারি ফায়ারিঙের ভিডিও এইমুহূর্তে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। জনগণ হাঁ করে দেখছে এক অফিসারের নির্বুদ্ধিতার মাশুল কীভাবে আর একটু হলেই গোটা শহরকে গুনতে হত। এক লিটার, দু-লিটার নয়, বারোহাজার লিটার তেলের ট্যাঙ্কারের ওপর ফায়ারিং করার অর্থ প্রায় অবশ্যম্ভাবী বিস্ফোরণ! ভিডিও ফুটেজে এটাও দেখা যাচ্ছে যে কীভাবে অধিরাজের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ট্যাঙ্কারটাকে থামানো গিয়েছিল, এবং কীভাবে সে প্রায় প্রাণ হাতে নিয়ে ঐ জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারটার গতিমুখ ঘুরিয়ে দিয়ে পুরো গাড়িটাকেই জলে ফেলে দিয়েছে। মাত্র এক কি দেড় মিনিটের ফুটেজ। বাস্তবেও যা ঘটেছিল তা ঐ সময়ের মধ্যেই হয়েছে! ঐ এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারত। ঘটেনি, এটাই মিরাকল! কিন্তু এই গোটা ব্লান্ডারটার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে একজনই অপরাধী, যাকে তেলের ট্যাঙ্কারের ওপর মুর্খের মতো ফায়ারিং করতে দেখা যাচ্ছে! অফিসার অর্ণব সরকার।

অর্ণব কী বলবে বুঝতে পারছিল না। এমনিতেই সে মরমে মরে আছে। বারবার নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করে চলেছে। পবিত্রও তাকে ছাড়েনি। অধিরাজের বারণ করা সত্ত্বেও সে আপাদমস্তক ঝেড়েছে অর্ণবকে। বলেছে, "আমাদের মাথায় কি গাধা লেখা আছে? আমরাও ঐ গাড়ির পেছন পেছন দৌড়চ্ছিলাম, অথচ বার্নিং শিখকে সামনে পেয়েও একবারও ফায়ার করিনি। সেটা কি এমনি এমনিই, না আমাদের গানগুলোয় জং পড়েছিল? টুইঙ্কল অরোরার মতো মারকুটে অফিসার, যিনি কথায় কথায় ঘুষি মেরে, তোড়ফোড় করে বসে থাকেন, সেই লেডি সিংঘমও যখন তোমাকে চিৎকার করে বারণ করছিলেন, তখনও তোমার মাথায় ঢোকেনি যে এই 'অ্যাকশন লেডি' শ্যুট করতে বারণ করছেন কেন? হোয়াটস গটেন ইন টু ইউ অর্ণব? কী প্রমাণ করতে চাও?"

অর্ণবের কাছে কোনো জবাব নেই। কী জবাব দিত সে? কী বলত? টুইঙ্কল অরোরার দিদিগিরিকে যে সে ঐ মুহূর্তে চরম ঘৃণা করছিল, তা কি আদৌ বলা যায়? অর্ণব যে ঐ মহিলাকে একটুও বিশ্বাস করছে না, কিংবা তার মেল ইগো একজন মহিলার বসিং মেনে নিতে পারেনি, এই কথা সে মরে গেলেও কাউকে বলতে পারবে না। অর্ণব জানে যে সে চূড়ান্ত বোকামি করেছে, কিন্তু তার পেছনের পাহাড়প্রমাণ অবিশ্বাস কাকে দেখাবে। কেউ বুঝবে না, যে প্রতি মুহূর্তে কী প্রচণ্ড সন্দেহে ও নিরাপত্তাহীনতায় সে পেন্ডুলামের মতো দুলছে। নিজেরই কলিগ কিংবা খবরিদের মধ্যে শিখ প্রজাতির নাম শুনলেই যে আঁতকে উঠছে, তা কি আদৌ প্রকাশ করা যায়।

তাই নিজের মধ্যে নিজেই আত্মগ্লানিতে গুমরে গুমরে মরছিল সে। ইতিমধ্যেই খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে গিয়েছে সর্বত্র। কানে গিয়েছে এডিজি শিশির সেনেরও। তিনি ঘটনার পনেরো মিনিটের মাথাতেই অধিরাজকে ফোন করে রীতিমতো উত্তেজিত গলায়

বলছিলেন, "ব্যানার্জি, এটা কী হল। হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের ফুয়েল ট্যাঙ্কের ওপর অর্ণব সরকার কোন্ বুদ্ধিতে ফায়ার করছিল? কিছু হয়ে গেলে আমি ওপরমহলকে কী জবাব দিতাম। আর একটু হলেই আমায় রিজাইন করতে হত, তোমাকেও। হোয়াটস গোয়িং অন?"

অধিরাজ খুব শান্তস্বরেই জবাব দিয়েছিল, "স্যার, বাস্তবে তেমন কিছু হয়নি।"

"হয়নি, কিন্তু হতে পারত!" তাঁর ধমক ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল, "অন্তত নাইন্টি পার্সেন্ট চান্স ছিল। বার্নিং শিখের চেয়েও তো বেশি ডেঞ্জারাস সরকারের বুদ্ধি দেখছি! ও কি নিজেকে ডেমোলিশন ম্যান প্রুভ করতে চায়? বার্নিং শিখ শুধু নিজের টার্গেটদেরই ওড়ায়, অর্ণব তো গোটা শহরকেই উড়িয়ে দেওয়ার তাল করছে।"

"স্যরি স্যার।" অধিরাজ একটু বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলে, "ওটা জাস্ট একটা ভুল ছিল।"

"তুমি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা কোর না ব্যানার্জি।" আবার একটা মোক্ষম ধমক, "ওটা ভুল নয়, ক্রাইম। আরে প্রকাশ্য রাস্তায় অয়েল কন্টেনারের ওপর ওর র‍্যান্ডম ফায়ারিঙের স্টুপিড ভিডিও সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে। আমাকেও তো কাউকে না কাউকে জবাব দিতে হয়। ঐ ঘটনার পর থেকে ওপরমহল আমার গর্দান নেওয়ার তাল করছে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে ফোন ঢুকছে। প্রত্যেকেরই বক্তব্য যে ওটা মেইন রোডের ওপর একটা বিরাট পেট্রোলপাম্পের একদম কাছে ছিল। বার্নিং শিখ যদি নিজেই কন্টেনারটাকে আগুন লাগিয়ে দিত তবে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ও নিজে আদৌ সে চেষ্টা করেনি, বরং সরকার এই স্কোপটা ওকে জাস্ট রসোগোল্লার মতো প্লেটে তুলে দিয়েছে। এই ইডিয়টিক কার্যকলাপকে তুমি 'ভুল' বলে জাস্টিফাই করছ! বাচ্চা ছেলে নাকি যে ভুল করে তেলের শিশি ভেঙে ফেলেছে।"

"আই অ্যাম স্যরি স্যার।"

এবার যেন এডিজি সেন একটু শান্ত হলেন। তাঁর গলা সামান্য খাদে নামল, "তুমি নিজে যদি এই ব্লান্ডারটাকে সামাল না দিতে তবে আমি জানি না কী হত। মাথায় রেখো, তোমার আন্ডারে যারা আছে তাদের উলটোপালটা স্টেপের দায় কিছুটা হলেও তোমার ওপরও বর্তায়। তেমন বুঝলে সরকারকে বসিয়ে দাও। কিন্তু এরকম ব্লান্ডার আমি দ্বিতীয়বার দেখতে বা শুনতে চাই না।"

অধিরাজ ফের শান্তভাবেই বলল, "ওকে স্যার...!"

শিশির সেন প্রায় দড়াম করেই ফোনটা কেটে দিলেন। যেভাবে উঁচু স্বরে তিনি কথা বলছিলেন, তাতে অর্ণবের ওঁর প্রত্যেকটা কথা শুনতে বা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি। তার ফর্সামুখ কালো হয়ে গিয়েছে। একেই মরমে মরে আছে, তার ওপর শিশির সেনের ভর্ৎসনা! অর্ণব যতবার সেই মুহূর্তটাকে মনে করেছে, বারবার নিজেই শিউরে উঠেছে। নির্বোধের মতো কী মারাত্মক ভুলটাই না সে করেছিল। তার মনে হচ্ছিল, ঐ এক্সপ্লোশনটা যদি সত্যি সত্যিই হত, আর সেই আগুনে শুধু সে একাই ছারখার হয়ে যেত, তবে বোধহয় সবচেয়ে ভালো হত। অন্তত প্রতিমুহূর্তে এমন তিলে তিলে মরতে হত না।

বার্নিং শিখের সঙ্গে এনকাউন্টারে পবিত্র এবং টুইঙ্কল, দু-জনেই সামান্য ইনজিওর্ড হয়েছিল। টুইঙ্কল আপাতত ফরেনসিক ল্যাবে চলে গিয়েছে। আহেলিই তাকে মেরামত করে দিতে পারবে। পবিত্র এতটাই বিরক্ত যে সে প্রথমে নিজের ইনজুরির কেয়ারই করছিল না। তাকে ধরে বেঁধে একটা হসপিটালের ওপিডিতে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক শুশ্রূষা করে ছেড়ে দিয়েছে ওরা। আপাতত সে ফের মিস্ বোস এবং পি সি চৌধুরীর পরিবারকে পাহারা দিতে নিজের ঘাঁটিতে ফিরেছে। পি সি চৌধুরী এবং ওঁর পরিবার এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে ঐ বুড়ি থুরথুরে কমলার পেটে পেটে এত

শয়তানিও ছিল। বার্নিং শিখের প্রস্থেটিক মেক-আপের নমুনা দেখে ওঁরা প্রত্যেকেই ভয়াবহ আতঙ্কে আছেন। ওঁদের অবস্থা দেখে অ্যাটম বম্বের দাপটে বিধ্বস্ত হিরোশিমা-নাগাসাকির কথা মনে পড়ে যায়। একটা গোটা বাড়িতে শুধু নিস্তব্ধতাই বিরাজ করছে। প্রত্যেকেই বুঝি কথা বলতেও ভয় পাচ্ছেন। কে জানে, কোথায় ওঁত পেতে আছে আততায়ী।

দেওয়ালেরও কান আছে। এমনকি নিজেদেরই ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছেন ওঁরা। অধিরাজ নির্দেশ দিয়েছে, কোনোমতেই যেন চৌধুরী পরিবার আজ কমলার রান্না করা খাবার না খায়। মিস্ বোস জানিয়েছেন, অসুবিধে নেই। তিনি কাজ চালানোর মতো রান্না করে ফেলতে পারবেন। তবে বাড়ির লোকেরা আদৌ আজ কিছু মুখে তুলতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

"পবিত্র।" অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক, "আমার মনে হয়, যতক্ষণ না সবাই খাওয়ার পাট চুকিয়ে বেডরুমে ঢুকবেন, ততক্ষণ কিছু হওয়ার চান্স নেই। মিস্ বোস তোমায় যে মুহূর্তে সিগন্যাল দেবেন যে ওঁরা ঘুমোতে যাচ্ছেন, সেই মুহূর্ত থেকে তুমি একদম বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দেখবে কেউ ঐ বাড়ির ধারেকাছে আসে কিনা। আর মিস্ বোসের জামায় লাগানো স্পাইক্যামটাকে নিজের মোবাইলেও কানেক্ট করে নেবে। ভেতরের দৃশ্য ও বাইরের পরিস্থিতি, দুটোই লাগাতার মনিটর করতে থাকবে। বাড়িটার আশেপাশে রাউন্ড দিতে থাকবে। আজকে আমিও ওখানে যাব। যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছি, ততক্ষণ হেতালের লাঠি নিয়ে চাঁদ সদাগরের মতো সতর্ক পাহারায় থাকবে। আজকের রাতটা ভীষণ বিপজ্জনক।"

"তোমার মনে হয় এখান থেকে তাড়া খাওয়ার পরও ও মাল আবার ফিরবে?" পবিত্র চোখ কপালে তুলে ফেলে, "আমার তো মনে হয়েছিল, ও আর এদিকে আসবেই না!"

"ভুল ভাবছ।" অধিরাজ মাথা নাড়ে, "ওর হাসিটা আমাকে এখনও হন্ট করছে। যদি কোনোক্রমে প্ল্যান 'এ' বানচাল হয়েও যায়, ও পাবলিক নির্ঘাত প্ল্যান বি'র বন্দোবস্তও করে রেখেছে। আজ রাতে কোথাও-না কোথাও অ্যাটাক হবেই। কারণ যত ওর হাতে সময় কমবে ও তত বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। সুতরাং যতক্ষণ না আমি পৌঁছচ্ছি, ও বাড়ির ওপর থেকে নজর সরাবে না। আর কোনোরকম গোলমাল দেখলেই স্ট্রেট ভেতরে ঢুকে যাবে। আমার অপেক্ষা করবে না। ক্লিয়ার?"

"ওকে বস।"

পবিত্র আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে গিয়েছে নিজের ঘাঁটিতে। তারপরই মিস্ দত্তকে ফোন করে আপডেট নিল অধিরাজ। আত্রেয়ী প্রথমেই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওদের সবার খবর নিল। জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারের ফুটেজ সে-ও দেখেছে। ভূপেন্দ্র দত্তা'র বাড়িতেও মোটামুটি সবই ঠিকঠাক চলছে। ওঁদের কাছেও অর্ণবের গুলি চালানোর ভিডিও এবং বার্নিং শিখের কীর্তির খবর পৌঁছে গিয়েছে। সকাল থেকেই সবার মানসিক পরিস্থিতি খারাপ ছিল, এখন আরও শোচনীয় দশা!

"আপনার মিশন ফিঙ্গারপ্রিন্টের কোনো আপডেট?"

আত্রেয়ী সপ্রতিভভাবে জানায়, "ইয়েস স্যার। চেষ্টা করেছি। কিন্তু পুরোপুরি সাকসেসফুল হইনি। শ্রীদর্শিনীর হাতের ছাপ পাওয়াই যায়নি। তার কারণ সে দুই হাতে ভয়াবহ মেহেন্দি করে বসে আছে। ওদের শ্যুটিং এ হয়তো কোনো বিয়ের দৃশ্য বা এপিসোড আছে। সেইজন্যই একদম তাজা তাজা মেহেন্দি লাগিয়েছে। ওদের বাড়িতে একটু মধুর খোঁজে গিয়েছিলাম। আমি শুনেছি শ্রী'র রোজ সকালে মধু আর লেবুজল খাওয়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু শুনেই সে মুখ হাঁড়ি করে নিজের দুই হাত দেখাল। ঐ অবস্থাতে স্বাভাবিকভাবেই কিছুই দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়৷ আমিও চাপাচাপি না করে ফিরে এলাম। তবে তার কিছুক্ষণ পরেই দেখি প্রিয়দর্শিনী মিঃ দত্তার বাড়িতে এসে উপস্থিত। ভদ্রমহিলা দেখলাম একটা কাচের বাটিতে করে অনেকখানি মধু নিয়ে এসেছেন। আমিও সুযোগ পেয়ে বাটিটা নিয়ে কিচেনে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজে দেখেছি স্যার। প্রিয়দর্শিনীর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে। স্যাম্পলও তুলে নিয়েছি।"

"গ্রেট জব মিস্ দত্ত!" সে বলল, "আর কারোর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেলেন?"

"তিতলিরও পেয়েছি। প্রিয়দর্শিনী আর তিতলির ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপাতদৃষ্টিতে নর্মাল। কিন্তু গুরশীলের কেসটা গোলমেলে।"

"মানে?"

"গুরশীলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েওছি আবার পাইওনি।"

"সে কী!" অধিরাজ চোখ কপালে তুলে ফেলেছে, "একইসঙ্গে দুটো কী করে হয়?"

"জানি না স্যার। তবে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট এসেছে ঠিকই, কিন্তু সেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট একদম ফাঁকা! আঙুলের কোনো রেখাই নেই। সব রেখা বেমালুম হাপিশ!"

অধিরাজের মুখ গম্ভীর, "হুম। বুঝলাম। আর?"

'কোকিলার কাছে একগ্লাস জল চেয়েছিলাম। সে আবার তখন বাসন-কোসন নিয়ে ভারি ব্যস্ত। জলের গ্লাস দিল ঠিকই, কিন্তু হাতভরতি ডিটারজেন্ট সাবানের ফেনা।"

"বুঝলাম। তার মানে তার ফিঙ্গারপ্রিন্টও আসেনি।" সে হতাশ, "যাকগে, ছেড়ে দিন। বেশি জোর করলে আবার সন্দেহ করবে। বাট স্টিল, গ্রেট অ্যাটেম্পট। ওঁদের সবার ছবি পাঠাতে বলেছিলাম, পাঠিয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ স্যার, অনেক আগেই হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়েছি। দেখেননি?"

"সুযোগ পাইনি মিস্ দত্ত। ব্যুরোয় ঢুকে ভালো করে দেখব।" অধিরাজ বলল, "থ্যাংকস এগেইন।"

ব্যুরোয় ঢোকার আগে বিশ্বজিতের কাছেও আপডেট চাইল সে। বিশ্বজিৎ জানায় যে যে গুলশন সিং ধিলোঁর নম্বরটা আপাতত আর অ্যাকটিভ নেই। তার নম্বরটা দিল্লির হলেও লাস্ট লোকেশন কলকাতাই দেখাচ্ছে। কলেজ স্কোয়ারে লাস্ট ঐ নম্বরের ট্রেন্স পাওয়া গিয়েছে। তারপর থেকেই সুইচড অফ। প্রি-পেইড সিম। ঐ নম্বর থেকে মাত্র একটাই কল গিয়েছে। সেটা জগদীপ সিং ভাট্টিকে করা হয়েছে। এরপর ইউজার ঐ নম্বরটিকে আর ইউজ করেনি। তাই ওটাকে ট্রেস করা অসম্ভব। "আর দ্বিতীয় নম্বরটা?"

বিশ্বজিৎ হাসল, "ওটা অলরেডি হ্যাকড। ওঁর কল ডিটেইলস রেকর্ডে বিশেষ কোনো সন্দেহজনক নম্বর বা সন্দেহজনক অ্যাকটিভিটি নেই। একটু আগেও উনি হানি সিং এর গান শুনছিলেন। আপাতত ডেন্টিস্টের চেম্বারে গ্যারাজ হয়েছেন। এখন ওঁর মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে ডেন্টিস্ট কিছু করছেন, এইটুকুই দেখতে পাচ্ছি।"

"ফাইন। গুডওয়ার্ক বিশ্ব। সন্দেহজনক কিছু পেলে জানিও।"

"ডেফিনিটলি।"

ততক্ষণে ব্যুরোর কাছে ওদের গাড়ি চলে এসেছে। রিপোর্টারদের ভিড় দেখে অর্ণব নিজেই কুঁকড়ে যাচ্ছিল। অধিরাজ বিরক্ত হয়ে বলে, "এদের একটা করে তাঁবু কিনে দেওয়া উচিত। ব্যুরোর সামনেই পেতে বসে থাকলে পারে! সবসময়ই ভিড় লাগিয়েই রেখেছে।"

রিপোর্টাররা ওরা গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের এবারের টার্গেট অর্ণব সরকার। তাকে দেখেই একরকম ধেয়ে এল ওরা। সঙ্গে চোখা চোখা বাক্যবাণ। অর্ণব মাথা হেঁট করে চুপ করে সব শুনছে। কোনোমতে মাথা বুকে গুঁজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রিপোর্টাররা তার রিজাইন চাইছে, হঠকারিতার পেছনের কারণ জানতে চাইছে, বলছে যে এই কেস থেকে তার সরে যাওয়া উচিত। অধিরাজ তার হাত ধরে টান মারল। একটু রুক্ষ স্বরেই বলল, "চলো অর্ণব। এখানে দাঁড়িয়ে প্রলাপ শোনার কোনো মানে হয় না!"

"প্রলাপ!" একজন রিপোর্টার উত্তেজিত হয়ে ওঠে, "আপনি এই চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকে সাপোর্ট করছেন? একটা আস্ত তেলের ট্যাঙ্কারকে কি উনি বেলুন পেয়েছেন যে দুমদাম গুলি মারবেন? এরপরও কি আপনার মনে হয় না যে ওঁকে সাসপেন্ড করা উচিত?"

এইবার অর্ণবকে পেছনে রেখে, তাকে একরকম গার্ড করে উদ্ধতভঙ্গিতে দাঁড়াল অধিরাজ, "অফকোর্স মনে হয়। আপনারা চাইলে এখনই অফিসার সরকারকে সাসপেন্ড করতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে। আপনাদের মধ্যে কোনো একজনকে ওঁর জায়গা নিতে হবে। কারণ বার্নিং শিখের পেছনে এখন গোটা সি.আই.ডি. হোমিসাইডই দৌড়চ্ছে। সে অফিসারদের, খবরিদের এমনকি ফরেনসিক এক্সপার্টদের বাড়ির লোককেও ধরে ধরে

কচুকাটা করছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, অফিসার কম পড়ছে। তারাও সবাই এখন সাহস পাচ্ছেন না। একজনকে বসিয়ে দিলে অন্য একজনকে তার জায়গা নিতে হবে। সেটা আপনাদের মধ্যে কে নেবেন? কেউ ভলান্টিয়ার হতে ইচ্ছুক? বার্নিং শিখের সঙ্গে সরাসরি পাঙ্গা নেওয়ার সাহস আছে আপনাদের কারোর?"

রিপোর্টাররা এবার চুপ। প্রত্যেকেই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কথাটা এভাবে ঘুরে যাবে তা বোধহয় কেউই আশা করেনি। তাদের প্রত্যেককে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে অধিরাজ এবার অর্ণবকে টেনে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, "যাকে ভিলেন বানাচ্ছেন তাকে একবার ভালো করে দেখুন। আপনারা আদৌ জানেন গত চুয়াল্লিশ ঘণ্টায় ওঁর সঙ্গে ঠিক কী কী ঘটেছে? বার্নিং শিখ ওঁকে তিনটে হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড বাল্ব ছুড়ে মেরেছিল। স্রেফ বরাতজোরে রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি সে, ওঁর গাড়ির সমস্ত সিস্টেম বরবাদ করে একটা বম্বও ফিট করে দিয়েছিল। অলমোস্ট মরতেই বসেছিলেন উনি। কীভাবে বেঁচেছেন তা শুধু আমরাই জানি। বার্নিং শিখের আবির্ভাবের আনন্দে এক রাতও ঘুমোতে পারেননি, ঠিকমতো একবেলা খাবারও জোটেনি। ওঁর মুখে যে লাল রংটা লেগে আছে, সেটা দোলের আবীরের নয়। উনি মনের আনন্দে মুখে পেইন্টও করেননি। বার্নিং শিখ আমাদের গরম তেল ছুড়ে মেরেছিল, তার সঙ্গে কয়েক মুঠো লঙ্কাগুঁড়োও ওঁর মুখে ছুড়ে মেরেছে। এখনও ওঁর চোখ, মুখ জ্বালা করছে, ঠিকমতো চোখ খুলেও রাখতে পারছেন না! এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরও উনি এখনও লড়ে চলেছেন। হ্যাঁ, মানছি যে ভুল হয়েছে। কিন্তু ঐ ফ্র্যাকশন অব সেকেন্ডে যদি কিছুক্ষণের জন্য ওঁর একটা ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তবে সেটা কি খুব অন্যায়? ওঁকে বসিয়ে আমি দিতেই পারি, কিন্তু ওঁর জায়গা কি আপনারা নেবেন? নিদেনপক্ষে ভলান্টিয়ারগিরি করার সাহসও আছে আপনার? মনে রাখবেন, যে মুহূর্তে আপনি মাঠে নামবেন সেই মুহূর্তেই একটা অ্যাসিড বাল্ব, একটা বম্ব, কেরোসিন আর আগুন কিংবা একটা তরোয়াল-কৃপাণ আপনার কপালে নাচছে।

আমাদের মধ্যে একজনও অফিসার নেই যে অক্ষত আছে। প্রত্যেকেই ইনজিওর্ড। সুতরাং বুঝে নিন, যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো সময়ে আপনার প্রাণটাই যেতে পারে। এখনও আজকের রাত এবং কালকের রাতটা বাকি আছে। তার মধ্যে সবকিছু হতে পারে। বুকের পাটা যদি থাকে তো এগিয়ে আসুন। আমি অফিসার সরকারকে বসিয়ে দিচ্ছি।"

রিপোর্টাররা সবাই নীরব। একজন এবার তুলনামূলক নরম সুরে বলল, "ওটা আপনাদের কাজ স্যার, আমাদের নয়।"

"তাহলে আপনারা আপনাদের কাজটাই করুন। আর আমাদের কাজটা আমাদেরই বুঝে নিতে দিন।"

কথা শেষ করে সে পেছনে তাকাল, "চলো অর্ণব...!"

"কিন্তু যে ঝিলে আপনারা তেলের ট্যাঙ্কারটাকে ফেলেছেন, ঐ ঝিলে প্রচুর মাছ আছে।" একজন গোঁয়ার গোবিন্দ সাংবাদিক বলে উঠল, "এখন ঐ তেল খেয়ে কতগুলো মাছ মারা যাবে, তাদের কী? যিনি ঐ ঝিলে মাছ চাষ করছিলেন, প্রত্যেকটা মাছ তাঁর সন্তানসম। বারোহাজার লিটার তেল তো নষ্ট হলই তার সঙ্গে কতগুলো নিরীহ মাছ মরবে, এটাকে কীভাবে জাস্টিফাই করবেন?"

অধিরাজ অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়, "যিনি মাছ চাষ করছিলেন, অবশ্যই তাঁর কাছে মাছ সন্তানসম। এমনই তাঁর সন্তানস্নেহ যে কিছুদিন পরেই ঐ তথাকথিত সন্তানদের জালে তুলে, কেটেকুটে সাইজ করে তিনি বাজারে পাঠিয়ে দিতেন। মাছেরা অকালে শহীদ হয়ে আপনাদের ও তাঁর উদরপূর্তি করতে পারল না বলে দুঃখিত। বাই দ্য ওয়ে, বিষ মদ খেয়ে মরে যাওয়ার রেট এখন কী চলছে?"

"প্রব্যাবলি তিনলাখ টাকা।"

ভিড় থেকেই নারীকণ্ঠে উত্তর এল। অধিরাজ সেটা শুনে উত্তরদাতার দিকে না তাকিয়েই মাথা ঝাঁকায়, "বেশ। আমরা মাছেদের গার্জিয়ানকে বিষাক্ত তেল খেয়ে তাঁর সন্তানদের

অকালমৃত্যুর জন্য ঐ রেটই দিয়ে আসব। সরিও বলে আসব। প্রয়োজনে কচি মাছের বায়োলজিক্যাল মা-বাবারা যদি বেঁচে থাকেন, তবে তাদের কাছেও হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে আসব। দরকার পড়লে সি.আই.ডি. হোমিসাইড খেসারত হিসাবে বাবা মাছ ও মা মাছকে ব্যুরোর অ্যাকোয়ারিয়ামে সাঁতার কাটার চাকরি দেবে। ওকে? হ্যাপি?"

রিপোর্টাররা কে কী বলবে আর বুঝে পায় না। অধিরাজ কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে ফের পেছনে ঘুরতেই যাচ্ছিল হঠাৎই পেছন থেকে সেই নারীকণ্ঠ ডেকে উঠল, "স্যার.... এক মিনিট...!"

সে একটু বিরক্ত হলেও ফের দাঁড়িয়ে পড়েছে, "ইয়েস? আর কোনো প্রশ্ন বা ডাউট?"

রিপোর্টারদের ভিড়কে ঠেলেঠুলে প্রায় বুলডোজারের মতোই এক কমবয়েসি তরুণী সামনে এগিয়ে এল। পোষাক-আষাকে রিপোর্টার বলে মেনে নেওয়াটা একটু কষ্টসাধ্য। তবে চলনে-বলনে স্মার্ট ও বোল্ডনেসের ছোঁয়া। এক ঝলকে বখে যাওয়া কোনো কলেজ-পড়ুয়া মনে হতে পারে। অধিরাজ তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই মেয়েটি ধপাৎ করে তার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়েছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলল, "উইল ইউ প্লিজ, ম্যারি মি?"

"হো-য়া-ট!"

এরকম ভয়াবহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তা অধিরাজ স্বপ্নেও ভাবেনি। সে প্রায় আঁতকে উঠেছে। কয়েকমুহূর্তের জন্য থতোমতোও খেয়ে গেল। অর্ণব ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল, সাংবাদিকদের পেছনে আরও অনেক তরুণী, যুবতী ভিড় জমিয়েছে। তাদের হাতে প্ল্যাকার্ড। কোনোটায় লেখা 'অফিসার ব্যানার্জি, টেক মি টু ইয়োর হার্ট", আবার কোনোটায় 'ম্যারি মি মিঃ আই জি', 'রাজা, আই লাভ ইউ' টাইপেরও গোটা কয়েক বিপজ্জনক পোস্টার। এতক্ষণ সাংবাদিকদের নাচানাচিতে এবং টেনশনে প্রমীলাবাহিনীর পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডগুলো ওদের কারোর নজরে পড়েনি। এতক্ষণে লক্ষ্য করে অর্ণব প্রমাদ গুণল। অধিরাজ তার সামনের নতজানু মেয়েটিকে কিছু বলার আগেই, বা অন্যদের ভালো করে দেখার আগেই সে তাকে একরকম হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে অকুস্থল থেকে কেটে পড়ল। মৃদু স্বরে বলল, "চলুন স্যার।"

ঘটনার আকস্মিকতায় অধিরাজ নিজেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে! কোনোমতে বলল, "অর্ণব। এটা সি.আই.ডি. ব্যুরো না আমরা ভুল করে কোনো ম্যাট্রিমোনিয়াল অফিসে চলে এসেছি! এ সব কী ভুলভাল বকছে!"

"ছাড়ুন না।" অর্ণব তাঁকে টানতে টানতেই ব্যুরোর ভেতরে নিয়ে আসে,

"যত্তসব ফালতু ব্যাপার।"

অধিরাজ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তার পেটেন্ট উদ্ধতভঙ্গিতে গটগট করে হেঁটে চলে গেল। অর্ণবও দ্রুতগতিতে তার পাশে পাশে যাচ্ছিল। যদিও এখনও সে স্বাভাবিক হতে পারেনি। হাতের আঙুল আর পা এখনও অল্প অল্প কাঁপছে। তবু মেয়েগুলোর কীর্তি দেখে গা জ্বলে গিয়েছে তার। আশ্চর্য আবদার ওদের। সবাইকেই কি এখন ধরে ধরে স্যার বিয়ে করবেন! কী ভয়াবহ দুঃসাহস যে বলে 'টেক মি টু ইয়োর হার্ট।' বার্নিং শিখের কৃপাণটা হাতের কাছে পেলে নির্ঘাৎ ছুড়ে মারত সে! কতগুলো পাজির পাঝাড়া মেয়ে!

ব্যুরোয় নিজের চেম্বারে ঢুকে শরীরটাকে নিজের চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসল অধিরাজ। তারপর অর্ণবকে বলল, "তুমি তোমার মুখের ঐ চিলি পাউডারের মেক-আপ ধুয়ে এসো প্লিজ। দেখো ওয়াশরুমে সাবান, লিকুইড সোপ সবই পেয়ে যাবে। ভালো করে মুখটা ধুয়ে নাও। নয়তো অনেকক্ষণ জ্বালাবে।"

অধিরাজের স্বাভাবিক ও সহজ ব্যবহার দেখে ফের প্রচণ্ড অপরাধবোধ গ্রাস করেছে অর্ণবকে। তার একটা গাড়োলের মতো কীর্তির জন্য কত কথাই না শুনতে হচ্ছে লোকটাকে। আর এখনও সে কী অদ্ভুত স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে অর্ণবের সঙ্গে। যেন কিছুই হয়নি। কখনও পবিত্রর সামনে, কখনও এডিজি সেনের কাছে, কখনও মিডিয়ার কড়া প্রশ্নের

সম্মুখীন হয়েও আশ্চর্যভাবে গার্ড করে চলেছে তাকে। সারা রাস্তায় একটিও কড়া কথা বলেনি। একবারও অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। তার ক্ষমাসুন্দর চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে অর্ণবের মনে হল, এর চেয়ে অধিরাজ তেড়ে তাকে গালাগালি দিলেই বোধহয় সে খুশি হত!

অর্ণব আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে যায়। কিছু বলাও সম্ভব ছিল না। আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। চোখে বাষ্প জমছে। অধিরাজের ক্ষমার বোঝা বুঝি তার অপরাধের বোঝার চেয়েও বেশি ভারি। ঠান্ডা জলের ঝাপটা মুখে দিতে-দিতেই সে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকায়। নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে আজ যেন নিজেই চোখ মেলাতে পারছে না। নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এ কোন অর্ণব সরকারকে দেখছে! পবিত্র আচার্য ও শিশির সেনের কথা সম্পূর্ণ সত্যি। তার মধ্যে বোধহয় সত্যিই কোনো অশুভ শক্তি ঢুকে পড়েছে। যে হয়তো বার্নিং শিখে চেয়েও বিপজ্জনক। রিপোর্টাররাও ঠিকই বলেছে। তার রিজাইন দেওয়াই উচিত। ব্যুরোয় ঢোকার সময়ে তার মনে হচ্ছিল, সবাই বুঝি ব্যঙ্গমাখা দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে মনে বিদ্রূপও করছে। ভাবছে, অর্ণব সরকারের হিরো হওয়ার শখ হয়েছিল, কিন্তু জিরো হয়ে ফিরে এল। জুনিয়রদের মুখে চাপা বাঁকা হাসিটাও যেন অনুভব করতে পারছিল সে! কিন্তু কাকে বোঝাবে যে কী অদ্ভুত দোলাচলে রয়েছে তার মন। ওরা কেউ বুঝবে না।

বেশ খানিকক্ষণ ধরে নিজের সঙ্গেই একটা অসম লড়াই লড়তে লড়তে শেষে বিধ্বস্ত হয়ে অবশেষে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এল অর্ণব। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, অধিরাজ ফের আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। এই কেস উপলক্ষ্যে যে হারে সে স্মোক করতে শুরু করেছে তাতে দিনে হয়তো এবার কম সে কম পাঁচ প্যাকেট সিগারেট লাগবে! কিন্তু কিছু বলারও উপায় নেই। লোকটার মাথার ওপর যে কী ভয়াবহ চাপ আর স্ট্রেসের পাহাড় তা সে উপলব্ধি করতে পারে। তাই মুখে কিছু না বলে চুপচাপ তার সামনের চেয়ারে এসে বসল। অধিরাজও কোনো কথা না বলে তার হাতের ধূমায়িত সিগারেটটা অর্ণবের দিকে এগিয়ে দেয়, "নাও, কাউন্টার টানো।" অর্ণব সবিস্ময়ে তার দিকে তাকায়। সে যে নন স্মোকার তা অধিরাজের অজানা নয়।

তা সত্ত্বেও এভাবে কাউন্টার অফার করার মানে কী!

হালকা লাগছে! তার এতক্ষণের ডিস্টার্বড।

আড়ষ্ট নার্ভগুলোও যেন মুহূর্তের মধ্যে কিছুটা হলেও শান্তি পেল। নিকোটিনের বহু দোষের মধ্যে এই একটাই গুণ। ম্যাজিকের মতো আরাম দিতে পারে!

তার দিকে একদৃষ্টে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল অধিরাজ। একটু যেন সময় দিল। তারপর মৃদু হেসে বলল, "ইউ নো ডিয়ার, আমি ভালো করে বেঙ্গালুরুর কেস ফাইলটা দেখছিলাম। দিল্লি আর কানপুরের পুলিশকে কিছু বলার নেই। কারণ ওরা "আই নো, তুমি সিগারেটের ভক্ত নও।" আস্তে আস্তে বলল, "তার সঙ্গে এটাও জানি, ওয়ান্স ইন আ ব্লু মুন তোমারও ফোঁকাফুঁকির শখ হয়। বছরে কি দু-বছরে একটা কি দুটো স্টিক এনজয় করে থাকো। বিলিভ মি, আজ এই ধোঁয়াটা তোমার খুব দরকার। আমি লক্ষ্য করেছি, টেনশনে, স্ট্রেসে তোমার হাতের আঙুলগুলো অল্প অল্প হলেও কাঁপছে। বি স্টেডি অর্ণব। নিজের মধ্যে 'ট্রেমর' আসতে দিও না। এই মুহূর্তে এটাই তোমার নার্ভকে রিলিফ দিতে পারে। সো এনজয়। নাও...!"

সে অধিরাজ সিগারেটটা এগিয়ে দেয়। অর্ণব বিনা বাক্যব্যয়ে কিংসাইজ সিগারেটটা নিয়ে নেয়। গোটা দুয়েক লম্বা টান মারতেই মনে হল, সত্যিই বুঝি মাথাটা অনেক ভালোভাবে কিছু বোঝার আগেই বার্নিং শিখ বাজি মাত করে দিয়ে গিয়েছিল। দিল্লির অফিসাররা তো কিছু করার সময়ই পায়নি। ওরা ঠিক মতো ঘটনাটা বোঝার আগেই টপাটপ লাশ ফেলে দিয়েছিল সে। কানপুরের পুলিশেরও প্রায় একই অবস্থা। এই আপদটি ওদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না। বাট বেঙ্গালুরুর কেসটা একদম

আলাদা। ওদের কাছে বার্নিং শিখ মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। ওরা রীতিমতো হোমওয়ার্ক করে, কোমর বেঁধে রেডি হয়েই নেমেছিল। তা সত্ত্বেও সফল হয়নি। কেন জানো?”

অর্ণব ভীরু দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকায়। তার চোখে ফুটে উঠেছে একটা নীরব প্রশ্ন। সেটা বুঝতে পেরেই অধিরাজ উত্তর দেয়, “কারণটা খুব ইন্টারেস্টিং। যা যা স্টেপ নেওয়ার দরকার ছিল, ওরা তা নিয়েছিল। ফ্যামিলিগুলোকে সেফ হাউসে সরিয়েও নিয়েছিল। ওদের ইনফর্মার নেটওয়ার্কও সতর্ক করে দিয়েছিল, ঠিকঠাক খবরও যথাসময়ে দিয়েছিল। তবু শেষরক্ষা হল না। এর পেছনে এক ও অদ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ইনভিজিবল ম্যানিপুলেশন!”

“ইনভিজিবল ম্যানিপুলেশন?”

“হ্যাঁ অর্ণব।” সে উস্কোখুশকো চুলের মধ্যে ক্লান্তভাবে আঙুল চালাল, “শুনতে অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু এটাই বাস্তব। ১৯৮৪ সালের শিখ জেনোসাইডের পেছনেও কিছুটা এই ইনভিজিবল ম্যানিপুলেশনও ছিল। সবার চোখের সামনে এই দেশের শিখ বীর, কয়েকশো ফ্রিডম ফাইটার, হাজার হাজার আর্মি অফিসার এমনকি রাজা রণজিৎ সিং এর মতো নিদর্শনও ছিলেন। সবাই জানত শিখরা দেশপ্রেমী ও বীরের জাত। অথচ কী মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি দেখো! একটা জর্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালে, একটা বেয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং এর জন্য মানুষের মনে সেই শিখরাই ‘বেইমান’ বা ‘গদ্দার’ হয়ে দাঁড়াল। কয়েকশো বছরের ইতিহাস এক নিমেষে মিথ্যে হয়ে গেল। কেউ এটা ভাবলও না যে, যে বডিগার্ডরা বেয়ন্ত সিংকে স্পটেই মেরেছিল ও সতবন্ত সিংকে ধরেছিল তাদের মধ্যেও কোনো শিখ থাকতে পারে! তাদের চোখের সামনে একজনই ছিল, বেয়ন্ত সিং। আর তাকে দিয়েই সবাই গোটা শিখ প্রজাতিকে জাজ করেছিল। কিছু লোক সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল ঠিকই, আবার কারোর বা পলিটিক্যাল এজেন্ডাও ছিল। তার সঙ্গে ঐ ‘মবে’ এমন কিছু মানুষও ছিল, যারা হয়তো আদৌ ক্রিমিনাল মাইন্ডেড নয়, কিন্তু এই অদৃশ্য ম্যানিপুলেশন তাদেরও রাক্ষস বানিয়ে ছেড়েছিল! আর এত বছর পরে ঠিক সেই ইনভিজিবল ম্যানিপুলেশনকেই কাজে লাগাচ্ছে বার্নিং শিখ।”

অধিরাজ একটু চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, “বেঙ্গালুরুর পুলিশেরা সব কাজই ঠিকঠাক করেছিল। কিন্তু একটা জিনিসই সব পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে দিল। অবিশ্বাস! আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আর্মি আর পুলিশের মধ্যে, এমনকি খবরির ক্ষেত্রেও তুমি শিখদের সর্বত্র পাবে। ওরা সবচেয়ে বড়ো ভুল এইখানেই করেছিল। ওদের মধ্যে এমন সব সাহসী অফিসাররা ছিলেন যারা শিখ এবং তারা বার্নিং শিখের চ্যালেঞ্জ অ্যাক্সেপ্ট করতে পারতেন! ওরা তাদের কাউকে বিশ্বাস করেনি। এমনকি এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধটাকে বার্নিং শিখ এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে অফিসাররা নিজেরাই নিজেদের কলিগকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। এর ফলটা কী হয়েছে, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। স্পষ্ট করে কেসফাইলেই লেখা আছে। পড়তে চাও?”

অর্ণব ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেলেছে। স্তিমিত স্বরে বলল, “নো স্যার। আমি বুঝেছি আপনি কী বলতে চাইছেন। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।”

“ইটস ওকে অর্ণব। ভুল হওয়াটা লজ্জার কিছু নয়।” অধিরাজ তার কাঁধে হাত রেখে আন্তরিকভাবে বলে, “ভুল সবাই করে। আমি করিনি? ‘সার্জিক্যাল স’ কিলারের কেসটায় আমি নিজেই প্রচুর ভুলভাল কাজ করেছি, তোমার সঙ্গে ভীষণ রুড ব্যবহার করেছি, পবিত্র আর স্বয়ং ডককে তো প্রায় মারতেই গিয়েছিলাম! আশেপাশের কোনো পুরুষকে বিশ্বাস করতে পারিনি। আফটার অল, আমরা সবাই মানুষ! আজকে যে এডিজি সেন রেগেমেগে চেঁচাচ্ছিলেন, তিনি কি কখনও ব্লান্ডার করেননি? রথীন দাশগুপ্তর সম্পর্কে একটা মারাত্মক তথ্য উনি জানতেন, যেটা ঐ কেসটাকে বত্রিশ বছর আগেই সলভ করে দিতে পারত। ঐ একটি লিঙ্ক গোটা কেসের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু সিনিয়রের প্রতি ভালোবাসায়

আর আবেগে ভদ্রলোক বেমালুম সেই প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশনগুলো চেপে গিয়েছিলেন যার আফটার এফেক্ট বত্রিশ বছর পরে আমরা সবাই ভুগেছি। এটা তো তোমার তেলের ট্যাঙ্কারের ওপর গুলি চালানোর থেকেও অনেক বড়ো ব্লান্ডার! অথচ আজ সেই এডিজি সেনই তোমার ওপর চটেছেন। আসলে মানুষ শিশির সেন চেঁচাচ্ছেন না, ওঁর এডিজির চেয়ারটা চেঁচাচ্ছে। কারণ ওঁকেও প্রচুর জবাবদিহি করতে হয়। তাই ওঁর রাগটাকে তুমি ইগনোর করতেই পারো। পবিত্রর লাফালাফিটাকেও বাদ দাও কারণ এ কেসে সর্বপ্রথম গোলমালটা ও নিজেই করেছে। সেদিন যদি ব্যাটা বাইকে তেল ভরাতে ভুলে না যেত, তবে বার্নিং শিখকে ঐ ডাম্পিং গ্রাউন্ডেই ধরে ফেলার একটা ফেয়ার চান্স ছিল। মিডিয়াকেও ইগনোর করো, কারণ মিডিয়া যে কোনো ইস্যু পেলেই নাচতে শুরু করে। কিন্তু ওদের এবং জনগণের স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ। বড়োজোর তিনদিন ওরা লাফাবে,

তারপর ফের অন্য ইস্যু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। পাবলিকও তাই। কোনো ঘটনাই ঐ বার্নিং শিখের ডেডলাইনের মতো 'বাহাত্তর ঘণ্টা'র বেশি টেকে না। তাই এদেরও পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই। যদি এদের মধ্যে সত্যিই কিছু ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে তোমার নিজের মনোভাব। একটা ভুল আমরা অ্যাফোর্ড করতেই পারি অর্ণব। আমি, তুমি, পবিত্র, এডিজি সেন, সকলেই ভুল করতে পারি। কিন্তু একটা ভুল একবারই করো। তুমি প্রত্যেকবার নতুন নতুন ভুল করো, তাতে আমার আপত্তি নেই। বাট, একই ভুল বারবার রিপিট করবে কিনা, এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের ওপর নির্ভর করে। আর এটাই এইমুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।”

অর্ণব নার্ভাসভাবে হাতের সিগারেটটায় আর একটা লম্বা টান মারে। সে বুঝেছে, অধিরাজের তার মনের কথা অজানা নেই। তাই সে চুপ করেই থাকে।

“বার্নিং শিখের কাজ করার এটাও একটা প্যাটার্ন। সে ফিজিক্যাল প্রেশারের সঙ্গে সঙ্গে একটা হিউজ মেন্টাল প্রেশারও সবার ওপর চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধটা যতটা শারীরিক, তার চেয়েও বেশি মনস্তাত্ত্বিক।” অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, “আমি যে ইনভিসিবল ম্যানিপুলেশনের কথা বলছিলাম, সেটা সচরাচর প্রোডাক্টের মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অমিতাভ বচ্চন বা শাহরুখ খান যখন কোনো ব্র্যান্ডের অ্যাডে দেখা দেন, তখন কাস্টমাররা ভাবে ঐ ব্র্যান্ডটাই বেস্ট। তারা ঐ প্রোডাক্টটাই কিনতে দৌড়য়। কেউ তোমায় গান পয়েন্টে রেখে বলবে না, ওই প্রোডাক্টটাই কেনো। কিংবা হিপনোটাইজও করবে না। অথচ তুমি নিজেরই অজান্তে একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা ম্যানিপুলেটেড ও হিপনোটাইজড হয়ে যাচ্ছ। এগজ্যাক্টলি সেম মেথড নিয়েছে বার্নিং শিখ। সে জানে, পুলিশ গর্দভ নয়। তারা ঠিকই ধরতে পারবে যে কোনো-না কোনোভাবে খবর লিক হচ্ছে। কিন্তু পুলিশের এই জানা বা আন্দাজ করার শক্তিটাকেই সে নেগেটিভ ভাবে তাদেরই বিরুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। ওর প্রত্যেকটা মুভমেন্ট ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলে বুঝবে, একবারের জন্যও লোকটা গোপন করার চেষ্টা করছে না যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ভেতর থেকেই ও খবরগুলো জোগাড় করেছে বা করছে। বরং এটাই প্রুভ করার চেষ্টা করছে যে, দেখো, তোমাদের মধ্যেই এক বা একাধিক মীরজাফর বা বিভীষণ বসে আছে। এটা ও এত সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল যে বেঙ্গালুরুর ডাকসাইটে অফিসাররা পর্যন্ত নির্বোধের মতো একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। আর কোনো টিমওয়ার্কের ক্ষেত্রে যদি এই জাতীয় সন্দেহ একবার ঢুকে যায়, তবে ওখানেই তাদের বারোটা বাজল। এইক্ষেত্রেও সে ঐ একই টেকনিক ইউজ করছে। বার্নিং শিখ জানে, টিমে কোনো না কোনো অফিসার নিশ্চয়ই আছে যে ..

তুলনামূলক সফট টার্গেট। আর ওর এই অদৃশ্য ম্যানিপুলেশন, সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কারোর না কারোর ওপর কাজ করবেই। স্বাভাবিকভাবেই ঐ অফিসার পুলিশের হয়ে কাজ করলেও সুবিধাটা দেবে বার্নিং শিখকেই। কপাল দেখো, আমরা ওর হাতিয়ার খুঁজে বেড়াচ্ছি, অথচ আমাদের টিমের মধ্যেই একটা মারাত্মক হাতিয়ার ও ফিট করে রেখেছে। সেটা তুমি! তুমি যে ওর হিপনোসিস ও ম্যানিপুলেশনের ফাঁদে পড়ে গিয়েছ তা আমিও তখন

বুঝতে পারিনি। ভুলটা কিছুটা আমারও বটে।”

“ইন দ্যাট কেস, আমার বোধহয় সত্যিই এই কেসটা থেকে সরে যাওয়া উচিত স্যার।” অর্ণবের চোখটা কড়কড় করে উঠল। সে কাঁপা স্বরে বলে, “আপনার প্রত্যেকটা কথা সত্যি। আমি সত্যিই সবাইকে সন্দেহ করছি। মিস্ টুইঙ্কল অরোরাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। সবক্ষেত্রেই ওর দুমদাম করে এগিয়ে যাওয়াটা সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। গুল্লুর নাম শুনলে আমার বুক কাঁপছে। ওর খবরের ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারছি না। আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না যে কোমল কৌর আমাদের আসার খবর আগে থেকেই জানতেন, ও তিনি একগাদা বন্ধ নিয়ে আমাদের ওড়াবার জন্য ফাঁদ পেতে বসেছিলেন। কোমল কৌরের লিডটা গুল্লুই দিয়েছিল...!”

বহুক্ষণ ধরে বুকের ভেতর চেপে বসে থাকা পাষাণভারটাকে শেষ পর্যন্ত অর্ণব উগরেই দিল। অধিরাজও চাইছিল যে অবিশ্বাস ও সংশয়ের কথা সে নিজের মুখেই বলুক। তার স্বীকারোক্তি শুনে হেসে ফেলল সে, “হায় ভগবান। তুমি এখনও কোমল কৌরকে পাকড়েই বসে আছ। কে বলেছে যে উনি জানতেন যে আমরা সেদিনই ওঁর কাছে যাব? উনি শুধু এইটুকু জানতেন যে কোনো-না কোনো সময় পুলিশ ওঁর কাছে ঠিকই পৌঁছবে। কোমল অসম্ভব বুদ্ধিমতী, তাই শুরু থেকেই এটুকু আন্দাজ করে নেওয়া ওঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। সেজন্যই ভদ্রমহিলা অনেক আগে থেকেই রেডি হয়ে বসেছিলেন। আমরা গুল্লুর খবর শুনে সেদিন না গিয়ে যদি একমাস পরেও যেতাম, তাহলেও একই ঘটনা ঘটত।”

অর্ণব এবার সত্যিই আকাশ থেকে পড়ল, “মানে? উনি জানতেন না যে ঐদিনই সি.আই.ডি. হোমিসাইড ওঁর বাড়ি যাবে? কিন্তু উনি তো বলেছিলেন সকালেই ওঁর কাছে খবর ছিল...!”

অধিরাজ কুলকুল করে হেসে উঠেছে, “ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন অর্ণব। কোমল কৌর বললেন, আর অমনি তুমিও বিশ্বাস করে ফেললে! নিজেই একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো, যদি সত্যিই ওঁর আমাদের যাওয়ার কথা আগেই জানা থাকত, তবে কি উনি হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিডের বারোখানা কন্টেনার, একগাদা বম্বের মালমশলা ও কিছু অর্ধসমাপ্ত বম্ব আমাদের নাকের সামনেই রেখে দিতেন? যে মহিলা এতখানি বুদ্ধি ধরেন, তিনি জানেন না যে সি.আই.ডি. ওঁর ঘর সার্চ করে সমস্ত মালমশলা বাজেয়াপ্ত করবে? উনি তো বার্নিং শিখের হাতে অস্ত্রগুলো তুলে দেওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। কোমল জানতেন ঐ মুহূর্তে তাঁর স্নেহভাজন খুনিটির হাতে উপরোক্ত একটি অস্ত্রও নেই। বিন্দুমাত্র আশঙ্কাও যদি ওঁর মনে থাকত তবে কি বার্নিং শিখকে অন্তত ওর অস্ত্রগুলো পাচার করে দিতেন না? পুলিশ কতক্ষণে এসে সব মাল তুলে নিয়ে যাবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকতেন?”

“কিন্তু ঐ ব্লাস্টটা!” অর্ণব বেয়াকুবের মত জানতে চায়, “ওই ফাঁদটা তো উনি আমাদের জন্যই পেতেছিলেন।”

“একেবারেই না।” সে একটা বাচ্চা ছেলেকে যেভাবে বোঝায়, তেমনভাবেই বলল, “যুক্তিতে এসো অর্ণব। আমি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে আগের দিন ভোররাতে যে মুহূর্তে গুল্লুকে ঐ প্রোফাইলের মানুষজনকে খুঁজতে বলেছিলাম, সেই মুহূর্তেই কোমল খবর পেয়েছিলেন যে সি.আই.ডি. হোমিসাইডের পদধুলি তাঁর বাড়িতে পড়তে চলেছে, তাহলেও ঐ শেষ রাত থেকে পরের দিন অবধি ওঁর হাতে মাত্র কয়েকঘণ্টাই সময় ছিল। ওঁর বাড়িতে যে ব্লাস্টটা হয়েছিল সেটা কোনো ছোটোখাটো ব্লাস্ট নয়। একাধিক শক্তিশালী বম্ব উনি সারা বাড়িতে ফিট করে রেখেছিলেন। এমনকি আস্ত একটা রিমোটও ডিটোনেটর হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিল। অতগুলো বন্ধ তৈরি করা, রিমোট তৈরি করা, রিমোটের সঙ্গে প্রত্যেকটা বম্বকে কানেক্ট করা, এতকিছু কি আদৌ ঐ হাতে গোণা কয়েকঘণ্টার মধ্যে সম্ভব? কোমল উঠবেন, হেঁটে মালমশলা অবধি যাবেন, একটা একটা করে পিস সংগ্রহ করবেন, ওঁর যা বয়স আর স্পিড, তাতে শুধু এইটুকু করতেই দু-তিন ঘণ্টা চলে যাবে! সেই তিনিই কী করে অলৌকিক স্পিডে পরোটা ভাজার মতো অতগুলো বন্ধ তৈরি করে, সেগুলোকে প্ল্যান্ট করে,

রিমোট বানিয়ে কানেক্টও করে ফেললেন! এত স্পিড যদি সত্যিই থাকত তবে কি পুলিশকে দেখানোর জন্য বম্ব আর সিলড অ্যাসিডের কন্টেনার নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতেন? তোমার পুরো ব্যাপারটা অসম্ভব মনে হচ্ছে না?”

এতক্ষণে যেন অর্ণবের মাথা কাজ করতে শুরু করল। সত্যিই তো! অতগুলো বন্ধ তৈরি করে, গোপন জায়গায় প্ল্যান্ট করে, রিমোটের মতো আস্ত ডিটোনেটর ডিভাইস তৈরি করে অ্যাক্টিভেট করে দেওয়া অত কম সময়ে আদৌ সম্ভবই নয়! তাছাড়া স্যারের যুক্তি অকাট্য। সত্যিই যদি কোমলের কাছে ওদের যাওয়ার খবর থাকত, তবে তিনি বোকার মতো সব প্রমাণ ফেলে ছড়িয়ে রাখতেন না। অন্তত কোনো গোপন জায়গায় পাচার করতেন যাতে পুলিশ খুঁজে না পায়। যুক্তিগুলো শোনার পর নিজেকে একটা আস্ত গর্দভ বলে মনে হচ্ছিল তার। তবু সে আমতা আমতা করে বলে, “তবে কোমল বললেন কেন যে উনি আগেই জানতেন?”

“কারণ উনি বার্নিং শিখের সুযোগ্য দিদি।” অধিরাজ মুচকি হাসল, “একা তুমি নও, আমিও একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম ঐ মুহূর্তে। কোমল জানতেন যে এমন একটা দিন ওঁকে দেখতেই হবে। বহুদিন আগে থেকেই এই সুইসাইড মিশনের প্রস্তুতি নিয়েও বসে ছিলেন। এ-ও জানতেন, আর কয়েক মিনিট পরেই ওঁর মৃত্যু অবধারিত। ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। তা সত্ত্বেও ভ্রাতৃপ্রেমে অন্ধ মানুষটি জীবনের শেষ মুহূর্তেও আমাদের ঘেঁটে ‘ঘ’ করার জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবেই মিথ্যে কথাটা বলেছিলেন। যাতে বার্নিং শিখের তৈরি করা অবিশ্বাসের ফাঁদটা আরও পোক্ত হয়। একমুহূর্তের জন্য হলেও আমিও ঐ ফাঁদেই পা রাখতে যাচ্ছিলাম। পরে যখন ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখলাম, তখনই লাস্ট মোমেন্টের মাস্টারস্ট্রোকটা বুঝতে পারলাম। তখন থেকেই ঠিক করেছিলাম, পৃথিবী উলটে গেলেও ঐ ভয়াবহ ম্যানিপুলেশনের জালে কিছুতেই জড়াচ্ছি না। একজন মীরজাফরের জন্য মীরমদন, মোহনলালদের ওপর সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না। তাতে যদি সিরাজের মতো অবস্থাও হয়-তাই সই।”

অর্ণব কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। নিজেকে নিজেই মনে মনে গালাগালি দিচ্ছিল সে। আরও একবার লজ্জিত কণ্ঠে বলল, “এক্সট্রিমলি স্যরি। এডিজি সেন ঠিকই বলেছেন। আমি একটা গাধা...।”

অধিরাজ মিষ্টি হাসছে, “ওরকম না ভেবে তুমি নেগেটিভ ব্যাপারটাকেও পজিটিভলি নিতে পারো। যেমন ধরো, তুমি সদ্য পাটভাঙা একটা চমৎকার বহুমূল্য শেরওয়ানি পরে সবে ঘর থেকে বেরিয়েছ। ঠিক তখনই একটা কাক বা পায়রার পেট হালকা করার শখ হল! সে তোমার বিন্দুমাত্রও অনুমতি না নিয়ে তোমার গায়ে...ইয়ে করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো লোক দাঁত কিড়মিড় করে কাক বা পায়রার গুষ্টির তুষ্টি করবে। তাই না?” '

“সেটাই তো নর্মাল রি-অ্যাকশন।”

“হ্যাঁ।” তার চোখে ও ঠোঁটে দুষ্টু হাসি খেলা করছে, “কিন্তু তুমি ব্যাপারটাকে অন্যরকমভাবেও ভাবতে পারো। কাকের বা পায়রার কীর্তি দেখার পর তুমি ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাতে পারো, ভাগ্যিস গরু বা হাতি আকাশে উড়তে পারে না। যদি একটা উড়ন্ত গোরু বা হাতির পেট খালি করার শখ হত, তবে ভেবে দেখো তুমি আর তোমার পেয়ারের শেরওয়ানি কোথায় থাকতে। তেমনই যে লোকেরা তোমায় সাধারণ সার্ভিস গান ফায়ার করতে দেখে লম্ফ মারছে, তাদের উদ্দেশ্যে তুমি বলতেই পারো যে, ভাগ্যিস, আমার হাতে সাধারণ রিভলবার ছিল। তার বদলে যদি রকেট লঞ্চার থাকত তবে কী হত তা একবার ভেবে দ্যাখ।” বলতে বলতেই সে চোখ টেপে, “এই পয়েন্টটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ডার্লিং।”

এবার অর্ণব সজোরে হেসে উঠল। তার মনের ভেতরের সমস্ত গ্লানি বুঝি একলহমায় মুছে গিয়েছে। হাতের সিগারেটটাও ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। সে টেবিলের ওপরে রাখা অ্যাশট্রেতে সমাপ্ত সিগারেটের বাটটা গুঁজে দিল দেখে অধিরাজ একটু হতাশ হয়ে বলে,

“যাঃ! তুমি তো পুরোটাই শেষ করে ফেললে। আমি সবে একটাই সুখটান মেরেছিলাম.....”

“আপনি অনেকগুলো অলরেডি খেয়ে ফেলেছেন স্যার।” অর্ণব এতক্ষণে হালকা হয়েছে। সে এবার একটু হেসে বলল, “তার ওপর আবার স্মোকিং প্রোমোট ও করছেন।”

“প্রোমোট করছি না ডিয়ার।” সে হাসল, “তবে চতুর্দিকটা এতটাই বিষাক্ত যে শরীরে অল্পস্বল্প বিষ মজুত রাখাও কখনো-কখনো ভালো রেমিডি। কিন্তু তোমার মনে আরও একটা ‘কিন্তু’ আছে অর্ণব যেটা নিকোটিনের চেয়েও বিষাক্ত। সেটা বললে না তো?”

এবার অর্ণব একটু বিস্মিত হয়। আর কোন ‘কিন্তু’র কথা বলছেন স্যার? যা বলার ছিল, তা তো সে বলেই দিয়েছে। এরপরও কিছু বাকি আছে কি?

“তোমায় মিস্ অরোরা চিৎকার করে শ্যুট করতে বারণ করেছিলেন। তারপরও তুমি থামলে না কেন? শুধুই কি অবিশ্বাস? না একজন লেডি অফিসার বারণ করছেন বলে তোমার ইগো হার্ট হয়েছিল?”

সে রীতিমতো শিউরে ওঠে। মনের অন্দরের এত বড়ো গোপন কথাটা কোন মন্ত্রবলে জেনে ফেললেন স্যার। টুইঙ্কল অরোরাকে যে অর্ণব পছন্দ করছে না, একজন মেয়ের এতখানি গুরুত্ব দেখে সে যে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তা উনি কী করে বুঝে ফেললেন! অদ্ভুত মানুষ একটা! সত্যিই কি ওঁর মধ্যে কোনো সুপার পাওয়ার আছে?

অধিরাজ তার নীরবতার পেছনের অর্থ খুব সহজেই বুঝে নিল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, “সর্বনাশিনীর কেসটাতেও দেখেছিলাম তুমি অ্যাডেলিন বাজাজের কাছে হেরে গিয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গিয়েছিলে। এখন মিস্ অরোরা তোমার ফ্রাস্ট্রেশন আরও বাড়াচ্ছেন। কেন অর্ণব? এই ছোট্ট একটা ‘মেল ইগো'কে কেন তুমি অতিক্রম করতে পারছ না? মিস্ অরোরা, মিস্ দত্ত কিংবা মিস্ বোসকে আমি নিতান্তই আই.পি.সি.-র ল’ মেনে ‘লেডি অফিসার' বলতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু ওঁরা আমার চোখে প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রতিভাবান ও পোটেনশিয়াল অফিসার, যেমন তুমি, পবিত্র কিংবা প্রণবেশদা। একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখো, লেডি অফিসারদের থেকে কিন্তু আমরা আদৌ বেটার নই। বরং ওঁরা আমাদের থেকে অনেক বেশি সুপিরিয়র। যে মুহূর্তে তুমি এটা বুঝবে, সেই মুহূর্ত থেকেই ওদের ‘বসিং’ তোমার খারাপ লাগবে না।”

“সুপিরিয়র ইন হোয়াট সেন্স?” অর্ণব এবার একটু রেগে গিয়েই বলে, “বসের সামনে ফুঁকফুঁক করে চুরুট ফোঁকায় না কথায় কথায় হাতা গুটিয়ে ফেলায়?”

“সামনে যদি কোমল কৌর কিংবা জগদীপ সিং ভাট্টির মতো নমুনা থাকে তবে হাতা গোটানোয় তো আমি কোনো দোষ দেখছি না। আর আমি ফুঁকতে পারি, পবিত্র ফুঁকতে পারে, তবে উনি কী দোষ করেছেন?” অধিরাজ স্মিত হাসল, “তবে ও কাজগুলো প্রণবেশদাও পারেন। আমি সেদিক দিয়ে সুপিরিয়র বলছি না। একটা জিনিস তুমি কখনও ভেবেছ কি? মেয়েদের প্রকৃতি অনেকরকম লড়াইয়ের মধ্যে ফেলে। আমার সুপার-ওম্যান মা ও এককালে মাসের কয়েকটা দিন সম্পূর্ণ বিবর্ণ, বিধ্বস্ত হয়ে .যতেন। তুমি তো ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলে, আরও ভালো জানবে। প্রকৃতি প্রতিটি মেয়েকে একটা আলাদা লড়াইয়ের মধ্যেই ফেলে দিয়েছে। তাদের দেহের গঠনও পুরুষদের থেকে আলাদা, ঝামেলাও অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও ওঁরা আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অপরাধীদের চেজ করেন। সমানতালে দৌড়ে যান, মারপিট করেন, অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমও করে থাকেন। অষ্টপ্রহর ঝুঁকি নেন। এই বাহাত্তর ঘণ্টায় ওঁরাও আমাদের মতো একফোঁটাও রেস্ট নিচ্ছেন না। আমাদের শুধু ক্রিমিনালদের সঙ্গে লড়তে হয়। আর ওঁরা একদিকে ক্রিমিনালদের সঙ্গে সমানতালে লড়ছেন, তার সঙ্গে নিজেদের ন্যাচারাল দৈহিক সমস্যাগুলোর সঙ্গেও নিরন্তর পাঞ্জা কষছেন। তাহলে তুমিই বলো, কে বেশি শক্তি রাখে? ওঁরা না আমরা?”

অর্ণব সম্পূর্ণ নীরব। সে বুঝতে পেরেছে, এখানে সত্যিই কিছু বলার নেই। অধিরাজ মেয়েদের সম্পর্কে উদাসীন হওয়া সত্ত্বেও যে সারসত্য উপলব্ধি করেছে, তা তার মোটা মাথায় কখনোই ঢোকেনি। সে মুখ নীচু করেই থাকে। অধিরাজ তার দিকে আড়চোখে

তাকিয়ে বলল, "শুধু এইটুকুই নয়। তুমি জানো, আমার কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো হিরো কে?"

"কে স্যার?"

অর্ণবের প্রশ্নে স্মিত হাসল সে, "আমার মা! তাঁর থেকে বড়ো হিরো আমি দেখিনি।

আমার বাবা একাই যা ইনকাম করেন তাতে বাড়িতে আম্বানির মতো পাঁচশো চাকর-বাকর না রাখতে পারলেও অন্তত দশ-বারোটা চাকর-দাসী রাখার ক্ষমতা তিনি রাখেন। তবে বাবা আবার কট্টর মার্কসবাদীও বটে। অন্য মানুষের শ্রম গ্রহণ করতে তাঁর বেজায় আপত্তি। তাই প্রথমে কোনো হেল্পিং হ্যান্ড রাখেননি। অথচ পরে মা যখন অ্যানিমিয়ায় প্রবল অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন, তখন ঠ্যালা খেয়ে আদর্শও মাথায় উঠেছিল। হিস্টো তখনই এন্ট্রি পায়। মানুষের ভালোবাসা সঙ্কটে পড়লে মার্কসবাদীও সোজা হয়। বাবাও বাধ্য হয়ে আরও বেশ কিছু লোক রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মা কিছুতেই অ্যালাউ করবেন না। ওঁর বক্তব্য, প্রোফেশনাল সার্ভেন্ট ঠিক ততটুকুই করবে, যতটা করার জন্য তারা টাকা পায়। তাদের কাজে প্রোফেশনালিজম থাকবে কিন্তু ভালোবাসা, আদর, যত্ন থাকবে না। প্রিয় মানুষগুলোর প্রতি ডেডিকেশনও থাকবে না। ওরা জানে না যে বাবা ডিনারে কী খেতে পছন্দ করেন, কিংবা আমার অন্যতম ফেভারিট ডিশ কী। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ বাড়িটা ওদের নিজেদের নয়। যা নিজের নয়, স্বাভাবিকভাবেই তাকে রক্ষা করার দায়ও ওদের নেই। মা, তাঁর নিজের রাজ্য নিজেই রক্ষা করে বেড়ান। সঙ্গে বহুবছরের সঙ্গী হিস্টো! ওঁকে কোনোমতেই দাসী ভেবো না, বরং উনিই এ রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। ওঁর কথাই আমাদের জীবনে শেষ কথা। ওঁর সিদ্ধান্তই শেষ সিদ্ধান্ত। আমরা তো কোনো কম্মেরই নই। ভদ্রমহিলা সেই ভোর থেকে নিজের ডিউটি চালু করে দেন, মাঝরাতের আগে সে ডিউটি শেষই হয় না। আমরা তবু কালেভদ্রে ছুটি পাই, অথচ মায়ের কোনো ছুটি নেই। ওঁকে দেখেই আমি জেনেছি স্বনির্ভরতা কাকে বলে, ডেডিকেশন জিনিসটা ঠিক কী। মানুষের সামান্য একটা রাজ্য চালাতে একগাদা হেল্পিং হ্যান্ড লাগে, কিন্তু ঈশ্বর একাই তাঁর গোটা পৃথিবীটা সামলাতে পারেন। তাই ওঁর বসিং মেনে নিতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমি বা বাবা নিজেরাই নিজেদের কাজ করে নিতে পারি, তার জন্য কোনো বাটলার লাগে না। আমি নিজে যে পদে আছি, তাতে আমাদের আশেপাশে অন্তত একডজন গার্ড থাকার কথা। অথচ আমার পাশে একটাও থাকে না। তারা সবাই আমার বাড়ি পাহারা দেয়, ঐ পর্যন্তই। মা আমায় শিখিয়েছেন, নিজেকে নিজেই রক্ষা করতে হয়। তাঁর শিক্ষাতেই আমি শিক্ষিত।" সে একটু থেমে ফের বলল, "সেই শিক্ষাই আমায় বলে দেয় যে এই লেডি অফিসাররা কী পরিমাণ পরিশ্রম করে থাকেন। এই মারাত্মক বাহাত্তর ঘণ্টার পর তুমি, আমি, পবিত্র বা প্রণবেশদা বাড়ি ফিরে হোমমেড খাবার গিলে স্রেফ বিছানায় উলটে পড়ে ঘুমোব। কিন্তু মিস্ দত্ত বা মিস্ বোসের ছুটি নেই। আমি যতদূর জানি ওঁরা কাজের সুবিধার জন্য পরিবারের থেকে আলাদা থাকেন। মিস্ মুখার্জিও তাই। এই বাহাত্তর ঘণ্টার পর হতক্লান্ত হয়ে ওঁরা নিজেদের ফ্ল্যাটে ফিরবেন, তিনদিনের অগোছালো ঘর পরিষ্কার করবেন, হয়তো বা রান্নাবান্না-ঝাড়াপোঁছা, ডাস্টিং-ক্লিনিং, কাপড় কাচা, সবই করতে হবে ওঁদের। তারপর দু মুঠো খেয়ে একটু বিশ্রাম নিতে যাবেন। এতরকমের চ্যালেঞ্জ ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ওঁরা সবাই যান। যাদের তুমি চোখে দেখছ, শুধু তাঁরাই নন, আমার মোস্ট ফেভারিট কিরণ বেদী ও দময়ন্তী সেনকেও বোধহয় এইভাবেই ঘরেবাইরে খেটে মরতে হয়েছে। ওঁরা শুধু আই.পি.এস. নন, কারোর গৃহিনী, কারোর মা-ও বটে। আমরা একটা ডিউটির ঠ্যালায় চোখে অন্ধকার দেখি। ওঁরা তিনটে রীতিমতো হেকটিক ডিউটি নিশ্চুপে করে যান। আমরা ওঁদের খাটুনি না কমাতে পারি, কিন্তু সেই পরিশ্রমের যথাযোগ্য সম্মানটুকুও কি দিতে পারি না? কী বলো তুমি? মেয়ে বলে কি ওঁরা আমাদের কলিগ হওয়ার যোগ্য নন?"

অর্ণবের মনে হল অধিরাজের শান্ত, নম্র কথাগুলো তাকে একভাবে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় মেরে গেল। কেউ যেন তার মনটাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তার সামনেই তুলে

ধরল। কবীরের একটা বিখ্যাত দোঁহা মনে পড়ে যায়, 'বুরা যো দেখন ম্যাঁয় চলা, বুরা ন মিলিয়া কোয় / যো দিল খোজা আপনা, মুঝসে বুরা ন কোয়।' সে ধরা পড়া চোরের মতো অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "স্যরি স্যার।"

"বারবার স্যরি বোলো না অর্ণব। দোষটা তোমার একার নয়, গোটা পুরুষ প্রজাতিরই। আমরা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ঐশ্বর্য রাইয়ের মতো মেয়েদের স্বপ্ন দেখি, কিন্তু পদ্মা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতালী-মধুমিতার মত ফিমেল ওয়ারিয়রদের স্বপ্নসুন্দরী বানাই না। বাড়ির মেয়ে মা লক্ষ্মীর প্রতীক হলে গর্বিত হই, কিন্তু নীরজা ভানোট কার্গিল গার্ল গুঞ্জন সাক্সেনার মত মেয়ে আমরা চাই না। এটা সোসাইটির প্রবলেম। বাট, তুমি বুঝদার।" অধিরাজ হাসল, "আমার ধারণা, একটু চেষ্টা করলেই তুমি এই ট্যাবুগুলো থেকে বেরিয়ে আসবে। একদিনে হবে না। কিন্তু রোজ চেষ্টা করলে একদিন নিশ্চয়ই হবে। আমিও একটা অদ্ভুত সমস্যার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রোজ লড়ছি, তুমিও লড়ো। মিস্ অরোরাকে 'লেডি' না ভেবে একজন জেনারেল কলিগ ভাবার চেষ্টা করো। দেখবে, খারাপ লাগবে না।"

এর উত্তরে অর্ণব কী বলবে ভাবছিল। তার আগেই কেবিনের দরজা সশব্দে খুলে গেল। ওরা দু-জনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল আহেলি ব্যুরোয় এসে উপস্থিত। সে রীতিমতো হন্তদন্ত হয়ে গটগট করে কেবিনে ঢুকছে। তার পেছন পেছন পোষা বিড়ালের মতো টুইঙ্কল অরোরা। আহেলির হাতে একটা নীল রঙের ফাইল। সে কোনোরকম ভূমিকা না করেই অধিরাজের নাকের সামনে সেটাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার মার্ডার ওয়েপনের প্রবলেম সলভড। এই নিন ফাইনাল রিপোর্ট। বলেছিলাম আজ রাতে দেব৷ ফোনে গোটা রিপোর্টটা বলা সম্ভব নয়, আর আপনারা ল্যাবে এলেন না। তাই নিজেই নিয়ে চলে এলাম।।"

অধিরাজ তার হাত থেকে ফাইলটা নিয়ে নেয়, "ওয়েপন ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাসই তো? না আরও কিছুর কম্বো আছে?"

"না। আর কোনো কম্বো নেই। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে দুটো গ্যাসের পরিমাণটা। পি পি এম আর পার্সেন্টেজটা দেখুন আমি রিপোর্টে মেনশন করে দিয়েছি।" আহেলি একটু চিন্তিত, "ঐ পার্সেন্টেজ বা পি পি এম যদি একচুলও এদিক ওদিক হত তবে গ্যাস দুটোর প্রভাব এতখানি মারাত্মক হত না। যাঁর মাথা থেকে এই দুর্বুদ্ধি বেরিয়েছে অফিসার, তিনি জিনিয়াস লেভেলের লোক নিঃসন্দেহে। রীতিমতো অঙ্ক কষে একদম নির্ভুল পরিমাণটি বের করেছেন।"

"জানি। তিনি যে কী পরিমাণের জিনিয়াস তার প্রমাণ হাতেনাতেই পেয়েছি।" অধিরাজ চিন্তান্বিত মুখে রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে বলল, "মার্ডার ওয়েপনের কেস অর্ধেক সলভ হল। বাকি অর্ধেক এখনও অন্ধকারে। গ্যাসদুটো যে কোথা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে তা এখনও বুঝতে পারছি না! বেডরুমের লাইট, ফ্যান, এসি খুলে, দেওয়াল ঘুষিয়ে টুষিয়ে দেখলাম, কোথাও কিচ্ছু নেই। কোনো ফাঁকা জায়গা, কোনো ভেন্টিলেটর নেই যা দিয়ে ওটা ইনসার্ট করা সম্ভব। আবার কেউ দু-দুটো গ্যাসের ক্যানিস্টার ঘাড়ে নিয়ে এসে এসব কীর্তি করছে, সেটাও ঠিক হজম হচ্ছে না। কিছু একটা প্যাঁচ আছে যা আমরা ধরতেই পারছি না। আপনার কী মনে হয়?"

"আমি জানি না অফিসার।" আহেলির মুখও চিন্তান্বিত, "আপনারা এয়ার পিউরিফায়ারগুলোকে তো এনেছেন। কিন্তু ওর মধ্যেও কোনো কারিকুরি নেই। সিম্পল এয়ারপিউরিফায়ার। ভেতরে কোনোরকম ভুলভাল জিনিস ফিট করা নেই। আমি সবকটাকেই খুলে টুলে দেখেছি। ইভেন, মেকানিককে দিয়েও চেক করিয়েছি। নিতান্তই নিরীহ জিনিস। তবে একটা জিনিস বুঝেছি। ওগুলো বিষাক্ত গ্যাস ছাড়তেই পারবে না কারণ কোনো এয়ারপিউরিফায়ারই কাজ করছে না। সম্প্রতি বোধহয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মেকানিককে দিয়ে ওগুলো ঠিকও করিয়েছি। আর একটা পয়েন্ট, আমি অন্যান্য ক্রাইমস্পটগুলোর ছবিও খুঁটিয়ে দেখলাম। প্রতিটা স্পটেই একটা অটোম্যাটিক এয়ার ফ্রেশনার ছিল। হয়তো তার গন্ধেই ফসজিনের মৃদু গন্ধ চাপা পড়ে গেছে৷ অন্তত এমন হওয়া

অসম্ভব নয়। কিন্তু এয়ার ফ্রেশনারগুলোর মধ্যেও কিছু নেই। টুইঙ্কল শুকে দেখেছে বলল।"

"তবে ভুলটা হচ্ছে কোথায়।..." বলতে বলতেই অধিরাজের চোখ পড়ল অর্ণবের দিকে। টুইঙ্কল অরোরা ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেচারি অর্ণব এমনিতেই মরমে মরে আছে। তার ওপর টুইঙ্কলের সামনে আরও বেশি যেন অপ্রস্তুত। সে হঠাৎই বলে উঠল, "আরে অর্ণব, তুমি যে বলছিলে মিস্ অরোরাকে বার্নিং শিখকে অমন মারাত্মক চেজ করার জন্য চকোলেট খাওয়াবে? তা এখনই খাইয়ে দাও না। এই তো সুযোগ।"

"আমি। চকোলেট...।" অর্ণব প্রায় আকাশ থেকে পড়তে পড়তেই শেষমুহূর্তে কোনোমতে বুদ্ধির প্যারাশ্যুট খুলে নিজেকে সামলে নেয়, "ও... হ্যাঁ...হ্যাঁ। তাই তো! ভুলেই গেছিলাম স্যার।"

অধিরাজ ঘড়ির দিকে তাকায়, "ব্যুরোর সামনের দোকানটা বোধহয় এখনও খোলা আছে। আর ওখানে ম্যাগনাম সাইজের খুব ভালো চকোলেটও পাওয়া যায়। কিন্তু মিস্ অরোরা চকোলেট খান কি? উনি যেভাবে বডি বিল্ডিং করে অভ্যস্ত তাতে তো...।" সে কথা শেষ করার আগেই টুইঙ্কল প্রায় লাফিয়ে উঠল, "স্যার, আমি একসঙ্গে পাঁচ, ছ-টা চকোলেট বার খেয়ে নিই। তারপর দরকার পড়লে আরও এক্সট্রা দু-তিন ঘণ্টা জিম করে নেব। বাট চকোলেট ছাড়ার কোনো চান্স নেই।"

আহেলি মুখ টিপে হাসে, "পাঁচ-ছটা ম্যাগনাম সাইজের চকোলেট একসঙ্গে খেলে কিন্তু ভুঁড়ি অবধারিত। আর একটু আগেও তুমি খিদে পেয়েছে বলে দুটো বড়ো সাইজের পিৎজা খেয়েছ! তাও মিডিয়াম বা লার্জ নয়, দস্তুরমতো ফ্যামিলি প্যাক!" টুইঙ্কল উত্তেজিত, "ভুঁড়ি! ভুঁড়ি হোক আমার দুশমনের। আমার পেট একদম সলমন খানের মতো ঝাক্কাস। এই দেখুন...।"

সে তেড়েফুঁড়ে নিজের 'ঝাক্কাস' পেট দেখানোর জন্য শার্ট খুলতেই যাচ্ছিল তার আগেই দুই পুরুষ অফিসার হাঁ হাঁ করে ওঠে। অধিরাজ সভয়ে বলল, "আরে....করেন কী! আমরা বিশ্বাস করি আপনার পেট ভীষণ সলিড ও স্বাস্থ্যবান। পিৎজা, চকোলেট, কারোর বাপ বা জ্যেঠাও কিছু করতে পারবে না। প্লিজ, দেখানোর দরকার নেই। আমরা জানি আপনার বডি অবিকল সলমন খানের মতো, তার জন্য শার্ট খোলার প্রয়োজন নেই।"

"আচ্ছা।"

টুইঙ্কল তার পেটের পেশী দেখাতে না পেরে হতাশ সলমন খানের মতোই মুখ করেছে। অধিরাজ ঢোক গিলে বলল, "ইয়ে... অর্ণব, ওঁকে এই ফাঁকেই চকোলেট খাইয়ে দাও। এরপর আমাদের তো আবার বেরোতেও হবে। পাঁচটা, দশটা যতগুলো পারো সেনোরিটাকে দিয়ে দাও। আমার মনে হচ্ছে উনি আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছেন। পিৎজাও বোধহয় এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে। তাই না...!"

"ইয়েস স্যার।" অর্ণব এতক্ষণে টুইঙ্কলের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাসল, "চলুন মিস্ অরোরা। আপনার চকোলেটের ট্রিট অপেক্ষা করছে।"

টুইঙ্কল বড়ো বড়ো চোখ করে অর্ণবকে দেখছে, "ইউ আর সো সুইট স্যার! আমি চকোলেট খেতে ভালোবাসি আপনি কী করে জানলেন?"

"চলুন, যেতে যেতে আপনাকে বলছি।" সে তাড়া দেয়, "নয়তো দোকানটা বন্ধ হয়ে যাবে।"

"নো নো... চলুন প্লিজ...!"

চকোলেটের তাড়ায় টুইঙ্কল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। পেছন পেছন অর্ণবও। আহেলি লক্ষ্য করল অধিরাজ থামস আপ দেখিয়ে তাকে 'বেস্ট অব লাক' জানাচ্ছে। মিস্ মুখার্জির মুখেও এবার একটা বদমায়েশি হাসি ফুটে ওঠে, "চকোলেটের প্যাঁচটা নিশ্চয়ই মিঃ সরকারের মাথা থেকে বেরোয়নি। যদি আমি ভুল না করি তবে এটা আপনারই দুর্বুদ্ধি।"

"দুর্বুদ্ধি কী সুবুদ্ধি জানি না।" অধিরাজ মৃদু হেসে বলল, "তবে কলিগে-কলিগে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে সেটা মিটমাট করার জন্য চকোলেটের থেকে বেটার জিনিস আর

কিছু নেই। একটু চকোলেট, একটু একান্তে সময় কাটানো অনেক কেমিস্ট্রিকে চেঞ্জ করে দিতে পারে। হোপ ফর দ্য বেস্ট।”

আহেলি বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন যেন একটু একটু করে লোকটাকে সে বুঝতে পারছে। ওর মনের তলও পাচ্ছে। অধিরাজ সবসময়ই তাকে বিস্মিত করে। সে আস্তে আস্তে বলল, “সত্যি বলতে কী, আমার সশরীরে ব্যুরোয় এসে হাজিরা দেওয়ারও অন্যতম কারণ এটাই। টুইঙ্কল এতক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসেছিল। ওর ধারণা হয়েছে যে মিঃ সরকার ওকে একেবারেই পছন্দ করছেন না কিংবা বিশ্বাস করছেন না। ওঁর বিরক্তি টুইঙ্কলও ধরতে পেরে খুব মনমরা হয়ে বসেছিল। আপনাদের কাউকে বলতে পারেনি, কিন্তু আমাকে ওর দুঃখের কথা বলেছে। কলিগদের মধ্যে এরকম ব্যাপার হওয়া উচিত নয়। তাও এইরকম অ্যালার্মিং পজিশনে। অথচ এসব কথা ওভার ফোনেও বলা সম্ভব নয়। তাই নিজেই আপনাকে বলতে এসেছিলাম। এখন দেখছি, আমার আসাটাই বৃথা। আপনি অলরেডি রোগ ডিটেক্ট করে চকোলেট প্রেসক্রাইব করে বসে আছেন।”

“নো মিস্ মুখার্জি। আপনার আসাটা একেবারেই বৃথা হয়নি।” অধিরাজ মোলায়েম স্বরে বলে, “আপনি না এলে মিস্ অরোরাও আসতেন না। তাহলে এই মেডিসিনটা প্রয়োগ করার স্কোপও পেতাম না। মিস্ অরোরা আসলে আদ্যোপান্ত ছেলেমানুষ। য হুমহাম করার তা বাইরেই করেন। ওর মনের ভেতরে কিছু থাকে না। মনটা একদ জলের মতো স্বচ্ছ, নিষ্পাপ। অর্ণবও বুঝদার, স্নেহশীল। যার মনে এত স্নেহ, তার ভাগ টুইঙ্কলের মতো সহজ, সরল মানুষ পাবেন না তা কি হয়? দু-জনে কিছুক্ষণ সময় কাটালেই দেখবেন অর্ণব মিস্ অরোরার লাভিং চকোলেট পাজি হয়ে গেছে, আর উনি অর্ণবের ফেভারিট বোনু।

আহেলি এবার খিলখিল করে হেসে ওঠে, “আপনি পারেনও বটে। তবে আপনার এই ফিমেল বাহুবলীটিকে আমার কিন্তু ভারি পছন্দ হয়েছে।”

“পছন্দ তো আমারও হয়েছে।” অধিরাজ মৃদু হাসল, “ভাবছি, প্রণবেশদাকে বলে ওঁকে পার্মানেন্টলি আমার টিমেই রেখে দেব। টিমটা একদম কমপ্লিট আর ব্যালান্সড হয় তাহলে।” বলতে বলতেই সে আহেলির দিকে ঝুঁকে পড়ে, “আচ্ছা মিস মুখার্জি আপনাকে যতবার আমি সালোয়ার বা শার্ট-প্যান্টে দেখেছি, প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি যে আপনি অবিকল ছেলেদের মতো একদম স্ট্রেট গটগট, খটখট করে হাঁটেন। প্লিজ অপরাধ নেবেন না, বাট এটাই সত্যি যে মিস্ দত্ত, মিস্ বোস বা মিস্ ভট্টাচার্যের হাঁট যথেষ্টই মেয়েলি। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ মেয়েদের স্ট্রাকচার অন্যরকম বলে ওঁদের হাঁটার ধরণও আলাদা। অথচ আপনি একেবারে আমাদের মতোই গটগটিয়ে হাঁটেন এটা কি আপনার ছোটোবেলা থেকেই অভ্যাস?”

আহেলি একটু বিব্রত, “হ্যাঁ। আসলে আমার হাঁটাটা এরকমই কাঠ কাঠ। মা অনেক বলে কয়েও শুধরোতে পারেননি। আমি অন্যদের মতো ক্যাট ওয়াক করতে পারি না ছেলেদের মতোই চলি। ডঃ চ্যাটার্জির ভাষায়, ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট!”

“থ্যাঙ্কস টু ইওর ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্ট!” সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে “আপনাকে যদি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়, তবে কি অবিকল এই ম্যানলি হাঁটার ছন্দটা বজায় রাখতে পারবেন? হোঁচট খেয়ে পড়ে টড়ে যাবেন না তো? কিংবা শাড়ির কোঁচ খুলে পড়ে যাওয়ার চান্স আছে কি?”

“শাড়ির কোঁচা হয় না অফিসার ব্যানার্জি!” আহেলি এবার রাগত দৃষ্টিতে তাকায় “কুঁচি হয়। কোঁচাটা ধুতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শাড়িও আমি ভালোই ক্যারি করতে পারি এবং কুঁচি খুলে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।”

তার বড়ো বড়ো চোখের জ্বলন্ত চাউনি দেখে অধিরাজ প্রায় লাফিয়েই ওঠে, “হোল্ড দ্যাট লুক!...হোল্ড দ্যাট লুক....!”

আহেলি এবার ঘাবড়ে গেল। আজ তো সবই উলটো হচ্ছে। অফিসার ব্যানার্জি তার হাঁটার ধরন লক্ষ্য করছেন। এমনকি চোখ গোল গোল করে তাকালেও সেটাই ‘হোল্ড’ করতে বলছেন। এ তো ভূতের মুখে রামনাম। সে সবিস্ময়ে দেখল অধিরাজ তার ফটোসেশন

করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। টকাটক মোবাইলে তার মুখের বিভিন্ন প্রোফাইলের ছবি নিতে ব্যস্ত। তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। কোনোমতে বলল, "এটা কী হচ্ছে।"

"বিশেষ কিছুই না।" সে নিরীহস্বরে বলল, "ছোটোবেলায় একজনকে দেখে আমি বড়োই ভয় পেতাম। এতদিনে আবিষ্কার করলাম আপনার চোখটা অবিকল তাঁর মতোই, মুখের আদলটাও অনেকটা একইরকম। তাই নিজেকে হরর ড্রিম দেখাব বলে ছবি তুলছি। বাই দ্য বাই, এই যে অ্যাংরি বার্ড মার্কা হাড় হিম করে দেওয়া লুকটা আপনি দিয়ে থাকেন, এটা কি শুধুমাত্র আমার জন্যই কাস্টমাইজড না অন্যদেরও বিতরণ করতে পারবেন?"

'হরর ড্রিমের' কথা শুনে আহেলি মর্মান্তিক চটেছে। সে গরগর করে, "এটা কোনো কাস্টমাইজড প্রোডাক্ট নয়। রেগে গেলে আমি এমন করেই তাকাই।"

" 'গ্রেট।" অধিরাজ দু-হাত জোড় করে ফেলেছে, "ঈশ্বরকে আবারও অশেষ ধন্যবাদ ফর ইওর জ্বালাময়ী দৃষ্টি।"

আহেলি মুখ লম্বা করে, "আপনার মাথাটা কি এবার একেবারেই গেছে?"

"আজ্ঞে না। কিঞ্চিৎ বাকি আছে।" সে প্রসঙ্গান্তরে গেল, "একটা প্রশ্ন করার ছিল। মিস্ দত্ত একজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছেন, আবার পানওনি! মানে, আঙুলের ছাপ তো আছে কিন্তু আঙুলের কোনো রেখার ছাপই নেই! আপনি কি এর কোনো এক্সপ্ল্যানেশন দিতে পারেন?"

আহেলি একটু ভাবল, "হ্যাঁ। হতে পারে অফিসার। অনেক এক্সপ্ল্যানেশন হতে পারে। যেমন কারোর যদি হাতই না থাকে এবং তিনি রোবোটিক হ্যান্ড ইউজ করেন সেক্ষেত্রে আঙুলের ছাপ এলেও রেখাগুলো থাকবে না। খুব রেয়ার ক্ষেত্রে কিছু কেসে মানুষের হাত জন্ম থেকেই রেখাহীন হয়। সেটা কয়েক হাজার কোটিতে হয়তো একটা। তবে সবচেয়ে বেশি যেটা হতে পারে তা হল, যাঁর হাতের রেখার ছাপ আত্রেয়ী পায়নি, কোনো না কোনো সময়ে সেই ব্যক্তির হাতদুটো কোনোভাবে পুড়ে গিয়েছিল। হাত যদি আঙুলসমেত পোড়ে, তবে পরবর্তীকালে নানারকম অপারেশন করে, কসমেটিক সার্জারি করে হাতটাকে স্বাভাবিক রূপ দেওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু আঙুলের রেখা আর ফেরত পাওয়া যায় না। বার্ন কেসের ক্ষেত্রে সমস্ত আঙুলের রেখা চামড়াসমেতই উড়ে যায়। ওটাকে আর রি-ক্রিয়েট করা যায় না। তাই ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসবে, আবার আসবেও না। অর্থাৎ আঙুলের ছাপ আসবে, রেখা আসবে না!"

অধিরাজের চোখ যেন জ্বলে ওঠে। সে গম্ভীরমুখেই বিড়বিড় করল, "আই সি।" কথাটা উচ্চারণ করেই অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা হলুদ রঙের প্যাকেট বের করে এনেছে অধিরাজ। আহেলি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল তার ভেতরে এভিডেন্স ব্যাগে কিছু একটা সন্তর্পণে র‍্যাপ করা আছে। সে আত্মমগ্নভাবেই বলল, "আপনি যখন স্বয়ং এসেই পড়েছেন, তখন এটা একটু দেখবেন তো। দুটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়ে যাবেন। একটা আপনার চেনা, অন্যটা অচেনা। আজ অর্ণব রাতে মিস্ দত্ত'র কাছে স্পেশাল চা খেতে যাবে। কাল ভোরে আরও বেশ কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্টের নমুনা ও আপনাকে দিয়ে আসবে। আপনি শুধু এইটুকু জানাবেন যে তাদের কারোর ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে এই অচেনা ফিঙ্গারপ্রিন্টটি মিলছে কিনা।"

"ওকে।" আহেলি কৌতূহলী, "কিন্তু এটা কী? কোনো স্পট থেকে তুলে এনেছেন?"

"উঁ!" অধিরাজ যেন ফের আস্তে আস্তে একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছে। সে আত্রেয়ী দত্ত'র পাঠানো ছবিগুলো এবার ল্যাপটপে ফেলে খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে। তার আঙুল খুব ধীরে ধীরে কি বোর্ডের ওপর নড়াচড়া করছিল। গভীর মনোসংযোগে একটা একটা করে ছবি দেখতে-দেখতেই আচমকা একটা ছবিতে তার চোখ আটকে গেল। সে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে বসে। স্খলিত স্বরে বলল, "মা-ই গ-ড! এটা মিস্ দত্তর চোখে পড়েনি কেন!"

কী চোখে পড়েনি। আহেলির পেট গুড়গুড় করলেও সে কোনো প্রশ্ন করল না। জানে, এখন জবাব আসবে না। এই লোকটা ক্রমাগতই এখন চিন্তায় ডুবছে। তাই বিরক্ত না করাই শ্রেয়। সে আর কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ কেবিনের বাইরে বেরিয়ে আসে। অধিরাজ তার

প্রস্থানও লক্ষ্য করেনি। সে তখনও ল্যাপটপের ওপরই হুমড়ি খেয়ে বসে আছে। তার এই তন্ময়তা ভেঙে দেওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আহেলির। তাই একটাও শব্দ না করে, আলগোছে হলুদ প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে অর্ণব ও টুইঙ্কল চকোলেট কিনে ফিরে এসেছে। আহেলি বাইরে বেরিয়েই দেখতে পেল দু-জন খোশমেজাজে গল্প করতে ব্যস্ত। টুইঙ্কলের বক্তব্য হল তাদের বাড়িতে নাকি বাঘের মতো মশা পাওয়া যায়, আর ডাইনোসরের মতো টিকটিকি। বহুবার পেস্ট কন্ট্রোল টিম সাফাই করার পরেও সে আপদ যাওয়ার নাম নিচ্ছে না।

আর অর্ণব তাকে কিছু ঘরোয়া টোটকা বাতলে দিচ্ছে। যেমন দেওয়ালে খালি ডিমের খোসা ঝুলিয়ে রাখা কিংবা ময়ূরের পালক মজুত রাখা, অথবা টিকটিকির জন্য বাড়িতে বিড়াল পোষা ইত্যাদি ইত্যাদি। দু-জনেই এখন অনেকটাই সহজ হয়েছে এবং হাসতে হাসতেই গল্প জুড়ে দিয়েছে।

"মিস্ অরোরা...।" অর্ণব একটু মাথা চুলকিয়ে বলল, "গাড়ির ভেতরে আপনি যে ফটোটা তুলেছিলেন না, ওটা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন প্লিজ? ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড...!"

"শিওর।" একহাতে চকোলেটের প্যাকেট ধরে অন্য হাতে মোবাইলটা নিয়েছে টুইঙ্কল, "আপনার নম্বরটা বলুন। এখনই করে দিচ্ছি।"

আহেলি দেখল অর্ণব খুব সহজভঙ্গিতেই নিজের নম্বরটা দিয়ে দিয়েছে তাকে। সে হোয়াটসঅ্যাপে অর্ণবকে অ্যাড করে নিয়ে কিছু একটা পাঠিয়ে দিল। বলল, "দেখুন, চলে গেছে।"

"ইয়েস, পেয়ে গেছি।" অর্ণব হাসল, "থ্যাঙ্কস।"

"অলওয়েজ ওয়েলকাম।"

"সব চকোলেট কি মিস্ অরোরার পেটেই যাবে?" আহেলি এবার ওদের দু-জনের নাকের সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "নাকি আমিও একটা দুটো পাবো?" টুইঙ্কল তাকে উত্তরে একজোড়া চকোলেট ধরিয়ে দেয়, "এ দুটো তোমার। বাকি পাঁচটা আমার।"

"তুমি পাঁচটা চকোলেট একসঙ্গে খাবে!" আহেলি হাঁ, "মানে ঐটুকু পেটে আঁটবে?" এর উত্তর অর্ণবই দিয়ে দিল, "মিস্ মুখার্জি, চকোলেটগুলো উনি এখন খাবেন। তবে তার আগে ঢকঢক করে একটা আস্ত এক লিটারের 'মাজার বোতল শেষ করেছেন। ওটা ওয়ার্ম আপ ছিল। শুধু তাই নয়, চকোলেটের নাম শুনে এতই উত্তেজিত হয়েছেন যে দু-বার আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছেন। তাও আবার ইনজিওর্ড পা টাই!"

"সে কী!" আহেলি উদ্বিগ্ন, "আপনার সেই নখ উড়ে যাওয়া পা-টা? বেশি লাগেনি তো?"

"নাঃ।" অর্ণব হাসল, "একচুলের জন্য বেঁচে গিয়েছি। আপনার স্যারের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ।" সে মৃদু স্বরে উত্তর দেয়, "তিনি যথারীতি বোধিবৃক্ষের তলায় বসে পড়েছেন দেখে আমি আর বিরক্ত করিনি। আমাকেও এবার ল্যাবে ফিরতে হবে। ডঃ চ্যাটার্জিকে আপডেট দিয়ে দেব। উনি বাড়িতে বসেই টেনশন করছেন আর অজস্রবার ফোন করছেন। পারলে আপনারাও ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলে নেবেন। খুব চিন্তায় আছেন উনি। বলছিলেন মিস্টার ব্যানার্জিকে আর আপনাকেও নাকি অনেকবার ফোন করেছেন। কিন্তু আপনারা কেউ তোলেননি।

অর্ণব এবার প্রমাদ গুণল। আসলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় এত ফোন আসছে যে ওদের জবাবদিহি করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। রিপোর্টারদের ফোন তো বটেই, তার সঙ্গে বাবা-মা, অন্যান্য আত্মীয়দের ফোনও এসেই চলেছে। অধিরাজ নিজে বিরক্ত হয়ে ফোন তুলছে না। তাই তার বাবা-মাও অর্ণবের ফোনেই কল করছেন। কাকু কাকিমা প্রায় প্রতি ঘণ্টায় ফোন করে জানতে চাইছেন, "অর্ণব, রাজা ঠিক আছে তো? তোমরা সবাই? ছেলেটা ফোনই তুলছে না। নির্ঘাৎ মোবাইল সাইলেন্ট করে রেখেছে। তুমি প্লিজ বলো, ও সুস্থ আছে তো?" শুধু কাকু-কাকিমাই নন, অর্ণবের বাবা-মায়েরও এই একই প্রশ্ন। আসলে ওঁরা প্রত্যেকেই টিভিতে

নানারকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আতঙ্কে ও আশঙ্কায় কাঠ হয়ে আছেন। বারবার ফোন করার একটাই কারণ। ওঁরা জানতে চাইছেন, তাঁদের সন্তান বেঁচে আছে কিনা! পুলিশ অফিসারের বাবা মা হলেও আদতে তো ওঁরাও রক্তমাংসের মানুষ। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় যে দিশাহারা হবেন তাতে আশ্চর্য কী!

কিন্তু এর মধ্যে ডঃ চ্যাটার্জির ফোনটা মিস্ করে ফেলেছে অর্ণব। সেটাই আরও বেশি চিন্তার বিষয়। ফোন না ধরলে অসীম চ্যাটার্জি তুমুল খেপে যান। তার ওপর সকালেই অত বড়ো ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হয়েছেন। কে জানে, দুর্বাসা ক্রোধের ঠিক কোন স্তরে আছেন। সে আহেলির দিকে সভয়ে তাকায়, "সেরেছে। আমি কি এখন ওঁকে রিংব্যাক করব?"

"না। আপনি করবেন না। তাহলে আপনার কপালে অশেষ দুঃখ আছে।" সে মৃদু হাসল, "ফোনটা আপনার স্যারকে দিয়েই বরং করাবেন। ওটাই বেস্ট।"

"ওকে।"

আহেলি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে মৃদু হেসে চলে গেল। টুইঙ্কল তখন খুব মনোযোগ দিয়ে চুকুম-চাকুম করে চকোলেট খাচ্ছিল। তাকে একরকম গুঁতো মেরেই নিয়ে গেল। অর্ণব অনেকটাই হালকা মনে অধিরাজের কেবিনের দিকে এগিয়ে যায়। তার বুক থেকে যেন একটা যন্ত্রণাদায়ক পাষাণভার নেমে গিয়েছে। এখন আর মনের মধ্যে আত্মগ্লানির কামড় টের পাচ্ছে না। তবে বর্তমানে আরও একটা চিন্তা তার মাথায় ঘাঁই মারছে। কে জানে ডঃ চ্যাটার্জি বারবার ফোন করছেন কেন! তাছাড়া কাকু-কাকিমাকেও অন্তত একবার রিংব্যাক করার কথা বলতে হবে। ওঁরা অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছেন।

"কিউরি-অ-সার অ্যান্ড কিউরি-অ-সার।"

কেবিনে ঢুকতে-না ঢুকতেই পরিচিত লব্জটা শুনে থমকে গেল সে। দেখল অধিরাজ ল্যাপটপে প্রায় নাক ঠেকিয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করে বলছে, "এটা তো হওয়ার কথা নয় গুরু।...কেসটা কী হল?"

অর্ণব কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায়। অধিরাজের ল্যাপটপে এক মহিলার ছবি! বেশ বড়োসড় বেবিবাম্প দেখলেই বোঝা যায় গর্ভবতী। কিন্তু তাঁর রূপ দেখে অর্ণব বিশেষণ খুঁজে পায় না। সব ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েলি কমনীয়তার ছিটেফোঁটাও নেই। সে অবাক হয়ে বলে, "ইনি কে?"

"ইনি হচ্ছেন মিস্ দত্ত বর্ণিত শ্রীমতি গুরশীল কৌর। যাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট উনি পেয়েও পাননি।" অধিরাজ বিড়বিড় করে বলে, "ইনিই শ্রীযুক্ত আমনদীপের সঙ্গে আর্বানায় লিভ-টুগেদার করছেন, এবং ওঁর বর এসে দু-জনকেই ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে!"

"ও! ইনিই!" অর্ণব এবার ভালো করে মহিলাকে দেখল, "পাঞ্জাবি মেয়েরা কি এরকমই কাঠ কাঠ হয়? মিস্ দত্ত ঠিকই বলেছেন। উনি প্রেগন্যান্ট।"

"সে তো বুঝলাম। কিন্তু মিস্ দত্ত'র প্রশ্নটাও সঠিক।" অধিরাজ ফের দীর্ঘদেহটাকে চেয়ারে এলিয়ে দেয়, "আমনদীপ ওর মধ্যে কী দেখেছে!"

"মানে?"

অধিরাজ চিন্তিত, "এটাই তো সমস্যা অর্ণব। শ্রীমতি গুরশীলের স্বামী থাকতে পারে না, উনি প্রেগন্যান্টও হতে পারেন না! কারণ উনি মহিলাই নন, পুরুষ!"

"অ্যাঁ!"

অর্ণব বিষম খেতে গিয়েও সামলে নিল, "বলেন কী?"

"নিজেই দেখে নাও।"

অধিরাজ গুরশীলের ছবিটা জুম করল। এমনিতে সবই ঠিকই আছে। কিন্তু সে মহিলার গালের ওপর আঙুল রেখে বলল, "এই দ্যাখো, এই লাল দাগড়া দাগড়া চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছ? একদম ডানগালে জ্বলজ্বল করছে? এটা মিস্ দত্ত নাও চিনতে পারেন, কারণ উনি শেভ করেন না। কিন্তু আমরা দু-জনেই নিয়মিত শেভ করি। তাই বুঝতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না যে ওটা রেজোর বার্ন বা রেজোর বাম্প! যেটা অনেকসময় প্রেশার দিয়ে, কিংবা ঘনঘন দাড়ি

কাটতে গেলেই বেশি হয়। আমার বাবাও অনেকসময় তাড়াহুড়োতে এই কাণ্ডটি বাঁধান। এখন এই মহিলা রেজোর দিয়ে এত বেশি দাড়ি কাটছেন কেন, সেটাই আমার চিন্তার বিষয়!"

অর্ণব কিছুক্ষণের জন্য বাকশক্তিহীন হয়ে যায়। স্যার মিথ্যে বলেননি। মহিলার মুখে সত্যিই রেজোর বার্নের দাগ স্পষ্ট। এ দাগ চিনতে ভুল হওয়ার কথাই নয়। যে কোনো পুরুষের চোখেই এটা ধরা পড়বে। তবে গুরশীল মেয়ের ছদ্মবেশে আর্বানায় কী করছে! তার গর্ভবতী হওয়াও সম্ভব নয়। তবে নকল বেবি বাম্পটি কি প্রস্থেটিক মেক-আপের নিদর্শন? না গর্ভবতী হওয়ার আড়ালে সে এমন কিছু বয়ে বেড়াচ্ছে যা মেটাল ডিটেক্টরের তলা দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তার সঙ্গী আমনদীপ কিছু জানে না তাও সম্ভব নয়! তাছাড়া গুরশীলের স্বামী পরিচয় দিয়ে যে লোকটি মাঝেমাঝেই এসে উপস্থিত হয়, সে তবে কে?

অর্ণবের মাথার মধ্যে সবটাই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। তার মস্তিষ্ক শুধু একটাই শব্দ উচ্চারণ করল, "বার্নিং শিখ!"

"মে বি।" অধিরাজ আপনমনেই বলে, "গুরশীল যদি বার্নিং শিখ হয় তবে আমনদীপ কে? আর তার ফেক স্বামীটিই বা কে? বার্নিং শিখ গোটা টিম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি!"

"স্যার!" অর্ণব উত্তেজিত, "তাহলে এডিজি সেন ঠিকই বলেছিলেন। বার্নিং শিখ একটা লোক নয়, একাধিক লোকের টিম।"

"পার্শিয়ালি কারেক্ট।" সে ফের অন্যমনস্ক, "বার্নিং শিখ একটা কিংবা দুটো-কোনো লোকই নয়। আসলে সে একটা সত্ত্বা! একটা ডার্ক পার্সোনালিটি যে একজনের ভেতরে ঢুকে বসে আছে। যদি তুমি কনজ্যুরিং সিরিজে বা ভূতে বিশ্বাসী হও তবে তাকে 'ডেমন'-ও বলতে পারো যে একটা মানুষকে এতটাই পজেজ করে রেখেছে যে মানুষটা চেয়েও নিজেই তাকে থামাতে পারছে না। মনস্তত্ত্বের ভাষায় ও একটা আগুনমুখো ট্রমা! আই পিটি হিম!"

"পিটি!" অর্ণব বিস্মিত, "স্যার, ঐ রাক্ষসটা আমাদের অলমোস্ট জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে পিটি করিয়ে ছাড়ছে। আর আপনি ওর জন্য দুঃখবোধ করছেন?"

"কারণ ট্রমা শব্দটার অর্থ আমি বুঝি অর্ণব।" অধিরাজ আত্মমগ্ন, "জগদীপ কী বলেছিলেন মনে আছে? অ্যাকর্ডিং টু মিঃ ভাট্টি, লোকটা এক্সপ্রেশনলেস। না ওর মুখে হাসি আছে, না কান্না। কোমল কৌরের কথা মনে করো। তিনিও শেষমুহূর্ত ছাড়া কখনও হাসেননি, কখনও কাঁদেননি। যারা কাঁদতে পারে, নিজের কষ্ট এক্সপ্রেস করতে পারে, তাদের কষ্ট অনেক কম। চোখের জল বুকের জ্বালা নিভিয়ে দেয়। কিন্তু কতখানি কষ্ট পেলে একটা মানুষ পাথরের মতো অনুভূতিহীন হয় সেটা কি বুঝতে পারো অর্ণব? কতখানি যন্ত্রণা পেলে একটা মানুষ বুলেটের ক্ষতের প্রবল কষ্টও টের পায় না! আমি এখনই গিয়ে গুরশীলকে গ্রেফতার করতে পারি। কিন্তু তাতে বার্নিং শিখ মরবে না, হারবেও না। তার জ্বালাও কমবে না। আমি যদি ঠিক আন্দাজ করে থাকি, তবে বার্নিং শিখের মৃত্যু তখনই হবে যখন ও এত বছরের চেপে রাখা বুকফাটা কান্নাটা কাঁদতে পারবে। সেখানেই ঐ রাক্ষসের অন্ত।"

"মানে?"

গোটাটাই অর্ণবের মাথার ওপর দিয়ে গেল। স্যার ঠিক কোন ভাষায় কথা বলছেন! যে লোকটা ওদের সবাইকে কেটে, উড়িয়ে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে, তাকে মারার জন্য একটা বুলেটই যথেষ্ট। একটা বুলেটে ওর মাথা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারলেই অর্ণব বেশি খুশি হবে। কিন্তু স্যার যে কী বোঝাতে চাইছেন তা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

"তুমি বুঝবে না। আবারও বলছি, যুদ্ধটা অনেকখানি মনস্তাত্ত্বিকও বটে।" সে মাথা নাড়ল, "মহিষাসুরের অন্ত একমাত্র দেবী দুর্গাই করতে পারতেন। বৃত্রাসুরকে মারার জন্য দধীচির হাড়ই একমাত্র বজ্র তৈরি করতে পারত। রক্তবীজকে ধ্বংস মহাকালীই করতে পেরেছিলেন, যতবার পৃথিবীতে নেগেটিভ শক্তি এসেছে, তাকে শেষ করার জন্য কোনো একটি পজিটিভ শক্তি বা অস্ত্রও বারবার এসেছে। বার্নিং শিখ যদি তাদের দলভুক্ত হয় তবে তাকে আমরা বুলেট, ছুরি, বেয়নেট, এমনকি বোফর্স কামান ছুড়েও মারতে পারব না। তার জন্য অন্য স্পেশাল অস্ত্র লাগবে।"

“কী অস্ত্র স্যার?”

অর্ণব কনফিউজড। এতক্ষণে অধিরাজের মুখে হাসি ফুটল। সে সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে, “এখন শুধু ঐ রিপোর্টার ভদ্রলোকের ফোনের অপেক্ষা। মিঃ রমানাথ চক্রবর্তী যদি আসল কাজটা করতে পারেন তবে বার্নিং শিখও মরবে। অর্থাৎ দধীচির হাড় উনি সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা সেটাই জানার। কী অস্ত্র সেটা এখন না জানলেও চলবে। তবে বোধহয় অস্ত্রটা আমরা পেয়ে গেছি।”

অর্ণব আরও বেশি ঘেঁটে গিয়ে বলল, “তবে গুরশীলের, আই মিন, বার্নিং শিখের কী হবে?”

“এখন কিচ্ছু না।” সে রহস্যময় হাসি হাসছে, “এখন আমাদের একটাই কাজ। কিছুই না করা। বুঝেছ?”

“ওকে স্যার।”

*

(২০)

শীতের সময়ে একটু বেশি রাত হতে না হতেই আজকাল রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে যায়। মানুষ একেই আচমকা বেড়ে যাওয়া শীতের কামড় নিতে পারছে না। তার ওপর বার্নি শিখের কল্যাণে এখন সকলেই একটা আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যে রয়েছে। টিভি চ্যানেলে ঐ একটা খবর ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রতি ঘণ্টায় বুলেটিন আসছে। কী হল, না হল, আবার কোথা থেকে আক্রমণ আসবে, আগামীতে কী হতে পারে, কী কী হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা নিয়ে সাংবাদিকদের মাথাব্যথা ও ডিসকাশনের শেষ নেই। অধিরাজের মনে হয়, বার্নিং শিখকে নিয়ে এরা যত মাথা ঘামাচ্ছে, স্বয়ং বার্নিং শিখও বোধহয় অত ঘামায়নি। মিডিয়া চিরকালই মানুষের মধ্যে প্যানিক সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। মানুষ কোমল কৌরের বাড়ির বিস্ফোরণ এবং ঐ জ্বলন্ত তেলের ট্যাঙ্কারের ফুটেজ দেখে এখন রাস্তাতেও বেরোতে ভয় পাচ্ছে। মনে আশঙ্কা, সি.আই.ডি. হোমিসাইড আর বার্নিং শিখের যুদ্ধে উলুখাগড়া হয়ে সাধারণ মানুষই না কাটা পড়ে। তার ওপর নিউজ চ্যানেল ব্যাপারটাকে এমনভাবে হাইলাইট করছে যেন যখন তখন, যেখানে সেখানে এক বা একাধিক বম্ব ব্লাস্ট হতে পারে। বার্নিং শিখকে 'খালিস্তানি' বানিয়ে মুম্বাই সিরিয়াল ব্লাস্টের মতোই 'কলকাতা ব্লাস্টের' সম্ভাবনার কথাও ঘোষণা করে বসে আছে। এগুলো আতঙ্ক তৈরি করা ছাড়া আর কি? সবসময়ই ব্যুরোর সামনে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রেকিং নিউজের জন্য। তাকে দেখলেই বুম-ক্যামেরা নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়ে, "স্যার...স্যার... একটা প্রশ্ন... একটা ছোট্ট বাইট।" বিরক্তিকর। এইজন্যই সে সবসময়ই মিডিয়ার লোকদের এড়িয়ে চলে।

তবে যতই বিরক্তি প্রকাশ করুক, এবার হয়তো এই মিডিয়াই তার কাজে লাগবে। অফিস থেকে বেরোনোর আগেই রমানাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি প্রথমে উদ্বিগ্নভাবে ওদের কুশল সংবাদ নেওয়ার পর জানিয়েছেন, "আপনার কাজ হয়ে যাবে অফিসার। আমি জাস্ট কিছুক্ষণ আগেই মিঃ চিরঞ্জীব জয়সওয়ালের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রথমে একটু নিমরাজি ছিলেন ঠিকই, তবে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলার পর রাজি হয়ে গেলেন। বলেছেন, সবরকম হেল্প করবেন। তবে ইন্দিরাজির স্পিচের কালেকশন বেশ বড়ো। ওঁর বয়েসও হয়েছে। তাই আজ রাতে কিছু করা সম্ভব হবে না। কাল আমাদের দিল্লির অফিসের এক ছোকরা গিয়ে ফাইলগুলো নিয়ে আসবে। একটু সময় লাগবে স্যার।"

"সময়ই তো হাতে নেই স্যার।" অধিরাজ একটু চিন্তিতস্বরে বলে, "কাল দুপুরের মধ্যে পেতে পারি কি? তার চেয়ে বেশি টাইম অ্যাফোর্ড করতে পারব না বোধহয়।"

"আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব দুপুরের আগেই দেওয়ার।" তিনি জানালেন, "আপনাদের মেইল অ্যাড্রেসটা...!"

"হ্যাঁ। এখনই হোয়াটসঅ্যাপ করে দিচ্ছি।"

সে আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত রমানাথকে বিশ্বজিতের ই-মেইল আইডি দিয়ে দেয়। অর্ণব একটু অবাক হয়েই বলে, "বিশ্বজিতের মেইল অ্যাড্রেস কেন স্যার? আপনার মেইলেই তো পাঠাতে পারেন।"

"আল্টিমেটলি সব ফাইল বিশ্বজিতের কাছেই যাবে ডার্লিং।" ছেলেমানুষি হাসিটা তার ঠোঁটে ভেসে ওঠে, "আসল কাজ তো বিশ্বই করবে। উনি আমাকে পাঠাবেন, আমি মেইল খুলব, ডাউনলোড করব বা ফরোয়ার্ড করব, তাতে কয়েক সেকেন্ড হলেও তো যাবে। আমি এক সেকেন্ডও নষ্ট করতে চাই না। তাই ফাইলগুলো বিশ্ব-র কাছেই ডাইরেক্ট আসুক। দাঁড়াও, ওকে জানিয়ে দিই। ভাট্টিসাহেব কী করছেন সেটাও জেনে নিই।"

বিশ্বজিৎ সমস্ত কথা শুনে বলল, "কিন্তু স্যার, ফাইলগুলো নিয়ে আমি কী করব?"

"ছোট্ট, কিন্তু পরিশ্রমসাধ্য একটা কাজ।" অধিরাজ বলল, "সেটা ফাইলগুলো এলে আমি তোমায় বলে দেব। আপাতত বলো, ভাট্টিসাহেব কী করছেন?"

"ও পাবলিক ডেন্টিস্টের চেম্বার থেকে সোজা বাড়ি গিয়ে ঢুকেছে। বেশ কিছুক্ষণ অনলাইনে দাঁত ব্যথা ইনস্ট্যান্ট কমানোর রেমিডি খুঁজলেন। তারপর হতাশ হয়ে মিকা সিং-এর চিৎকার শুনলেন। তাতে ওঁর দাঁত ব্যথা কমল কিনা জানা নেই, কিন্তু আমার মাথা আর কান দুটোই ব্যথা হয়ে গিয়েছে। এখন শুয়ে পড়েছেন। আমি চুপচাপ ওঁর বাড়ির সিলিং দেখছি।"

"দেখতে থাকো বিশ্ব। আগামীকাল রাতের আগে তোমার ছুটি নেই।"

কথা বলতে বলতেই সে টের পেল একের পর এক হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ঢুকছে। স্ক্রিনে ডঃ চ্যাটার্জির নাম শো করছে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "ওকে বিশ্ব, পরে কথা বলছি।"

"শিওর।"

অধিরাজ ফোন তৎক্ষণাৎ কেটে দিয়ে তাড়াতাড়ি মেসেজগুলো খুলে কিছুক্ষণের জন্য টেনসড হয়ে গেল। বারোটা মেসেজ পাঠিয়েছেন ডঃ চ্যাটার্জি। কিন্তু একটাতেও কিছু লেখা নেই। সবগুলোই ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ। সে সভয়ে অর্ণবের দিকে তাকায়, "এ কী। ডক ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ পাঠাচ্ছেন কেন? আবার কারোর কিছু হল না তো?"

"ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ।" অর্ণব ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। তার হৃৎপিণ্ড ফের লাফ মারল। সচরাচর কারোর মৃত্যুর খবর বা সেরকমই কোনো দুঃসংবাদ দিতে অনেক সময় মানুষ ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ পাঠিয়ে থাকে। ডঃ চ্যাটার্জি এই ব্ল্যাঙ্ক মেসেজের মাধ্যমে কী বলতে চাইছেন? একেই সকালবেলায় ঐ গ্রুসাম কাণ্ড! এখন আবার কী হল? অন্য কোনো ট্র্যাজেডি নয়তো? বারবার উনি ফোনই বা করছিলেন কেন? অধিরাজের ফোনে প্রায় বারোবার আর অর্ণবের ফোনে সাতবার ট্রাই করেছিলেন। আহেলির কথা শুনে ওরা ভেবেছিল হয়তো খবর নেওয়ার জন্য ফোন করছিলেন। অধিরাজ একটু ফ্রি হয়েই তাঁকে রিংব্যাক করবে ভেবেছিল। কিন্তু এখন একটা শীতল ভয় তাকে চেপে বসল। এই ফোনের পেছনে অন্য কোনো দুঃসংবাদ থাকে যদি!

অধিরাজ তাড়াতাড়ি ডঃ চ্যাটার্জির নম্বর ডায়াল করে। তার বুকের ভেতরে প্রচণ্ড তোলপাড়। ওদিকে সব ঠিক আছে কি? অসিত চ্যাটার্জি, কুক্কু, ওরা সব সুস্থ আছে তো। কুক্কু তো একেবারেই বাচ্চা ছেলে। স্বভাবের দিক দিয়ে আরও বেশি ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ। বার্নিং শিখ শিশুদেরও ছাড়ে না! আগেই সে হুমকি দিয়েছিল। ওর কিংবা ডঃ চ্যাটার্জির কিছু হয়ে গেলে...!

"কাম অন ডক, পিক আপ! পিক আপ দ্য ফোন।"

ফোনটা প্রথমবার বেজে বেজে কেটেই গেল। সে অর্ণবের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, "মনে হয় ইমিডিয়েটলি ওঁর কাছে যাওয়া দরকার। ফোন তুলছেন না!" অর্ণব বিনাবাক্যব্যয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে প্রায় দৌড়েইছিল। কিন্তু তার আগেই অধিরাজের ফোন বেজে উঠেছে। ডঃ চ্যাটার্জি। "হ্যাঁ। হ্যালো ডক! আপনি ঠিক আছেন? ইজ এভরিথিং অলরাইট? আপনি কোথায়? অসিতবাবুর ফ্ল্যাটেই তো?"

প্রচণ্ড উদ্বেগে সে প্রায় নিঃশ্বাস নিতেই ভুলে গিয়েছে। একনিশ্বাসে প্রশ্নগুলো করে গেল। আরও হয়তো কিছু জিজ্ঞাসা করত তার আগেই ও প্রান্ত থেকে ডঃ চ্যাটার্জির বিরক্তিমাখা কণ্ঠ ভেসে এল, "এই প্রশ্নগুলো তো আমার করার কথা! টিভিতে যা সব দেখছি তাতে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জো! আর তুমি ফোন তোলো না কেন? কখন থেকে ভয়ে যন্তরমন্তর হয়ে ফোন করছি, তুলছই না।"

"বিজি ছিলাম।" অধিরাজের ভয় তখনও কাটেনি। কোনোমতে বলল, "আপনি বারবার ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ পাঠাচ্ছেন কেন? কোনো অঘটন ঘটেনি তো?"

"ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ!" তিনি স্যাটেলাইট থেকে পড়লেন, "লেঃ হালুয়া। আমি ব্ল্যাঙ্ক

মেসেজ পাঠাব কোন্ দুঃখে? আমি তো স্রেফ ভিডিও কলিং করার চেষ্টা করছিলাম।

কিছুতেই গেল না!”

এবার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ওদের। ভদ্রলোক এমনিতেই হোয়াটসঅ্যাপে সড়গড় নন। তার ওপর কায়দা মেরে ভিডিও কল করতে গিয়েছিলেন। আদতে উনি জানেনই না যে ভিডিও কল কীভাবে করতে হয়। নির্ঘাত কিছু উলটোপালটা আইকন টিপে দিয়েছিলেন, যার ফলে অতগুলো ব্ল্যাঙ্ক মেসেজ চলে এসেছে। অধিরাজ সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চায়, “আর ভিডিও কল করার জন্য ঠিক কোন আইকনটা প্রেস করেছিলেন আপনি?”

“কেন? নীচে ডানদিকে যে ক্যামেরার ছবিটা থাকে...।”

“বুঝেছি।” সে এবার লঘুস্বরে বলল, “ক্যামেরা আপনার অপূর্বকান্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে এবং লজ্জা পেয়ে ছবিই তোলেনি। বেচারি কী পাঠাবে বুঝতে না পেরে ব্ল্যাঙ্ক মেসেজই পাঠিয়ে দিয়েছে! আর আমরা আপনার ব্ল্যাঙ্ক মেসেজের ভাব সম্প্রসারণ করতে হিমশিম খাচ্ছি। ভেবে মরছি, পুতিন বুঝি আপনার ওপরেই বোম ফেলেছেন!”

“দেখো মিঃ সাইবেরিয়ান হাস্কি, সবসময় তোমার এই টকেটিভ ‘আঁউ আঁউ' মার্কা আর্গুমেন্ট ভালো লাগে না!” ডঃ চ্যাটার্জি চূড়ান্ত চটে গিয়েছেন, “কাঁধের সেলাইটা কি আছে, না ফের ছিঁড়েছ? কপালে কী হল? আর তাছাড়া তুমি ঐ গন্ধমাদনের মতো তেলের গাড়িটার সঙ্গে মারপিটই বা করতে গেছ কোন্ সাহসে? ওটা রীতিমতো জ্বলছিল। ব্লাস্ট করলে কোথায় থাকতে শুনি? নাকি ওটাকে টাইটানিক ভেবে ওটার সঙ্গেই সলিলসমাধি নেওয়ার প্ল্যান ছিল। বেশি হিরোগিরির শখ হয়েছে না তোমার? কী ভাবো নিজেকে? কথা নেই বার্তা নেই, যখন তখন শক্তিমানের মতো চরকিপাক মারতে শুরু করো! আমায় না মেরে তোমার শান্তি নেই না? সবসময় কিছু না কিছু ঘোটালা পাকাতেই থাকো। কারোর কেয়ার করো না, কারোর ভালোবাসার মূল্য দাও না। বুঝবে! যেদিন এই বুড়োটা হার্টফেল করে মরবে, সেদিন বুঝবে। লোকে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না...!”

বলতে বলতেই তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন একটা কান্নার ভাব ভেসে এল। পরিস্থিতি গম্ভীর দেখে অধিরাজ কোনোমতে বলল, “স্যরি ডক। আমি আপনাকে ফোন করতামই। চিন্তা করবেন না। কাঁধের সেলাই এখনও ঠিক আছে। কপালেরটা নিউ এডিশন। আপাতত আমি আপনার বেবি মোস্তাফার সেলাই প্রোজেক্টে পরিণত হয়েছি। এই কেসটা ক্লোজ হতে হতে আশা করছি আস্ত নকশিকাঁথা হয়ে যাব।”

“একদম ফিচলেমি করবে না। যতসব অলুক্ষুণে কথাবার্তা...!” এবার সত্যিই কেঁদে ফেললেন তিনি, “কী শুরু করেছ তোমরা? যতবার ফুটেজগুলো দেখছি, ততবার রক্তহিম হয়ে আসছে। সকালে সনৎ! তারপর তোমরা অলমোস্ট দু-বার ব্লাস্টের হাত থেকে বেঁচেছ! একবারও ভেবেছ এই বুড়োটার কী অবস্থা হচ্ছে? এমনই অসহায় অবস্থা যে তোমাদের কোনো সাহায্যও করতে পারছি না। এক সন্তানকে সদ্য হারিয়েছি। অন্য দু-জনের খবর নেই। ফোন করছি, তুমি-অর্ণব, কেউ তুলছ না। আমার জায়গায় থাকলে বুঝতে...!”

ওঁর অবস্থা দেখে অধিরাজ এবার নরম স্বরে বলল, “কিচ্ছু হবে না ডক৷ আপনি আপাতত টিভিটা অফ করুন। আর একদম পরশু সকালে খুলবেন। এর মধ্যে সব কিছু হতে পারে, কিন্তু আমরা কেউ মরছি না। আপনি বরং অন্য কিছু করুন। গান শুনুন। কিংবা কুক্কুর সঙ্গে খেলুন।” সে জানতে চায়, “কুক্কুসাহেব আর অসিতবাবু কি ফিরেছেন?”

“হ্যাঁ।” এবার একটু শান্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর, “ওরা কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছে। ডিনার করেছি আমরা। তবে কেউ ঘুমোতে যাইনি। অসিত আর কুক্কুও আমার সামনেই বসে আছে। বার্নিং শিখের খবর ওরাও জানে। আমরা সবাই তোমাদের খবর নিয়ে তবেই ভাবছি ঘুমোতে যাব।”

“এতবড়ো ফ্যামিলি থাকতে আমাদের কিছু হতে পারে? কুক্কুসোনা-কে আমার আদর জানাবেন। খুব তাড়াতাড়িই দেখা করতে আসব।” অধিরাজ হাসল, “যান, এখন আর কথা না বাড়িয়ে লেপের তলায় ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ুন। কাল আবার কথা হবে। ফোন করব।”

“শিওর? তুমি ফের ভুলে যাবে না তো?”

"না।"

ডঃ চ্যাটার্জি কতখানি আশ্বস্ত হলেন কে জানে। কিন্তু তার স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের হাহাকারে দুই অফিসারই একটু ইমোশনাল হয়ে পড়েছিল। অধিরাজ মনে মনে ভাবছিল, সত্যিই তো! ডঃ চ্যাটার্জিকে অনেক আগেই ফোন করা উচিত ছিল ওদের। এই পুলিশের ডিউটি মানুষকে বড়ো অসামাজিক, স্বার্থপর করে দেয়। নয়তো এই বয়স্ক মানুষটার কথা আগে মনে পড়েনি কেন। আজ সকালেই কত বড়ো আঘাত পেয়েছেন তিনি! অথচ তাঁর খবর নেওয়ার কথা একবারও মনে হয়নি। অথচ শোকার্ত, বিধ্বস্ত লোকটা বারবার ফোন করে খবর নেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছে!

অনেকক্ষণ ধরে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করার পর মিস্ দত্তের ফোনটা ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায় এল। আত্রেয়ী জানাল যে মিঃ দত্তার বাড়ির সবাই এতক্ষণ জেগেই বসেছিলেন। কেউই ঘুমোতে যাচ্ছিলেন না। মনে প্রবল আতঙ্ক যে আদৌ পরদিনের সূর্যোদয় দেখবেন কিনা। সারাদিন ধরেই সবাই অভুক্ত। রাতে সে জোরজার করে সবাইকেই কিছু-না কিছু খাইয়ে দিয়েছে। এখন সারাদিনের টেনশনে, আতঙ্কে ভোগা মানুষগুলো অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করছে। আশা করা যায় দশ মিনিটের মধ্যেই হয়তো সকলেই বেডরুমে অন্তত একটু গা এলিয়ে দেওয়ার জন্য ঢুকে যাবেন।

"ওকে মিস্ দত্ত। অর্ণব পৌঁছে যাবে।"

অধিরাজ ফোনটা কেটে দিয়েই অর্ণবকে তাড়া দেয়, "চলো, চলো। স্পেশাল চা অপেক্ষা করছে।"

অর্ণব একটু বিব্রত হয়, "কিন্তু মিস্ বোস তো এখনও ফোন করেননি।"

"অন দ্য ওয়ে ঠিকই করবেন।" অধিরাজ ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখছে, "আর সময় নেই অর্ণব। কাঁটায় কাঁটায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হতে চলল। অ্যাটাক এবার আসবেই। একদম চোখ-কান খোলা রাখবে। দরকার পড়লে রাউন্ড দেবে। সারা রাত নিজের পজিশন থেকে নড়বে না। আর একটাও মৃত্যু যেন না হয়। মনে রেখো, তোমাদের তিনজনের ওপরে একটা গোটা পরিবারের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। প্রণবেশদাকেও বলবে ব্যাক-আপের জন্য একদম রেডি থাকতে। যে কোনো মুহূর্তে যা কিছু ঘটতে পারে, মাইণ্ড ইট।"

"কিন্তু স্যার। গুরশীল...।"

অর্ণব কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়েছে সে, "আপাতত গুরশীলে গুলি মারো। ওকে আর আমনদীপকে কাল সকালে দেখে নেবো। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের সমস্ত ফোকাস এই রাতটার ওপরে। আজ রাতে কিচ্ছু হতে দেবে না অর্ণব। এক মুহূর্তের জন্য চোখ বুঁজেও আসতে দেবে না। দরকার পড়লে মিস দত্তকে বলে গোটা জলের ট্যাঙ্কটাতেই স্পেশাল চা ভরিয়ে নাও। তুমি কত গ্যালন চা বা কফি খেয়েছ, আমি জানতে যাব না! কিন্তু ফ্র্যাকশন অব সেকেন্ডের জন্যও তোমার অ্যাটেনশন যেন একচুলও না নড়ে। হাই অ্যালার্টে থেকো।"

"ইয়েস স্যার।"

ওরা আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। অর্ণবকে আর্বানায় ছেড়ে দিয়ে সে নিজে এই মুহূর্তে পি সি চৌধুরীর বাড়ির দিকে যাচ্ছে। ড্রাইভ করতে-করতেই দ্রুতবেগে কয়েকটা কাজ সেরে নিয়েছে অধিরাজ। প্রথমত, তার এক বন্ধু প্রীতমকে দুটো ছবির সেট পাঠিয়ে দিয়েছে। তার দশ মিনিটের মধ্যেই প্রীতম কল করল, "এ কী রে! এত সিমিলার ফেস কাটিং আর চোখ আমি জীবনে দেখিনি! চোখের শেপ আর চাউনি তো অবিকল এক। ইভেন চোয়াল আর মুখের আদলটাও।"

"কাজটা করে দিতে পারবি?"

"বাঁ হাতের খেল। নাকটা একটু ছোটো। কিন্তু সেটাও ম্যানেজ হয়ে যাবে। নাইন্টি পার্সেন্ট অথেন্টিক জিনিস দাঁড় করিয়ে দেব। চট করে দেখলে বা একটু কম আলোতে পুরো অরিজিনালই লাগবে। তবে দিনের বেলা কেউ যদি খুঁটিয়ে দেখে, তবে ধরা পড়বি।"

"দিনের বেলায় খুটিয়ে দেখার গল্পই নেই। তুই রেট বল।"

"তুই যা দিবি। না দিলেও চলবে বস।" প্রীতম হাসল, "তবে ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে আসিস না। মিনিমাম আট থেকে দশ ঘণ্টা সময় লাগবে কিন্তু। কারণ ডোপলগ্যাঙ্গার বানাতে সময় লাগে। ছোটো ছোটো ডিটেলিংগুলোও মিস করা যাবে না। অনেক কাজ করতে হবে।"

"বুঝেছি। সময় নিয়েই যাব। রেডি থাকিস।"

"ওকে।"

তার ফোন কেটে দিয়েই গুল্লুর খবর নিল সে। গুল্লু নির্ধারিত গুরুদ্বারার আশেপাশেই ঘুরঘুর করছিল। যদিও এখনও সেই সর্দারজির আসার সময় হয়নি। কিন্তু প্রত্যেকবার সে একই টাইমিং-এ আসবে এমন কোনো কথা নেই। তাই রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে পজিশন নিয়ে নিয়েছে। জানতে চাইল, "লোকটা এলে কি ধরব স্যার?"

"একদম না।" অধিরাজ বলল, "ধরার চেষ্টাও করবি না। স্রেফ ছায়ার মতো ফলো করবি। দেখবি সর্দারজি ঠিক কোথায় যাচ্ছেন বা তার ঘাঁটিটা কোথায়। কোমল কৌরের বাড়িতে আমরা পেট্রোলের একফোঁটাও পাইনি। গ্যাসের কন্টেনার কিংবা তরোয়াল বা কোনোরকম কাটারও ছিল না। তার মানে ভদ্রলোকের আরও একটা ঘাঁটি আছে যেখানে এগুলো তিনি রেখে থাকেন। আমার শুধু সেই ঘাঁটির ঠিকানাটা চাই। বাকিটা আমরা বুঝে নেব। তুই লোকটা কোথায় ঢুকেছে দেখে নিয়েই ওখান থেকে সরে পড়বি।"

"হো যায়েগা স্যার।"

গুল্লু যথারীতি আত্মবিশ্বাসী। তার আপডেট শেষ হওয়ার পর কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় মিস্ বোসের মেসেজ ঢুকল। পি সি চৌধুরীর পরিবারও আস্তে আস্তে ঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পবিত্র-ও জানতে পেরে একদম বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছে। তার সতর্ক নজর প্রতিটা মুহূর্ত মেপে নিচ্ছে। অস্থির পায়ে মাঝেমধ্যেই রাউন্ডও দিচ্ছে। তার সঙ্গে মোবাইলের মাধ্যমে ভেতরের পরিস্থিতি মনিটরিংও করে চলেছে। তার চোখ এড়িয়ে কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ এলেই ধরা পড়বে। এককথায় পবিত্র-র ভাষায় 'বজ্র আঁটুনি।'

কিন্তু তারপরও অধিরাজের মনে শান্তি নেই। যেখানে 'বজ্র আঁটুনি', সেখানেই 'ফস্কা গেরো" হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বার্নিং শিখ এত সহজে চুপচাপ বসে থাকার লোক নয়। তাছাড়া কমলার ঐ রহস্যময় হাসি বারবার তাকে ভাবাচ্ছে। নিশ্চয়ই ওর অন্য কোনো প্ল্যান আছে, যেটার হদিশ অধিরাজরা এখনও পায়নি। তার মুখে চিন্তার ছায়া ফের ফিরে এসেছে। কিছু গোলমাল তো আছেই। তাকে যত তাড়াতাড়ি হোক, পি সি চৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছতেই হবে। পবিত্র আর কৌশানী ওখানে উপস্থিত আছে ঠিকই, তবুও মনে স্বস্তি নেই। সবসময়ই মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু একটা ভুল হচ্ছে। ঐ আনক্যানি হাসিটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ভোলা যায় না! ওর মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ ছিল। সে আর কিছু না ভেবে গাড়িতে স্পিড তুলল।

আজকের রাতের পরিবেশটাও বড়ো বেশি থমথমে। এখন আবার সেই ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশার স্তর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। বাধ্য হয়েই ডিপার জ্বালাল অধিরাজ। রাস্তার আলোগুলোও যেন বড়ো নিষ্প্রভ। যেন আগে থেকেই কোনো বিপদের আশঙ্কাতে ওদের আলোও ভয়ার্ত, বিবর্ণ। এমনকি আকাশে চাঁদটাও যেন ভয়ে ভয়ে উকি মারছে। কোনো অশনিসঙ্কেতে সে-ও বুঝি সাবধানে তাকিয়ে দেখছে চতুর্দিকটা। এমন রাত যে কোনো মানুষকেই আশঙ্কিত করে তোলে।

অধিরাজ ড্রাইভ করতে-করতেই টের পাচ্ছিল, ক্লান্তিতে, ঘুমে তার চোখ বুজে' আসছে। সে একা নয়, মোটামুটি টিমের সকলেরই এক অবস্থা। এইভাবে একটানা দৌড় আগে কখনও করতে হয়েছে বলে বিশেষ মনে পড়ে না। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়লে চলবে না। এখনও শেষ কিছু ঘণ্টা বাকি আছে। বাকি আছে অন্তিম একটা দিন। তার আগে তার ঘুমোনো তো দূর, মরারও উপায় নেই।

সে একহাতে স্টিয়ারিং সামলে, অন্যহাতে তুলে নেয় ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা। বেশিরভাগ সময়ই অধিরাজ ডানহাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে প্যাকেটের ঢাকনা খুলে ঠোঁট দিয়ে সিগারেটের বাট চেপে ধরে একটা স্টিক টেনে বের করে আনে। হাত কম ইউজ করে। এটাই তার স্টাইল। আজও তেমনভাবেই একটা সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে জ্বালাল। স্মোকিংটা একটু বেশিই হচ্ছে। অথচ উপায় নেই। এই মুহূর্তে নিকোটিনের ভয়ের চেয়েও চোখে ঘুম আসার ভয়টা অনেক বড়ো। সারা শহর ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির কোলে শুয়ে পড়লেও টিম অধিরাজের ছুটি নেই। তাদের জেগে থাকতেই হবে। পরিস্থিতিটাই এমন।

সিগারেটের কড়া ধোঁয়াটা গলায় লাগতেই তন্দ্রাভাব অনেকটাই কাটল। সে ঘুম ঘুম ভাব তাড়ানোর জন্য কিছুটা ধোঁয়া গিলেই নিল। এখন গন্তব্য আর বিশেষ দূরেও নেই। এই স্পিডে চলতে থাকলে আর মিনিট পাঁচেকের রাস্তা মাত্র। তবু যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ শান্তি নেই অধিরাজের। একেকটা মুহূর্ত খসছে, ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা সরছে, তার সঙ্গে যেন তাল মিলিয়ে তার হৃৎস্পন্দনও বাড়ছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণে পি সি চৌধুরীর পরিবার ঘুমোতে গিয়েছে। কে জানে, কী ঘটতে চলেছে তাদের সঙ্গে! তবে অধিরাজ নিশ্চিত, যা ঘটার তা রাতের এই কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ঘটবে। কে জানে পবিত্র ঠিকঠাক নজর রাখছে কিনা...!

ভাবতে-ভাবতেই পি সি চৌধুরীর বাড়ির গলিটা এল। অধিরাজ রাইট টার্ন নিয়ে গলির ভেতরে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে নিয়েছে। আর মিনিটখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাবে...!

ঠিক তখনই আচমকা তার মোবাইল ফোন সশব্দে বেজে উঠল। অধিরাজ চমকে তাকায় ফোনের দিকে। স্ক্রিনে বড়ো বড়ো করে পবিত্র-র নাম ও ছবি ভাসছে। দুশ্চিন্তায় তার কপালে ভাঁজ পড়ে। পবিত্র এখন ফোন করছে কেন? একটু আগেই তো কথা হল। তখনও তো সব ঠিক ছিল। সে জানে অধিরাজ রাস্তায় আছে। বিনা প্রয়োজনে তাড়া দেওয়ার মতো লোক অফিসার আচার্য নয়। এখন কি তবে কিছু ঘটেছে! কোনো দুর্ঘটনা....!

সে ধূমায়িত সিগারেট ধরা হাত দিয়ে স্টিয়ারিং শক্ত করে ধরে ফোনটা বিদ্যুৎবেগে তুলে নেয়, "হ্যালো!"

ওদিক থেকে ভেসে এল পবিত্র-র বিপন্ন ও উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, "কোথায় তুমি?" "এই তো। জাস্ট গলিতে এন্ট্রি নিয়েছি।"

"তাড়াতাড়ি এসো প্লিজ...। সামথিং ইজ ভেরি রং...!"

অধিরাজের হৃৎপিণ্ড যেন গলায় এসে আটকে গিয়েছে, "কী হয়েছে? পি সি চৌধুরীর ফ্যামিলি ঠিক আছেন?"

পবিত্র হাঁউমাউ করে ওঠে, "ওঁদের খবর জানি না। তবে আমি ঠিক নেই। মিস্ বোস আরও ঠিক নেই। কাম শার্প!"

অধিরাজ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে গাড়ির স্পিড বাড়ায়। এই লম্বা গলিটার শেষপ্রান্তেই মিঃ চৌধুরীর বাড়ি। প্রায় ঝড়ের বেগেই কয়েক সেকেন্ডে সে পৌঁছে গেল গেটের বাইরে। সিগারেটটায় উত্তেজিত শেষ টানটা মেরেই ছুড়ে ফেলে দিয়ে পড়িমরি করে দৌড়োল লোহার গেটের দিকে। গেট খোলাই ছিল। এমনকি ওঁদের বাড়ির দরজাও খোলা। সে ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে। বুকের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা তাণ্ডব করছে। কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। কী হল মিস্ বোসের। সে বেঁচে আছে তো! না বার্নিং শিখ তাকেও সরিয়ে দিয়েছে এ পৃথিবী থেকে...।

"হাম তো ফনা হো গয়ে উনকি আঁখে দেখ কর গালিব, না জানে উয়োহ আইনা ক্যায়সে দেখতে হোঙ্গে...!"

অধিরাজ প্রায় দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। হলের কাছে আসতেই শুনতে পেল একটা নেশাজড়িত উষ্ণ নারীকণ্ঠ। মিস কৌশানী বোস! কিন্তু সে হঠাৎ গালিবের শায়রি আওড়াচ্ছে কেন? এই কি শের-শায়রি করার সময়! মহিলার মাথাটা কি একেবারেই গেছে!

ভেতরে তখন আধো আলো, আধো অন্ধকার। স্রেফ কম পাওয়ারের একটা নাইটবাল্ব জ্বলছে। কিন্তু তাতেই সামনের দৃশ্যটা দেখে অধিরাজের চক্ষু চড়কগাছ। সে কোনোমতে বিস্মিত গলায় বলল, "এ কী!"

ঐ স্বল্প আলোতেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে মিস্ বোস পবিত্রকে একেবারে সজোরে ঠেসে ধরেছে দেওয়ালের সঙ্গে। তার পুরুষালি দেহের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর খাজুরাহোর নরম পেলব সৌন্দর্য। তার একটি মৃণালভুজ পবিত্র-র কোমরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। অন্য হাতটি গলায় নাগপাশ দিয়ে রেখেছে। তার বুকে উন্মত্তের মতো মাথা, মুখ ঘষতে ঘষতে কৌশানী নেশাস্খলিত স্বরে বলছে, "যখন তোমায় দেখিনি, তখন থেকেই আমি পৃথ্বীরাজের সংযুক্তা হয়ে বসে আছি। কেস ডিসকাশনে যখন তোমার অ্যাসাইলাম মার্ডার কেসটার রেফারেন্স শুনেছিলাম, পুরো কেসফাইল স্টাডি করেছিলাম, তখন থেকেই আমি আলাউদ্দিন খিলজির মতো পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। লাইফে রতনসিং থাকুক কি না থাকুক, তোমাকে আমি ছিনিয়ে নিয়েই ছাড়ব। তুমি যদি ছ-ফুট চার ইঞ্চির না হয়ে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চিরও হতে, তাহলেও আমি তোমাকেই চাইতাম। আই জি না হয়ে কনস্টেবল হলেও কিচ্ছু আসত যেত না। তোমার জন্য বাড়ি-ঘর-পরিবার সব কিছু ছেড়েছুড়ে এখানে চলে এসেছি। তারপর তোমার বাদামি চোখ, ঐ অদ্ভুত নিষ্পাপ মুখ, বাচ্চাদের মতো হাসি, বিশ্বাস করো, আমি সব ভুলে গেছি। এত অপদার্থ হয়ে গেছি যে সোসাইটির দরোয়ানটার মধ্যেও শুধু তোমাকেই দেখতে পাই। আর তুমি আমাকে পাত্তাই দাও না! প্লিজ, টেক মি টু ইওর হার্ট। আর কষ্ট দিও না। প্লিজ, টেক মি ..."

অধিরাজ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকেই তাকিয়ে আছে। এসব কী প্রলাপ বকছে মেয়েটা!

কেনই বা বকছে? পবিত্র-র অবস্থা করুণ। সে দু-হাত তুলে 'ভজ গৌরাঙ্গ' স্টাইলে কোনোমতে দাঁড়িয়ে ছিল। অধিরাজের দিকে চোখ পড়তেই ভয়ার্ত স্বরে বলল, "আমি কিছু করিনি রাজা!..বিলিভ মি... আমি ওঁকে ছুঁইনি! তুমি সাক্ষী!"

মিস্ বোস কিছুক্ষণ তার বুকে মুখ ঘষে এবার পবিত্র-র মুখের দিকে তাকায়। তার চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। মুখে স্পষ্ট জেদের লক্ষণ। সে আরও জড়ানো স্বরে বলে, "কিন্তু এই হতচ্ছাড়া গোঁফ আমাদের মাঝখানে কবে এল! একটু আগেও তো ছিল না। এইটুকু সময়ের মধ্যেই কেন এমন ঝাঁটার মতো গোঁফ রেখেছ তুমি?"

"ওরে আমার আলাউদ্দিন খিলজি!" পবিত্র ঐ অবস্থাতেই কেঁউমেউ করে ওঠে, "গোঁফ এইজন্য আছে কারণ আমি তোর ছ-ফুট চার ইঞ্চির পদ্মাবতী নই। আমি নেহাতই পদ্মিনীর বুড়ো বাবা 'গন্ধর্বসেন'। ওঁর ঠাকুর্দা হতেও আপত্তি নেই। আমার বাড়িতে একজন ললিতা পাওয়ার বসে আছে! সে যদি জানতে পারে এখানে আমায় 'লোলিটা' চেপে ধরেছে তো লাইফের পুরো 'পাওয়ারকাট' করে ছেড়ে দেবে। প্লিজ, ছাড় আমায় মা।"

"উঁহু।" সে মাথা নাড়ছে, "তুমি গোঁফ গজাও, দাড়ি গজাও, মোটা হয়ে যাও, বেঁটে হয়ে যাও, হিরো আলমের মতো দেখতেও হয়ে যেতে পারো, তবু আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়ব না। যখন তুমি ঠোঁট দিয়ে সিগারেটের বাট কামড়ে ধরো, রিং বানাও তখন আমারও সিগারেট হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কামন অন—কিস মি! কিস মি নাও লাইক আ সিগারেট। বার্ন মি লাইক ইন্ডিয়া কিং...!"

বলতে বলতেই কৌশানী তার চুম্বনোদ্যত মুখ পবিত্র-র ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়েছে। পবিত্র মুখ সরিয়ে নিয়ে কোনোমতে উদ্যত চুমুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচায়। পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করে বলল, "এ কী! ইনি তো গাঁজা খেয়েছেন! গন্ধে আমার গা গুলোচ্ছে। ইশশশ!"

অধিরাজ স্তম্ভিত। মিস্ বোস গাঁজা খেয়েছে! এ কী করে সম্ভব? সে যথেষ্ট সতর্ক মেয়ে। অত্যন্ত দায়িত্ব সচেতনও বটে। এই পরিস্থিতিতে এই জাতীয় মাদকের সেবন ও কিছুতেই করবে না। সর্বোপরি সে নিজেও জানে, কৌশানীর গাঁজা খাওয়ার কোনোরকম অভ্যেসই নেই। এতদিন ধরে একসঙ্গে রাত-দিন কাজ করছে। গঞ্জিকা সেবন করলে কখনো-না কখনো ঠিক আভাস পেত। বরং সে স্মোক করে। কেউ তার সিগারেটের স্টিকে গাঁজা

মিশিয়ে দেয়নি তো! সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে ঘটনাটা একবার দেখল। পরক্ষণেই উৎকর্ণ হয়ে কিছু যেন শুনল। কোনো একটা বেডরুম থেকে ভারি নিঃশ্বাস ও চাপা কাশির শব্দ ভেসে আসছে না! ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট। অধিরাজ প্রমাদ গুনল। কোনোমতে ফিশফিশ করে বলল, "সর্বনাশ। সর্বনাশ।"

"প্লিজ সেভ মি রাজা।" পবিত্র কাতরস্বরে বলে, "এ পাবলিক আমার সাড়ে তেরোটা বাজিয়েই ছাড়বে! আমি মি-টু কেস খাব...।"

"সরি বস...।" অধিরাজ আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে সোজা টেনে দৌড়োল বেডরুমের দিকে, "তার থেকেও বড়ো বিপদ আমার সামনে আছে। ওঁকে পরে দেখছি...!"

সে সরু করিডর দিয়ে একটু এগোতেই শুনতে পেল কাশির আওয়াজটা। বেডরুমের ভেতর থেকেই আসছে। এই শীতে এমন কাশির শব্দ একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অধিরাজ খুব ভালোভাবেই জানে এর অর্থ কী। সে মরিয়া হয়ে আপ্রাণ ধাক্কাধাক্কি করে বেডরুমের দরজা খোলার চেষ্টা করে। অথচ দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! খুব সম্ভবত ল্যাচ টানা আছে। ওদিকে কাশির আওয়াজটা ক্রমাগতই বাড়ছে। তার মাথার মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হল আহেলির বলা শব্দগুলো! ...দশ থেকে পনেরো মিনিট... তার বেশি সময় হাতে নেই...! এর মধ্যে যদি এই রুদ্ধদ্বার না খোলে, তবে কাউকে বাঁচানো যাবে না! ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাস তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। .... ওদিকে উলটোদিকের বেডরুম থেকেও সেই কালান্তক কাশির শব্দ আসছে। মিসেস চৌধুরীও বিপন্ন!

অধিরাজ প্রথমে কোন্দিকে দৌড়বে বুঝতে পারল না! পরিস্থিতি চরম বিপজ্জনক। এখনই ওঁদের প্রত্যেককে বাইরে বের করে আনা দরকার। এদিকে পরিমল আর মেঘনার জীবন বিপন্ন। ওদিকে সোমলতার মতো একজন অসুস্থ বৃদ্ধা! কোনদিকে যাবে সে? কোথায় যাওয়া উচিত! অথচ ওঁদের হাতে সময় ক্রমশ কমছে। ঐ বিষাক্ত গ্যাস যত ফুসফুসের ভেতরে ঢুকবে, ততই কালান্তক মৃত্যু কাছে ঘনিয়ে আসবে। একমুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সে। কিছুটা হেল্পলেসও বটে। একা কতজনকে বাঁচাবে? ওদিকে পবিত্র আর মিস্ বোসের অবস্থাও তথৈবচ। ওদের সাহায্য এখন পাওয়া যাবে না। অথচ সময় নেই...! সময় নেই...। শিয়রে শমন।

একটা গভীর শ্বাস টেনে সে নিজেকে একটু শান্ত করার চেষ্টা করে। এখন বিচলিত হলে চলবে না। এই দরজা ভাঙতেই হবে তাকে। এখানে বন্দুক ইউজ করা যাবে না। ভেতরে দু-দুটো বিপজ্জনক গ্যাসের অস্তিত্ব! তার মধ্যে ফায়ার করলে কোনোরকম উলটোপালটা কিছু হবে কিনা জানা নেই। তাই ম্যানুয়ালি ভাঙাই ভালো। ট্রেনিঙের সময় দরজা ভাঙার পদ্ধতিটা তাদের সবাইকেই শেখানো হয়েছিল। তার জন্য দয়ানন্দ শেঠির মতো হেভিওয়েট হওয়ার প্রয়োজন নেই। ওটা স্রেফ একটা টেকনিক। অধিরাজ

একটু পিছিয়ে গিয়ে দরজার ল্যাচের অবস্থান আন্দাজ করে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে একটা সজোর কিক মারল। একটু পুরোনো কাঠের দরজা সেই আঘাতে কেঁপে উঠলেও একচুলও নড়েনি। সে আফসোসে ঠোঁট কামড়ায়। এগুলো এখনকার ফ্যান্সি দরজা নয় রীতিমতো শাল বা সেগুনের শক্তপোক্ত কাঠের দরজা। একবারে হবে না! "কাম অন...কাম... অন!"

সে পাগলের মতো দরজার গায়ে একের পর এক লাথি মারতেই থাকে। জোরে.. আরও জোরে... আপ্রাণ জোরে! দরজাও ভাঙার নাম নিচ্ছে না। অধিরাজও হা ছাড়ছে না। এখন তাকে সম্পূর্ণ উন্মাদের মতো লাগছে। কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা টপটপ করে পড়ছে। শক্ত কাঠের দরজা বারবার তার আঘাতকে প্রতিহত করছে। তবু যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ক্রমশই সরছে... কাশির শব্দ ক্রমাগতই বাড়ছে.... শব্দটা এমন, যেন কেউ ওঁদের গলা টিপে ধরেছে... চোকিং সাউন্ড... একটু পরে এটাও শোনা যাবে না... ভোক্যাল কর্ডটাই পুড়ে যাবে! মারতেই হবে...! ভাঙতেই হবে...। সময় হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে...!

বারংবার প্রচণ্ড আঘাত অনাহতভাবে আছড়ে পড়ার ফলে শেষপর্যন্ত মানুষের দুরন্ত জেদের কাছে হার মানল কাঠের দরজা। একটা ধাতব ঝনঝন শব্দ! ল্যাচটা ভেঙে খুলে

পড়েছে। অধিরাজ বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে এক লাথি মেরে এবার দরজাটা খুলে দিল। ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ তার নাকে এসে ধাক্কা মারে। রুম ফ্রেশনারের সৌরভের মতো মিষ্টি নয়, কেমন যেন অদ্ভুত! অধিরাজের মনে হল তারও বুঝি দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই সেই ফসজিনের গন্ধ! ঠিক তখনই আর একটা মারাত্মক ভুল আবিষ্কার করল সে। প্রচণ্ড আফসোসে নিজেকেই মনে মনে বলল, 'স্টুপিড।'তাড়াহুড়োয় গ্যাসমাস্কটা ও গাড়িতেই ফেলে এসেছে! অসম্ভব বড়ো একটা ব্লান্ডার। তবে দরজা খুলতে পেরেছে এই রক্ষে। খোলা দরজা দিয়ে গ্যাসটা কিছুটা হলেও বাইরে বেরিয়ে আসবে।

অধিরাজ অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে নাকে মুখে বেঁধে নেয়। তারপর আর দেরি না করে ঢুকে পড়ল বেডরুমের ভেতরে এখন ফের গাড়ি অবধি দৌড়ে যাওয়ার সময় নেই। যা হবে দেখা যাবে। ফসজিন যদি আজ তাকে মেরেও ফেলে তবু মানুষগুলোকে উদ্ধার করেই ছাড়বে। আর একটা মৃত্যুও হতে দেবে না! তাতে যা লেখা থাকে কপালে!

পরিমল আর মেঘনার জীবনীশক্তি ততক্ষণে প্রায় জবাব দেওয়ার পথে। কাশতে কাশতে দু-জনেরই মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। কাশার মতো শক্তিও বুঝি আর অবশিষ্ট নেই। দু-জনেই প্রায় অচেতন, অবিন্যস্ত, বিস্রস্ত! যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তবু মেঘনার জ্ঞান তখনও সামান্য ছিল। সে কোনোমতে তাকিয়ে বলল, "অ-ফি-সা-র।"

"স্যরি ম্যাডাম। বাট আই হ্যাভ টু টাচ ইউ।"

শুধু এইটুকু বলেই সে প্রায় এক হ্যাঁচকায় টান মেরে মেঘনাকে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিয়েছে। মেঘনা নারী বলেই পরিমলের চেয়ে অনেক বেশি ভালনারেবল। ওকেই আগে বাইরে বের করে নেওয়া দরকার। তার মাথায় তখনও আহেলির নির্দেশ ঘুরছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের বাইরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সে সবেগে মেঘনাকে নিয়ে দৌড়োল বাইরের দিকে। ততক্ষণে পবিত্রও নিজেকে মিস্ বোসের আলিঙ্গন থেকে কোনোমতে মুক্ত করতে পেরেছে। সে অধিরাজকে বাইরের দিকে মেঘনাকে নিয়ে পাগলের মতো ছুটতে দেখে একমুহূর্তও সময় নষ্ট করল না। ঘটনাটা কী ঘটেছে তা বুঝতে তার একটুও কষ্ট হয়নি। বিদ্যুৎবেগে অধিরাজের দেখাদেখি পবিত্রও মুখে রুমাল বেঁধে দৌড়োল ঐ বেডরুমের দিকেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অজ্ঞান পরিমলকে তুলে নিয়ে সে-ও তড়িৎবেগে বেরিয়ে এসেছে ঐ প্রাণঘাতী গ্যাস চেম্বার থেকে। পরিমলের দেহ অত্যন্ত ভারি। পবিত্র-র রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু মাঝপথেই দেখা হয়ে গেল অধিরাজের সঙ্গে। সে আবার ভেতরের দিকেই দৌড়চ্ছিল। পবিত্রকে গলদঘর্ম হতে দেখে বলল, "আমায় দাও।"

পবিত্র বিনাবাক্যব্যয়ে পরিমলের ভারি দেহটা অধিরাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে সে অনায়াসেই ঐ লম্বা চওড়া যুবককে নিয়ে বাইরের দিকে ছোটে। ওরা কোনোদিকে না তাকিয়ে, সোজা বাড়ির বাইরে গিয়ে একদম খোলা আকাশের তলায়, প্রাকৃতিক হাওয়ার মধ্যে শুইয়ে দিয়েছে দু-জনকে। অধিরাজ আর পবিত্র-র দৃষ্টি বিনিময় হতেই সে বলল, "সোমলতা! কুইক!"

সোমলতার দরজা ভাঙতে অবশ্য খুব বেশি বেগ পেতে হল না। দু-জন শক্তিশালী বলিষ্ঠ যুবকের পদাঘাত তাঁর বেডরুমের প্রাচীন ছিটকিনি বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। ফসজিন ও মাস্টার্ড গ্যাসের যুগ্ম আক্রমণে তিনিও তখন জীবনের শেষ প্রান্তে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলেন। অধিরাজ তাঁর ভারি শরীরটাকে কাঁধে ফেলে বলল, "পবিত্র, দুটো ঘরের সব জানলা খুলে দিয়ে ফ্যান চালিয়ে দাও ইমিডিয়েটলি ...!"

"ইয়েস স্কিপি।"

সোমলতাকে নিয়ে অধিরাজ চলে যেতেই পবিত্র তাড়াতাড়ি দুটো বেডরুমের ভেতরে ঢুকে দ্রুতবেগে সমস্ত জানলা খুলে দেয়। সেই দম বন্ধ করা পরিস্থিতি এখনও কায়েম আছে। কিন্তু বাইরের ঠান্ডা হাওয়া বদ্ধ ঘরে ঢোকামাত্রই একটু যেন পরিবেশটা হালকা হল। সে প্রথমে ফ্যানের সুইচ খুঁজে পাচ্ছিল না। তাই যে ক-টা সুইচ ছিল সবগুলোকেই অন করে

দিয়েছে। রেগুলেটরে হায়েস্ট স্পিডের সঙ্কেত পেয়েই পাখা একেবারে ঝড়ের গতিতে ঘুরতে শুরু করল। পবিত্র টের পেল, দম বন্ধ ভাবটা এবার আস্তে আস্তে কমছে। আহেলি সঠিকই বলেছিল। ফসজিন ভারি গ্যাস হলেও ক্লোরিনের মতো গোঁয়ার গোবিন্দ নয়। গ্যাসটা পাখার ধাক্কায় ও খোলা জানলার মাধ্যমে সত্যিই বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে এখন লুটোপুটি খাচ্ছে ঠান্ডা তাজা বাতাস।

নিজের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে ফের বাইরে বেরিয়ে এল পবিত্র। অধিরাজ ততক্ষণে কোথা থেকে যেন লম্বা একটা পাইপ এনে বাইরের কলের সঙ্গে কানেক্ট করে ঝঝপ করে জল ফেলছে ভিকটিমদের ওপর। এই পাইপটা বোধহয় বাগানে জল দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। পরিমল, মেঘনা ও সোমলতা, তিনজনেই আপাদমস্তক ভিজে চুপচুপে হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু জলে স্নান করার ফলও পাওয়া গিয়েছে হাতেনাতে। তিনজনেরই হুঁশ আস্তে আস্তে ফিরছে। সোমলতা ও মেঘনা নড়াচড়া করছেন। পরিমলও ক্লান্ত চোখ খুলে তাকায়। অধিরাজ ঝুঁকে পড়ে তিনজনেরই শ্বাস চেক করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, "নর্মাল ব্রিদিং! ফাঁড়াটা এবারের মতো বোধহয় কেটে গেল পবিত্র। অ্যাম্বুলেন্স ডাকো। ওঁদের তিনজনকেই হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে।"

পরিমল আস্তে আস্তে বলল, "বা-বা!"

"আশা করছি ওঁর কিছু হয়নি।" অধিরাজ তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে, "আপনি ঠিক আছেন? শ্বাস নিতে এখনও কষ্ট হচ্ছে?"

পরিমল কোনোমতে মাথা নেড়ে জানায় যে এখন আর শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে না। বাইরের তাজা অক্সিজেন আর জল, ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাসের মারাত্মক প্রভাব অনেকটাই দূর করতে পেরেছে। যদি আভ্যন্তরীণ অঙ্গে কোনোরকম ক্ষতি হয়ে থাকে তবে তা হসপিটালে পৌঁছোনো অবধি বোঝা যাবে না। পবিত্র আর কথা না বাড়িয়ে নিকটবর্তী হসপিটালের সঙ্গে যোগাযোগ করে অ্যাম্বুলেন্সের বন্দোবস্ত করে ফেলে। হসপিটাল থেকে ওদের জানানো হল, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

"চোখে, নাকে ভীষণ জ্বালা...!" এবার মেঘনা অতিকষ্টে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।" "ওয়েলকাম ম্যাডাম।" বলেই অধিরাজ পবিত্র-র দিকে তাকিয়েছে। সে তখন উত্তেজনায়, পরিশ্রমে রীতিমতো হাঁফাচ্ছে। কোনোমতে বলল, "মিঃ চৌধুরীকে খবর দাও। ওঁকে ইনফর্ম করো। আর দেখো, মিস্ বোসের কী হল।"

"কী।" পবিত্র আঁতকে ওঠে, "আবার ঐ লুচ্চি আলাউদ্দিন খিলজির খপ্পরে পড়ব। আর একটু হলেই আমি অফ হয়ে যাচ্ছিলাম রাজা। থ্যাংক গড তার আগেই উনি নিজেই অফ হয়ে গিয়েছিলেন! আবার যদি চেপে ধরেন, তবে কপালে জওহরব্রতই নাচছে। আমি না, আমার বউ করবে। আমি নেই। তুমি ওঁকে দেখো। আমি বরং পি সি চৌধুরীকে ডেকে আনছি।"

"ওকে।"

পি সি চৌধুরীর অবশ্য কোনো ক্ষতি হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। অধিরাজরা ঠিকই আন্দাজ করেছিল। বয়স্ক মানুষটিকে বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়া স্পর্শও করেনি। তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিলেন। পবিত্র-র ডাকাডাকিতে সভয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। নিদ্রাজড়িত আড়ষ্ট অবস্থায় প্রথমেই কী হয়েছে তা বুঝতে পারেননি। পরক্ষণে দুঃসংবাদটা শুনেই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, "সে কী! ওরা... ওরা সবাই...!"

"বেঁচে আছেন এবং সুরক্ষিতও আছেন।" পবিত্র তাঁকে আশ্বস্ত করে, "আপনি চলুন। অ্যাম্বুলেন্স অন দ্য ওয়ে। পেশেন্টদের গার্জিয়ান হিসাবে আপনাকে থাকতে হবে। অবিলম্বে ট্রিটমেন্ট দরকার ওঁদের।"

ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "ওকে। থ্যাঙ্ক ইউ!...থ্যাঙ্ক ইউ...!"

অন্যদিকে অধিরাজ মিস্ কৌশানী বোসকে অতি সন্তর্পণে পরীক্ষা করছিল। সে এখন

সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু! সৌভাগ্যক্রমে আরও বেশি কিছু অঘটন ঘটার আগেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। অধিরাজ ঝুঁকে পড়ে অতি সাবধানে তার মুখ শুঁকে দেখল। হ্যাঁ, পবিত্র ঠিকই বলেছে। অকৃত্রিম গাঁজার গন্ধই বটে। তবে তার অভ্যস্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় হালকা মার্লবোরোর গন্ধটাও পেল। সে কথা না বাড়িয়ে কৌশানীর ব্যাগ খুঁজে বের করে ভেতর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে আনে। তার মধ্যে এখন মাত্র দুটো স্টিকই পড়ে আছে। সে একটা স্টিককে ভেঙে ভেতরের ঘ্রাণটা নেয়। উঃ! ভয়াবহ!

অধিরাজ আফসোসে মাথা নাড়ে। তার সন্দেহই সঠিক। কৌশানী নিজে গাঁজা খায়নি। সে মার্লবোরোই স্মোক করছিল। হয়তো রাত জাগার ক্লান্তি দূর করার জন্যই একাধিক সিগারেট টেনেছিল। সেটাই স্মোকারদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বুঝতে পারেনি যে ঐ স্টিকগুলোর মধ্যে কেউ গাঁজাও মিশিয়ে দিয়েছে। সন্দেহে অধিরাজের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু মেশাল কখন। কমলাকে তো তার অনেক আগেই ওরা এ বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। তার আগেই কি সে সুযোগ পেয়ে সিগারেটের বাক্সে হেরফের করে রেখেছিল? নাকি অন্য কেউ তাকে সাহায্য করেছে? তাছাড়া কৌশানী টুইঙ্কলের মতো সকলের সামনেই বেপরোয়াভাবে হুশহুশ করে স্মোক করে না। সে লুকিয়ে চুরিয়ে ধূমপান করে থাকে। কেউ জানলই বা কী করে ওর এই দুর্বলতাটার কথা! এ বাড়ির মানুষেরা যে পরিমাণ সাত্ত্বিক তাতে নার্স সিগারেট ফুঁকছে দেখলে আগেই হার্টফেল করতেন ওঁরা। সুতরাং ফ্যামিলির কেউ জানতেই পারে না। তবে? কৌশানীকে প্যাকেটটাই বা এনে দিল কে?

অধিরাজের মুখে দুশ্চিন্তা। বার্নিং শিখকে কিছুতেই জব্দ করা যাচ্ছে না। সেডেটিভ, স্ট্রেস ফ্রি ড্রাগের যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে এখন গাঁজার মতো নেশার বস্তুর আশ্রয় নিয়েছে। কৌশানী বোসের স্মোকিং হ্যাবিটের কথা ও আগেই জেনে গিয়েছিল। আশ্চর্য! এই টিমের প্রত্যেকটি অফিসার এবং তাদের সব অভ্যেসের খবর কি সে মুখস্থ করে রেখেছে! পবিত্র এখানে এসে না পড়লে, আর অধিরাজ সময়মতো উপস্থিত না হলে কৌশানীর টুকরো টুকরো করা দেহটা কাল পাওয়া যেত! সঙ্গে আরও তিনটে মানুষের লাশ! এত সাবধানতা, সতর্কতা, এত আপ্রাণ প্রচেষ্টা আর একটু হলেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছিল। কী ভয়ংকর খুনি! কী ভয়াবহ আর নিখুঁত তার প্ল্যানিং। সশরীরে সে আশেপাশে কোথাও উপস্থিত নেই। অথচ কী অব্যর্থ তার মারণাস্ত্র।

জুতোর খটখট শব্দে সে সচকিত হয়ে ওঠে। পবিত্র মিঃ পি সি চৌধুরীকে নিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের মুখে বিহ্বলতা, ভয়, গ্লানি, সব মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে আছে। অঝোরে কেঁদেই চলেছেন। তিনি অধিরাজের দিকে শুধু একটি নীরব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নমস্কার জানিয়ে সোজা চলে গেলেন বাইরে শায়িত তাঁর পরিবারের কাছে। পবিত্রকে এই সুযোগে একান্তে ডেকে নিল অধিরাজ, "তুমি কি জানতে যে মিস্ বোসের স্মোকিং হ্যাবিট আছে?"

"হ্যাঁ।" পবিত্র উত্তর দেয়, "আগে জানতাম না। কিন্তু কাল ওঁর ড্রেসে লাগানো স্পাইক্যামেরার সামনে আস্ত মার্লবোরোর প্যাকেট ও উড়ন্ত ধোঁয়া দেখে বুঝেছিলাম যে উনিও আমাদেরই প্রজাতিভুক্ত।"

"তাহলে ওকে খাবার আর জলের সঙ্গে সিগারেটের সাপ্লাইও কি তুমিই দিয়েছিলে?"

"না।" পবিত্র এবার যেন একটু বিস্মিত হয়, "এক মিনিট... এক মিনিট...। তাই তো! উনি তো একবারও বলেননি যে ওঁর সিগারেটের প্রয়োজন আছে! বরং এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় শিখাকে এ বিষয়ে কিছু বলেছিলেন। শিখাকে আমি অন ক্যামেরা বিড়ি খেতে দেখেছি। তারপরই আজ সন্ধের পর মিস্ বোস শিখাকে কিছু টাকা ধরিয়ে কিছু একটা বলেছিলেন। কী বলেছিলেন, অতটা স্পষ্ট শুনতে পাইনি। তারপর প্রায় একঘণ্টা পরে শিখা ওকে একটা কালো কাগজে মোড়া প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি অত রাখঢাক দেখে গুরুত্ব দিইনি। জানোই তো মেয়েদের অনেক কিছু লাগে। অনেকরকম প্রাইভেসি থাকে...।

"আই নো!" সে মাথা ঝাঁকায়, "স্বাভাবিকভাবেই তুমি সন্দেহ করোনি। আর মিস্ বোসও

তোমায় সিগারেটের কথা বলতে কুণ্ঠাবোধ করেছেন। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ অনেক পুরুষই মেয়েদের স্মোক করা পছন্দ করে না। সেক্ষেত্রে উনি শিখাকেই বলবেন। নিজে যেতে পারছিলেন না, ওঁর ওপর সর্বক্ষণ ওখানে উপস্থিত থাকার অর্ডার ছিল। ওদিকে সিগারেট শেষ। যেহেতু শিখা নিজেই বিড়ি ফোঁকে তাই তাকেই একমাত্র এই গোপন কথাটা বলা যায়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিখাও এই প্যাকেটটা আনেনি। কমলা এনেছে।"

"অ্যাঁ। কিন্তু আমি যে শিখাকেই দেখলাম।"

"তুমি যা দেখেছ সেটাও সত্যি। আবার মিস্ বোস যা বলেছিলেন সেটাও। উনি বলেছিলেন শিখা একনম্বরের ফাঁকিবাজ। সে টিপিক্যাল পটের বিবি। নিজের কাজটাও কমলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এবার তুমিই ভেবে দেখো, এখান থেকে সবচেয়ে কাছের সিগারেটের দোকানটা মাত্র দু-মিনিটের দূরত্বে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে সেখানে মার্লবোরোর মতো অভিজাত ব্র্যান্ড পাওয়া যায় না, তবু গলি থেকে বেরিয়েই একটা বড়ো টোব্যাকো প্রোডাক্টের দোকান দেখেছি আমি। ওখানে ট্রিপল ফাইভ, বেনসন অ্যান্ড হেজেস, ইন্ডিয়া কিং সমেত সব দামি ব্র্যান্ডই পাওয়া যায়। শিখা যদি ওখান থেকেও নিয়ে আসত, তবে হার্ডলি দশ মিনিট লাগার কথা। কিন্তু তুমি নিজেই দেখেছ, সে প্যাকেটটা ডেলিভারি দিয়েছিল এক ঘণ্টা পরে। এখন প্রশ্ন হল, এত সময় লাগল কেন!"

"কেন?"

"কারণ শিখা আদৌ নিজে সিগারেট আনতে যায়নি। যে পটের বিবি ও ফাঁকিবাজ সে নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়েই চাপাবে, সেটাই স্বাভাবিক। শিখাকে ইন্টারোগেট করলে দেখো সে বলবে যে সিগারেট আনার দায়িত্ব সে কমলাকে দিয়েছিল। বার্নিং শিখ নিজে স্পিডি হতে পারে, কিন্তু কমলার ছদ্মবেশে সে অত্যন্ত শ্লথ। অ্যাক্টিং স্কিল এতটাই মারাত্মক যে ওর অস্কার পাওয়া উচিত। কমলাকে স্পিডে কাজ করতে দেখলে সকলেই সন্দেহ করবে। তাই টুকটুক করে নিজের কাজ সেরে সে ধীর গতিতে দোকান অবধি গিয়েছিল। আজই প্রথম নয়, নির্ঘাৎ কালও সে-ই মিস্ বোসের জন্য শিখার হুকুমে মার্লবোরোর প্যাকেট এনেছিল, তাই তার জানা ছিল যে এই লেডি অফিসার ধূমপান অভ্যস্ত। আজ মিঃ কমলা তাই একদম প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। সে যেহেতু চরম স্লো, তাই সিগারেটের স্টিকের মধ্যে গাঁজা মেশাতে যে এক্সট্রা টাইম লেগেছে, সেটা জাস্টিফাই করতে কোনো অসুবিধেই হয়নি। যে ওরকম কচ্ছপের গতিতে কাজ করে, সে দশ মিনিটের কাজ করতে একঘণ্টাই নেবে। মিস্ বোসের ধারণা ছিল না যে সিগারেটটা শিখা আনেনি, কমলা এনেছে। তাই চোখের সামনে কমলার আসল রূপ দেখার পরও ওঁর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়নি যে মার্লবোরোর স্টিকে কোনো প্যাঁচ-পয়জার থাকতে পারে। কারণ উনি শিখাকে বলেছিলেন, এবং সে-ই ওঁকে প্যাকেটটা ডেলিভারি করেছিল। শিখা যেহেতু ক্লিন, তাই তার দেওয়া প্রোডাক্ট নিয়েও সন্দেহ করার কোনো মানে হয় না। আর তুমি নিজেই দেখেছ, প্যাকেটটা এসে পৌঁছেছে সন্ধ্যার কিছু পরে। বার্নিং শিখ জানত, প্রকাশ্যে সবার সামনে উনি স্মোক করবেন না। হাই প্রব্যাবিলিটি আছে যে সবাই শুয়ে পড়ার পরেই একান্তেই মৌতাতে মনোনিবেশ করবেন। সেই চান্সটাই সে নিয়েছে। ফলাফল তোমার সামনে। তুমি আর আমি যদি আর একটুও দেরি করতাম, তবে চারজনই এতক্ষণে স্বর্গে ট্রান্সফার হয়ে যেতেন।"

পবিত্র এবার চটে লাল হয়ে গিয়েছে, "ফলাফল! আরে ইনি তো বিষফল। ওঁর স্পাই ক্যামের ওপর নজর রাখতে রাখতেই হঠাৎ দেখি ক্যামেরা ছাতের দিকে একবার ঘুরছে, পরক্ষণেই পালটি খাচ্ছে। তুমি বলেছিলে কোনোরকম সন্দেহ হলেই যেন সোজা ভেতরে ঢুকে যাই। ক্যামেরার জগঝম্প দেখে যেই এসে ঢুকেছি, অমনি উনিও আমায় এইসান ভীম আলিঙ্গনে চেপে ধরলেন যে অলমোস্ট আমি পটল তুলতেই যাচ্ছিলাম। তুমি স্বচক্ষে দেখেছ কী অবস্থা হয়েছিল। ম্যাডাম নিজেই যদি পতন ও মূর্ছা না যেতেন তবে আজ আমার হার্ট অ্যাটাক কেউ আটকাতে পারত না। ওঃ, ইনি আলাউদ্দিন খিলজির চেয়েও ডেঞ্জারাস! আর যা-ই হোক, ও লোকটা পদ্মিনীকে এইভাবে জাপ্টে ধরেনি।"

বাইরে থেকে ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সের হুটারের তীব্র আওয়াজ ভেসে এল। অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়েছে। একটা নয়, একাধিক। অধিরাজ আর কথা না বাড়িয়ে বাইরে চলে এল। তার মধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে লেগে পড়েছে স্বাস্থ্যকর্মী ও ওয়ার্ডবয়ের দল। তিনজন পেশেন্টকেই দ্রুতগতিতে তারা তুলে নিল অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে। সে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আরও একজন আছেন ভাই। ঘরের ভেতরে আনকনশাস অবস্থায় আছেন। ওঁকেও নিয়ে যাও। ওনারও ট্রিটমেন্ট দরকার।"

"ওনার ট্রিটমেন্ট নয়, ঝাড় দরকার।" পবিত্র ক্ষেপচুরিয়াস, "ঝাড় দিয়ে ওঁকে খণ্ড খণ্ড করে ঝাড়খণ্ডে ট্রান্সফার করা দরকার। এই মহিলাকে অবিলম্বে বসিয়ে দাও রাজা।

এ নিজেও ডুববে আমাদেরও ডোবাবে। একনম্বরের ক্যারেক্টারলেস টাইটানিক।" "আপাতত চুপ থাকো।" অধিরাজ হাতের ইশারায় তাকে থামতে বলে, "এখন রাগারাগি করার সময় নয়। প্রত্যেককেই প্রপার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সময়। তুমি কি পি সি চৌধুরীর সঙ্গে হসপিটালে যাবে? না আমি যাব? কারণ একজনকে ওখানে যেতেই হবে। ডাক্তারদের বলতে হবে যে এই দুর্ঘটনার পেছনে ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাসের লেথাল এক্সপোজার আছে। যত তাড়াতাড়ি ওঁরা রোগের কারণ জানবেন, তত তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্টও চালু হয়ে যাবে।"

"আমি একা কোথাও যাচ্ছি না।" সে গরগর করে, "তুমি গেলে যেতে পারি।" "বেশ। চলো।"

সারা রাস্তা পবিত্র আর একটি কথাও বলল না। সে একদম চুপ মেরে গিয়েছে। এরমধ্যেই অধিরাজ লোক্যাল পুলিশকে ইনফর্ম করেছে। পুলিশ আপাতত মিঃ চৌধুরীর বাড়িটাকে একবার ভালো করে সার্চ করে দেখবে। তারপর বাড়িটাকে পুরোপুরি ক্রাইম সিন হিসাবে সিল করে দিয়ে ওখানে পাহারা বসিয়ে দেবে। অর্ণবকে ফোন করে আর্বানার পরিস্থিতিও জানতে চাইল। ওখানে সবই স্বাভাবিক। কোনোরকম অঘটন এখনও ঘটেনি। আত্রেয়ী ও অর্ণব দু-জনেই অতন্দ্র প্রহরায় আছে। এখানকার অ্যাটাকের কথা শুনে অর্ণব উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চায়, "আপনারা সব ঠিক আছেন? আমি কি ওখানে আসব?"

"না।" অধিরাজ বারণ করে, "তুমি ওখানে একদম থাবা গেড়ে সকাল অবধি বসে থাকো। একচুলও নড়বে না। এখানে অ্যাটাক হয়েছে তার মানে এই নয় যে ওখানে হবে না। আমি যতদূর বুঝেছি, এই খুনগুলো করার জন্য বোধহয় খুনির সশরীরে উপস্থিত থাকার দরকার নেই। সেটা কোন্ পথে, কীভাবে সম্ভব তা জানি না। তবু সূর্যোদয় হওয়া অবধি সাবধানে থেকো। আপডেট দিও।"

"ওকে।"

পি সি চৌধুরীর বাড়ি থেকে হসপিটালটির দূরত্ব খুব বেশি নয়। রাস্তাতেও কোনো সমস্যা হয়নি। তিনটে অ্যাম্বুলেন্স পরপর রোগীদের নিয়ে হাসপাতালের চত্বরে ঢুকল। চৌধুরী সাহেব অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরেই ছিলেন। আর ওদের পেছন পেছন অধিরাজ ও পবিত্র গাড়িতে যাচ্ছিল। এমার্জেন্সিতে ঢোকামাত্রই উপস্থিত ডাক্তারদের সব ব্রিফ করে দিল ওরা। অধিরাজ জানাল যে ফসজিন ও মাস্টার্ড গ্যাসের এক্সপোজারে ছিলেন পেশেন্টরা। একজন তরুণ ডাক্তার কৌশানীকে দেখিয়ে বলল, "উনিও কি ফসজিনের কন্ট্যাক্টে এসেছিলেন?"

"না। উনি গঞ্জিকাসেবন করে বর্তমানে হাওয়ায় ওড়াউড়ি করছেন। মাটিতে নামিয়ে আনার দায়িত্ব আপনাদের। আর ওনার তেজস্ক্রিয় কন্ট্যাক্টে আমি এসেছি। কী বলেন আপনারা? ঠিক হয়ে যাব, না আই সি ইউতে ঢুকে পড়তে হবে?"

অধিরাজ কিছু বলার আগেই পবিত্র রাগতস্বরে জানিয়ে দিল। তরুণ ডাক্তারটি কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হেসে চলে গেল। অধিরাজ তার দিকে তাকিয়ে শুধু বলে, "সবসময়ই ওভার-রিঅ্যাক্ট করা জরুরি?"

পবিত্র একটু চুপ করে থেকে করুণস্বরে বলল, "উনি এত বড়ো একটা ব্লান্ডার করতে পারেন, বেতালের মতো আমার ঘাড়ে চড়তে পারেন, আর আমি একটু রাগতেও পারব না?

মানছি, শুরুতেই আমি নিজেই কেলো করে বসে আছি। তার জন্য তোমার যথেষ্ট ঝাড়ও খেয়েছি। কিন্তু তারপর অর্ণব যা করল, আর ইনি যা করেছেন সেটা কম কী! তার জন্য তো ওদেরও ঝেড়ে লাট করে দেওয়ার কথা! কিন্তু তোমার সব ঝাড় আমার ওপরই পড়ে কেন? আমি কি একাই ঝাড়খণ্ডি হওয়ার ঠেকা নিয়ে বসে আছি। বাকিদের তো তুমি কিছু বলো না।”

অধিরাজ স্মিত হাসল, “তার কারণ বাকিদের ঝাড়ার দায়িত্ব তুমিই নিয়েছ। দেখো, গোটা টিম এখন এমনিতেই ট্রিমেন্ডাস প্রেশারে আছে। তাই বকাবকির প্রেশারটা এখানে শুধু একজনই দিতে পারে। যেহেতু তুমি টিমের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র, সেহেতু অন্য কেউ তোমায় কিছু বলতে পারবে না। তাই তোমায় ডোজ দেওয়ার দায়িত্ব বা অধিকার একমাত্র আমারই আছে। কিন্তু অর্ণবকে তুমি প্রায় পাট পাট করে ছেড়েছ। তার ওপর শিশির সেনও ছেড়ে কথা বলেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিস্ বোসকেও তুমিই একহাত নেবে। কোনো ক্ষেত্রেই আমি তোমায় বাধা দেব না। ঐ বকাটা ওরা ডিজার্ভ করে। কিন্তু তোমার দেখাদেখি আমিও যদি শুরু হয়ে যাই, তবে অফিসারদের মনের ওপর আর একটা এক্সট্রা চাপ পড়বে যেটা একেবারেই কাম্য নয়। শাসন বা আদর কোনোটাই অতিরিক্ত হওয়া ঠিক নয়। যখন একজন সিনিয়র জুনিয়রদের ভর্ৎসনা করে, তখন অন্যদের চুপ থাকাই উচিত। সবাই মিলে বকতে শুরু করলে জুনিয়রদের সেলফ কনফিডেন্স ভেঙে যায়। ওটা একেবারেই সঠিক কাজ নয়। তাই যেহেতু তুমি অ্যাকটিভ, তাই আমি প্যাসিভ মোডেই আছি।”

“বুঝলাম।” পবিত্র একটা শ্বাস টানল, “কিন্তু তুমি কি বুঝেছ মিস্ বোস নামক আলাউদ্দিন খিলজির পদ্মাবতীটি আসলে কে? অবভিয়াসলি আমি নই। ইনফ্যাক্ট আমার জায়গায় ঐ বুড়ো পি সি চৌধুরী থাকলেও উনি তাঁকেও একইভাবে চুমু খেতে যেতেন। কারণ একজনের মূর্তিই ওঁর চোখের সামনে ছিল।”

“জানি।” এতক্ষণে তার মুখে ফের চিন্তার ছাপ, “উনি আমার কথা বলছিলেন।” “আরে বাঃ।” পবিত্র তার দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকায়, “তুমি সেটা বুঝেছ। শেষপর্যন্ত বুঝতে পারলে? আই মিন, মাথায় ঢুকল তোমার মামা? থ্যাঙ্ক গড! সূর্যটা ঠিক কোন্ দিকে উঠেছিল আজকে?”

“না বোঝার কিছু নেই।” সে গম্ভীর স্বরে বলে, “কমন সেন্স পবিত্র। ওঁর বক্তৃতার মধ্যেই সব ক্লু ছিল। এখানে পুরো সি.আই.ডি. হোমিসাইডটাই সাসপেক্ট হতে পারত। কিন্তু ছ-ফুট চার ইঞ্চির ক্লিনশেভড স্মোকার একজনই আছে। মেন্টাল অ্যাসাইলামের কেসও তাঁর আন্ডারেই ছিল। ঐ একটি লোকই ইন্ডিয়া কিংস ব্র্যান্ড ইউজ করে, ঠোঁট দিয়ে টেনে সিগারেট প্যাকেট থেকে বের করে কিংবা ধোঁয়ার রিং বানাতে পারে। উনি যে টিমের সদস্য সেখানেও আই জি একপিসই আছে। বাকিটা জলবৎ তরলং। একটা পাঁচবছরের ছেলেও ক্রিমিনালকে খুঁজে বের করতে পারবে, সেখানে তো আমি পেশাদার ইনভেস্টিগেটর।”

“তারপরও তুমি চুপ করে আছ! তোমার মনে হয় না, এখনই ওঁকে এই টিম থেকে কান ধরে বের করে দেওয়া উচিত?”

‘ট্রেনিং-এর সময়ে তুমি নিজেও তো একবার হোলির পার্টিতে নাক অবধি টেনে অ্যাকাডেমির গুঁফো বিহারী দরোয়ানকে চুমু খেতে গিয়েছিলে। তাই বলে কি তোমায় অ্যাকাডেমি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে? একটু ঝাড় পড়েছিল, সেটা আলাদা কথা।” অধিরাজ বলল, “মানুষ নেশা করলে প্রচুর ভুলভাল বকে। প্রলাপকে একদমই সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত নয়, ইগনোর করাটাই বেটার। কাল সকালে ওঁরও কিছু মনে থাকবে না। আমাদেরও ভুলে যাওয়াই ভালো। রাতে উনি স্রেফ ভুল করে গাঁজা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, এর বেশি আমরা কিছু জানি না, শুনিনি, দেখিনি। গল্প শেষ, চ্যাপ্টার ক্লোজড।”

“চ্যাপ্টার ক্লোজড? শিওর?” পবিত্র এবার খুব সিরিয়াস, “নেশায় মানুষ সবসময় ভুল বলে না রাজা। অনেকসময় পেটের কথা মুখেও চলে আসে। ঘোরের মধ্যে থাকা লোক বেশিরভাগ সময়ই সত্যি কথাটা বলে ফেলে। এটা তোমারও জানা৷ এইজন্যই অনেক ঘুঘু

ক্রিমিনালের 'নার্কো টেস্ট" হয়। তাই আমার মনে হয় না যে এটাকে আদৌ হালকা ভাবে নেওয়া উচিত।"

"রিয়েলি?" অধিরাজ মৃদু হাসল, "তা হলে বলো, মাধবী কে?"

"হোয়াট?" সে চোখ কপালে তুলে ফেলল, "মাধবী! সে আবার কে। অভিনেত্রী মাধবী?"

"ওয়েল, ফর ইওর কাইন্ড ইনফর্মেশন....।" অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসছে, "তুমি সেদিন বিহারী দরোয়ানকে জাপ্টে ধরে কোনো মাধবীর বিরহেই কাতর হয়ে পড়েছিলে ও ভেউ ভেউ করে কেঁদেছিলে। ওদিকে আমরা শুরু থেকেই জানতাম যে তোমার ছোটোবেলার প্রেম রীতিমতো সফল। বাল্যবয়েস থেকেই তুমি একজনের প্রেমেই হাবুডুবু খেয়েছ। তিনি অধুনা আমাদের সবার বউদি। তখনও তিনিই তোমার স্টেডি গার্লফ্রেন্ড ছিলেন, দ্বিতীয় কোনো নারী ছিল না। তাঁর নাম মাধবীও নয়। তাই কোনো মাধবী বা করবীর হাফসোল খেয়ে দেবদাস হওয়ার কোনো চান্সই ছিল না তোমার। অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় তো হতেই পারেন না, কারণ তোমার ড্রিম গার্ল মাধবী মুখোপাধ্যায় ছিলেনই না। মেরিলিন মনরো আজীবনের স্বপ্নসুন্দরী। ক্লাসিক থেকে আধুনিক সব ডাকসাইটে সুন্দরী নায়িকারাও তাঁকে রিপ্লেস করতে পারেননি। এখন অবশ্য দেখছি সানি লিওনি যুক্ত হয়েছেন। মেরিলিন মেরিলিন বললে তবু বুঝতাম, কিন্তু যেভাবে তুমি টান্টু খেয়ে 'মাধবী, মাধবী' বলে কান্নাকাটি জুড়েছিলে তাতে মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি তোমার জন্ম জন্মান্তরের প্রেমিকা!"

"অ্যাঁ।" পবিত্র হাঁ। সে ভয়াবহ কনফিউজ হয়ে বলে, "আমি তাই করেছিলাম? কিন্তু মাধবীটা কে। বউয়ের দিব্যি, আমি কোনো মাধবী, মালতীকে চিনি না! ঐ নামের কোনো মেয়েবন্ধু ছিল বলেও তো মনে পড়ছে না।"

"ছিল না।" সে হেসে ফেলেছে, "সে রহস্য তখন ভেদ হয়নি। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম।"

"কী বুঝেছিলে? মাধবী কে?"

"তিনি সমরেশ মজুমদারের বিখ্যাত উপন্যাস 'কালবেলা'র নায়িকা মাধবীলতা।" অধিরাজ হাসছে, "ঐ ঘটনার ঠিক আগেই তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কালবেলা পড়ছিলে। আর মাধবীলতার অসামান্য ক্যারেক্টারের ওপর অবসেসড হয়ে গিয়েছিলে। সেদিন রাতে তুমি যে কাণ্ডটি করেছিলে সেটা অন্য কিছু নয়, একটি কাল্পনিক চরিত্রের ওপর ইনফ্যাচুয়েশন। আর এই ইনফ্যাচুয়েশন জিনিসটি একেবারেই দীর্ঘস্থায়ী নয়। নিজেকে দিয়েই দেখো। যে মাধবীলতার জন্য মজনুর মতো কেঁদে ভাসিয়েছিলে, তাকে পরেরদিনই আর মনে করতে পারোনি। মিস্ বোসের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ওটা ইনফ্যাচুয়েশন। কালই কেটে যাবে। পাগলকে শুধু সাঁকো নাড়ানোর কথা মনে করিয়ে দিও না। আদারওয়াইজ, শি ইজ আ ভেরি গুড অফিসার। এইটুকুই আমার সঙ্গে ওঁর বিজনেস।"

পবিত্র-র মুখে দুশ্চিন্তা। অধিরাজ ব্যাপারটাকে যত সহজভাবে নিচ্ছে ব্যাপারটা আদৌ অত সহজ নয়। মিস্ বোস তাকে চেপে ধরলেও ওর আকুলতাকে বুঝতে কষ্ট হয়নি পবিত্র-র। কৌশানী যখন অধিরাজকে দেখেওনি, তখন থেকেই তার জন্য পাগল হয়ে বসেছিল। এখন তার ব্যক্তিত্বকে ডিঙিয়ে যেতে পারছে না বলে কিছু প্রকাশ করছে না। কিন্তু একটু আগেই সে যেভাবে বেসামাল জগন্নাথের রথের মতো ঘাড়ে এসে পড়েছিল তাতেই হাড় হিম হয়ে গিয়েছে পবিত্র-র। আস্ত মঞ্জুলিকার ভূত এসে পড়লেও বোধহয় এত ভয় পেত না। বিষয়টা বোধহয় এতটাও হালকা নয়।

সে ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য অবশ্য ফের লঘু চালে বলল, "বাট ইউ রাজা। ইউ আর মির্জাফর। ট্রেইটর। বিশ্বাসঘাতক। যখন অলমোস্ট আমি গঙ্গায় ডুবছিলাম, হেল্প হেল্প করে চেঁচাচ্ছিলাম, তুমি তখন স্রেফ সুড়ুৎ করে কেটে পড়লে! এ কী জাতীয় বন্ধুত্ব। ফিলিং সো মাচ দুক্কু!"

"সরি বাডি।" অধিরাজ বলল, "কিন্তু আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স কতগুলো মানুষের প্রাণ

ছিল। তোমাকে বাঁচাতে গেলে তাঁদের বাঁচানো যেত না। আমি নিজের ডিউটিটাই করছিলাম।" তার মুখে ফের চিন্তার রেখা, "বাই দ্য ওয়ে, তুমি যে ওখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলে, ঐ গোটা সময়ে কাউকে আসতে যেতে দেখেছ?"

"বিলিভ ইট অর নট, একটা কুকুর, বিড়ালও বাড়ির ত্রিসীমানায় আসেনি, মানুষ তো দূর।" পবিত্র বলে, "ইনফ্যাক্ট আমি ওখানে ফেরার পর থেকেই সমানতালে মনিটরিং করে গেছি। মিস্ বোসও ছিলেন। উনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, কোনো বাইরের লোক ও বাড়িতে ঢোকেনি। আমি নিজেও ক্যামেরার মাধ্যমে দেখছিলাম। ঘরে পরিবারের লোকজন ছাড়া আর কেউ ছিলেনই না। মিঃ অ্যান্ড মিসেস চৌধুরী, পরিমল আর মেঘনা। ওঁদের সঙ্গে কৌশানী বোস। এই পাঁচজনই ছিলেন। যেহেতু তোমার মক্কেল স্পাইডারম্যানের আত্মীয় তাই ছাতের দিকেও নজর রেখেছিলাম। মিস্ বোস নিজেও তন্নতন্ন করে ছাতটা দেখে এসেছিলেন। সেখানেও কেউ ছিল না। তারপর তো আমি একদম বাড়ির চতুর্দিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কারোর আসা-যাওয়ার গল্পই নেই।"

"কেউ আসেনি, কেউ যায়নি। বার্নিং শিখ সিন থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল। বেডরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। জানলাও সব বন্ধ। কয়েকঘণ্টা আগেই আমরা দুটো ঘরই ভালো করে খুঁজেছি। কোথাও সন্দেহজনক কিছু পাইনি। সব নর্মাল। কোনো হিডন চেম্বার নেই, কোনো এক্সট্রা পাইপ নেই, এসিতেও গোলমাল নেই। একদম বদ্ধ ঘর।" অধিরাজের কপালে ভাঁজ, "স্ট্রেঞ্জ। তবে ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাস এল কোথা থেকে! এই ক্লোজড ডোর মিস্ট্রির তো কোনো হদিশই পাচ্ছি না। কীভাবে? কোন্ পথে? কী মিস্ করছি আমরা। কোথায় ভুল হচ্ছে?"

অধিরাজ ফের চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। পবিত্রও তাকে বিরক্ত করল না। সে আপাতত কৌশানী বোসকে নিয়ে চিন্তিত। মেয়েটা বড়ো ডেসপারেট। কিছু মানুষ জগতে আছে যারা ধৈর্য ধরে ভালোবাসার মানুষকে জয় করে নিতে পারে। আহেলি তাদের মধ্যে পড়ে। কেউ আবার বিনা উচ্চারণে, নিঃশব্দে শুধু একতরফা ভালোবেসে যায়, প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না, ঘৃণারও নয়। প্রিয়া বাজাজ তাদের মধ্যে অন্যতম। কেউ কাঙ্খিত মানুষকে দেখলে এত নার্ভাস হয়ে যায় যে কোনো কিছু প্রকাশই করতে পারে না। আইভি তেমনই। কিন্তু কৌশানী তা নয়। সে যেন নিজের ইপ্সিত মানুষকে যেন তেন প্রকারেণ ছিনিয়ে নিতেই এসেছে। আহেলি যদি দখিনা বাতাস হয় তবে কৌশানী কালবৈশাখী। অন্তত যেটুকু অভিজ্ঞতা তার নিজের হয়েছে, তার মাধ্যমেই সে বুঝতে পেরেছে। এ-ও বুঝতে পেরেছে যে এ কথা কাউকে বলা চলবে না। অধিরাজ ব্যাপারটাকে ইনফ্যাচুয়েশন হিসাবে নিয়েছে, তার জন্য ওটাই মঙ্গল। কিন্তু প্রিয়াকে ছেড়ে দিলে, তিন ফুল-এক মালির কম্বিনেশনটা বড়োই বিপজ্জনক পথে যাচ্ছে। সে মনে মনে ঠিক করল, ডঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করবে। বয়েসে একটু বড়ো এবং অভিজ্ঞ হওয়ার দরুণ পবিত্র অশনি সঙ্কেত টের পাচ্ছে যা অন্য কেউ বুঝবে না। একমাত্র ডঃ অসীম চ্যাটার্জিই বুঝতে পারেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। সময় একটু একটু করে এগোচ্ছে। অধিরাজ হসপিটালের বেঞ্চে এলিয়ে পড়ে কী যেন ভাবছে। পি সি চৌধুরী ওদের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখেই বসেছেন। তিনি ক্রমাগতই কাঁদছেন। পরিবারের এমন অবস্থা হলে কান্না আসাই স্বাভাবিক। তবু তো ওঁরা এখনও বেঁচে আছেন। বাকিটা ডাক্তার ও ঈশ্বরের হাতে।

একটু পরেই ঘড়ির কাঁটা রাত তিনটের সময় নির্দেশ করল। যত সময় যাচ্ছে, ততই যেন চিন্তা আরও বাড়ছে। বার্নিং শিখের দেওয়া বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে চেষ্টা করেও সে এখনও পর্যন্ত নিজের প্রতিশোধ নিয়ে উঠতে পারেনি। অধিরাজ ও তার টিম তার প্রত্যেকটি চাল সফলভাবে ব্যর্থ করেছে। হাতে আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা! সে কি আর আদৌ চুপ করে বসে থাকবে! তার নিজের ইগোও নির্ঘাৎ ধাক্কা খেয়েছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় একটিও লাশ পড়েনি। বলা ভালো, সি.আই.ডি. হোমিসাইড পড়তে দেয়নি। উলটে নিজেই বেশ কয়েকবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচেছে। এর শোধ সে নির্ঘাত

তুলবে। সামনে এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক শেষ চব্বিশ ঘণ্টা!

আরও মিনিট পনেরো পরে অবশেষে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। ইনি সিনিয়র মানুষ। জুনিয়রদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে দিতেই করিডরে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। শান্ত দৃষ্টিতে চতুর্দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "পেশেন্টদের বাড়ির লোকেরা কোথায়?"

পি সি চৌধুরী প্রায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ওঁর দিকে ছুটে যান। পেছন পেছন অধিরাজ এবং পবিত্রও। চৌধুরীসাহেব ভেজা গলায় জানতে চাইলেন, "কেমন আছে ওরা ডক্টর?"

ডাক্তারবাবুর গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটল, "চিন্তার কোনো কারণ নেই। ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাস কিছুটা ইনহেল করলেও ফ্যাটাল হওয়ার মতো গ্যাসদুটো ওদের লাংসে যাওয়ার সুযোগ পায়নি। তার আগেই ওদের বের করে নেওয়া হয়েছিল বলে একচুলের জন্য বেঁচে গিয়েছেন। আর ওদের ওপর গ্যালন গ্যালন জল কে ঢেলেছিলেন?"

অধিরাজ একটু অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকোচ্ছে, "আজ্ঞে, আমি।"

"খুব ভালো করেছেন।" ডাক্তারবাবুর চোখে প্রশংসা, "আপনি জল ঢেলে ওঁদের স্কিন থেকে, কিছুটা নাক মুখ থেকেও গ্যাসের লেয়ারটা সরিয়ে দিয়েছেন। যার জন্য কোনোরকম বার্ন হয়নি। ফসজিন বা মাস্টার্ড গ্যাস এক্সপোজার ক্ষতিকর হলেও তার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সেই ডিউরেশনটা ঐ গ্যাস দুটোর কোনোটাই পায়নি বলে খুব বেশি ক্ষতিও হয়নি। শুধু গলায় আর নাকে সামান্য কিছু ইরিটেশন আছে, সেগুলো ঠিক হয়ে যাবে। আর মিসেস সোমলতা চৌধুরীর বয়েসটা একটু বেশি বলে ওঁর লাংসে সামান্য ফ্লুইড জমেছিল। কিন্তু সেটাও কিওরেবল। ইন শর্ট, তিনজনেই ঠিক আছেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা অবজার্ভেশনে রেখে আর ছোটোখাটো কিছু ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পর সবাইকেই ডিসচার্জ করে দেওয়া হবে।" বলতে বলতেই তিনি সকৌতূহলে অধিরাজের দিকে তাকালেন, "আপনাকে ভীষণ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। বাই এনি চান্স আপনি মিঃ আই জি...!"

"আজ্ঞে!" অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "ঠিকই ধরেছেন। আমিই।"

ডাক্তারবাবু এতক্ষণে একগাল হাসলেন, "আরে, আমার কন্যারত্নটি আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত। সে জেদ ধরে বসে আছে আই.পি.এস.-ই হবে, এবং আপনার সঙ্গেই কাজ করবে। তাকে যতই বোঝাই, ডাক্তারের মেয়ে ডাক্তার হওয়াই উচিত, নয়তো সোসাইটিতে মুখ দেখানো যাবে না, সে আমার পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করে! ইন ফ্যাক্ট আপনি এখন থেকেই তারও স্যার! একটা সেলফি দেবেন?"

সে ম্লান হাসল, "শিওর। তবে তার আগে পেশেন্টদের কন্ডিশন আরও একটু জেনে নিই। কোনোভাবে ওঁদের ডিটোরিয়েট করার চান্স নেই তো? আমরা কি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারি?"

"একদম নিশ্চিন্ত থাকুন। তেমন কিছুই ঘটেনি।" তিনি মাথা নাড়লেন, "তবে হ্যাঁ, অনেক কিছুই হতে পারত যা অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। আপনারা দ্রুত ওঁদের রেসকিউ করেছেন বলে একেবারেই অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। কিন্তু ওঁরা যদি আরও মিনিট পাঁচ বা দশ গ্যাসগুলোর কন্ট্যাক্টে থাকতেন, তবে লাইফ থ্রেট ছিল। ত্রিশ কি চল্লিশ মিনিট থাকলে তো বাঁচানোই যেত না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ওসব কিছুই হয়নি। ওঁরা দ্রুত ঠিক হয়ে যাবেন। ডিটোরিয়েট করার কোনো চান্স নেই।"

"আর আমাদের এক লেডি অফিসার...?"

"ধুর!" ভদ্রলোক ফের হাসলেন, "ওঁর তো কিছুই হয়নি। স্রেফ নেশা করার ফল। তা-ও বোধহয় জীবনে এই প্রথমবার এই জাতীয় কিছু ফুঁকেছেন, সেইজন্যই একেবারে কাটা সৈনিক হয়ে গিয়েছেন। যে কোয়ান্টিটি ওঁর ব্লাডে আছে, তা নিতান্তই কম। যারা গাঁজা ফুঁকে অভ্যস্ত তারা এত কম কোয়ান্টিটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে। ওঁর অভ্যাস নেই বলেই ফেইন্ট হয়েছেন। হসপিটালে আনার দরকারই ছিল না। আপনারা যদি একটু লেবুজল, বা অ্যাসিডিক কিছু, নিদেনপক্ষে সর্ষের তেলও নাকে আর কানে ঢেলে দিতেন বা গিলিয়ে দিতেন তবে

এতক্ষণে সেন্সও কিছুটা ফিরত। নেশার ঘোরটা কেটে গেলেই চাঙ্গা হয়ে যাবেন। তখন ছেড়ে দেব।”

পি সি চৌধুরী ডাক্তারের হাতদুটো আঁকড়ে ধরে বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ... থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর...!”

ডাক্তারবাবু ইশারায় পবিত্র ও অধিরাজকে দেখালেন, “থ্যাঙ্ক দেম! ঐ মানুষগুলো যদি আর পাঁচ মিনিটও দেরি করতেন তবে অন্তত আপনার মিসেসের প্রাণ যাওয়ার হাই প্রব্যাবিলিটি ছিল। ওঁর লাংসে ফ্লুইড জমা সবে শুরু হয়েছিল। সেটা আরও কিছুক্ষণ থাকলে ডেডলি হত। তা হয়নি সেটা ওঁদের কৃতিত্ব।”

অধিরাজ এবার নীচুস্বরে পবিত্রকে বলে, “কিছুটা কৃতিত্ব কিন্তু মিস্ বোসেরও আছে খুড়ো।”

“মিস্ বোসের কৃতিত্ব।” পবিত্র উদ্ভট মুখভঙ্গী করেছে, “কীভাবে তিনি হেল্প করলেন? গাঁজা খেয়ে?”

“শুনতে অদ্ভুত লাগলেও ঠিক তাই।” সে মুচকি হাসে, “তিনি যদি গাঁজা খেয়ে স্রেফ হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতেন, তবে ক্যামেরা স্টিল থাকত। তুমি ফুটেজ দেখে ভাবতে উনি চুপচাপ বসে আছেন। তার মানে কোনো সমস্যা নেই। তুমি বাইরে দাড়িঁয়ে বার্নিং শিখের অপেক্ষা করতে, ওদিকে ততক্ষণে ভেতরে ফসজিন আর মস্টার্ড গ্যাসের আবির্ভাব হয়ে যেত। জানলা দরজা সব বন্ধ, হালকা কাশির জাওয়াজও শুনতে পেতে না। ওদিকে যা হওয়ার হয়ে যেত। কিন্তু বাদ সাধলেন মিস্ বেস। তিনি অতৃপ্ত আত্মার মতো লাট খাচ্ছিলেন বলেই ক্যামেরার নাচানাচি দেখে তোমার সন্দেহ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই এন্ট্রি নিলে এবং ওঁর ঐ অ্যানাকোণ্ডা মার্কা পীচে পড়ে খাবি খেতে খেতে আমায় ফোন করলে। আমার হয়তো আরও কয়েকমিনিট সময় লাগত। তোমার ঐ হাঁসফাঁস অবস্থা দেখে কয়েক মিনিটের পথ কয়েক সেকেন্ডে অতিক্রম করে হাঁউমাউ করতে করতে পৌঁছলাম। মিস্ বোসের অবস্থা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল, অ্যাটাক হয়েছে। ভেবে দেখো, এতগুলো কাণ্ড যদি না ঘটত, সময় থাকতে থাকতেই যদি না ওঁদের বের করে নেওয়া যেত, তবে কপালে অবধারিত মৃত্যু নাচছিল।” অধিরাজের মুখে দুষ্টু হাসি, “আর এই সব কিছুর কেন্দ্রেই কিন্তু মিস্ বোস আর ওঁর গঞ্জিকামিশ্রিত মার্লবোরো। তাই কিছুটা ক্রেডিট উনি পেতেই পারেন।”

“হুঃ।” পবিত্র বিষণ্ণ স্বরে বলে, “ইনসাল্টের শেষ নেই। একেই আমার ভার্জিনিটি সঙ্কটে ছিল। তার ওপর ম্যাডাম বলেন কিনা আমার নাকি ঝাঁটার মতো গোঁফ! হাউ ডেয়ার ইজ শি। আরে মুছে হো তো মেরা জ্যায়সা, মুছ নেহি তো কুছ নেহি! সেই সাধের গোঁফ কিনা ঝাঁটা? এরজন্য এক্সট্রা আর এক ডোজ খিস্তি ওঁর কপালে নাচছে, ফর ইনসাল্টিং মাই গোঁফ।”

“বেশ। দিও। আমি বারণ করব না। কিন্তু ওঁর অবদানটাও ফেলে দেওয়া যায় না, এটাও মাথায় রেখো।” বলতে বলতেই তার ভুরু কৌতুকে একটু উঠে গেল, “বাই দ্য ওয়ে, তুমি ভার্জিন কবে হলে?”

উত্তরে পবিত্র আরও কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই পি সি চৌধুরী আর্দ্র চোখে, নত মস্তকে ওদের সামনে এসে হাজির হয়েছেন। তিনি হাতজোড় করে বললেন, “আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আপনারা আমার পরিবারকে বাঁচিয়েছেন। সারাজীবনেও আমি এই ঋণশোধ করতে পারব না...।”

“এতে কৃতজ্ঞতার কিছু নেই। আমরা স্রেফ নিজেদের ডিউটি করছি। এটাই আমাদের প্যাশন ও প্রোফেশন।” অধিরাজ একটু সহৃদয়ভাবে বলে, “কিন্তু মিঃ চৌধুরী, আপনার ঘরে যে বিষ বসে আছে, তাকে তো আমরা তাড়াতে পারব না। ওটা আপনাকেই করতে হবে।”

পি সি চৌধুরী একটু বিস্মিত। কথাটার মর্মার্থ তাঁর মাথায় ঢোকেনি। তিনি অবাক হয়ে বললেন, “বিষ?”

“পরিমল কি জানে যে সে আসলে একজন শিখের সন্তান? এবং তার পালক-পিতা সেই বায়োলজিক্যাল বাবা-মায়ের খুনি?”

কথাটা শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল তাঁর। কোনোমতে বললেন, "পরিমল এসব জানে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" অধিরাজ তাঁকে বুঝিয়ে বলে, "আমার ধারণা সে সম্প্রতিই জেনেছে। এবং জানার পর প্রচণ্ড শকড়ও হয়েছে। কিন্তু কাউকে বুঝতে দেয়নি। একমাত্র সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে প্রয়োজনে যে কোনো লকস্মিথকে ল্যাচ বাইপাসিং টুল অনায়াসেই প্রোভাইড করতে পারে। সে নিজমুখে স্বীকারও করেছে সবার সামনে তালাচাবির ব্যাপারে পরিমল মাস্টার লোক কারণ ওটাই ওর ব্যবসার একটা পার্ট। আমার মনে হয়, গুল্লু নামক চাবিওয়ালাটিকে ল্যাচ বাইপাসিং টুলটি সে শুধু গিফটই করেনি, ওটার সদ্ব্যবহার করতেও শিখিয়েছে। গুল্লুর আসল পরিচয় পরিমল জানে, নয়তো কোনো ব্যাবসায়ী এত উদার নয় যে সামান্য চাবিওয়ালাকে দামি কিট উপহার দেবে। গুলশন সিংই সেই ব্যক্তি যে ওকে ওর আসল ইতিহাস জানিয়েছে ও ব্রেইনওয়াশ করেছে। এই গুল্লু বা বার্নিং শিখ ম্যানিপুলেশনে পি.এইচ.ডি. করেছে। পরিমলও ওর হিপনোটিজমের জালে পড়ে ওকে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছে। তবে সে এটা ভাবেনি যে গুল্লু ওর তীর ওর ওপরেই চালাবে। ওর ধারণা ছিল, বার্নিং শিখ আপনাকে মারবে, আর এটা ও নিজেও চাইছিল।"

"কিন্তু আপনি সব বুঝলেন কী করে?"

"যে মুহূর্তে আমি 'বোলে সো নিহাল' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, তখন আমার দুটোই এজেন্ডা ছিল। প্রথমত, উত্তরটা কে দেয় সেটা দেখা। দ্বিতীয়ত আপনার সুপুত্রের এক্সপ্রেশন লক্ষ্য করা। পরিমল ঐ ওয়ারক্রাইয়ের উত্তর দেয়নি ঠিকই, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে ওর চোখে দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। ঐ আগুনে দৃষ্টি আমার চোখ এড়ায়নি। সেই মুহূর্তে ও আপনার দিকেই দেখছিল। ফ্রম দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আমি জানি যে পরিমলও নিজের আসল পরিচয় জানে ও বার্নিং শিখকে ও সাহায্য ও করেছে।"

পি সি চৌধুরী আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না। তিনি ধপ করে বসে পড়েছেন। কয়েক মিনিট কোনো কথাই বলতে পারলেন না ভদ্রলোক। শেষে অতিকষ্টে বললেন, "সব আমার পাপ! আমারই দোষ। যৌবনের ভুল আদর্শে যে কাজ করেছি তার মাশুল তো দিতেই হত...!"

অধিরাজ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে মিঃ চৌধুরীকে দিয়ে কথা বলাতেই চায়। তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়বিড় করে বললেন, "আমি সজ্জনকুমারের চোখে পড়তে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, নিজের হাতে কোনো শিখকে মারিনি। অত সাহসও ছিল না। তবে সজ্জনকুমারের বক্তৃতায় আমারও তখন মনে হয়েছিল যে বেয়ন্ত সিং এর মতো বেইমানের জাতদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই! গরম রক্ত অনেক ভুলভ্রান্তি করে। সজ্জনকুমার সেই আগুনে ঘি ঢেলেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীকে আমরা দেবী ভাবতাম। তাই আবেশে এসে রীতিমতো ঘোষণা করে দিয়েছিলাম যে পাগড়িসুদ্ধ প্রতিটা মাথার জন্য টাকা দেব। তখনও বুঝিনি কী সর্বনাশ হতে চলেছে। তখনও বুঝতে পারিনি, গোটা দিল্লির রাস্তা চাপা পড়ে যাবে রক্তাক্ত পাগড়ির স্তূপে! কী ভয়াবহ ভুল করেছিলাম আমি.... বিরাট পাপ করেছিলাম।...'

"পরিমলকে কোথায় পেলেন?"

তাঁর চোখ বেয়ে জল পড়ল। মুখ তুলে বললেন, "একটা অনাথ আশ্রমে। নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছিলাম হাতে নাতেই। পরের বছরই সোমলতার মিস্ ক্যারেজ হয়। ডাক্তার বলেছিলেন, ও আর কখনও মা হতে পারবে না। সোমলতা প্রায় পাগলই হতে বসেছিল। অবস্থা দেখে ঠিক করলাম বাচ্চা অ্যাডপ্ট করব। দিল্লির একটি নামকরা অনাথ আশ্রমে প্রায় দেড়-বছরের একটা ছোট্ট মিষ্টি শিশুকে ভারি পছন্দ হল। কিন্তু তার ইতিহাস জানতে গিয়ে জানলাম, চুরাশির দাঙ্গায় বাচ্চাটার গোটা পরিবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তিন তারিখ দুপুরে যখন আর্মি নামল, তখন সেই পোড়া, কাটা লাশের ভিড় থেকে একটা সদ্যোজাত শিশুকে উদ্ধার করেছিল ওরা। সে-ই পরিমল। হ্যাঁ, ও শিখেরই সন্তান। আমি ভাবলাম, ঈশ্বর হয়তো আমায় প্রায়শ্চিত্তের একটা সুযোগ দিতে চান।" বলতে বলতেই অনুতাপে, দুঃখে কেঁদে

ফেলেন তিনি, “কিন্তু বুঝিনি, এটা পে-ব্যাক ছিল। যে বাচ্চাটাকে আমি পরিবার, স্নেহ-ভালোবাসা, নাম, পরিচয় দিলাম, বুকের পাঁজরের মতো আগলে রেখে বড়ো করলাম, সারাজীবন সামান্য আঁচও ওর গায়ে লাগতে দিইনি, সবসময়ই ভয়ে ভয়ে থাকতাম কেউ যদি আসল পরিচয় ফাঁস করে দেয়, সেইজন্যই দিল্লি থেকে সপরিবারে এখানে চলে আসা, নিজের জীবনের সব সুখ-আয়েশ আরাম বিসর্জন দেওয়া, আজ সেই সন্তান আমায় খুনি ভেবে ঘেন্না করছে। আজ সেই প্রাণের থেকেও প্রিয় মানুষ আমার রক্তদর্শন করতে চায়! এর থেকে বড়ো শাস্তি কি আর আছে? এর চেয়ে তো মৃত্যুও ভালো ছিল।”

তিনি অসম্ভব কান্নায় ভেঙে পড়েন। অধিরাজ চুপ করে থাকে। এখানে তার বলার কিছুই নেই। সে জানে, এই দুঃখের কোনো স্বান্ত্বনা হয় না। পি সি চৌধুরীকে আজীবন এই যন্ত্রণা কুড়ে কুড়ে খেয়ে যাবে। পরিমলের চোখে নিজের ‘খুনি' রূপ দেখতে-দেখতেই শেষ হবেন তিনি। পিতা-পুত্রের মাঝখানের এই ভাঙন আর কোনোদিন জুড়বে না। জোড়েও না। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেখান থেকে নীরবে সরে যায়। তার ডিউটি সে করেছে, মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু আর করণীয় কিছু নেই। আসল বিচার করার ক্ষমতা তার নেই। ঈশ্বরের লাঠির কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু যখন পড়ে...!

“রাজা?”

সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। পবিত্রর ডাকে সচকিত হয়ে বলল, "উ?”

“তোমার মনে হয় হসপিটালে ওঁরা সবাই সুরক্ষিত?” পবিত্র আচার্য আস্তে আস্তে বলে, “বার্নিং শিখ যখন জানতে পারবে যে ওর প্ল্যান ফ্লপ করেছে, তখন কি সে আবার অ্যাটাক করবে না? তার যা মেক-আপ স্কিল তাতে সে ডাক্তার, নার্স বা ওয়ার্ডবয়ের ছদ্মবেশেই হয়তো হসপিটালের ভেতর এন্ট্রি নেবে এবং লোকগুলোকে খুন করবে। ওঁদের প্রোটেকশনের ব্যবস্থা কি করা উচিত নয়?”

অধিরাজ মাথা নাড়ল, “না পবিত্র। ওঁদের প্রোটেকশন দিয়েও কিছু করা যাবে না। কারণ পুলিশ প্রহরী এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারে, কিন্তু তারা গোটা হসপিটালের সব নার্স, ডাক্তার বা ওয়ার্ডবয়কে চেনে না। ওরা বহিরাগতদের আটকাতে পারে, ওষুধ দিতে আসা কর্মচারী বা ডাক্তারকে আটকাবে না। আর বার্নিং শিখ ঐ রাস্তাটাই যে নেবে তা তুমিও জানো, আমিও জানি।”

“তবে?”

অধিরাজ একটু আত্মমগ্নভাবেই বলল, “নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে/ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।”

“মানে?”

“যারা খুন হবেন তাদের প্রোটেকশন না দিয়ে খোদ খুনিকেই প্রোটেকশন দাও।” সে রহস্যমাখা হাসি হাসল, “একটাও খুন আর হবে না!”

“মানে?”

পবিত্র আর কিছু বলার আগেই অধিরাজের ফোন বেজে ওঠে। স্ক্রিনে গুল্লুর নাম ভেসে উঠেছে। সে সেই অজ্ঞাত রাতচরা সর্দারজির দেখা পেয়ে গিয়েছে। অধিরাজ মৃদুস্বরে বলল, “মানেটা তো এবার গুল্লু বলবে।”

****

(২১)

শেষ রাতের ঝাপসা অন্ধকারের রহস্যময়তাই আলাদা। সূর্যোদয় হতে আর বেশি সময় বাকি নেই। তাই আঁধারের কালিমাও খানিকটা আবছা হয়ে এসেছে। নক্ষত্ররা টিম টিম করে জ্বললেও তাদের রশ্মি এখন ক্লান্ত। চাঁদও অস্তাচলের পথে ঢলে পড়ছে। জ্যোৎস্নার উচ্ছ্বাস চলে গিয়ে এখন মনমরা একটা ম্লান আলো ছেয়ে আছে। মাঝেমধ্যে হিমেল বাতাস চুপিচুপি এসে স্পর্শ করে যায় গাছেদের শরীর। গাছগুলো একমুহূর্তের জন্য বুঝি শিউরে ওঠে। পরক্ষণেই আবার সব শান্ত। যেন হাওয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

এই পরিবেশে একটা পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে বেশ কিছুটা দূরে, একটা বড়োসড়ো গাছের পেছনে কভার নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা তিনজন। অধিরাজ, পবিত্র ও গুল্লু। অধিরাজ গুল্লুকে ফিশফিশ করে জিজ্ঞাসা করে, "ঠিক দেখেছিস? ও পাবলিক এখানেই এসে ঢুকেছে তো? বাড়িটা দেখে তো মনে হয় না কেউ এখানে থাকে!"

গুল্লুও চাপাস্বরে জানায়, "কেউ থাকে না সাব। আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে নিয়েছি আমার ছেলেপুলেদের কাছ থেকে। থাকা সম্ভবও নয়। এটা 'কালী বুড়ির বাড়ি নামে কুখ্যাত। রাত তো ছাড়ুন, দিনের বেলায়ও এর ধারে কাছে কেউ আসে না।"

"কালী বুড়ি আবার কে!"

"সবাই বলে সে নাকি ভৈরবী ছিল, অনেকে অবশ্য ডাইনিও বলে। লোকজনের মধ্যে থাকা তার পছন্দ ছিল না। তাই এখানে বাড়ি বানিয়েছিল। এই লোকেশনের দুটো ফায়দা। একদিকে গেলে শ্মশান পাবেন। অন্যদিকে গেলে কবরখানা। এই বাড়িটা তার মাঝখানেই। এতে নাকি কালী বুড়ির সাধনায় খুব সুবিধা হত।" গুল্লু নীচুস্বরে জানায়, "বুড়িকে সবাই খুব ভয় পেত বলে সে জিন্দা থাকতেই ধারে কাছে কেউ আসত না। কী করত, কী খেত কেউ জানত না। একদিন এ রাস্তা দিয়ে কিছু লোক যাচ্ছিল, তারা বেজায় 'বদবু' পেল। ঢুকে দেখল বুড়ি মরে পড়ে আছে। কতদিনের বাসি মড়া ভগবান জানে! তার সামনে একটা আস্ত কঙ্কালও পড়েছিল। ওটা কার কঙ্কাল তা জানা যায়নি। ব্যস্, এটুকুই। ভূত-প্রেত কেউ দেখেনি ঠিকই, বুড়ি কোনোদিন কারোর ক্ষতিও করেনি। কিন্তু তবু লোক ভয় পায়। ভাবে কালী বুড়ি বুঝি ভূত হয়ে এই 'খণ্ডহর' পাহারা দিচ্ছে!"

অধিরাজ সখেদে মাথা নাড়ল, "লোক এইজন্য ভয় পায়, কারণ ভয় পেতে তারা ভালোবাসে। কালী বুড়ির খেয়ে কাজ নেই এই আধভাঙা, ছাত খসে পড়া বাড়ি পাহারা দিতে আসবে। সে এখন আত্মা। দরকার পড়লে মুকেশ আম্বানির বাড়িতে ঢুকেও মহা আরামে বসে থাকতে পারে, নীতা আম্বানির চল্লিশ কোটির শাড়ি পরে সাজতেও পারে। কেউ বাধা দেবে না। খামোখা ভাঙা বাড়ি আগলে রেখে লাভ কী! ভূতেরও মিনিমাম প্রেস্টিজ আছে। কথায় কথায় দরোয়ানের ডিউটি তারা করে না। এই বাড়ি ভূতের নয়, ক্রিমিনালদের জন্য আদর্শ জায়গা।"

পবিত্র আরও চাপা স্বরে বলে, "কিন্তু লোকেশনটা কী চমৎকার ভেবে দেখো রাজা। একদিকে শ্মশান, অন্যদিকে কবরখানা! ভাবতেই গুজ বাম্প হচ্ছে। তার ওপর কী রূপ! আহা! হ্যারি পটার থেকে একটা দুটো ডিমেন্টর, মানে তমপিশাচকে এনে ছেড়ে দিলে জমে যেত কিন্তু।"

পবিত্র কথাটা শেষ করার আগেই কোথা থেকে একটা কাকের কর্কশ স্বর শোনা গেল। এমনভাবে ডেকে উঠল যে ক্ষণকালের জন্য ওরা তিনজনেই চমকে উঠেছিল। আচমকা ডেকে উঠেই পাখিটা মাথার ওপর দিয়ে ঝটপট করে উড়ে গেল। অধিরাজ বিড়বিড় করে, "নাও, তোমার তমপিশাচের বাঙালি ভার্সন চলে এসেছে। গুল্লু, পাবলিকটা এখনও এখানেই আছে তো? না বেরিয়ে গেছে?"

"না স্যার।" গুল্লু জানাল, "ও এখানে ঢোকামাত্রই আমি একদম চোখ কান খাড়া করে

বসেছিলাম। এখনও কোথাও যায়নি। এখানেই আছে।”

“ফাইন।” সে কয়েকটা নোট ধরিয়ে দিল তাকে, “এবার এখান থেকে মানে মানে পাতলা হয়ে যা। কী হল বা কী হবে দেখার জন্য ভুলেও দাঁড়াবি না।”

“জি সাব।” গুল্লু সেলাম ঠোকে, “আর কোনো কাজ থাকলে বলবেন।”

“আছে। একজনকে একটু স্টক করতে হবে। ফটো আর ডিটেইলস তোকে কাল পাঠাব। আপাতত ভাগ।”

গুলাব সিঞাঁ আর কথা না বাড়িয়ে দ্রুত স্থানত্যাগ করে। বিষণ্ণ আলোয় ছায়ামাখা ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অধিরাজ। তারপর আপনমনেই একটু ক্লান্তভাবে বলল, “চলো, ফের মোলাকাতের সময় হয়েছে। আবার কোস্তাকুস্তি করার জন্য তৈরি হও। যেভাবে আমরা সবাই, রাঞ্ঝা, মাহিওয়াল, মজনু কিংবা রোমিওর মতো খাওয়া, ঘুম লাটে তুলে গোঁয়ার ‘দিওয়ানা মস্তানার' মতো লোকটার পেছনে দৌড়চ্ছি, বউদির প্রতি যদি তুমি এর এক পার্সেন্ট এনার্জিও ডেডিকেট করতে তবে তোমার ছানা তোমায় ‘মামা' বলত না!”

“আমি ভাবছি, এখানে দাঁড়িয়ে ইন্ট্রো হিসাবে গোবিন্দার ডান্সের সঙ্গে গানও গেয়ে ফেলি। ম্যায় লায়লা লায়লা চিল্লাউঙ্গা, কুর্তা ফাড়কে। মাইরি বলছি, লায়লার জ্বালায় কুর্তা তো দূর, নিজেরাই ফেঁড়েফুঁড়ে অস্থির হচ্ছি, তবু তার দয়া হচ্ছে না!” পবিত্র মুখ লম্বা করেছে, “কিন্তু তুমি শিওর যে রাতের বেলায় যে সর্দারজি গুরুদ্বারায় এসে ক্ষমা চায়, তিনিই বার্নিং শিখ?”

“নো ডাউট তিনিই।” সে মাথা ঝাঁকায়, “টাইমিংটা দেখো। প্রত্যেকবার হয় খুনের আগে অথবা পরে তার আবির্ভাব হয়েছে। সে জানে, ওয়াহেগুরু এই পাপ ক্ষমা করবেন না। তাই গুরুদ্বারার মধ্যে ঢোকে না। ও নিজের কাজের জন্যই সে অধিকার হারিয়েছে। আমার ধারণা, যখন সে খুনগুলো করার প্রস্তুতি করে নেয়, অথবা খুন করে তারপরই ক্ষমা চাইতে আসে। তাছাড়া যে বাড়িতে এসে তিনি ঢুকেছেন, তোমার মনে হয় কোনো সাধারণ সর্দারজি এখানে ঘাঁটি গাড়বে? এখানে কোনো মানুষ থাকতেই পারে না!”

সত্যিই তাই। যে কোনো বাড়িতে মানুষ থাকার জন্য নিদেনপক্ষে চারটে দেওয়াল ও একটা আস্ত ছাদ লাগে। কিন্তু এ বাড়ির দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। শুধু তাই নয়, চারপাশের আগাছার জঙ্গল দেওয়াল ফাটিয়ে দিব্যি ঢুকে গিয়েছে ভেতরের দিকে। অর্থাৎ মেঝে নামক বস্তুটিও নেই। সেখানে শুধুই গুচ্ছ লতাপাতা ও আগাছার ভিড়! যতখানি দৃশ্যমান তার মধ্যেই বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ধ্বংসস্তূপের বাইরেই নয়, ভেতরেও গুল্ম-ঝোপঝাড়ের অভাব নেই। বেশ কিছু খোঁচা খোঁচা গাছের ডাল ভেতর থেকেই ভাঙা জানলার কোটর দিয়ে বাইরের দিকে শাখা-প্রশাখা বাড়িয়ে দিয়েছে সূর্যালোকের আশায়। তার ওপর ছাতও বিভিন্ন জায়গা থেকে খসে খসে পড়েছে। এই হতচ্ছাড়া বাড়িতে মানুষ তো দূর, প্রেস্টিজ জ্ঞানওয়ালা ভূতও থাকবে না। অথচ লোকটা ত্রিভুবনে আর জায়গা পেল না ঘাঁটি গাড়ার?

“এখানে একমাত্র তমপিশাচই থাকতে পারে রাজা।” পবিত্র আস্তে আস্তে বলল, “এগোব?”

“এগোও, তবে তমপিশাচকে মাথা থেকে নামিয়ে।” অধিরাজের হাতে সার্ভিস রিভলবার উঠে আসে, “নয়তো বার্নিং শিখকে দেখে যদি এক্সপেক্টো প্যাট্রোনাম বা পিত্রুদেব সংরক্ষণম বলেই লাফিয়ে ওঠো তাহলেই গেছি।”

পবিত্র জিভ কেটে মাথা নাড়ল। তারপর খুব সন্তর্পণে গুটিগুটি এগিয়ে গেল অধিরাজের পেছন পেছন। চাঁদের মরা আলোয় এই ধ্বংসস্তূপটাকে দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি হয়। মনে হয়, এই ভগ্নস্তূপ কোনোদিনই বোধহয় সূর্যালোক দেখেনি। দিনের বেলায়ও বুঝি কোনো এক অদৃশ্য মায়াজালে নিজেকে অন্ধকারেই জড়িয়ে রাখে। কোথাও শুভশক্তির লেশমাত্র নেই। ভীষণ নৈর্ব্যক্তিক অশুভ উদাসীনতার নীরবে বসে আছে। আর তার থেকেও বেশি

অশুভ সঙ্কেত দেয় আশেপাশে ওঁত পেতে বসে থাকা অন্ধকার। আশ্চর্য বিষয়, বাড়িটার মূল দরজা অবধি পৌঁছোনোর জন্য কোনো পথ, এমনকি মানুষের পেড়ে ফেলা পায়ে হাঁটা রাস্তাও নেই। চতুর্দিকে শুধু ঝোপঝাড়, গাছপালা আর আগাছার স্তূপ। থাকার মধ্যে আছে শুধু কিছু লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল। তার সঙ্গে কিছু অজানা লতা। এগোতে গেলেই পায়ে জড়িয়ে টড়িয়ে একসা হচ্ছে।

"মামা! সাবধানে।" পবিত্র তার সহজাত ভঙ্গিতে সতর্ক করে, "এখানে বাঘ কেন, বুনিপও লুকিয়ে থাকতে পারে।"

হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। গুটি গুটি পায়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে যেতেই আচমকা থমকে দাঁড়াল অধিরাজ! একদম পুতুলের মতো স্থির! এক বিন্দুও নড়াচড়া করছে না। নিঃশ্বাসও যেন নিতে ভুলে গিয়েছে সে। তার অবস্থা দেখে পবিত্রও থমকে যায়, "কী হল?"

খুব আস্তে আস্তে একটা আঙুল তুলে ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলল সে। সারা দেহ যেন পাথরের স্ট্যাচু। শুধু তর্জনী দিয়ে পায়ের দিকে ইঙ্গিত করে কিছু বোঝাতে চাইছে। তার তর্জনীর দিকনির্দেশ লক্ষ্য করে পায়ের দিকে তাকাতেই রক্তহিম হয়ে গেল পবিত্র-র। এখানে জোরালো আলোর কোনো উৎস নেই। চাঁদের হিমশীতল আবছা আলোতেই যা দেখা গেল, তা-ই ভয় পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। অধিরাজের ডান পায়ে একটা কিছু মোটা দড়ির মতো জিনিস খুব স্লথ অথচ মসৃণভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে। কালো নয়, বরং পিঙ্গল এবং সোনালি। চাঁদের আলো তার তৈলাক্ত পিচ্ছিল শরীরে পড়ে চিকচিকিয়ে ওঠে। ভারি রিরংসাময় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছে চরণপ্রান্ত। তবে এখনও সেই মসৃণ প্রাণীটির মধ্যে হিংস্র হয়ে ওঠার বিশেষ লক্ষণ নেই। সে যেন পরম আরামে এবং মহা আহ্লাদে উষ্ণ একটা আশ্রয় পেয়ে শান্তিতে ওম নিচ্ছে। তবুও কারুকার্যময় ফণাটি দৃষ্টি এড়ায় না। পবিত্র প্রায় লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত চাপা স্বরে বলল, "গোখরো!"

"আস্তে। লাফাবে না।" অসম্ভব চাপা স্বরে উত্তর দিল অধিরাজ, "যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই থাকো। কোনোরকম ভাইব্রেশন যেন টের না পায়!"

"গুলি মেরে উড়িয়ে দিলে হয় না।"

পবিত্র-র কথা শুনে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে, "গুলি কেন? তোপ মেরে আমাকে-ই উড়িয়ে দাও! ঝামেলাই শেষ।"

পবিত্রও কোনো কথা না বাড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করছে। গোখরো জাতসাপ। ওকে বিশ্বাস নেই। তবে আপাতদৃষ্টিতে সাপটার মধ্যে কিন্তু কোনোরকম আক্রমণাত্মক ভাব নেই। বরং বেশ কিছুক্ষণ সে তার বরফশীতল দেহটাকে অধিরাজের পায়ে গোল করে জড়াল। কুন্ডলী পাকাল। অধিরাজ একদম স্থির। তাকে দেখে মনেও হয় না যে সে শ্বাস নিচ্ছে। বরং বুকের ওঠানামা এতই ক্ষীণ যে সন্দেহ হয় বুঝি দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সাপটা মহা আরামে, নিশ্চিন্তে কিছুক্ষণ যেন উষ্ণতা শুষে নিল। তারপর আস্তে আস্তে সরসর করে আপনমনেই নেমে গেল তার পা বেয়ে। চেহারাটা অবশ্য দেখার মতো। রীতিমতো মোটাসোটা ও লম্বা। নাগরাজ বাসুকির আত্মীয় বটে! দেখলেই ভয় করে। কিন্তু আজ বোধহয় তার দংশন করার মুড একেবারেই নেই। সে একদম ধীরে সুস্থে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। অধিরাজ টের পেল একটা শীতল, মসৃণ কিছু তার পা থেকে আস্তে আস্তে নামল। লম্বা লম্বা ঘাস ক্ষণিকের জন্য নড়ে উঠল। একটা দীর্ঘ চকচকে সরীসৃপ তার মধ্য দিয়েই ধীরগতিতে অন্যদিকে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। তারপরই চতুর্দিক আবার ছবির মতো স্থির।

"উঃ!" এতক্ষণে পবিত্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, "গেছে মনে হয়। তুমি যেভাবে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে, আর ও যেরকমভাবে জড়িয়ে ধরেছিল তাতে আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমায় দেখে তো মনে হয় না বিশেষ ভয় পেয়েছ। ছোবল মেরে দিলে কী হত!"

"ও যাতে ছোবল মারে তার জন্য তোমার অন্তত চেষ্টার ত্রুটি কিছু ছিল না। আরও দুটো

লাফ মারলে সেটাই হত।” সে গরগর করে, “তবে ব্যাটা মানুষ নয়-সাপ! কথায় কথায় ছোবল মারে না। যতক্ষণ না বিপদ বুঝছে বা ভয় পাচ্ছে, ততক্ষণ ও কিচ্ছু করবে না। তাছাড়া এখন ওর ঘুমের সময়। আশেপাশেই কোনো গর্তে, ফোঁকরে—কোথাও হয়তো শীতঘুম দিচ্ছিল, বাই এনি চান্স চলে এসেছে। বা পায়ে জড়িয়ে গেছে। মানুষও ঘুমের মধ্যে মারপিট করে না, ও বেচারি তো সাপ। ঝিমোতে ঝিমোতে এসেছিল, আবার ঢুলতে ঢুলতেই চলে গেছে। কোনো থ্রেটের ইশারা পায়নি, তাই কিছু করেওনি। তবে হ্যাঁ, ওর লেজে যদি পা পড়ত বা তুমি আরও লম্ফঝম্প করে ওকে চেতিয়ে দিতে, তবে নির্ঘাত বিষদাঁত বের করত।”

“আরে, সাপ দেখে ভয় পাব না।” পবিত্র বলল, “তার ওপর গোখরো।”

“মাউন্টেনিয়ারিং বা পাহাড়ি অরণ্যে হাইকিং করে দেখো কখনও।” অধিরাজ পা টিপে টিপে ফের এগোয়, “হিমালয়ান পিট ভাইপার, হিমালয়ান কিলব্যাক আর কিং কোবরা তোমার জন্য সেখানে মালা নিয়ে বসে থাকবে। এসব পাহাড়ে যারা নিয়মিতো চড়ে তাদের কাছে জলভাত।”

“হুঃ। পাহাড়ে চড়ে কাজ নেই আমার। আজকে কলকাতাতেই যে গাঁজাখোর ব্ল্যাক মাম্বা জড়িয়ে ধরেছিল, তাতেই আমি ফর্সা হয়ে যাচ্ছিলাম।” সে ফিশফিশ করে, “তবে সাবধান। এখানে একটাই গোখরো থাকবে এমন কোনো কথা নেই।” “হুঁ।” অধিরাজের কপালে চিন্তার রেখা প্রকট, “সেটা আমি জানি। তুমিও যে জানো তাতেই কৃতার্থ হলাম।”

পবিত্র আর কথা না বাড়িয়ে অধিরাজের পেছন পেছন চলল। এখন সাধারণ লতাপাতাও তার পায়ে জড়িয়ে গেলে খণ্ডমুহূর্তের জন্য হলেও আঁতকে উঠছে সে। ওরকম পেল্লায় গোখরো আগে কখনও দেখেনি। তাই বুকের মধ্যে চাপা ভয়ও আছে। এখনও হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করছে। তার ওপর পায়ের তলায় ঘাস সরসর করে উঠছে। কখনও কখনও শুকনো পাতার মর্মরধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। এখানে টর্চ বা মোবাইলের আলো ব্যবহার করা যাবে না। আলো দেখে গৃহস্বামী পালিয়ে যেতে পারেন। নয়তো মোবাইলের টর্চটা জ্বালতে পারলে খুশিই হত পবিত্র। কে জানে, গোখরোটা হাই টাই তুলে বেডরুমে গিয়েছে, না এখানেই ল্যাজ নাচিয়ে ‘দেহি পদপল্লবমুদারম' স্টাইলে ফের পায়ে পড়ার তাল করছে।

“এত ঝোপঝাড়ের মধ্যে লোকে বাড়ি করে কেন!” সে ভয়াবহ অসন্তুষ্ট, “শুধু সাপ কেন, আস্ত ডাইনোসরও থাকলেও অবাক হব না।”

“যিনি শ্মশান সাধনায় এক্সপার্ট ছিলেন, তিনি আর্বানায় থাকবেন বলে তোমার মনে হয়।” বিরক্তিমাখা গলায় উত্তর এল, “নাও শা-ট আ-প!”

“শাট আপ’ শুনে সাময়িক চুপ করে গেল পবিত্র। আসলে সে বলতেও পারছে না যে তার রীতিমতো ভয় লাগছে। ভয়টা বার্নিং শিখকে নয়। তাকে হাতের কাছে পেলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিতে পারবে। ভূতকে নিয়েও কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সাপ নামক বস্তুটি দেখলেই তার গা ঘিনঘিন করে। অধিরাজ ওরকম শান্ত হয়ে কী করে দাঁড়িয়েছিল, সেটাই আশ্চর্যের। ওটা যদি পবিত্র-র পায়ে জড়াত, তাহলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে এই ভগ্নস্তূপকেই মাথায় তুলে ফেলত সে। আর জঙ্গলের যা বাহার, তাতে ঐ একটিই কিং সাইজের আপদ থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কে জানে তার ছানাপোনারাও আশেপাশে কিলবিল করছে কিনা! তার ওপর জঙ্গলের এই বুনো গন্ধটা কিছুতেই নিতে পারে না। কেমন যেন একটা বিটকেল গন্ধ। ভাঙা বাড়িটা যতই কাছে আসছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা চিমসে দুর্গন্ধের প্রভাবও বাড়ছে। এই বাড়ির মধ্যে ইঁদুর, বাদুড়, চামচিকে, ছুঁচো সবই থাকতে পারে। হয়তো এসব তাদেরই সম্মিলিত দেহসৌরভ!

"ব-ল হ-রি, হ-রি-বো-ল। ব-ল হ-রি, হ-রি-বো-ল!”

হঠাৎ নিস্তব্ধতা চিরে একদল মানুষের শোরগোল ভেসে এল। একমুহূর্তের জন্য পবিত্র কেঁপে ওঠে। এটা অনভিপ্রেত কিছু নয়। গুল্লু বলেছিল, কাছেই শ্মশান। সুতরাং হরিধ্বনি ভেসে আসাটাই স্বাভাবিক। মানুষও দিন, কাল, সময় কিংবা তিথি, নক্ষত্র দেখে মরবে, তেমন

কোনো কথাও নেই। শ্মশান থাকলে যে কোনোসময়েই হরিধ্বনি শোনা যাবে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে, ঐ ভাঙা 'খণ্ডহরের' অন্ধকার ঝোপঝাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই চিৎকারটা কেমন যেন একটা অশুভ বার্তা বয়ে আনল তার মনে। সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নয়। তবু ওই মিটমিটে আলোর মধ্যে, ছায়া ছায়া শম্পগুল্মের ভিড়ে একটি প্রাচীন ভাঙা বাড়ির শবদেহের সামনে হরিধ্বনির আওয়াজ বিপদসঙ্কেতের মতো ঠেকল তার। নিজের এই আশঙ্কিত চিন্তাভাবনাকে অতিক্রম করার জন্য পবিত্র ফের আস্তে আস্তে বলে, "রাজা, তুমি কি কখনও রামসে ব্রাদার্সের 'ভিরানা' ফিল্মটা দেখেছ?" অধিরাজ একটু বিরক্ত হয়েই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়, "হুঁ।"

"তোমার মনে হয় না এই স্পটটা অবিকল ভিরানার পেত্নীটার বাড়িটার মতো? ব্যস, এখন শুধু সুন্দরী জ্যাসমিনকে লাগবে...!"

অধিরাজ এবার একরকম হাল ছেড়ে দিয়ে ফের থমকে দাঁড়াল। তারপর তার দিকে ফিরে বিরক্তিমাখা রাগ রাগ দৃষ্টিতে গম্ভীরমুখে তাকায়। দুই হাত কোমরে রেখে একদৃষ্টে ওকে দেখছে। পবিত্র তাকে থেমে যেতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে, "কী হল? আবার গোখরো?"

"না। তোমার এক্সপেক্টেশন।" সে হতাশভাবে দু-হাত ছড়িয়ে বলে, "শুরুটা কী করেছ? এক্সপেক্টেশনেরও একটা লিমিট আছে! তোমার অ্যাকচুয়াল চাহিদাটা কী? প্রথমেই তুমি তমপিশাচের অর্ডার করলে। নেক্সট বাঘ আর বুনিপও এল। তারপর ডাইনোসরের প্রত্যাশাও হল। এখন দেখছি সুন্দরী পেত্নী জ্যাসমিনের আবদার করছ। আগে ক্লিয়ার করো যে এগজ্যাক্টলি তুমি চাও টা কী! এবার প্লিজ একদম ফাইনালি বলবে। তারপর না-হয় ভেতরে ঢুকে দেখব যে আদতে কী আছে!" পবিত্র অপ্রতিভ হয়ে বলে, "স্যরি... এক্সট্রিমলি স্যরি...!"

"ব্যাপারটা স্যরি বলার মতো সিরিয়াস কিছু নয়।" অধিরাজ এবার একটু নরম স্বরে বলে, "আমি জানি, তুমি স্ট্রেস কমানোর জন্যই বেশিরভাগ সময় এই জাতীয় ফিচলেমি করে থাকো। বিলিভ মি, আমরা প্রত্যেকেই ট্রিমেন্ডাস প্রেশারে আছি। এখানে জোরদার একটা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। এর মধ্যে প্লিজ, নিজেকে সামলানোর চেষ্টাটা অ্যাট লিস্ট করো। একটু আগেই একটা অ্যাটাক হয়েছে, মিস্ বোস হসপিটালে, বার্নিং শিখ সামনের ভগ্নস্তূপে ঢুকে বসে আছে, এই ঘাসের মধ্যে কোথায় গোখরো, কোথায় লাউডগা ঠিক নেই। এখন আমি ওকে ধরার চেষ্টা করব? না তোমার বায়নাক্কা সামলাব?"

পবিত্র এবার সিরিয়াস হয়ে বলল, "ওকে। প্লিজ, লেটস্ গো।"

অধিরাজ আর কোনো কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে পরিচিত ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেল। গাছপালার ঝোপঝাড়ের মধ্যে বেশ কিছু ক্যাকটাসও আছে। হাতে, পায়ে কাঁটার খোঁচাও খাচ্ছে অবিরত। কাঁটার খোঁচায় বা ঘষা খেয়ে চুনী চুনী রক্তবিন্দু ফুটেও উঠছে। তা সত্ত্বেও যেভাবে একটাও শব্দ না করে অতি সন্তর্পণে এগোচ্ছে সে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পবিত্রও এবার একদম বাধ্যভঙ্গিতে তাকে অনুসরণ করছে। সচরাচর যে লিড করে, রাস্তা বানিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব তারই। বাকিরা তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাই অধিরাজকে যতখানি শ্রম দিতে হচ্ছিল, পবিত্রকে অতটা দিতে হয়নি। তবুও ক্যাকটাসের কাঁটা তাকেও রেয়াত করছে না। মনে মনে বার্নিং শিখের চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করছিল পবিত্র। লোকটা থাকার জন্য আর জায়গা পায়নি! কেন? একটা ভদ্রস্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িতে ঢুকলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? কিন্তু এটা অধিরাজকে বলা যাবে না। বললেই সে চোখ কপালে তুলে বলবে, "এখন তোমার ফাইভস্টার অ্যাকোমোডেশনও চাই! চাহিদার তো শেষ নেই দেখছি।"

বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখতে যতটা ভয়ানক, ভেতর থেকে আরও বেশি। কোনায় কোনায় কালো অন্ধকার শিকার ধরার অপেক্ষায় বসে আছে। হিমশীতল হাওয়া মাঝেমধ্যেই ওদের ছুঁয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোনোরকমে বন-বাদাড় পেরিয়ে ভেতরে পা রাখতেই যেন গোটা শরীর ছ্যাঁৎ করে উঠল। এটা শীতকালের স্বাভাবিক শৈত্য নয়, উত্তুরে হাওয়ার হিমস্পর্শও নয়। এ বুঝি মর্গে রাখা মৃতদেহের মতো হিমশীতল। যেন বহুদিনের একটা প্রাচীন ও অনড় মৃত বাতাস এখানে পড়ে থেকে থেকেই পচে গিয়েছে। তার ভ্যাপসা গন্ধ, স্থির শীতলতা বড়োই অস্বস্তিদায়ক। এখন শীতের মরশুম হলেও তাপমাত্রা এতক্ষণ স্থির ছিল। কিন্তু এই

প্রথম মনে হল, আশেপাশের টেম্পারেচার বুঝি আচমকাই ড্রপ করেছে। ভুলবশত হয়তো নেমে গিয়েছে হিমাঙ্কের নীচে। দুই অফিসারই শার্টের নীচে মোটা কটস্ উলের জামা পরেছিল। সোয়েটার বা কার্ডিগান আজকাল আউট অব ফ্যাশন। তাই কটস্ উল কিংবা গরম কোট, জ্যাকেটই ভরসা। তা সত্ত্বেও দু-জনেরই দেহে সামান্য হলেও কাঁপুনি ধরল।

অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। নিঃসন্দেহে এখানে সূর্যালোক ঢোকে। কারণ মাথার ওপরের ছাত অধিকাংশটাই ভেঙে গিয়েছে। ঘরের ভেতরেও যেভাবে স্বাস্থ্যবান ঘাস ও ঝোপের সমাহার, তাতেই স্পষ্ট ওরা সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় আলোও পায়। এখন বাইরের চাঁদের ম্লান আভাও দিব্যি এসে পড়েছে ভেতরে। তা সত্ত্বেও হাওয়ায় এত প্রাচীন শীতলতা কেন। পুরো পরিবেশটাই অস্বাভাবিক!

অধিরাজের চোখের সামনে হঠাৎই আরও একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। অবিকল এমন না হলেও সেই ভয়াবহ স্লটারহাউজের কথা এক সেকেন্ডের জন্য হলেও মনে পড়ে যায়। এই কেসটা আসার পরে নিজের মস্তিষ্কও তার সঙ্গে মাঝেমধ্যেই একটা বিপজ্জনক খেলা শুরু করেছে। বারবার 'সার্জিক্যাল স' কিলারের সেই কলঙ্কিত অধ্যায় মনে করিয়ে দিচ্ছে, যা সে আপ্রাণ ভুলতে চায়। কখনও ক্রাইম সিনে, কখনও গুপ্ত আড্ডায় বারবার সেই টুকরো টুকরো পুরোনো দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে। ক্ষণিকের জন্য প্রচণ্ড একটা ভয় তাকে গ্রাস করে নেয়। মনে হয়, সেই লোকটা বুঝি বিকৃত ঝাঁঝরা দেহ নিয়ে ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়েই শীতল নিঃশ্বাস ফেলছে!

কী কষ্টে যে অধিরাজ নিজেকে সামলে নিল তা শুধু তার অন্তর্যামীই জানলেন। তার কপালে ফের বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। তবু আপ্রাণ নিজেকে স্বাভাবিক রেখে অতি সাবধানে চতুর্দিকটা মেপে নিল। অনভিপ্রেত দৃশ্য আর অভিজ্ঞতাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশটা দেখছে। আশেপাশে কি কেউ আছে? কিংবা কোথাও কোনো শব্দ? কোনো ছায়া? অন্ধকারের সঙ্গেও কেউ মিশে থাকতে পারে। গুল্লু লোকটাকে বেরোতে দেখেনি। সুতরাং নির্ঘাত সে এখানেই আছে। কিন্তু তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কেন!

ভেতরে পা দেওয়া মাত্রই দুই অফিসার ওই ঝোপের মধ্যেই নিজেদের লুকিয়ে ফেলেছিল। কয়েক মিনিট সেভাবেই থাকার পর ও ভালোভাবে চতুর্দিকটা মেপে নেওয়ার পরে অধিরাজ নিজের দীর্ঘদেহটাকে গুটিয়ে, ওই গুল্মের ঝাড়ের মধ্য দিয়েই গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল। পবিত্রকে হাতের ইশারায় ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে সে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে। এখানেও যথারীতি ক্যাকটাসের ঝোপ রয়েছে। তবে অতিকষ্টে কিছুটা এগোনোর পরই দেখা গেল ঘরের একদিকটায় কোনোরকম ঝোপ বা আগাছা নেই। ঘরটা বাইরে থেকে যতটা ছোটো মনে হয়েছিল, আদতে তাও নয়। বরং বেশ বড়ো। অন্তত একটা বিশাল প্রাকৃতিক গুহার সাইজের। তার একদিক জঙ্গলে আচ্ছন্ন হলেও অন্যদিকটা কে যেন সযত্নে কেটে, আগাছা মুড়িয়ে দিব্যি পরিষ্কার করে রেখেছে। মেঝে বলে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। তবু কিছু ইট চাপিয়ে, সিমেন্টের প্রলেপ লাগিয়ে মোটামুটি চলনসই করে নিয়েছে কেউ। তার ওপর কিছু ইটের পাঁজার ওপরে বিরাট বিরাট পাথরের স্ল্যাব চাপিয়ে তৈরি করে ফেলেছে আস্ত টেবিল। টেবিলের ওপরে কিছু জিনিসপত্র, প্রচুর শিশি বোতল রাখা আছে। নীচেও অনেক কিছুই আছে, তবে এই আবছায়া পরিবেশে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না।

অধিরাজ দু-তিন মিনিট স্থির হয়ে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করল যে আশেপাশে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। কিন্তু চতুর্দিকের খাঁ খাঁ শূন্যতা প্রমাণ করে দিল যে এখানে আপাতত কেউ নেই। এই ঘরটার সংলগ্ন আরও কিছু ছোটো ছোটো ঘর আছে। সেখানে থাকলেও থাকতে পারে। তবে আপাতদৃষ্টিতে কারোর উপস্থিতির লক্ষণ নেই। সে এবার হাতের ইশারায় পবিত্রকে এগিয়ে আসতে বলল। নিজে একদম নিঃশব্দে এগিয়ে গেল টেবিলটার দিকে। তার হাতের মোবাইলের টর্চটা জ্বলে উঠল ঠিকই। তবে অধিরাজ টর্চের মুখের সামনে হাত

রেখে সেটার আলোটাকে যথাসম্ভব স্তিমিত করেছে। এবার পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে প্রকট হল।

টেবিলের ওপরে বেশ কয়েকটা শিশিতে নানারকম তরল রয়েছে। কিছু তুলো, সার্জিক্যাল স্পিরিট, ড্রেসিং গজ—ইত্যাদি। কয়েকটা দেশলাই বাক্স ও সস্তা ব্র্যান্ডের সিগারেটের প্যাকেট। এক সাইডে প্রমাণ সাইজের তিনটে তরোয়াল। তার পাশেই সেই মোক্ষম কৃপাণ! আলোয় তাদের শাণিত দেহ চকচক করে ওঠে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এগুলোর প্রত্যেকটাতেই ভয়াবহ ধার আছে। পবিত্র বিনাবাক্যব্যয়ে গ্লাভস পরে নেয়। তারপর অস্ত্রের একটাকে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে। একদম পরিষ্কার, ঝকঝকে ইস্পাতের ফলা। সে ফিশফিশ করল, "মার্ডার ওয়েপন?"

"হ্যাঁ।" অধিরাজের স্বর তার চেয়েও নীচু, "ধুয়ে মুছে সাফ করে রেখেছে। তবে ল্যাবে নিয়ে গেলে ব্লাড ট্রেস আর ডি.এন.এ. পাওয়া গেলেও যেতে পারে।" বলতে-বলতেই সে-ও আগ্নেয়াস্ত্রটা কোমরে গুঁজে পকেট থেকে গ্লাভস বের করে পরে নেয়, "এভিডেন্স হিসেবে তুলে নাও। ইনি তো তৈরি লোক। এই দ্যাখো, আমার গিফট করা বুলেটটাও আছে। বলেছিলাম না, উনি নিজেই বের করবেন? সেটাই করেছেন। এটাকেও নাও, বিগ এভিডেন্স।"

পবিত্র সবিস্ময়ে দেখল স্পিরিটের বোতলের একপাশে একটা বুলেট পরে রয়েছে। কয়েকটা সার্জিক্যাল নাইফ আর স্কিন স্টেপলারও চোখ এড়াল না। সত্যিই তৈরি লোক! নিজের সার্জারি নিজেই করেছে। স্টেপলার দিয়ে স্টিচও মেরেছে! অথচ নড়াচড়া, লাফঝাপ দেখলে কেউ বলবে।

টেবিলের নীচে তিনটে পাঁচ লিটারের বড়ো বড়ো তেলের জেরিক্যান। কোমল কৌরের বাড়ি খুঁজে ওরা যা পায়নি, সম্ভবত এটাই সেই বস্তু। সেই পনেরো লিটার পেট্রোল এখানেই মজুত করা আছে। তবে একটা জেরিক্যান বেশ কিছুটা খালি। সেটা লক্ষ্য করেই একটু চিন্তায় পড়ল অধিরাজ। কিছু পেট্রোল এখান থেকে গায়েব! বিষয়টা মোটেই খুব স্বস্তির নয়। তবে ওটার প্রয়োগ এখনও হয়নি। তাই কিছু বলা বা আন্দাজ করা মুশকিল। এছাড়া কোনোরকম গ্যাসের কন্টেনারও চোখে পড়ল না। ওগুলো কি তবে অন্য ঘরে রাখা আছে? বা অন্য কোথাও?

"ডক্টরস্ ব্র্যান্ডি।"

পবিত্র টেবিলের ওপরে রাখা শিশিগুলো খুলে খুলে শুঁকে দেখছিল। সবগুলোর মধ্যেই কিছু না কিছু লিকুইড আছে। একটার মধ্যে নিরীহ স্পিরিট আছে। একটা ডক্টরস্ ব্র্যান্ডির, তার পাশেরটা টার্পেন্টাইন অয়েলের। একটা জলের মতো স্বচ্ছ তরল। গন্ধও সামান্য ঝাঁঝালো হলেও তেমন কিছু সন্দেহজনক নয়। ওষুধ-বিষুধ কিছু হবে হয়তো। আর একটা বোতল খুলে নিঃশ্বাস টানতেই কেমন যেন মাথা ঘুরে যাচ্ছিল তার। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "রাজা, ক্লোরোফর্ম।"

"শুধু ক্লোরোফর্ম নয়...।" অধিরাজ ততক্ষণে ওই বিরাট টেবিলের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটের ভেতরে গুঁড়ো গুঁড়ো বিজাতীয় পাউডার দেখে কৌতূহলী হয়ে খুলে পরীক্ষা করছিল। এবার শুঁকে দেখে প্যাকেটটা পবিত্রর দিকে এগিয়ে দিয়েছে, "গঞ্জিকাও স্টক করে রেখেছেন। এর কিছুটাই মিস্ বোসের মার্লবোরোর প্যাকেটে গেছে। মহা ত্যাঁদড় লোক। সেডেটিভ, ড্রাগের আমদানি বন্ধ করে দিয়েছি বলে এখন গাঁজা, ক্লোরোফর্ম, এইসব জুটিয়ে বসে আছে।"

"গাঁজা তো মিস্ বোসের জন্য।" পবিত্র চিন্তায় পড়েছে, "ক্লোরোফর্ম কি তবে মিস্ দত্তের জন্য রেডি হচ্ছিল? উনি স্মোক করেন না। কিন্তু চা, কফি তো খেয়েই থাকেন। লিকুইড ক্লোরোফর্ম পরিমাণ মতো মিশিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে।"

"হতে পারে।" সে মাথা নাড়ে, "অসম্ভব কিছুই নয়। ক্লোরোফর্ম ঘুমের ওষুধের সাবস্টিটউট

হতেই পারে। আমি আশ্চর্য হব না যদি ইতিমধ্যেই ও ক্লোরোফর্ম দিয়ে একাধিক অ্যাটেম্পট করে থাকে। কিন্তু মিস্ দত্ত ফাঁদে পা দেননি। যা যা হাতের কাছে পাচ্ছ, সব তুলে নাও। গাঁজা, ক্লোরোফর্ম, টার্পেনটাইন, স্পিরিট, বুলেট থেকে শুরু করে পেট্রোলের জেরিক্যান পর্যন্ত। তরোয়ালগুলো আমি নিয়ে নিচ্ছি। কৃপাণ আর ছুরিগুলোও। সব এভিডেন্স হিসাবে গাড়িতে রাখব। ওর হাতে আক্রমণের জন্য কোনো অস্ত্রই থাকবে না।" বলতে বলতেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, "তারপর দেখি, ও শেষ কয়েকঘণ্টায় কী করে বাজিমাত করে।"

পবিত্র জিনিসগুলো তুলে নেওয়ার জন্য এগিয়েই যাচ্ছিল। তার আগেই গোটা ঘরের ছাত কেঁপে উঠল সুরেলা হুইস্লে। কে যেন খুব সুরে, মিষ্টি শিস দিয়ে সুর ভাঁজছে, "গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই...!"

পবিত্র শিউরে ওঠে। তার গায়ের রোম একধাক্কায় খাড়া হয়ে গিয়েছে। অধিরাজ চমকে উঠল। কী সর্বনাশ! তার মানে লোকটা আগাগোড়া এখানেই উপস্থিত। গুল্লু ভুল বলেনি। সে এতক্ষণ এখানেই ছিল। হয়তো অন্য কোনো অন্ধকার ঘরে লুকিয়েছিল বলে তার অস্তিত্বের টের পায়নি। লোকটা আড়াল থেকে তাদের দেখেছে, হয়তো বা সব শুনেওছে! তবে সে নিজে এখানে সশরীরে উপস্থিত নেই। কারণ এই মুহূর্তে শব্দটা ভেসে আসছে অন্য কোনো ঘর থেকেই। এই সুরের উৎস বড়ো ঘরটা নয়। অথচ উঁচু ছাতের প্রতিটা ইটে ধাক্কা খেয়ে এমন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তাতে মনে হয় বুঝি একদম সামনে দাঁড়িয়ে শিস দিয়ে চলেছে কেউ!

"রাজা। ইটস আ ট্র্যাপ।" পবিত্র দাঁতে দাঁত পিষল, "হারামজাদাটা জানত আমরা এখানে আসব। ও আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। গুল্লু কিংবা ওর টিমের কেউ বেইমানি করেছে!"

শিস্ থেমে গিয়ে এবার জোরালো হাসির শব্দে কাঁপতে শুরু করেছে গোটা ঘরটা। পাগলের মতো কে যেন ব্যঙ্গমিশ্রিত অট্টহাসি হাসছে। তার হাসিতে এত কৌতুক যে শুনলেই বোঝা যায় যে এই দুই অফিসারের অসহায়তা সে ভীষণভাবে উপভোগ করছে। তার সেই উন্মত্ত হাসি প্রমাণ করে দিল যে পবিত্র-র আশঙ্কাই একশো শতাংশ সত্যি! সরষের মধ্যেই ভূত আছে!

অধিরাজের হাতে আবার বিদ্যুৎবেগে ফণা তুলেছে আগ্নেয়াস্ত্র। যদিও এখনও স্পষ্ট নয় যে আওয়াজটা আসলে আসছে কোথা থেকে। তবু সে তার স্বভাববিরুদ্ধ উচ্চস্বরে যেন খানিকটা শুনিয়ে শুনিয়েই বলল, "না পবিত্র। ও কিচ্ছু জানত না। যদি জানত তবে তেলের জেরিক্যান, তরোয়াল, কৃপাণ আর ছুরি এখানেই রেখে দিত না। এটা ওর বহু পুরোনো, ক্লিশে হয়ে যাওয়া বাবা আদমের জমানার স্ট্র্যাটেজি! ওর জাতভাই বেয়ন্ত সিংও গোটা শিখজাতিকে বেইমান প্রুভ করেছিল, ইনিও অবিকল তাই করছেন। ও স্রেফ তোমায় নাচানোর চেষ্টা করছে, আর তুমিও ওর তালে তালে নাচছ।

বাট, আই অ্যাম নট আ ডান্সিং এক্সপার্ট। তাই নাচতে আমার প্রবল আপত্তি আছে।"

তার বলা শব্দগুলো গমগম করে উঠল গোটা ঘরে। যে ব্যক্তি এতক্ষণ হাসছিল, এবার হঠাৎই ফের চুপ করে গেল। প্রতিপক্ষ যে তার চাল ধরতে পেরেছে সেটা বুঝতে পেরে হয়তো থতোমতো খেয়ে গিয়েছে সে। এটা একেবারেই 'আশাতীত! পুলিশের মনস্তত্ত্ব নিয়ে খেলে খেলে অভ্যস্ত দুষ্কৃতী আবার যেন জোরদার একটা ধাক্কা খেল। আসল লোকটাই তার ফাঁদে পা দেয়নি। অথচ একটু আগের তেলের ট্যাঙ্কারে র‍্যান্ডম শ্যুটিং এর ঘটনায় মনে হয়েছিল, সে সফল হয়েছে। মনে মনে বীভৎস মজা অনুভব করেছিল। কিন্তু নাঃ। আবার ব্যর্থতা। সবটাই এই লোকটা বুঝে ফেলেছে। তার ওপর কিনা তার তুলনা বেয়ন্ত সিং-এর সঙ্গে করছে। ঠান্ডা মস্তিষ্কের খুনির মাথায় এবার রক্ত চড়ে যায়। শেষে তাকে আর বেয়ন্ত সিংকে এক করে দিল। এত বড়ো দুঃসাহস!

হঠাৎ নেমে আসা নৈঃশব্দের পেছনে অপরাধীর হতবিহ্বল অবস্থা আন্দাজ করে মনে মনে

হাসল অধিরাজ। বেয়ন্ত সিং নামক 'দুখতি রগে' হাত পড়েছে। দাওয়াইও কাজ করেছে। ওভার কনফিডেন্ট ক্রিমিনালদের এটাই স্বভাব। প্রতিপক্ষকে তারা আন্ডার এস্টিমেট করে। সে এবার ব্যঙ্গমিশ্রিত ঠান্ডা স্বরে বলে, "যাঃ মিঃ লাফিং বুদ্ধ। আপনি যে গৌতম গম্ভীর হয়ে গেলেন! আপনার নিজেকে সবজান্তা গেঞ্জিওয়ালা প্রমাণ করার চেষ্টা বিফলে গেল বলে দুঃখ করবেন না। নতুন কিছু ভাবুন। লেটস্ স্টার্ট ইট অ্যাফ্রেশ। ট্রাই মি। পুলিশ হয়ে বাতেল্লা দিতে ভালো লাগে না। কৃপা করে দেখা দেবেন কি? না আমাদেরই খুঁজতে হবে?"

কথাগুলো সে মুখে বললেও তার সন্ধানী চোখ লোকটাকে খুঁজছিল। পবিত্র-র বুঝতে অসুবিধে হল না যে অধিরাজ বার্নিং শিখকে ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রোভোক করছে। নয়তো সে সি.আই.ডি. সিরিয়ালের এসিপি প্রদ্যুম্নের মতো অপরাধীর সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেওয়ায় একেবারেই বিশ্বাসী নয়। নিজের ক্ষণিকের সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে সে-ও রিভলবার তাক করে পূর্ণদৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে নির্দেশের অপেক্ষায় তাকায়। অধিরাজ তাকে চোখের ইশারায় একটি অন্ধকার ঘরের দিকে যেতে বলল। সে নিজেও গুটিগুটি পায়ে উলটোদিকের ঘরটার দিকে নিঃশব্দে এগোল। শিস এবং হাসির শব্দ এখান থেকেই হয়তো আসছিল। মুখে কিন্তু বক্তৃতা থামাল না, "আপনি তো দেখছি ভিন্দ্রানয়ালের চেয়েও লাজুক। সে স্বর্ণমন্দিরে লেজ গুটিয়ে লুকিয়ে বসেছিল, আপনিও অন্ধকারে লুকিয়ে বসে আছেন। বিশেষ পার্থক্য নেই। বাই দ্য বাই, আপনারা সবাই কি এরকমই কাওয়ার্ড?"

বেয়ন্ত সিং-এর নাম শুনেই গায়ে জ্বালা ধরেছিল। এবার ভিন্দ্রানয়ালের নামটা আর নিতে পারল না দুষ্কৃতী। সে থাকতে না পেরে গর্জন করে উঠল, "বেয়ন্ত আমার কেউ না। ভিন্দ্রানয়ালেও নয়। আমি ওদের মতো কাপুরুষ, নামর্দ, বেইমান নই।" কথাটা শুধু বলার অপেক্ষা। তার কণ্ঠস্বর এবার ভেসে আসতেই অধিরাজ নিঃসন্দেহভাবে বুঝতে পারল যে লোকটা ঠিক কোথায় আছে। এখন শব্দভেদী বাণের জমানা নয়। কিন্তু তার মতো একজন সর্বগুণসম্পন্ন শাপশ্যুটার শুধু আওয়াজ শুনেই নিশানা লাগাতে সক্ষম। টার্গেট স্থির ও রেঞ্জের মধ্যে থাকলে অধিরাজ চোখ বুজেও শ্যুট করতে পারে। সে বিদ্যুৎগতিতে একদম পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে স্ট্রেট ফায়ার করল। আগ্নেয়াস্ত্র'র গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা দেহ পড়ে যাওয়ার ভারি শব্দ। লেগেছে।

যে ঘরটা থেকে পড়ে যাওয়ার শব্দ এল, ঠিক সেদিকেই গুটি গুটি পায়ে এগোল দুই অফিসার। গুলি লাগলেও আঘাতটা হয়তো বিপজ্জনক হয়নি। অধিরাজ একটা চাপা অথচ ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। লোকটা জখম, তবে মরেনি। তাই তাড়াহুড়ো করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যেখানে সে আছে, বাড়ির ওই দিকের ছাতটা এখনও টিকে আছে। তাই ভেতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে।

ওরা দু-জনেই সেই অন্ধকারের দিকে সবে পা বাড়িয়েছিল, তার আগেই কানের কাছে অদ্ভুত একটা গড়গড় শব্দ। একাধিক ভারি জিনিস যেন গড়াতে গড়াতে এদিকেই আসছে। পবিত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অধিরাজও সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছে যে আওয়াজটা ঠিক কীসের। তবে বুঝতে খুব বেশি দেরিও হল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সামনে প্রকট হল একজোড়া এল পি জি গ্যাস সিলিন্ডার। তার সঙ্গে গ্যাসের ভয়াবহ দমবন্ধ করা গন্ধ। বার্নিং শিখ সিলিন্ডারদুটোর মুখ খুলে দিয়েছে। এখন সামান্যতম স্পার্ক হলেই বিস্ফোরণ অবধারিত!

পবিত্র প্রমাদ গুনল। এই পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করা যাবে না। গ্যাস একদম হুড়হুড় করে বাতাসে মিশছে। শয়তানটা যদি একটা দেশলাই বা লাইটারও জ্বালে, তবে ওরা তিনজনেই উড়ে যাবে। বাঁচার সম্ভাবনা একদমই নেই। অধিরাজের কানে হালকা একটা শব্দ আসে। ও পক্ষ কি লাইটার জ্বালানোর চেষ্টা করছে?... কী সর্বনাশ!

সে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করেই দৌড়োল সেই জমা অন্ধকারের মধ্যেই। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে পবিত্র শুনতে পেল দুটো ভারি দেহের সংঘর্ষের আওয়াজ। একটা ধাতব জিনিস

সশব্দে মাটিতে ছিটকে পড়ল। বোধহয় লাইটারটা। তার বিস্মিত দৃষ্টি অন্ধকার একটু সইয়ে নিতেই দেখতে পেল যুযুধান দুইপক্ষকে। কিছুক্ষণের জন্য সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবছিল কী করবে। তার আগেই অধিরাজ লোকটার প্রায় টুটি টিপে ধরে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল সেই ঘর থেকে। চোখের সামনে জলজ্যান্ত বার্নিং শিখকে দেখে হাড় হিম হয়ে যায় পবিত্র-র। এত কাছ থেকে এই তয়াবহ রূপ সে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। কমলার ছদ্মবেশেও ওকে এতটা ডেঞ্জারাস মনে হয়নি। কী বীভৎস ওর মুখের পোড়া জায়গাটা! একটা চোখ নেই। অন্য চোখটায় কী ভয়াবহ রাগ আর প্রতিশোধস্পৃহা। এক মুহূর্তের জন্য তারও মনে হল, এ মানুষ নয়। হতেই পারে না!

"স্যরি পবিত্র।" অধিরাজ দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "সুন্দরী জ্যাসমিনকে না পেলেও তোমার তমপিশাচকে পেয়েছি। প্রাণ ভরে দেখে নাও ওঁর হ্যালোউইন মেক-আপ।" এ চেহারা তমপিশাচকেও ভয়াবহতায় হার মানাবে। পবিত্র দেখল লোকটার হাত বেয়ে রক্ত পড়ছে। গুলিটা হাতের মাংস চিরে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। বুলেটপ্রুফ ভেস্ট বুক, পেট, কাঁধকে রক্ষা করলেও হাতকে সুরক্ষা দেয় না। তাই সেও আহত হয়েছে। অধিরাজ আরও কিছু বলার আগেই লোকটার হাত গিয়ে ছোবল মারল তার জখম কাঁধে। যেখানে সে কৃপাণ বসিয়েছিল, ঠিক সেই পয়েন্টটাতেই আঘাতটা পড়েছে। অধিরাজ যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে। তার হাতও শিথিল হয়ে গেল কয়েকমুহূর্তের জন্য। সেই সুযোগেই খুনি নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। সে দৌড়োল পাথরের টেবিলের দিকে। পবিত্র-র মনে পড়ে যায়, ওখানে এককোণে কয়েকটা দেশলাইবাক্সও দেখেছিল! লাইটারটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে বলে এখন দেশলাইয়ের প্যাকেটের দিকেই দৌড়চ্ছে! একদিকে গ্যাসের সিলিন্ডার নির্বিবাদে গ্যাস ছড়িয়ে চলেছে। তার ওপর তিনটে পেট্রোলের জেরিক্যান এখানে উপস্থিত। যদিও আধভাঙা ছাতের দৌলতে কিছুটা হলেও গ্যাস বেরিয়ে যাবে, কিন্তু তবুও বিপদের সম্ভাবনা কম নয়। কারণ এই গ্যাসগুলোও ওপর দিকে ওঠে না, বাতাসের চেয়ে ভারি হওয়ার দরুণ মাটির দিকে থিতিয়ে পড়ে। যার জন্য ওকে তাড়ানোর জন্য ফ্যান বা ওই জাতীয় ফোর্স লাগে। এখানে সেসব কিছুই নেই! একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষামাত্র। তারপর এই গোটা বাড়ি সবই বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে!

সে লোকটার দিকে বন্দুক তাক করেছে, "হ-ল্ট! ওখানেই দাঁড়া। নয়তো এনকাউন্টার করে দেব।"

বার্নিং শিখ তার দিকে তাকিয়েছে। নিষ্প্রভ আলোয় তার মুখটা অবিকল একটা বীভৎস লাশের মতো দেখাল। অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলল, "গুলি করবি? কর!"

এবার পবিত্র রীতিমতো ঘামছে। সে জানে যে এই পরিস্থিতিতে ফায়ার করা যাবে না। স্রেফ ওকে থামানোর জন্যই আলপটকা বলে দিয়েছিল। কিন্তু এ লোকও সেয়ানা। ও জানে যে এই মুহূর্তে দুই অফিসারের অবস্থাই নির্বীর্য বিষদাঁতহীন সাপের মতো। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে ঠিকই, অথচ কাজে লাগবে না। এতটাই কনফিডেন্ট যে গান পয়েন্টে থাকা সত্ত্বেও থামেনি। বরং সবেগে এগিয়ে যাচ্ছে দেশলাই বাক্সগুলোর দিকে...!

সে আর কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক সজোর লাথি মেরে তাকে ছিটকে ফেলল একদম ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে। পবিত্র কয়েক কদম এগিয়ে যেতে না যেতেই সে স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো পালটা লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে পবিত্র-র তলপেটে এক ঘুষি বসিয়ে দেয়। আঘাতটা এতটাই তীব্র যে তার মতো অভিজ্ঞ অফিসারও ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়েছে। অদ্ভুত লোক তো! কিছুতেই হার মানবে না। পবিত্র প্রথম আঘাতটা সামলে ওঠার আগেই পরপর দুটো ঘুষি এসে পড়ল তার মুখে। একটা চোখের ওপর, আর একটা ঠোঁট ঘেঁষে। দুটোই তুলনামূলক নরম জায়গা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য পবিত্র-র মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হল, চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ঠোঁটের কষ বেয়ে উষ্ণ কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছে। সে তবুও হাল ছাড়ে না। বরং এবার নাছোড়বান্দার মতো বার্নিং শিখকে পেছন দিক দিয়ে প্রাণপণে চেপে ধরল। কিন্তু তাও মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য।

লোকটা হাতাহাতিতে রীতিমতো ওস্তাদ লোক। সে বিদ্যুৎবেগে কনুই দিয়ে তার নাকে গুঁতো মেরেছে। এত জোরদার তার মার যে পবিত্রর মনে হল, তার নাকের হাড়ই বুঝি ভেঙে গিয়েছে। চেহারায় ছোটখাটো হওয়ার দরুণ মানুষটার স্পিড বেশি। এবং নাতিদীর্ঘ চেহারার সুবিধা সে দীর্ঘদেহী অফিসারদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সফলভাবে নিচ্ছে। পবিত্র প্রত্যাঘাত করার আগেই আবার একটা জোরালো পাঞ্চ তার কানের ঠিক নীচে! বেকায়দায় পড়েছে। সে সামলে উঠে আর কিছু করার আগেই বার্নিং শিখ একলাফে পৌঁছে গিয়েছে টেবিলের দিকে। সবেগে ছোঁ মেরে তুলে নিয়েছে দেশলাইয়ের বাক্স...! অসম্ভব দ্রুতবেগে একখানা কাঠিও বের করে এনেছে বাক্স থেকে...। পবিত্র দেখল তার ঠোঁটে পৈশাচিক হাসি...। চতুর্দিকে গ্যাসের গন্ধ...। কয়েক লিটার পেট্রোল.... সে আফশোশে চোখ বুজল!

"পবিত্র... রান্!"

বার্নিং শিখ দেশলাইটা ধরানোর আগেই চিতার ক্ষিপ্রতায় তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়েছে অধিরাজ। পবিত্র-র সঙ্গে তার হাতাহাতি পর্ব এতটাই দ্রুত ছিল যে তখন সে কিছু করার সুযোগ পায়নি। কাঁধের তীব্র যন্ত্রণায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবশ হয়ে গিয়েছিল। বেশি সময়ের জন্য নয়, মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তার মধ্যেই পবিত্র আর বার্নিং শিখের মধ্যে আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ চলছিল। সেলাইটা এই নিয়ে তৃতীয়বার কাটল। অধিরাজ টের পাচ্ছিল তার শরীর বেয়ে উষ্ণ একটা তরল ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে। কটস উলের গরমজামাটা ছাপিয়ে তাজা রক্তের দাগ দেখা দিল শার্টেও। তাও সে সর্বশক্তি দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে আততায়ীর ওপরে। তার আঘাতের আকস্মিকতায় দেশলাইটা বার্নিং শিখের হাত থেকে কোথায় যেন ছিটকে পড়ে। সে কোনোমতে লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই সপাটে একটা আছাড় মেরে মাটিতে পেড়ে ফেলে চেঁচিয়ে বলল, "এই মুহূর্তেই এখান থেকে বেরিয়ে যাও...। সঙ্গে মার্ডার ওয়েপনগুলোও নিয়ে নাও।... জাস্ট রান...! ওকে আমি দেখছি....!"

'রান' মানে! পবিত্র স্তম্ভিত। অধিরাজ কি তাকে পালিয়ে যেতে বলছে! এইরকম জটিল পরিস্থিতিতে পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছে? দু-দুটো গ্যাসের সিলিন্ডার খোলা অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ওদিকে বদ্ধ উন্মাদ সাইকোটা লাইটার, দেশলাই যা পাচ্ছে জ্বালানোর চেষ্টা করছে! আগ্নেয়াস্ত্র থেকেও কোনো লাভ নেই। লোকটা কম্ব্যাটে ওস্তাদ। অধিরাজের ক্ষত ফের তাজা হয়ে গিয়েছে। ফের শুরু হয়ে গিয়েছে রক্তক্ষরণ। এই অবস্থায় তাকে একা ফেলে পবিত্র পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবে!

তার জেদ চেপে যায়। কখনও না! সে গোঁয়ারের মতো ফের আক্রমণে গেল। ততক্ষণে বার্নিং শিখকে মেঝের ওপরে ফেলে তার সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে অধিরাজ। হিংস্র খুনি কোনোমতে দেশলাই বাক্স অবধি পৌঁছোতে চাইছে, আর তাকে অসীম শক্তিতে আটকে রেখেছে সে। কিন্তু লোকটা তার জখম কাঁধটাকেই টার্গেট করে নিয়েছে। বারবার ওই দুর্বলতম জায়গাটিতেই ঘুষির পর ঘুষি বসিয়ে চলেছে। পবিত্র এগিয়ে গিয়ে তাকে নিরস্ত করতে যায়। কিন্তু দুষ্কৃতী তাকে লক্ষ্য করেই অধিরাজকে উলটে ফেলে, পবিত্রকে ঐ অবস্থাতেই জোরালো কিকে ছিটকে ফেলল! ওইটুকু চেহারা, অথচ তার গায়ে কী অসম্ভব শক্তি! এরকম অমানুষিক গায়ের জোর একমাত্র কোনো বন্য হিংস্র জানোয়ারের হতে পারে, অথবা কোনো উন্মাদের। পবিত্র-র মনে হল, বার্নিং শিখ বুঝি দুটোই।

লোকটা পবিত্রকে অ্যাটাক করতে যে খণ্ড মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, সেই ফাঁকেই আবার তাকে মেঝেতে চিত করে ফেলে তার ওপর উঠে বসেছে অধিরাজ। পাগলের মতো তাকে একের পর এক ঘুষি মারতে মারতে ফের চেঁচিয়ে বলল, "পবিত্র, পালাও। ডাইনে-বাঁয়ে তাকাবে না। সোজা এখান থেকে বেরিয়ে যাও...। গো... গো!"

"তোমাকে একা ফেলে?" পবিত্র সজোরে প্রতিবাদ করে, "হারগিস না!"

"যা বলছি তাই করো।...." অধিরাজ এবার গর্জন করে ওঠে, "একসঙ্গে দু-জনের মরাটা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তুমি ওর কৃপাণ, ছুরি আর তরোয়ালগুলো নিয়ে স্রেফ কেটে

পড়ো। পারলে আমার ছোঁড়া বুলেটটাও নাও। ওগুলোই ওর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। কৃপাণে ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, বুলেটে ডি.এন.এ. স্যাম্পলও হয়তো...!"

বার্নিং শিখ এই কথাটা শোনামাত্রই একেবারে মত্ত হাতির বলে অধিরাজকে নিজের ওপর থেকে সরাতে চাইল। সে নিজেও প্রতিপক্ষের বুদ্ধির মারটা বুঝেছে। ওই তরোয়াল থেকেই ফরেনসিক অনেক মারাত্মক এভিডেন্স বের করে ফেলবে। তরোয়ালটা যতই ধুয়ে মুছে রাখুক, উন্নত ফরেনসিক সায়েন্স তার মধ্যে থেকেই ঠিক অব্যর্থ প্রমাণ বের করবেই। ওগুলো তার অন্যতম মার্ডার ওয়েপন! সবচেয়ে বড়ো কথা, তরোয়াল আর ছুরির ওপর যদি তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নাও পাওয়া যায়, কৃপাণের ওপর পাওয়া যাবেই। কারণ কৃপাণটা সবসময়ই তার দেহের সঙ্গে লেগে থাকে। এটা তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতোই অবিচ্ছেদ্য। তাই এটার ওপর থেকে হাতের ছাপ মুছে ফেলার কথা কখনও ভাবেনি সে। তার ওপর আর কোথাও না থাক, কৃপাণ বা বুলেটটা থেকে তার ডি.এন.এ.-ও পেয়ে যেতে পারে। এতগুলো জায়গায় কোথাও সামান্যতম ক্লুও ছাড়েনি এই চতুর অপরাধী। এবার মনে হল, অধিরাজ ব্যানার্জি ঠান্ডা মাথায় তার জন্য ফাঁসির দড়ি তৈরি করছে। মার্ডার ওয়েপন আইনের জন্য সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ! সেই প্রমাণটাই ওদের হাতে চলে গিয়েছে।

সে এবার আফসোসে, নিজের মূর্খামির ওপর রাগে একেবারে চরম নির্মম, নৃশংস হয়ে উঠল। অধিরাজের কপালে, কাঁধে দুমদুম করে একের পর এক আঘাত করেই চলেছে। অধিরাজ দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছিল। কিন্তু মুহুর্মুহু আঘাতে তারও যন্ত্রণা বাড়ছে। একটু কাতর শব্দ করে উঠল, "ওঃ।"

"রাজা।"

পবিত্র এগিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ফের নিরস্ত করেছে সে। সর্বশক্তি দিয়ে লোকটাকে ফের মেঝের ওপর চেপে ধরে বলল, "যা বলছি তাই করো। সমস্ত এভিডেন্স নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো। ভুল করেও পেছনদিকে তাকাবে না। একটা অধিরাজ ব্যানার্জি শেষ হতে পারে, কিন্তু সি.আই.ডি. হোমিসাইড হারবে না। রান্‌ন... পবিত্র! অ্যান্ড ইটস মাই অর্ডার। মাইন্ড ইট!"

সে তবুও কিছুক্ষণ অসহায় ও বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার চোখের সামনে যেন দুই মহারথীর লড়াই চলছে! দু-জনেই সমান শক্তিশালী, দু-জনেই আহত। কিন্তু কেউ কাউকে ছাড়ছে না। কখনও অধিরাজের পাল্লা ভারি হচ্ছে, কখনও বার্নিং শিখের। বার্নিং শিখ হাত-পায়ের আঘাতে অধিরাজকে পরাহত করতে চাইছে। সাময়িক সফলও হচ্ছে। তার টার্গেট এখন দেশলাইয়ের বাক্স অবধি পৌঁছোনো। কিন্তু অধিরাজ আহত হচ্ছে, রক্তাক্ত হচ্ছে, তবু কিছুতেই তাকে বাক্সটা তুলে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না। কখনও লাথি মেরে উলটে ফেলে দিচ্ছে, কখনও বা চেপে ধরে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে অন্যদিকে। দুই পক্ষের মধ্যে সমান রোষে হাতাহাতি ও খণ্ডযুদ্ধ হয়েই চলেছে। একজন বিস্ফোরণ করার জন্য মরিয়া, অন্যজন তাকে প্রাণপণ শক্তিতে প্রতিহত করছে। অথচ পবিত্র-র কিছুই করার নেই!

"দেখছ কী!" এবার অধিরাজ হাঁপাতে হাঁপাতেই গর্জন করে ওঠে, "যা বলছি তাই করো। এই সুযোগ। সমস্ত এভিডেন্স নিয়ে পালিয়ে যাও। আই রিপিট.... ইটস মাই অর্ডার, অ্যান্ড আই অ্যাম ইওর বস্‌!"

এতক্ষণে পবিত্র যেন সংবিৎ ফিরে পেল। সে আর কথা না বাড়িয়ে এক ছুটে টেবিলটার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বার্নিং শিখ তাকে আটকাবার চেষ্টা করার আগেই অধিরাজ তাকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিয়েছে পবিত্র-র সামনে থেকে। হিংস্র গলায় বলল, "নট্‌ দিস টাইম। এই বাজিটা আমরা জিতবই। কেউ আটকাতে পারবে না! আর তরোয়াল, পেট্রোল তোর আর কোনো কাজের নয় মিঃ গুলশন সিং! ফর ইওর কাইন্ড ইনফর্মেশন, পি সি চৌধুরীর গোটা পরিবার দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। তুই তাদের কিস্যু ছিঁড়তে পারিসনি। একটা চুলও না!"

বার্নিং শিখ এতক্ষণ আপ্রাণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অধিরাজের এই তথ্যটা শুনে তার চোয়াল যেন ঝুলে পড়েছে। তার নিজের আসল নাম শুনে সে চমকে গিয়েছিলই। তার ওপর

যখন শুনল পি সি চৌধুরীর পরিবার জীবিত, তখন একটা অদ্ভুত হতাশা তাকে ঘিরে ধরল। এতদিনের এত পরিশ্রম, এত উত্তেজনা, এত প্রচেষ্টার ফলাফল যখন শূন্য হয়, তখন হতাশা ও সাময়িক ক্লান্তি আসাই স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ছিল যে পি সি চৌধুরীর পরিবারকে স্বয়ং ভগবানও বাঁচাতে পারবে না। অথচ সে গর্ব, সে আত্মবিশ্বাস এক নিমেষে ধূলিসাৎ! পরাজয় তার সহ্য হয় না। সে এই দুঃসংবাদটা আদৌ প্রত্যাশা করেনি। তাই সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য একটু স্থির হয়ে গেল। যেন মারপিট করতেও ভুলে গেল।

পবিত্র-র ওই বনবাদাড় ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। তবুও সে প্রাণপণে নিজেকে কাঁটার হাত থেকে মুক্ত করে আপ্রাণ ছুটল বাইরের দিকে। গ্লাভস পরা দুই হাতে সযত্নে ধরে রেখেছে সব এভিডেন্স। গাড়িতে এভিডেন্সব্যাগ আছে। ওখানে রেখে দিয়ে সিল করে দিতে হবে! আজ যদি পবিত্র মরেও যায় তবু এগুলো আহেলির কাছে পৌঁছে দিয়েই মরবে। সে ঝোপঝাড় ভেঙে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। উদ্ধত গোখরোর ফণার থেকেও বড়ো ভয়, যদি কোনোমতে বার্নিং শিখ দেশলাই অবধি পৌঁছে যায়। যদি অধিরাজের কিছু হয়। সে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ক্লান্ত, আহত ও ক্ষতবিক্ষত। এই অবস্থায় কতক্ষণ পাগলটার সঙ্গে লড়বে?

পবিত্র সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়ে সমস্ত মার্ডার ওয়েপন, কৃপাণ ও বের করে আনা বুলেট নিয়ে সোজা দৌড়ে বেরিয়ে গেল লোকটার সামনে থেকে। দৃশ্যটা দেখেই ফের জ্বলে উঠল বার্নিং শিখ, অথবা গুলশন সিং। সে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা ইটের টুকরোই তুলে বসিয়ে দিয়েছে অধিরাজের মাথায়। কোনোমতে তাকে ছাড়িয়ে ফের দেশলাইয়ের বাক্সটা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সব বাজিই ওরা জিতবে। পি সি চৌধুরীকে ও তার পরিবারকেও বাঁচাবে, বার্নিং শিখের আসল নামও জেনে ফেলবে আবার কোর্টে সাবমিট করার জন্য এভিডেন্সও জোগাড় করে ফেলবে? অধিরাজ ব্যানার্জি নিজেকে সুপারম্যান ভাবে? দ্বিতীয় অফিসারটি সব কিছু নিয়ে হাপিশ হওয়ার আগেই সে সবাইকে সুদ্ধ এই জায়গাটাকেই উড়িয়ে দেবে। সবই যদি জ্বলে যায় তবে প্রমাণও থাকবে না, প্রমাণ করার লোকও নয়।

অধিরাজের মাথা ইটের আঘাতে ঝনঝন করছিল। কিন্তু সে দেখল পবিত্র এখান থেকে বেরিয়ে গেলেও ঝোপের মধ্যে আটকে গিয়েছে। বিশেষ করে ওই ক্যাকটাসগুলোকে এড়িয়ে এত অল্প সময়ে ওখান থেকে বেরোনো একেবারেই সহজ নয়। তার ওপর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে তার শার্ট, প্যান্ট আটকে যাচ্ছে কাঁটায়, ঝোপে। ওকে আরও একটু সময় দিতে হবে। আর কিছু না ভেবে সে দাঁতে দাঁত পিষে ফের লোকটাকে পাকড়াও করেছে। ওকে শ্বাস নেওয়ার সময়টুকু না দিয়েই একের পর এক পাঞ্চ আর কিক মেরে ফের সরিয়ে নিয়ে গেল কিছুটা তফাতে। গুলশন কিছু বোঝার আগেই ওর মুখে, বুকে র‍্যান্ডম অ্যাটাক এসে পড়ছে। সে দু-হাত মুখের কাছে তুলে নিয়ে বক্সারদের মতো নিজেকে সেভ করার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু অধিরাজ একেবারে রুদ্রমূর্তি ধরেছে। সে তাকে সামলে নেওয়ার সময়টুকুও দিচ্ছে না!

অধিরাজ তাকে ফিরে তাকাতে বারণ করেছিল। তবু দরজার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে পবিত্র করুণ, অসহায় চোখে তাকাল পেছন দিকে। অধিরাজের আক্রমণে বিধ্বস্ত বার্নিং শিখ কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েই টেবিলের ওপর থেকে একটা শিশি তড়িৎগতিতে নিয়ে তার ভেতরের সমস্ত তরল ছুড়ে দিল প্রতিপক্ষের মুখে। অধিরাজ এই অদ্ভুত আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না। সে চোখ বুঁজে ফেলে হাত দিয়ে মুখের তরলটাকে সাফ করার চেষ্টা করছে। লোকটা সেই ফাঁকেই ফের দৌড়ে ঢুকে গিয়েছে সেই অন্ধকার ঘরে! এবার তার পেছন পেছন অধিরাজও দৌড়োল। পবিত্র-র বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে। কী ছিল লিকুইডটা? অ্যাসিড নয়তো! ও ওই ঘরে দৌড়চ্ছে। বুঝতে পেরেছে কিছুতেই দেশলাই উদ্ধার করতে পারবে না। জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে কিছুতেই ওদিকে যেতে দেবে না। তাই উলটোদিকেই ছুটেছে। ঐ অন্ধকার ঘরেরই কোনো কোণে পড়ে আছে সেই মারাত্মক

লাইটার। ওটা যদি কোনোমতে ওর হাতে পড়ে...!

পবিত্র আর কিছু চিন্তা না করে সোজা ছুটল গাড়ির দিকে। বাড়ির সামনের ঝোপ, ঘাস, লতাপাতা এখনও তাকে বাধা দিচ্ছে, পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু সব বাধা পেরিয়েই সে নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল গাড়ির কাছে। উত্তেজনায়, উদ্বেগে তার হাত কাঁপছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এভিডেন্স ব্যাগে চটপট সব রেখে পবিত্র আবার দ্রুতবেগে পোড়োবাড়ির দিকে ফিরে গেল। তার বুকের ভেতরটা কাঁপছে। কে জানে, দু-জনের মধ্যে এখন কী হচ্ছে। বার্নিং শিখ কিছুতেই হারবে না, আর অধিরাজ মরে গেলেও তাকে ছাড়বে না। ওখানে শুধু পেট্রোলই নয়, স্পিরিট, টার্পেন্টাইনের মতো দাহ্য বস্তুও আছে। একবার যদি আগুন জ্বলে ওঠে, তবে সর্বনাশ হবে। অধিরাজ যদি একা লোকটাকে সামলাতে না পারে! হয়তো তার সাহায্যের প্রয়োজন। হয়তো পবিত্রকে এখনই দরকার...!

সে মাত্র কয়েক পা-ই এগোতে পেরেছিল। হঠাৎই তার চোখের সামনের অন্ধকারে নীলাভ আগুনের রশ্মি ঝলসে উঠল। পরক্ষণেই একটা প্রচণ্ড আওয়াজ। ত্রিভুবন যেন কেঁপে উঠেছে। একটা দুরন্ত আগুনের হলকা একরাশ জ্বালা উগরে দেয় ফাঁকা দরজা দিয়ে। পবিত্র ভয়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল সশব্দে খণ্ডহরের বাকি ছাতটাও হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছে। ভেঙে পড়ছে অবশিষ্ট দেওয়াল। ছাতহীন বাড়িটার মাথায় লাফিয়ে উঠেছে লেলিহান আগুনের লকলকে জিহ্বা। যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে বার্নিং শিখ। লাইটার সে পেয়েছে! আগুনও জ্বালিয়েছে। গ্যাস, পেট্রোল এবং অন্যান্য দাহ্য বস্তুও নিজেদের কাজ করেছে। অধিরাজ তবে...!

পবিত্র আচার্য-র দেহটা বুঝি অবশ হয়ে আসে। তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। সে জানত, এটাই হতে চলেছে। তবু মনে ক্ষীণ আশা ছিল। অধিরাজ বুঝি বার্নিং শিখকে পরাস্ত করতে পারে... অথবা কোনো দুর্ঘটনায় লাইটারটা নাও জ্বলতে পারে... কিংবা কোনো মিরাকল্... 1

তার চোখের সামনে হু হু করে জ্বলছে বহ্নিশিখা। সশব্দে পুড়ে যাচ্ছে আগাছা, ঝোপ-ঝাড়। তার পোড়া দুর্গন্ধ নাকে এসে লাগছে। আগুন সেই ঝোপ বেয়ে কিছুটা বাইরের দিকেও বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছুই যেন টের পাচ্ছে না পবিত্র। তার পায়ের ওপর দিয়ে হঠাৎ দ্রুতগামী কী যেন একটা চলে গেল। আগে হলে লাফিয়ে উঠত সে। অথচ এখন যেন অনুভূতই হল না। বরং গোখরোটা এখন তাকে কামড়ে দিলেই কৃতজ্ঞ থাকত। তার চোখের সামনে গোটা বাড়িটা দাউদাউ করে জ্বলছে, গোটা ধ্বংসস্তূপ খসে খসে পড়ছে, ও শুধু স্থির একটা পুতুলের মতো দেখছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে কোনোমতে ভেজা ও ভাঙা স্বরে উচ্চারণ করল, “রা-জা।”

পবিত্র-র সারা দেহ অবশ হয়ে আসে। সে আস্তে আস্তে পরাজিত মানুষের মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সেই জ্বলন্ত খণ্ডহরের সামনে। চোখের জলে যদি এই আগুন নেভানো যেত, তবে নিভিয়ে দিত। জীবনে এই প্রথম হাসিখুশি, চটুল ও চঞ্চল প্রকৃতির অফিসারের চোখ জলে ভরে এল। একটা প্রচণ্ড কান্না গোটা দেহকে ঝাঁকিয়ে উঠে আসছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে চেপে রাখার। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক চোখ মনের কথা শুনতেই রাজি নয়। বারবার প্রচণ্ড কান্নাকে প্রতিহত করছে, তবুও তাকে হারাতে পারছে না! শেষপর্যন্ত অসহ্য কষ্টে, অপরাধবোধে অশ্রুর কাছে হার মানল পবিত্র। ঘাস-মাটির ওপর একটা বিফল ঘুষি মেরে সে বোবাকান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নার ধাক্কায় লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপরেই। কিচ্ছু করার নেই। ওই বাড়ির ভেতরে যারা ছিল, তাদের বাঁচার কোনো চান্সই নেই। নিজেকে এসকেপিস্ট, ভীরু, কাপুরুষ বলে মনে হচ্ছিল তার। আজ যদি সেও অধিরাজকে সাপোর্ট দিত, তবে এমন কাণ্ড হত না। অথচ সে পালিয়ে এল। ক্লান্ত, রক্তাক্ত অধিরাজকে ওই রাক্ষসের সামনে একা ছেড়ে দিয়ে পবিত্র স্রেফ পালিয়ে এসেছে। কোনোদিন কেউ ক্ষমা করবে না তাকে। সে নিজেও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না।

মাটিতে মুখ গুঁজে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল পবিত্র। বারবার মাটিতে

ঘুষি মারতে মারতেই বলছিল, "রাজা!... রাজা!..হোয়াই? হোয়াই...।" তার দেহ ক্রমাগতই ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ততক্ষণে পূর্বাকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে। রক্তিম আগুনের ছ-টার সঙ্গে মিলে মিশে যাচ্ছে আকাশের রং। সূর্যোদয় হওয়ার সময় আসন্ন। তবু যেন এ রাত কাটল না। গোটা দুনিয়াটাই বুঝি চির অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে। সে পাগলের মতো শুধু মাটিতে মুষ্টিবদ্ধ হাত ও কপাল ঠুকতে ঠুকতে আর্ত হাহাকার করে বলছিল, "হোয়াই....রাজা, হোয়াই....ওঃ!"

তার এ শোকের সান্ত্বনা বুঝি প্রকৃতির কাছেও ছিল না। তাই উতলা হাওয়াও অকস্মাৎ থমকে গিয়েছে। একটু দূর থেকে ফের ভেসে এল সেই অলুক্ষুণে হরিধ্বনি, 'বলো হরি, হরিবোল! বলো হরি, হরিবোল!...' ওদিকে কোনো মৃতদেহ অগ্নিসংস্কারের পথে চলেছে। এদিকে জ্যান্ত মানুষগুলো জ্বলন্ত চিতায় ছারখার হয়ে গেল। আগুন যা ভয়াবহ রূপ ধরেছে, তাতে পোড়া হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না। পবিত্র-র সামনে যেন শুধু অন্ধকার... কেউ নেই... কিছু নেই...!

"কাঁদছ কেন? কে মরে গেল মামা?"

পবিত্র অসাড় হয়ে মাটির ওপর পড়েছিল। একটা অপ্রত্যাশিত ও পরিচিত ঠান্ডা স্বরের কৌতুকমাখা বাক্য শুনে তড়িদাহতের মতো মুখ তুলে তাকাল। সামনের দৃশ্যটা দেখে মনে হল, এবার সে সত্যিই মরে যাবে। তার সামনে জলজ্যান্ত, ছ-ফুট চার ইঞ্চির দীর্ঘদেহটাকে একটু ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং অধিরাজ। রক্তাক্ত, ক্লান্ত, একটু বুঝি টলমলও করছে। তবু নিঃসন্দেহে সশরীরে রক্তমাংসের অধিরাজ ব্যানার্জিই বটে! সে তার চিরপরিচিত ঠাট্টার সুরে বলল, "বার্নিং শিখের জন্য কান্নাকাটি করছ? চিন্তা নেই, ও ব্যাটা মরেনি। মিহির ভিরানির থেকেও ওর আয়ুর জোর বেশি...।"

কথাগুলো স্বাভাবিক, কিন্তু ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক। কেমন যেন নেশাজড়িত ভাবে কথাগুলো বলছিল সে। পবিত্র এক লাফে উঠে আনন্দের চোটে তাকে জড়িয়ে ধরতেই যাচ্ছিল, তার আগেই বাধা দিল, "এখন ভুলেও ছোঁবে না! দূরে থাকো।"

"রাজা!" পবিত্র আহত, "এটা আমি!"

"ওটা তুমি বলেই বলছি।" সে রীতিমতো টলছে, "ওই হারামজাদা পুরো ক্লোরোফর্মের শিশিটাই আমার মুখে ঢেলেছে। আমি তো অফ হবই, তুমিও না অফ হয়ে যাও! জানতাম, নিজের মিশন কমপ্লিট না করে ও কিছুতেই মরবে না। তাই ওকে চেজ করছিলাম... এস্কেপ রুট একমাত্র ও-ই জানত! যে অন্ধকার ঘরে আমরা ঢুকেছিলাম, ওটাকে ও কিচেন হিসাবে ব্যবহার করে। সেখানে একটা বিশাল জানলা ছিল... একদম ভোঁ ভাঁ। অ্যাজ ইউজুয়াল কোনো শিক নেই। একমাত্র ওটারই পাল্লা আছে। আগের বার বন্ধ ছিল বলে দেখতে পাইনি। লাইটারটা ও কপালগুণে পেয়ে গিয়ে নিজেকে সিকিওর করার জন্য যেই জানলাটা খুলল, আমিও এস্কেপরুট দেখতে পেলাম। ও জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে লাইটারটা জ্বালিয়ে যেই ভেতরে আগুন ধরাতে গেছে, তার আগেই আমিও ওই জানলা দিয়েই লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে কোনোমতে বেঁচেছি। তবে ব্যাটা এবারও পালিয়ে গেল...!"

বলতে-বলতেই অধিরাজ বেসামাল হয়ে ধড়াস করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পবিত্র দেখল সে আস্তে আস্তে জ্ঞান হারাচ্ছে। সারা মুখে এক বোতল ক্লোরোফর্ম ছুড়ে মারার ফল! ওই তরলটা তবে অ্যাসিড নয়, ক্লোরোফর্ম ছিল। সে তাড়াতাড়ি তাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতেই ক্লোরোফর্মের গন্ধটা পেল। ভগবানই জানে কতখানি তার সিস্টেমে গিয়েছে! ঢেলেছিল তো পুরোটাই। পবিত্র ব্যাকুলস্বরে বলল, "রাজা। সামলাও নিজেকে। কিচ্ছু হবে না।"

"এতক্ষণ ধরে কী করে সামলাচ্ছি তা শুধু আমিই জানি। অনেক কষ্টে এই অবধি হেঁটে এলাম... আর পারছি না।" অধিরাজ নির্জীব স্বরে বলে। ক্লোরোফর্মের প্রভাবে সে ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। কোনোমতে টেনে টেনে বলল, "বিলিভ মি, আমি নিজের হাত-পা কিচ্ছু ফিল করতে পারছি না। টেক মি টু বেবি মোস্তাফা। বার্নিং শিখ এখনও বেঁচে আছে... আমি

অফ হতে চাই না... কিছুতেই অফ হতে চাই না... টেক মি টু মিস্ মুখার্জি... প্লিজ!”

বলতে-বলতেই সে জ্ঞান হারিয়েছে। পবিত্র আর কথা না বাড়িয়ে তার রক্তাক্ত দেহটাকে সযত্নে তুলে নিয়ে গাড়ির ব্যাকসিটে সাবধানে শুইয়ে দিল। তারপর আর কোনো কথা না বাড়িয়ে এভিডেন্স ও বেহুঁশ অধিরাজকে নিয়ে রওনা দিল ফরেনসিক ল্যাবের দিকে। নষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। আর একটা দিনের সূত্রপাত ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। আজ অন্তিম দিন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আহেলি মুখার্জির কাছে পৌঁছোতেই হবে তাকে।

এতদিনে এই প্রথম বোধহয় অধিরাজ স্বেচ্ছায় আহেলির কাছেই যেতে চাইল। তাও সজ্ঞানে! তার দৃঢ় বিশ্বাস, মিস্ মুখার্জি ঠিক তাকে দাঁড় করিয়ে দেবেন।

*

(২২)

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ডায়েরি

শুনেছি, আলেকজান্ডার বলেছিলেন, "আমি সেই হাজার সিংহের দলকে ভয় পাই না, যাদের সেনাপতি একজন ভেড়া। কিন্তু আমি সেই হাজার ভেড়ার ফৌজকে ভয় পাই যার নেতৃত্ব একজন সিংহ দিচ্ছে!"

আমিও এখন ভয় পাচ্ছি। কারণ আমার সামনে একটা দল প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে যার সেনাপতি একজন সিংহ। এরকম লোহার মতো কঠিন নার্ভ, মনের জোর, লড়াইয়ে টিকে থাকার সাহস ও অসম্ভব বুদ্ধির সংমিশ্রণ জীবনে খুব কমই দেখেছি। আমার কোনো চাল, মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবই ওর ওপর কাজ করছে না! যতই নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করি, ঠিক চিনে নিচ্ছে। এমনকি আমার আসল নামটাও বের করে ফেলেছে। কমলার ছদ্মবেশে আমায় চেনা একরকম অসম্ভবই ছিল। কিন্তু কে জানত, ও আমার মুখ থেকে বেফাঁস কথাটা বের করে নেবে! এখন খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, বেয়ন্ত সিং ও জর্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালের সঙ্গে তুলনাটাও ও একদম ইচ্ছে করে দিয়েছিল। যাতে আমার খুন গরম হয়ে ওঠে আর আমি বেওকুফের মতো চেঁচিয়ে নিজের লোকেশনটা জানিয়ে দিই। কী অসম্ভব ধূর্ত লোক! কীভাবে আমার এই ডেরার কথা জানল, কখন জানল, কী করে এসে উপস্থিত হল রবজিই জানেন। এত চমকাবার পরেও খবরি নেটওয়ার্ক কাজ করে চলেছে, এত আতঙ্ক সৃষ্টির পরও ফরেনসিকে কেউ মজুত আছে—এ আমার কল্পনার বাইরে। নিজেকেই এখন অপদার্থ বলে মনে হচ্ছে। আমার অবিশ্বাসের জাল এত ঠুনকো ছিল যে সবটাই ছিঁড়ে ও বেরিয়ে আসতে পারল? আমার রহস্যময় প্ল্যানের 'কোহরা' ভেদ করে পি সি চৌধুরীর পরিবারকে বাঁচিয়ে নিল। এ কী করে সম্ভব? আমি কি এতটাই 'নিকম্মা!

এখন রীতিমতো নিজের মাথাই দেওয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করছে। কোন কুক্ষণে আমি পুলিশকে চিঠি লিখেছিলাম! তখন কে জানত যে বেছে বেছে এই অধিরাজ ব্যানার্জির 'বাস দুশমনি'-ই আমার কপালে নাচছে। জানা তো দূর, আমি বুঝতেও পারিনি যে ওরা এভাবে একদম নিশ্চুপে আমার ঘাঁটিতে এসে হাজির হবে। নেহাত কিচেনের জানলা দিয়ে বেরিয়ে কয়েক মিনিটের জন্য একটু শ্মশানের রাস্তায় 'টহল' মারতে গিয়েছিলাম। সেই ফাঁকেই ওরা ঢুকে পড়েছিল, তাই আমার সাড়াশব্দ পায়নি। ওদের খবরি বোধহয় সামনের দরজায় চোখ রেখেছিল, তাই পেছনের জানলা দিয়ে আমাকে বেরোতে দেখেনি। আমি ফিরে এসে দেখি, দুই অফিসার আমার গুপ্ত ঘাঁটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম বলে কী করব প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। চুপি চুপি জানলা দিয়ে গলে পালিয়ে গেলেই বোধহয় ভালো হত। কিন্তু আমি 'গধেড়া'র মতো অতিরিক্ত 'হিরোপন্তি' দেখাতে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়েছি, পালটা ভয়ও দেখিয়েছি। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। মাঝেমধ্যে অল্পবিস্তর রান্না কিংবা জল গরম করার জন্য গ্যাসের সিলিন্ডার দুটো রেখেছিলাম বলে কপালগুণে বেঁচেছি! নয়তো অতখানি ক্লোরোফর্ম ঢালার পরও সে 'বান্দা' এইসান চেজ করেছিল যে বার্নিং শিখের গল্প প্রায় আর একটু হলে শেষই হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয়নি। এখনও একটা আস্ত দিন আর রাত পড়ে রয়েছে। আজ রাত তিনটে অবধি আমার দেওয়া বাহাত্তর ঘণ্টার মেয়াদ অবশিষ্ট আছে। তার মধ্যে আমি বারবার ফিরে আসব। বারবার আক্রমণ করব! অবিকল যেমন ওরা করেছিল...।

এই গল্প শুরু হয়েছিল ৩১ অক্টোবরের বিকেল থেকে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গিয়ে এক তারিখের বিকেল হল, রাতও হল। তবু পরিস্থিতি পালটাল না। আমাদের জীবনে আর সূর্যোদয় হল না। বাহাত্তর ঘণ্টার এক লম্বা রাত! অন্তহীন... রক্তাক্ত। সেদিন ছাতে দাঁড়িয়ে আমি যেটুকু দেখেছিলাম, তারপর আর ওখানে দাঁড়াবার সাহস হয়নি। কীভাবে যে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে এসেছিলাম সে শুধু আমিই জানি। পা দুটো এমন কাঁপছিল যে মনে

হচ্ছিল, এখনই বুঝি পড়ে যাব। শেষপর্যন্ত দু-পায়ে নামতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, পা দুটোই বুঝি নেই। চার হাতে-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে কোনোমতে একতলায় এলাম। গোটা বাড়ি তখন অন্ধকার। দরজা জানলা সব বন্ধ। বাইরের আলো-বাতাস ঢোকা তো দূর, ঘরেও একবিন্দু আলো নেই। বেবে সব আলো নিভিয়ে দিয়ে বসে আছে। সেই অদ্ভুত অচেনা অন্ধকারে আমি কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভয় করছিল... ভীষণ ভয় করছিল....! মনে হচ্ছিল এটা আমার আজন্মপরিচিত সুখের ঘর নয়। একটা নির্জন দুনিয়ায়, আলোহীন কোনো বিশ্বে আমায় একা কেউ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আমার সবাই আছে, তবু কেউ নেই। এখানে ব্যথা লাগলে যদি কেঁদেও উঠি, তবু 'বেবে' ছুটে আসবে না। বাপু সস্নেহে ক্ষতে মলমের প্রলেপ লাগিয়ে দেবে না। ছোটো ছোটো দুই প্রা'জির কোলাহল কোথাও নেই। দিদির বিয়ের সানাই কোনোদিন বাজবে না-রোশনাই হবে না। এখানে শুধু অন্ধকার। শুধুই শীতল অন্ধকার!

আমার খুব ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে কেঁদে বেবেকে ডাকি। কিন্তু ওই 'অন্ধেরা' ঘরে বেবে যেন হারিয়েই গিয়েছে। শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম খুব মৃদুস্বরে একটা মেয়েলি কান্না। আমার বেবেকে চিরকালই খুব সাহসী বলে জানতাম। বাপু গল্প করেছিলেন, বেবে নাকি বিয়ের আগে একবার কোনো গুন্ডাকে লাঠি দিয়ে 'পিটাই' করেছিল। ওরকম একটা গুন্ডাকে স্রেফ লাঠি দিয়ে পেটাতে গেলে 'জিগ্রা' লাগে। আমার ইচ্ছে ছিল, বেবের মতো সাহসী হব। অথচ আমার সেই হিম্মতওয়ালি বেবেই কাঁদছিল, আর বলছিল, 'কিসিকো নেহি ছোড়নেওয়ালে উয়ো লোগ... উয়ো ফির আয়েঙ্গে... সব কো মারেঙ্গে।'

একটা আট বছরের শিশুর হৃদয়ে যে সাহসের শেষ উৎস ছিল, সেটাও বুঝি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একটা মানুষের জীবনে যে এত আতঙ্কও থাকতে পারে, তা জানা ছিল না। কানে আসছিল দিদির রিনিরিনে স্বর, "শুভ শুভ বোল বেবে.... কিচ্ছু হবে না। বাইরে সরতাজরা আছে তো!"

বাইরে তখন সরতাজরা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ছিল। যতই দরজা জানলা বন্ধ থাকুক, কলোনির অন্যান্য ব্লকের মানুষদের পরিত্রাহি চিৎকার সব ছাপিয়ে তখনও কানে আসছে। অর্থাৎ চক্রাকারে চলছে আক্রমণ। এই ব্লকে সুবিধা করতে পারেনি। কিন্তু পুরো মঙ্গলপুরীকে ওরা ঘিরে ধরে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এই একটি এলাকা শুধু বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো এখনও সুরক্ষিত পড়ে আছে। তবে ঐ আট বছরের শিশুও বুঝতে পেরেছিল, বেশিক্ষণ থাকবে না। আমাদেরও ওই একই পরিণতি হবে যা বাকিদের হতে দেখেছি। যতবার দৃশ্যগুলো মনে পড়ছিল, ততবার কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম। ছোটোবেলায় ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখলে মা বুকে জড়িয়ে ধরত, আশ্রয় দিত৷ আজ কেউ জড়িয়ে ধরার জন্য ছিল না। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়ে গিয়েছিলাম আমি! "গুরু। পুত্তর!"

বেবের কান্নামাখা গলার ডাক শুনে আমারও বুকের ভেতরে একটা অবুঝ কান্না দাপিয়ে মরল। মায়ের ছায়াশরীরটা ততক্ষণে চোখে পড়েছে। আমি সোজা দৌড়ে গিয়ে তাকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। ভয়ে, অদম্য আতঙ্কে তার বুকের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, "বেবে!... বেবে!"

বেবের নরম হাতটা আমার মাথার ওপরে পড়ল। কিন্তু এ সেই বরাভয় দেওয়ার হাত নয়। স্পষ্ট বুঝলাম, মায়ের হাতও আজ কাঁপছে। সেই স্পর্শে উষ্ণতা ছিল না, বরং ভয়মাখা শীতলতা ছিল। তার হৃৎস্পন্দনে একটুও অভয় ছিল না, বরং আতঙ্কের দ্রুতগামী লয় ছিল। মায়ের বাহুপাশেও এক সন্তান সেদিন আশ্রয় খুঁজে পায়নি। দুঃস্বপ্নে, আতঙ্কে যে স্নেহময়ী চিরকাল রক্ষা করেছে, আজ সে-ও বিপন্ন। ওই অন্ধকারেই আমরা কয়েকজন চুপ করে বসে রইলাম। বেবে, আমি, আমনপ্রীত, সরবজিত আর যস্যিদিদি। না, চুপ করেছিলাম বললে ভুল হয়। নিজেদের আপ্রাণ চুপ করাবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু চাপা কান্না আমাদের পেছন ছাড়ছিল না। সবাই সবাইকে চিনতে পারছিলাম, নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম, অথচ ঠিকমতো অনুভব করতে পারছিলাম না। ওদের কাউকে জীবিত মানুষ বলে মনেই হচ্ছিল না।

কতগুলো আত্মা যেন হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, "কেউ বাঁচবে না... কেউ না...!"

একটু পরেই ফের বাইরে অনেক উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। প্রথমে আমরা সকলেই আঁতকে উঠেছিলাম। ভাবলাম, ওরা আবার ফিরে এল বুঝি! আমার আর উঁকি মেরে দেখার সাহস ছিল না। বেবের বুকে মুখ লুকিয়ে ভাবছিলাম, যদি এই আশ্রয়টুকুই আমায় বাঁচায়। যদি মা নিজের বুকের মধ্যেই চিরদিনের জন্য আমায় লুকিয়ে রাখে.... "আরে, তোমরা ফিরে এলে? কাজ হয়েছে?"

বাইরে থেকে সরতাজের কণ্ঠ ভেসে এল, "গৌরীদিদি। তুমি কাঁদছ কেন? কী হল?"

গৌরী দিদির মুখে সব ঘটনা শোনা গেল। ওরা আহত মানুষগুলোকে নিয়ে, নভজ্যোতের দিদি আর পদ্মীভাবিকে বাঁচানোর জন্য অনেক আশায় হাসপাতালে গিয়েছিল। গুরু নানক হসপিটালেরই শরণাপন্ন হয়েছিল ওরা। গৌরী বিশ্বাসের মনে ভরসা ছিল, অন্তত যে হসপিটাল স্বয়ং গুরু নানকের নামে, সেখান থেকে হয়তো শিখদের শূন্য হাতে ফিরতে হবে না। তাছাড়া তিনি নিজেও ওই হসপিটালেরই কর্মচারী। তাই আস্থা ছিল। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে আশ্বাসও দিয়েছিল যে তারা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এসে জানাল সব বেড ভরতি, তাই পেশেন্টদের ভেতরে নিতে পারবে না। দু-জন দগ্ধ নারীকে যেন আপাতত বাইরেই মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। ভেতরে বেডের ব্যবস্থা হলে দু-জনকেই শিফট করা হবে।

এইটুকু আশ্বাস দিয়েই ডাক্তাররা চলে গেলেন। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল, কারোর দেখা নেই! কেউ ওদের শুশ্রুষা করতে এল না। পদ্মী কৌর 'জল জল' বলে গোঙাচ্ছিল। গৌরী তাড়াতাড়ি ভেতরে গেলেন একটু জলের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কেউ যেন তাঁকে দেখলই না। সবাই নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত! ডাক্তারদের খোঁজ নিতে গিয়ে জানলেন যে তাঁরা নাকি জরুরি মিটিং করছেন। এমনকি জুনিয়র ডাক্তাররাও নাকি নেই। এখন কেউ আসতে পারবেন না। জলের প্রসঙ্গ তুলতেই তাঁর সহকর্মীরা জানাল যে আপাতত হসপিটালের ট্যাঙ্ক ও জলের বোতল সব শূন্য।কিছুক্ষণ পরেই জল দেওয়া হবে।

কিন্তু সেই জল আর এল না। ফিরে এলেন না ডাক্তাররাও। তারা সবাই নাকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন। গৌরী যতবার ভেতরের মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছেন, প্রত্যেকবার একই উত্তর পেয়েছেন, "ডাক্তাররা খুব ব্যস্ত। যখন বেডের ব্যবস্থা হবে তখন পেশেন্টদের নিয়ে আসা হবে। অপেক্ষা করুন।"

তিনি নিরুপায় হয়ে বলেন, "থার্ড ডিগ্রি বার্ন কেস। এভাবে মাটিতে শুইয়ে রাখলে ওরা তো এমনিই মরে যাবে!"

যিনি বিষয়টা দেখছিলেন, তিনি আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, "বেড না থাকলে কী করব সিস্টার? আমি তো নিজেই বেড বানিয়ে অ্যালট করতে পারি না। আর বাইরের মেঝেতে পেশেন্টদের শুতে আপত্তি থাকলে হসপিটালের মেঝেতে শুইয়ে দিন। একই ব্যাপার।"

কথাটা শুনে আঁতকে ওঠেন গৌরীদিদি। পুড়ে যাওয়া পেশেন্ট মেঝেতে শোবে। ইনফেকশনেই তো শেষ হয়ে যাবে। এমনিতেই বাইরে মানুষগুলো যে পরিস্থিতিতে আছে, তাতে আর বেশিক্ষণ থাকলে এমনিই বাঁচবে না। বার্ন কেসের রোগীর পাশে একটু আগেও দুটো নোংরা কুকুর শুয়েছিল! সবাই মিলে কোনোমতে চেঁচিয়ে তাদের তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। ওদের চেঁচামেচি শুনে ইউনিফর্ম পরা এক ওয়ার্ডবয় গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল, "কী হল? চেঁচাচ্ছেন কেন আপনারা! এটা হসপিটাল। এখানে শোর-শরাবা করলে লোক ডেকে স্রেফ বাইরে বের করে দেব।"

"ও জি।" গুরশরণ তাওজি বোঝানোর চেষ্টা করেন, "এই দেখুন ...কুত্তা শুয়ে আছে পেশেন্টের পাশে!"

"তো?" লোকটি নিস্পৃহমুখে বলে, "কুকুরই তো শুয়ে আছে। বাঘ তো নয় যে পেশেন্টকে খেয়ে ফেলবে!"

জবাব শুনে সকলেই স্তম্ভিত। কে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। গোমড়ামুখো ওয়ার্ডবয় রীতিমতো 'চেতাবনি' দিয়ে গেল, ফের হল্লা করলে পেশেন্টদের তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দেবে। ওয়ার্ডবয়টি গৌরীদিদির পরিচিত। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন,

"গুড্ডুভাই, দেখো না একবার ডাক্তাররা কোথায়! অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল!"

গুড্ডু নামক ব্যক্তিটি গৌরীদিদির দিকে এবার একটু নরম দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বলল, "আচ্ছা দিদি। খুঁজে দেখছি।"

সেই খোঁজ আর শেষ হল না। দু-জন দগ্ধ, অর্ধমৃত নারী হসপিটালের বাইরেই প্রায় তিনঘণ্টা মাটিতে শুয়ে কাতরাতে কাতরাতে অবশেষে একসময় নীরব হয়ে গেল।

সেটাই হওয়ার ছিল। শেষমুহূর্তে একফোঁটা জলও ওদের কপালে জোটেনি। ডাক্তাররা আর ফিরে আসেননি, তবে কুকুরগুলো বারবার ফিরে আসছিল। বাপু, তাওজিরা চেঁচাতেও পারছিলেন না। হাত-পা চালিয়ে যতবার ওদের তাড়িয়েছেন, ঠিক কিছুক্ষণ পরই প্রাণীগুলো ফের এসে হাজির। হয়তো এটাই ওদের আরাম করার স্থায়ী জায়গা। আজ সেখানে কতগুলো মানুষ শুয়ে আছে দেখে ওদেরও বুঝি কৌতূহলের অন্ত ছিল না। পুড়ে যাওয়া মানুষগুলোকে শুঁকে শুঁকে দেখে কী বোঝার চেষ্টা করছিল কে জানে। ডাক্তাররা তো ছুঁয়েও দেখল না। তবু কেউ তো দেখল, হলই বা মনুষ্যেতর প্রাণী।

যন্ত্রণাকাতর মুমূর্ষুদের কষ্ট কমাতে ডাক্তার না এলেও শেষপর্যন্ত যমরাজই এলেন। ওদের ছটফটানি, গোঙানি আর জ্বালা দেখে বোধহয় তাঁরও দয়া হল। মানুষদুটো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেই অদ্ভুতভাবে কুকুরগুলোও স্থানত্যাগ করল। পবনজ্যোত আর নভজ্যোতের কান্না থামছিল না। পবনজ্যোত পত্নীর মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে পাগলের মতো বিলাপ করছিল। গৌরীদিদি বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। তিনি হয়তো আবার হাসপাতালের মধ্যে যেতেন, তার আগেই এবার তাড়াতাড়ি ওয়ার্ডবয়রা বেরিয়ে এল। কোনো কথা না বলে মৃতদেহ দুটোকে তুলে নিয়ে চলে গেল। ওরা বুঝি জানত যে মেয়ে দুটো কিছুতেই বাঁচবে না। ওদের মরার অপেক্ষাতেই ছিল। বেড খালি না থাকলেও মর্গে নিশ্চয়ই জায়গা আছে! সেখানে ফেলে রাখতে সমস্যা নেই। সমস্যা শুধু চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

বাইরের সমস্ত সংলাপই আমার কানে এসে ঢুকছিল। ওই বয়েসে অত কিছু আমার আদৌ বোঝার কথা নয়। অথচ আশ্চর্য। সব বুঝতে পারছিলাম। পবনজ্যোতের কলজে-ছেঁড়া কান্না আর বাপুর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা— সবই শুনছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, এখন বাপু পবনকে 'দিলাসা' দিচ্ছেন। কিন্তু এরপর কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? মঙ্গলপুরীর চতুর্দিকে শিখ বসতি আর বিশেষ বাকি নেই। আমাদের মতো দু-চারটে এলাকা ছাড়া গোটাটাই প্রায় একটু একটু করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। দুষ্কৃতীরা একবার উদয় হচ্ছে, মারছে, চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আবার দ্বিগুণ হিংস্র মূর্তিতে ফিরে আসছে, আবার মারছে কাটছে। আজ সারাদিন ধরে এই-ই চলেছে। চতুর্দিকে লাশের স্তূপ। কে কাকে সামলায়, কে কার দুঃখ ভাগ করে নেয়? সবাই শেষ! মৃতদেহ বহন করার জন্য, মুখাগ্নি করার জন্যও কেউ বেঁচে নেই।

আমরা জানতাম, এখানেও তাই হবে। 'ভেড়িয়ার' দল একবার ব্যর্থ হয়ে চলে গেলেও আবার আসবে। বাইরের কথাবার্তাতেও সেই আশঙ্কাই বারবার উঠে আসছিল। চাপা গুঞ্জনের মধ্যে ফুটে উঠছিল একটাই আতঙ্ক, "উয়ো লোগ ফির আয়েঙ্গে। এবার হয়তো আরও বেশি শক্তি সংগ্রহ করে।"

কথাটা বেবের কানেও গিয়েছিল। ফুঁপিয়ে উঠে আমায় আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। ওর অন্য বাহুতে মুখ লুকিয়ে বসে আছে আমনপ্রীত ও সরবজিত। ওরা আওয়াজ করে কাঁদছিল না। কিন্তু দু-জনেরই কাঁপুনি আমি এখান থেকেই টের পাচ্ছিলাম। পাছে কান্নার আওয়াজ কেউ শুনে ফেলে, সেই ভয়ে ওরা আওয়াজ করে কাঁদতেও পারছিল না। কিন্তু পৈশাচিক আতঙ্ক কাঁপুনির মাধ্যমে সবাইকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

ততক্ষণে বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। দেখতে দেখতে আরও একটা রাত এসে

পড়ল। কিন্তু আমাদের তাতে কিছুই আসে যায় না। কখন আলো ফুটছে, কখন রাত নামছে কিছুই বুঝতে পারছি না। বদ্ধ ঘরের ভেতরে বসে দরদর করে ঘামছি। একটা সামান্য আওয়াজ পেলেও চমকে উঠে ভাবছি, ওই এল...। ওই বুঝি এল ওরা! শ্বাস নিতেও ভয় করছে। যদি কোনো শত্রু শুনে ফেলে। যেটুকু বাতাস বুকে না ভরলেই নয় ঠিক ততটাই মেপে মেপে নিচ্ছি। যদি জেনে ফেলে এখানে শিখ পরিবাররা এখনও জিন্দা আছে। নিজেদের লুকিয়ে রাখার প্রবল ইচ্ছে মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু কোথায় লুকোব? যে বাড়িটাকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ভাবতাম, সেটাই কখন আগুনে জ্বলে উঠবে সেই ভয়েই মরছি। এই ঘর, পরিবার ছাড়া আর কোনো আশ্রয় তো আমার নেই। বাপুর মুখে শুনেছিলাম, এই দেশ আমার, এই মাটি আমার, এই দেশের সব মানুষ আমার আত্মীয়। অথচ এক মুহূর্তে সব কেমন যেন উলটোপালটা হয়ে গেল। হঠাৎ করেই বুঝলাম, এই দেশ, মাটি—কোনোটাই আর আমার নেই। আচমকা কোথা থেকে যেন একদল লোক এসে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, তোমরা এই দেশের কেউ নও! এখানে তোমাদের অস্তিত্বই থাকতে দেব না আমরা। একদিন আগেও আমি জানতাম, ওরাই আমার আপন! আর আজ প্রত্যেকটা পরিচিত মুখই যেন ভয়াবহ এক রাক্ষসের মুখোশে ঢাকা!

“আয়েঙ্গে তো দেখ লেঙ্গে।” সরতাজের তেজি কণ্ঠ ভেসে এল, “আমরা এখনও মরিনি। যতক্ষণ না মরছি, লড়ে যাব। তারপর যা হবে দেখা যাবে।”

আস্তে আস্তে অনেক রাত হল। বাপু কিংবা তাওজি, কেউই একবারের জন্যও ঘরে এলেন না। বুঝলাম, ওরা সরতাজের সঙ্গে বাইরে কলোনি পাহারা দিচ্ছেন। একা ওরাই নন, বাকিরাও সবাই কেউ লাঠি, কেউ তরোয়াল হাতে নিয়ে অতন্দ্র প্রহরায় কায়েম আছে। ওদের অস্থির পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বিশেষ করে সরতাজের ভারি বুট জুতো এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার খট্‌ খট্‌ আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়।

সেই রাতে কারোর বাড়িতে ‘চুলা-চৌকা’ হয়নি। কোনো ঘরের উনুন জ্বলেনি। শান্তিময় রাতের বরাদ্দ রুটি-জলটুকুর কথাও ভুলে গিয়েছিল সবাই। আমারও সেসব কিছু মনে ছিল না। যে দৃশ্য দেখেছি, তারপর ক্ষুধা-তৃষ্ণাবোধ না থাকারই কথা। 'জিন্দা লাশ' হয়ে আমরা সবাই বসেছিলাম। টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা একটু একটু সরছিল, আর ভাবছিলাম, কখন আবার মৃত্যু এসে হানা দেবে। সবার মাথাতেই এক চিন্তা। কী হবে! তার চেয়েও কঠিন প্রশ্ন—কখন হবে!

ঠিক তখনই একটা চাপা কান্নার শব্দ পেয়ে চমকে উঠি। এতক্ষণ তো চারদিকে শুধু নীরবতাই ছিল। কারোর চোখে ঘুম নেই, যে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠবে। তবে হঠাৎ এমন নীচুস্বরে কাঁদে কে! আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুনতে পেলাম যসমিত দিদির ফিশফিশে গলা, “সরবজিত! কাঁদছিস কেন?”

সরবজিত কোনো উত্তর না দিয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নাকে গলাধঃকরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও তার ‘সিকিয়াঁ’ শোনা যাচ্ছিল। ততক্ষণে রাত বেশ গভীর হয়েছে। চতুর্দিকে নৈঃশব্দ। নিজের কলোনিটাকে নিজেই চিনতে পারছি না। এখানে অনেক রাত অবধি গাল-গল্প, হাসি-ঠাট্টা, শোর শরাবা চলতেই থাকে। এমনিতেই সর্দারদের বদনাম আছে, তারা নাকি সবসময়ই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একসা করে। তার ওপর অল্পবয়েসী ছেলে মেয়েদের কলরব, শিশুদের কান্নার আওয়াজ, সব মিলিয়ে জমজমাট থাকে। অথচ আজ বড়োদের আওয়াজ তো দূর, একটা ছোট্ট বাচ্চার হাসি বা কান্না, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ছোট্ট শিশুরা একদিনেই কি বড়ো হয়ে গেল? না তাদের মায়েরা বাচ্চাগুলোর মুখে কাপড় গুঁজে রেখেছে, যাতে কান্না না শোনা যায়৷ কোথাও কেউ কোনো আওয়াজ করলেই সবাই ফিশফিশ করে বলে উঠছে, “চুপ। চুপ।” প্রত্যেকের শ্রবণেন্দ্রিয় উৎকর্ণ হয়ে আছে, ওই বুঝি শোনা যায় আততায়ীদের চিৎকার। ওই বুঝি ধুপধাপ করে একদল মানুষ ছুটে আসছে। ওই বুঝি...!

সরবজিতের কান্না আরও একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বেবে আর যসমিত দিদি দু-জনেই তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসা করার পর সে কান্নাভেজা গলায়

কাতর স্বরে বলল, “ভুখ লেগেছে।”

বেবে আর দিদি নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। সরবজিত পা'জির দোষ নেই। ছোটোবেলা থেকেই সে খিদে সহ্য করতে পারে না। সর্দারের বাচ্চার খাওয়ার পরিমাণ একটু বেশিই হবে এতে আর আশ্চর্য কী। আর সে বড়ো ছেলে বলে মায়ের একটু বেশিই আদরের। আমনপ্রীত বা আমার খাওয়া নিয়ে বিশেষ কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সরবজিতের খাওয়ার পরিমাণ চিরকালই একটু বেশি। চারটে রুটি ছাড়া তার কোনোদিন পেট ভরত না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার খিদে পায়। কখনও বাদাম খায়, কখনও ভুট্টা। যখনই দেখো, সবসময়ই তার মুখ চলছে। কিছু না কিছু খেয়েই চলেছে। অথচ বাড়ির কারোর মনেই পড়েনি যে আজ অনেকক্ষণ ধরে ভোজনরসিক ছেলেটা অভুক্ত! এই অবস্থায় সে খাবার চাইতেও পারছে না, ওদিকে খিদের জ্বালাও সহ্য করতে পারছে না। শেষপর্যন্ত আর থাকতে না পেরে খুনখুন করে কেঁদেই ফেলল।

আমার কপালের ওপর টপ্ করে একবিন্দু গরম জল পড়ল। বেবের চোখের জল। সন্তানের ক্ষুধা দেখে অসহায় মায়ের চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। হয়তো ওর মনে পড়ে গিয়েছিল, শুধু সরবজিত নয়, তার অন্য সন্তানেরাও খিদের আগুনে জ্বলছে। অথচ তাদের মুখের সামনে দুটো রুটি ধরার অবস্থাও নেই। এখন আতঙ্কে ঘরে কেউ আলোই জ্বালাচ্ছে না, ‘চুলা’ তো দূর। আলো দেখলে শিকারীরা টের পাবে। উনুনের ধোঁয়া তো আবার দূর থেকেও দেখা যায়। স্টোভের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। ওরা এখন সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা মঙ্গলপুরীকে থেকে থেকেই ঘিরে ধরছে। যদি বুঝতে পারে, এত কিছু হয়ে যাওয়ার পরেও সর্দাররা এখন 'খানা পাকাচ্ছে' তাহলে ছেড়ে কথা বলবে না! নির্ঘাৎ বলবে, “ইন্দিরা গান্ধীকে মেরে তোরা এখন ডাল-রুটি পাকাচ্ছিস! মার সালে কো....!” মারপিট করার শুধু অজুহাতই তো চাই ওদের। সেটা আলোকসজ্জা, মিঠাই থেকে শুরু করে রুটি পর্যন্ত সব হতে পারে। যসমিত দিদি কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর শেষে উঠে রসোইয়ের দিকে গেল। আমরা শুধু তার লঘু পায়ের আওয়াজের শব্দ পেলাম। আর কোনো আওয়াজ নেই। এমনকি বাসনপত্রের টুংটাং, ঠংঠংও নয়। কিছুক্ষণ পরই দিদি ফিরে এল। আমাদের প্রত্যেকের হাতে ক্ষীরা আর গাজর ধরিয়ে দিয়ে বলল, “এখন এটাই খেয়ে নে। সকালে যদি সব ঠিকঠাক থাকে তবে কিছু বানিয়ে দেব।”

এতক্ষণ ভয়ে, আশঙ্কায়, বিবিধ চিন্তায় টের পাইনি যে আমাদেরও পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। রাত কত প্রহর কে জানে! তবে নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের মধ্যে থেকে মনে হচ্ছিল, হয়তো মধ্যরাত হয়ে গিয়েছে। সরবজিত আর কোনো কথা না বাড়িয়ে গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করল। শসা বা গাজর কামড়ে খেতে গেলে একটা আওয়াজ হবেই। আজ পর্যন্ত এই দুটো জিনিস কেউ নিঃশব্দে খেতে পেরেছে বলে জানা নেই। কিন্তু খাওয়ার শব্দটুকুও করা যাবে না। বেবে চোখ মুছে বলল, “পুত্তর! আস্তে খা। আওয়াজ করিস না...।”

মা শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল। আচমকাই গভীর রাতের সব ‘সন্নাটা' চিরে দিয়ে একটা হিংস্র চিৎকার ভেসে এল। শুনলাম, অনেকগুলো মানুষ চেঁচিয়ে বলছে, “ব্যাটারা এখানে লুকিয়ে বসে আছে...! সালারা দল বানাচ্ছে। মারো... মারো...!” সঙ্গে তাদের পায়ের সেই ধপাধপ ভয়াবহ আওয়াজ। মনে হচ্ছিল, গোটা কলোনিই বুঝি সেই শব্দে কাঁপছে। সরবজিত সবে এক কামড় শসা মুখে দিয়েছিল। ওর হাত থেকে শসাটা ধপ্ করে নীচে খসে পড়ে গেল। আমরা সবাই যেন ফের বরফের পুতুল হয়ে গিয়েছি। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শুনলাম ফের সেই রণ-হুঙ্কার। এদিক থেকে শিখরা চেঁচিয়ে উঠল, “বোলে সো নিহাল... সৎ শ্রী অকাল...।”

তারপর কী ঘটল তা উকি মেরে দেখার সাহস বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না। বেবে ওখানে বসে কাঁদছে আর আমাদের বুকে জড়িয়ে ধরে চাপা স্বরে ‘ওয়াহেগুরুর' নাম নিচ্ছে। দিদি একদম চুপ। বাইরে তখন লাঠির ঠাঁইঠাঁই শব্দ। তরোয়ালের ঝনৎকার। মৃত্যুর তাণ্ডব চলছে। মাঝেমধ্যেই নানারকমের ধাতব অস্ত্রের সংঘর্ষের জোরালো শাণিত শব্দ কানে ও মাথায়

জ্বালা ধরাচ্ছে। তার সঙ্গে কারোর না কারোর আর্তনাদ ভেসেই আসছে। কে আহত হল, বাঁচল না মরল, শত্রু না মিত্র, কিছুই জানার উপায় নেই। শুধু একরাশ মানুষের চিৎকার, গোঙানি অথবা অস্ত্রের আওয়াজ। তার সঙ্গে টুকরো টুকরো ক্রুদ্ধ গালিগালাজও ভেসে আসছে।

আমনপ্রীত দু-হাতে কান চেপে শুয়ে পড়েছে। সে আর নিতে পারছে না। সরবজিতকে দেখে মনে হচ্ছে ও আর বেঁচে নেই। বেবে বিড়বিড় করে কী সব যেন বলে চলেছে। আর দিদিও মূর্তির মতো চুপ করে বসে আছে। আমার নিজের বাহ্যিক অবস্থা কী হয়েছিল তা সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু আমিও অনড় হয়ে প্রতিটা মুহূর্ত গুণছিলাম। যারা বাইরে এখনও লড়ছে, শত্রুদের বাধা দিচ্ছে, তারা যদি হেরে যায় তবে যে কোনো মুহূর্তে এই বদ্ধ ঘরটা অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠতে পারে। অথবা নিতান্তই পলকা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আসতে পারে আততায়ীরা। তারপর...!

এর থেকে বোধহয় নরকের যন্ত্রণাও অনেক ভালো ছিল। অন্তত সেখানে মানুষ জানতে পারে তার সঙ্গে ঠিক কী হতে চলেছে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল স্বচক্ষে দেখা দৃশ্যগুলো! সেই জ্বলন্ত টায়ার, তরোয়ালের কোপে টুকরো টুকরো করে ফেলা, গায়ে সাদা পাউডার ঢেলে দেওয়া, কেরোসিন-পেট্রোল-ডিজেল ঢেলে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া, এককোপে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দেওয়া...! আমি ভাবছিলাম, এর মধ্যে ঠিক কোটা আমার সঙ্গে হবে। কোটা এদের মধ্যে একটু কম যন্ত্রণাদায়ক? যত ভাবছিলাম, ততই নিজের দেহে একের পর এক সেইসব মৃত্যুগুলোর যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। কখনও মনে হচ্ছিল, একটা জ্বলন্ত টায়ার আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে... হাত নাড়তে পারছি না... টায়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমার গোটা দেহ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে...। কখনও অনুভব করছিলাম কেউ বুঝি তীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্র দিয়ে আমায় কুপিয়েই চলেছে। কর্তার সিং-এর মতো আপাদমস্তক ওই কালান্তক সফেদ পাউডারে পুড়ে যাচ্ছি, চোখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছি না। যারা মরেছে, তারা যে-কোনো একটা মৃত্যু মরেছে। আমি যে একসঙ্গে সবক-টা 'মওত'-ই মরছিলাম। এখন মনে হয়, মৃত্যু বুঝি পোষাকের মতো আমার ওপর একের পর এক ট্রায়াল দিয়েই চলেছিল।

জানি না, বাকিদের মনের মধ্যে কী চলছিল। তবে আমার মনে হচ্ছিল, অসহ্য এই নিরাপত্তাহীনতার চেয়ে বোধহয় তাড়াতাড়ি মরে যাওয়াই ভালো। জানি না, বাইরে বাপু এখনও বেঁচে আছেন কিনা! তাওজি লড়ছেন, না তাঁর সব লড়াই শেষ হয়েছে তাও জানা নেই। সরতাজের রাইফেলের গর্জন শুনতে পাচ্ছি না। নভজ্যোত, পবনজ্যোতেরও আওয়াজ নেই। অনিশ্চয়তার প্রতিটা মুহূর্তের চেয়ে তখন মরণের মুহূর্তটা অনেক বেশি অভিপ্রেত হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। সত্যি বলছি, ওই মুহূর্তে ভাবছিলাম, আমি এখনই হৃৎপিণ্ডটা ফেটে গিয়ে মরে যাই না কেন! অন্তত সেটা তো নিশ্চিত!

কতক্ষণ চলেছিল এই যুদ্ধ জানি না। অন্ধকারে সময়ের আন্দাজ করা মুশকিল। তবে আমার মনে হয়, বোধহয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের চেয়েও লম্বা ছিল এই লড়াই। দিন, মাস, বছর নয়, বহু শতাব্দী চলে যাচ্ছিল। যখন হৃৎপিণ্ডটা প্রায় গলায় এসে ঠেকেছে তখনই শুনতে পেলাম সরতাজের বিশ্বস্ত রাইফেলের আওয়াজ। পরমুহূর্তেই দুড়দাড় করে পদধ্বনি। না, আওয়াজটা এখন বিপরীতদিকে। অজস্র মানুষ এখন কলোনির এই গলি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দৌড়চ্ছে। শত্রু পিছু হটছে! ওরা পালাচ্ছে! পালিয়ে যাচ্ছে। ওঃ রবজি। ওয়াহে গুরুজি দা খালসা, ওয়াহেগু রুজি দি ফতেহ!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত আওয়াজ থেমে গেল। দাঙ্গাইরা আবার ব্যর্থ হয়েছে। তবে কিছুক্ষণ পরেই বাইরে একাধিক নারীকণ্ঠের কান্না শুনে বুঝলাম, এবারের মতো পালিয়ে গেলেও এ পক্ষের কয়েকটা লাশ ফেলে দিতে পেরেছে তারা। আমার মনের ভেতরটা অসাড় হয়ে আসছিল। আর কতক্ষণ চলবে এসব? ওরা ফিরবে, কয়েকজনকে মারবে, চলে যাবে। আবার ফিরবে... আবার মারবে...! এভাবে কতক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব? আর যতবার ওই ভিড়

ফিরে আসবে, ততোবার বেশি সংখ্যক লোক, বেশি অস্ত্র নিয়ে আসবে। আমাদের ঘরে তো হাতে গোণা কিছু অস্ত্রই ভরসা। আর এক এক করে মানুষও মরছে। কতক্ষণ লড়বে? বাপু, তাওজি ঠিক আছেন তো? এখনও তো ওঁদের কোনো সাড়া নেই। শুধু একের পর এক নারীকণ্ঠের হাহাকার, চুড়ি ভাঙার শব্দ, শোকার্ত কান্নার আওয়াজই ভেসে আসছে। সেই শোকবিলাপের প্রাবল্য বলে দিল এবার আমাদের অনেক পরিচিত মানুষেরই মৃত্যু হয়েছে। কে জানে, তাদের মধ্যে কারা কারা আছে। বাপু, তাওজি, সরতাজ, নভজ্যোত, ওরা কোথায়? কারোর সাড়া নেই কেন?

আমি মনে মনে এসব কথা ভাবছিলামই, এমন সময়ে দরজায় টোকা পড়ল। শুনতে পেলাম সরতাজের গলা, "পরজাইজি। দরজা খোলো একবার!"

সরতাজের কণ্ঠস্বর প্রাণে কিছুটা আরাম এনে দিল। যাক, অন্তত ও ঠিক আছে! আবার পরক্ষণেই আঁতকেও উঠলাম। দরজা খুলতে বলছে কেন? তবে কি বাইরে কোনো দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে! কে গেল! বাপু? তাওজি?...

বেবের মনেও বোধহয় তেমনই কোনো আশঙ্কা কাজ করেছিল। কোনোমতে কাঁপতে কাঁপতে দরজার দিকে ছুটল। ওর পা এমন কাঁপছিল যে দেখে মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি পড়ে যাবে। তবু অনেক কষ্টে শেষপর্যন্ত দরজা খুলে সামনে তাকাল। আমরাও গেলাম পেছন পেছন। মনের ভেতর ভয় তো ছিলই, কিন্তু তাও গিয়ে হাজির হলাম। সামনের দৃশ্যটা দেখে কলিজায় একটু 'ঠন্ডক্'এল ঠিকই। সামনেই বাপু দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে তাওজি। ওঁরা সবাই 'সলামত' আছেন। তবে সবাই অমন বিষণ্ণ চোখে আমাদের দিকে দেখছেন কেন? সরতাজের চোখেও অব্যক্ত বেদনা। সে একটু ভারি গলায় বলল, "পরজাইজি, ছুটকিকে একবার ডাকো...!"

দিদিকে সে চিরকালই 'ছুটকি'বলে ডাকে। যসমিত দিদি সরতাজের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। দুরন্ত আবেগে সে কাঁপছে। চতুর্দিকের ভিড় দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "কী হৈয়া....!"

সরতাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে দাঁড়ায়। গোটা ভিড়টাও আস্তে আস্তে সরে গিয়ে সামনের দৃশ্যটা প্রকট করে দিল। তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। একটা রক্তিম অথচ বিষণ্ণ আলো এসে পড়ছিল চতুর্দিকে। তার মধ্যেই দেখা গেল, আরও বেশ কিছু মৃতদেহের সঙ্গে নভজ্যোতও টানটান হয়ে পড়ে আছে মাটির ওপরে। তার গলার শিরা কেটে গিয়ে রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। পেট পুরো ফালাফালা। চোখ খোলা কিন্তু তাতে কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই। ওর বাবার, দাদা পবনজ্যোতের উথালিপাথালি কান্না প্রাণে এসে ধাক্কা মারছে। কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির তিনজন মেয়েকে হারিয়েছে ওরা। এবার কনিষ্ঠ পুত্র, ছোটো ভাইও চলে গেল! চলে গেল যস্যিদিদির হবু ঘরওয়ালা! বিয়ের আগেই বিধবা হয়ে গেল দিদি...!

অথচ আশ্চর্য। দিদির মুখ অদ্ভুত নিরুত্তাপ। সে যেন স্থির মূর্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ নভজ্যোতের দেহটা দেখল। তারপর ক্লান্তভঙ্গিতে সরতাজের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, "উয়ো জিন্দা হ্যায়? ইয়া মর গয়া?"

দিদির এই অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ায় উপস্থিত সবার সঙ্গে যেন সরতাজও ঘাবড়ে গেল। তার কাজলকালো সুন্দর দুই চোখে অসম্ভব বেদনা। সে উত্তরে শুধু মাথা নীচু করল। এ প্রশ্নের কোনো জবাব হয় না। দিদি তার নীরবতার ভাষা কতদূর বুঝল কে জানে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে নভজ্যোতের লাশটার কাছে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল তার মাথার কাছে। উপস্থিত সকলেই একটা প্রবল শোকের ধাক্কা, বেসামাল কান্নার অপেক্ষা করছে। আমরাও কেঁদে ফেলেছিলাম। জিজু যতই গুরুগম্ভীর হোক কিংবা অঙ্ক ধরুক, তার কোমল স্বভাব, দিদির প্রতি মুগ্ধতা, বেবে-বাপুর সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক, দুষ্টু-মিষ্টি খুনসুটি, সব কিছু নিয়ে ভীষণ আপন ছিল। কিছুদিন পরে সে এ বাড়িরও পুত্রসম হতে যাচ্ছিল। আমরা সবাই তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। অথচ আজ সেই মানুষটাই নেই। কেন নেই—এ প্রশ্নেরও কোনো যথাযথ উত্তর নেই! ওই পড়ে আছে এক শান্ত, ভদ্র, নিরীহ প্রেমিক মানুষের

দেহ! কোন্ অপরাধে? কেউ জানে না!

আমাদের কান্না যতই উচ্ছ্বসিত হোক না কেন, দিদির মোমের মতো অচ্ছাভ মুখ ভীষণ শান্ত ও প্রতিক্রিয়াহীন। সে আলতো করে তার সদ্য মেহেন্দি পরা রাঙা হাতদুটো দিয়ে নভজ্যোতের খোলা চোখদুটো আস্তে করে বন্ধ করে দিল। নভজ্যোতের দেহের রক্তের ধারা তার হাতের মেহেন্দিতে এসে মিশেছে। সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। শুধু তার হিমশীতল মৃত্যুকঠিন মুখ শেষবারের মতো স্পর্শ করল সে। তারপর উদাসীনভঙ্গিতে ফের উঠে এসে আস্তে আস্তে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। অন্যান্যদের মতো হাতের চুড়ি ভাঙল না, কাঁদল না, বিলাপ-হাহাকার করল না। নিশ্চুপে উঠে চলে গেল সেখান থেকে!

তখন আমরা কেউই দিদির এই অদ্ভুত ব্যবহারের পেছনের কারণ বুঝিনি। বুঝেছিলাম অনেক পরে। শুধু আমরা কেন, ওই মুহূর্তে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মানুষও বোঝেনি। হয়তো অন্য কোনো সময়ে এই জাতীয় নিরুত্তাপ ব্যবহারের জন্য দিদির সমালোচনা হত, কেউ না কেউ কথা শোনাতই। তবে তখন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার মতো মানসিকতা কারোরই ছিল না। সবার চোখেই তখন একটাই প্রশ্ন—এরপর কী। আর কতবার যুদ্ধ করতে হবে? আর কতগুলো লাশই-বা পড়বে।

সেদিনের প্রথম সূর্যালোক কতগুলো নিথর মরদেহের ওপর পড়েছিল। সদ্যবিধবাদের কান্নায় চকিত হয়ে গিয়েছিল ভোরের শান্ত পরিবেশ। কিন্তু তখনও আমরা জানতাম না, এই অভিশপ্ত দু-তারিখ আমাদের আরও অনেক কিছুই দেখাবে। হয়তো বা আগের থেকেও ভয়াবহ কিছু। আমি ভেবেছিলাম, সবকিছু দেখে ফেলেছি, বুঝে ফেলেছি। কিন্তু তখনও জানা ছিল না, আসলে কিছুই দেখিনি। যেটুকু দেখেছি সেটা নেহাতই 'শুরুয়াত'।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ল। ভয়ার্ত মানুষগুলোর ক্লান্ত, শুকনো মুখের দিকে তাকানো যায় না। আমনপ্রীত নিজের দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে নীরবে কেঁদেই চলেছে। যসমিত দিদি চুপ করে বসে আছে পাথরের মতো। কোনো কথা বলছে না, নড়াচড়াও করছে না। সরবজিত 'ভুখ-প্যায়াস' কিছুর নামই করছে না। শুধু থেকে থেকে বেবেকে কাতরস্বরে বলছে, "চল্ না বেবে, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। ওরা সবাইকে মেরে ফেলছে। আমাদেরও মেরে ফেলবে। তার আগেই চল্ চলে যাই।"

সরবজিতের কথা যুক্তিগ্রাহ্য। কিন্তু ও জানত না যে যমের বাড়ি ছাড়া আমাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা ছিল না। দিল্লিতে একটা জায়গাও তখন ছিল না যেটা শিখদের জন্য সুরক্ষিত। যারা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তাদের কখনও তাড়া করে, কখনও ট্রেন বা বাস থেকে হিঁচড়ে টেনে নামিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল দাঙ্গাইরা। এমনকি একজন হিন্দু একটি শিখ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছে জানতে পেরে আততায়ীরা চড়াও হয়েছিল তাদের ওপরে। শিখ পরিবারটিকে তো মেরেইছে, সঙ্গে হিন্দু আশ্রয়দাতাকেও কেটে টুকরো টুকরো করে রক্তাক্ত তরোয়াল উচিয়ে পৈশাচিক উল্লাস করেছে। পরে জানতে পেরেছি, গোটা দিল্লিতে শুধুমাত্র পাঁচটা এফ.আই.আর. লেখা হয়েছিল! অতগুলো লুট, খুন, ধর্ষণের ফলাফল মাত্র পাঁচটা এফ.আই.আর.! তাও মাত্র একলাইনের। অমুক সময়ে, 'ফলানা' জায়গায় ভিড় এসে অতগুলো লোককে খুন করেছে। ব্যস্, এইটুকুই। এর ওপরে কী তদন্তই বা হওয়া সম্ভব? কাকেই বা ধরপাকড় করবে আইন? ভিড়ের কোনো মুখ নেই, নাম নেই। নামগুলো প্রত্যক্ষদর্শীরা গড়গড়িয়ে বলেও দিয়েছিল। অথচ এফ.আই.আর.-এ তার কোনো উল্লেখই নেই। বাঃ রে "কানুন'।

আইন-কানুনের রক্ষকদের ঘুম ভাঙল আরও অনেক পরে। তখন মঙ্গলপুরীর শিখ কলোনির প্রায় সমস্ত ব্লকেই আগুন জ্বলে গিয়েছে। কাল অবধিও আশেপাশের ব্লকে যে ক-টা পরিবার বেঁচে ছিল, সকাল হতে-না হতেই ভিড় এসে তাদেরও কেটে, জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। আমাদের ব্লকে সরতাজ, বাপুসহ পুরুষদের দলটা তখনও অক্লান্তভাবে পাহারা দিয়ে চলেছে। শুনতে পাচ্ছে আশপাশ থেকেই তীব্র চিৎকার, মরণ-আর্তনাদ ভেসে আসছে। দেখতে পাচ্ছে সর্বগ্রাসী আগুন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উগরে দিচ্ছে। বাতাসে শুধুই রক্তের

গন্ধ। সঙ্গে পোড়া মাংস আর কেরোসিনের কটু বদবুর জ্বালায় চোখ জ্বলছে, নিঃশ্বাস নেওয়া দায় হয়ে উঠেছে। বুঝতেও পারছে যে ওরাও মরবে। তবু শেষ অবলম্বনের মতো লাঠি, তরোয়াল, কৃপাণ, কাটারি আঁকড়ে ধরে অপেক্ষা করছে আবার একটা আক্রমণের। এর শেষ কোথায়, কেউ জানে না। তবু লড়াই ছাড়বে না। দাঙ্গাইরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে যে এই ব্লকের নাছোড়বান্দা লোকগুলোও হাতে অস্ত্র নিয়ে বসে আছে। তাই এখনও এদিকে আসছে না, শুধু আশেপাশের নিরীহ পরিবারগুলোকে মেরে বেড়াচ্ছে। আর আমাদের বুকের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে বিষম মৃত্যুভয়ের শ্বাসরোধ করা ভার!

তখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুপুর বারোটা। একত্রিশ তারিখ ও এক তারিখের বিভীষিকার সাক্ষী মানুষগুলো সব বিধ্বস্ত, ক্ষুধার্ত ও হতক্লান্ত। মাথার ওপরে সূর্যদেবও আগুন ছড়াতে ব্যস্ত। মেয়েদের কান্নাকাটি তখন থেমে গিয়েছে। একটা মানুষ আর কতক্ষণই বা কাঁদতে পারে। চোখের জলও একসময়ে শুকিয়ে যায়। বিনিদ্র, কালি পড়া চোখগুলো নির্বাক দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়েই আছে এখন। এই একটি ব্লক ছাড়া গোটা কলোনিই নিশ্চুপ, নিথর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কেউ দেখলে বলবে না যে এখানে কখনও জনবসতি ছিল! ঐ ছোট্ট সঙ্কীর্ণ গলি কোথাও লাল রক্তে ভেসে গিয়েছে, কোথাও বা শুধু কালো ছাই আর হাড়গোড়ের স্তূপ! একটাও মানুষ নেই! মানুষ তো দূর, একটা কুকুর, বিড়ালও নেই আশেপাশে। তারাও বুঝে গিয়েছে, শিখদের সঙ্গে থাকলে মরতে হবে।

সেই সঙ্কীর্ণ রক্তাক্ত রাস্তাই ভরদুপুরে হঠাৎ ভারি বুটের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল। দলের লোকেরা সবাই ফের অস্ত্রশস্ত্র হাতে তৈরি হল আরও একটা লড়াইয়ের জন্য। সবার ক্লান্ত দেহ যেন মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজনায় টানটান। ওই আবার আসছে...! আরও জোরদার যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আসছে..! আমি ঘরের ভেতর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। বুকের ভেতরটা ফের আকুলিবিকুলি করছিল। আর থাকতে না পেরে সবার অলক্ষ্যে ঘরের খিড়কিটা একটুখানি খুলে উঁকি মেরে বাইরের দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা করছিলাম। আবার সেই খুনিরা এসে উপস্থিত....?

না! এবার নৃশংস খুনি নয়, খাঁকি উর্দি চোখে পড়ল। দিল্লি পুলিশ! ওদের দেখে আশ্বস্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আটবছরের শিশুটিরও ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত লাগল। কাল ওদের কাছেই সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন বাপুরা! ওরা সাহায্য করেনি। ওদের মতে তো দাঙ্গাই হচ্ছিল না। একটা গোটা দিন মানুষগুলো দলে দলে কাটা পড়ল, আগুনে জ্বলল, চেঁচিয়ে গেল। গোটা দিল্লিতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল মৃত্যুপথযাত্রীদের অন্তিম-আর্তনাদ। তখনও ওদের ঘুম ভাঙেনি। আস্ত একটা রক্তাক্ত দিন গেল, ভয়াবহ রাত গেল, রক্তাক্ত ভোর এল, তবুও পুলিশ সিনেই আসেনি। তবে হঠাৎ এখন এসে উপস্থিত কেন? একটা সিস্টেমের জেগে উঠতে এত সময় লাগে? হাজার হাজার মানুষ শূলে চড়ার পর এখন ওদের মনে হয়েছে যে আইনি হস্তক্ষেপ দরকার? কিন্তু সাহায্য করবে কাকে? কেউ তো বাকিই নেই। কালান্তক একত্রিশ তারিখ ও এক তারিখেই দিল্লির প্রায় সব শিখ পরিবার শেষ।

বুটের আওয়াজ শুনে সরতাজ ফের রাইফেল তুলে ধরেছিল। কিন্তু পুলিশের উর্দি দেখেই বন্দুকটা নামিয়ে নিয়েছে। সে হাতের ইশারায় বাকিদেরও নিরস্ত করল। উর্দিপরা যে মানুষগুলো এলেন, তাঁরা সাধারণ পুলিশ বা দারোগাদের থেকে অনেকটাই আলাদা। দেখেই বোঝা যায় ওঁরা দিল্লি পুলিশের 'আলা অর'। চুনোপুঁটি কনস্টেবল নয়, আই.পি.এস.! আমি এবার মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। আই.পি.এস.-রা এসেছেন মানে এতক্ষণে হয়তো আইন-কানুনের কৃপাদৃষ্টি আমাদের ওপর পড়ল। এবার বুঝি আতঙ্কের প্রহর শেষ হল। ওঁরা নিশ্চয়ই আমাদের সুরক্ষা দিতে এসেছেন। যিনি ওদের মধ্যে সবচেয়ে 'বড়া অফসর' তিনি সরতাজের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।

খুব মৃদুস্বরেই বললেন, "ক্যাপ্টেন সরতাজ সিং?"

সরতাজ ঘর্মাক্ত কপাল মুছে নিয়ে বলল, "জি।"

ভদ্রলোক করমর্দনের জন্য হাত এগিয়ে দিলেন, "ভূপেন্দ্র দত্তা, ডেপুটি কমিশনার অব

পুলিশ।”

সে তাঁর বাড়িয়ে দেওয়া হাত স্পর্শ করে একটু অভিযোগের সুরেই বলল, “আপনারা এতক্ষণে এলেন স্যার? আমরা কাল লোকাল থানায় গিয়ে কোনো হেল্প পাইনি। দারোগাসাব তো আমাদের ভাগিয়েই দিলেন। বললেন, এখানে নাকি কোনো দাঙ্গা হচ্ছে না। সবাই নাকি শান্তিতে আছে। আপনিই একবার তাকিয়ে দেখুন আমরা ঠিক কেমন শান্তিতে আছি। কাল থেকে আজ পর্যন্ত দাঙ্গাইরা বারবার আমাদের ওপর অ্যাটাক করেছে ও করছে। অনেকগুলো মানুষ মরেও গেছে তাদের আক্রমণে। লাশগুলোর 'ক্রিয়া-করম' এখনও করতে পারিনি আমরা। কিন্তু লোকাল পুলিশ আমাদের কোনোরকম সাহায্যই করেনি, প্রোটেকশন দেওয়া তো দূর। আমাদের এফ.আই.আর.-ও নেয়নি।”

“তাই?”

কথাটা বলে আই.পি.এস. দত্তা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাঁর পেছনের উর্দিধারীদের দিকে তাকালেন। তাদের মধ্যে একজন নিজেকে তখন লুকোনোর চেষ্টা করছিল। সম্ভবত ইনিই সেই বিতর্কিত দারোগাসাহেব। তিনি গম্ভীরস্বরে বললেন, “পান্ডে! এসব কী শুনছি? কী বলছেন ওঁরা? কাল ওঁরা তোমার কাছে এসেছিলেন অথচ তুমি ওদের কমপ্লেইন নাওনি?”

“স্যার...।” পান্ডে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, “তখনও আমাদের কাছে কোনোরকম খবর ছিল না। অন্যান্য জায়গায় ছোটখাটো 'হিংসা' হয়েছে শুনেছি। কিন্তু এদিকে তখনও কিছু হয়নি।”

“কিছু হয়নি? হোয়াট কিছু হয়নি?” ডিসিপি গর্জন করে উঠলেন, “কিছুই যে হয়নি সে তো আসার সময়েই দেখতে পেলাম! কলোনির একটা বাড়িও আস্ত নেই। জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়েছে সব। গলিতে পা রাখা যাচ্ছে না। লাশে লাশে ছয়লাপ। এখানে কারোর হাত, ওখানে কারোর পা, এখানে 'আঁত', ওখানে 'গুর্দা'। এটাই কি তোমার “কিছু হয়নি?”

পান্ডে এবার ঢোঁক গিলল, “স্যার, আপনি তো জানেন, 'মব'কে আটকানো একরকম অসম্ভব। তার ওপর ইন্দিরাজির মৃত্যুর পর সবাই খেপে আছে। ওরা সব হাজারে হাজারে আসছে। আমরা হাতে গোণা! কাকে ধরব? কী করব? কিছু করতে গেলে ওরা পুলিশকে ধরেই মেরে দিচ্ছে।”

“উর্দি আর মাইনের টাকাটা কি তোমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য দেওয়া হয়? আরে আর কিছু না পারো প্রোটেকশন দাও। 'সুলা' করিয়ে দাও৷ এভাবে কীভাবে চলবে? আমাদেরও তো কিছু দায়িত্ব আছে নাকি? তোমাদের এইসব ইডিয়টিক কাজকর্মের উত্তর আমাদের দিতে হয়। যত্তসব নালায়ক নিকম্মার দল। থোড়া তো শরম করো!” দত্তাসাহেব বকাঝকার কোটা কমপ্লিট করে, পান্ডেকে অগ্নিদৃষ্টিতে ঝলসে দিয়ে এবার উপস্থিত ভিড়ের দিকে তাকালেন, “দেখুন, পুলিশের এই অপদার্থতার জন্য আমি নিজে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমাদের আরও আগে আসা উচিত ছিল ও আপনাদের প্রোটেকশন দেওয়া কর্তব্য ছিল। আপনারা অনেক কিছু সহ্য করেছেন। এখন আপনাদের আর কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে পুলিশবাহিনী আছে। তারা সবাইকে প্রোটেকশন দেবে। তবে আমার মনে হয়, হিংসার বদলে হিংসা করাটাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওরা স্রেফ কিছু রেগে থাকা মানুষ, যারা ভুল বুঝে এসব কাজ করছে। আপনারা চাইলে আমরা 'সুলা' করিয়ে দিতে পারি। কথাবার্তা বলে মিটমাট করে নিন না।”

সরতাজ এবার শান্ত স্বরেই জানায়, “স্যার, আমরা কেউ হিংসা চাই না। এখানে সবাই খেটে খাওয়া শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমরা সবাই শান্তি চাই। মিটমাট করতেই তো চাইছিলাম। ওদের শুরুতেই বলেছিলাম। কিন্তু ওরা কেউ কথাই শুনছে না। যাকে পারছে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, কেটেকুটে একসা করছে কিংবা সফেদ পাউডার ফেলে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সেলফ ডিফেন্সে আমরাও 'পলট্ ওয়ার' করতে বাধ্য হয়েছি।”

তিনি অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করলেন, “সেলফ ডিফেন্সে আক্রমণ করাটা অবশ্য ক্রাইমের পর্যায়ে পড়ে না। তবে ক্যাপ্টেন সিং, আপনার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আছে যে

আপনি বেশ কয়েকজনের ওপর গুলি চালিয়েছেন। আপনার কপালগুণে অবশ্য তারা কেউ মরেনি।”

সরতাজ এবার ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হেসে ফেলল, “ও! তবে এই শান্তিপ্রস্তাব ওদের পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন আপনি। যাদের কথা বলছেন, তারা যে এখনও বেঁচে আছে সেটা আমার কপালগুণে নয় স্যার। আমার শ্যুটিং স্কিলের গুণে। গুলি করে মারতে চাইলে কপালও ওদের বাঁচাতে পারত না। আমি আর্মিম্যান। ‘শ্যুট টু কিল' কাকে বলে তা ভালোভাবেই জানি। তাই সবকটা গুলি বুঝেই চালিয়েছি। আত্মরক্ষায় চালাতে বাধ্য হয়েছি। আপনি কি আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন?”

“না, তা নয়। আপনি ভুল বুঝছেন।” দত্তাসাহেব খুব নম্রস্বরেই বললেন, “জাস্ট জানকারি দিচ্ছি। এই বোল্ট অ্যাকশন রাইফেলটা আপনার নিজের? লাইসেন্স আছে?”

“হ্যাঁ। এটা আমার। লাইসেন্সডও বটে।” সে জানাল, “আপনি প্লিজ নিজের বক্তব্যটা পরিষ্কার করে বলুন ডিসিপি সাব। ঠিক কী বলতে চাইছেন? আমরা শান্তি চাই। আপনারা যেমন বলছেন তেমন সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির মিটমাটও করে নিতে চাই। অযথা নিজেদের মধ্যেই মারপিট-হাঙ্গামা চাই না। এইটুকু বলতে পারি, আপনারা যদি ‘সুলা’ করিয়ে দিতে চান তবে আমার নিজের গ্রেফতারিতে কোনো আপত্তি নেই। কথা দিচ্ছি, এই বোল্ট অ্যাকশন রাইফেলও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আপনারা সেন্ট্রালের অর্ডার দেখান, আমি নিজেই নিজেকে আর রাইফেলটাকে আপনাদের ‘হাওয়ালে’করে দেব। কিন্তু খামোখা আর একটা ‘মাসুম জান’ও যেন না যায়।”

ডিসিপি মাথা নাড়লেন, “আপনাকে অ্যারেস্ট করার অর্ডার এখনও সেন্ট্রাল দেয়নি। আমাদেরও তেমন ইচ্ছে নেই। তবে হ্যাঁ, আপনার হাতিয়ারটা আমরা অবশ্যই বাজেয়াপ্ত করব। সেটা অবশ্য অন্য কারণে। শুধু আপনারই নয়, সবার হাতিয়ারই আমাদের হেফাজতে নিতে হবে। নয়তো উভয়পক্ষে রফা করা সম্ভব নয়।”

এতক্ষণ সরতাজ আর ভূপেন্দ্র দত্তার মধ্যেই কথা হচ্ছিল। এবার বাপু মাঝখানে ঢুকে পড়লেন, “কেন সাব? আমাদের কাছে হাতিয়ার থাকলে ব্যাপারটা মিটবে না কেন? এমনিতেই সমস্ত শিখের ঘরে আর কিছু না থাক কৃপাণ তো থাকবেই। কিন্তু অস্ত্র থাকলেও আমরা কোনোদিন তা প্রয়োগ করিনি। এতবছর ধরে ঘরে কৃপাণ, তরোয়াল পড়ে আছে, কোনোদিন শুনেছেন যে খুনোখুনি করেছি? তবে আজ কীসের আপত্তি?”

“সর্দারজি, আপনি বুঝছেন না।” তিনি শান্তভাবেই উত্তর দেন, “আপনাদের অস্ত্রের দরকার কী? আমরা তো এখনই পুলিশ পাহারা বসিয়ে দিয়ে যাব। যেখানে স্বয়ং দিল্লি পুলিশ আপনাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে, সেখানে তো আপনাদের ‘ঔজার’ ব্যবহার করার প্রয়োজনই নেই। কেউ আক্রমণ করতে এলে পুলিশই তাকে ঠেকাবে। তার ওপর একটা কথা ভাবুন। বেয়ন্ত সিং আর সতবন্ত সিং যা করেছে, তাতে পাবলিকের খেপে যাওয়ারই কথা। ওরা যদি দেখে আপনারাও হাতিয়ার নিয়ে ঘুরছেন, তবে ভুল বোঝাবুঝি আরও বাড়বে। আপনারা সন্ধি প্রস্তাব দিতে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে ‘নিহত্তা’ যাওয়াই নিয়ম। তরোয়াল নিয়ে কেউ সন্ধি করতে যায় না। বরং ‘সুলা’র আগে হাতিয়ার ফেলে দেওয়াই পরম্পরা। ওদের হাতেও যাতে কোনো অস্ত্র না থাকে সেটাও আমরা দেখব। পুলিশ প্রোটেকশন তো রইলই। কেউ আপনাদের ‘বাল বাঁকা ও করতে পারবে না। আমার গ্যারান্টি।”

সরতাজ আর বাপু দৃষ্টি বিনিময় করল। ভদ্রলোকের কথায় কিছুটা হলেও যুক্তি আছে। যদি সামনাসামনি বসে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তার চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কী হতে পারে? যারা এমনিতেই ভুল বুঝে বসে আছে, তাদের হাতিয়ার দেখিয়ে আরও উত্তেজিত করার কোনো মানেও হয় না। তাছাড়া খোদ ডিসিপি সাহেব যেখানে নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে রাজি, সেখানে সত্যিই অস্ত্রের আর প্রয়োজনীয়তাও নেই।

কিন্তু মনের মধ্যে কোথাও একটা দ্বিধা তখনও ছিল। সরতাজ সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চায়, “আপনার আসল প্রস্তাবটা কী?

তিনি সেই নম্রসুরেই বললেন, "দেখুন, আমাদের সঙ্গে বড়ো বড়ো নেতাদের পার্সোনাল কানেকশন থাকে। সজ্জনকুমার বা জগদীশ টাইটলার সাবও আমার কাছের মানুষ। আপনারা ডাইরেক্ট ওঁদের সঙ্গেই আলোচনা করুন না। সজ্জনকুমার বা জগদীশ স্যারদের প্রিয় নেত্রীর এরকম মর্মান্তিক অ্যাসাসিনেশন হয়েছে বলে ওঁরা উত্তেজিত হয়ে আছেন। কিন্তু কেউই মানুষ খারাপ নন। আপনারা যদি ওঁদের সঙ্গে আমনে-সামনে ডিসকাস করেন, সমস্যাটা মিটে যাবে বলেই আমার ধারণা। আফটার অল, আপনারা তো কেউ ইন্দিরাজিকে খুন করেননি। আমি একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করছি, আপনারা চলুন। কথা বলে সবটাই শান্তিতে মিটিয়ে নিন। নয়তো ওরা আপনাদের কাটতে আসছে, আপনারা ওদের ঠেকাতে মারধোর করছেন, এই আক্রমণ, পালটা আক্রমণে শুধু ভুল বোঝাবুঝি আর ভায়োলেন্সই বাড়ছে। ওদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়বে, কতক্ষণ ঠেকাতে পারবেন? তার চেয়ে শান্তিপ্রস্তাব দেওয়া ভালো নয় কি?"

সরতাজ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। ওর চোখে একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত দৃষ্টি। কী করবে বুঝতে পারছে না। হাতের হাতিয়ার ফেলে দেওয়া আদৌ নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ওদিকে সঙ্গী সাথীদের মুখের দিকে তাকিয়েও বুঝল, তারাও এখন ক্লান্ত। এরা কেউ পেশাদার খুনি বা সৈনিক নয়। ওরা সব নুন আনতে পান্তা ফুরোনো গরীব নিরীহ মানুষ। এতক্ষণ যে টিকে আছে এই অনেক। ওদের চোখের দৃষ্টি, মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট কেউ যুদ্ধ চায় না, যে কোনো মূল্যে শান্তি চায়।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "ঠিক আছে। আমরা শান্তি প্রস্তাবেই রাজি। বলুন, কী করব।" "আগে হাতিয়ারগুলো দিয়ে দিন।" ডিসিপি বললেন, "আপনাদের দায়িত্ব এখন থেকে আমাদের।"

সরতাজ বিনাবাক্যব্যয়ে নিজের কৃপাণ আর রাইফেল ওঁর হাতে তুলে দিল। তার দেখাদেখি সকলেই নিজেদের হাতিয়ারগুলো সমর্পণ করল পুলিশের কাছে। আমি তখন ভীষণ শান্তি পেয়েছিলাম। অবশেষে যুদ্ধ শেষ! আর কারোর লাশ পড়বে না, আর কেউ আগুনে জ্বলবে না, কেউ তরোয়ালের ধারে খণ্ড খণ্ড হবে না। এই হিংস্র রক্তাক্ত অধ্যায় অবশেষে সমাপ্ত হল। আজ রাতে আমি বেবের কোলে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। যা ক্ষতি হয়েছে, আঘাত লেগেছে তা হয়তো কখনোই পুরোপুরি সারবে না। তবু আমার পরিবার তো বেঁচে থাকবে!

ভীষণ ক্লান্তি ও আকস্মিক প্রশান্তিতে আমার ঘুম পাচ্ছিল। তবু চুপচাপ সব দেখছিলাম আর শুনছিলাম। সরতাজ ডিসিপি সাবকে জিজ্ঞাসা করল, "আমরা কথা বলব কী করে ওদের সঙ্গে? ওরা কি এখানে আসবেন?"

ভূপেন্দ্র দত্তা হাসলেন, "ওঁরা সব বড়ো বড়ো নেতা মন্ত্রী। আপনাদেরই ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"বড়ো বড়ো নেতা মন্ত্রীরা আমাদের বাড়িতে বা অফিসে ঢুকতে দেবেন?" সরতাজের মুখে ব্যঙ্গবঙ্কিম হাসি, "ওঁরা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করেন?"

"আমরা আছি কী করতে?" তিনি বললেন, "কথা যখন দিয়েছি যে সব ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেব, তখন আমরাই দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের নিয়ে যাব ওঁদের কাছে। কিন্তু সবাই মিলে তো যাওয়া যাবে না। আপনাদের তরফ থেকে মাত্র তিন-চারজনকেই নিয়ে যেতে পারি। ক্যাপ্টেন সিং, আপনি চলুন। সঙ্গে যাদের নেবেন নিয়ে নিন।"

সরতাজ এবার মহাসমস্যায় পড়েছে। সে ফৌজি। যুদ্ধ করতে জানে। যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বও দিতে জানে কিন্তু তেমন বাক্পটু নয়। কথার মারপ্যাঁচ সে বোঝে না। সন্ধিপ্রস্তাব তাদেরই নিয়ে যাওয়া উচিত যারা কথা বলতে জানে ও রাজনীতি বোঝে। বাপু তার সমস্যা বুঝতে পেরে বললেন, "চল্, আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি। আর কেউ যাবে?"

"না!"

বাপুর কথা শুনে সকলেই এ-ওর দিকে তাকাচ্ছিল। আমাদের আর এক প্রতিবেশী

নারায়ণ সিং কিছু বলতেই যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একটা নারীকণ্ঠের তীব্র প্রতিবাদ। আমরা সবিস্ময়ে দেখলাম, আমার দিদি যমিত কৌর, যে একটু আগেই বাহ্যজ্ঞানহীনের মতো পুতুল হয়ে বসেছিল সে এবার সবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চেঁচিয়ে বলল, "সরতাজ যাবে না। ও কোত্থাও যাবে না। তোমরা যাও। কিন্তু ওকে কেউ নিয়ে যাবে না।"

তার এই প্রতিক্রিয়া দেখে সকলেই স্তম্ভিত! একটু আগেই ওর হবু বরের মৃত্যু হয়েছে। অথচ তার জন্য কোনো শোক-তাপ নেই। এখনও নভজ্যোতের রক্ত তার মেহেন্দিরাঙা হাতে লেগে আছে। তা সত্ত্বেও সে সবার সামনে এসে সরতাজের জন্য দরবার করছে। আমরা সবাই অবাক। এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে স্বয়ং সরতাজও বিস্মিত সে শুধু অবাক হয়ে বলল, "ছুটকি!"

আর কেউ কিছু বোঝার আগেই দিদি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে সরতাজকে! সবেগে বক্ষলগ্না হয়ে দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছে তার বলশালী দেহটাকে। কাঁধের ওপর মাথা রেখে উন্মাদের মতো কেঁদে বলল, "তুই যাবি না! কোথাও যাবি না। সরতাজ .... তোকে আমার দিব্যি...! তুই আমার চোখের বাইরে যাবি না...!"

সবার মধ্যে এবার অল্প হলেও 'কানা ফুসফুসি' শুরু হল। এ কী! যে মেয়ের মরদ একটু আগেই মরেছে, সে অন্য একজন পুরুষকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে! এ কী অনাসৃষ্টি!! এমনকি আমরাও ভাবছিলাম, যস্যিদিদির হল কী? এরকম প্রকাশ্যে সরতাজকে জাপ্টে ধরেছে কেন? হলই-বা 'দাদা'র মতো। কিন্তু নিজের দাদা তো নয়। তাও এভাবে সবার সামনে। বাপু, তাওজি, বেবে সবাই দাঁড়িয়ে আছেন...!

"ছুটকি!" সরতাজ সস্নেহে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল, "আমরা 'সুলা' করতে যাচ্ছি। যুদ্ধ করতে নয়। তুই শান্তি চাস্ না? আর কত লোক মরবে বল্? বেঁচে থাকতে চাস্ না?"

"বাঁচতে চাই না আমি।" দিদি সর্বসমক্ষে চিৎকার করে ওঠে, "আমি তোকে চাই। জিন্দা। আর মরতে হলে তোর সঙ্গেই মরব। কিন্তু তুই আমায় ছেড়ে কোথাও যাবি না... কোথাও না...!"

গোটা কলোনি যেন কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠলাম আমরাও। শোকে-তাপে দিদির মাথাটাই কি গেল? না শরম-হায়া সব গিয়েছে। ও কী বলছে তা আদৌ জানে? আজ পর্যন্ত আমরা জেনে এসেছি নভজ্যোতের সঙ্গে দিদির শাদি হবে। ওদের দু-জনের মধ্যে প্রেম আছে। সরতাজের সঙ্গে দিদির খুব কমই কথাবার্তার আদান-প্রদান দেখেছি। বরং ওর সামনাসামনি পড়লে দিদি যেন একটু লজ্জা পেত, গুটিয়ে যেত। কখনো-কখনো সরতাজ ওর বিনুনি টেনেও বলেছে, "ছুটকি, বিয়েও করছিস তাও আমারই বাড়ির সামনে! হায় হায়, বোন-জিজার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার, খাতির পাওয়ার সুযোগও হল না। জানলায় উঁকি মারলেই দেখা হয়ে যাবে।" দিদির গাল দুটো তখন আপেলের মতো লাল হয়ে যেত। অত লজ্জা বোধহয় ও নভজ্যোতের কথাতেও পেত না। চোখ দুটো অবনত করে বলত, "ধুৎ। তার চেয়ে বল্ না দূরে পাঠিয়ে দিতে পারলেই বাঁচিস?"

"ভূত-পেত্নী যতদূরে থাকে ততই মঙ্গল।"

সে একটু হেসে কথাটা ছুড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। এমনিতেই সরতাজ অল্প কথার মানুষ। সে কলোনির সবার সঙ্গেই সদ্ভাব রেখে চলে, বাচ্চাদের সঙ্গে খুনসুটি করে, বড়োদের মান্য করে, কিন্তু সবকিছুই একটা সীমারেখার মধ্যে রেখে। নিজের চতুর্পাশে একটা অদৃশ্য গন্ডী টেনে রেখেছে, যেটাকে ডিঙিয়ে কেউই তার খুব কাছে যেতে পারেনি। আমি জানতাম, শুধু বাচ্চারা নয়, অনেক মেয়েও সরতাজকে পছন্দ করে। ওর ঐ লম্বা চেহারা, চওড়া কাঁধধ-বুক, গটগটিয়ে চলে যাওয়ার উদ্ধত ভঙ্গি, টানা টানা দুটো সুন্দর কালো চোখ, সর্বোপরি ব্যক্তিত্ব এই কলোনির অনেক মেয়েকেই আকৃষ্ট করে। তারা হাবেভাবে প্রকাশ করলেও বেশি কাছে যেতে পারে না। কারণ সরতাজ কাউকেই নিজের অত কাছে আসতেই দেয়নি। তার মাথায় অল্প বয়েস থেকেই দেশপ্রেম এমন ভর করেছে যে অন্য কোনো প্রেমের ইশারা ওর কাছে পৌঁছোতেই পারেনি। সে প্রেমিকার বাহুপাশে থাকার চেয়ে

বেয়নেট নিয়ে সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালোবাসে।

দিদি ওর থেকে বয়েসে অনেকটাই ছোট। বাপুকে ও পাজি বলে, বেবেকে 'পরজাইজি।'নিয়মমতো দিদি ওর ভাইঝি হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তাই চিরকাল ছোটো বোনের মতোই দেখেছে। এর অন্যথা কখনোই হয়নি। অথচ নিমেষে আজ সব সম্পর্কের রসায়ন উলটে গেল। সরতাজ নিজেই বুঝতে পারছিল না কী বলবে। সে অপ্রস্তুত। তাকে কিছু বলতে না দিয়েই বাপু দিদিকে টেনে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "ঘরে যা যস্যি। আমাদের যেতে হবে।"

বলতে বলতেই বেবের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন তিনি। দিদি তবু কিছুতেই সরতাজকে ছাড়বে না। সে পাগলের মতো চিৎকার করছে আর বলছে, "তুই যাবি না... তুই কোথাও যাবি না। রব্ দি কসম, আমায় ছেড়ে যাস্ না সরতাজ

বেবে আর তাইজি তাকে ওখান থেকে একরকম কোনোমতে টেনে হিঁচড়েই নিয়ে চলে গেল। আমি চুপ করে দেখছিলাম দিদির অসহায় কান্না। নিজের মানুষটার জন্যও যা সে করেনি, তা একটি অন্য মানুষের জন্য লজ্জা, ঘেন্নার মাথা খেয়ে করল। নভজ্যোতকে কখনও সে এমন ব্যাকুল হয়ে আলিঙ্গন করেনি। তার বুকে আছড়ে পড়ে এভাবে কাকুতি-মিনতি করেনি। তার লাশ দেখে কাঁদেওনি। অথচ এখন তার এ কী মূর্তি! এর কোনো ব্যাখ্যা তখন পাইনি। সে বয়েসও ছিল না আমার। শুধু দেখলাম, সরতাজ ভুরু কুঁচকে দিদির দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। ডিসিপিসাহেব বললেন, "ক্যাপ্টেন সরতাজ সিং।...যাওয়া যাক?"

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এবার সংবিৎ ফিরে পেয়ে মৃদুস্বরে বলল, "জি। চলুন।"

ডিসিপি সাহেবের সঙ্গে সরতাজ আর নারায়ণ সিং শত্রুদের সঙ্গে মিটমাট করতে চলে গেল। সঙ্গে বাপুও গেলেন। দেখলাম, খাঁকি উর্দিধারীরা সশস্ত্র প্রহরায় মোতায়েন হল। গোটা কলোনিটাইকেই ঘিরে ধরল ওরা। আশা করা যায়, শত্রুরা আর ফিরে আসবে না। দেখেও বড়ো শান্তি পেলাম। যাক! 'জঙ্গ' থেমে গিয়েছে। একটা প্রাণান্তকর যন্ত্রণা থেকে হঠাৎই যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তার থেকে বেশি আরামের আর অন্য কিছু হয় না। আরামে এবং ক্লান্তিতে আমার চোখ বুজে আসছিল। তখনও কানে আসছে বেবের মৃদু ভর্ৎসনা। বেবে দিদিকে বলছে, "এসব কী যস্যি? তুই পাগল হয়েছিস? এভাবে মেয়েদের সবার সামনে পরায়া মর্দকে জড়িয়ে ধরতে আছে? লোকে কী বলবে।..."

শুনতে শুনতেই আমার চোখ বুজে এল। বেবের চাপা ধমক আশ্বস্ত করল, সব স্বাভাবিক আছে। অনেকক্ষণ ধরেই চোখের পাতা বড়ো ভারি হয়ে আসছিল। কিন্তু উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, ভয়ে ঘুম ধারে কাছেও ঘেঁসেনি। টানটান স্নায়ু, 'নস্'গুলো ঢিলে হতেই একটা গভীর ঘুম আমায় ঘিরে ধরছিল। কলোনিতে এখনও নৈঃশব্দই কায়েম আছে। সেটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধ থেমে যেতে পারে। তবে তার ভয়াবহ ফলাফল ও স্মৃতি বহুদিন মানুষকে তাড়া করে। শুধু ওই নীরবতার মধ্যেই মাঝেমধ্যে ভেসে আসছে চাপা কান্নার শব্দ। তন্দ্রাজড়িত অবস্থাতেই শুনলাম, কারা যেন 'মাতম্' মানাচ্ছে। ওদের কেউ মারা গিয়েছে। তাদের কপালে লেখা ছিল 'ওয়াহিয়াত মওত'। এত আতঙ্কের মধ্যে পরিবারের সদস্যরা প্রাণ খুলে একটু কাঁদতেও পারেনি। বুকে পাথর চাপা দিয়ে অশ্রুরোধ করে বসেছিল। এখন চোখের জলে প্রিয়জনের জন্য শোক প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। গুঞ্জনের মতো ভেসে আসছিল সেই আওয়াজ। নিদ্রা তখন আমার কোলে তুলে দোলাচ্ছে। একটা দুলুনি টের পাচ্ছিলাম। কে যেন বলছে, "ঘুমিয়ে পড়.... ঘুমিয়ে পড় পুত্তর...। ঝড় থেমে গিয়েছে। এখন তুই শান্তিতে ঘুমো... 1

আমি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চোখের সামনে কখন যে অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছে তা টের পাইনি। কান ও মস্তিষ্কের ভেতরে সম্পূর্ণ শূন্যতা। এতটাই ক্লান্ত ছিলাম যে দুঃস্বপ্ন দেখারও ক্ষমতা ছিল না। এক নির্বোধ মৃতদেহের মতো জাগতিক সমস্ত চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় ছিলাম তা জানি না। শুধু নিঃসঙ্গ এক অন্ধকার তার শীতল কোলে টেনে

নিচ্ছিল আমাকে... আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম... অথবা ডুবছিলাম অচেতনতার গভীরে...! ক্রমাগতই গভীর থেকে গভীরতর চোরাবালি আমায় টেনে নিচ্ছিল... আপাদমস্তক গ্রাস করে নিচ্ছিল...!

"বাঁ-চা-ও!...বাঁ-চা-ও!"

আচমকাই যেন আমার শান্ত নিদ্রার কাচের মহলে একটা বিরাট পাথর এসে আছড়ে পড়ল। কানের কাছে ঝনঝনিয়ে উঠল এক অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। ধড়মড় করে উঠে বসে প্রথমেই বুঝে পেলাম না যে কোথায় আছি। বাস্তবে, না স্বপ্নে? ততক্ষণে গলাটা আরও স্পষ্ট হয়েছে, "গ-দ্দা-রি! গ-দ্দা-রি হয়েছে আমাদের সঙ্গে। ওরা আসছে...!" কারা আসছে! পুলিশ তো আমাদের বাঁচানোর জন্য বাইরে রয়েছে। কে-ই বা কার সঙ্গে গদ্দারি করল! হল কী? হতবাক শিশুর মনে অনেক প্রশ্ন ছিল। কিছুই বোঝার মতো অবস্থায় সে ছিল না। আরও বেশি কিছু বোঝার আগেই দুড়দাড় করে ঘরে ঢুকলেন বাপু! তাঁর সারা শরীর রক্তে ভেজা। যেন এইমাত্র রক্তের নদীতে 'ডুবকি' মেরে এসেছেন! এ আবার কী! তিনি তো সরতাজ আর নারায়ণ সিং এর সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে নিতে গিয়েছিলেন। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে এখানেই এই হিংসার সমাপ্তি ঘটবে। তবে বাপু এমন করছেন কেন?

তাঁর চিৎকারে আমাদের বাড়ির সামনে ভিড় উপচে পড়ল। বাপুর ওই রক্তমাখা কলেবর দেখে সবাই আঁতকে ওঠে। তাওজি কোনোমতে বললেন, "এমন হাল হল কী করে? তোরা তো সুলা করতে গিয়েছিলি!"

"কোনো সুলা নয় প্রা'জি!" বাপু হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, "ওরা জানত যে সরতাজ আর ওর বন্দুক থাকতে আমাদের হারানো মুশকিল। তাই পুলিশ স্রেক ওকে তুলে নিয়ে যেতে এসেছিল। ওই ডিসিপি মঙ্গলপুরী থেকে বেরোনো মাত্রই সরতাজকে ওই নেকড়েগুলোর হাতে তুলে দিয়েছে। নারায়ণও ...!"

আমার পায়ের তলার মাটি থরথরিয়ে কাঁপছিল। এসব কী বলছেন বাপু। এমনটাও কি হতে পারে? এটা বাস্তবে ঘটছে না দুঃস্বপ্ন দেখছি? এই তো, একটু আগেও সব ঠিক ছিল। খোদ আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তা এসে বলে গেলেন, সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। আর কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে না। তিনিই তো বাপুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে গেলেন। তবে এখন কী হল?

বাপু কথা বলতে পারছিলেন না। কখনও পাগলের মতো কাঁদছিলেন, কখনও কপালে করাঘাত করছিলেন। সবাই তাঁকে শান্ত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারণ বাকিরাও আমার মতো কিছুই বুঝছিল না। গুরশরণ তাওজি জানতে চাইলেন, "পুত্তর, তুই একটু ঠান্ডা হয়ে বলবি যে হয়েছেটা কী?"

বাপু কোনোমতে যা জানালেন তাতে উপস্থিত সবার 'রুহ' কেঁপে গেল। ওঁরা গিয়েছিলেন বটে শান্তিপ্রস্তাব নিয়েই। কিন্তু পুলিশের গাড়ি মঙ্গলপুরীর সীমানার বাইরে যাওয়া মাত্রই দেখা গেল রাস্তার ধারে শয়ে শয়ে লোক হাতে ধারালো অস্ত্র, টায়ার, মশাল আর কেরোসিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের 'খুংখার' মূর্তিতেই স্পষ্ট যে ওরা 'শান্তি' শব্দটার অর্থ বোঝে না! ওদের তরোয়াল রক্তপানের জন্য প্রস্তুত! বাপু ভয়ে কেঁপে উঠেছিলেন। তবু এইটুকু ভরসা ছিল যে সঙ্গে খোদ ডিসিপি আছেন। ডিসিপির গাড়ির ওপর হামলা করার মতো সাহস নিশ্চয়ই দাঙ্গাইরা করবে না। তাদের নিশ্চয়ই যেতে দেবে।

অথচ গাড়ির ড্রাইভার ঠিক ওই ভিড়টার সামনেই এসে সজোরে ব্রেক কষল। গাড়িটা সজোর ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেতেই আততায়ীরা 'মার মার' করে এসে আছড়ে পড়ল দরজার ওপর। সরতাজ শুধু কোনোমতে বলতে পেরেছিল, "এ কী!"

আর কিছু না বলতে দিয়েই দরজা সপাটে খুলে প্রায় পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে নিল ভিড়টা। যেন একরকম ছিনতাই করেই নামিয়ে নিল গাড়ি থেকে। অন্যদিকে নারায়ণ সিংকেও জামা ধরে টেনে নামিয়েছে জনতা৷ বাপু সভয়ে দেখলেন, তাঁর দিকেও তেড়ে আসছে ওরা! নারায়ণ সিং নিজেকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু একজন সাধারণ

নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ দশটা সশস্ত্র গুণ্ডার সঙ্গে লড়বে কী করে! তাকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চেপে ধরে ওরা একটা টায়ার জোর করে ঢুকিয়ে দিল গলা দিয়ে। টায়ারটা আটকে গিয়েছে তার বুকের কাছে। ঐ পরিস্থিতিতে হাত নাড়ানোও সম্ভব নয়।

নারায়ণ অসহায় চিৎকার করে উঠল, "পা-জি, ডিসিপিসাব, বাঁচাও!" , বাপু বিদ্যুৎবেগে ডিসিপি দত্তার দিকে ফিরলেন, "স্যার, কিছু করুন। ওদের মেরে ফেলবে তো!"

ডিসিপি খুব শান্তস্বরে জবাব দিলেন, "করছি তো। দেশের শত্রুদের মারছি। এটাই তো পুলিশের ডিউটি।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। এ কী বলছেন ডিসিপি দত্তা। একটু আগেই তো কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছিলেন। একরকম শান্তির ধ্বজা উড়িয়েই এসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, সমস্যার সমাধান করে দেবেন। এই লোকটার কথাতেই ভরসা করে তাদের শেষ সম্বল অস্ত্রগুলো পর্যন্ত ওঁদের হাতে তুলে দিয়েছে সবাই। এত বড়ো দাগাবাজ! এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা!

বাপু আর কিছু বলার সুযোগ পাননি। তার আগেই তাঁকেও টেনে নামিয়েছে ওরা। ডিসিপি আর তাঁর পুলিশ বসে বসে তামাশা দেখছিলেন। বাপুকে রাজপথের ওপর ফেলে মারতে শুরু করেছে ওরা। মুড়ি-মুড়কির মতো লাথি, ঘুষি এসে পড়ছিল তার ওপরে। তবু শুনতে পেলেন নারায়ণ সিং-এর প্রাণান্তকর চিৎকার! টায়ার পরিয়ে, কেরোসিন ঢেলে ওকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিয়েছে ভিড়। সে আপ্রাণ চেঁচাতে চেঁচাতে এদিক ওদিক দৌড়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু অগ্নিদেব ক্রমাগতই ওকে সাপটে ধরছেন। জ্বলন্ত টায়ার ওকে পুড়িয়ে মারছে। ওর চিৎকার করে ছটফট করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বাঁচার প্রশ্নই ওঠে না।

নারায়ণের পরিণতি দেখতে পেলেও সরতাজকে তো দেখাই যাচ্ছিল না। গোটা দলটা যেন ওর ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভিড়ের তলায় চাপা পড়া মানুষটার কী হল তা বোঝা দায়। ডিসিপি দত্তা ওকে ভিড়ের হাতে তুলে দিতে পেরে খুব তৃপ্তমনে ধূমপানে মন দিয়েছেন। বাবা পরম আফশোশে চোখ বুজলেন। এতগুলো লোকের সঙ্গে একা কী করে লড়বে ছেলেটা! যতই আর্মিম্যান হোক, ও যে নিরস্ত্র! আর আততায়ীদের হাতে লোহার রড, তরোয়াল, ছুরি, কী নেই! এরা ঠিক কী ধরনের কাপুরুষ? হিম্মত থাকলে অন্তত কৃপাণটা ওর হাতে তুলে দিয়ে দেখত

কিন্তু সরতাজের মতো একজন জওয়ানকে চিনতে বাপুরও ভুল হয়েছিল। সে প্রথমে পরিস্থিতির আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। সেই ফাঁকেই তাকে রডের বাড়ি মেরে মেরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছিল ওরা। তীক্ষ্ণ তরবারিও উন্মত্ত রাগে তার রক্তের স্বাদ নিচ্ছে। কিন্তু পরিস্থিতিটা মাথায় ঢুকতেই সে সবেগে ভূপতিত অবস্থাতেই একজন দাঙ্গাইয়ের হাত থেকে কেড়ে নিল তরোয়াল। একজন প্রশিক্ষিত ও দক্ষ সেনার হাতে কথা বলার জন্য বোফর্স বা বেয়নেট লাগে না। একটা ধারালো তরোয়ালই যথেষ্ট। বাপু মার খেতে খেতেই দেখলেন, গোটা ভিড়টা যেন একটু ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল। তার কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে সরতাজ সিং। সমস্ত জখম নিয়েই রক্তমাখা দেহে উদ্ধত, অপরাহত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। শত্রুর তরোয়ালের ধার, ছুরির আঘাত তাকে কেটেছে-ছিঁড়েছে। আপাদমস্তক রক্তে ভেসে যাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষতও বটে। কিন্তু সে কী ভয়াল মুর্তি তার। এতক্ষণ যে সরতাজকে দেখছিলেন, সে নিজের দেশবাসীদের প্রাণ নিতে চায়নি। এবার যেন সেই মানুষটাই মূর্তিমান কালের রূপ ধরল। যে দেশপ্রেমিক জওয়ান মাথায় শহীদির 'কাফন্' বেঁধে শত্রুদের ব্যূহে ঢুকে পড়ে, সরতাজ সেই নির্ভীক সেনা! তার হাতের তরোয়াল এমনভাবে ঘুরছে, যেন ওটা বহুবছরের পোষ মানা। চোখেই দেখা যায় না তার আক্রমণ। যারা এতক্ষণ আক্রমণ করছিল তাকে, এবার তারাই পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবাই সভয়ে দেখল, একটা লোকের সামনে হেরে যাচ্ছে একদল হিংস্র মানুষ। অস্ত্র চালানোয় প্রশিক্ষিত হাত তরোয়াল নিয়ে একরকম তাণ্ডবমূর্তি ধরল। দিল্লির রাস্তা সাক্ষী থাকল এক অদ্ভুত অসম যুদ্ধের একটা মানুষকে চতুর্দিক

দিয়ে বহু লোকের ভিড় ছেঁকে ধরেছে। মানুষটা টলছে, উপর্যুপরি আঘাতে শিউরে শিউরে উঠছে, তবু হাল ছাড়ছে না।

কিন্তু ওরা ভুলে গিয়েছিল, বাঘের একটা পাঞ্জাই তাদের পেড়ে ফেলবার জন্য যথেষ্ট! গায়ে অজস্র ক্ষত নিয়ে রক্তাপ্লুত সরতাজ এবার এগোল। তার হাতে বনবন করে ঘুরছে তরোয়াল। দাঁতে দাঁত চেপে নিয়ন্ত্রণ করছে নিজের ভারসাম্যকে। কিন্তু তার শিক্ষিত হাত প্রাণ নিতে অভ্যস্ত। সে নিজে থেমে যেতে পারে, তবু তার হাত থামবে না। চোখের সামনেই এবার ধড়াধড় দাঙ্গাইদের লাশ পড়তে শুরু করল। এখন আর বিচার-বিবেচনা করার কিচ্ছু নেই। যে তার সামনে আসছে, তাকেই নিষ্ঠুরভাবে কাটছে সরতাজ। তরোয়াল তো প্রতিপক্ষের হাতেও ছিল। কিন্তু ওটা চালাতে কী করে হয় এবং ঠিকমতো চালালে কী হতে পারে, তা এক প্রকৃত যোদ্ধাই দেখিয়ে দিল।

বাপুকে এতক্ষণ যারা পেটাচ্ছিল, এবার তারাও তাঁকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়েছে ওই একমাত্র শত্রুর দিকেই। নারায়ণ সিং-এর পোড়া মৃতদেহ একদিকে পড়ে ছিল। বাপুকে নিয়েও ওদের অত চিন্তা নেই, যত এই আর্মির ক্যাপ্টেনকে নিয়ে আছে। বুকে গুলি আর পোড় খাওয়া যোদ্ধা যে এত সহজে বাগ মানবে না তা ওরা জানত। অনেক কষ্টে, অনেক ষড়যন্ত্রের পর নিরস্ত্র লোকটাকে একা পাওয়া গিয়েছিল। তাই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভেবেছিল, ব্যাপারটা একেবারেই সহজ হবে। কিন্তু ভুলে গিয়েছিল, একজন জওয়ান একশোটা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে মরে পড়ে গেলেও তার হাত, দুটো জিনিস শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আগলে রাখে- তেরঙ্গা আর রাইফেল। যার রক্তে 'সরফরোশি'র নেশা, সে অত সহজে হার মানবে না। বাপুর মাথা ফেটে চোখ মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তবু তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, সরতাজের সেই বিধ্বংসী মূর্তি। হাতে তরোয়াল নিয়ে সে প্রলয়নাচ নাচছে। সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরে চতুর্দিক দিয়ে কখনও তরোয়ালে, কখনও চপার দিয়ে কোপাচ্ছে। সর্বাঙ্গে অন্তত চল্লিশটা মারাত্মক 'জানলেওয়া' জখম। ব্যথায় থেকে থেকে কাতরে উঠছে, কাঁপছে। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না। তবু কী অদম্য তার জীবনীশক্তি! একসময়ে এমন মনে হল, একা তার সামনেই বুঝি শেষ হয়ে যাবে দাঙ্গাইদের দল! একাই বুঝি কয়েকশো লোককে কেটে রাস্তায় ছড়িয়ে দেবে সরতাজ সিং।

তার এই মারমার কাটকাট রূপ দেখে জনতা এবার ভয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল। বাপু কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সভয়ে দেখলেন, সরতাজের নাক, মুখ থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে। সে হাত দিয়ে মুখের রক্ত মুছে অতিকষ্টে তাকাল বাপুর দিকে। কোনোমতে বলল, "পা-জি। পালাও...!"

শুধু এইটুকুই বলতে পেরেছিল সে। পরক্ষণেই একটা জোরদার ফায়ারিং-এর আওয়াজ! বাপু বিস্ফারিতদৃষ্টিতে দেখলেন, সরতাজের কপাল ফুটো করে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট! তার রক্তাক্ত দেহটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই ভারসাম্য হারিয়ে একেবারে চিত হয়ে পড়ল দিল্লির রাজপথে। দু-চোখ তখনও খোলা। কাজলকালো চোখদুটোয় মর্মান্তিক বিস্ময়! শেষমুহূর্তেও হতভাগ্য জওয়ান বিশ্বাস করতে পারেনি যে ভারতবর্ষের সে রক্ষক ছিল, সেই ভারতবর্ষেরই আর এক তথাকথিত রক্ষক এইভাবে শেষ করে দেবে তাকে! সীমান্তের শত্রু যা করতে পারেনি, নিজের দেশের লোকই তা করে দেখাল।

"বেওকুফ, নালায়কের দল!"

ডিসিপি দত্তা এবার রিভলবারটা নামিয়ে নিয়ে গজগজ করলেন, "তোরা তোদের নেতার নামের কলঙ্ক! একটা লোককে এত কষ্টে ভুলিয়ে ভালিয়ে, ভুজুং ভাজুং দিয়ে তোদের হাতে তুলে দিলাম, তারপরও তোরা কিস্যু করতে পারলি না! ও একা আর নিরস্ত্র ছিল। আর তোদের হাতে নেই, এমন কোনো অস্ত্রই নেই! একগাদা নিকম্মা'র দল। একটা লোককে সামলাতে পারলি না? আর একটু হলেই ভয়ের চোটে ভেগে যাচ্ছিলি সালোঁ? যত বাজে কাজ আমাকেই করতে হয়!"

সরতাজের প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়েছিল। পাগড়িটা খসে গিয়ে তার মাথার দীর্ঘ চুল এলিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপরে। চোখদুটো শূন্যদৃষ্টিতে আকাশ দেখছে। হাতে তখনও মুঠো করে ধরা রক্তাক্ত তরোয়াল। জলের মতো তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে দেশের মাটি। এটাই তো মানুষটার স্বপ্ন ছিল। দেহের প্রতিটা রক্তবিন্দু দেশের মাটির জন্য বরাদ্দ করেই সে সেনাবাহিনীতে গিয়েছিল। অবশেষে দেশ তার রক্ত গ্রহণ করল। কিন্তু এইভাবে?

ভিড় তখনও মৃতদেহের দিকে এগোতে সাহস পাচ্ছে না দেখে ভূপেন্দ্র দত্তা গর্জে উঠলেন, "আরে ভীতুর ডিম সব। লাশকে ভয় পাচ্ছিস? মর গয়া ইয়ে। যাও, টুট পড়ো।" এইটুকুই শোনার ছিল। পরাজিত শক্তিশালী শিকারের মৃতদেহের ওপর নির্লজ্জ হায়নারা যেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়, তেমনই এবার সবাই প্রতিশোধস্পৃহায় সবিক্রমে লাফিয়ে পড়ল সরতাজের প্রাণহীন দেহের ওপরে। সহস্র তরোয়াল, কাটারি, চপার দিয়ে তাকে সকলে মিলে কোপাচ্ছে! সেই গোলমালের মধ্যেই বাপু কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন!"

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে সবাই 'থ'। এই ছিল পুলিশের মনে! বাপু আর বলতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সকলের চোখে অবিশ্বাস। এই তো, একটু আগেও রাইফেল নিয়ে অতন্দ্র প্রহরায় ছিল ছেলেটা। সামনাসামনি তাকে পরাস্ত করতে পারেনি কেউ। দু-দুবার শত্রুপক্ষ তার ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এই দেশকে সে ভালোবাসত। দেশের আইনরক্ষকদের বিশ্বাস করেছিল। সে বিশ্বাস এতটাই গভীর যে নিজের হাতিয়ারটাও চোখ বুজে তুলে দিয়েছিল ওদের হাতে। অথচ তার এমন হৃদয়বিদারক পরিণতি।

কেউ কোনো শব্দ খুঁজে পায় না। সকলের চোখে আতঙ্ক। সরতাজ নেই! যে সিংহটা ভেড়ার দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাকে শেষ করে দিতে সক্ষম হয়েছে ওরা। এখন বাকিরা কী করবে? তাদের হাতে এখন বাধা দেওয়ার মতো অস্ত্রও নেই। সব বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে চলে গিয়েছেন ভূপেন্দ্র দত্তা আর তাঁর পুলিশবাহিনী। তাঁর দেওয়া আশ্বাস যে কতখানি মিথ্যে ছিল তা এইবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল সবাই। পুলিশ শুধু চোখ বুজেই বসে নেই, ওদের সাহায্যও করছে। এই বেইমানিটা বুঝতে পারার পর প্রত্যেকেরই মুখ প্রায় রক্তহীন হয়ে গিয়েছে। কারোর বুঝতে বাকি নেই যে মৃত্যু দরজায় কড়া নাড়ছে। এবার ওরা আবার ফিরে আসবে। খুব দ্রুতই আসবে। কিন্তু কেউ লড়তেই পারবে না, বাধা দিতে পারবে না। সবাই নিরস্ত্র। ঘরে লাঠি, তরোয়াল এমনকি কৃপাণটাও নেই।

"আমার সরতাজ মরে গেছে...? এক্কেবারে মরে গেছে... অ্যাঁ?"

দিদি এতক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সব শুনছিল। এতক্ষণে ফিশফিশ করে জানতে চাইল। এই মুহূর্তে ওর কথা শুনে বিরক্ত বা বিস্মিত হওয়ার মতো অবস্থা কারোরই ছিল না। সবাই নীরব। সবার নৈঃশব্দই ওর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। সে কিছুক্ষণ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এতক্ষণে ওর চোখ বেয়ে জল পড়ে, "সবাই মিলে ওকে মারল। কত কষ্ট পেয়েছে... কত ব্যথা পেয়েছে...!"

বলতে বলতেই সে এক আছাড়ে নিজের হাতের সব চুড়ি ভেঙে ফেলল। আমরা সবাই এর অর্থ জানতাম...! এ ও জানতাম, আর কোনো আশা নেই...! সব শেষ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা!... মৃত্যু আসছে। আমাদের অন্তিম সময় উপস্থিত। ...

আজও ভুলতে পারি না সেই মুহূর্তগুলো। দিদির সেই ব্যাকুলতা, সেই অর্থপূর্ণ চুড়ি ভেঙে ফেলা, অকালবৈধব্য স্বীকার করে নেওয়া, সরতাজের নামের আগে 'আমার' শব্দটা বলা। কত বড়ো মূর্খ ছিলাম আমরা। বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারিনি। ভেবেছি নভজ্যোত আর দিদি দু-জন দু-জনকে ভালোবাসে। ওদের বিয়েটা প্রেমের বিয়ে! বাপু আর বেবেও কিছু বুঝতে পারেননি। আশ্চর্য! দুই পক্ষের উদ্যোগেই বিয়েটাও নির্বিঘ্নে ঠিক হয়েছিল। ওঁরাও ভেবেছিলেন, ছেলে-মেয়েরা একে অপরকে ভালোবাসে।

এখন সবকিছুই বুঝতে পারি। ভালোবাসা নিঃসন্দেহে ছিল। তবে সেটা নভজ্যোতের দিক থেকেই বেশি। দিদি ওর ভালোবাসাটাকে মেনে নিয়ে এবং মানিয়ে নিয়ে ওকে একজন

ভারতীয় ও শিখ পরিবারের আদর্শ মেয়ের মতোই ভালোবেসেছিল। কিন্তু ওর মনের প্রবল প্রেম সরতাজের দিকেই চিরকাল ধাবিত হয়েছে। আমি ওর লজ্জাবনত চোখ, রক্তিম গাল দেখেও বুঝিনি। বোঝার কথাও নয়। তবে যখনই সরতাজ স্নান করতে যেত, ঠিক তখনই দিদি জল ভরতে যেত! এই সমাপতনও কারোর চোখে পড়েনি। সদ্যস্নাত মানুষটার জলসিক্ত দেহের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। নভজ্যোত আর দিদির সামনে সরতাজ এসে পড়লে সবসময়ই ও একটু সরে যেত বা সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিত, যেন পাপ করছে। অথচ কোনোদিন ও লোকটা ভ্রূক্ষেপও করেনি যে 'ছুটকি'এমন করে কেন! তার কাছে যস্যি দিদি স্নেহের 'ছুটকিই ছিল। যখন এল.ও.সি.-তে বা ডিউটিতে চলে যেত, তখন যমিত কৌরের উদাস মুখ কারোর চোখেই পড়েনি!

তবে যস্যিদিদি বুদ্ধিমতী। ও জানত, উদ্ধত হিমালয়ের রহস্যময় পথে হারিয়ে যাওয়ার উপায় ওর নেই। তার জন্য একটা ছোট্ট সুখের ঘর, সাধারণ ক্ষেতের মেঠো পথ অপেক্ষা করছে। নভজ্যোত কাকে ভালোবাসে তা সবাই জানত। কিন্তু কেউ যসমিতকে জিজ্ঞাসা করেনি, সে কাকে ভালোবাসে। মেয়েদের কাছে বোধহয় জানতেও চাওয়া হয় না। ও জানত সরতাজকে কোনোদিনই পাওয়া যাবে না! বয়েসে বড়ো হওয়াটাও অতখানি সমস্যা ছিল না। সরতাজ কলোনির প্রত্যেকটা মানুষের কাছে এতটাই প্রিয় ছিল যে বেবে-বাপুও তাকে জামাই হিসাবে পেলে বর্তে যেতেন। ওদিকেও কোনো বাধা ছিল না। দিদির প্রেমকাহিনির সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তার প্রিয়তম মানুষটা নিজেই। আজীবন যস্যিদিদিকে ও 'ছুটকি' ছাড়া কিছু ভাবলই না। ওর চোখে চোখ রেখে আবেগটুকুও দেখল না। ওর ওষ্ঠাধরের কম্পন চোখ তুলে কোনোদিন দেখেইনি। অতকিছু লক্ষ করার তার সময়ই ছিল না। ডিউটি ছাড়া জীবনে কিছুই সে বোঝেনি। তাই দিদি বাধ্য মেয়ের মতো নভজ্যোতকেই জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছিল।

কিন্তু সেদিন সব বাঁধ ভেঙে গেল। জীবন যা পারেনি, মৃত্যু করে দেখাল। দিদি বুঝেছিল, আর সময় নেই। লোকলজ্জা ওকে আর সইতে হবে না। আমরা সবাই বুঝেছিলাম, মৃত্যু আসছে! যমিতও জানত, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এই অসহ্য অভিনয় করার আর কোনো মানে হয় না। কিছুক্ষণ পরেই সব শেষ হতে চলেছে। তাই এই ভন্ডামি করার প্রয়োজন কী? তাই শেষমুহূর্তে নিজের সত্যিটা সর্বসমক্ষে দেখিয়ে গিয়েছিল সে। দিদি বুঝে গিয়েছিল 'বেশরম, বেহায়া' এইসব বিশেষণ শোনার জন্য ও নিজেও বেঁচে থাকবে না। বলার মানুষগুলো তো নয়ই।

এখনও মাঝে মাঝে দিদিকে দেখতে পাই। যখনই অধিরাজ ব্যানার্জির সামনা-সামনি হই, তখনই মনে হয় দিদি হাসছে। বলছে, "ভাই, এবার তুই ওকে হারাতে পারবি না! আমার সরতাজকে তোর ভেতরের বেইমান লোকগুলো আর ধোঁকা দিতে পারবে না! একবার শয়তান ওকে বোকা বানাতে পেরেছে, বারবার পারবে?"

হ্যাঁ দিদি। ও অবিকল তোর সরতাজেরই মতো! হয়তো তোর সরতাজই আবার ফিরে এসেছে দেশের টানে। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসী। পুনর্জন্মতেও বিশ্বাস করি। তেমনই অপূর্ব চোখ, তেমনই ঔদ্ধত্য, তেমনই তেজ, জেদ। ভেড়ার সামনে দাঁড়ানো সিংহ। কিন্তু কী করব দিদি! আট বছরের শিশু যে ওইদিনই শিখে গিয়েছিল, বীরত্বের চেয়ে ছল আর কৌশল অনেক বেশি কার্যকরী হয়! শয়তানি আর বিশ্বাসঘাতকতার পাঠ যে সেদিনই সে পড়ে ফেলেছিল। সে শিক্ষা আমি কোথায় রাখি বল্! রাক্ষসের আঘাতে যে রাক্ষস তৈরি হয়েছে, তাকে নিয়ে কী করব! সে যে নিজের কাজ করবেই। এখনও একটা রাত বাকি। আর দুটো পরিবার। সময় কম। সুযোগও ...!

"যো বাত কী হ্যায়, উস মেঁ সও মানে ছুপে হ্যায়,
চেহরোঁ কে পিছে কিতনে হি চেহরে ছুপে হ্যায়
ধোঁকে কা হ্যায় ধুঁয়া, ধুন্দলা ধুন্দলা সা হ্যায়, আখোঁ মে হর সমা...!"

******

(২৩)

“বার্নিং শিখ ওঁর মুখে এক বোতল ক্লোরোফর্ম ছুড়ে মারল, আর আপনি কিছু করতে পারলেন না স্যার? ওটা ক্লোরোফর্ম না হয়ে যদি কোনোরকম অ্যাসিড হত? অথবা ব্লাস্টে যদি কিছু হয়ে যেত।”

অর্ণবের শান্ত অথচ সামান্য অনুযোগমিশ্রিত কথাটা শুনেও চুপ করে রইল পবিত্র। সে নিজেই নিজেকে বারবার কাঠগড়ায় তুলছিল। অর্ণব তো একথা বলতেই পারে। ওকে কিছু বলার মুখ তার নেই। সত্যিই তো, ওটা অ্যাসিডও হতে পারত। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা কাউকেই বোঝানো যাবে না। সে নিজেই অধিরাজকে ছেড়ে আসতে চায়নি। অথচ সম্পূর্ণ নিরূপায় ছিল! সে কথা কেউ শুনবে না। তাই নিজের দায়ভার নিজেকেই বইতেই হবে।

আহেলি আড়চোখে একবার অর্ণব আর পবিত্রকে একঝলক দেখে নিয়ে ফের অধিরাজের মাথায় আর মুখে জল ঢালতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্লোরোফর্ম এমনিতে খুব মারাত্মক কোনো বস্তু না হলেও অতিরিক্ত মাত্রায় গেলে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। সেইজন্যই সে ডঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে ফোনে পরামর্শ করে নিয়েছে। তিনিই বলেছেন, “বিশেষ ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শুধু কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর মাথায় আর মুখে চোখে জল ঢালতে থাকো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের পাবলিক চালু হয়ে যাবে। তবে যতক্ষণ পড়ে আছে তার মধ্যেই স্টিচটা ফের মেরে দাও আহেলি। পারলে এবার একটু জোরদার মারো। নয়তো ব্যক্তিটি যেরকম শান্ত মানুষ তাতে বেশিক্ষণ টিকবে না। আর যতক্ষণ মহাকাশে চাঁদ-তারা দেখতে ব্যস্ত আছেন, তার মধ্যেই কর্ণবধ করে ফেলো। নয়তো পৃথিবীতে পা রেখেই তিনি ফের লাফাবেন কিন্তু।”

ইঙ্গিতটা বুঝতে আহেলির কোনো কষ্ট হয়নি। ততক্ষণে অর্ণবও আত্রেয়ীর কাছ থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্যাম্পল্ নিয়ে ফরেনসিক ল্যাবে ঢুকে গিয়েছে। স্যারের খবর সে আগেই শুনেছিল। তাই সূর্যোদয় হওয়ামাত্রই একরকম দৌড়োতে দৌড়োতে চলে এসেছে। পবিত্র আর অর্ণব দু-জনের দিকেই সে তাকিয়ে বলল, “আপনারা কাইন্ডলি ওঁর শার্টটা রিমুভ করুন। স্টিচ করতে হবে।”

“আপনিই খুলে নিন না।” পবিত্র বলল, “আমি তুলে ধরছি ওকে।”

“আমি! পাগল নাকি?” আহেলি চোখ কপালে তুলে ফেলল, “জানতে পারলে উনি আমার নামে বস্ত্রহরণের চার্জ আনবেন! অন্য কিছুরও আনতে পারেন। আপনাদের মধ্যেই একজন একটু তুলে ধরুন, অন্যজন শার্ট-কটস উল, সব রিমুভ করুন প্লিজ। এত কিছুর ওপর দিয়ে সেলাই করা সম্ভব নয়।”

“আমি ধরছি।” পবিত্র অর্ণবের দিকে তাকায়, “তুমিই খোলো।”

অর্ণব শান্তভঙ্গিতেই কোনো কথা না বাড়িয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে। অধিরাজকে পবিত্র কোনোমতে তুলে ধরতেই সে দ্রুতগতিতে শার্টটা খুলেছে ঠিকই, কিন্তু সমস্যার ফেলল ভেতরের কটস উল! ওটা বুক দিয়ে নয়, মাথা দিয়ে গলিয়ে খুলতে হবে। অথচ অর্ণব যতবারই টান মেরে খুলতে যাচ্ছে ততবারই গ্রিপ হারাচ্ছে পবিত্র। আর অধিরাজের দেহটা ফের এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সেটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের বডি গ্রিপিং পোশাক, যা মাথা দিয়ে খোলে সেটা যে লোকটা পরে থাকে, তার পক্ষেই টান মেরে খোলা সবচেয়ে সহজ। অন্য কেউ খুলতে গেলে নানারকমের সমস্যা দেখা দেয়। তার ওপর ছ-ফুট চার ইঞ্চির বলিষ্ঠ দেহের লোককে ওভাবে তুলে ধরে রাখাও সহজ কাজ নয়।

বেশ কিছুক্ষণ টানাটানির পর দুই অফিসারই গলদঘর্ম হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। অর্ণব মাথা নাড়ল, “এভাবে খোলা যাবে না মিস মুখার্জি। দুই হাতে, পিঠে, ঘাড়ে আটকে যাচ্ছে। স্যারও ধরতে পারছেন না ঠিক করে। উনি পড়ে যেতে পারেন। আপনি বরং কাঁচিটা দিন। কেটে

খুলে নিই।”

আহেলি ঢকঢক করে মাথা নাড়ে, “একদম না! অফিসার আচার্য ওঁকে তুলুন বা আপনি ওঁর সাধের কটস উল কেটে খুলুন, আলটিমেটলি চাঙ্গা হওয়া মাত্রই খাতা উনি আমার নামেই খুলবেন! তার ওপর যদি শোনেন কাঁচিটা আমি দিয়েছি, তবে আমার পেছনেই কাঁচি নিয়ে পড়ে যাবেন। বাবা মোস্তাফা হতে রাজি আছি, কিন্তু দুঃশাসন হতে বেজায় আপত্তি আছে।”

এতক্ষণ টুইঙ্কল অরোরা বসে মিটমিট করে সব দেখছিল। এবার দুই অফিসারের অবস্থা দেখে বলল, “স্যার, দু-জনে মিলে পারবেন না। তিনজন লাগবে। দু-জন যদি দু-দিক দিয়ে ধরে তুলে ওঁর হাত দুটো লিফ্ট করে দেন, আর একজন উলিকটটা ধরে ওপরের দিকে টান মারেন ওটা তবেই খুলবে।”

অর্ণব আর পবিত্র দু-জনেই অসহায় দৃষ্টিপাত করে। অর্ণব বলল, “তবে আমি আর আচার্য স্যার ধরছি। আপনি খুলুন মিস মুখার্জি।”

আহেলি আঁতকে উঠল, “আমি নেই। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার অভিজ্ঞতা খুব খারাপ।”

অবস্থা বেগতিক দেখে টুইঙ্কলই এবার হাতা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে আসে,

“অর্ণব পা-জি, আপনি খুলুন। আমি আর আচার্য স্যার ধরছি।”

কথাটা শুনে পবিত্র ব্যোমকে গেল, “আ-প-নি....মানে ধরতে পারবেন? ভারি আছে কিন্তু...।”

টুইঙ্কল তার দিকে অবিকল অর্ধনিদ্রিত বিড়ালের মতো আধখানা চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকাল। তারপর দমাস্ করে কথা নেই বার্তা নেই পবিত্রকেই টক্ করে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে অনায়াসে তুলে নিল। সে বেচারি আঁতকে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, “হোয়াট দ্য হেল! আমাকে কেন!....।”

“আমার দাদির ওজন একশো দশ কেজি।” সে পবিত্রকে শূন্যে লটকে রেখেই বলল, “কিন্তু আমি তাঁকেও কোলে নিয়ে ঘুরি। ওঁকে পারব না বলছেন?”

“ওরে বাবা!” পবিত্র হাঁউমাউ করে ওঠে, “আমি আপনার দাদির মতো হেভিওয়েট নই। রাজাও ওঁর তুলনায় একেবারেই হালকা। ফর গড় সেক! আপনি সব পারেন। ইনফ্যাক্ট খোদ হারকিউলিস যা যা পারতেন না, আপনি তাও পারবেন। প্লিজ, পুট মি ডাউন... প্লিজ। আমার বউ জানতে পারলে...!”

আহেলি আর অর্ণব তখন অতিকষ্টে হাসি চাপছে। এই মেয়েটাকে চ্যালেঞ্জ করা আর খ্যাপা ষাঁড়কে লাল রুমাল দেখানো প্রায় একই। টুইঙ্কল আর কথা না বাড়িয়ে পবিত্রকে সযত্নে নীচে নামিয়ে রেখেছে। পবিত্র বিড়বিড় করে, “রক্ষাকালী। মেয়েগুলো সব ডাকাত। সবাই প্রেস্টিজে গ্যামাক্সিন দেওয়ার জন্য আমাকেই পেয়েছে! এবার আমার ডিভোর্স কেউ ঠেকাতে পারবে না। হোয়াই মি গড়। ...হোয়াই মি!”

সে যা-ই বলুক, পরের কাজটা কিন্তু খুব সহজেই হয়ে গেল। মিস্ অরোরা সত্যিই কাজের মেয়ে। সে বেহুঁশ বসের মাথাটা সযত্নে নিজের কাঁধের ওপর রেখে অনায়াসেই ওকে তুলে ধরল। অন্য দিক দিয়ে পবিত্রও সাপোর্ট দিয়েছে। এবার একবারের চেষ্টাতেই সহজেই বেরিয়ে এল কটস্উল। কিন্তু বসের অনাবৃত দেহ দেখেই টুইঙ্কল লাফিয়ে ওঠে, “হিঃ। কী সর্বনাশ! মতি মারি গয়ি থি মেরি। আমি ওঁর সামনে নিজের পেটের গর্ব করছিলাম। ইনি তো অল্পবয়েসের সিলভেস্টার স্ট্যালোনকেও হার মানাবেন, সলমন খান তো নস্যি! তার ওপর কী গ্লেজি স্কিন! যারা জিম করে তাদের এত গ্ল্যামারাস স্কিন হয় না, প্রচুর স্ট্রেচ মার্কস থাকে। ইনি একদম ফ্ল লেস। ভাগ্যিস, নিজের পেট দেখাইনি...!”

আহেলি একটু ভয়ার্ত দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায়। কিন্তু অর্ণব এবার একটুও রাগেনি। বরং হেসে ফেলেছে। এই লেডি অফিসারটি যে-কোনো কিছুই ভেবেচিন্তে বলে না তা সে এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে। মুচকি হেসে বলল, “ডোন্ট ওরি। ওঁর ডায়েট চার্টটা আমি দিয়ে দেব আপনাকে। আপনিও সিলভেস্টার স্ট্যালোন হয়ে যাবেন। তবে চকোলেট একটু কম খেতে

হবে।”

“নাঃ।” সে মাথা নাড়ে, “এগুলো ওভাবে বানানো যায় না পা-জি। গড গিফটেড। রবজি-র হাতে প্রচুর সময় ছিল মানতেই হবে। আমাদের সময় যে ভদ্রলোক কী করেছেন কে জানে!”

“লাও ঠ্যালা।” পবিত্র ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে, “আরও একজন বোল্ড আউট হলেন। রাজার স্পয়েল করার ক্ষমতা কী মারাত্মক দেখেছ?”

টুইঙ্কল নির্বিবাদে জানায়, “ওয়ে পা-জি, আপনি আছেন কোন্ দুনিয়ায়? আমি স্পয়েলড্ মানছি। কিন্তু একা আমি নই, গোটা অফিসের নিরানব্বই পার্সেন্ট বুড়ি আর ছুঁড়ি স্পয়েল হয়ে বসে আছে। অফিসের সামনের চায়ের দোকানটাকে কখনও ঠিকমতো লক্ষ্য করেছেন? রোজ দুপুর দুটো আর রাত ন-টাতেই ওই দোকানটায় সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। ভিড়ের ঠ্যালায় বেচারি দোকানি হিমশিম খেতে থাকে। আর সেই ভিড়ে আপনি মেয়েদেরই সবচেয়ে বেশি পাবেন।”

“রাজার সঙ্গে চায়ের দোকানের কী সম্পর্ক? কী জ্বালা!”

পবিত্র ফের কনফ্যুসিয়াস হয়ে গিয়েছে। অর্ণব তাকে বুঝিয়ে বলে, “নর্মাল রুটিন হলে স্যার রোজ ওই চায়ের দোকানটা থেকেই এগজ্যাক্ট ওই টাইমিঙেই চা খেয়ে থাকেন। ঠিক ডট্ দুপুর দুটো আর রাত ন-টা। ওঁর ওই সময়ে খোলা হাওয়ায় রাউন্ড দেওয়ার শখ হয়। ওখানে দাঁড়িয়ে চা আর সিগারেট খেতে খেতে আমার সঙ্গেই আড্ডা মারেন। ব্যাপারটা আমিও লক্ষ্য করেছি। অন্য সময় দোকান শুনশানই থাকে, শুধু ওই বিশেষ সময় দুটো ছাড়া।”

“ওই দেখুন। অর্ণব পা-জি একদমই ঠিক ধরেছেন।” টুইঙ্কল বলল, “উনি তো চা-সিগারেটের মজা নেন। এদিকও তাকান না, ওদিকও তাকান না। বাকিরা ওঁকে দেখে মজা নেয়। স্বাভাবিক। এরকম অসহ্য টাইপের মারকাটারি সুন্দর জোয়ান লোক, ওরকম পার্সোনালিটি হলে মেয়েরা চোখের সুখ করবে না তো কি ভজন-কীর্তন গাইবে? বুঝেছেন এবার?” সে যোগ করল, “তবে হ্যাঁ, স্পয়েলড হলেও আমার ওই লাইনে দাঁড়ানোর কোনো ইচ্ছেই নেই। ইনফ্যাক্ট কোনো লাইনেই দাঁড়ানোর শখ নেই। প্রভু শ্রীরামের সীতা হওয়ার জন্য স্বয়ম্বর চলুক, কিন্তু আমার ও ইনটেনশন নেই। আমি তো শ্রীরামের চরণের দাস, সেবক, ভক্ত হনুমান হতে পারলেই ধন্য হয়ে যাই।” এবার পবিত্রও মজা পেয়েছে, “সেরেছে। আপনি রামভক্ত হনুমান হলে অর্ণবের কী হবে? ও বেচারির তো ছুটি হয়ে গেল!”

কথাটা শুনে অর্ণব তুমুল চটার আগেই মিস্ অরোরা জিভ কাটছে, “এ রাম! অর্ণব পা-জি হনুমান হতে যাবেন কোন্ দুঃখে? উনি তো শ্রীরামের লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের বলরাম আর বিষ্ণু ভগবানের শেষনাগ। যার কোলে তিনি পরম সুখে অনন্ত নিদ্রায় ডুবে থাকেন। ওঁকে ছাড়া চলবে কেন? আমি হনুমান হয়েই ঠিক আছি। অবশ্য যদি উনি চরণে আশ্রয় দেন...!”

কথাগুলো শুনে অর্ণবের মনে হল, সত্যিই এমন মিষ্টি মেয়ে সে আগে কখনও দেখেনি। ওকে বেলজিয়াম চকোলেটের গোটা কন্টেনারই গিফট করা উচিত। বড়ো সুন্দর মানুষ এই টুইঙ্কল অরোরা। মেয়েটাকে এই টিমে রাখার জন্য স্যারের কাছে দরবার করতে হবে।

আহেলি ওদের কথা শুনতে-শুনতেই মনে মনে হাসছিল। কাজও চলছে সমানতালে। প্রাথমিক কাজ শেষ হতেই অত্যন্ত দক্ষ হাতে ফের ক্ষতস্থান সেলাই করে দেয়। তার সবসময়ই মনে ভয়, এই বুঝি লোকটা নড়েচড়ে উঠল। এমনিতেই রথীন দাশগুপ্ত-র ঘটনাটার পর অধিরাজকে চড়া দাগের সেডেটিভ এবং অন্যান্য ড্রাগ দিতে হয়েছিল। আহেলি জানে, এখনও সে নাইট ডিউটি না থাকলে সেডেটিভ নেয়। সুতরাং ক্লোরোফর্ম বেশিক্ষণ কাত করে রাখতে পারবে না। যে-কোনো মুহূর্তে তিনি চোখ খুলতে পারেন, এবং উঠেই আহেলির নাকে নাকে ঝগড়া শুরু করে দেবেন। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারা যায় ততই ভালো।

“মিস্ মুখার্জি।” এবার অর্ণব গুটিগুটি পায়ে ফের এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। চিন্তিত স্বরে

বলে, "এখনও তো হুঁশ ফিরছে না! কতক্ষণে রিকভার করবেন বলে মনে হয়?" "আর মিনিট কুড়ি কী ত্রিশ লাগবে।" সে কাজ করতে করতেই বলে, "এক কাজ করুন তো। কাঁধটুকু ছাড়া বাকিটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিন। কারণ এখনই ড্রেস পরানো যাবে না। সেলাইটা করে দিয়েই মুখে মাথায় জল ঢেলে ক্লোরোফর্মের এফেক্টটা কমাতে হবে। জলের ঝাপটায় জামা ভিজে যাবে। চোখ খুলে যদি দেখেন, ওঁর গায়ে জামা নেই তবে আমার খবর আছে।"

"আপনার? কেন?"

"কারণ হনোলুলুতে বজ্র পড়ুক কী সাইবেরিয়ায় ভূমিকম্প, দোষ সবসময়ই আমারই হয়।" সে নির্লিপ্ত মুখে জানায়, "ওইদিকে দেখুন বেশ কয়েকটা সাদা চাদর আছে। একটা নিয়ে আসুন।"

অর্ণব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, "কিন্তু ওগুলো তো মড়ার চাদর।...মানে, ওগুলো দিয়ে ডেডবডি ঢাকা থাকে যে। স্যারের গায়ে লাশের চাদর...!"

'আমি আহেলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "গুড পয়েন্ট। এরপর উনি ডায়লগ দেবেন, এখনও মরিনি মিস্ মুখার্জি।' ছাড়ুন।"

বলতে বলতেই সে নিজের গায়ের শালটা দিয়েই অধিরাজকে সযত্নে ঢেকে দেয়। অর্ণব আড়চোখে দেখল, এই সেই বিখ্যাত শালটাই! এটা দিয়েই আহেলি কোনোসময়ে বিপন্ন, ঘোরে আচ্ছন্ন অধিরাজকে ঢেকে দিয়েছিল। এই শালটা গায়ে দিয়ে সে বাচ্চাদের মতো শান্তিতে ঘুমোত। একটু ঠিক হওয়ার পরেই অবশ্য এটাকে ওয়াশ করে কাকিমা অর্ণবের হাত দিয়ে আহেলিকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। স্যারের অবশ্য সেসব কথা মনেও নেই।

"ওয়াশরুম থেকে একবালতি জল নিয়ে আসুন প্লিজ। জলের ঝাপটা না খেলে উনি উঠবেন না।"

তারপর থেকেই কেটে গিয়েছে আরও পনেরো মিনিট। আহেলি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে অধিরাজের মাথায় আর মুখে জল ঢালছে। নরম হাত দিয়ে সাবধানে মুখ ও মাথার চুল পরিষ্কার করছে। তিন অফিসার সামনেই দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের আপডেট নিচ্ছিল। মিস্ দত্ত এবং ভূপেন্দ্র দত্তার পরিবার সুরক্ষিত। ওদিকে এখনও কোনো সমস্যার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। পি সি চৌধুরীর পরিবারও নিরাপদেই আছে। মিস্ বোসের জ্ঞান বেশ কিছুক্ষণ আগেই ফিরেছে। এখন সে ঠিকই আছে। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ কিছুক্ষণ বাদেই তাকে ডিসচার্জ করবে। পবিত্র-র উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল আহেলি। সে কৌশানীকে ঝেড়ে কাপড় পরাতে ব্যস্ত! রীতিমতো ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "আপনার কোনো দায়িত্বজ্ঞান নেই মিস্ বোস? এতগুলো লোকের বাঁচা-মরা আপনার ওপর নির্ভর করছিল। বারবার আপনাদের সবাইকে বলা হয়েছে যে বাইরের খাবার খাবেন না, বাইরের প্রোডাক্ট ইউজ করবেন না, কাউকে বিশ্বাস করবেন না। যা চাই, আমাকে বলবেন। আপনার স্মোক করার ইচ্ছে হয়েছিল, সেটা আমাকে বলা যেত না? বেছে বেছে ও বাড়ির সবচেয়ে বিপজ্জনক লোকটাকেই আপনি পেয়েছিলেন সিগারেট আনানোর জন্য?"

কৌশানী বোধহয় আমতা আমতা করে বলছিল, "আপনাকে বলতাম। আপনি কী মনে করতেন স্যার...!"

"আমি মনে করতাম? আমি?" সে ধমকে ওঠে, "এইটাই হচ্ছে আপনার প্রবলেম। টিমের লোকদের সঙ্গে ঠিকমতো মেশেন না, তাই কিছুই জানেনও না। আরে, আমার বউ রীতিমতো স্মোকার। তিনি মাঝেমধ্যেই আমার কাউন্টার ডিমান্ড করেন। আমি বাড়ির কিছুই দেখতে পারি না, কোনো কর্তব্য করি না, সব তিনিই করেন বলে স্ট্রেসের শেষ নেই। সেই স্ট্রেসের জ্বালায় আমাকেই তাঁর সুখটানের কোটা কিনে দিয়ে আসতে হয়। আর আপনি বলছেন, আমি মাইন্ড করব? আপনি সিগারেট টানবেন, খামোখা আমি মাইন্ড করতে যাব কেন? তাছাড়া যদি মাইন্ড করার গল্পও থাকত, তবে কোন্‌টা বেশি ইম্পর্ট্যান্ট? আমার মাইন্ড খাওয়া, না লোকগুলোর মরা? আপনি জানেন, আমি আর রাজা সঠিক সময়ে না পৌঁছোলে ঠিক কী হত? তিনটে লোকই পুড়ে ঝুরে মরে পড়ে থাকত। আর আপনাকে আমাদের রীতিমতো

টুকরোয় কিলোদরে কালেক্ট করতে হত। বার্নিং শিখ এমন চমৎকার কিমা বানিয়ে দিত যে জোড়া লাগাতে লাগাতে ফরেনসিক এক্সপার্টরাও বুড়ো হয়ে যেতেন। আপনার বাড়ির লোকদের কী জবাব দিতাম? এডিজি স্যারকেই বা কী বলতাম?...আপনার একটা স্টুপিডিটির জন্য সবার সমস্ত পরিশ্রম জলে যাচ্ছিল। কাণ্ডজ্ঞানহীন, ওয়ার্থলেস...!"

বেশ কিছুক্ষণ বকে ঝকে একটু দম নেওয়ার জন্য থামল সে। তারপরই বলল, "তাছাড়া আপনি কী জাতীয় স্মোকার? টান মেরেও বুঝলেন না যে ওটা তামাক নয়, গাঁজা! গন্ধেই তো টনক নড়া উচিত ছিল! তার বদলে হুশহুশ করে মেরে দিলেন। এতদিন ধরেও মার্লবোরোর টেস্ট চেনেননি? আপনি যেমন অপদার্থ অফিসার, তেমন অপদার্থ স্মোকারও বটে! এডিজি সেন জানতে পারলে আপনাকে টার্মিনেশন লেটার ধরিয়ে দিতেন। রাজা পুরো ব্যাপারটাই চেপে গেছে বলে আমরাও কিছু বলিনি। ওর জায়গায় আমি থাকলে, শুধু গাঁজা চিনতে না পারার জন্যই আপনাকে ইনকম্পিটেন্ট ঘোষণা করতাম...।"

তার বকাঝকা চলতেই থাকল। অন্যদিকে টুইঙ্কল একগাদা কলা তুলে নিয়ে বেছে বেছে খেতে ব্যস্ত। তার আবার খিদে পেয়েছে। অর্ণবের মুখে চিন্তার ছায়া। বারবার তার একটাই কথা মনে হচ্ছে। স্যারকে একা ছাড়লেই কিছু না কিছু অঘটন ঘটেই। 'সর্বনাশিনী'র ক্ষেত্রে কিছুক্ষণের জন্য একলা ছেড়েছিল। সেবারই গুলি লাগল! 'সার্জিক্যাল স' কিলার কেসেও অভিমানে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে গিয়েছিল তাকে। সেদিন যদি মাঝপথ থেকে ফের ফিরে না আসত, তবে তো পুরোপুরিই হারাতে হত অধিরাজকে! তার মৃতদেহটাই শুধু লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত অবস্থায় পড়ে থাকত। সেদিনটার কথা মনে পড়লে আজও আতঙ্ক গ্রাস করে। আর আজ! ভাগ্যিস ক্লোরোফর্ম। তার বদলে হাইড্রোফ্লুওরিক, সালফিউরিক বা যে কোনো অ্যাসিড থাকলে....! তার ওপর ওরকম মারাত্মক ব্লাস্ট। অধিরাজ যদি জানলা দিয়ে সঠিক সময়ে লাফিয়ে না বেরোতে পারত।

ভাবতেই শিউরে ওঠে সে। প্রত্যেকবার লোকটার ওপর কোনো-না-কোনো ফাঁড়া আসবেই। একমুহূর্তও দৃষ্টির বাইরে গেলেই আজকাল চিন্তা হয়, কিছু হয়ে গেল না তো! অর্ণব পাশে থাকলে অন্তত লড়তে তো পারত। পবিত্র স্যার ওঁকে একা ফেলে চলেই বা এলেন কী করে। অর্ণব হলে মরে গেলেও সঙ্গ ছাড়ত না... 1

"উঃ!"

একটা অস্ফুট কাতরোক্তির শব্দে সকলেই সচকিত হয়ে ওঠে। আহেলি দেখল, অধিরাজের মুখে একটু একটু করে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। সে একটু নড়েচড়ে উঠে ফের বলল, "আঃ...!"

আহেলি এবার খানিকটা জল আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে তার মুখে সজোরে ছিটিয়ে দেয়। একটু চিন্তিত স্বরে বলল, "অফিসার...! অফিসার ব্যানার্জি?"

অধিরাজের ভুরু একটু বিরক্তিতে আর যন্ত্রণায় কুঁচকে যায়। সে একবার আলগোছে চোখ খুলেও ফের বুজে ফেলেছে। খুব মৃদু অথচ জড়ানো গলায় বলল,

"আমার মুখটা ওয়াংখেড়ের ক্রিকেট পিচ নয় যে এত জোরে জলের ঝাপটা দিতে হবে!"

তিন অফিসারই এবার তাড়াতাড়ি চলে আসে তার কাছে। অর্ণব টেনসড্-"ওসব ওয়াংখেড়ের পিচ টিচ কীসব বলছিলেন যেন! আবার ডেলিরিয়াম হল নাকি?"

"কোনো রিয়ামই হয়নি!" আহেলির মুখ হাঁড়ি, "গোমড়াথেরিয়াম হয়েছেন উনি। একদম টনটনে জ্ঞানে আছেন। ডেমো দেখতে চান?" বলতে বলতেই সে একটু জোরে বলে, "অফিসার ব্যানার্জি, আমার গলা শুনতে পাচ্ছেন আপনি?"

অধিরাজ চোখ বুজেই ফের বিড়বিড় করল, "চাঁদ থেকেও চীনের প্রাচীর স্পষ্ট দেখা যায়। আর শুধু একটা জিনিসই স্পষ্ট শোনা যায়। আপনার অ্যাংরি বার্ড মার্কা ধমক মিস মুখার্জি! আমি তো পৃথিবীতেই আছি! অল্ ক্লিয়ার অ্যান্ড লাউড!"

"দেখেছেন?" আহেলি মুখভঙ্গি করে, "বলেছিলাম না, সব দোষ আমারই হয়। আপনি এবার দয়া করে চোখ খুলুন। আপনার ভক্তরা অনেকক্ষণ ধরে শুভদৃষ্টির জন্য অপেক্ষা

করছে!”

সে মিনমিন করে বলে, “আপনার নাকের সামনে একখানা জাঁদরেল ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে রাখলে চোখ খুলতে পারবেন আপনি? মনে তো হচ্ছে আস্ত সূর্যটাই চোখের সামনে টাঙিয়ে রেখেছেন!”

এইবার নিজের ভুলটা বুঝতে পারল মিস্ মুখার্জি। ফরেনসিক ল্যাবের ছাতে একটা অসম্ভব জোরালো আলো জ্বলে। পোস্টমর্টেমের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের দেখতে সুবিধা হয়। ওই লাইটটা সত্যিই চোখ ধাঁধানো। মৃতদেহের কোনো অসুবিধা হয় না, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু জ্যান্ত মানুষেরা সেদিকে তাকাতেও পারবে না। সন্তর্পণে স্টিচ মারার জন্যই বড়ো আলোটা জ্বেলে দিয়েছিল বেচারি। নেভাতে ভুলে গিয়েছে। সে এবার পটাস করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে সুযোগ পেয়ে চোখ খুলে তাকাতে পারল অধিরাজ। সজ্ঞানে আসামাত্রই দুর্বলস্বরে প্রশ্ন করল, “ওদিককার খবর কী? অল্ সেট?”

"হ্যাঁ।”

পবিত্র আর অর্ণব তাকে সঙ্গে সঙ্গেই আপডেট দিয়ে দেয়। ওদের কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতেই সে সটান উঠে বসার চেষ্টা করছে। কিন্তু যেই গায়ের জোরে ভর দিয়ে উঠতে গেল, অমনিই যেন তার নীচের মাটিটা খানিকটা গড়গড়িয়ে সরে গেল। পৃথিবীটাই বুঝি নড়ে উঠল। অধিরাজ ঘাবড়ে যায়, “এ কী! আমি শুয়ে শুয়ে হাঁটছি কী করে? মানে আমি হাঁটার আগেই আমার পিঠের নীচে এটা কী হাঁটাহাঁটি করছে!” অর্ণব একটু ভয়ে ভয়েই বলে, “অ্যাকচুয়ালি স্যার, আপনি ল্যাবের ট্রলির ওপরে শুয়ে আছেন। ওটার চাকাগুলোই নড়াচড়া করছে।”

“হোয়াট। ট্রলি? মানে ডেডবডি ক্যারি করার ট্রলি!”

সে প্রায় তড়াক করে লাফ মেরে নীচে নামল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আহেলির দিকে তাকিয়ে বলল, “মিস্ মুখার্জি! আপনি এতক্ষণ ধরে আমায় মড়ার ট্রলিতে ফেলে রেখেছেন!”

“কী করব?” সে নিস্পৃহভাবে বলে, “আপনি এতটাই ছোটখাটো মানুষ যে আমার টেবিলে রাখা যাচ্ছিল না। ইনফ্যাক্ট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজতে হচ্ছিল আপনাকে। অন্য অপশন পেলাম না বলে...!”

“তাই বলে ডেডবডির ট্রলি!” অধিরাজ আহতস্বরে বলে, “আপনি জ্যান্ত মানুষকে স্রেফ মেরে ফেলে দিলেন?”

আহেলি কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর গরগর করে উঠে বলল, “তাহলে কি পোস্টমর্টেম টেবিলে ফেলে রাখতাম? সেটা বেশি ভালো লাগত আপনার? এখানে ওটা ছাড়া আর কোনো কিং সাইজ বেডের অপশন নেই।”

একে বলে বডিলাইন বোলিং। অধিরাজ উত্তর খুঁজে না পেয়ে চেপে গিয়ে বলল, “ধুত্তোর। ক-টা বাজে এখন? আরে, আমার ঘড়ি কোথায়?”

যথারীতি নিজের কব্জিতে ঘড়ি দেখতে না পেয়ে সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অর্ণব নীরবে তার দিকে রিস্টওয়াচ আর ফোনটা এগিয়ে দেয়। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটার নির্দেশ একঝলক দেখে নিয়ে আবার অস্থির হয়ে বলল, “আমার মাথায় কি তোমরা মা গঙ্গাকে চাপিয়ে দিয়েছ? মাথা থেকে খালি জল গড়াচ্ছে কেন? আমি কি গঙ্গাধর শিব যে জটায় আস্ত নদী ধরে রেখেছি? একটু অফ হয়ে গিয়েছিলাম বলে যা খুশি তাই করবে। একেই মড়ার ট্রলি, তার ওপর ওঁ গঙ্গা। হচ্ছেটা কী? চোখের ওপর তুলসীপাতাও চাপিয়ে দাওনি তো? ধূপ-টুপ...? ট্রলি থেকে কি চিতায় শুইয়ে দেওয়ারও প্ল্যানিং ছিল?”

অসহ্য বদমায়েশ লোক। যা খুশি তাই বলে চলেছে! আহেলির মনে হল, এ ব্যাটাকে চেপে ধরে ফের ক্লোরোফর্ম শুকিয়ে দেয়। যতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, ততক্ষণ কী সুন্দর নিষ্পাপ শান্ত শিশুর মতো ছিল। যেই চোখ খুলেছে, তারপর থেকেই সবার হাড় ভাজা ভাজা করতে শুরু করেছে। অনেকসময় ক্লোরোফর্মের এফেক্টে এরকম অস্থির লাগে। মাথা টলমল করে, বমি বমি লাগে, শরীরটা অবসন্ন মনে হয়। সে জানে, হয়তো ভেতরের সেই অসুস্থতাটাই

এরকম মুড সুইং আর খিটখিট করার কারণ। তার ওপর ব্যথা তো আছেই। সেটা মুখে বললেই তো হয়। লাফালাফি করার দরকার কী? ভাঙবে তবু মচকাবে না। সে দাঁত কিড়মিড় করে একটা টাওয়েল ছুড়ে মারে, "দয়া করে মাথা মুছে নিয়ে আমায় উদ্ধার করুন। আর অত মাথা গরম করার দরকার নেই। এই এফেক্টটা ঘণ্টা দুয়েক থাকবে। এর মধ্যে কিছু খাবেন না এবং লাফালাফি করবেন না।" তার কথাটা অগ্রাহ্য করেই তোয়ালে দিয়ে ভেজা মাথা, মুখ ভালো করে মুছে নেয় অধিরাজ। তারপর অর্ণবের দিকে তাকায়, "তোমায় মিস্ দত্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন? বার্নিং শিখের আর কোনোরকম মুভমেন্ট?"

"হ্যাঁ স্যার।" সে বলল, "আমি মিস্ মুখার্জিকে দিয়েও দিয়েছি। কালকের পর থেকে এখনও পর্যন্ত বার্নিং শিখের কোনোরকম সাড়াশব্দ নেই। সব চুপচাপ।"

"সাড়াশব্দ খুব শীগগিরিই পাওয়া যাবে অর্ণব।" অধিরাজ ঘড়িটা দ্রুত নিজের কব্জিতে পরতে পরতে বলল, "আজ স্লগ ওভার। হয় এস্পার-নয়-ওস্পার। কোনো-না-কোনো ঘোটালা উনি করবেনই। নষ্ট করার মতো সময় নেই। মিস্ বোসের কী অবস্থা?"

"উনি ফর্মে ফিরেছেন।" পবিত্র জানাল, "আমি দায়িত্ব নিয়ে আচ্ছা করে ঝেড়ে দিয়েছি। একটু পরেই ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে...।"

"উঁহু...উহু...!" সে এবার মোবাইলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "এখনই না। বরং হসপিটালে ফোন করে বলো, ওঁকে যেন এখনই ডিসচার্জ না করে। আর পারলে চৌধুরী পরিবারের সঙ্গেই আই.সি.ইউ.-তে শিফট করে দেয়।"

"আই.সি.ইউ.-তে?" পবিত্র একটু অবাক, "কিন্তু ওঁর তো হার্ট অ্যাটাক হয়নি, বরং উনি নিজেই মূর্তিমান হার্ট অ্যাটাক! মিস্ বোস আই.সি.ইউ.-তে গেলে খোদ আই.সি.ইউ.-কেই আই.সি.ইউ.-তে রাখতে হবে।"

তার ডায়লগ শুনে অধিরাজ কটমট করে তার দিকে তাকাল। সে নিজেকে সামলে নেয়, "আরে, চটছ কেন? বলে দিচ্ছি তো। হঠাৎ করে এত রেগে যাচ্ছ কেন?"

"কারণ আমার হাতে সময় নেই।" সে জলে ভেজা অবিন্যস্ত চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে ভদ্রস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। টাওয়েলটা বিদ্যুৎগতিতে প্রায় আহেলির মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বলল, "আমি এখনও ভুলতে পারছি না যে অকুস্থলে তুমি উপস্থিত ছিলে, আমিও ছিলাম। মিস্ বোস আগে থেকেই ঘাঁটি গেড়ে বসেছিলেন। লোকটা ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, আর ত্রিসীমানায়ও আসেনি। অথচ গ্যাসটার আবির্ভাব একেবারে মোক্ষম সময়েই ঘটল। কীভাবে? কেউ ওটাকে ইনসার্ট করেনি, ওখানে কোনো লুপহোল ছিল না, তবে আমাদের সবাইকে কাঁচকলা দেখিয়ে এল কোথা থেকে? যতক্ষণ না এই প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। চলো, ক্রাইমসিনে আর একবার যেতে হবে। ভালো করে দেখা দরকার....!"

বলতে বলতেই সে গটগট করে এগিয়ে যায়। বাকি তিন অফিসার সভয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। উত্তেজনার চোটে স্যার খেয়ালই করেননি যে এই মুহূর্তে তিনি ঠিক কী পরে আছেন। কেউ মনে করিয়ে দেওয়ার সাহসও পাচ্ছে না। অধিরাজ কিছুটা এগিয়ে গিয়েই খেয়াল করল যে বাকি তিনমূর্তি তখনও পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে একটু অবাক হয়েই বলে, "তোমাদের আবার কী হল?"

টুইঙ্কল এবার মিউমিউ করে ওঠে, "স্যার, আপনি ড্রেসটা তো আগে পরে নিন। তারপর না হয় যাওয়া যাবে।"

"ড্রেস পরে নেব মানে!" সে চোখ কপালে তুলেছে, "আমার গায়ে তো গরম কিছু একটা আছে। এটা তবে কী..!"

বলতে বলতেই অধিরাজ গায়ে হাত রেখে আহেলির শালটা আবিষ্কার করেছে। বলাই বাহুল্য তার সঙ্গে নিজের শোচনীয় অবস্থাটাও বুঝতে অসুবিধা হয়নি। ক্রোধ, বিস্ময় ও বিরক্তিতে সে কিছু বলতেই যাচ্ছিল। তার আগেই মাথাটা কেমন যেন চক্কর দিয়ে উঠল। চোখটা কয়েকমুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে হঠাৎই যেন কাটা কাটা

কয়েকটা অস্পষ্ট ছবি সরে সরে গেল! ফের মস্তিষ্ক তার সঙ্গে কোনো উদ্ভট খেলায় মেতেছে। শালটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। এটাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন? মনে হচ্ছে কোথাও বুঝি দেখেছে। ঠিক স্পষ্ট নয়... কিন্তু এটাই নিঃসন্দেহে।... কোথায়?...কখন?...

অধিরাজকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে শালটা জরিপ করতে দেখে অর্ণবের সন্দেহ হল। উনি কি কিছু বুঝতে পেরেছেন? সে একটু গলা খাঁকারি দেয়, "স্যার?"

"উ?" অর্ণবের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেয়ে সে ফের রেগে গেল। এবার তার দৃষ্টি আহেলির দিকে ফিরেছে। রীতিমতো জুলিয়াস সিজারের এক্সপ্রেশন দিয়ে বলল, "মিস্ মুখার্জি। হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস? আনবিলিভেল!"

আহেলি তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অর্ণবের উদ্দেশ্যে বলল, "সি। আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম। মার্ডারটা অ্যালিয়েন এসে করলেও এফ.আই.আর-টা উনি ঠিক আমার নামেই লিখবেন। দেখেছেন? প্রমাণিত সত্য!"

বেগতিক দেখে অর্ণবই এবার দুই যুযুধান পক্ষের মাঝখানে সাদা পতাকা দেখাল, "স্যার, উনি কিছু করেননি। আপনার শার্ট আর কটস উল একেই রক্তে ভিজে গিয়েছিল। তার ওপর ও দুটো থাকলে স্টিচটা দেওয়া যাচ্ছিল না। ব্লাড লস হচ্ছে দেখে আমরাই সব রিমুভ করেছি। আবার পরিয়েও দিতাম। কিন্তু তার আগেই...!"

"ওকে। ফাইন।" সে আর কথা বাড়াল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, "জামার সেট কোথায়?"

"আমি আসার সময়ই ব্যুরো থেকে নিয়ে এসেছি। আমার ব্যাগে আছে। আপনি চেঞ্জ করে নিন।"

অধিরাজ বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে চেঞ্জ করার জন্য চলে গেল। অর্ণব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। জামাকাপড় নিয়ে লোকটার খুঁতখুঁতানি এমনই বাতিকের পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মাঝেমধ্যে অবুঝের মতো কাজ করেন। তাও ভালো, তাড়া আছে বলে বিশেষ কথা বাড়াননি। বাধ্য ছেলের মতোই ওয়াশরুমে ঢুকে গিয়েছেন।

অর্ণবের সাত খুন মাফ! আহেলি মনে মনে গরম হলেও মুখে কিছু বলল না। বরং যে টাওয়েলটা অধিরাজ তার দিকে ছুড়ে মেরেছিল সেটাকে নিয়েই চলে গেল নিজের লকারের দিকে। তোয়ালেটা থেকে এখনও হালকা সিগারেট, পারফিউম আর কোনো নাম-না-জানা বিদেশি শ্যাম্পুর গন্ধ আসছে। সঙ্গে কিছুটা ঘামের সৌরভ। এই সম্মিলিত গন্ধটা অধিরাজের কাছে দাঁড়ালেই পাওয়া যায়। অদ্ভুত মাদকতা আছে এই সুবাসে। ভীষণ পুরুষালিও। সে কোনো কথা না বাড়িয়ে তোয়ালেটাকে সযত্নে ভাঁজ করে নিজের পার্সোনাল লকারে চালান করে দিল। এটা এখন আর কোনো কাজে ব্যবহৃত হবে না!

বাকিরা কেউ লক্ষ্য না করলেও অর্ণবের সতর্ক চোখ পুরোটাই লক্ষ করেছে। সে মনে মনে একটু হাসলেও গোটা ঘটনাটাই চেপে যায়। এখন যা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তাতে এ হিসেব আপাতত তোলাই থাক। যত সময় শেষের পথে যাচ্ছে, ততই খেলাটা বিপজ্জনক থেকে বিপজ্জনকতর হয়ে উঠছে। তবু বার্নিং শিখের কাজের প্যাটার্ন দেখে বোঝা যায় যে সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত অবধি তার অ্যাকটিভিটি তুলনামূলক কম। আজ শেষ দিন। এই ক-ঘণ্টায় সে কী করবে জানা নেই। দিনের বেলায় অতটা ভয়ও লাগছে না। কিন্তু সূর্যাস্তের পর ঠিক কী হবে সেটাই ভেবে বেশি চিন্তা হচ্ছে।

ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে কোনো কথা খরচ না করে অধিরাজ স্ট্রেট বেরিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই থমকে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আহেলির দিকে তাকাল সে। একটু কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "মিস্ মুখার্জি, আমি যে ফিঙ্গারপ্রিন্টের স্যাম্পল্ আপনাকে দিয়েছিলাম, পবিত্র-র আনা ওয়েপনে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে আর অর্ণব যে স্যাম্পল্ এইমাত্র দিল, সেগুলো মিলিয়ে দেখতে আপনার কতক্ষণ লাগবে?"

"দশটা এগারোটা নাগাদই রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।" আহেলি গোমড়া মুখে বলে,

"ডি.এন.এ.-টা টাইম লাগবে।"

"ডি.এন.এ.-র থেকেও আপাতত একটা অন্য কাজ বেশি ইম্পর্ট্যান্ট।" অধিরাজ তার দিকে আঙুল তুলে বলল, "আপাতত আমি মিস অরোরাকে নিয়ে যাচ্ছি কারণ আপনার সঙ্গে আরও একজন রয়েছেন। তিনি সম্ভবত বাইরে। তাঁকে ভেতরে ডেকে নিন। ডি.এন.এ. ছাড়ুন, জাস্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর ব্লাডট্রেসটা দেখুন। এগারোটার মধ্যে সব কাজ শেষ করে পেট ভরে লাঞ্চ করে নেবেন। কারণ তারপর কখন আপনার খাওয়া জুটবে তা বলতে পারব না। ঠিক বারোটায় আমি আসব আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। রেডি থাকবেন।"

"অ্যাঁ? কী।"

আহেলির চোয়াল ঝুলে পড়ল। সে আবার কী! বারোটায় কোথায় নিয়ে যেতে আসবেন উনি? আর খাওয়াই বা জুটবে না কেন? কিন্তু তার প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই পেটেন্ট উদ্ধতভঙ্গিতে গটগটিয়ে চলে গিয়েছে অধিরাজ। একেবারে আঙুল তুলে হুকুম করে গেলেন নবাবজাদা! কোনোরকম অনুমতি বা উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করেননি। অ্যাটিটিউড দেখো! যেনো জাঁহাপনা বাদশা আকবর চলেছেন। মগের মুলুক।

সে নিজের মনেই গরগর করতে করতে শালটা এবার নিজের গায়ে পেঁচিয়ে নেয়। এটা থেকেও এখন অধিরাজের দেহের সৌরভই আসছে। সেই সুগন্ধের উষ্ণ ওম নিতে নিতেই আপনমনেই বলল, "টেরা হ্যায়, পর...!" বাকিটা সকলেই জানে। মেরা হ্যায়।

(২৪)

"মিস্ বোস। এখন কেমন আছেন আপনি?"

গাড়িতে যেতে যেতেই কৌশানী বোসের খবর নিল অধিরাজ। আহেলির ওপরে যতই খ্যাঁকখ্যাক করুক, তার কথা আপাতত মেনেই চলছে সে। কোনোরকম খাবার, এমনকি জলটুকুও খায়নি। সে কাউকে কিছু বলছে না, মুখেও প্রকাশ করছে না। কিন্তু সত্যিই শরীরটা অসম্ভব খারাপ লাগছে তার। থেকে থেকেই মাথাটা পাক মারছে, বমি বমি ভাব, আরও বেশি ক্লান্তি যেন চেপে ধরেছে। সর্বোপরি মাথাটা এখনও ভার। অর্ণব একবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে হয়তো আরও একটু বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তার। তাছাড়া যে পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে তাতে ব্লাড নিলেও ভালো হত। কথাটা সে ভুল বলেনি। কিন্তু অধিরাজ মাথা নেড়ে বলেছে, "সময় নেই অর্ণব। আমি রেস্ট নিতে গেলে বাকিরা রেস্ট ইন পিস হয়ে যাবে। আমরা এই মুহূর্তে সব চেয়ে মারাত্মক স্টেজে আছি। ও লোকটা নাছোড়বান্দা, আর মরিয়া হয়ে বসে আছে। ও আবার অ্যাটাক করবে। আমি খুব আশ্চর্য হব না যদি ও আজ আবার অন্য কোনো স্ট্র্যাটেজি নেয়। সবকিছুর জন্যই তৈরি থাকা ভালো।"

অর্ণব আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু তার মনের মধ্যে এখনও প্রবল আশঙ্কা। এই মানুষটার ওপর দিয়ে ঝড়-ঝাপটা বড়ো বেশি যাচ্ছে। অধিরাজ ঝুঁকি নিতে ভালোবাসে। তাই বলে সবসময়ই একটা সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে? সবসময়ই প্রাণটা হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয়। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি পা ফস্কে গেল! আর অর্ণবের চোখের বাইরে থাকলে তো কথাই নেই। সবকিছু হতে পারে! সবকিছু। অধিরাজকে একাধিকবার সে প্রায় হারিয়েই ফেলেছিল। সেই মুহূর্তগুলো মনে করলেই ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যায়। সেই সময়ে বুঝতে পেরেছে, এই মানুষটা তার ঠিক কতখানি অংশ অধিকার করে বসে আছে। টুইঙ্কল ভুল বলেনি। সে বিষ্ণুর শেষনাগই বটে, যার নিরাপত্তায় নিশ্চিন্তে থাকেন তিনি। অথচ যতবার সেই শেষনাগের ছায়া তার মাথার ওপর থেকে সরে যায়, ততবারই কোনো-না কোনো বিপদ এসে উপস্থিত। পবিত্র আচার্য যথেষ্ট দায়িত্বশীল অফিসার। তার সিনিয়রও বটে। তবু মনে মনে কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে পারছে না অর্ণব। আর নিজেই নিজেকে দোষারোপ করে চলেছে। অতবড়ো ব্লান্ডারটা না করলে হয়তো অধিরাজ তাকে মিস্ দত্ত-র কাছে পাঠিয়ে দিত না। রাতের অভিযানে সঙ্গেই রাখত। যখন সে আরাম করে মিস্ দত্ত-র হাতের কুকিজ আর চায়ের স্বাদ আয়েশ করে নিচ্ছিল, তখন এই লোকটা বার্নিং শিখের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছিল। এর জন্য তার দায়ও কিছু কম নয়। একটা ভীষণ অপরাধবোধ তাকে ক্রমাগতই গ্রাস করে নিচ্ছে। তার স্যারের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। ওঁকে ছাড়া একদমই ঠিক হয়নি।

আজ পবিত্রই ড্রাইভ করছে। অধিরাজ তার পাশে বসে কৌশানী বোসের খবরাখবর নিতে ব্যস্ত। কৌশানী অনুতপ্ত স্বরে বলছিল, "আই অ্যাম রিয়েলি সরি স্যার! কাল একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছি... আমি জানি না ঠিক কী করেছি...।"

অধিরাজ খুব শান্তস্বরে উত্তর দেয়, "মিস্ বোস, কাল আপনি কী করেছেন তা নিয়ে বিলিভ মি, আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আপনার যখন মনে নেই যে কী করেছেন, তখন আপনি কিছুই করেননি। ফাইন? চ্যাপ্টার ক্লোজড। তবে একটা পরামর্শ অবশ্যই দেব।"

"বলুন।"

"আপনি একজন দক্ষ অফিসার। অনেক রক্ত, ঘাম ঝরিয়ে, প্রচুর পরিশ্রম করে আজ আপনি এখানে এসে পৌঁছেছেন, যেটা অবশ্যই ডিজার্ভ করেন।" সে ঠান্ডা স্বরেই বলল, "এমন কোনো ভুল করে বসবেন না, যাতে সবাই আপনাকে ইনকম্পিটেন্ট ভাবে। ক্লিয়ার?"

"ক্রিস্টাল স্যার।"

"গ্রেট।" সে প্রসঙ্গান্তরে গেল, "ওদিককার অবস্থা কী?"

কৌশানী জানাল যে চৌধুরী পরিবারের সকলেই এই মুহূর্তে স্টে। যদিও তাদের

আটচল্লিশ ঘণ্টা কড়া মনিটরিং-এ রাখার জন্য আই.সি.ইউ.-তে রাখা হয়েছে, তবে লাইফ থ্রেট নেই। ডাক্তাররা মাঝেমধ্যেই ভিজিট করছেন এবং সিস্টারদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। সোমলতা তাঁর স্বভাবমতোই বেশ বিরক্ত। কথায় কথায় খ্যাচখ্যাঁচ করছেন ও ডাক্তার-সিস্টারদের জ্বালিয়ে মারছেন। মেঘনা চুপচাপই আছে। তবে সবচেয়ে বেশি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে পরিমল। সে অদ্ভুতরকমের গুম্ মেরে বসে আছে। কারোর সঙ্গেই কোনো কথা বলছে না। পি সি চৌধুরী ভিজিটিং আওয়ারে একবার কিছুক্ষণের জন্য ঢুকেছিলেন। স্ত্রী, পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। প্রাণপ্রিয় ছেলের সঙ্গে একটি বাক্যও বিনিময় করেননি। পরিমল হয়তো কিছু বলতে চাইছিল, অথচ তিনি একদমই অগ্রাহ্য করে চলে গিয়েছেন। দেখলে মনে হয় ছেলে ও বাবার মধ্যে কোনো মান-অভিমান পর্ব চলছে।

"ফ্যামিলি ইস্যু। ছেড়ে দিন।" সে জানতে চায়, "আপনি কোথায় আছেন?"

"আমি একদম ওঁদের পাশের বেডেই স্যার।" কৌশানী এবার একটু অধৈর্য, "কিন্তু ডাক্তাররা আমাকে এখানে কেন রেখেছেন? আমি সম্পূর্ণ ঠিক আছি। ডিউটিতে জয়েন করতে চাই...!"

"আপনি অলরেডি অন্ ডিউটি মিস্ বোস।" সে তাকে শান্ত করল, "আপনি ওখানেও নিজের ডিউটিই করছেন। স্রেফ একটু অন্যভাবে।"

"মানে?"

"বার্নিং শিখ এত সহজে হাল ছাড়বে না সেনোরিটা। সে ওদের মারার জন্য ফের চেষ্টা করবে। এবং হসপিটালের ভেতরে ঢুকেই অ্যাটেম্পট্ করবে।" অধিরাজ বুঝিয়ে দেয়, "আমরা বাইরে কোনো সিকিউরিটি রাখিনি। রেখে লাভও হত না। কারণ বার্নিং শিখও এটাই এক্সপেক্ট করছে। সে মূর্খ নয়। জানে যে বাইরে গার্ড থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তাই আদৌ নিজের পেটেন্ট হ্যালোউইন বেশে আসবে না। যতই সিকিউরিটি মোতায়েন থাকুক, তারা হসপিটালের সব স্টাফকে চেনে না, তাই স্টাফের ছদ্মবেশে থাকলে বাধাও দেবে না। হসপিটালের মধ্যে নিতান্তই গবেট না হলে কেউ কোনোরকম অস্ত্র নিয়ে ঢুকতে যাবে না, মেটাল ডিটেক্টরে আটকাবে। তাই ছুরি, বন্দুকের প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাসিড বা বম্ব ওর কাছে নেই। সবচেয়ে ভালো রাস্তা হল লেথাল ইঞ্জেকশন বা ফাঁকা সিরিঞ্জে হাওয়া ভরে টুক করে দিয়ে দেওয়া। আমি যদি ভুল না করি, তবে সে সেটাই করবে।"

"কিন্তু আমিই-বা এতজন ডাক্তার বা সিস্টারের মধ্যে ওকে আইডেন্টিফাই করব কী করে?" কৌশানী একটু বিপন্ন, "এখানে তো বিভিন্ন শিফটে বিভিন্ন ডাক্তার, সিস্টার, ওয়ার্ডবয় আসছে! তারা কেউ-না কেউ ইঞ্জেকশনও দেবেই। চিনব কী করে?"

"আপনাকে চিনতে হবে না।" সে মৃদু হাসল, "ও নিজেই আপনাকে চিনে নেবে। সেখান থেকেই আপনিও চিনবেন। সেটা পরে এক্সপ্লেইন করছি। তার আগে একটা কথা বলি, সচরাচর আই.সি.ইউ.-তে যে ডাক্তাররা ঢোকেন তাঁরা সিনিয়র ও স্পেশালিস্ট। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের স্টাফরা সবাই চেনে। ওঁরা নিজেরা কোনো মেডিসিন বা ইঞ্জেকশন দেন না। ওটা সিস্টার বা ওয়ার্ডবয়দের কাজ। বার্নিং শিখ আর যা-ই হোক, ডাক্তার সাজার ভুলটা করবে না। তবু লক্ষ্য রাখবেন কোনো ডাক্তার হাতে সিরিঞ্জ নিয়ে আসছেন কিনা। যদি আসে তবে চেপে ধরবেন।"

"ওকে স্যার।"

"এটার সম্ভাবনা অবশ্য ক্ষীণ। কারণটা আগেই বলেছি। ডাক্তারদের মুখ সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এবার আসি দ্বিতীয় ও শেষ সম্ভাবনায়। সিস্টার বা ওয়ার্ডবয় সেজে কাজ করাটা তুলনামূলক সোজা। বাইরে সিকিউরিটি না থাকা ওর জন্য সম্পূর্ণ আনএক্সপেক্টেড। তবে তাতে ও খুশিই হবে। কিন্তু এর থেকেও বড়ো আনএক্সপেক্টেড টার্ন যে ভেতরে অপেক্ষা করছে সেটা ওর জানা নেই। আমিও জানতাম গাঁজা খেলে কাউকে হসপিটালে ঢোকানোর

প্রয়োজন পড়ে না, কয়েকঘণ্টা শুইয়ে রাখলেই ঠিক হয়ে যায়। তবু আপনাকে ইচ্ছে করেই হসপিটালে ঢুকিয়ে দিয়েছি। বার্নিং শিখ প্রত্যাশাই করবে না যে আপনি অ্যাজ এ পেশেন্ট ওখানে থাকবেন। কমলা আপনাকে সি.আই.ডি. অফিসার হিসাবে ভালো করেই চেনে। যতই মেক-আপ করুক, মনের মধ্যে চোর। আপনাকে চিনতে পারলেই একমুহূর্তের জন্য হলেও চমকাবে বা থমকাবে। ওটাই হচ্ছে আপনার কল। সেজন্যই আপনি ওখানে আছেন।" অধিরাজ গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল, "প্রত্যেকটি নার্স ও ওয়ার্ডবয়কে খুঁটিয়ে একেবারে শকুনের দৃষ্টিতে দেখতে থাকুন। ওদের মধ্যে কেউ-না কেউ আপনাকে দেখে হয় মুখ নীচু করবে, নয়তো ফ্র্যাকশন অব সেকেন্ডের জন্য থমকে যাবে। দেখবেন, তার হাতে কোনো সিরিঞ্জ আছে কিনা। সব ক-টা ক্রাইটেরিয়া মিললে কোনো কথা না বলে আপনি তাকেই পাকড়াও করবেন। আশেপাশের স্টাফদের ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন তারা কেউ এই বিশেষ ব্যক্তিটিকে চেনে কিনা। যেভাবেই হোক, ইঞ্জেকশন কিছুতেই দিতে দেবেন না। একদম সতর্ক হয়ে বসে থাকুন। গট্ ইট?"

"ইয়েস স্যার।" মিস্ বোসের আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আমিও এবার দেখে নেব। ডোন্ট ওরি।"

"গ্রেট। আপনার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আপনি পারবেন।" সে হাসল, "ওভার অ্যান্ড আউট।"

অধিরাজ ফোনটা কেটে দিয়ে দেখল তিনজোড়া চোখ তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। সে অবাক, "কী হল?"

পবিত্র একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "ব্রেইনটা একটু ধার দাও মামা। তুমি কি লোকটার কুম্ভমেলায় হারিয়ে যাওয়া জুড়ুয়া ভাই? ওর প্রত্যেকটা স্টেপ রিড করে আগে থেকেই টাইট মারার বন্দোবস্ত করে রাখো কী করে! আমি হলে একগাদা পুলিশ বাইরে দাঁড় করিয়ে দিতাম। বাট, ইউ আর রাইট। তাতে কাজের কাজ কিছুই হত না। তাই ভাবি! সামান্য গাঁজা খাওয়ার জন্য মিস্ বোসকে হসপিটালে ঢুকিয়ে দিলে কেন! আমিও তো টিন এজে কম টানিনি। কখনও হাসপাতালে যেতে হয়নি। তাও আবার সটান আই.সি.ইউ.। এতক্ষণে বুঝলাম, তুমি ফের সিসিটিভি ফিট করেছ। পেন্নাম হই জাঁহাপনা।"

"পেন্নামের কিছু নেই।" অধিরাজ ধীর স্বরে বলে, "সি সাইকোলজি। তুমি যা এক্সপেক্ট করছ, সেটা এলে চমকানোর কিছুই নেই। কিন্তু যা সম্পূর্ণ আনএক্সপেক্টেড, সেটা হলে যতবড়ো আর চতুর অপরাধীই হোক না কেন, একমুহূর্তের জন্য হলেও ঘাবড়ে যাবে। তার বুক ধড়াস করে উঠবেই, ভয়ও পাবে। যত ভালো অভিনেতাই হোক না কেন, মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য তার মুখোশটা একটু সরবে। ওইটুকু লক্ষণই যদি কেউ ধরতে পারে তবে বাকিটা তার জন্য জলভাত।"

"কিন্তু স্যার...!" অর্ণব একটু ইতস্ততঃ করে, "মিস্ বোস কি সেটা বুঝতে পারবেন?"

"আবার তুমি একজন মেয়ের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে আন্ডার-এস্টিমেট করছ অর্ণব।" সে নিশ্চিন্তভঙ্গিতে বলল, "মিস্ বোস, মিস্ দত্ত বা মিস্ অরোরাই আমাদের থেকে অনেক ভালো বুঝতে পারবেন। মেয়েরা অসম্ভব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে যা আমরা করি না। মিস্ বোসের যোগ্যতার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। বিশ্বাস না হয়, পবিত্রকেই জিজ্ঞাসা করো। ও যখন পার্টি করে সব ঢাকা-চাপা দিয়ে ম্যানেজ করে বাড়ি ফেরে, তখন বউদি ঠিক কী বলেন?"

পবিত্র-র মুখ বিষণ্ণ, "আমি সহমত। রাজার কথা সম্পূর্ণ সত্যি। ছুটির দিনে যদি আয়েশ করে এক পেগও টানি, তবু রক্ষে নেই। অনেক কিছু করে দেখেছি, পান মশলা, জর্দা, ভিকস, মিন্ট চুইংগাম, এমনকি ছাগলের মতো কাঁচা পেয়ারাপাতাও কচরমচর করে চিবিয়েছি। মুখ থেকে কোনো স্মেল আসার কথাই নয়। এক পেগে নেশাই হয় না তো মাতলামির সিনই নেই। তাও দেবী ঠিক ধরে ফেলেন! এমন মা মনসার মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে এসে বলবেন, 'ফের গিলেছ!' যে ভয়ের চোটে নাকের সামনে ধূপ, ধুনো

দিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। আমি আজও বুঝিনি যে মহিলা বোঝে কী করে?”

অধিরাজ এবার হেসে ফেলল, “প্রশ্নের উত্তর পেলে অর্ণব?”

এবার টুইঙ্কলও মাথা নাড়ল, “সহি বাত। আমার বাবাও প্রায়ই ধরা পড়েন। কোনোরকম গড়বড় করলে বা মিথ্যে বললে আর রক্ষে নেই। মা বলে বাবা মিথ্যে বললে নাকি ওঁর নাকে ভাঁজ পড়ে! আমি তো আজ পর্যন্ত কোনো ভাঁজই দেখিনি। মা কী করে দেখে কে জানে!”

অর্ণব দেখল অধিরাজ মুচকি হেসে চুপ করে গেল। তার হাবেভাবেই স্পষ্ট যে মিস্ বোসের যোগ্যতার ওপর কোনো সন্দেহ নেই। অর্ণব নিজেও অবশ্য মিস্ বোসের চেজিং এর ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখেছে। মেয়েটি পুলিশ অফিসার হিসেবে নিঃসন্দেহে যোগ্য। তবু, খুঁতখুঁতুনি একটু যেন লেগেই থাকে। কে জানে, যদি মিস হয়ে যায়!

অধিরাজ ততক্ষণে ফের গুল্লুকে ফোনে ধরেছে, “গুলাব সিঞ্জা, সৎ-শ্রী-অকাল!” "সৎ-শ্রী-অকাল স্যারজি।” গুল্লু বলল, “বলুন কী হুকুম? কাল বলছিলেন কাকে যেন স্টক করতে হবে?”

“হ্যাঁ। বলছিলাম।” সে নির্দেশ দেয়, “তবে তুই নিজে স্টক করবি না। তোকে ও স্পট করেছে হয়তো। ছেলেপুলেগুলোকে নামা। তাদের বলবি, একেক শিফটে যেন একেকজন ফলো করে। আজ সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি কোথায় থাকছে, কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, সব খবর আমার চাই। তোকে ফোন করার আগেই দ্যাখ নাম, ঠিকানা, ছবি সমেত হোয়াটস্ অ্যাপ করেছি।”

“একটু আগেই যে মেসেজটা এল?” গুলাব সিং-এর বিস্ময়ের অবধি নেই, “বলেন কী স্যার। এনাকে স্টক করব? তার মানে ইনিই....!”

“বলার দরকার নেই। বুঝে নে।” তার বক্তব্য সোজাসাপটা, “তুই শুধু উক্ত ব্যক্তিকে এখন থেকেই ফলো করা চালু করে দে। আবারও বলছি, নিজে করতে যাবি না। ওস্তাদ ছেলেপুলেগুলোকে দিয়ে করা। ওদের বলবি, শিকার যেন এক সেকেন্ডের জন্যও চোখের আড়াল না হয়।”

“হবে না স্যার।” গুল্লু জানায়, “গ্যারান্টি। পল পলের খবর আপনার কাছে পৌঁছোবে।”

“থ্যাঙ্কস!”

অধিরাজ ফোনটা কেটে দিয়ে একটু চিন্তিত মুখেই সামনের দিকে তাকাল। এখন ওরা পি সি চৌধুরীর বাড়ির দিকে চলেছে। তার মনের মধ্যে এখনও অনেক প্রশ্ন। মার্ডার ওয়েপন কী তা জানা গেলেও সেটার উৎস এখনও পাওয়া যায়নি। একটা বন্ধ ঘর। ভেতর থেকে ল্যাচ আটকানো। ঘরের মধ্যে কেউ ঢোকেনি, বেরোয়ওনি। ভেতরে মিস্ বোস ছিল, বাইরে পবিত্র। মিস্ বোস ভুলবশত গাঁজা খেলেও একদম প্রথমেই বেহুঁশ হয়নি। পবিত্র-র কথা সম্পূর্ণ সঠিক। ওর জায়গায় যে কেউ সামনে পড়লেই কৌশানী তাকে চেপে ধরে ভুলভাল বকত। অথচ পবিত্র ক্যামেরায় কিচ্ছু দেখেনি। ভেতরে কেউ ছিল না। বাইরেও পবিত্র-র সতর্ক নজরকে টপকে ভেতরে ঢোকা অসম্ভব। তবে গ্যাসটা ইনসার্ট করল কে?

এই অদ্ভুত রহস্যের কোনো কূলকিনারা পাচ্ছে না। ঘটনার আগেই ওরা পুরো ঘর তল্লাশি করেছে। যা যা ছিল, সব ভালো করে বাজিয়ে দেখেছে। কোথাও কোনো ‘মাংকি বিজনেস’ ছিল না। কিছু মিস্ করেছে বলে তো মনে হয় না। সে চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করে। অন্যমনস্কভাবে ফের একটা সিগারেট কামড়ে ধরে বের করে আনল। কিন্তু এখনও অগ্নিসংযোগ করেনি। তখনও তার মন অতীতের দৃশ্যটাকে মনে করার চেষ্টা করছে। কী কী ছিল ওখানে? এসি, মসকুইটো লিকুইড, অটোম্যাটিক এয়ার ফ্রেশনার, এয়ার পিউরিফায়ার কয়েকটা সফট টয়, কাবার্ড-আলমারি, বেড, গুটি কয়েক ফার্নিচার, শো পিস, একটা দুটো পেইন্টিং—এই তো। এগুলো সব ওরা ধরে ধরে পরীক্ষা করেছে। এর বাইরে এমন কিছুই ছিল না যা সন্দেহজনক। তবে? আদতে হচ্ছেটা কী? কোন্ জিনিসটা ওদের এখনও চোখে পড়েনি? আদৌ কি তেমন কিছু আছে? ক্রাইমসিনটা আবার ভালো করে দেখতে হবে...।

সিগারেটটা সে একটু অন্যমনস্কভাবেই লাইটার দিয়ে ধরাতে যাচ্ছিল। তার আগেই তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিয়ে বেজে উঠেছে 'দেশ' রাগ। ফোন এসেছে। অধিরাজ একঝলক স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েই বিরক্ত হয়ে বলল, "নট্ এগেইন

অর্ণব আর পবিত্র দু-জনেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখল, স্ক্রিনে কোনো নম্বর শো করছে না। কোনো প্রাইভেট নম্বর থেকে ফোন আসছে। অধিরাজের মুখে বিরক্তি দেখে অর্ণব জানতে চায়, "কে ফোন করছে স্যার?"

"ভগা জানে।" সে বিরক্ত, "কাল থেকে করেই যাচ্ছে। বেশির ভাগ সময়ই তুলি না। একবার-দু বার তুলেছি, কেউ কোনো কথা বলেই না। আমি একাই হ্যালো হ্যালো করে মরছি। ওদিক থেকে কোনো জবাবই নেই! বুঝি না, কথাই যখন বলবে না তবে ফোন করে কেন। ঘোস্ট কলার। দেখবে?"

বলতে বলতেই অধিরাজ ফোনটাকে লাউডস্পিকারে দিয়ে বলল, "হ্যালো! হু ইজ দিস্?"

ও প্রান্তে কোনো উত্তর নেই। কেউ কোনো উত্তর দিল না। তবে একদম নৈঃশব্দ নয়। কারোর একটা ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে ফের বলল, "ইয়েস? কে বলছেন?"

তাতেও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। এমন নয় যে ভুলবশত কেউ ফোন করেছে। রং নাম্বার হলেও লোকে কিছু কথা অন্তত বলে বা সাড়া দেয়। দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণে অন্যদিকের আওয়াজ এদিকে এসে পৌঁছোচ্ছে না তাও হতে পারে না। ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্যান্য লোকের আওয়াজ এবং একটা শ্বাস ফেলার ফোঁস ফোঁস জোরালো শব্দ দিব্যি শোনা যায়। অধিরাজ বিরক্ত হয়ে ফোন কেটে দিতেই যাচ্ছিল তার আগেই টুইঙ্কল অরোরা চেঁচিয়ে বলল, "আবে ভূতনিকে, তোর শেষ নিঃশ্বাস পড়ছে নাকি? অক্সিজেন লাগবে?"

ওপ্রান্তের ঘোস্টকলার বোধহয় এই ধরনের স্বাগতভাষণ আশা করেনি। সে ঘাবড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ফোন কেটে দিয়েছে। পবিত্র অর্ণবের কানের কাছে ফিশফিশ করে, "সত্যিই হনুমান। চাল্লিসা পড়ারও দরকার নেই। ধমক খেয়েই ভূত পালাচ্ছে।"

"থ্যাঙ্কস মিস অরোরা।" অধিরাজ ফোনটা ড্যাশবোর্ডের ওপর রেখে বলল, "এরপর আবার ঘোস্টকলারের ফোন এলে ফের প্রণবেশদার কাছেই দৌড়োতে হবে, আপনার হেল্প নেওয়ার জন্য।"

"ইয়ে...স্যার...।" অর্ণব খুব শান্তস্বরে অনুরোধমাখা কণ্ঠে বলল, "মিস্ অরোরার একটা আর্জি আছে। আপনি এই ফাঁকে যদি একবার শুনে নেন ..."

"আর্জি?" সে এবার লাইটারটা জ্বেলে সিগারেটে আগুন ধরায়, "শুনি।"

টুইঙ্কল একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করেছে। সে আস্তে আস্তে বলল, "স্যার, আমি আপনার শ্রীচরণের হনুমান হতে চাই।"

পবিত্র হাসি চাপতে গিয়ে আরও বেশি গম্ভীর হয়ে গেল। অর্ণবের কপালে হাত। এই মেয়েটা যা খুশি তাই বলে বসে থাকে! কেউ এভাবে টপ বকে টিমে রাখার অনুরোধ করে? অধিরাজ বেচারি সবে সিগারেটটায় একটা সুখটান মেরেছিল। ভড়কে গিয়ে গলায় ধোঁয়া আটকে বিষম টিষম খেয়ে অস্থির! প্রায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। অর্ণব কিছু করার আগেই টুইঙ্কল তার মাথায় দুমদুম করে চাপড় মারতে মারতে বলল, "স্যরি স্যার। এক্সট্রিমলি স্যরি...।"

"সেনোরিটা...!" কাশতে কাশতে প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসা অবস্থায় উচ্চারণ করল অধিরাজ, "ইউ আর হার্টিং মি...!"

অর্ণব তাড়াতাড়ি খপ্ করে টুইঙ্কলের হাত ধরে ফেলেছে। একেই স্যারের মাথায় ওই সাইডটাতেই চোট লেগেছে। কপালে জখম তো বটেই, তার সঙ্গে বার্নিং শিখ একটা ইট দিয়েও নাকি মেরেছিল। তার ওপর ওই ভয়াবহ হাতের চাপড় খেলে টুইঙ্কলকে ভুলেও টিমে জায়গা দেবেন না। সে চোখের ইঙ্গিতে মেয়েটাকে থামতে বলে। কাশিতে অধিরাজের চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছে দেখে নিঃশব্দে জলের বোতল এগিয়ে দিয়েছে। জলটল খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে সে কোনোমতে বলল, "স্যরি, আমি ঠিক বুঝলাম না। উনি বলতে কী

চাইছেন?”

“বাংলাতেই তো বললেন!” পবিত্র ঠোঁট টিপে হাসছে, “যা বললেন তাই। উনি হনুমান হতে চান। তাও তোমার শ্রীচরণের।” পবিত্র অধিরাজকে আরও উলটোপালটা কিছু বোঝানোর আগেই অর্ণব বলে ওঠে, “স্যার, উনি এই টিমেই পার্মানেন্টলি থাকতে চাইছিলেন। লাহিড়ীস্যারের টিমে ফিরতে চান না।”

কাশির ধাক্কায় অধিরাজ একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল। বেশ কয়েকবার জোরে জোরে শ্বাস টেনে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “কেন?”

এবার মিস্ অরোরাই উত্তর দিল, “কারণ ওখানে আমার ভালো লাগে না। কোনো সম্মান নেই। ও টিমে কেউ হাসে না স্যার। সবসময়ই ভামের মতো মুখ করে বসে থাকতে হবে। তাও তবু সহ্য হয়। কিন্তু লাহিড়ীস্যারের গালিগালাজ হজম করা খুব কঠিন। আমার সবকিছুতেই ওঁর আপত্তি। একটু ‘টস্’ সে ‘মস্’ হলেই মা-বাপ তুলে গালি দিয়ে দেন। নিজের অপমান সহ্য হয়। আমি ওর নোকর হতে পারি, কিন্তু আমার বাড়ির লোক তো দাসখত লিখে দেয়নি। মা-বাপ তুলে বললে ছেড়ে দেব কেন বলুন? আমিও তেমন পালটা ওঁকেও মা-বাপ তুলে আচ্ছা করে দিয়েছি...!”

অধিরাজের মুখ দেখে অর্ণবের মনে হল এবার লোকটা স্রেফ বিষম খেয়েই মরে যাবে। তবে এতক্ষণে বোধহয় কিছুটা শকপ্রুফ হয়ে গিয়েছে সে। শুধু বলল, “আপনি প্রণবেশদাকে মা-বাপ তুলে বলে দিলেন! উনি আপনার এনকাউন্টার করেননি?” টুইঙ্কল বিষণ্ণবদনে বলে, “বন্দুক কি ওঁর একার আছে?”

পবিত্র সজোরে একটা হেঁচকি তুলেছে। গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, “স্যরি, স্যরি।” মেয়েটি মুখ করুণ করে জানায়, “তবে বেশ কিছুদিনের জন্য সাসপেন্ড করে দিয়েছিলেন। বরং সেটাই ভালো। ওঁর সঙ্গে ডিউটি করা মানেই পানিশমেন্ট। দমবন্ধ হয়ে আসে। সবসময় ‘মেয়েছেলে মেয়েছেলে' বলে অ্যাড্রেস করেন। আবার বলেন রান্না করা, বাসন মাজা হাত বন্দুক ধরতে পারে না!”

কথাটা শুনেই অধিরাজের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। সে অর্ণবের দিকে তাকায়, “প্রণবেশদা এরকম করেন নাকি?”

অর্ণব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে। এ কথা মোটামুটি অফিসের সকলেই জানে। প্রণবেশ লাহিড়ীর ভয়াবহ মেজাজ এবং লেডি-অফিসারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা মোটামুটি সর্বজনোবিদিত। ব্যুরোয় এমন একটা লোকও নেই যে ওঁকে পছন্দ করে। একমাত্র দুটো মানুষকেই উনি সমঝে চলেন। অধিরাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেও ওকে ঘাঁটাতে সাহস পান না। আর এডিজি শিশির সেনের সামনে ওঁর ‘বোলতি বন্ধ’। এছাড়া পৃথিবীর কারোর সঙ্গে ওঁর সদ্ভাব নেই।

অধিরাজের কপালের মাঝখানে একটা ভাঁজ পড়েছে। কোনোকিছু তার গুরুতর অপছন্দ হলেই এই ভাঁজটা পড়ে। সে আপনমনেই চুপ করে কিছুক্ষণ ধোঁয়ার রিং বানাল। তারপর বলল, “অ্যাকচুয়ালি সেনোরিটা, আমিও ভাবছিলাম প্রণবেশদাকে বলে আপনাকে আমার টিমেই নিয়ে নিই। যদি আপনার এবং প্রণবেশদার আপত্তি না থাকে....!” সে কথাটা শেষও করতে পারেনি। তার আগেই টুইঙ্কল পেছন দিক দিয়েই উচ্ছ্বাসের চোটে বাচ্চা মেয়ের মতো তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, “সচ্চি... আমার কোনো প্রবলেম নেই। প্লিজ...প্লিজ...বলুন স্যার! আই অ্যাম ইওর বিগ ফ্যান.... আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারলে আমার আর কিচ্ছু চাই না... ইনফ্যাক্ট স্যালারিও চাই না। ইটস মাই ড্রিম ... ।”

তার উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে অধিরাজের প্রায় দমবন্ধ হয়ে এসেছিল। সে হাঁসফাঁস করতে করতে কাতরস্বরে বলল, “সেনোরিটা! আপনি তখনই আমার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন যখন আমি বেঁচে থাকব...!”

সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অধিরাজকে ছেড়ে দিয়েছে, “স্যরি...স্যরি!”

“ইটস ওকে।” সে অল্প কেশে নিয়ে বলল, “আমি এই কেসটা ক্লোজ হলেই প্রণবেশদার

সঙ্গে কথা বলব। ওঁর আপত্তি না থাকলে আপনি থাকছেন মাদমোয়াজেল।” পবিত্র মাথা নাড়ল, “নিশ্চিন্ত থাকো। মিঃ লাহিড়ীর কোনো আপত্তি থাকার কথাই নয়। ইনফ্যাক্ট তুমি যে মুহূর্তে চাইবে, উনি তৎক্ষণাৎ মিস অরোরাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়বেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওইদিন উনি গঙ্গাস্নানটাও সেরে ফেলবেন।”

“কেন স্যার?” অর্ণব জানতে চাইল, “ওঁর কথায় তো তেমন কিছু মনে হল না!” “অর্ণব। তুমি জানো রাবণকে মারার জন্য আর লঙ্কার বারোটা বাজানোর জন্য রাম আর হনুমানের দরকার কেন পড়েছিল?”

অফিসার আচার্য-র কথা শুনে একেবারেই ঘেঁটে গেল অর্ণব। এর মধ্যে রাম আর রাবণ কোথা দিয়ে টপকে পড়ল! সে একটু অনিশ্চিতভাবেই বলে, “ডেস্টিনি?”

“একেবারেই নয়।” পবিত্র বুঝিয়ে বলে, “রাম আর হনুমানের প্রয়োজনই পড়ত না যদি লঙ্কায় রাবণের আর একটা জুড়ুয়া ভাই বা বোন থাকত। থাকার মধ্যে ছিল ওই কুম্ভকর্ণ, যে ব্যাটা স্রেফ ঘুমিয়েই লাইফ কাটিয়ে দিল। আর ঘরশত্রু হলেও নিতান্তই গোবেচারা বিভীষণ। নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই, অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রাখতে ওস্তাদ। আর শূর্পনখা চেরি অন টপ। কিন্তু ভেবে দেখো, যদি লঙ্কেশের আরও একটি দশমাথাওয়ালা, সমান গরম মেজাজের যমজ ভাই বা বোন থাকত তাহলে কী হত। সোনার লঙ্কা আগেই বরবাদ হয়ে যেত। দুটোই নিজেদের মধ্যে মারপিট করে, খিস্তি-খেউড় করে, বোম-টোম মেরে নিজেরাই মরে যেত, রাম-লক্ষ্মণ, হনুমান কাউকেই লাগত না। এখানেও তাই। লঙ্কায় অলরেডি একটা রাবণ বসে আছে। তার ওপর যদি লেডি রাবণ এসে টপকে পড়ে, তাহলে বাইরে নয়, হোমিসাইডের ভেতরেই এনকাউন্টার হয়ে যাবে। যে কোনো এলাকায় একটা গুণ্ডাই কাফি। তাই লাহিড়ীসাহেব বিন্দুমাত্রও আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না।”

পবিত্র-র কথা শুনে এতক্ষণে অধিরাজের মুখে ফের সেই শিশুসুলভ হাসিটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। অর্ণবও হাসছে। শুধু টুইঙ্কল গম্ভীর মুখে বলল, “পা-জি, আপনি কি আমাকে কায়দা করে রাবণ বলছেন?”

“নো মাই সিস্টার। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা আছে। আমি শুধু মিঃ লাহিড়ীকে রাবণ বলছি।”

মিস্ অরোরা আর কোনো কথা বাড়ায় না। তারা ইতিমধ্যেই ক্রাইমসিনের কাছে চলে এসেছে। পবিত্র গাড়িটাকে টার্ন নিয়ে গলির মধ্যে ঢোকাতেই দেখা গেল, এই সাতসকালেই সামনে প্রচণ্ড ভিড়। চার অফিসারই একটু অবাক হল। আশ্চর্য! এমন তো হওয়ার কথা নয়। এখনও কুয়াশা পুরোটা সরেনি। কিন্তু এখান থেকেই উত্তেজিত জনকোলাহল শোনা যাচ্ছে। শীতের সকালে মানুষজন এত সকালে খুব একটা ওঠে না। যাদের জীবিকার তাগিদ, একমাত্র তারাই এখন বাইরে বেরোয়। বাকিদের এখনও ঘুম ভাঙার সময় হয়নি। অথচ দেখে মনে হচ্ছে, গোটা লোকালয়ই ভেঙে পড়েছে সামনে। গুরুতর কিছু না ঘটলে এরকম হওয়ার কথা নয়। কী হল তবে?

“সামথিং ইজ ফিশি রাজা!” পবিত্র গাড়িটাকে দ্রুত সাইড করেছে, “সামনে যা ভিড়, তাতে আর গাড়ি এগোবে না। এত সকালে ভিড় কেন!”

“নট ওনলি ফিশি পবিত্র।” অধিরাজ প্রায় লাফিয়েই গাড়ি থেকে নামল, “সামথিং ইজ রটেন ইন দ্য স্টেট অব ডেনমার্ক! তোমরা বলছিলে না, বার্নিং শিখ চুপচাপ আছে? সে চুপ থাকার লোকই নয়। আরও একটা চমকের জন্য রেডি হও।”

ওরা চারজনেই অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ভিড় ঠেলেঠুলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল পি সি চৌধুরীর বাড়ির দিকে। এটা একটা ক্রাইমসিন। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের প্রহরা থাকার কথা। তেমনই কথা হয়েও গিয়েছিল। সাধারণ জনগণ সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। অথচ পি সি চৌধুরীর বাড়ির চতুর্দিকে উপচে পড়েছে জনতা। তাদের চিৎকার, ভয়ার্ত শোরগোলই বলে দিল, এখানে কিছু গোলমাল হয়েছে। একটু এগোতেই যা চোখে পড়ল তাতে ওদের চারজনেরই বিস্ময়ের অবধি থাকে না! বাড়িটার ভেতর থেকে কালো ধোঁয়া গলগল করে

বেরিয়ে আসছে। লালচে একটা অবদমিত আভাও সিলড দরজা জানলা দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাতাসে ভয়াবহ গন্ধ। ইঙ্গিতেই স্পষ্ট, ভেতরে আগুন লেগেছে!

পবিত্র উত্তেজিত হয়ে গেটটা খুলে নীচের দিকে না তাকিয়েই সেদিকে দৌড়োতে যাচ্ছিল। হঠাৎই তার পায়ের নীচে কী যেন একটা পড়ে জোরালো শব্দে ফট্ করে ফেটে গেল। আর মাটিটাও আশ্চর্য পিছল! সে স্লিপ করে ভারসাম্য হারিয়ে উলটে পড়ল মাটিতেই। দু-হাতের পাতা মাটিতে রেখে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেই একটা ভয়াবহ জিনিস আবিষ্কার করল পবিত্র আচার্য। দেখেই প্রায় শিউরে উঠে চেঁচিয়েই উঠেছে, "রা-জা!"

পবিত্র-র কিছু বলার আগেই সামনের দৃশ্যটা প্রকট হয়ে ধরা দিয়েছিল অধিরাজ, অর্ণব ও টুইঙ্কলের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে। পবিত্র-র পা যে জিনিসটার ওপর পড়েছিল, সেটা একটা রক্তাক্ত, ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের খুলি। কাটা একটা মাথা! পবিত্র-র দেহের চাপ আর ভারি বুটের আঘাত নিতে না পেরে একদিকটা সশব্দে ফেটে গিয়েছে। গোটা রাস্তাটা ভাসছে রক্তের ফেনায়। তাতেই পিছলে পড়েছে পবিত্র আচার্য। তার সারা গায়ে রক্ত মাখামাখি হয়ে আছে। শুধু খুলিই নয়, একগাদা কাটা মাংসের স্তূপও চতুর্দিকে ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে। যেন কেউ একপাল পশুকে পিস পিস করে কেটে রেখেছে। পার্থক্য শুধু একটাই। এই মাংসপিণ্ডগুলো কোনো ছাগল বা ভেড়ার নয়, মানুষের!

"হোয়াট দ্য...।"

অধিরাজ কথাটা শেষ করার আগেই টুইঙ্কল বমি করে ফেলল। এই দৃশ্য দেখে শুধু চক্ষুস্থির হয় না বা ভয় লাগে না, সঙ্গে প্রচণ্ড একটা দুর্দম বিবমিষাও পাকস্থলী থেকে উঠে আসে। মেয়েটার দোষ নেই। এ পর্যন্ত অনেক মারাত্মক, রক্তাক্ত ক্রাইমসিন সে দেখেছে। কিন্তু এরকম ভয়াবহ কিছু দেখার কথা মানুষ অতিবড়ো দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না। যতই পুলিশ হোক, মানুষ তো বটে। অর্ণব আর অধিরাজেরও গা গুলিয়ে উঠছিল। ওঃ! এ কী ভয়ংকর নারকীয় দৃশ্য। জীবনে ভাবেনি এমন দিনও দেখতে হবে। স্লটারহাউজের বীভৎসটাই চরম মনে হয়েছিল ওদের। এখন মনে হচ্ছে, ওটা কিছুই না। অধিরাজ তাড়াতাড়ি টুইঙ্কল অরোরাকে সামলায়। টুইঙ্কল তার কাঁধের ওপর ভর দিয়ে অনেকটা বমি করে একটু সুস্থ হল। সে মেয়েটার হাতে একটা ছোট জলের বোতল ধরিয়ে দিয়েছে। এই জলের বোতল থেকে একটু আগেই নিজেই জল খেয়েছিল, তাই বোতলটা সঙ্গেই রয়ে গিয়েছে। টুইঙ্কল আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল। তার মুখ বিবর্ণ। অধিরাজ উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চায়, "মিস্ অরোরা, আপনি ঠিক আছেন?"

কোনোমতে লেডি অফিসার মাথা নেড়ে জানায় যে সে ঠিক আছে। ওদিকে পবিত্র যতবার হাতে পায়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, ততবারই পিছলে যাচ্ছে। মাটি প্রায় দেখাই যায় না। তার ওপর রক্তের মোটা প্রলেপ যেন হিংস্র হাসি হাসছে। যতবার হাতে বা পায়ে জোর দিচ্ছে ততবারই স্কিড করছে। তার হাতের সামনে একটা অদ্ভুত শেপের বিরাট লম্বা দড়ি ছিল। লম্বায় প্রায় ষোল সতেরো ফুট। সে কোনোমতে দড়িটা আঁকড়ে ধরে বলল, "অর্ণব! হেল্প। আমি উঠতে পারছি না। দড়িটা ধরে টানো প্লিজ।"

দড়িটা এঁকেবেঁকে গেট অবধি এসেছে। অর্ণব তাড়াতাড়ি ওটাকে দু-হাত দিয়ে ধরেই থমকে গেল। পরক্ষণেই সে-ও হড়হড়িয়ে বমি করে ফেলেছে। দড়িটাকে হাত থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। অধিরাজ সভয়ে দেখল ঘেন্নায়, কষ্টে তার দেহ কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে টুইঙ্কলকে একপাশে সযত্নে বসিয়ে দিয়ে ছুটে গেল অর্ণবের দিকে। অর্ণবের ফর্সা মুখ ততক্ষণে লাল টকটকে। রীতিমতো ঘামছে। হাবেভাবেই স্পষ্ট যে একটা প্রচণ্ড আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অধিরাজ তাকে ধরে ফেলল, "অর্ণব!"

অর্ণব অতিকষ্টে থেমে থেমে জবাব দেয়, "স্যার...। পবিত্র, স্যারের হাতে ওটা দড়ি নয়...!"

"দড়ি নয়? তবে?"

সে শুধু উচ্চারণ করল, "ওটা হিউম্যান ইনটেস্টাইন...!"

বলতে বলতেই আবার বমির দমক এল। অর্ণব পুরো বেঁকে গিয়েছে। সে আপ্রাণ নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছে। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে ঘেন্না পায় বলেই তো মেডিক্যাল কলেজের পাঁচিল টপকে পালিয়ে এসেছিল। অথচ আজ সেই মানুষের অস্ত্র তার হাতে! ভাবতেই সর্বশরীর ঘিন ঘিন করে উঠছে। অধিরাজ তাকে ধরে ফেলে বলল, "ইটস্ ওকে... ইটস্ ওকে... থ্রো আপ! চেপে রাখার চেষ্টা কোর না। থ্রো ইট আপ...! ইউ উইল ফিল বেটার...!"

এদিকে টুইঙ্কল অরোরার মতো তেজি মেয়েরও এই অবস্থা। তার মধ্যে অর্ণব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পবিত্র কী করবে বুঝতে পারছে না। ফেনায়িত তাজা রক্তে ভাসছে। আজই তার পরনে সাদা শার্ট ছিল। অথচ এখন সেটা রক্তাভ লাল। তিন অফিসারের অবস্থা দেখে অধিরাজ নিজেই কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারছিল না। একবার এদিকে দৌড়চ্ছে, আর একবার ওদিকে। টুইঙ্কল চোখ বুজে ওখানেই বসে আছে। অর্ণব এখনও কাঁপছে। বমি হয়ে যাওয়ার পরও ঘেন্না আর দুর্বলতা তাকে ছাড়ছে না। ওদিকে পবিত্র-রও হেল্প দরকার!

সে সযত্নে অর্ণবকে জল খাইয়ে দেয়। তারপর তাকেও টুইঙ্কলের পাশেই বসিয়ে দিয়ে বলল, "অর্ণব, মিস্ অরোরা—দু-জনেই এখানে একটু বসুন। ওদিকে এখন তাকাবেন না। কিচ্ছু হয়নি। ওকে? জাস্ট স্টে হিয়ার... স্টে সেফ।" অর্ণব ক্লান্তস্বরে উত্তর দেয়, "ইয়েস স্যার...!"

তার কাঁধে একটা আলতো চাপ দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল অধিরাজ। তারও উপায় নেই। অতি সন্তর্পণে গেট খুলে পবিত্র-র দিকে এগোল। নীচের দিকে তাকাতে তারও বুক কাঁপছে। বিভিন্ন দেশের, অনেক ভাষার অনেকরকম 'মিথে' রক্তের নদীর কথা অনেকবার শুনেছে ঠিকই। কিন্তু জীবনে এই প্রথম দেখল। বীভৎস বললেও কম বলা হয়। মাটিতে মিশে ঘন কালচে লাল রক্ত প্যাচপ্যাচ করছে। কিছুটা তরল! তার মধ্যেই টুকরো টুকরো মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোথাও কোথাও ভাসছে। কোথাও হাতের পাতা, কোথাও একগাদা আঙুল। উরু, হাঁটুও চোখে পড়ল। বাকি নেই আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গও। একটা রক্তমাখা প্লীহা চোখে পড়তেই একমুহূর্তের জন্য চোখ বুজে ফেলল অধিরাজ। মনে মনে নিজেকেই বলল, "স্টেডি... স্টেডি....!"

পবিত্রও ততক্ষণে চতুর্দিকের দৃশ্যটা দেখে যা বোঝার বুঝে গিয়েছে। কাল ক্রাইম সিন সিল করে দিয়ে এখানে নিরাপত্তারক্ষী দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল লোকাল পুলিশ। এই দেহাংশ সম্ভবত সেই হতভাগ্য নিরাপত্তারক্ষীদেরই। কারণ উর্দিগুলোও তার মধ্যেই টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। সে সভয়ে বলে, "আমাদের ঝালটা বোধহয় ওদের ওপর দিয়েই ঝেড়েছে।"

অধিরাজ দাঁতে দাঁত চেপে পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। সে কোনো জবাব দিল না। এই মুহূর্তে একটুও যদি ভারসাম্য হারায় তবে সে-ও আর সহজে উঠে দাঁড়াতে পারবে না। পা-টা ঠিকভাবে রাখার জায়গাটুকুও নেই। মানুষের দেহের টুকরো ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে আছে, তার মধ্যে পিচ্ছিল চটচটে রক্ত! অর্ণব আর টুইঙ্কলের মতো তারও আঁশটে দুর্গন্ধে প্রায় অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছে। ভনভন করতে করতে কতগুলো নীলরঙের মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দু-একটা তার গায়েও এসে বসার চেষ্টা করছে। তবু নিজেকে অতিকষ্টে স্থির রেখে সে এগিয়ে গেল পবিত্র-র দিকে। একটু ঝুঁকে পড়ে হাত এগিয়ে দিয়েছে, "ওঠো! সাবধানে...!"

পবিত্র তার হাত ধরল। অধিরাজ আপ্রাণ শক্তিতে তাকে লিফট করার চেষ্টা করছে। সে পায়ের সবটুকু জোর জড়ো করে এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস চালাচ্ছে। যদিও কাজটা সহজ ছিল না। গেটের বাইরের জনতা অপ্রয়োজনীয় চিৎকার-চেঁচামেচি করে যথেষ্টই বিরক্ত করে চলেছে। পবিত্র ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে দু-একবার পিছলে গিয়েছিল; তাতেই রব উঠল, "গেল... গেল..."

সে একবার জনতার দিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকায়। এদের কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। সামনে কতগুলো কেটে টুকরো টুকরো করা লাশ রক্তে ভাসছে। বাড়িটার ভেতর থেকে জোরদার আগুনের হলকা বেরোতে শুরু করেছে। একজন পুলিশ অফিসার ধরাশায়ী, অন্যজন প্রাণপণে তাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। তার মধ্যে লোকগুলো চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার ফোন বের করে ভিডিও তুলছে। যেন এখানে আই.পি.এল.-র টোয়েন্টি-টোয়েন্টি ম্যাচ চলছে। এখানে একটা বাড়িতে আগুন জ্বলছে, খুনোখুনি হয়ে গিয়েছে, সবাই সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আর ফটো তুলছে। এদের মধ্যে একজনও পুলিশ কিংবা ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করার কথা ভাবেনি। ওরা ক্রাইম সিন ভিজিট না করতে এলে জানতেই পারত না যে এখানে এতসব কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। সবাই চিৎকার করছে, ভিড় জমাচ্ছে, অথচ কাজের কাজ কেউ করছে না! অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব!

"কাম্ অন্ পবিত্র।" অধিরাজ তার হাত টেনে ধরেছে, "ওদিকে তাকিও না। উঠে দাঁড়াও...!"

"ইয়েস স্কিপি...।"

অতিকষ্টে, টেনেটুনে অবশেষে পবিত্রকে দাঁড় করানো গেল। সে নিজের অবস্থা একঝলক দেখে বলল, "ইশশ্। আমি কোন্ কুক্ষণে গাধার মতো ঠিকমতো না দেখেই ভেতরের দিকে দৌড়চ্ছিলাম। ব্যুরোয় ফিরে স্নান করতে হবে।"

"অর্ণব আর মিস্ অরোরার অবস্থা আরও খারাপ।" অধিরাজ চিন্তিত স্বরে জানায়, "এই সিন দেখে ওরাও একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

পবিত্র কোমরে হাত দিয়ে চতুর্দিকটা ভালো করে দেখল। তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও আতঙ্কের মিশ্রণ, "এ আদতে কী জিনিস রাজা? মানুষ না অন্যকিছু?"

"২০১৮ সাল অবধি মানুষই ছিল।" অধিরাজ মোবাইল বের করে এনে ফায়ার ব্রিগেডের নম্বর ডায়াল করতে করতে বলল, "এখন যা হয়েছে তা তুমি নিজের চোখেই দেখছ!"

এতক্ষণে বাড়ির ভেতরের অবদমিত আগুনটা বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভলকে ভলকে জ্বালাময়ী শিখা উদগার করে আগুনের লোলজিহ্বা বাড়ির বাইরেটাও সাপ্টে নিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে অধিরাজ হতাশভাবে মাথা নাড়ে। এই ক্রাইমসিন আর তল্লাশি করে দেখা যাবে না! তেজি আগুন সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। এর মধ্যে কোনোরকম ক্লু বা এভিডেন্স খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। লোকটা জানত যে সি.আই.ডি. হোমিসাইডের টিম মার্ডার ওয়েপনের খোঁজ করতে আবার ঠিকই ফিরে আসবে। তাই কোনো চান্সই নেয়নি। গোটা বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আর এ আগুন একমাত্র ফায়ারব্রিগেডই নেভাতে পারে। রাতে যারা পাহারায় ছিল, সেইসব পুলিশকর্মীকেও টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। এই বডি বা দেহাংশগুলোর আর কিছু করার নেই। একা আহেলির পক্ষে এতগুলো লাশ সামলানো সম্ভব নয়। ডঃ চ্যাটার্জি যতক্ষণ না আবার আসছেন, ততক্ষণ টুকরোগুলোকে রেখে দেওয়া ছাড়া আর কিচ্ছু করা যাবে না। অধিরাজ মনে মনে বুঝতে পারল, আবার এক কদম পিছিয়ে গেল ওরা। যদি-বা মার্ডার ওয়েপনের কিছু কারিকুরি বোঝার সুযোগ ছিল, সেটাও হাতছাড়া হয়ে গেল।

সে আপনমনেই বলল, "স্লগ ওভার শুরু হয়ে গিয়েছে পবিত্র। কোমর কষে নাও। এ লোক এবার হাত খুলে পেটাবে! কী আসছে, বাউন্সার, ইয়র্কার না ফুলটস দেখবেই না, স্রেফ মারবে। গত দু-দিন ধরে যা দেখছ, সেটা নেহাৎ ট্রেলার ছিল। আজকে ওর সবচেয়ে বিধ্বংসী রূপ দেখার অপেক্ষা করো।"

"আরও বিধ্বংসী! এর থেকেও বেশি কিছু হতে পারে?"

"১৯৮৪ সালের ওই বাহাত্তর ঘণ্টায় সবচেয়ে মারাত্মক ছিল শেষ কয়েক ঘণ্টা। এ লোক সেই দিনগুলোকেই রি-ক্রিয়েট করছে। শুধু অন্যভাবে। তাই শেষ রাত্রে ও ওস্তাদের মার দেওয়ার ডেসপারেট চেষ্টা করবে।" তার মুখে ফের চিন্তার মেঘ, "আমরা এর আগে যা ভুল

করেছি, করেছি। এবার আর একটাও ভুল করা যাবে না। একটাও না!”

“কিন্তু ওর মার্ডার ওয়েপনগুলো তো আমরা সরিয়ে নিয়েছিলাম! কিছুটা অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয়েছে। নতুন হাতিয়ার আবার কোথা থেকে আমদানি হল?”

“সব ওয়েপন ধ্বংস হলেও কিছু জিনিস ও একদম হাতের কাছে রেখেছে নিশ্চয়ই।” অধিরাজের দৃষ্টি প্রখর, “সবচেয়ে বড়ো কথা গ্যাসের উৎস আমরা এখনও খুঁজেই পাইনি। যে অন্ধকারে ছিলাম, সেই অন্ধকারেই আছি।”

“তবে?”

“তবে?” পবিত্র-র কথা শুনে সে একটু মৃদু হাসল, “এখনও তেমন কিছুই হয়নি। আসল কাণ্ড তো সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হবে।”

“আরও লাশ পড়বে।” পবিত্র স্তম্ভিত, “কার?”

“জানি না। কিছু মিস্‌হ্যাপ আমরা আটকাতে পারব। কিন্তু সবগুলো ঠেকাতে পারব না।” অধিরাজের কণ্ঠস্বরে হতাশা, “এত প্রচেষ্টার পরও অন্তত একটা তরোয়াল বা চপার এখনও ওর কাছে আছে। গ্যাস আছে। সেটা প্রয়োগের মাস্টারস্ট্রোকও ওর জানা, কিন্তু আমরা জানি না। আর যদি ভুল না করি, তবে পেট্রোলও আছে। ঈশ্বরকে অসীম ধন্যবাদ যে অ্যাসিড বা বম্ব নেই। কিন্তু ওর মারাত্মক স্ট্র্যাটেজিটা আছে। আজ সূর্যাস্তের পর ও আমাদের কনফিউজ করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সবকিছু হতে পারে। দেখে নিও।”

“তবে?”

অধিরাজ জোরদার একটা সাইরেনের শব্দ শুনে সামনের দিকে তাকায়। ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি ঢুকছে। সে আত্মমগ্নভাবেই বলল, “ভেবো না ব্রাদার-আজ রাতেই বার্নিং শিখের চ্যাপ্টার আমি ক্লোজ করব। সমূলে উৎখাত যাকে বলে। কলকাতাতেই ওর খেলা শেষ হবে। শুধু লোকটার জন্যই দুঃখ হয়! ও এটা ডিজার্ভ করত না। কিন্তু ওকে থামাতেই হবে...!”

পবিত্র শেষের কথাগুলো শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। লোকটার জন্য দুঃখ হয় মানে? কোন্ লোক? বার্নিং শিখ?

বার্নিং শিখের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছে অধিরাজ! সে কী!

** * *

(২৫)

অনেকক্ষণ ওরা কেউ কোনো কথা বলেনি।

অর্ণব আর টুইঙ্কল এখন কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। অবশ্য টুইঙ্কলের চাঙ্গা হতে আটটা চিকেন ক্লাব স্যান্ডউইচ, দু-গ্লাস হট চকোলেট ও চারটে চুরুট লেগেছে। কিন্তু অর্ণব প্রথমে কিছুই মুখে তুলতে পারছিল না। অধিরাজ উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে যতবার কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করছে, ততবারই সে নঞর্থক ভাবে ঘাড় নেড়েছে। একটু লিকার চা খাওয়ার চেষ্টা করেছিল। অথচ তরলটা দেখেই মনে হল, ওটা চা নয়। কাঁচা রক্ত গ্লাসে ভাসছে! কিছুতেই সে চা পান করতে পারল না। বরং হাত কাঁপছিল তার। মনে হচ্ছে, মানুষের ওই চটচটে রক্তাক্ত অস্ত্রটা বুঝি এখনও তার হাতে লেগে আছে। তার দুর্গন্ধ কিছুতেই পেছন ছাড়ছে না। অধিরাজ সেটা লক্ষ্য করেই বোধহয় কোথা থেকে নীরবে ব্রেড আর দুধের গ্লাস নিয়ে এসেছিল। দুধের সাদা রংটাই শেষপর্যন্ত বাঁচাল অর্ণবকে।

"থ্যাংকস স্যার...!" সে একটু হাসার চেষ্টা করে, "মিস আ লট।"

অধিরাজের চোখে কৌতুক, "এনি টাইম স্পেশাল ওয়ান!"

অর্ণব হেসে ফেলেছিল। তারপর থেকে একটু স্বাভাবিক হয়েছে। পবিত্র ও নিজের রক্তাক্ত ধড়াচুড়ো সব পালটে নিজেকে সাফ করে নিয়েছে। এইমুহূর্তে ওরা আর্বানার দিকে যাচ্ছে। গুরশীল ও আমনদীপকে বাজিয়ে দেখাই আপাতত ওদের মূল উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে বাকিদেরও একটু দেখে নেবে। সকালের ঘটনাটা অধিরাজ আশা করেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু বাকি তিন অফিসার দুঃস্বপ্নেও এমন আশঙ্কা করেনি। পবিত্র কখনোই কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাবে না। তাই সে অতটা ধাক্কা খায়নি। কিন্তু অর্ণব একেবারে ভেতর অবধি কেঁপে গিয়েছে! ওই শূন্য ঘরে এমন কী ছিল যে গোটা বাড়িটাকেই আগুন লাগিয়ে দিতে হল। যে পুলিশকর্মীরা পাহারা দিচ্ছিল, তারাই-বা কী অপরাধ করেছে যে অমন নৃশংসভাবে তাদের মারতে হবে। ইসমাইল বা সনৎকে তবু চেনা যাচ্ছিল। এদের তো চেনাই দায়! অধিরাজের ক্ষমতা আছে বলতে হবে যে সে লোকাল পুলিশদের সঙ্গে ওই রক্তে ভাসা ক্রাইমসিন ঘুরে ঘুরে দেখছিল ও অভ্যস্ত হাতে এভিডেন্স কালেক্ট করার চেষ্টা করছিল। বেশ কয়েকটা রক্তমাখা শূন্য চায়ের কাপ রীতিমতো ভুরু কুঁচকে তুলে তুলে পরীক্ষা করে দেখে এভিডেন্স ব্যাগে ভরেও নিল। তার হাতের সাদা গ্লাভসটা পুরো লাল! পবিত্র-র মতো লোকেরও অতখানি সাহস হয়নি। লোক্যাল পুলিশ টিমকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা ওখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে। নেহাৎ স্বয়ং আই জি, হোমিসাইড কোনোকিছুর তোয়াক্কা না করে ক্রাইমসিন পরীক্ষা করছেন দেখে তারাও বাধ্য হয়ে মাঠে নামল। নয়তো স্রেফ উলটো দিকে পিটটান দিলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

ফায়ার ব্রিগেড যতক্ষণে অতি কষ্টে গোটা বাড়ির আগুন নেভাল, ততক্ষণে ভেতরে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। আততায়ী একটা জানলা কেটে ভেতরে ঢুকেছিল। পেট্রোলের গন্ধে বুঝতে বাকি নেই যে আগুনটা ঠিক কেমন করে লেগেছে। ঘরে যা যা ছিল সবই পুড়ে ছাই! এভিডেন্স বলতে আর কিছু পড়েই নেই। ফার্নিচার থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রিক্যাল গ্যাজেট—কিছুই অক্ষত নেই। অধিরাজ তবু একবার অক্ষম একটা প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। নাঃ, এই সিন থেকে কিচ্ছু বোঝা সম্ভব নয়। তৃতীয় দিনের শুরুতেই বার্নিং শিখ পেল্লায় একটা ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছে। তাকে আর পবিত্রকে শেষ করতে না পারার রাগে, সাময়িক হারের জ্বালায় সে চরম নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। গুল্লুকে আরও একটু আগে সতর্ক করতে পারলে হয়তো এই ট্র্যাজেডিটা আটকাতে পারত। অথচ ঠিক তখনই ক্লোরোফর্মের নেশায় পড়ে ছিল অধিরাজ। সেই সুযোগেই যা করার লোকটা করে দিয়ে গেল। ক্রাইম সিন লোকাল পুলিশ টিম সিকিওর্ড রেখেছিল। কেউ ভাবতেই পারেনি যে অ্যাটাকটা এদিক দিয়ে আসবে!

তারপর থেকেই সরাসরি গুল্লুর সঙ্গে কন্ট্যাক্টে আছে অধিরাজ। গুল্লু জানিয়েছে, যাঁকে নজরে রাখা হচ্ছে, তিনি এখনও বাড়ি থেকেই বেরোননি। তার ছেলেপুলে লেগে আছে তাঁর পেছনে। একজন নয়, অনেকজন নজর রাখছে। ওরা আশেপাশে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছে যে তিনি সারারাত বাইরেই ছিলেন এবং ভোরে ফিরেছেন। তারপর থেকে বাড়িতেই আছেন। এখনও কোনো নড়াচড়া নেই।

এর মধ্যেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো লোকে, ওই বীভৎস ক্রাইমসিনের দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করে দিয়েছে। সকাল সকাল যাঁরা সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম খুলে বসেছিলেন, তাঁদের সকলের আক্কেল গুড়ুম। সকালের চা-ব্রেকফাস্ট আর খেয়ে উঠতে পারেননি তাঁরা। ওই দৃশ্য দেখার পর কিছু মুখে দেওয়া সম্ভবই নয়। লোকে জানে, তবু পোস্ট করবে। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই ভাইরাল! ইউটিউবাররাও প্রথমে রিপোর্টিং শুরু করেছিল, 'এই দেখুন, রক্তে ভেসে যাওয়া ক্রাইমসিন!... ওই দেখুন কাটা হাত-পায়ের স্তূপ...' বলে। কিন্তু পুলিশ ডান্ডা উঁচিয়ে তাড়া করতেই আপাতত পালিয়ে গিয়েছে। গোয়েন্দা দপ্তর, সাইবার টিম কোনোমতে সামাল দিয়েছে ঠিকই। ভিডিও এবং ছবিগুলোও আপাতত উড়ে গিয়েছে। তবে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। বার্নিং শিখের কাজের বীভৎসতায়, আতঙ্কে ফের কলকাতার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম!

একেই একদিকে প্যানিক যতটা সম্ভব ছড়িয়ে গিয়েছে। এডিজি সেনের নাভিশ্বাস উঠছে প্রেস কনফারেন্স করতে-করতে। বেচারা শিশির সেন বারবার অনুরোধ করছেন, মানুষ যেন অযথা প্যানিক না করে। এটা কোনোরকম আতঙ্কবাদী অ্যাটাক নয়, কিংবা উগ্রপন্থীদের সঙ্গেও এর সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাংবাদিকরা মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য খোদ পুলিশের গাড়িতে বম্বিং, প্রকাশ্য রাস্তায় ফায়ারিং, জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারের বিস্ফোরণ হতে হতে বাঁচা, গণহারে হত্যা হওয়ার পরও কী করে সি.আই.ডি., হোমিসাইড সবাইকে শান্ত থাকতে বলতে পারে। কে বলতে পারে এরপর হয়তো রাস্তার মধ্যেই কিলোদরে বিস্ফোরণ হতে শুরু করবে। এডিজি সেন তাদের আশ্বস্ত করতে-করতে প্রায় গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন। মানুষ ভয় পেতে ভালোবাসে, আর মিডিয়া ভয় দেখাতে। বার্নিং শিখের কাণ্ডকারখানায় আর কিছু না হোক, টি আর পি চড়চড়িয়ে উর্ধ্বগামী।

"তুমি গুল্লুকে কাকে স্টক করতে বললে রাজা?"

অনেকক্ষণের নিস্তব্ধতা ভেঙে অবশেষে পবিত্র বলে ওঠে, "বার্নিং শিখের কোনো লিঙ্ককে? ওই ভদ্রলোক, কী যেন নাম.... মনে পড়েছে, জগদীপ সিং ভাট্টিকে?"

"না।" সে খুব শান্তস্বরেই উত্তর দেয়, "তিনি অলরেডি বিশ্ব-র র‍্যাডারেই আছেন। কাল রাতে কোথাও যাননি। সারা রাত বেচারা বিশ্বজিৎ ওঁর নাসিকাগর্জন শুনেই কাটিয়েছে। আজ সকালে দুধ-কর্নফ্লেক্স খেয়ে ব্রেকফাস্ট করেছেন। এখনও বাড়িতেই বসে মিটিং-এর তোড়জোড় করছেন। গুল্লুর টিম ওঁকে স্টক করছে না। তারা খোদ বার্নিং শিখকেই ম্যান টু ম্যান মার্কিং-এ রেখেছে।"

"কী!" পবিত্র প্রায় লাফিয়ে ওঠে, "বার্নিং শিখ কোথায় আছে সেটা তুমি জানো?" "শুধু আমি কেন?" সে জানায়, "তোমরা সবাই জানো।" "আমরা সবাই!"

"জানা তো উচিত।" অধিরাজ নির্লিপ্ত মুখে বলে, "সব তোমার চোখের সামনে আছে, শুধু দেখে নাও৷"

"চোখের সামনে আছে মানে? চোখের সামনে আছেটা কী?" পবিত্র স্তম্ভিত, "তুমি যা দেখছ, আমরাও তাই দেখছি। তুমি যা জানছ, আমরা সবাই তাই জানি! তুমি একা কোথাও যাওনি, কারোর সঙ্গে কথা বলোনি, আমরা কেউ-না কেউ তোমার সঙ্গে ছিলাম। তাহলে একা তুমিই টের পেলে কী করে? আমরা তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না!"

"বউদি আর সানি লিওনি চোখের সামনে থেকে সরবেন, তবে তো দেখতে পাবে।" সে মৃদু হাসল, "নয়তো তুমিও জানতে, হোয়্যার টু গো অ্যান্ড হোয়াট টু ডু।"

“তার মানে তুমি সব জানো! কে এই বার্নিং শিখ?”

একা পবিত্র নয়, টুইঙ্কলও এখন বিস্মিত দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকেই দেখছে। ওদের সবার কাছেই এটা একটা চরম বিস্ময়। শুধু অর্ণব আগে থেকেই জানত যে সে কিছু আন্দাজ করেছে। কিন্তু প্রমাণাভাবে কিছু করে উঠতে পারেনি। কিন্তু কী আঁচ করেছে, কীভাবে করেছে—তা তার জানা নেই। সে জানে, সময় এলেই স্যার সব খুলে বলবেন।

“দুর্ভাগ্যবশত সবটা জানি না।” তার মুখে এবার একটু চিন্তা, “একটা পাজলের উত্তর এখনও পাইনি। সেটা পেলেই আর কিছু অজানা থাকবে না। তবে আমার জানা যথেষ্ট নয়, আইনের জানা বেশি জরুরি। নয়তো আজকাল সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সও তেমন স্ট্রং প্রমাণিত হচ্ছে না। জজসাহেব তো বলার জন্য বসেই আছেন, “বেকসুর খালাস!”

“আমরা কিছুটা হলেও মোক্ষম এভিডেন্স পেয়েছি।”

“পেয়েছি পবিত্র। সেটা বার্নিং শিখও জানে। সেজন্যই এত খেপেছে!” অধিরাজ একটু চিন্তিত, “সে এটাও জানে যে এই এভিডেন্সগুলো তখনই লাগবে যখন আমরা তাকে কোর্টে তুলব। তার আগেই সে নিজের কাজ শেষ করে কেটে পড়বে।”

“কিন্তু লোকটা কে? নাম কী?”

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “নামটা বহুবার তোমরা শুনেছ। গুলশন সিং ওরফে গুল্লু। একটি কথাও সে নিজের সম্পর্কে মিথ্যে বলেনি।”

“কিন্তু সিনে তো এই গুলশন সিং নামক ব্যক্তিটি ছাড়া বাকি সবাই আছে। গুল্লু একটাই আছে, কিন্তু সে গুলশন সিং নয় গুলাব সিং। গোটা কলকাতাই আছে, মনুমেন্ট আছে, হাওড়া ব্রিজ আছে, ময়দান ভিক্টোরিয়াও আছে, পিসি-ভাইপো সবাই উপস্থিত—শুধু সে ব্যাটাই নেই।” পবিত্র মহা বিরক্ত, “এ তো মহা বিপদ। যে লোকটাকে চোখেই দেখা যায় না, উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না, তুমি তার দিকে আঙুল তুলছ। এ তো ঘোস্ট মার্ডারার দেখছি! তুমি কি বাতাসের পেছনে দৌড়চ্ছ?”

“কমলার পেছনে দৌড়ে তোমার তাকে বাতাস বা ঘোস্ট বলে মনে হয়েছে বুঝি?” সে ঠোঁট টিপে হাসল, “বেশ...বেশ...।”

পবিত্র আর কিছু বলল না। সে খুব ভালোভাবেই জানে যে বলে কোনো লাভ নেই।

তাছাড়া ততক্ষণে ওদের গাড়ি আর্বানার বিশাল গেট দিয়ে ঢুকছে। তার মনে প্রশ্ন অনেক, কিন্তু আপাতত চেপে গেল। এখন টার্গেট গুরশীল ও আমনদীপ। কে জানে, ওদের কথাই বলছে কিনা। আত্রেয়ী কিছুক্ষণ আগেই ইনফর্ম করেছে যে ওরা ফ্ল্যাটেই আছে। এখনও কেউ বেরোয়নি। বাকি বাসিন্দারাও আছেন।

এখনও পর্যন্ত যতবার এখানে এসেছে অর্ণব, ততবারই তার মন খুশিয়াল হয়ে উঠেছে। বড়ো সুন্দর এই কমপ্লেক্সের পরিবেশ। চতুর্দিকে সবুজের ঢল দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, মন প্রশান্তি পায়। এমন জায়গায় থাকতে পারলে বোধহয় মন খারাপ নামক বস্তুটা কাউকে স্পর্শই করবে না। মুহূর্তের মধ্যে যে কেউ ভুলে যাবে যে তারা ইট-কাঠ-পাথরে ভরা কলকাতা শহরে আছে। এমনও ভুল হয়, যে হয়তো আশেপাশেই কোনো অরণ্য রয়েছে, অথবা শান্ত নদী কুলকুলিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ‘হোম সুইট হোম’ বোধহয় একেই বলে। একদম শান্তির স্বর্গ।

অথচ সেই স্বর্গটাই এখন অসুরের দখলে! আর্বানার সিকিউরিটি নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অসম্ভব কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্য দিয়ে মাছিও গলতে পারবে না। অধিরাজদেরই বারবার নিজেদের আই ডি দেখাতে হয়। কিন্তু যখন শয়তানটি বার্নিং শিখের মতো চতুর, তখন তাকে আটকানো একরকম অসাধ্যই। সে একেবারে ভেতরে ঢুকে বসে আছে। বাইরে থেকে কিছু করার উপায় নেই।

এতক্ষণে এখানকার সকালও রুটিনমাফিক শুরু হয়ে গিয়েছে। কর্মীরা কাজ করতে ব্যস্ত। লনে, ঘাসে, ফুলগাছে জল দেওয়া হয়েছে একটু আগেই। স্বচ্ছ জলবিন্দু এখনও ঘাসের বুকে ঝিলিক মারছে। সদ্য ফোটা ফুলের নিষ্পাপ মুখে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সবচেয়ে যেটা

স্বস্তিদায়ক, সব কিছুই এখানে বড়ো নিঃশব্দে ঘটে। শহরের কোনোরকম কোলাহল, কোনোরকম দূষণ স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু মানুষের মনের দূষণ, অশান্তি কোথায় যাবে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা সবাই দ্রুত ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাটের সামনে হাজির। কলিংবেল বাজাতেই মিস্ দত্ত উঁকি মারল। সে প্রস্তুত হয়েই বসেছিল। অধিরাজকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "স্যার, আপনি কেমন...!"

"ঠিক আছি।" সে তার কথা শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত প্রশ্ন করল, "গুরশীল?" আত্রেয়ী অঙ্গুলিনির্দেশে দেখিয়ে দিল ফ্ল্যাটটা। গলা নামিয়ে বলল, "ঘরে আছে।" "আপনি সবার পেছনে আসুন।" অধিরাজ নির্দেশ দেয়, "যদিও ছবি দেখেছি। তবু চিনতে বা বুঝতে না পারলে সাবটাইটেল দিয়ে দেবেন।"

মিস্ দত্ত ফিক্ করে হেসে ফেলেছে, "ওকে স্যার।"

ওরা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে গুরশীল-আমনদীপের ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অধিরাজ একটা শ্বাস টেনে টুইঙ্কলের দিকে তাকিয়েছে, "আপনার হাতের খবর কী? সে আজ কুচুপুচু করতে চাইছে, না গোলুগোলু সেনোরিটা?" "দুটোই।"

'কুচুপুচু' আর 'গোলুগোলু' শুনে টুইঙ্কল এখন ফুল চার্জড হয়ে গিয়েছে। সে দ্রুতবেগে হাতা গুটিয়ে নিচ্ছে, "শুধু একবার বলে দেখুন স্যার।"

"বলব।"

তার দৃষ্টি এবার অর্ণবের দিকে ফেরে। ইশারাটা বুঝেই অর্ণব কলিংবেলের ওপর ফুলফোর্সে চাপ দিল। পুলিশ কখনোই বন্ধ দরজার সামনে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত নয়। তাই সে বারংবার ডোরবেল বাজাতেই থাকল যাতে ভেতরে থাকা মানুষের কান ঝালাপালা হয়ে যায়। এই টেকনিকটা সম্প্রতি টুইঙ্কলের কাছ থেকেই শিখেছে। একদম তাকে নকল করেই বেলটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মিস্ অরোরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, "টু-উ গুড পা-জি!"

অর্ণব মুখ টিপে হাসে, "থ্যাঙ্কস্ মিস্।"

"আরে, কে বেল বাজাচ্ছে!"

ভেতর থেকে একটা বিরক্তিমাখা পুরুষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আসছি তো। দো মিনিট ইয়ার। হু ইজ দিস?"

পবিত্র এবার অর্ণবকে সরিয়ে দুমদাম করে দরজা পিটিয়ে বলে, "ডেলিভারি ম্যান।" তার ডায়লগ শুনে অধিরাজ নিজেই ব্যোমকে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় তার দিকে। তার চোখে বিস্ময় আর প্রশ্ন, "ডেলিভারি ম্যান! বলার জন্য তুমি এটাই পেলে?" পবিত্র অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকোয়, "ইয়ে... মানে ম্যাডামের ডেলিভারির টাইম হয়ে গেছে কিনা!"

কী ভয়াবহ যুক্তি। অধিরাজ তাকে আর কিছু বলার আগেই দরজা সশব্দে খুলে গিয়েছে। সামনে একজন চকচকে যুবক। ফর্সা, লম্বা। সুদর্শন বলাই যেত, তবে চোয়ালটা ভারি হওয়ার দরুণ একটু অদ্ভুত দেখতে লাগে তাকে। পেছন দিক দিয়ে আত্রেয়ীর চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল অর্ণব, "আমনদীপ।"

আমনদীপ একটু অবাক হয়ে ওদের সবার দিকে তাকায়, "ডেলিভারি? কীসের ডেলিভারি? আমরা তো কিছু অর্ডার করিনি।"

অধিরাজ তাকে প্রায় অসভ্যের মতোই এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে পড়ল, "স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে আসছি। আমাদের কাছে খবর আছে যে আপনার স্ত্রী বা গার্লফ্রেন্ড প্রেগন্যান্ট অবস্থায় সিগারেট টানছেন, ড্রাইভিং করছেন এবং অনেক সময় লিফটের জায়গায় সিঁড়িও ভাঙছেন। আপনি কি জানেন এগুলো বিপজ্জনক? সেজন্যই আমরা এসেছি।"

"কিন্তু... আপনারা...

আমনদীপের চোখ এমনিতেই কপালে উঠেছিল। সে আমতা আমতা করে বলে, "স্বাস্থ্যবিভাগের কোন্ শাখা থেকে...?"

"নতুন স্কিম।" অধিরাজ দুষ্টু হাসল, "দুয়ারে ডেলিভারি। শোনেননি?"

"হোয়াট?"

"আপনার বান্ধবী কোথায়? তাঁকে দেখছি না তো?" সে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এসেছে। চোখের ইঙ্গিতে টুইঙ্কলকে এগিয়ে আসার ইশারা করে, "আমরা ওঁর জন্য স্পেশাল লেডি ডক্টরও নিয়ে এসেছি। ফর চেক আপ। ডঃ অরোরা, আপনি রেডি?"

ডঃ অরোরা হাতা গুটিয়ে বলল, "ইয়েস স্যার....!"

"পেশেন্ট মনে হয় বড়োই লাজুক। একটু সার্চ করে দেখুন তো তিনি কোথায় গেলেন। এসেছি যখন, কাজটাও করেই দিয়ে যাই।"

আমনদীপের মুখ ফ্যাকাশে। তার নজরে সন্দেহ, "আপনারা কারা?"

অধিরাজ ফের পেটেন্ট দুষ্টু হাসিটা হাসল, "বললাম তো। দুয়ারে ডেলিভারি। সোশ্যাল সার্ভিস। আমরা বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের সেবা করে থাকি। সেবা চাইলে করি। না চাইলে তো আরও বেশি করি। আপনি চান আর না চান, আমরা আর্তদের সেবা করেই তবে ছাড়ব। আমরা দেশসেবী রণক্লান্ত, আমরা কিছুতে দেব না ক্ষান্ত পরিষেবা নেবেন না মানে? দিয়েই ছাড়ব। অবশ্য অনেকে আমাদের গালাগালি দিয়ে 'সি.আই.ডি. হোমিসাইডও' বলে।"

এইবার আমনদীপের শান্ত, সহজ, সরল চেহারার মুখোশ সরে গিয়ে একটা হিংস্র মুখ বেরিয়ে এল। সে শুধু বলল, "পুলিশ?"

"রাইট ইউ আর।"

"কিন্তু এখানে আপনাদের কী দরকার?" কেটে কেটে বলল আমনদীপ, "এখানে কোনো ইল্লিগ্যাল বিজনেস্ হচ্ছে না। এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার এখন লিগ্যাল।" অধিরাজ আরও এককাঠি সরেস। সে একেবারে নিরীহভাবে বলে, "আমরা আপনার পার্সোনাল ম্যাটারে হস্তক্ষেপ করতে আসিনি স্যার। আপনি একডজন এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার করুন না। এমনকি আপনাদের সন্তানও বৈধ। একটা গোটা দেশের জনগণের জন্ম দিলেও আপত্তি নেই। আমাদের শুধু একটা বিষয়েই কৌতূহল।

আপনার বান্ধবী প্রেগন্যান্ট। অথচ তিনি রোজ একাধিকবার দাড়ি কামাচ্ছেন। একেবারে কিলোদরে গাল শেভ করছেন। এ কীরকম কথা। দুটো তো একসঙ্গে হতে পারে না। এরমধ্যে আসলে কোনটা, সেটাই দেখার। বিশ্বাস করুন, চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করেই চলে যাব। মিস্ অরোরা... প্লিজ সেনোরিটা?"

টুইঙ্কল আর কোনো কথা না বাড়িয়ে ফ্ল্যাটের ভেতরে গটগটিয়ে হেঁটে চলে গেল। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে দেখে আমনদীপ এবার ফোঁস করে ওঠে, "আপনারা একজন শিখ মহিলার প্রাইভেসি এভাবে নষ্ট করতে পারেন না। এটা আমাদের ধর্মে আঘাত করা। আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কেস করব।"

"অন হোয়াট গ্রাউন্ড!" সে সবিস্ময়ে বলে, "আমরা পুরুষেরা ওঁকে হাতও লাগাচ্ছি না। আইন অনুযায়ী আমাদের লেডি অফিসার পরীক্ষা করে দেখবেন। আমরা জাস্ট একটা 'ওয়েলনেস চেক' করছি। সেটা বিদেশেও পুলিশরা করে। এখন অনুপ্রেরণার জমানা চলছে কিনা। তাই আমরাও অনুপ্রেরিত হয়েছি।"

"কে বলেছে আপনাদের ওয়েলনেস চেক করতে?" আমনদীপ গর্জন করে ওঠে, "আপনাদের হেল্প লাগবে না আমাদের।"

সে সখেদে মাথা নাড়ে, "আজব মানুষ তো আপনি মশাই! পুলিশ হেল্প না করলে অভিযোগ, কেন পুলিশ হেল্প করে না? আবার করলেও জানতে চাইবেন কেন পুলিশ হেল্প করছে। অদ্ভুত ভূতুড়ি!"

"কিন্তু তাই বলে একজন প্রেগন্যান্ট মহিলাকে ডিস্টার্ব করবেন?"

"ডিস্টার্ব কোথায় করছি?" অধিরাজ আহত গলায় বলল, "আমরা এত কষ্ট করে ওঁর জন্য স্পেশাল লেডি ডক্টর খুঁজে আনলাম। উড বি মাদারের স্বাস্থ্য পরীক্ষাই তো করতে চাইছি। খবর নিয়ে জানলাম, এতদিনে উনি একবারও গাইনোকলজিস্টের কাছে যাননি। সেজন্যই

ছুটে এলাম। আপনি এমন করে বলতে পারলেন! একটুখানি হেল্প ও করতে দেবেন না?"

"বাট্...!"

সে আরও কিছু বলার আগেই ভেতরের ঘর থেকে টুইঙ্কল প্রায় গুরশীলের ঘেঁটি ধরে অবিকল একটা বিড়ালছানার মতো ঝোলাতে ঝোলাতে নিয়ে এল। উপস্থিত সকলেই সবিস্ময়ে দেখল গুরশীল নামক মহিলার মাথায় একটাও চুল নেই। সেখানে আস্ত টাক! তার সমস্ত চুলটাই এখন টুইঙ্কলের বাঁ-হাতে ঝুলছে। অধিরাজ আঁতকে ওঠে, "ইরক্। মিস্ অরোরা, করেছেন কী। আপনি ওঁর মাথার সব চুল টেনেই তুলে ফেলেছেন!"

"স্যার।" সে কাঁচুমাচু মুখে জানায়, "আমি শুধু অল্প একটু টেনেছিলাম। কী করব? উনি আসতেই চাইছিলেন না। তার ওপর মুখের ওপর আস্ত অ্যাশট্রে ছুড়ে মেরেছেন। ভাবলাম, চুল ধরে টেনে আনাই সবচেয়ে ভালো অপশন। বিশ্বাস করুন, আমি ঠিকমতো টানও মারিনি। একটু ছুঁয়েছি মাত্র। তাতেই পুরো চুল খুলে হাতে চলে এল।" অধিরাজ একঝলক গুরশীলের অবস্থা দেখল। সে বাঘের থাবায় লটকে থাকা ইঁদুরের মতো ঝুলছে। মাঝেমধ্যে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করছে ঠিকই, কিন্তু সবটাই ব্যর্থ। টুইঙ্কল তাকে দিব্যি একহাতে লিফট করে ধরে আছে। অধিরাজ গম্ভীরমুখে বলে, "মিস্ অরোরা, এমন দুরবস্থা তো দুঃশাসনও দ্রৌপদীর করেননি। তিনিও চুল ধরেই টেনে এনেছিলেন। তাতে দ্রৌপদী ওঁর বুকের রক্তে চুল ধোয়ার আগে চুল বাঁধেননি। কিন্তু তাঁকেও টাকলু হতে হয়নি! না বাঁধার জন্য অ্যাটলিস্ট মাথায় চুল বাকি ছিল। আপনি তো সে অপশনও...!"

মিস্ অরোরা তার হাতের চুলের গুচ্ছ অধিরাজের দিকে ছুড়ে দিয়েছে, "কারণ দ্রৌপদী উইগ পরতেন না। এটা উইগ স্যার। ইনি তো পুরো 'উজড়া চমন।" "সে কী!"

তার কৌতুকমাখা সহাস্য চোখ এবার আমনদীপের দিকে ঘুরল। সবিস্ময়ে জানতে চাইল, "আপনি কি আপনার ডার্লিং এর এই নতুন হেয়ারস্টাইল সম্পর্কে জানতেন? উনি কি বলেছেন যে পার্লারে গিয়ে গুচ্ছের টাকা গচ্চা দিয়ে এই অবাক পৃথিবী কাট কেটেছেন? মেয়েরা হেয়ার স্ট্রেট করায় জানতাম, ইনি তো গোটা মুণ্ডুটাই স্ট্রেট করে ফেলেছেন।"

আমনদীপ উত্তর দেবে কী! সে তখন কুলকুল করে ঘামছে। ফরসা মুখ রাগে লাল। কোনো কথাই তার মুখ দিয়ে বেরোল না। ওদিকে গুরশীল বেগতিক দেখে লম্বা লম্বা নখ দিয়ে টুইঙ্কলকে আঁচড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। লেডি অফিসার প্রথম দু-একবার তার খামচা চুপচাপ সহ্য করল। তারপর একটা নখ লেগে তার গাল ছড়ে যেতেই তাকে মেঝেতে ফেলে তার হাত চেপে মুচড়ে ধরল। গুরশীল খ্যাঁচাকলে পরে কাতরে ওঠে। টুইঙ্কল দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "তেরি তো... 1 সালি, নাখুন চালায়েগি? দেখুন স্যার, কীরকম ভ্যাম্পায়ারের মতো নখ রেখেছে...!"

সে বেচারি গুরশীলের নখ সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করার জন্য নখসুদ্ধ আঙুলটা চেপে ধরেছিল। কিন্তু ফের অঘটন। তার চাপের ঠ্যালায় গোটা নখটাই উপড়ে উঠে এল। অধিরাজ চোখ কপালে তুলে ফেলে আর্তনাদ করে ওঠে, "চুলের পর এবার নখও গেল। আপনি কি ওঁকে পার্ট বাই পার্ট ডিম্যাটল করতে চাইছেন? মিঃ আমনদীপ তো বিধবা হবেন। ওঁর সুহাগের কী হবে?"

আত্রেয়ী এতক্ষণ অর্ণবের পেছনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এবার অর্ণবকে চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "এই ছোটা ভীম কি আমাদের নতুন কলিগ?"

অর্ণব হেসে ফেলে, "আজ্ঞে। এই কেস থেকেই জয়েন করেছেন। আশা করছি ভবিষ্যতেও থাকবেন।"

আত্রেয়ী আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে যায়। টুইঙ্কল ততক্ষণে গুরশীলের হাত চেপে ধরে তার নখ উৎপাটনে ব্যস্ত। কোনো কথা না বাড়িয়ে একেবারে টপাটপ বাকি ন-টা নখও তুলে নিয়ে দেখাল অধিরাজকে, "একটাও আসল নয়। এগুলো সব ফেক স্যার। আজকাল

নতুন স্টাইল উঠেছে আর্টিফিশিয়াল নেইল রাখার। আর সেই আর্টিফিশিয়াল নখ দিয়ে তুই আমায় খোঁচাচ্ছিলি পেত্নী কোথাকার...।"

"কিউরি' অ-সা-র অ্যান্ড কিউরি' অ-সা-র!" অধিরাজ ডানহাতের তর্জনী দিয়ে চিবুকের ভাঁজটা ঘষল, "ওঁকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে। বাকি বডি পার্টসগুলো আসল না নকল সেগুলোও দেখে নিন একবার।"

"গোলুগোলু স্যার?"

সে মাথা ঝাঁকায়, "একদম র‍্যাম্পার্ট গোলুগোলু।"

"চল্ বেটা। তেরা নম্বর আ গয়া!"

টুইঙ্কল এবার একেবারে ঠেসে ধরেছে গুরশীলকে। গুরশীলও ছাড়ার পাত্র নয়। সে টুইঙ্কলের চেয়ে বেঁটে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল হাত-পা চালাতে ওস্তাদ। বেচারার মিস্ অরোরাকে বুঝতে একটু ভুল হয়েছিল। ওই হাত তো বোধহয় 'গদর' ফিল্মের সানি দেওলের মতো আস্ত হ্যান্ডপাম্প একটানে তুলে অভ্যস্ত! মানুষ আর কী জিনিস সে বেশ কয়েকবার এদিকে ওদিকে তুলে গুরশীলকে অনায়াসে পারফেক্ট 'ধোবি পছাড় মারল। তারপর র‍্যান্ডম থাপ্পড় কষাতে কষাতে বলল, "ফাজলামির জায়গা পাস না! অ্যাশট্রে ছুড়ে মারবি, আঁচড়ে রক্ত বের করে দিবি, ঘুষি মারবি। লোকে আমাদের মামা বলে, তাই 'মামাবাড়ির আবদার' পেয়েছিস টাকলা পুতনা রাক্ষসী?"

সবাই যখন গুরশীল আর টুইঙ্কলের যুদ্ধ দেখতে ব্যস্ত ছিল, তখনই আমনদীপ সুযোগ পেয়ে বিদ্যুৎবেগে টেবিলের ড্রয়ার খুলে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে এনেছে। তার প্রথম লক্ষ্য মিস্ অরোরাই ছিল। কিন্তু কিছু করার আগেই রিভলবার ধরা হাতটায় একটা জোরদার মার খেয়ে কাতরে উঠেছে সে। ঘুষিটা এতটাই মারাত্মকভাবে পড়েছে যে তার হাত থেকে কাঁধ অবধিই যেন অবশ হয়ে গেল। পরক্ষণেই সবিস্ময়ে দেখল, সে নিজেও শূন্যে ভাসছে। পা দুটো হাওয়ায়! একটা চরম শক্তিশালী হাত তার কলার ধরে টেনে তুলে ধরেছে ওপরে। নাকের সামনে একটা অনিন্দ্যসুন্দর হাসিমাখা মুখ। সে মাথা নেড়ে আক্ষেপসূচক আওয়াজ করে খুব শান্তভঙ্গিতে বলল, "নাও, দ্যাটস রিয়েলি চিটিং মিঃ আমনদীপ! একে তো মিস অরোরা গুরশীল কৌরের সঙ্গে হিসাব বুঝছেন। ওঁরা দু-জন দু-জনকে বুঝে নেবেন। দু-জনের মল্লযুদ্ধের মধ্যে আলটপকা তৃতীয়জনের ঢোকা একেবারেই উচিত নয়। ওটা নীতিবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ করা, পিঠে গুলি মারা কাপুরুষের কাজ। আপনার হাতাহাতি করার শখ হলে আমরা আছি তো! বললাম না, পরিষেবা দিয়েই ছাড়ব!"

টুইঙ্কল অধিরাজের বক্তব্য শুনে গুরশীলের পিণ্ডিপাঠ করা থামিয়ে এদিকেই তাকিয়েছিল। তাকে বিরতি দিতে দেখে অধিরাজ মুখ ফিরিয়ে অবিকল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো ভেলভেটি ভয়েসে বলল, "আঃ! থামলেন কেন? বা-জা-ন!"

"ইয়েস স্যার...।"

সে আবার গুরশীলের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ধস্তাধস্তি, ঘুষোঘুষি, চড়-চাপাটি ফের চালু হয়ে গেল। অধিরাজ এবার ভারি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি করে ডানদিকের ভুরুটা সামান্য তুলে তাকায় আমনদীপের দিকে, "হ্যাঁ... আমরা যেন কোথায় ছিলাম?"

"দিস ইজ ইলিগ্যাল...!" আমনদীপ হিসহিস করে বলল, "এভাবে একজন সম্মানিত নাগরিককে বিরক্ত করতে পারেন না আপনি। আমাকে জেনারেল পাবলিক পাননি। আমরা হাই সোসাইটির লোক ..."

"উপস্! তাই তো!" সে লোকটাকে আরও একফুট ওপরে তুলল, "হাই সোসাইটি হিসাবে এই হাইটটা ঠিক আছে? না আরও একটু তুলব!"

আমনদীপ কী করবে বুঝতে পারছে না। সামনের ব্যক্তির চেহারা ভীষণ বলিষ্ঠ, অসম্ভব সুগঠিত ও অপূর্ব ঠিকই, কিন্তু সুমো পালোয়ান বা ডাব্লু ডাব্লু ই-এর রেসলারদের মতো আন্ডারটেকারমার্কা ভীমভবাণী আদৌ নয়। অথচ সেই লোকটাই তার মতো শক্তিশালী পুরুষকে প্রায় ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে ধরে আছে! কী অমানুষিক শক্তি! তবু সে হাল ছাড়ল

না। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "আমার হাত কিন্তু যথেষ্ট ওপর অবধি আছে...।"

অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ে। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে লোকটাকে আরও একফুট তুলে বলল, "এতটা ওপরে?"

"রাজা, আর তুলো না!" পেছন থেকে পবিত্র এবার ভয়ার্ত স্বরে বলে, "ওপর ওপর করতে-করতে এবার ডাইরেক্ট ওপরেই না পৌঁছে যান! শেষপর্যন্ত ওঁর হাত কি স্বর্গে গিয়ে থামবে?"

"কী করব মামা?" সে ফের ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়, "ওঁর টাওয়ারের প্রবলেম আছে। আমার কথা বা বক্তব্য কোনোটাই ধরতে পারছেন না। তাই ওপরে তুলে চেক করছি, যদি সিগন্যাল ধরতে পারেন।"

বলাইবাহুল্য, আমনদীপের মাথায় কোনোরকম সিগন্যালই ঢোকেনি। সে রাগে চেঁচিয়ে বলে, "আপনারা আমায় চেনেন না। আমি সবার এগেনস্টে কমপ্লেইন করব। আমার এক বন্ধু নামকরা উকিল। সবক-টাকে দেখে নেবো। সবক-টাকে কোর্টে তুলব...।"

"অর্ণব!" সে আবার ঘাড় ঘোরায়, "ইজ হি স্কেয়ারিং মি?"

অর্ণব মনে মনে প্রমাদ গোণে। এই ডায়লগটা তার অত্যন্ত পরিচিত! জীবনে বহুবার শুনেছে। এবং তার ফলাফলও স্বচক্ষে দেখেছে। সে মাথা নাড়ে, "মনে তো হয়।"

"আমার কি ভয় পাওয়া উচিত?"

কার যে এখন ভয় পাওয়া উচিত তা সকলেই বুঝেছে। অর্ণব আতঙ্কিত। আমনদীপ এখন চুপ করলেই তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। সে শুনল, পবিত্রও বিড়বিড় করছে, "কন্ট্রোল... গুরুদেব... কন্ট্রোল!" কিন্তু আসল ব্যক্তিটির মাথায় তখনও সেটা ঢোকেনি। সে হিংস্রভাবে বলল, "ইউ...ইউ! ইউ ডোন্ট নো মি! আমি কী করতে পারি, কতদূর যেতে পারি, আপনাদের কোনো ধারণাই নেই....।"

অর্ণব মনে মনে ফের কপাল চাপড়াল। পবিত্র আলতো করে গোঁফের ওপর হাত বোলায়। এখানে কিচ্ছু করার নেই। এখন স্বয়ং ঈশ্বরই আমনদীপকে রক্ষে করুন। "রাইট। ওপরে ওঠা তো দেখলাম।" অধিরাজ ঘাড় কাত করে খুব নিষ্পাপ দৃষ্টিতে দেখছে তাকে, "এবার কতদূর যেতে পারেন সেটাও দেখে নিই।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই তার পেটে মোক্ষম একটা কিক। লং লেগের লাথি বলে কথা! লম্বা সুন্দর পায়ের জন্য অনেকেই পেছনে আদর করে তাকে'লেগসাম ম্যান'ও বলে। কিন্তু তার কিটাও মারাত্মক। আমনদীপ সত্যিই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে অনেকখানিই দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। উঃ, আঃ জাতীয় কোনোরকম কাতরোক্তি করার আগেই মাথাটা একেবারে সজোরে দেওয়ালে ঠকাস করে ঠুকে গিয়েছে। একটা শব্দ করারও সুযোগ পেল না সে। একেবারে ধড়াস করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"ফাইন।" অধিরাজ স্থির দৃষ্টিতে প্রায় স্থির দেহটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আই অ্যাম স্কেয়ারড। ভয় পেয়েছি। স্যাটিসফায়েড নাও? বাই দ্য ওয়ে, ওজন আর হাইট অনুপাতে অনেকদূরই গেছেন। কী বলো অর্ণব?"

অর্ণব দুষ্টু হাসল, "হ্যাঁ স্যার। ঠিকই বলছিলেন উনি। সত্যিই অনেকদূর যেতে পারেন।"

পবিত্র ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে আমনদীপকে চেক করছে। নাকের কাছে হাত রেখে বলল, "যাঃ শালা, বেঁচে আছে। এমন করে পড়ল, ভাবলাম টপকেই গেল বুঝি। মরহাব্বা, মাশাআল্লাহ, জাহনর্শি, জোরদার মার থা জনাব।"

"শুক্রিয়া!"

সে এবার লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল টুইঙ্কল আর গুরশীলের দিকে। ওদিকে গুরশীলকে ঠেঙিয়ে প্রায় লম্বাই করে ফেলেছে মিস অরোরা। চড়, ঘুষি তো বটেই, হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই দিয়েই পেটাচ্ছে। পেটাতে পেটাতে তাকে প্রায় আধমরা করে, একেবারে ধরে উলটো করে পেল্লায় একটা ঝাঁকুনি দিল সে! গুরশীলের মুণ্ডুটা মেঝে থেকে কিছুটা ওপরে। মেঝে থেকে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঝুলছে। টুইঙ্কল ছেড়ে দিলেই ঘাড়টা মেঝেতে

পড়ে মচকে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। লেডি অফিসার তার ঠ্যাংদুটো আচ্ছা করে চেপে ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "নকলি চুড়েল কোথাকার। আমার সঙ্গে হাতাহাতি করবি? তুই চুড়েল হলে আমিও ডায়েন দি গ্রেট। ঘাড় মটকে ছেড়ে দেব।"

অধিরাজ খুব শান্তভঙ্গিতে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আরাম করে বসল ওদের সামনে। আস্তে আস্তে গুরশীলকে বলল, "আর ইউ এনজয়িং দ্য রোলার কোস্টার রাইড সেনোরা? অর শ্যুড আই সে সেনর?"

গুরশীল কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই ধপাধপ করে দুটো নরম বল তার জামা থেকে মাটিতে খসে পড়ল। টুইঙ্কলের রামঝাঁকুনির ফলাফল। এগুলোকে হ্যান্ড এক্সারসাইজ বল বলে। স্ট্রেস কমানোর জন্য বা হাতের এক্সারসাইজের প্রয়োজনে এই বলগুলো ব্যবহৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকের নারীসুলভ বাঁকও হাওয়া। মিস অরোরা চূড়ান্ত চটে গিয়ে বলল, "সা-লা! এটাও নকল! শরম নেহি আতি! আমার গোঁত্তা খেয়ে 'অম্রুতও এমন টপাটপ পড়ে না। বুকে বল আটকে মেয়ে সেজে ঘুরছিস? ঘোরাচ্ছি তোকে।"

আবার পেল্লায় একটা ধাক্কা। গুরশীলকে দেখে মনে হচ্ছিল, বুঝি পাহাড়ে ভূমিকম্প হচ্ছে এবং একের পর এক ল্যান্ডস্লাইড হয়েই চলেছে। এবার ভূ-কম্পে তার নকল পেটটাই খসে পড়ল। বলাই বাহুল্য, প্রস্থেটিক পেট। কিন্তু সেই স্ফীতোদরের ভেতর থেকে ঝনঝনিয়ে যে ধাতুর টুকরোগুলো সশব্দে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল সেগুলো দেখে সবারই চক্ষু চড়কগাছ! তার নকল গর্ভের ভেতরে কোনো মানবসন্তান নয়, গুচ্ছ গুচ্ছ বুলেট লুকনো ছিল। অর্ণব সবিস্ময়ে অধিরাজের মুখের দিকে তাকায়। সে নিস্পৃহ মুখে গালে হাত দিয়ে বসে চুপচাপ মজা দেখছে। মুখভঙ্গিতে কোনোরকম বিস্ময়ের ছাপ নেই। যেন জানত, এরকমই কিছু হতে চলেছে। বরং ফের ঠোঁট দিয়ে টেনে একটা সিগারেট কামড়ে বের করে এনে খুব ঠান্ডাভাবেই ধরাল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ রিং বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অর্ণবের কানের কাছে পবিত্র ফের ফিশফিশ করে, "শুনেছি কদ্রু একগাদা সাপকে জন্ম দিয়েছিলেন। ইনি তো আরও এককাঠি ওপরের ডেঞ্জারাস জিনিস ডেলিভারি দিচ্ছেন দেখছি। ওই পেটের ভেতরে এ কে ফর্টি সেভেন, মিসাইল-টিসাইলও নেই তো।"

অধিরাজ রিং বানাতে বানাতেই বলল, "এমন প্রতিভাশালী বুলেটগর্ভাকে আর্মির স্পেশাল কেয়ারে রাখা উচিত। বুলেটের জন্য চিন্তাই করতে হবে না!"

অর্ণব আর মিস্ দত্ত হাঁ করে সব দেখছিল। যেমন করে লোকে গাছ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আম বা কুল পাড়ে, মিস অরোরা তেমনই বুলেট পাড়ছে। এককথায় প্রায় বুলেটের বৃষ্টিই হয়ে চলেছে। গুরশীল কথা বলার অবস্থাতেই নেই। সে বোধহয় সরষের ফুল, ধুতরো আর কদমফুল, সবই একসঙ্গে দেখছে। মোটামুটি ধোয়া এবং ঝাড়া পর্ব শেষ হতেই টুইঙ্কল একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "হয়ে গেছে স্যার। কোথাও আর কিছু নেই। আরও বেশি ধাক্কামুক্তি করলে এবার আসল অর্গানগুলোও বেরিয়ে পড়বে।"

অধিরাজ এবার টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ায়, "নো প্রবলেম মাদমোয়াজেল। বাকিটা আমরাই টুকটুক করে খুলে নেব। ইলেক্ট্রিসিটি থেকে প্লাম্বিং, ভাঙা থেকে জোড়া—সব কাজই মোটামুটি পারি। আপনি বরং, এই চেয়ারটাতে বসুন। খাবেন কিছু?"

টুইঙ্কল মাথার ঘাম মুছে বলল, "পরে। আমি আপাতত খাওয়ানোর মুডে আছি স্যার।"

"নিশ্চয়ই মিস অরোরা।" সে হাসছে, "সে সুযোগও দেব। আপনি ততক্ষণ একটু জল-চুরুট খেয়ে রিচার্জ হয়ে নিন। এই ফাঁকে আমরাও একটু ঘোলা জলে মাছ ধরে আসি।"

বলতে-বলতেই অধিরাজ হাতা গুটিয়ে এগিয়ে গেল। পেছন পেছন অর্ণব আর পবিত্রও। গুরশীল গোটা ব্যাপারটাই হাঁপাতে হাঁপাতে অতিকষ্টে দেখছিল। এবার হাত তুলে বলল, "প্লিজ, স্টপ। প্লিজ!"

"কেন? মিস অরোরার সেবাতেই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন? বড়ো অল্পেই সন্তুষ্ট দেখছি।" অধিরাজ বড়োই দুঃখিত হয়ে ভুরু তুলেছে, "আমাদের একটু সেবা করার সুযোগ দেবেন না? বেশি না.... একটুখানি।"

"প্লিজ।" গুরশীল কোনোমতে বলে, "আমি... আমি কো-অপারেট করছি। আর নয়।

"গুড।" সে অর্ণব আর পবিত্র-র দিকে একঝলক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, "শি....আই মিন, হি ইজ ইন্টেলিজেন্ট। তাই না?"

পবিত্র গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসল, "নিঃসন্দেহে। সেইজন্যই তো প্রেগন্যান্সির আড়ালে মেটাল ডিটেক্টরের তলা দিয়ে না যাওয়ার স্কোপ খুঁজে নিয়েছিলেন। আশা করি মিস্ অরোরার হাতের তলা দিয়েও দ্বিতীয়বার আর যাবেন না। ওটা মেটাল ডিটেক্টর নয়, মেটাল ডেস্ট্রয়ার।"

"অফকোর্স!" তার চোখে কৌতুক, "এমনিতেই ন্যাড়ার বেলতলা দিয়ে যাওয়া উচিত নয়। আর উনি তো পুরো ইন্দুলুপ! তাও আবার বেলতলা নয়, তালতলা দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাক গে, মিঃ...!"

"আকাশ সিং।"

গুরশীল, ওরফে আকাশ মিউমিউ করে জবাব দিল। ঝাঁকুনির চোটে এখনও বোধহয় তার হাড়গুলো খটখট করে কাঁপছে। চোখ, মুখ লাল

"আকাশ সিং।" অধিরাজের নিরীহ প্রশ্ন, "হঠাৎ আকাশ থেকে পাতাল হয়ে গেলেন কেন? এতকিছু থাকতে খামোখা জেন্ডার চেঞ্জ করার কারণ?"

আকাশ থুতিয়ে থুতিয়ে যেটুকু বলল তাতে বোঝা গেল যে ওরা গোয়ার বিখ্যাত ড্রাগমাফিয়া কার্লোসের হয়ে কাজ করে। কার্লোস নিজে মূলত গোয়ায় গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। কিন্তু ওর এজেন্ট, ক্যান্ডিম্যানরা সর্বত্র বিরাজমান। কার্লোসের আবার একটি হেভিওয়েট গডফাদারও আছে যার হয়ে ও ভারতবর্ষে কাজ করছে। সবাই তাকে রিচার্ড গডম্যান বা রিকি গডম্যান নামেই চেনে। তার মতো চতুর ও প্রভাবশালী ক্রিমিনালও খুব কম আছে। সবাই তার কীর্তিকলাপ জানে, কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ ওর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি। আকাশ সিং বা তার সঙ্গী আমনদীপ নিতান্তই চুনোপুঁটি মাত্র।

আকাশ এর আগে উগ্রবাদীদের সঙ্গে কাজ করত। কট্টর খালিস্তানি সমর্থক ছিল। একবার বম্ব বানাতে গিয়ে ছোটখাটো ব্লাস্টের শিকার হয়েছিল। তাতে দেহের কিছু অংশ আর দুটো হাত পুড়ে গিয়েছিল। অক্ষত থাকলে মানুষের সাহস বেশি থাকে। কিন্তু ছ্যাঁকা খেয়ে বিপ্লব মাথায় উঠেছিল তার। অগত্যা হিস্ট্রিশিটারের দলে নাম লিখিয়েছে। প্রথমে পাতার ছোটখাটো কারবারি ছিল। তারপর সস্তা পাউডারের। এখন কার্লোসের কৃপাদৃষ্টিতে দামি পাউডার বেচছে।

"বার্নিং শিখের সঙ্গে কী লিঙ্ক তোদের? তাকে কী বেচেছিস? ড্রাগস না গাঁজা?"

"বার্নিং শিখ!" সে অবাক, "তাকে তো চিনিই না। জন্মেও দেখিনি।"

"তাকে দেখে চেনার জন্য তোকে একশোবার মরে জন্মাতে হবে। এক জন্মে হবে না। অ্যাসিড, বম্ব জাতীয় কিছু দিয়েছিস কাউকে? তোর তো আবার বম্বের হিস্ট্রিও আছে। খালিস্তানি সমর্থকও বটে! একেবারে সর্বগুণসম্পন্ন কাঁঠালি কলা দেখছি।"

"সত্যি বলছি স্যার, ওই ব্লাস্টের পর জীবনে আর বম্ব বানাইনি। এখন এটাই আমাদের ব্যাবসা।" আকাশ বলল, "আর বার্নিং শিখ আমার কাছে আসেইনি খালিস্তানি ছিলাম। অল্পবয়েসে সাপোর্টও করতাম। কিন্তু এখন ভুল বুঝেছি।"

"বাঃ! আর এই বোধোদয়ের কারণ?"

ও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বুদ্ধি পাকার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম খালিস্তান কোনো কাজের জিনিসই নয়। ওই ছোট্ট একটা অংশে শিখরা আদৌ নিরাপদ নয়। পাকিস্তান এমনিতেই দেশভাগের সময় পাঞ্জাবের অর্ধেকটা নিয়ে নিয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা সরে গেলে বাকিটাও দখল করার চেষ্টা করবে। শিখদের কাটবে। স্বর্ণমন্দির ভাঙবে। তাছাড়া আমাদের কাছে কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই। ফসল ছাড়া ইনকামের রাস্তা নেই। এই বিরাট দেশের সাপোর্ট ছাড়া খালিস্তান না খেতে পেয়ে স্রেফ ধুঁকে ধুঁকে মরবে! কোনো উন্নতি হবে না, কাজ মিলবে না, কিচ্ছু হবে না। খালিস্তান স্রেফ একটা মিথ ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। বাস্তবে সম্ভব

হলে আমরাই মরব। তাই বার্নিং শিখকে হেল্প করে নিজের পায়ে কেন কুড়ুল মারব? ওকে আমরা চিনিও না, কোনো লিঙ্ক নেই।”

“তবু ভালো। বুদ্ধি হয়েছে। কোকেন, হেরোইন, ড্রাগস তো বুঝলাম।” অধিরাজ ভুরু কুঁচকেছে, “কিন্তু এর মধ্যে বুলেট কোথা থেকে এল? কার্লোস কি অন্যকিছু প্ল্যান করছে? না তোর তেজস্ক্রিয় পেটের হিটে পাউডার সব জমে বুলেট হয়ে গেছে?”

“স্যার।” গুরশীল ওরফে আকাশ দু-হাত জোড় করে ফেলেছে, “আমরা আগে ড্রাগসের কারবারই করতাম। কিন্তু কার্লোসের অর্ডারে এখন ফায়ার আর্মসের ডিলও করি।”

“কার্লোস ড্রাগের পাশাপাশি এখন ফায়ার আর্মসের ব্যাবসাও করছে? নাকি কোনো জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওয়েপন সাপ্লাই করছে। প্ল্যান কী তোদের?” সে ধমকে উঠল, “ব-ল্।”

“আমরা আদার ব্যাপারি।” আকাশ প্রায় কেঁদেই ফেলেছে, “জাহাজের খবর কী করে জানব? আমাকে আর আমনকে যতটুকু অর্ডার দেওয়া হয়, ততটুকুই করি। তার বদলে মোটা টাকা পাই। এর বাইরের খবর জানি না।”

“আদার ব্যাপারি? তবে আদার খবরই বল।” অধিরাজ দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে জড়ো করে, “জাহাজের খবর আমরা ঠিক বের করে নেব।”

“স্যার, এই ফ্ল্যাটের ব্যবস্থাটা আমাদের কার্লোসই করে দিয়েছিল। বলেছিল, একজনকে মেয়ে সাজতে হবে। আমন লম্বা চওড়া। ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমিই মেয়ে সেজেছিলাম। আমাদের ওপর অর্ডার ছিল যে একটা নকল স্ক্যান্ডাল তৈরি করতে হবে যাতে ওর একজন মেল আর ফিমেল এজেন্ট ইজিলি আমাদের কাছে যে-কোনো সময়ে প্রয়োজনমতো আসতে পারে, অথচ কেউ সন্দেহও না করে। সেজন্যই দু-জন বিবাহিত লোকের এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ারের প্লট খাড়া করতে হল। ওদিকে আমনের বউ হিসাবে একজন ফিমেল এজেন্ট আসত, আর গুরশীলের বর হিসাবে একজন মেল এজেন্ট। ওরা প্রয়োজনমতো ড্রাগস নিয়ে যেত। কার্লোসের কলকাতায় বিভিন্ন এরিয়ায় মোট দু-জন মেইন সাপ্লায়ার আছে। তাদের মধ্যে আমরা এক পার্টি। আমাদের মাল হাই কোয়ালিটির, হাই প্রাইজের। তাই ডিমান্ডও আছে। এজেন্টরা এসে নকল বর-বউ সেজে খিস্তিখেউড় করার ফাঁকেতালে ড্রাগস নিয়ে চলে যেত। সবাই তামাশা দেখতে এত ব্যস্ত থাকত যে কেউ অন্য কিছু সন্দেহ করেনি। ওরাই ক্যান্ডিম্যান বা ড্রাগ পেডলারদের হাতে হাতে প্যাকেট পৌঁছে দিত। এই অবধিই সব ঠিক ছিল। হঠাৎ কার্লোস বলল যে গান আর বুলেটও সাপ্লাই করতে হবে। কিন্তু মাল নিয়ে আসা আর নিয়ে যাওয়ায় প্রবলেম হচ্ছিল। চেকিং সিস্টেম, মেটাল ডিটেক্টর...!”

“সেজন্যই প্রেগনেন্সির নাটক।” সে আকাশ সিংকে জোরদার এক চড় মারল, “পেহলা মালা খালি! এত কিছু প্ল্যান করলি আর মাথায় এটা এল না যে মহিলারা দিনে বারবার শেভ করে না, ওটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ? যে মহিলা নিজের বেবির সেফটির জন্য মেটাল ডিটেক্টরের তলা দিয়ে যায় না, সে প্রেগনেন্সির সময়ে মরে গেলেও স্মোক করবে না, গাড়ি চালাবে না! মেয়েরা স্মোকার হতে পারে, গর্ভবতী মায়েরা হয় না। ওরা সারাজীবন নিজে বিষ নিতে পারেন, চেইন স্মোকারও হতে পারেন, কিন্তু ডিউরিং প্রেগন্যান্সি নিজের শিশুর রক্তে কিছুতেই নিকোটিনের মতো বিষ মেশাবেন না, তা সে যতই কষ্ট হোক। সেইজন্যই ওঁরা মা। এই রিসার্চটাও করিসনি। কোন লেভেলের ইডিয়ট তোরা?”

থাপ্পড়টা খেয়ে আকাশ সিং একদম মুখ থুবড়ে পড়ল। আর উঠলই না! অধিরাজ নিজের মনেই গজগজ করে, “স্কাউন্ড্রেল! ডিসগাইজটাও ঠিকমতো করতে পারে না। কার্লোস এই গর্দভদের নিয়ে এখনও বিজনেস চালাচ্ছে কী করে? কে বেশি অপদার্থ? পুলিশ? না কার্লোস?”

"ও ত্তেরি!" টুইঙ্কল প্রায় শহীদ হয়ে যাওয়া আকাশ সিং এর দিকে তাকিয়ে বলল, “এ মালটাকে নিয়ে এতক্ষণ আমি জাগলিং করছিলাম। তারপরও ব্যাটা টিকে ছিল। আপনি এক

লাফা মারলেন অমনি ছিপকলির 'দুম' এর মতো টুকুৎ করে খসে পড়ল। মান গয়ে হুজুর। হোয়াট আ সেক্সি লপ্পড়।"

অর্ণব উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকাল। 'সেক্সি' শব্দটা তার অত্যন্ত অপছন্দের। এই শব্দটাকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। সভয়ে দেখল একঝলক অসন্তোষ তার মুখে ভেসে উঠল। তবে টুইঙ্কলকে চিনতে ওর-ও বাকি নেই। তাই বিরক্তির ছাপটা দ্রুতই সরে গিয়েছে। মৃদু অপ্রতিভ স্বরে বলল, "থ্যাঙ্কস।"

তার চোখ এবার অর্ণব আর পবিত্র-র দিকে পড়েছে, "তোমরা একটু আশেপাশের প্রতিবেশীদের ডেকে আনো। ওঁদের সাক্ষী রেখে ফ্ল্যাটটাকে আগাপাশতলা সার্চ করে দেখো আর কী কী পাও। যা পাবে এভিডেন্স ব্যাগে ভরবে। আমার ধারণা বুলেট যখন আছে তখন ফায়ার আর্মসও আছে। সেগুলোও পাওয়া যাবে। তন্নতন্ন করে খোঁজো। কোনো জায়গা বাদ দেবে না। কার্লোসকে আমরা এখন ধরতে পারব না। কিন্তু ওকে একটু লসের শোক তো দিতেই পারি। সব খুঁজে বের করে, জ্যান্ত লাশদুটোকে হেফাজতে নিয়ে, মাল বাজেয়াপ্ত করে, ফ্ল্যাটটা সিল করে দাও। তারপর বাকি খবর নিচ্ছি।"

দুই অফিসারই মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত প্রতিবেশীদের ডাকতে গেল। ভূপেন্দ্র দত্ত ও এলেন। শ্রীদর্শিনী, প্রিয়দর্শিনী, তিতলি, বসন্ত, কোকিলা, এমনকি নিরীহ মুখে খোদ প্রণবেশ লাহিড়ী- প্রায় প্রত্যেকেই এসে হাজির। ওঁরা সকৌতূহলে উঁকিঝুঁকি মারছেন। এবার অফিসাররা তল্লাশিতে লেগে পড়ল। প্রণবেশ এগোলেন না। হয়তো নিজের কভারটা নষ্ট করতে চান না। আত্রেয়ীও দাঁড়িয়ে থাকলেও হাত লাগায়নি। যেন সে নিতান্তই সাক্ষী। অন্যদিকে যদিও অধিরাজ টুইঙ্কলকে কোনো নির্দেশ দেয়নি, তবু সে সার্ভিস দেওয়ার একটা চান্সও ছাড়তে রাজি নয়। ও তড়াক করে উঠে হাত লাগিয়েছে ওদের সঙ্গে। খুব বেশি অবশ্য কষ্ট করতে হল না। সোফার গদির ভেতরে, তাকিয়া, ফুলদানির ভেতর, বক্স খাটের বক্সে, অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে, বইয়ের ভাঁজে, আলমারির মাথা এবং অন্যান্য সমস্ত জায়গা থেকে টপাটপ ড্রাগসের প্যাকেট, আগ্নেয়াস্ত্র, বুলেট, টাকার গুচ্ছ বান্ডিল- সবই একেবারে সর্বসমক্ষে বেরোতে শুরু করল।

"কার্লোস কে স্যার?" এতক্ষণে আত্রেয়ী দত্ত চাপা স্বরে জানতে চায়, "নতুন হিস্ট্রিশিটার?"

"নাঃ। পুরোনো পাপী।" অধিরাজ একটু অন্যমনস্ক, "অনেকদিন ধরেই পুলিশকে ল্যাজে-গোবরে করে রেখেছে। কিন্তু সেটার থেকেও বেশি চিন্তার বিষয়, আকাশ সিং-এর স্টেটমেন্ট। কলকাতায় কার্লোসের দু-জন মেইন সাপ্লায়ার আছে। একটা তো বেরোল। আর একটা কে? বা কারা?"

"আরও একটু ইন্টারোগেট করতে পারতেন।"

সে মাথা নাড়ল, "উঁহু মিস্ দত্ত। আপনি কার্লোসকে চেনেন না। ওর ডান হাতও বাঁ হাতের খবর রাখে না। হাতের কথা তো ছাড়ুন, ওর পাঁচটা আঙুলও জানে না একটা এক্সট্রা বুড়ো আঙুলও আছে কিনা। তবে ইন্টারোগেট অবশ্যই করব। আমনদীপের ফলস বউ আর আকাশ সিং-এর ফল্স বর অবধি পৌঁছোতে পারলে আস্তে আস্তে পুরো নেটওয়ার্কের অনেকটাই হাতে আসবে। তবে এখন নয়। আগে বার্নিং শিখকে দেখে নিই।"

আত্রেয়ী একটু চিন্তিত, "ওদের সঙ্গে তবে সত্যিই বার্নিং শিখের কোনো সম্পর্ক নেই?"

"নাঃ। এটা কনফার্ম।" অধিরাজ বুঝিয়ে বলে, "বার্নিং শিখ খালিস্তানি মুভমেন্টকে সমর্থন করে না। আর সে যদি আকাশের কাছে আসত, তবে আকাশও তার এই অপছন্দের কথা জানত। কিন্তু তার কথাতেই স্পষ্ট যে বার্নিং শিখ সম্পর্কে এই তথ্যটি তার জানা নেই।"

"তবে সে কোথায়?"

আত্রেয়ীর প্রশ্নে হতাশভাবে মাথা ঝাঁকায় অধিরাজ, "এখানেই আমার বুঝতে একটু ভুল হয়ে গেল মিস্ দত্ত। ডাইরেক্ট সম্পর্ক নেই তা বুঝেছিলাম। কিন্তু সামান্য আশা ছিল যে গুরশীল-আমনদীপের সঙ্গে তার সূক্ষ্ম লিঙ্ক থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে আকাশ

বলল যে সে খালিস্তানি সাপোর্টার ছিল, সেই মুহূর্তেই বুঝলাম, ডিডাকশনটা ভুল। বার্নিং শিখ যে খালিস্তানিদের দেখতে পারে না তা আমরা সবাই জানি।"

"তার মানে আমাদের হাত ফের ফাঁকা?"

"উঁহু।" সে অন্যমনস্কভাবে বলে, "একদমই নয়। অ্যাট লিস্ট একটা ছোটখাটো মাছ তো হাতে পড়ল। আর এটাও জানা গেল যে কার্লোসের আর একটা ঘাঁটি আছে। যে কোনো সঠিক ইনফর্মেশন সবসময়ই ভ্যালুয়েল্। ঠিক কোনো না কোনো সময়ে কাজে লেগে যাবে। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো তিমিঙ্গিল গিলগিল রিকি বা রিক গডম্যান তো আছেই।"

"হুঁ।"

আত্রেয়ী আড়চোখে দেখল, বাইরে তখন ছোটোখাটো ভিড় জমে গিয়েছে। তিতলি আর শ্রী মুগ্ধ দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকেই দেখছে। কোকিলাও কিছু কম যায় না।

অনেকেরই চোখে আত্রেয়ীর জন্য ঈর্ষা। এই মুহূর্তে বার্নিং শিখের পাশাপাশি অফিসার ব্যানার্জিও 'টক অব দ্য টাউন'। এটাই খুব স্বাভাবিক। একের পর এক কেসে যা পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন ভদ্রলোক, তাতে মিডিয়ার 'ডার্লিং' হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। তার ওপর মেয়েদের মধ্যে রীতিমতো হাই ভোল্টেজ 'সেনসেশন'! কাল অয়েল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে ওঁর একা যুদ্ধ করার ফুটেজ দেখে অনেকেই ঘাড় মুচকে পড়েছে। আত্রেয়ীর নিজের এক কাজিন সিস্টার আছে, সমন্বিতা ওরফে 'স্যাম'। সে প্রায় ওঁর ব্যাপারে পাগল! দিদিকেও পাগল করে রেখেছে, যে করেই হোক 'স্যার'কে দেখতে সে যাবেই। সেইখানে তিনি একরাশ মানুষের সামনে আত্রেয়ীর কাছে দাঁড়িয়ে অত সহজভাবে কথা বলছেন, এটা যে অনেকেরই সহ্য হবে না সেটা সর্বজনোবিদিত। আত্রেয়ী অল্প গলাখাঁকারি দিয়ে একটু তফাতে সরে দাঁড়ায়। প্রমীলাবাহিনীকে খেপিয়ে লাভ নেই। সে সি.আই.ডি. অফিসার হতে পারে, কিন্তু রজনীকান্ত নয় যে একাই চল্লিশ-পঞ্চাশজনকে পিটিয়ে দেবে। একটা বুলেটকে চাকু দিয়ে দু-টুকরো করে দু-জনকে মারার মতো ক্ষমতাও রাখে না। তাই সেফ সাইডে থাকাই ভালো।

অর্ণব, পবিত্র আর টুইঙ্কল গোটা ফ্ল্যাট তল্লাশি করে ততক্ষণে প্রায় কুবেরের ভাণ্ডার এনে রেখেছে। মিস অরোরার মাথায়, মুখে সাদা ময়দার প্রলেপ দেখে অধিরাজ চিন্তিতস্বরে বলে, "মিস অরোরা! আপনি এমন সাদা হয়ে গেলেন কী করে? ট্যালকম পাউডার মেখেছেন?"

"কী করব স্যার?" টুইঙ্কল বিরক্ত, "এই 'অকল কা দুশমন' পাবলিকগুলো ময়দার বস্তার মধ্যে ড্রাগসের প্যাকেট রেখেছিল। সেগুলো আনতে গিয়েই... ৷"

"বুঝলাম।" সে মাথা ঝাঁকায়, "আল্টিমেটলি কী কী পাওয়া গেল অর্ণব?"

"এগারোটা গান আছে স্যার।" অর্ণব জানায়, "তার মধ্যে চারটে স্মিথ অ্যান্ড ওয়ে মডেল নাইন্টিন, তিনটে কোল্ট পাইথন, দুটো স্মিথ অ্যান্ড ওয়ে মডেল টোয়েন্টি নাইন, আর দুটো জে-ফ্রেম!"

সে ঠোঁট ওলটায়, "কেয়া বাত! এইজন্যই সমাজবিরোধীরা সব ভয়াবহ ফায়ার আর্মস নিয়ে ঘুরছে। আমরা যে কেন পাই না কে জানে! আর কিছু?"

"ইয়েস।" এবার পবিত্র বলল, "প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকার হাই কোয়ালিটির ড্রাগস, আন্দাজ আশি লাখ টাকা শুধু ক্যাশ। বেশি-কম হতে পারে কারণ তাড়াহুড়োয় আন্দাজে গুণেছি। ব্যুরোয় নিয়ে গিয়ে ভালো করে গুণতে হবে। আর প্রচুর বুলেট। এককথায় গুপ্তধন রাজা।"

"সব বাজেয়াপ্ত করে সিল মারো। তার আগে একসঙ্গে রেখে ছবি আর ভিডিও তুলে নিও। সাক্ষীদের ভেতরে ডেকে নাও। মালপত্র দেখিয়ে অল্পবিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দাও।"

মোটামুটি আর দু-ঘণ্টার মধ্যেই সব ফর্ম্যালিটি শেষ হয়ে গেল। অত টাকার মাল উদ্ধার হলেও অধিরাজের মুখমণ্ডলে এখনও চিন্তার ছাপ প্রকট। হিসাবে সামান্য ভুল হয়ে গিয়েছে। এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা কেস। তার চোখদুটো ফের অন্যমনস্ক। মিডিয়া এটাকে নিয়েও

ঘোঁট পাকাবে। কিন্তু কার্লোসের থেকেও বড়ো থ্রেট এখন বার্নিং শিখ। কার্লোস আর তার বসকে ধরার জন্য যথেষ্ট সময় আছে। বার্নিং শিখ আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই যা করার করবে। আর ইয়া পার। ঘড়ির কাঁটা চিন্তাভাবনা করার জন্য এক্সট্রা এক সেকেন্ড সময়ও দেবে না। দিনও চব্বিশঘণ্টার বেশি লম্বা হবে না। আর এখন তো হাতে চব্বিশ ঘণ্টাও বাকি নেই। অথচ গ্যাসদুটোর প্রবেশ পথ এখনও আবিষ্কার করা যায়নি...! মারণাস্ত্রটা ঢুকছে কোন্ পথে।

"স্যার... স্যা-র!"

ওরা সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে, ফ্ল্যাট সিল করে দিয়ে লিফটের দিকেই যাচ্ছিল। বেশিরভাগ মালই অর্ণব আর অধিরাজের হাতে। পবিত্র-র কাঁধে ঝুলছে আমনদীপ। এখনও তার হুঁশ ফেরেনি। তবে আকাশকে মারা চড়টা বোধহয় অতখানি মারাত্মক ছিল না। সে নিজের পায়েই হেঁটে চলেছে। পেছন থেকে বলির পাঁঠার মতো তাকে চেপে ধরে আছে মিস্ অরোরা। মিস্ দত্ত আবার সুযোগ বুঝে সুড়ুৎ করে ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাটে সেঁধিয়ে গিয়েছে। প্রণবেশও ধারে কাছে নেই। ওরা সবাই নীচে নামার জন্য লিফটের অপেক্ষাই করছিল। হঠাৎই পেছন থেকে নারী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, "স্যার... এক মিনিট...", 'স্যার' শব্দটা তিনজন পুরুষ অফিসারের ক্ষেত্রেই খাটে। অগত্যা অধিরাজ, অর্ণব আর পবিত্র, তিনজনেই পেছনদিকে ফিরে তাকায়। অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল তিতলি আর শ্রীদর্শিনী এদিকেই আসছে। তিতলির শিফনের শাড়ি স্লিভলেস ব্লাউজের ওপর থেকে মাঝেমধ্যেই স্লিপ করছে আর শ্রীদর্শিনীর পরনে এখনও অর্ধস্বচ্ছ নাইট গাউন। আগে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল বলে খেয়াল করেনি। কিন্তু এবার চোখে পড়তেই প্রবল বিরক্তিবোধ করল সে। হাই সোসাইটির মেয়েরা কি এমনই হয়? সে প্রবল বিরক্ত হয়ে বলল, "ইয়েস?"

অর্ণবকে রাস্তা থেকে প্রায় একধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তিতলি বলল, "আপনি না। উনি।"

অর্ণব হাঁ। পবিত্র মুখ টিপে হাসছে। যথারীতি তীর নিশানাতেই লেগেছে। তিতলির 'উনি'-টি অধিরাজই বটে। সে মেয়েদুটির দিকে তাকিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তখনও তার দৃষ্টিতে আত্মমগ্নতা। মনে মনে অন্য কিছুই ভাবছে। একটু মৃদু স্বরে উত্তর দিল, "উঁ?"

"স্যার, আমরা আপনার খুব ফ্যান। একটা সেলফি হবে? ইনস্টাগ্রামে দেব। আপনার সব ভিডিও, ছবি ইনস্টাগ্রামে, ফেসবুকে ভাইরাল হয়। কয়েক মিলিয়ন লাইক পড়ে কয়েক হাজারেরও বেশি শেয়ার হয়। তার সঙ্গে আমারটাও হয়ে যাবে। প্লিজ... একট সেলফি!"

এবার শ্রীদর্শিনী প্রায় একনিঃশ্বাসেই গড়গড়িয়ে বলে গেল কথাগুলো। অর্ণব একেই ধাক্কা খেয়ে খেপে ধানিলঙ্কা হয়েছিল। তার ওপর শ্রীদর্শিনীর এই ন্যাকাপনা দেখে তার পিত্তি আরও জ্বলে গেল। কিন্তু কিছু বলার আগেই তিতলি বায়না জুড়ল, "অটোগ্রাফ স্যার।"

"সেলফি! অটোগ্রাফ!" অধিরাজ এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে অবাক, "স্যরি আপনারা ভুল করছেন। আমরা সেলিব্রিটি বা হিরো নই। আমরা তো....!"

"সি.আই.ডি. হোমিসাইড।" তিতলি প্রায় নাচতে নাচতেই বলল, "আপনাকে তে প্রায়ই টিভিতে দেখি স্যার। বাকি হিরোদের কী? ওরা তো 'রিল লাইফ হিরো'। যত কেরদানি ঐ ক্যামেরার সামনেই। তাও অর্ধেক স্টান্টম্যানই করে। পুরোটাই নকল। আর আপনি 'রিয়েল লাইফ হিরো'। আমার ক্রাইম নিউজে খুব ইন্টারেস্ট। খবরের কাগজেও দেখেছি। আমি আপনার বিগেস্ট ফ্যান, থ্রি টন ইনভার্টার এসিও বলতে পারেন। আমার ফ্যান্টাসি ছিল আপনাকে সামনাসামনি একবার দেখার। কিন্তু কখনও ভাবিনি, আসল মিটিঙের সময়ে আমি এত ঘাবড়ে যাব, আর আপনি ছবির চেয়েও অনেক বেশি হ্যান্ডসাম হবেন!"

পবিত্র আড়চোখে তাকিয়ে দেখল অর্ণব চোখ মুখ লাল করে ক্ষ্যাপা মোষের মতো মেয়েদুটির দিকে তাকিয়ে আছে। দেখলেই ভয় হয়, এই বুঝি গুঁতিয়ে দিল। তার ওপর বিপদ শুধু এদিকেই নেই। অন্যদিকে তিতলিদের ফ্ল্যাটের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে বৃদ্ধ বসন্তের ক্রুদ্ধ মুখ! সে অধিরাজকে চেতিয়ে দেবে কিনা ভাবছিল। তার আগেই একটা মোটা সোটা ফেল্ট পেন তার দিকে এগিয়ে দিয়েছে তিতলি, "অটোগ্রাফ প্লিজ!"

"ওকে সেনোরা, অ্যাজ ইউ উইশ!"

অধিরাজ এই মুহূর্তে ঝামেলা বাড়ানোর বা তর্কে গিয়ে সময় নষ্ট করার মুডেই নেই। সে এখন কোনোমতে নির্বিবাদে এখান থেকে কেটে পড়তে পারলে বাঁচে। পেনটা তিতলির হাত থেকে নিয়ে বলল, "পেপার?"

উত্তরে নিজের ধবধবে সাদা ও নরম ম্যানিকিওর করা ডানহাতের পাতা এগিয়ে দিয়েছে মেয়েটি, "এখানে সাইন করুন...।"

"আপনার হাতে!" এইবার বেচারি 'স্যারের' চক্ষু চড়কগাছ। সে বিপন্নভাবে বলল, "কিন্তু জল লাগলেই যে কালি গলে লেপটে গিয়ে পুরো হাত কালো হয়ে যাবে ম্যাডাম। পেপার নেই? ডায়েরি বা অটোগ্রাফ বুক?"

অর্ণব মনে মনে বলে, "মুখেও কালি লাগলে বেশ হয়। তার সঙ্গে একটু চুনও।" "ডায়েরি বা অটোগ্রাফবুক তো হারিয়েও যেতে পারে। তাছাড়া আপনি আমার হাতে সাইন করলে আমি এই হাতটা জলেই দেব না! দরকার পড়লে স্নানও করব না।" সুন্দরী একগাল হাসল, "বরং এটার ওপর দিয়েই পার্মানেন্ট ট্যাটু করিয়ে নেবো। প্লিজ, সাইন করে দিন।"

সর্বনাশ করেছে। এর ওপর দিয়ে ট্যাটু করাবে। শুরু করেছে কী? এ কী জাতীয় পাগলামি! মানসী জয়সওয়ালের পর ইনি বোধহয় দ্বিতীয় নমুনা। এবার অর্ণবও দেখল, তিতলির 'অতি বড়ো বৃদ্ধ পতি'র কপালে নয়, চোখে আগুন। শুনতে পেল পবিত্র গুনগুন করে গাইছে, "বসন্ত ক্ষেপে গেছে-এ-এ/ বসন্ত ক্ষেপে গেছে...।" সে মনে মনে প্রমাদ গোণে। শেষে এই অটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ নিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড না হয়ে যায়!

শেষপর্যন্ত অবশ্য তেমন কোনো ভয়ংকর ব্যাপার ঘটল না। অধিরাজ আর কোনো কথা না-বাড়িয়ে তিতলির হাতে নিজের নাম সই করে দেয়। এখন এসব নিয়ে কোনোরকম ইস্যু চায় না সে। তাকে সেলফি তুলতে দিয়েও সন্তুষ্ট করল। শ্রীদর্শিনীর সঙ্গে সেলফি দিতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ শ্রী খুব লম্বা নয়। তার পাশে অধিরাজ সত্যিই বুর্জ খলিফা। তবু সে কোনোরকমে ঝুঁকে পড়ে সেলফি দিয়ে দিল। কিন্তু শ্রী তাতেও সন্তুষ্ট নয়। স্বাভাবিকভাবেই অধিরাজ তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার কোমর ধরে কাছে টেনে নিয়েছে, "কাছে আসুন প্লিজ, নয়তো ফ্রেমটা ঠিক হচ্ছে না।"

"সেনোরিটা।" অধিরাজ এবার প্রায় কাতর অনুনয়ে বলল, "আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছে। পরে সেলফি দিলে চলবে?"

এবার অর্ণবের ধৈর্যশক্তি জবাব দিয়েছে। এ আবার কী! সেলফি অবধি ঠিক ছিল। তাই বলে কোমর ধরে টানাটানি করবে। সে একেবারে খেপে দুর্বাসা হয়ে এক ঝটকায় অধিরাজকে টেনে সরিয়ে নিয়ে বলে, "এটা কী জাতীয় ভদ্রতা ম্যাডাম! আপনি সেলফি তুলছেন ভালো কথা, তাই বলে এভাবে ওঁকে ধরে টানাটানি করবেন?"

"কেন?" শ্রীদর্শনী খুব সহজভাবেই উত্তর দেয়, "আমি তো আমার কো-অ্যাক্টরদেরও জড়িয়ে ধরে ছবি তুলি। ওদের তো কোনো প্রবলেম হয় না! আপনার কী প্রবলেম হচ্ছে? আপনাকে ধরে তো টানছি না।"

শখের অন্ত নেই। জড়িয়ে ধরে ফটো তুলবে এখন! অর্ণব ফায়ার হয়ে কিছু বলতেই যাচ্ছিল, তার আগেই তাকে হাত তুলে থামিয়েছে অধিরাজ, "মাদমোয়াজেল, আমরা এখন একটু তাড়ায় আছি। অন-ডিউটি, বুঝতেই পারছেন। পরে যদি দেখা হয়, তবে ভালো করে সেলফি দেব। শুধু আমি কেন, পুরো টিমই দেবে। এখন যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে..."

"ইয়েস... ইয়েস স্যার।" শ্রী একেবারে বিগলিত হয়ে বলল, "আপনি ডিউটি করুন। তবে আপনার নম্বরটা যদি দেন তাহলে ভালো হয়। আমরা একসঙ্গে কফি তো খেতেই পারি। আমি ফিশ ফিঙ্গার খুব ভালো বানাই।"

"শিওর।"

সে আর কথা না বাড়িয়ে তার ফোন নিয়ে নিজেই ফোন নম্বর টাইপ করে দেয়। তিতলিরও দেখাদেখি ফোন নম্বর চাই। অগত্যা চূড়ান্ত ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দু-জনের

ফোনেই নির্বিবাদে নিজের ফোন নম্বর সেভ করে দিয়ে অধিরাজ ও বাকিরা দ্রুত নীচে নেমে আসে। সময় নেই। হাতে সময় একদমই নেই। এই দুটো হিস্ট্রিশিটারকে বামালসমেত যথাস্থানে জমা করে দিতে হবে। ওদিকে গুল্লুর টিম বার্নিং শিখের মুভমেন্টের ওপর নজর রাখছে। এখনও তার কোনো খবর নেই ঠিকই। তবে যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। অধিরাজের মন বলছে, সে আদৌ হাত গুটিয়ে বসবে না। সকালের ঘটনাতেই স্পষ্ট যে-কোনো মুহূর্তে বিষাক্ত ছোবল এসে পড়তে পারে...

"স্যার।" অর্ণব চটে লাল, "আপনি ওই দুই মহিলাকে নিজের নম্বর দিয়ে দিলেন। তাও আবার মুখে বলে নয়, ডাইরেক্ট ওঁদের ফোনে নিজেই সেভ করে দিলেন? এটা কী হল? একা কি মানসী জয়সওয়াল কম উৎপাত ছিল যে আপনি আরও বাড়াচ্ছেন?"

"কী করতাম অর্ণব।" সে একটু বিব্রত হয়েই বলে, "উপায় ছিল না। মেয়েরা নম্বর চাইলে না বলাটা অভদ্রতা। আবার যদি চেঁচিয়ে নিজের নম্বর ডিক্টেট করতাম, বা নম্বরটা মুখে বলতাম তাহলে ওঁরা কেন, তুমিও বুঝে যেতে কোন নম্বর দিচ্ছি। তাই নিজেই টাইপ করে নিজের নামে সেভ করে দিলাম।"

"মানে!" এবার রাগের জায়গায় অগাধ বিস্ময় ফুটে উঠেছে অর্ণবের মুখে, "কোন নম্বর বুঝে যেতাম মানে? কার নম্বর দিয়েছেন আপনি?"

অধিরাজ দুষ্টু হাসল, "আরে, ওই নম্বরটা। যেটা সর্বত্র হোর্ডিংে লেখা থাকে। কী যেন...? ইয়েস, 'দিদিকে বলো।' মুখে বললে ওঁরা বুঝতে পারতেন না?"

"অ্যাঁ।" সে আকাশ থেকে পড়বে না পাতালে প্রবেশ করবে ভেবে পায় না, "আপনি চিফ মিনিস্টারের হট লাইনের নম্বর দিয়ে দিলেন?"

"কী করব বলো!" অধিরাজ মাথা চুলকাচ্ছে, "ওই নম্বরটাই ওই মুহূর্তে মনে পড়ল। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর কি কফি, ফিশফিঙ্গার খেতে ইচ্ছে করে না? এমন একটা ডেট পেলে যেতেও তো পারেন।"

"খুড়ো!" পবিত্র হাতজোড় করে ফেলেছে, "স্বীকার করে নিচ্ছি, শয়তানি বুদ্ধিতে তুমি রাজশ্রী, মানে আমার বউয়েরও বাপ! এমন লেভেলের বজ্জাত তো আমার বউ কিংবা শাশুড়িও নয়। পেন্নাম হই!"

"বেঁচে থাকো বাবাজীবন।"

বলতে বলতেই হঠাৎ অধিরাজের ফোনটা বেজে ওঠে। সে চকিতে দেখল, স্ক্রিনে তখন গুল্লুর নামই ভেসে উঠেছে। একেই বলে টেলিপ্যাথি। ব্যাটা অনেকদিন বাঁচবে। সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা রিসিভ করে লাউডস্পিকারে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ। বল।"

ওপ্রান্ত থেকে গুল্লু উত্তেজিত স্বরে দ্রুত জানায়, "স্যার, এই এক সেকেন্ড আগেই তিনি বেরোলেন। আমার লোক লেগে আছে। সবেই বেরিয়েছে...।"

"কোথায় যাচ্ছে কোনো আন্দাজ আছে?"

"আন্দাজা নেই। কিন্তু ব্যাটা ড্রেস চেঞ্জ করেছে। এই মুহূর্তে গেট আপটা স্যার ওয়ার্ডবয়ের। ওই ছদ্মবেশটাই আজ নিয়েছেন উনি।"

সে মাথা ঝাঁকায়, "আর কোনো আভাস পাওয়ার দরকার নেই গুল্লু। ওর ছদ্মবেশটাই বলে দিয়েছে যে কোথায় যাচ্ছে। তোর ছেলেটা কি এখনও লেগে আছে?"

"একদম ছায়ার মতো চিপকে আছে।" গুল্লু একটু থেমে বলল, "তবে ছেলে নয়, মেয়ে স্যার। দৃষ্টি দত্ত। ইয়াং, খুবসুরত।"

"অ্যাঁ!" অধিরাজের মাথায় বিস্ময়ের পাহাড় ভেঙে পড়ে, "খবরি শেষে সুন্দরী তরুণী। গুল্লু, উনি মাটি করবেন না তো রে! মেয়েদের আমি আন্ডার এস্টিমেট করি না। কিন্তু ইনফর্মার হিসাবে আগে কখনও কোনো মেয়েকে দেখিনি।"

গুল্লুর হাসির শব্দ ভেসে এল, "আন্ডার এস্টিমেটের প্রশ্নই নেই। হেবি হুঁশিয়ার মেয়ে। টাকাপয়সা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। ভালো ঘরের শিক্ষিত মেয়ে, আমাদের মতো 'আনপড়", হাভাতে নয়। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারের খুব শখ। গোয়েন্দাগিরির ভূত মাথায়

সওয়ার। আর এত সাবধানী যে কিছু বলারই নেই। আগেও অনেকবার উৎরে দিয়েছে। আর ভীষণ শান্ত আর সুইট বলেই আরও কেউ ইনফর্মার বলে সন্দেহ করে না। খুব সাহসী। এখন ও-ই লেগে আছে।”

“যদিও মোটামুটি বুঝেছি যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন, তবু মাদমোয়াজেলের নম্বরটা পাওয়া যাবে?” সে একটু থেমে যোগ করল, “তাহলে লোকটার মুভমেন্ট ট্র্যাক করতে পারব।”

“এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।” গুল্লু ফিচ করে হাসল, “তবে ও কিন্তু আপনার অন্ধ ফ্যান স্যার। খোদ আপনারই ফোন পেলে হয়তো ভয়েই তোতলাবে। তাতে রাগ করবেন না! এসব আজকালকার মেয়েদের ইশক-মুশকের চক্কর। একটু ‘ঝেলে নিন।”

“ডান। ‘ঝেলে’ নেব। তুই নম্বর দে।”

ফোনটা কেটে দিয়েই বলল অধিরাজ, “পবিত্র, হাতে সময় নেই। তুমি এই গাড়িতেই মক্কেলদের নিয়ে চলে যাও। একটা এখন উঠবে বলে মনে হয় না, আর একটা বেশি ট্যা-ফোঁ করলে এক ঘুষি মেরে অজ্ঞান করে দিও। ঠুকেও দিতে পারো, আই ডোন্ট কেয়ার। যে কোনো একটাকে বাঁচিয়ে রাখলেই হল। আমি, অর্ণব আর মিস্ অরোরা এখনই একটা ক্যাব ডেকে হসপিটালের দিকে যাচ্ছি।”

এতক্ষণ ওরা প্রত্যেকেই গুল্লুর কথা শুনছিল। তার কথা শুনে বুঝতে ওদের কারোরই অসুবিধে হয়নি যে বার্নিং শিখ এখন ঠিক কোথায় যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে। ওরা প্রত্যেকেই জানত যে এই স্টেপটা সে যে-কোনো মুহূর্তে নিতে পারে। তবে এত তাড়াতাড়ি নেবে তা ভাবেনি।

উত্তেজনায় অর্ণবের হৃৎপিণ্ড দ্বিগুণ বেগে চলতে শুরু করল। আরও একবার সম্মুখ সমরের সম্ভাবনা আছে! কিন্তু সফল হবে কি? মিস্ বোস কি আটকাতে পারবেন লোকটাকে? ওরা কি ঠিক সময়ে পৌঁছোতে পারবে? যদি ভুল হয়ে যায়! যদি সুন্দরী খবরি তাকে হারিয়ে ফেলে। আফটার অল, মেয়ে। পেরে উঠবে কি অমন ধুরন্ধর ক্রিমিনালের সঙ্গে?

ইটস হাই টাইম। এই মুহূর্তে আর একটাও ভুল করার উপায় নেই। একটাও না।

(২৬)

মিস কৌশানী বোস নিজের বেডের ওপরে বসে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। এমনিতেই আই.সি.ইউ.-র মধ্যে খুব বেশি লোকজনের যাতায়াত নেই। যারা আছে, তাদের মোটামুটি মুখ চিনে নিয়েছে সে। চতুর্দিকে যে সিস্টাররা ঘুরছে, তারা বেশিরভাগই গোমড়ামুখো। অবশ্য ওদের হাসার সুযোগও বিশেষ নেই কারণ এখানে যে পেশেন্টরা আছে, তারা হয় অজ্ঞান, নয় নিজেরাই খিটখিট করে নার্স-ওয়ার্ডবয়দের আরও খিটখিটে বানাচ্ছে। সত্যি বলতে কী এর মধ্যে হাসি নামক পদার্থটাই আসে না। চতুর্দিকে নাকে নল গোঁজা, পঞ্চাশটা যন্ত্রপাতি ঠুসে দেওয়া কিছু মানুষ শুয়ে আছে। চিলড এসির জ্বালায় কাঁপুনি উঠে যায়। তার ওপর কানের কাছে গুচ্ছ যন্ত্রের অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ। কোনোটা পিঁক্ পিঁক্ করছে তো কোনোটা বিপ্ বিপ্! এখানে যারা আছেন, তাদের চব্বিশ ঘণ্টাই মনিটরিং চলছে।

সবার মধ্যে একমাত্র কৌশানীই সুস্থ মানুষ। কিন্তু স্যার আবার তাকে কায়দা করে গ্যারাজ করে দিয়েছেন এই আধমরাদের ভিড়ে। মাঝেমধ্যে আশেপাশের দৃশ্য দেখে নিজেকেই অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে তার। পাশের বেডের একজনের ইসিজি মেশিন মাঝখানে এমন শোরগোল শুরু করেছিল যে মনে হচ্ছিল এবার বুঝি তারই হার্টফেল হয়ে যাবে! রীতিমতো বুক ধড়ফড় করতেও শুরু করে দিয়েছিল। কী কষ্টে যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনেছে তা একমাত্র সে-ই জানে। এই অসুস্থ পরিবেশে ডিউটি দিতে হবে কোনোদিন ভেবেছিল?

তবে যতই অসুবিধা হোক, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে অক্লান্ত পাহারা দিচ্ছিল সে। সকালবেলা অফিসার আচার্য-র বকা খেয়ে একটু দমে গেলেও টপ বসের ভোক্যাল টনিকে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কৌশানী বোস জানে, দুনিয়ায় সবার ভুল হতে পারে, কিন্তু ও লোকটার প্রতিপক্ষকে মেপে নিতে একটুও ভুল হবে না। সে নিভৃতে ওঁর প্রচুর কেস স্টাডি করেছে। একসময় তো নেশার মতো কেসফাইলগুলোকে পড়ত। পেপার কাটিং জমা করে ফাইলে সাজিয়ে রাখত। তাই তার খুব ভালোভাবেই জানা আছে, যেখানে সবার চিন্তা শেষ হয়, সেখান থেকেই অধিরাজ ব্যানার্জি ভাবতে শুরু করেন। আজ স্বয়ং তিনিই ওর ওপর ভরসা রেখেছেন। সে ভরসা ফের কিছুতেই ভাঙতে দেবে না সে। এবং আদৌ ও এতটা মূর্খ নয় যে কোনো পুরুষ অফিসারের বদলে কায়দা করে লেডি অফিসারকে বার্নিং শিখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার পেছনের কারণ বুঝবে না। স্যার আগেও বলেছেন, বার্নিং শিখ সবরকম দুষ্কর্ম করতে পারে, কিন্তু কোনো নারীকে সরাসরি, সজ্ঞানে হত্যা করবে না। চেজিং এর সময়ে সে কৃপাণ চালিয়েছিল ঠিকই, তবে সেটাও হালকা জখম দেওয়ার জন্য। নয়তো ওই কৃপাণ বুকে বা পেটে লাগত। আই.সি.ইউ.-র সামনে যতই কড়া প্রহরা হোক, একটা ইউনিফর্ম আর নকল আইডেন্টিটি কার্ড থাকলে গোটা থানাও কর্মীদের আটকাবে না। বার্নিং শিখকে হতভম্ব করার এইটাই মোক্ষম রাস্তা, সেটা কৌশানী বুঝেছে। আর এই জন্যই লোকটার জন্য মরে যেতেও ইচ্ছে করে, বার্নিং শিখের সঙ্গে হাতাহাতি তো কোন ছাড়!

তাই যতই প্রতিকূল পরিবেশ হোক, তার প্রখর দৃষ্টি মেপে নিচ্ছিল উপস্থিত প্রত্যেকটি মানুষকে। সজাগ কর্ণেন্দ্রিয় যান্ত্রিক আওয়াজের মধ্যেও অতি সূক্ষ্ম শব্দও শুনে নিচ্ছে। সিস্টার-ওয়ার্ডবয়দের নিজেদের মধ্যে চাপা কথাবার্তা, পেশেন্টদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ কিংবা উঃ আঃ, ডাক্তারদের নীচুস্বরের বার্তালাপ—কিছুই মিস্ করছে না।

এমনিতেই স্যারের কথা এখনও পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। যেসব ডাক্তাররা এখানে ঢুকছেন, ওয়ার্ডবয় কিংবা সিস্টারদের হাবেভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে ওঁরা সবাই পরিচিত মানুষ। তাঁরা নিজেরা কোনোরকম ইঞ্জেকশন বা ওষুধ নিজের হাতে দেন না। বরং মন দিয়ে মেডিক্যাল চার্ট বা ফাইল পড়ে নিয়ে খসখস করে কিছু লিখে দেন বা সঙ্গের সিস্টার বা ওয়ার্ডবয়কে মৃদুস্বরে নির্দেশ দিয়ে দেন, ‘বাইশ এ-র একটা এম আর আই স্ক্যান

করে সিভিএসটির অবস্থাটা দেখে নাও। শ্রশ্বাসটাকে মনিটর করতে থাকো।' কিংবা 'তেইশ বি-এর সিজারটা কতটা ফ্রিকোয়েন্ট সেটা দেখে নিয়ে মেডিসিন দিও।' মোটামুটি এইরকমই সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ সেরে তাঁরা চলে যান। পেছন পেছন সঙ্গের জুনিয়র ডাক্তার বা সিস্টার-ওয়ার্ডবয়রাও চলে যায়। যারা ইঞ্জেকশন বা মেডিসিন দিতে আসে, এতক্ষণে তাদেরও মোটামুটি চিনে ফেলেছে কৌশানী। এখনও পর্যন্ত কোনোরকম সন্দেহজনক কিছু পায়নি। তারা সব নীরব লম্বা মুখ করে আসে, ফাইল আর চার্টে একবার চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর যা করার করে চুপচাপ চলে যায়।

এর মধ্যেই সোমলতা চৌধুরী রীতিমতো গোটা আই.সি.ইউ. মাথায় তুলে রেখেছেন। তাঁর কোনো কিছুই পছন্দ হচ্ছে না। একচুলের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন, তা নিয়ে কোনো কৃতজ্ঞতাবোধও নেই। এখন ব্রেকফাস্টের কোয়ালিটি নিয়ে পড়েছেন। মুখ বিকৃত করে বললেন, "ছ্যাঃ। এগুলো মানুষে খায়?"

যে তরুণী নার্সটি তাঁর ওষুধের চার্ট দেখছিল সে গম্ভীরমুখে বলল, "এটা ফাইভস্টার হোটেল নয় ম্যাম। হসপিটালের আই.সি.ইউ.। এখানে বেশিরভাগ পেশেন্টকেই গলায় নল ঢুকিয়ে খাওয়াতে হয়। আপনার সৌভাগ্য যে আপনি নিজের হাতে খাচ্ছেন!" কৌশানী মুখ টিপে হাসল। বেশ হয়েছে। একটু মুখঝামটা খাওয়া মহিলার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। মুখ কি ওর একারই আছে? সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি! ভদ্রমহিলা সবাইকেই নিজের বাড়ির লোক পেয়েছেন। যেন ওঁর দাপটে সবাইকে একেবারে ছুঁচোর মতো হয়ে থাকতে হবে। মিঃ চৌধুরীর জন্য দুঃখ হয়। কী বাঁশটাই না গিলেছেন। এখন না পারছেন ফেলতে, না পারছেন গিলতে। সারাজীবন বেচারি জ্বলন্ত উনুনের ওপর উঠে বসেই থাকলেন। মহিলা একেবারে হাড় ভাজাভাজা করে দিল!

সোমলতা হাঁড়িমুখো নার্সের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন পারলে খাবারের বদলে ওকেই জল দিয়ে গিলে ফেলেন। কিন্তু আর কথা বাড়ালেন না। কৌশানী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বুড়ি বড়োই খিটখিটে। কী করতে যে স্যার ওকে ঘাড়ে তুলে নিয়ে বাইরে বের করেছিলেন। শাঁখা-সিঁদুর সহ স্বর্গে গেলেই বেশ হত। অদ্ভুত চরিত্র। দুনিয়ার সবাইকে জ্বালিয়ে না মারা অবধি শান্তি নেই।

সে মনে মনে সোমলতাকে আরও একটু গালিগালাজ করার কথা ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই বালিশের নীচে রাখা মোবাইলটা ভাইব্রেট করে উঠেছে। এখানে মোবাইল রাখা অ্যালাউড নয়। বিশেষ করে আই.সি.ইউ.-র ভেতরে তো একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে বার্নিং শিখের কীর্তিকাহিনি এখন কারোরই অজানা নয়। সি.আই.ডি. হোমিসাইডের অনুরোধে এইটুকু সুবিধা হসপিটাল কর্তৃপক্ষ প্রোভাইড করেছে। সে আলতো করে ফোনটা বালিশের তলা থেকে বের করে আনে। স্ক্রিনে ছবিসহ নামটা দেখেই বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। প্রত্যেকবারই এই ছবি আর নামটা দেখলে ওর হৃৎপিণ্ড দ্বিগুণ বেগে চলতে থাকে। গায়ে যেন চারশো চল্লিশ ভোল্টের ছ্যাঁকা! কীভাবে যে নিজেকে স্বাভাবিক রাখে তা একমাত্র সে-ই জানে। ফোন তুললে এখনই ভেসে আসবে মন্দ্র উষ্ণ কণ্ঠস্বর। কিছু কিছু মানুষের কণ্ঠস্বরে নেশা থাকে। ওঁর ভয়েজে তো ভগবান কড়া ডোজের এল এস ডিই মিশিয়ে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে বড়ো বুঁদ করা ব্যক্তিত্ব।

কৌশানী একটা জোরালো শ্বাস টেনে ফোনটা রিসিভ করল, "ইয়েস স্যার?" ওপ্রান্ত থেকে অধিরাজের শান্ত অথচ মখমলি স্বর ভেসে এল, "রেডি থাকুন মিস্ বোস। উনি আপনার দিকেই আসছেন।"

কণ্ঠস্বর আর সংবাদ দুটোই মোক্ষম। এক ঝটকায় গায়ের সমস্ত রোম খাড়া হয়ে গেল তার। সে নীচু স্বরে বলে, "দেখে নিচ্ছি।"

"আমরাও আসছি।" অধিরাজ জানায়, "একজন লেডি খবরি ওর সঙ্গে লেগে রয়েছেন। সেনোরিটা বললেন, তিনি জাস্ট এইমাত্র হসপিটালে ঢুকেছেন। ওয়ার্ডবয়ের ড্রেস আছে, সঙ্গে ব্যাজ, আর নকল আই ডি কার্ডও আছে। তবে হসপিটালের স্ক্যানারের সামনে দিয়ে

যখন গেছে তখন সঙ্গে কোনো ওপন্ বা হিডন্ অস্ত্র নেই। অস্ত্রটা ও ওখান থেকেই সংগ্রহ করবে। আমাদের পৌঁছোতে আরও মিনিট পাঁচেক লাগবে। ওকে ধরতে পারবেন কিনা জানি না, কিন্তু আটকান। কোনো ব্যাড নিউজ আমি চাই না মিস বোস।”

“গুড নিউজই পাবেন।” সে দাঁতে দাঁত পিষল, “এবার ওকে ছাড়ব না।”

“গ্রেট।”

ফোন কেটে গেল। সেটাকে ফের বালিশের তলায় চালান করে দিয়ে মেরুদণ্ড একদম টানটান করে শিকারীর ভঙ্গিতে বসে রইল মিস্ বোস। লোকটা ওয়ার্ডবয়ের ছদ্মবেশে আছে এইটুকু তথ্যই যথেষ্ট। বাকিটা সে দেখে নেবে। তার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নেই ঠিকই, তবে বার্নিং শিখও নিরস্ত্র। দেখা যাক কতখানি বুদ্ধি ও শক্তি সে ধরে!

কৌশানীর সতর্ক চোখ একটা অপরিচিত মুখ খুঁজতে থাকে। কোথায় সেই বহুরূপী? ঠিক পাঁচ মিনিট আগেই একটা দলের শিফট শেষ হয়েছে। ওই গ্রুপটাকে সে মোটামুটি চিনে ফেলেছিল। এখন শিফট চেঞ্জ হচ্ছে। অর্থাৎ কয়েকজন ছাড়া আর প্রায় সবই নতুন মুখ এসে জায়গা নেবে। সে আফসোসে ঠোঁট কামড়ায়। একেবারে এই সময়টাতেই বেছে বেছে ঢুকছে লোকটা! শিফট চলাকালীন এলে সহজেই ধরা পড়ত। কিন্তু এখন তার চোখের সামনেই আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে সিস্টার-ওয়ার্ডবয়রা। তাদের জায়গা নিচ্ছে নতুন মানুষেরা। এর মধ্যে কোথায় সে?...এক এক করে তো ওয়ার্ডবয়রাও আসছে... কিন্তু তিনি কোনজন?

সে ক্রমাগত বিহ্বল হচ্ছিল! চোখের সামনে এখন সব অচেনা চেহারা। পোষাক একই, ইউনিফর্মও এক। প্রত্যেকের গলায় আই ডি কার্ডও ঝুলছে। কিন্তু এদের মধ্যেই মিশে আছে একটা নকল মুখ আর নকল পরিচয়। বুঝবে কী করে? তার সঙ্গে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কাও কাজ করছে। যদি চিনে নিতে না পারে? যদি আবার কোনো ভুল হয়ে যায়? বার্নিং শিখ হয়তো ইচ্ছাকৃতই এই শিফট চেঞ্জের সময়টা বেছে নিয়েছে। কারণ বিশেষ করে এই সময়টা কেউ কাউকে ঠিকমতো দেখেও না। যারা আগে ডিউটিতে ছিল তাদের বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। যারা নতুন আসে তারা নিজের পজিশন বুঝে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে একটা হট্টগোলের পরিবেশ। এর মধ্যে খোশগল্প করার বা ঠিকমতো পরস্পরকে বুঝে বা দেখে নেওয়ার সময়টুকুও মেলে না। তাই কোনো নতুন মুখও যদি এদের মধ্যে মিশে থাকে তবে চট করে নজর করা কষ্টকর। আর এই চতুর ক্রিমিনালের জন্য ওই কয়েক মুহূর্তের অসাবধানতাই যথেষ্ট। তার মধ্যেই বাজি মাত করে বেরিয়ে যাবে সে। তাই এক মুহূর্তের জন্যও ঢিল দেওয়া যাবে না।

কৌশানী সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে বসে থাকে। তার হৃৎস্পন্দন তুঙ্গে। স্যার যদি সঠিক বুঝে থাকেন তবে কোনো-না কোনো ইঙ্গিত ওদিক থেকে আসবেই। সে সূক্ষ্ম ও ধারালো দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা পরখ করতে থাকে। কাউকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে কি? ওই তো একজন দাড়িওয়ালা ওয়ার্ডবয় একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। স্যালাইনের বোতলের দিকে তাকিয়ে আছে। ও নয় তো? গোটা মুখই তো দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন। আসল চেহারা বোঝা দায়। এটা কি আসল মুখ না ছদ্মবেশ? কিংবা এইমাত্র যে ওয়ার্ডবয়টি ওষুধের ট্রলি নিয়ে ঢুকল সে? এর মুখে অবশ্য দাড়ি নেই, তবে মোটাসোটা গোঁফ আছে। দেখে তো বাঙালিই মনে হয়। নিরীহ চেহারা... কিন্তু বিশ্বাস নেই।

কৌশানী বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। এখানে দু-জনই ওয়ার্ডবয় আছে। এদেরও সন্দেহের বাইরে রাখছে না ঠিকই। কিন্তু দু-জনেরই চলনে বলনে যথেষ্টই পেশাদারিত্বের ছাপ আছে। দু-একবার তার দিকে তাকিয়েওছে ওরা। কিন্তু ওদের সদা নির্লিপ্ত মুখে কোনোরকম চমকে ওঠা বা নার্ভাসনেস তো দূর, বিন্দুমাত্র কৌতূহলেরও ছাপ নেই। এখন মেল পেশেন্টদের কাছে যে ওয়ার্ডবয়রা আছে, তাদের দেখে নেওয়ার পালা।

মেল আর ফিমেল পেশেন্টদের জন্য এই বিরাট পোর্শনেই এরিয়া ভাগ করা আছে। কাচ আর পর্দা দিয়ে পার্টিশন করা। কিন্তু কৌশানী সেদিকেও নজর রাখছে। যেহেতু ডাক্তাররা

ওর পরিচয় জানেন, তাই হয়তো তেমন কিছুই নির্দেশ দেওয়া আছে মূল স্টাফদের। তাই তাকে কেউ আটকাচ্ছে না। সে স্বচ্ছন্দেই কয়েকবার চুপচাপ রাউন্ড দিয়েছে। সকলেই জানে, কারোরই হাতে এখন নিয়ম মানার মতো সময় নেই। বাহাত্তর ঘণ্টার মেয়াদ শেষ হলে দেখা যাবে। এখন নর্মস, রুলস দেখতে গিয়ে বেঘোরে কারোর প্রাণ যাক তা কর্তৃপক্ষও চান না। আর এর মধ্যেই মৃত্যুর তাণ্ডব ওঁরা দেখেছেন ও জানেন। তাই আপত্তি করার কোনো জায়গাই নেই।

মেল আই.সি.ইউ.-র কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছিল কৌশানী। সেখানে এই মুহূর্তে তিনজন ওয়ার্ডবয় আছে। একজন এক পেশেন্টের ক্যাথিটার চেঞ্জ করতে ব্যস্ত। সে মাথা নাড়ল। এ হতে পারে না। কারণ এর সঙ্গে ডাক্তারও আছেন। যেভাবে কথাবার্তা চলছে তাতে স্পষ্ট, ডাক্তারের চেনা।

বাকি রইল দু-জন। একজন কিছু মেডিসিন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, অন্যজন পরিমলের বেডের চাদর গুছিয়ে দিচ্ছে। দু-জনেই পরিমলের খুব কাছাকাছি। তার ভুরু নেচে ওঠে। এই দু-জনকেই একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

সে চুপচাপ কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। যে লোকটি পরিমলের বিছানা ঠিকঠাক করছিল, সে একঝলক তাকাল তার দিকে। তার চোখে কৌতূহল। অন্য ওয়ার্ডবয়টি মেডিসিন নিয়ে এদিকেই আসছিল। কৌশানীর তীব্র দৃষ্টি তাকে ছুঁয়ে যেতেই অদ্ভুত এক কাণ্ড হল! ওয়ার্ডবয়টি যেন খণ্ডমুহূর্তের জন্য চোখ সরিয়ে নিয়েছে তার দিক থেকে। জাস্ট সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য সে যেন একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছে। একটু যেন থমকেও গেল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বেশ তেজি গলায় বলল, “ম্যাডাম, আপনি মেল ইউনিটে কী করছেন?”

কৌশানী ঠোঁট কামড়ে ধরে একটু চটুল হাসল। স্যার একটুও ভুল আন্দাজ করেননি। কী করে যে পারে লোকটা সেটা আজও বুঝে উঠতে পারেনি সে। কিন্তু স্বচক্ষেই দেখছে যে পেরেছেন। কোনো সন্দেহই নেই যে ইনিই তিনি। কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা, থমকে যাওয়া, চোখ লুকিয়ে ফেলাই ওর পরিচয় বলে দিয়েছে। আর কী অদ্ভুত ওর মেক-আপের ক্ষমতা! কোথায় সেই বুড়ি থুরথুরি কমলা, আর কোথায় এই শক্তপোক্ত ওয়ার্ডবয়! ওই সেকেন্ডের ভুলটা না করলে ওকে ধরাই যেত না।

সে মোহিনী হাসি হাসল, “তেমন কিছুই করছি না। জীবনে তো এই প্রথমবার হসপিটালে বেড়াতে এসেছি, তাই একটু ট্যুর করছিলাম। তার সঙ্গে সমস্ত ওয়ার্কারদের সঙ্গে একটু গল্পগাছাও করছি। কী করব বলুন, গাইড নেই কিনা। তাই হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি সবই নিজেকেই জানতে হচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, আপনার নামটা...?”

“স্যাম...!” ওয়ার্ডবয় বেশ কড়া গলায় বলে, “হসপিটালটা আপনার ট্যুর করার জায়গা বলে মনে হয়? যান, নিজের বেডে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।”

“ট্যুর করার জায়গা না হোক।” এবার তার কণ্ঠস্বরে পুলিশি টোন, “ইন্সপেকশন করার জায়গা তো হতেই পারে।”

“ইন্সপেকশন?” লোকটা এবার একটু ঘাবড়ে যায়, “কীসের ইন্সপেকশন?”

“যেমন রোগীদের খাবার কোয়ালিটি। তাদের যত্ন-আত্তি ঠিক হচ্ছে কিনা, কিংবা ওষুধ-পত্র ঠিকঠাক দেওয়া হচ্ছে কিনা।” মিস বোস নিরীহ মুখে জানতে চায়, “আপনি ট্রেতে ওটা কী নিয়ে যাচ্ছেন? সিরিঞ্জ?"

“হ্যাঁ। একটা মেডিসিন দেওয়ার টাইম আছে ম্যাডাম।”

“ওকে মিঃ স্যাম।” কৌশানী সিরিঞ্জটার দিকে তাকায়, “কী মেডিসিন আছে এতে? হাওয়া? আই মিন্ এয়ার বাবলস্? কারণ সিরিঞ্জ তো ফাঁকা৷ ট্রে-তে কোনো মেডিসিন ভায়ালও দেখছি না। কাকে দেবেন? মিঃ পরিমল চৌধুরীকে? ফ্রেশ এয়ার এমনিতে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। কিন্তু ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গেলে...!”

মুহূর্তের মধ্যে লোকটার মুখে গভীর আফশোশ, রাগ, বিরক্তি সব একসঙ্গে ভেসে উঠল।

তার মুখের ভাঁজগুলো চরম নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। বোধহয় ভাবতেই পারেনি যে এভাবে ধরা পড়ে যাবে। সেই হতাশাই তাকে আরও ক্রুর করে তুলল। সে আচমকা হাতের ট্রে-টা কৌশানীর দিকে ছুড়ে মেরে সবেগে ছুটল বাইরের দিকে। কৌশানী আন্দাজই করেছিল যে এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সে বিদ্যুৎবেগে ডাক করে। প্রাথমিক আক্রমণটা ডজ করেই সে-ও তাকে চেজ করছে। চেঁচিয়ে বলল, "দাঁ-ড়া!"

উপস্থিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিস্থিতি দেখে স্তম্ভিত। তারাও বুঝি কিছুক্ষণের জন্য মূর্তিবৎ হয়ে গিয়েছে। কেউ কিছু বোঝার আগেই আততায়ী সবাইকে পেছনে ফেলে তীরবেগে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল আই.সি.ইউ. থেকে। তার পেছন পেছন পেশেন্টের পোষাকে মিস্ বোস প্রায় বাঘিনীর মতো ধাওয়া করল। মনে মনে বলল, "শুয়োরের বাচ্চা! আমায় গাঁজা খাওয়ানো! দেখাচ্ছি।"

বার্নিং শিখ দৌড়োতে-দৌড়োতেই ভয়ার্তভাবে দেখল যে পেছনের লেডি অফিসার মারাত্মক বেগে স্প্রিন্ট টানছে। মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট, সহজে ছাড়বে না। একেবারে সাক্ষাৎ মা চণ্ডীর মতো বেগে ধেয়ে আসছে। সে মুহূর্তের জন্য অসহায়বোধ করল। পুরুষ অফিসার হলে ঠিক ডাক্তারি ছুরি বা চাকু ম্যানেজ করে পেট ফাঁসিয়ে দিত। কিন্তু আবার সেই লেডি অফিসার। অধিরাজ ব্যানার্জি শুরুটা করেছে কী! একে তো বাইরে থেকে দেখে বোঝাই দায় যে কোথাও সিকিউরিটি আছে কিনা। অন্তত দেখে মনে হয়েছিল, নেই। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে সুযোগ বুঝে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। রাস্তা ফাঁকা। কাজ হয়েও যেত। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ফের সেই লেডি অফিসার এসে মাথায় পড়ল। কী করে বুঝল, কী করে ধরল ভগবানই জানে। এখন একে থামাবে কী করে! প্রত্যেকবার তার দুর্বলতার সুযোগ নেবেই এই ধুরন্ধর আই জি! এই নারীজাতি প্রত্যেকবারই তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় কেন? এ কী বিপদ। এমনিতেই অনেক নীচে নেমেছে। আর কত নামতে হবে?

সে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। অন্যদিকে কৌশানী বোস চিতার মতোই স্প্রিন্ট টানতে-টানতে আচমকা শরীরটাকে চরম দক্ষতায় ছুড়ে দিয়েছে শূন্যে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই উড়ন্ত অবস্থাতেই পা চালিয়েছে। জোরালো পায়ের জোরদার লাথি পিঠে খেয়ে লোকটা একদম দড়াম করে ছিটকে পড়ে মাটিতে। উত্তেজনায় দরদর করে ঘামছিল কৌশানী। আলগা করে হাতায় মুখ মুছে নিয়ে বলল, "ব্যাটাচ্ছেলে!" বার্নিং শিখ মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কোনোমতে মারটা সামলে নিয়ে সোজা হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। তার আগেই একখানা পা তার বুকের ওপর তুলে দিয়ে তাকে মাটিতে চেপে ধরে বলল লেডি অফিসার, "একদম না! ভুলেও চেষ্টা করবি না।" এই মুহূর্তে এই কৃষ্ণাঙ্গী, দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরীকে সত্যিই মহাকালীর মতো দেখাচ্ছে।

পদানত অসুরের বুকে পা দিয়ে যেন ভয়ংকরী মহাশক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিধ্বংসী রূপ, সেই রণরঙ্গিনী অসুরদলনী। শুধু মুণ্ডমালাটাই যা বাকি!

তার ওই রুদ্রমূর্তি দেখে অমন ভয়াবহ খুনিও বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে গেল। তার মুখভঙ্গিতেই স্পষ্ট, কী করবে বুঝতে পারছে না। একেই প্রতিদ্বন্দ্বী এক নারী। তার ওপর জবরদস্তি করার শিক্ষা সে কখনোই পায়নি। কিন্তু এইটুকু বুঝল যে করেই হোক পরিত্রাণ তাকে পেতেই হবে। এ তো শুধু 'মোহরা।' এর পেছনের শাণিত মস্তিস্কটিও নিশ্চয়ই যে-কোনো মুহূর্তে এসে পৌঁছোবে। আর ওই বিপজ্জনক মানুষটিকে এখন রীতিমতো ভয় পেতে শুরু করেছে সে। যে লোক ছাতের ওপর দিয়েও চেজ করতে ছাড়ে না, চলন্ত ও জ্বলন্ত তেলের ট্যাঙ্কারকে প্রাণ হাতে করে জলে ফেলে দেয়, সে সব কিছু করতে পারে! এমনকি তার গোপন ঘাঁটিতেও পৌঁছে গিয়েছিল। ওই লোকটা তাকে কিছুতেই জিততে দেবে না। আজ যদি পালাতে না পারে, তবে সব শেষ। এতদিনের পরিশ্রম... প্রচেষ্টা... সব ব্যর্থ!

মরিয়া আততায়ী এদিক ওদিক তাকিয়ে হাতের কাছে একটা ট্রলি দেখতে পেল। কোনো সিস্টার বা ওয়ার্ডবয় হয়তো ওখানে রেখে গিয়েছে। এগুলোতে সব প্রয়োজনীয় মেডিক্যাল অ্যাপারেটাস থাকে। সে তাকিয়ে দেখল নীচের তাকে একটা স্টিলের প্যান জাতীয় কিছু

একটা আছে। অপারেশন থিয়েটারে এমন বস্তু দেখা যায়। গরম জল বা তরল কিছু রাখার জন্যই ব্যবহৃত হয় ওগুলো। ও অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে হাত বাড়িয়ে সেটাকেই টেনে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে কৌশানীর মুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।

মিস্ বোস এই জাতীয় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ধাতব জিনিসটা নিখুঁত লক্ষ্যে তার কপালে গিয়ে সজোরে আছড়ে পড়েছে। খণ্ডমুহূর্তের জন্য সে দিনের বেলাতেই বোধহয় চোখে চাঁদ-তারা সব একসঙ্গেই দেখে ফেলল। সেই সুযোগেই একধাক্কায় তাকে সরিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল বার্নিং শিখ। পরক্ষণেই ফের দৌড়!

কৌশানী টের পেল কপাল বেয়ে একটা উষ্ণ কিছু নামছে। জোরদার ব্যথাও লেগেছে। কিন্তু হেরে যেতে সে-ও শেখেনি। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। হারামিটা কিছুতেই থামার নাম নিচ্ছে না। হাতের কাছে রিভলবারটা থাকলে এখনই শ্যুট করে দিত। এমনিতেও এ লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। অথচ সঙ্গে অস্ত্রটাও নেই। অগত্যা সে-ও লোকটার পেছন পেছন দৌড়োয়। এবার কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যাবে না ওকে। অনেকবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে...।

হসপিটালটা বহরেও খুব ছোটো নয়। অনেকগুলো করিডর এঁকেবেঁকে একেকদিকে চলে গিয়েছে। এই ফ্লোরে প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্ট, ল্যাবও আছে। আই.সি.ইউ.-র সিরিয়াস পেশেন্টদের বেশি নাড়াচাড়া করা যায় না বলে এখানেই স্ক্যান, এক্স রে থেকে শুরু করে যাবতীয় পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই গলিঘুঁজি, আর গা ঢাকা দেওয়ার জায়গা অনেক বেশি। ইউরোলজি আর নিউরোলজির ডিপার্টমেন্টও এখানেই। মস্তবড়ো ওপিডি। লুকোচুরি খেলে চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য একদম পারফেক্ট জায়গা। লোকটা হসপিটালের কর্মীর ছদ্মবেশে আছে। যে কোনো জায়গার অ্যাক্সেস পেতে ওর অসুবিধে হবে না। কৌশানী টের পেল, সে সামান্য হলেও ব্যাকফুটে। হসপিটালের সবাই যেমন বার্নিং শিখকে চেনে না, তেমন তাকেও চেনে না। আই.সি.ইউ.-র মেইন কিছু লোককে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলে সমস্যা হয়নি। কিন্তু সবাইকে বলে রাখা তো সম্ভব নয়! তাছাড়া এটা হসপিটাল। সিরিয়াস পেশেন্টরা আছেন। শোরগোল করাও যাবে না। যা করার নীরবেই করতে হবে, কোনোরকম অস্ত্র ছাড়াই।

করিডরে একটা লেফট টার্ন নিতেই মিস্ বোস হতবাক। যা বাব্বা! লোকটা গেল কোথায়! এতক্ষণ তো চোখের সামনেই ছিল। সামনেই পড়িমড়ি করে দৌড়োচ্ছিল। কিন্তু বাঁক নিতেই ভ্যানিশ! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি? একটা জলজ্যান্ত মানুষ এত সহজে অদৃশ্য হয়ে যায় কী করে? টেকনিক্যালি সেটা অসম্ভব। যদি না ...

মিস বোসের সতর্ক দৃষ্টি চতুর্দিকটা একবার দেখে নিল। সে তখনও হাঁপাচ্ছে। কপালের পাশ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় শীতল ঘামের বিন্দু গড়িয়ে পড়ছে। বুকের ভেতরে জোরদার আন্দোলন। তবু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করল, করিডরের পাশের বন্ধ দরজাগুলোর মধ্যে কোনোটা সামান্য হলেও নড়ছে কিনা। এটা ছাড়া লোকটার গায়েব হয়ে যাওয়ার আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। করিডর বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ডেড এন্ড। সুতরাং পালাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে সে এদিকেই আছে। এই সার সার বন্ধ দরজাগুলোরই কোনো একটার পেছনেই লুকিয়ে রেখেছে নিজের অস্তিত্ব। কিন্তু কোন্ ঘরটায় ঢুকল? কোথায়...?

কৌশানীর অনুসন্ধানী চোখ পেশাদারি দক্ষতায় নির্দিষ্ট ঘরটিকে খুঁজতে থাকে। মোটামুটি সব ঘরেই আলো জ্বলছে। ভেতরে নিশ্চয়ই পেশেন্ট আর টেকনিশিয়ান বা প্যাথোলজিস্টরাও আছেন। অন্তত একাধিক ছায়ার নড়াচড়া এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। ওপিডিতেও প্রচুর লোকজনের চলাফেরা। ডাক্তার, সিস্টারদের ব্যস্তসমস্ত ছন্দেই স্পষ্ট ওখানে তালভঙ্গ করার জন্য কোনো লোক দৌড়ে ঢোকেনি। ঢুকলে সাময়িক হলেও সবাই একটু অবিন্যস্ত হয়ে যেত। দরজাও একদম অনড়। সামান্য সুইং-ও করছে না। কয়েকমুহূর্ত আগেও খুলেছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া হয়তো লোকটা ওপিডিতে ঢোকার রিস্কও নেবে না। এখানে অনেক

লোকজন থাকার দরুণ যেমন মিশে যাওয়ার সুবিধাও আছে, তেমনই একবার কেউ স্পট করলে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। সে নিজেকে কোনো নির্জন জায়গাতেই লুকোবে। কিন্তু কোথায়...?

একটা সূক্ষ্ম শব্দে তার কান খাড়া হয়ে যায়। একটা ভারি দরজার আস্তে আস্তে বন্ধ হওয়ার আওয়াজ নয়? কোটা বন্ধ হচ্ছে? তার দৃষ্টি আবার প্রত্যেকটা দরজার ওপর প্রায় সার্চলাইটের মতোই পড়ল। ডানদিকের গুলো সব বন্ধ। দেখে মনেও হচ্ছে না যে কেউ সম্প্রতি খুলেছে। তবে বাঁদিকের একটা দরজা এখনও সামান্য নড়ছে। বলা ভালো, সুইং করছে। হাইড্রলিক ডোর ক্লোজারের কৃপায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। এটা ওপেন এম.আর.আই. স্ক্যানের রুম। এমনিতে এম.আর.আই. স্ক্যানের অন্যত্র ব্যবস্থা থাকলেও আলাদা করে ওপেন এম.আর.আই. সেইসব পেশেন্টদের জন্যই রাখা হয়, যারা ক্লস্ট্রোফোবিক। বা অনেকের আবার এম.আর.আই.-এর জন্য প্রয়োজনীয় সরু স্পেসে ঢুকতে আপত্তি আছে। তাই ওপেন এম.আর.আই.-এর জন্য আলাদা রুমের বন্দোবস্ত। যদিও এই রুমটার ভেতরে এই মুহূর্তে কোনো স্ক্যান হচ্ছে না। লাইটও বন্ধ। ভেতরের অন্ধকার আবহ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি এইখানেই...?

কৌশানী কয়েকমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আবার একটা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিল। তারপর ভারি দরজাটাকে যথাসম্ভব নিঃশব্দে ও আস্তে টেনে খুলেছে। ভেতরে কোনো আলো জ্বলছে না। এম.আর.আই. মেশিনটা এখন কোনোরকম আওয়াজ করছে না। কিন্তু ভয়াবহ চিলড এসির স্পর্শে সারা শরীর ছ্যাঁত করে উঠল। অসম্ভব কনকনে ঠান্ডা। প্রায় দাঁত কপাটি লেগে যাওয়ার জো! আশেপাশে কোনো টেকনিশিয়ানও নেই। শুধু অন্ধকার আর শীতলতায় ছেয়ে আছে ঘরটা। দরজা বন্ধ হয়ে যেতে-না যেতেই একদম পিনড্রপ সাইলেন্স। বাইরে যে একটা বিরাট মহাযজ্ঞ চলছে, তার বিন্দুমাত্র রেশও নেই।

নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ ওখানেই দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছিল সে। বুকের ভেতর যেন দামামা বাজছে। সব কিছু ছাপিয়ে যেন ওই শব্দই ধ্বনিত হচ্ছে গোটা ঘরে। চারপাশে তেমন স্পষ্ট আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু ওপেন এম.আর.আই. মেশিনটার প্রকাণ্ড দেহ আর কিছু ছায়া ছায়া অ্যাপারেটাস। পুরো রুমেই আলো-আঁধারির লুকোচুরি। এর মধ্যে একটা লোক কোথায় লুকিয়ে আছে তা বোঝা প্রায় দুঃসাধ্য!

এ ঘরের আলো বা অন্যান্য মেশিনের সুইচ অপারেটেড হয় এরই সংলগ্ন একটি কাচের রুম থেকে। ওই ঘরেই সমস্ত কম্পিউটার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কন্ট্রোলস, সুইচ— সব থাকে। টেকনিশিয়ানরা এই ঘর থেকেই গোটা সিস্টেমটাকে অপারেট করে। তবে এই মুহূর্তে ওই ঘরেও কোনো আলোর জোরালো রশ্মি নেই। খুব সামান্য একটা নীলচে প্রভার রেশ ছড়িয়ে আছে মাত্র।

সে প্রথমে এম.আর.আই. মেশিনটাকে ভালো করে দেখে নেয়। সতর্ক পায়ে, গুটি গুটি এগোচ্ছে। এই শীতের মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম তার কপালে ও ঠোঁটের ওপরে ফুটে ওঠে। এতক্ষণ দৌড়োচ্ছিল বলে হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে নিঃশ্বাসও দ্রুত তালে চলছিল। কৌশানী নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসকে আপ্রাণ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। নয়তো তার জোরে শ্বাস টানার শব্দ শুনেই লোকটা তার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছে যে অন্য কোথাও আরও একটা ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায় কিনা। বার্নিং শিখও নিশ্চয়ই টানা দৌড়ে এসে এখন হাঁপাচ্ছে। তার মন বলছে, যতই চেপে থাকার চেষ্টা করুক, দুষ্কৃতী অন্তত একবার বুক ভরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করবে। এখন শুধু সেই মুহূর্তটার অপেক্ষা!

অবশ্য মিস্ বোসও আদৌ অলসভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকার লোক নয়। সে খুব সতর্কভাবে আঁতিপাতি করে খুঁজছে ঘরটা। ওপেন এম.আর.আই.-এর বিরাট মেশিনটাকে একবার ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে নিল। আলো জ্বালা সম্ভব না হলেও অন্তত একটা মানুষের ছায়াকে দেখে ফেলতে তার খুব অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। চোখদুটোও রীতিমতো

অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা অস্তিত্বকে চিনে ফেলার জন্য ওয়েল ট্রেইনড। তাই সে প্রথমেই স্ক্যানের সাউন্ডপ্রুফ ঘরটাকে হাতড়ে হাতড়ে দেখে নেয় যে এখানে কেউ আছে কিনা। ওরকম বড়ো একটা মেশিন, তার আশেপাশের যন্ত্রপাতি যেভাবে জায়গা দখল করে আছে, তার আড়ালে যে কেউ ওঁত পেতে বসে থাকতে পারে। তাই একটুও অন্যমনস্ক হওয়ার বা ভুল করার উপায় নেই। সমস্ত স্নায়ু উত্তেজনায় টানটান। সে দমবন্ধ করে খুঁজতে থাকে। ওই পর্দার পেছনে..., মেশিনের ব্যাক সাইডে... যন্ত্রগুলোর পেছনে... টেবিলের নীচে... অন্ধকার কোণায় কালোর সঙ্গে মিশে... কেউ বসে নেই তো।

মাঝেমধ্যেই একটা হিমশীতল অনুভূতি কৌশানীর পিঠ আর মেরুদণ্ড ছুঁয়ে যাচ্ছিল। জীবনে অনেক ক্রিমিনালদের সঙ্গে পাঞ্জা কষেছে। কিন্তু এ লোকটা যেন কিছুতেই বাগে আসছে না! যতবার মনে হচ্ছে এই ধরা পড়ল বুঝি, ঠিক তখনই কিছু না কিছু উপায়ে পাঁকাল মাছের মতো ফস্কে যাচ্ছে। এতগুলো লোক মিলেও তাকে ধরতে পারল না! যেমন নিষ্ঠুর, তেমনই চতুর! একখানা বিষধর কালসাপের চেয়ে কিছু কম যায় না। আর সেই সাপটাই এখন এই অন্ধকারে লুকিয়ে বসে আছে... যে-কোনো মুহূর্তে করাল ফণা তুলে ছোবল মারবে... .!

তবে এই ঘরটায় তেমন কিছু নেই। সে একটু হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এই রুমটা ক্লিন। কিন্তু স্বস্তির পাশাপাশি এবার আশঙ্কাও চেপে ধরছে। তাহলে কি ওই লাগোয়া ঘরটা? টেকনিশিয়ানের চেম্বার? এছাড়া আর কোনো এস্কেপ রুটও তো নেই। ওখানেই কি তবে...?

গুটিগুটি পায়ে, সাবধানী পদক্ষেপে অ্যাটাচড রুমটার দিকে এগোচ্ছিল। ঠিক তখনই তার কানে এসে পৌঁছল একটা চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। কেউ যেন আর থাকতে না পেরে একঝলক বাতাস ফুসফুসে টেনে নিল। এতক্ষণ বুঝি রুদ্ধশ্বাসে সে-ও বসেছিল। কিন্তু আর পারল না। আর এই ভুলটারই এতক্ষণ ধরে কৌশানী প্রতীক্ষা করছিল!

লেডি অফিসার তড়িৎগতিতে শব্দটার উৎসস্থলের দিকে ছুটল। নিঃসন্দেহে ওই ঘরেই আছে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। এবার আর ওর রক্ষা নেই। অনেক হয়েছে লুকোচুরি। এবার গেম ওভার....।

অপারেটিং রুমটাও প্রায় অন্ধকারে ডুবে আছে। শুধু কোনো একটা কম্পিউটারে তখনও ক্ষীণ আলো জ্বলছিল। তারই হাল্কা নীলাভ আভাস খুব সামান্যই আলোকিত করেছে। এছাড়া আর কোনো তীব্র আলোর উপস্থিতি নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এর থেকে একদম অন্ধকার হলেই বোধহয় বেশি ভালো হত। অন্তত অন্ধকার চোখকে কিছুটা হলেও আরাম দেয়। আঁধার কোনো কিছুকেই প্রকাশ করে না। কিন্তু এই নীলাভ কুয়াশার মতো রহস্যময় আলো একে তো চোখকে কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত করে, তার ওপর আপাতদৃষ্টিতে প্রকাশ করছে মনে হলেও আসলে সে সবকিছুই অপ্রকাশিত রাখে। যেন আলোর হেঁয়ালি! কিছু দেখা যায়, বেশিটাই দেখা যায় না। অদ্ভুত এক দ্বিচারিতা!

কৌশানী চোখ কুঁচকে চতুর্দিকটা দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রথম দর্শনেই চমকে উঠল! তার সামনে ওই ছায়াটা কে! কে দাঁড়িয়ে আছে? তার হাত দুটো বিদ্যুৎবেগে স্টান্স নিল। কী আশ্চর্য। উলটোদিকের মানুষটাও অবিকল একইভাবে আক্রমণ শানাচ্ছে। সেই একই ভঙ্গি। একই স্টান্স। সে এবার ততক্ষণাৎ অন্য স্টান্স নেয়। এবার ডিফেন্সিভ। কিন্তু ওই ছায়ামূর্তিরও ভঙ্গি সঙ্গে সঙ্গেই পালটে গেছে। এবার ও ডিফেন্সিভ, অবিকল কৌশানীর মতোই।

সন্দেহে তার চোখ কুঁচকে যায়। আদতে হচ্ছেটা কী? এ ঘরে কি কোনো ম্যাজিক আছে? নাকি ট্র্যাপ? এ কী জাতীয় মায়াবী খেলা। ওদিকের মানুষটা বাস্তব, না কোনোরকমের হ্যালুসিনেশন? কেউ কি তার সঙ্গে মেন্টাল গেম খেলছে? এই নীলাভ আধো অন্ধকার ছায়া ছায়া আবহের মধ্যেই এক অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করল সে। কোনো অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার নয়তো। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল, একটা ভয়াবহ বিষাক্ত মাকড়সা মারাত্মক একটা জাল বুনে রেখেছে। আর কৌশানী একদম তার কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে আটকে আছে বুঝি। যে কোনো সময়ে শিকারী এগিয়ে আসতে পারে... তার কড়কড়ে বিষাক্ত পা দিয়ে গুঁড়ি মেরে

এগিয়ে আসবে...

সেই অজানা আতঙ্কের মধ্যেই তার চোখ আচমকাই বাস্তবটা আবিষ্কার করল। ঘটনাটা আদৌ কোনো অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। এ ঘরে চতুর্দিকে কাচ লাগানো আছে। সেই সার সার কাচে তার নিজেরই ঝাপসা প্রতিবিম্ব দেখেই আঁতকে উঠছিল। ব্রুস লি-র 'এন্টার দি ড্রাগন' সে বহুবার দেখেছে। কিন্তু কোনোদিন স্বয়ং তাকেই ওই পরিস্থিতিতে পড়তে হবে এমন সম্ভাবনা মাথাতেও আসেনি। ব্রুস লি-র ক্ষেত্রে অন্তত একটা জোরদার আলো ছিল। এখানে তো আলো থেকেও নেই। অথচ চতুর্দিকে শুধু সার সার কাচ। যেন হাউজ অব মিররস। সেই কাচে নিজেরই আবছা প্রতিফলন দেখে নিজেই বারবার চমকে উঠছে। মনে হচ্ছে, চুপিসাড়ে তার আশেপাশে বুঝি বেশ কয়েকটা অস্তিত্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো এই ছায়াগুলোর মধ্যেই একটা সত্ত্বা মিশে আছে। ধরা দিচ্ছে না, কিন্তু সে আছে। অবশ্যই আছে।

লৌকিক ও যৌক্তিক ঘটনাটা বুঝতে পেরে মিস বোস ক্ষণিকের শান্তি পেল ঠিকই, তবে স্বস্তি পেল না। একটু আগেই সে লোকটার শ্বাস টানার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। আসল বিপদ মাথার ওপর থেকে এখনও সরেনি। বার্নিং শিখ এ ঘরেই আছে, এখানেই আছে।

সে সন্তর্পণে সবে কয়েক পা এগিয়েই গিয়েছিল, কিন্তু আরও কিছু বোঝার বা করার আগেই ওই নীলাভ ছায়াময় অন্ধকারের ভেতর থেকেই একটা কম্পিউটরের মনিটর তড়িৎবেগে উড়ে এসে দড়াম করে আছড়ে পড়ল তার বুকের ওপর। ধাক্কার অভিঘাতে মনে হল, পাঁজরগুলো বুঝি ভেঙেই গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কৌশানী ক্ষণিকের জন্য একটু টলে গেলেও একটা ছায়ামূর্তির সাঁৎ করে সরে যাওয়া তার নজর এড়ায়নি। প্রতিদ্বন্দ্বী দরজার দিকে দৌড়চ্ছে। ও পালাবে। "থা-ম্ শা-লা!"

লেডি অফিসার প্রায় গর্জন করে ওঠে। লোকটা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই সে লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরেছে ওর গ্রীবা! শক্তিশালী হাতটা সাপের মতো তার গলা পেঁচিয়ে ধরল। ধরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লক অ্যান্ড চোক!

বার্নিং শিখ এবার চোখে অন্ধকার দেখল। একটা মেয়ের হাতে এত শক্তি থাকতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। অমন পেলব সুন্দরী মেয়েটা যে প্রয়োজনে এমন 'মর্দানি' হয়ে উঠতে পারে তা কে জানত। সে হাঁকপাক করতে-করতে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে। যে-কোনো নারীর চেয়ে ও নিজে অনেক বেশি শক্তিশালী ও বেপরোয়া। কিন্তু মত্ত হাতির পিঠে যখন অপেক্ষাকৃত ছোটো চেহারার লেপার্ড চেপে বসে তার ঘাড় কামড়ে ধরে, তখন ওই অমিত বলশালী প্রাণীটিও অসহায়। এমন বেকায়দায় ধরেছে যে ছাড়াতেও পারছে না। সে তবু প্রবল জেদে কৌশানীকে সুদ্ধই দেওয়ালে ধাক্কা মারতে শুরু করল। পিঠের দিক দিয়েই সমস্ত যন্ত্রপাতির ওপর আছড়ে ফেলছে নিজেকে। পিঠ দিয়েই দেওয়ালের কাচ সজোরে ঝনঝনিয়ে ভাঙছে। যে করেই হোক, নিজেকে মুক্ত করতেই হবে। তার ধাক্কায় লেডি অফিসারের মাথা দেওয়ালে ঠুকে যাচ্ছে, হাত পা ঘষা খেয়ে ছড়ে যাচ্ছে, কঠিন যন্ত্রের আঘাতে ব্যথা পাচ্ছে, কাচ ভেঙে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত, আহত হচ্ছে, তবু ও মেয়ে ছাড়ার নাম করে না। তার লৌহ আবেষ্টন ক্রমাগতই চেপে বসছে কণ্ঠনালীর ওপরে। এ কী! ইনি কি মরে গেলেও ছাড়বেন না!

মত্ত হস্তীর মতো বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর বার্নিং শিখ বুঝতে পারল যে তার পালানোর পথ ক্রমাগতই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। এই ঘরে যা ভাঙাভাঙির আওয়াজ হচ্ছে তাতে হসপিটালের কর্মীরা এখনই ছুটে আসবে। তাহলে আর পালাবার পথ নেই। তার নিজের নিয়ম এবার তাকেই ভাঙতে হবে। সম্পূর্ণ জেনে-বুঝে, ওয়াহেগুরুর মর্যাদার সর্বনাশ করে এক নারীকে অপ্রয়োজনে নিজ হাতে খুন করতেই হবে! আর কোনো উপায় নেই।

দু-জনের মারামারির চোটে বেশ কিছু মনিটর ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণে ভেঙে খান খান। এমনকি দেওয়ালে লাগানো বেশ কিছু কাচ ভেঙে গিয়ে খানিকটা ধারালো অংশ তীক্ষ্ণ ছুরির

মতো তখনও খাড়া হয়ে আটকে ছিল। সে আর অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে কৌশানীকে নিয়েই প্রায় উলটে পড়ল ওটারই ওপর। তার হিসাবমতো ওই ধারালো

কাচটায় কৌশানীর গলা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হিসাবে সামান্য ভুল থাকার দরুণ গলার মাঝখানে না লেগে কাচটা মেয়েটার গ্রীবার ডানদিকে গেঁথে গেল। এইবার সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছে। ব্যথার তাড়সে বজ্র আঁটুনি আলগা ও হয়ে যায়। সেই সাময়িক দুর্বলতারই সুযোগ নিল বার্নিং শিখ। সে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে বাইরের দিকে দৌড়োল।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মেয়েটা কুঁকড়ে গিয়েছিল। তবু দাঁতে দাঁত চেপে একটানে বের করে আনল তীক্ষ্ণ কাচের টুকরোটা। কাচটা একদম ভেতরে বসে গিয়েছিল। বের করে আনতেই রক্তের ধারাও বেরিয়ে এল। সে বিন্দুমাত্রও পাত্তা দিল না। তার মাথায় তখন একটাই চিন্তা। লোকটা পালাচ্ছে। যেভাবেই হোক, ওকে ধরতে হবে। সে নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। ছাড়বে না... কিছুতেই ছাড়বে না...!

ওয়ার্ডবয়ের পোষাকে এক ব্যক্তিকে ওভাবে করিডর দিয়ে পড়িমড়ি করে দৌড়োতে দেখে ডাক্তার, সিস্টার, এমনকি পেশেন্ট পার্টিরাও হতবাক! মানসিক রোগগ্রস্ত পেশেন্ট হসপিটাল থেকে পালাতে পারে, এবং তার পেছনে ওয়ার্ডবয় বা সিস্টাররা তাকে পাকড়াও করার জন্য ছুটতেও পারে। কিন্তু জীবনে বোধহয় সবাই এই প্রথমবার কোনো ওয়ার্ডবয়ের পেছন পেছন কোনো রোগিনীকে ছুটতে দেখল। তাও রোগিনীর কী অবস্থা! আপাদমস্তক রক্তাপ্লুত। পোশাকটা রক্তে লাল। কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেবে কী, সবার চক্ষুস্থির! এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থারই সুযোগ নিল বার্নিং শিখ। এক সিস্টার উলটো দিক দিয়ে এক বৃদ্ধকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে নিয়ে আসছিল ওয়ার্ডের দিকে। সে আচমকাই তার ঘাড়ের ওপর পড়ে বৃদ্ধকে হুইলচেয়ার সুদ্ধই এক জোর ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল কৌশানীর দিকে।

বৃদ্ধ বেসামাল হয়ে ভয়ের চোটে সজোরে চিৎকার করে উঠলেন। কৌশানী প্রমাদ গুণল। ভয়াবহ বেগে হুইলচেয়ার সুদ্ধ পেশেন্ট একেবারে এসে আছড়ে পড়তে চলেছে তার ওপর। জোরদার ধাক্কা খেলে পেশেন্টটির অবস্থা কী হবে কে জানে। কী ডেসপারেট ক্রিমিনাল! একবারও ভেবে দেখল না যে ওই অসহায় নিরীহ নিরপরাধ বৃদ্ধ মানুষটির কতখানি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে! সে প্রায় ডাইভ মেরে ভদ্রলোকের হুইল চেয়ারটাকে ধরে আটকাল। দ্রুতবেগে চলা হুইলচেয়ার এক ঝটকায় থেমে যেতেই অসুস্থ লোকটি জোরালো ঝাঁকুনি খেয়ে প্রায় পড়তেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই কৌশানী তাঁকে ধরে ফেলেছে। ভদ্রতাবশত তিনি ঠিক আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। অথচ তার হাতে সময় নেই। সে দেখল দুষ্কৃতি দুড়দাড় করে দৌড়োচ্ছে লিফটের দিকে। যতক্ষণ বিপন্ন পেশেন্টটিকে সামলাতে ব্যস্ত ছিল, সেই সুযোগেই ঢুকে পড়েছে লিফটে। কিছু করার আগেই লিফটের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শেষমুহূর্তে শুধু শয়তানটার ঠোঁটের কোণে একটা অম্লরসাক্ত হাসি ভেসে ওঠে। ভাবটা এমন, "কী করবি করে নে।"

এই ফ্লোরে সাধারণ ও কর্মীদের ব্যবহার করার জন্য অনেকগুলো লিফটই আছে। এমনই কপাল যে তার একটাও এই মুহূর্তে ধারে কাছেও নেই। সবগুলোই ব্যস্ত। মিস্ বোসের হাতে নষ্ট করার মতো যথেষ্ট সময়ও নেই। সে শশব্যস্তে দৌড়োল সিঁড়ির দিকে। যেভাবে লাফ মেরে মেরে সিঁড়ি ভাঙছে তা দেখলে বুঝি শ্রেষ্ঠ লংজাম্পারও লজ্জা পাবে। যে-কোনো পার্কোর-এক্সপার্টের কাছে এইসব স্টেয়ারকেস জাম্প বা ভল্ট মেরে পেরিয়ে যাওয়া প্রায় বাঁ হাতের খেল। অধিরাজ ব্যানার্জির মতো এ বিষয়ে মহাগুরু না হলেও কৌশানী যথেষ্ট স্পিডি। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই দৌড়ে নীচে পৌঁছে গিয়েছে। একেবারে বিদ্যুতের মতো তেজি, কালসাপের মতো মসৃণ তার গতি।

কিন্তু এ কী! লিফটের দরজা খোলা। ভেতরে কেউ নেই। এত কাণ্ডের পরও স্রেফ একটুর জন্য মিস্ করেছে লোকটাকে! কৌশানী অসহায়দৃষ্টিতে দেখল হসপিটালের সীমানা পেরিয়ে ততক্ষণে একটা ভিড়ের দিকে দৌড়োচ্ছে সে। ওর পেছনে যাওয়ার আর কোনো

মানে হয় না। লোকটা অত্যন্ত চালাক। ঠিক ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবে। কিন্তু চৌধুরী পরিবারকে অরক্ষিত রেখে সে কোথাও যেতে পারবে না। কারণ টপ বসের নির্দেশ একদম স্পষ্ট, লোকটাকে ধরার চেয়ে আটকানো বেশি জরুরি। কে বলতে পারে, কৌশানীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে হয়তো আবার অন্য পথে ফিরে আসবে!

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাল ছেড়ে দেয় মেয়েটা। এতক্ষণ উত্তেজনায় নিজের ক্ষতবিক্ষত দেহটার পরোয়া করেনি। কিন্তু এখন তীব্র যন্ত্রণা টের পেল। রক্তক্ষরণে, হতাশার ক্লান্তিতে কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে। সে সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। এইভাবে হেরে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। জীবনে এই প্রথম বুঝি রাগে, দুঃখে তার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে...! "মিস্ বোস?"

কানে এল অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। কৌশানী মুখ তুলে দেখল অধিরাজ, অর্ণব এবং টুইঙ্কল, তিনজনেই দ্রুতবেগে ছুটে আসছে তার দিকে। আরও একটু আগে এলে হয়তো খেল খতম হয়ে যেত বার্নিং শিখের। কিন্তু দেরি হয়ে গেল! ...একটুর জন্য...। আধমিনিটেরও কম সময়ের দাম দিতে হল!

"লোকটা পালিয়ে গেল স্যার...।" তার কণ্ঠস্বরে আফশোশ, "একটুর জন্য ধরতে পারলাম না। জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য ফস্কে গেল।"

"ওঁরা সবাই ঠিক আছেন?"

"হ্যাঁ।" সে সজোরে দম নিতে নিতে বলে, "ওঁদের কিছু হয়নি।"

"ইটস ওকে... গ্রেট ওয়ার্ক ইনডিড।" অধিরাজ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে একঝলক তার গ্রীবার ক্ষত দেখে নেয়, "আপনার এখন ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন। ওকে আমরা দেখে নিচ্ছি। কোন্দিকে গেল?"

সে হাত তুলে বার্নিং শিখের গমনপথের দিক নির্দেশ করে। অধিরাজ এবার টুইঙ্কলের দিকে তাকিয়েছে, "মিস্ অরোরা, প্লিজ টেক কেয়ার অব হার। এক্ষুনি ওঁকে ওপরে নিয়ে যান। শি ইজ ব্লিডিং। আমরা ওদিকে যাচ্ছি।"

মিস্ অরোরা একটাও কথা না খরচ করে মিস্ বোসকে সাবধানে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। মিস বোস তার কাঁধে ভর দিয়ে চলে যেতে যেতে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দেখল যে দুই অফিসার জ্যা মুক্ত তীরের মতো দ্রুতবেগে বার্নিং শিখের খোঁজে দৌড়োচ্ছে। ব্যর্থতার গ্লানির কামড় বুকের মধ্যে একটা তীব্র কষ্টের সৃষ্টি করলেও সে মুখে কিছু বলল না। বরং টুইঙ্কলের হাত ধরে অতিকষ্টে ভেতরের দিকে চলে গেল।

বাইরে তখন রাস্তায় দমবন্ধ করা ভিড়। এর মধ্যেই কোনো এক বিরোধী পার্টির প্রতিবাদ মিছিল চলছে। নানারকম প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে অগুণতি মানুষ স্লোগান দিতে দিতে হেঁটে যাচ্ছে। অধিরাজ এবং অর্ণব অসহায় দৃষ্টিতে দেখল, ওই মুখের মিছিলে যে-কোনো একজনকে স্পট করা প্রায় অসম্ভব। তাদের দৃষ্টি একরকম ব্যর্থ হয়েই গোটা মিছিলকে মাপছিল। কিন্তু নাঃ, এভাবে কোনোমতেই কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হবে না। তবে কি সে এই ভিড়ের মধ্যেই মিশে গিয়ে সরে পড়ল? না অন্য কোথাও লুকিয়েছে?

অর্ণব হতাশভাবে মাথা নাড়ল, "ইম্পসিবল। আবার পালিয়ে গেল।"

অধিরাজ একদৃষ্টে মিছিলের দিকেই তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। অর্ণবের কথা শুনে সংবিৎ ফিরে পেয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, "গুল্লুর লেডি ইনফর্মার বার্নিং শিখকে স্টক করছিলেন না? তিনি কোথায়? তাঁর তো এখানেই থাকার কথা। ফোনে তোমায় বলেছিলেন না যে এখানেই থাকবেন?"

এতক্ষণে অর্ণবের মনে পড়ল। হ্যাঁ, দৃষ্টি দত্ত নামের মেয়েটি তো বার্নিং শিখের পেছনেই ছিল। ফোনে অধিরাজ নিজে কথা না বললেও অর্ণবের তার সঙ্গে বাক্যালাপ হয়েছে। সে জানিয়েছিল, "আমি একদম ওর থেকে দশ হাত দূরত্বেই আছি। আপনারা চিন্তা করবেন না। একেবারে বেহায়া চিনে জোঁকের মতো লেগে থাকব।"

অর্ণব বিড়বিড় করে, "তাই তো। বেহায়া চিনে জোঁকটি গেল কোথায়? গোলমাল দেখে

ভেগে গেল? দেখতে কেমন তাও তো জানি না। হয়তো ভয় পেয়ে সিন থেকে সরে পড়েছে। আফটার অল মেয়ে...!"

"আই ডোন্ট থিঙ্ক সো।" তার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা, "ওই দেখো, ভিড়ের ঠিক উলটোদিকে নীল রঙের ড্রেস পরা এক ইয়াং সেনোরিটা হাঁউমাউ করে ঠিক অপোজিট দিকে দৌড়চ্ছেন। আমার মনে হয় ইনি তিনিই! নয়তো কোথাও কিছু নেই, মিছিল সামনের দিকে, আশেপাশে পুলিশও নেই যে তাড়া খাবেন, ধারে কাছে ইভটিজারও নেই, দিনের বেলায় কোনো মেয়ে ওরকম অকারণে দৌড়বে কেন? যদি না সে কাউকে চেজ করে!"

তার কথা শুনে অর্ণব আবিষ্কার করল যে সত্যিই তাই! এক নীলবসনা সুন্দরী একেবারে প্রাণপণ মিছিলের উলটো ডিরেকশনে দৌড়োচ্ছেন। অধিরাজের কথা মিথ্যে নয়। ওরকম পাঞ্জাব মেলের মতো ছোটার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। সে বলল, ফোন করব? কিন্তু উনি তো ডাইনে-বাঁয়ে তাকাচ্ছেনই না! আমাদের দেখতে পাবেন না। ফোন বাজলেও ধরবেন বলে মনে হয় না!"

"শুধু ডাইনে বাঁয়ে নয়।" মেয়েটির অবস্থা দেখে অধিরাজের কপালে হাত, "সবচেয়ে ভয়ের কথা, উনি সামনের দিকেও তাকাচ্ছেন না! কোন দিকে দেখছেন তা ভগবানও জানে না। সামনে প্রমাণ চেহারার ল্যাম্পপোস্ট! ওটাতেই শিশুর শট ধাক্কা খেতে চলেছেন। সর্বনাশ করেছে!"

কথাটা বলতে বলতেই সে প্রায় হুড়মুড়িয়ে অভদ্রের মতোই ভিড় ঠেলেঠুলে উলটোদিকের ফুটপাথের দিকে দৌড়োল। ছুটতে ছুটতেই চেঁচিয়ে বলল, "উনি ফোন ধরবেন কী? ওঁকে কে ধরে তারই নেই ঠিক। ..."

মেয়েটি নীল রঙের চুড়িদার, শান্তিনিকেতনি ঝোলা ব্যাগ, আর ওড়না সামলাতে সামলাতে তীরবেগে ছুটছিল। বেচারির ওড়নাটা এতই ওড়াউড়ি করে বিরক্ত করছে যে তার দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে সামনের লম্বা চওড়া ল্যাম্পপোস্টটার দিকে তাকায়ইনি। ফলতঃ অধিরাজ যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই হল। প্রবল বেগে গিয়ে, সজোরে আছড়ে পড়ে, ঠকাস করে এক ধাক্কা খেল ল্যাম্পপোস্টটার সঙ্গে। অর্ণব ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কোন্টা গেল? মাথা না নাক

মেয়েটির ভোগান্তির তখনও আরও কিছু বাকি ছিল। মাথায় জোরদার আঘাত পেয়ে এমনিতেই চোখে সরষেফুল দেখছিল, তার ওপর ঠিক ওই মুহূর্তেই অসাবধানে পা-ও স্লিপ করেছে। ফুটপাথের ওপরেই সে সজোরে আছাড় খেতে চলেছে দেখে আশেপাশের

লোকজন হাঁ হাঁ করে ওঠে। ভয়ের চোটে চোখ বুজে দৃষ্টি নিজেও চেঁচিয়ে উঠল, "ভ-গা। গে-ছি। গে-ছি!"

রাস্তার ওপরেই সপাটে আছড়ে পড়ছিল তার হালকা দেহটা। পড়লে হাড়গোড় কিছু আস্ত থাকত কিনা কে জানে। কিন্তু তার আগেই দুটো সবল বাহু তাকে জাপটে ধরেছে। কানের কাছে একটা উষ্ণ স্বর, "এখনও যাননি সেনোরিটা। কিন্তু আর একটু হলেই যেতেন!"

দৃষ্টি টের পেল যে সে নিরাপদ আশ্রয়ে শূন্যে ঝুলছে। ব্যাপারটা কী হল তা বোঝার জন্য সে একখানা চোখ খুলে নিজের রক্ষাকর্তাকে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু সামনে যা দেখল তাতে এখন সরষেফুল নয়, মোটামুটি পুরো ভ্যালি অব দ্য ফ্লাওয়ারই দেখতে শুরু করেছে মেয়েটি। সামনে এই লম্বা লোকটা কে! এতদিন টিভিতে, পেপারে দেখেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। এখন বুঝল, ক্যামেরা কতখানি অপদার্থ। স্বপ্ন দেখছে না মরতে চলেছে? সে প্রায় মরণাপন্ন রোগীর মতোই শ্বাস টানতে টানতে বলল, "ব..ব...ব...ব...!" অর্ণবও ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। খবরির অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "ব...ব... মানে? বাস? বাড়ি? ব্যুরো? বরফ? না বিড়ি? কোথায় যেতে চাইছেন? বা কোনটা চাইছেন?"

দৃষ্টি তোতলাতে তোতলাতেই বলল, "ন...ন...না! ব...ব-স্।"

এতক্ষণে তার 'ব' এর অর্থ বুঝতে পেরে দুই অফিসারই একসঙ্গে কথা বলে ওঠে। অধিরাজ সবে বলছিল, "আর ইউ ওকে মিস্? আপনার নামটা কী যেন?" কিন্তু তার প্রশ্ন

শেষ হওয়ার আগেই অর্ণব বলে উঠল, "লোকটা কোথায়?"
সে যথারীতি তেমনভাবেই বলল, "চ...চ... চাউমিন।"
অধিরাজ প্রায় আঁতকে ওঠে, "ক্ষীঃ! আপনার নাম চাউমিন?"
'চাউমিন' শব্দটা শুনে অর্ণবের অন্তত খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু সে উলটে বেজায় রেগে বলল, "চাউমিন মানে? লোকটা চাউমিন খাচ্ছে? কীসব বলছেন যা তা! আপনি কী জাতীয় ইনফর্মার?"
ও আরও কিছু বলার আগেই অধিরাজ হাত তুলে থামিয়েছে তাকে। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে যে মেয়েটা নার্ভাস। প্রায় কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে একদম সামনের একটা ওপেন ক্যাফের টুলে তাকে বসিয়ে দিয়ে দ্রুতভঙ্গিতে বলল, "মাদমোয়াজেল, আমাদের হাতে একদম সময় নেই। আপনি কি জানেন লোকটা কোনদিকে গেছে?" দৃষ্টি তখনও শক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কোনোমতে বলল, "চা...চ... ...!"
"এখন আপনি আবার চা খাবেন?" অর্ণব পুলিশি টোনে ফের ধমক দেয়, "আরে লোকটা কোথায়? আপনি স্টক করছিলেন না?"
অধিরাজ প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, "সেনোরিটা। এখন 'ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমনে'-র সময় নেই। তাড়াতাড়ি অর্ণব গোস্বামীর মোডে আসুন। নেশন ওয়ান্টস টু নো-হোয়্যার ইজ হি? দাঁড়ি, কমা, পজ—সব গুলি মারুন।"
"লোকটা ও...ওই চাউমিনের দো...দোকানের পাশের সরু গলিটা দিয়ে ঢু ...ঢুকে গেছে ভে...ভেতরে।" সে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করল, "ক.... কিন্তু গলিটার শেষে কিছু নেই। ডে...ডেড এন্ড। তবে ও এ...এখনও বাইরে বেরোয়নি, ...ওখানেই আ...আছে।"
"ওকে। থ্যাংকস। অর্ণব, তুমি এখানেই দাঁড়াও। যদি বাই এনি চান্স ও আমায় বিট করে এদিক দিয়ে বেরোতে যায়, তবে ধরার চেষ্টা করবে। লক্ষ রেখো। ততক্ষণ সেনোরিটা একটু জলখাবার কফি খেয়ে নিন। অনেক কষ্ট করেছেন। বিল অন্ মি।" কথাটা ছুড়ে দিয়েই সে পড়িমড়ি করে ছুটেছে উক্ত গলিটির দিকে। লোকটা এখনও যখন বেরোয়নি তখন ওদিকেই কোথাও আছে। কিন্তু মিস্ 'চাউমিন' আবার বললেন যে গলিটার শেষে ডেড এন্ড। ওখান থেকে বেরিয়ে তার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তবে সে হাপিশ হল কোথায়! গলির ভেতরে ওঁত পেতে রাস্তা ক্লিয়ার হওয়ার অপেক্ষায় বসে আছে কি? কোথায়?
মিস দৃষ্টি দত্ত এবার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সেইদিকেই তাকিয়ে থেকে মুচকি হাসল। অর্ণব রীতিমতো কটমট করে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। এ কেমন ইনফর্মার? একেবারে নবনীকোমল চেহারা! বাচ্চা বাচ্চা মিষ্টি মুখ। দেখলেই মনে হয় টিপিক্যাল ভালোমানুষ সাহিত্যের ছাত্রী! তার ওপর আবার তোতলা। খবরি কখনও এমন তোতলায়? শুধু তাই নয়, প্রথম দর্শনেই দড়াম করে একখানা আছাড় খেতে চলেছিল। ইনি 'সখী ধরো ধরো' চালে র‍্যাম্পে হাঁটলেই ঠিক আছে, খবর তুলে আনা এনার কম্ম নয়। এরকম আনস্মার্ট ইনফর্মার যদি হোমিসাইডের নেটওয়ার্কে ঢোকে তবে গোটা ব্যুরোটাই লাটে উঠে যাবে।
অধিরাজ মিলিয়ে যেতেই দৃষ্টি আলগোছে একটা হাই তুলল। তারপর ক্যাফের ওয়েটারকে ডেকে বলল, "হেই ডিয়ারি, টু চিকেন স্যান্ডুইচ, ওয়ান চিজ ওমলেট, সসেজেস অ্যান্ড আ হট মাটন বার্গার! সঙ্গে জমিয়ে কোল্ড কফি। ওকে?"
মেনুর ফিরিস্তি শুনে অর্ণবের চক্ষু চড়কগাছ। এই মেয়েটা এত খাবে। সে প্রায় অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে দৃষ্টি ফের হাই তুলে বলল, "হে-ই। চিল্ ব্রো! হোয়াই সো সিরিয়াস? টাকাটা তো তোমার গ্যাঁট থেকে খসছে না।"
একেই 'ব্রো।' তার ওপর আবার 'তুমি।' এ আবার কী জাতীয় আলগা পিরিত! অর্ণবের মাথায় চড়াৎ করে রক্ত চড়ে যায়। হোমিসাইডের অফিসারকে 'ব্রো' বলে ডাকছে। সাহস তো কম নয়! তাছাড়া এখন তো একবারও তোতলাচ্ছে না। তবে তখন অমন থুতিয়ে থুতিয়ে কথা বলছিল কেন? এ তো আজব পাবলিক। তখন পুরো কাঠগুদামের স্পিডে কথা বলছিল। অথচ এখন পুরো রাজধানীর মতো তড়বড়িয়ে চলেছে। এর সঙ্গে বেশি কথা না বাড়ানোই

ভালো। সে সামান্য ভদ্রভঙ্গিতে মৃদু হেসে ক্যাফের বাইরে চলে আসে। ও মেয়ে ফাঁসির খাওয়া গিলুক। কিন্তু এই মুহূর্তে গলির মুখ থেকে তার চোখ সরানোর উপায় নেই। যাতে পুরো ভিউটা ক্লিয়ার পাওয়া যায় সেই আন্দাজেই শিকারীর ভঙ্গিতে পজিশন নিল ও। সামনে দিয়ে একগাদা লোকের লম্বা মিছিল চলেছে। কিন্তু অর্ণবের চোখ অর্জুনের মতো পাখির চোখই দেখছে। যাই ঘটে যাক, এখন এখান থেকে নড়া যাবে না।

মেইন রাস্তাটা যেখানে একটা বাঁক নিয়ে সরু গলির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে ঠিক সেখানে সত্যিই একটা চাউমিনের দোকান আছে। মেয়েটা ভুল বলেনি। দোকানি তখন ঘাড় গুঁজে চিকেন চাউমিন বানাচ্ছিল। একটা লম্বা লোককে ওরকম পাগলের মতো দৌড়োতে দেখে সামান্য বিস্মিত দৃষ্টিতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাকাল। পরক্ষণেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে চাউমিনে। এই গলির মুখ থেকে ভেতর অবধি নানারকমের ছোটখাটো ফুড স্টল আর মাঝারি রেস্টোর‍্যান্ট এমনকি সস্তার ভাতের হোটেলও আছে। হসপিটালে ভরতি পেশেন্টদের আত্মীয়রা অনেকেই দূর থেকে আসেন, সারা দিন থাকেন। সকালে ভিজিটিং আওয়ারে দেখা করে এখানেই অপেক্ষা করেন এবং সন্ধেবেলা ফের অসুস্থ প্রিয়জনকে দেখে ফেরত যান। সিরিয়াস পেশেন্টদের লোকেরা তো সর্বক্ষণই থাকেন। তাই কিছু খেতে হলে এখানেই আসতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটা দোকানের সামনেই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত কাস্টমারদের ভিড় উপচে পড়ছে। এর মধ্যে কি বার্নিং শিখ থাকতে পারে?

তার তীব্র দৃষ্টি প্রত্যেকটা স্টল, হোটেল, রেস্তোরাঁ খুঁজে দেখল। গুলশন বা শুরু যা-ই হোক, সে মিস্ বোসের তাড়া খেয়ে এদিকেই এসেছে। মিছিলে মিশতে পারেনি কারণ ওর ছদ্মবেশটাই আটকে দিয়েছে। ওয়ার্ডবয়ের পোষাকে আর যা-ই হোক, মিছিলে হাঁটা যায় না। সবার চোখে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা। ইউনিফর্মটা খোলার মতো সময় পায়নি। তাই আর জায়গা না পেয়ে এদিকেই পালিয়েছে। সম্ভবত হুলিয়াটা একটু বদলে নেওয়াই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য নিশ্চয়ই জনবহুল রেস্তোরাঁয়, হোটেলে বা স্টলে যাবে না। সে একটু ফাঁকা জায়গাই খুঁজবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, বা জনসমক্ষে নিশ্চয়ই চেঞ্জ করবে না। তবে গেল কোথায়?

সে সতর্ক ভঙ্গিতেই চতুর্দিকটা দেখতে দেখতে গলি বেয়ে সামনের দিকে এগোল। শুধু খাবার নয়, এখানে প্রচুর ওষুধের দোকানও আছে। বেশ ভালোই বিজনেস স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে এরা। এখানেও নিশ্চয়ই ঢুকবে না। দোকানের সামনে মানুষের লাইন। অধিরাজ বিড়বিড় করে বলল, "ফাঁকা জায়গা...যেখানে মানুষ নেই...অ্যাবানডন্ড? আমি হলে সেখানেই যেতাম...। কোনো অ্যাবানডন্ড জায়গা বা ফ্যাক্টরি বা বিল্ডিং...স্টল...আছে এখানে...? হাই প্রব্যাবিলিটি...!"

গলি ধরে আরও কিছুটা এগোতেই তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। সরু রাস্তাটা যত শেষের দিকে এগোচ্ছিল, ততটাই মানুষের ভিড় হালকা হয়ে আসছিল। যত দোকান সব সামনের দিকেই। পেছনে তেমন দোকানের সারি নেই। বরং কয়েকটা পুরোনো বাড়ি, বেশ কিছু পুরোনো আমলের লম্বা বিল্ডিং, যেগুলোকে সস্তার লজিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়, এক কামরার ঘর নিয়ে মানুষ থাকে, তেমনই কিছু পড়ল। কিন্তু সেখানে ভিড় না থাকলেও বাসিন্দারা আছে। তারা কেউ দেখে ফেলতেই পারে। বার্নিং শিখ সে রিস্কও হয়তো নেবে না। এরকম মান্ধাতা আমলের বাড়িতে কোনো অপরিচিত মুখ ওয়ার্ডবয়ের পোষাকে ঢুকছে দেখলেই মানুষ নোটিস করবে। সে এত মাথামোটা নয় যে বুঝবে না, মিস্ বোস যদি অকুস্থলে থেকে থাকেন তখন হোমিসাইডের টিমও তার পেছন পেছন আসবে। তাই এমন কোথাও যাবে না যাতে সাধারণ মানুষের নজরে পড়ে। সে এখানেই আছে। কিন্তু অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে।

আরও কয়েককদম এগিয়েই থমকে গেল অধিরাজ। গলিটা এখানেই শেষ। শেষপ্রান্তে বিরাট উঁচু একটা পাঁচিল যেটাকে টপকে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু ঠিক তার লাগোয়াই একটা

ভাঙাচোরা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অন্য বাড়িগুলোর মতোই প্রাচীন আর লম্বা বারান্দা যুক্ত। ভেতরের সার সার খুপরি খুপরি পায়রার খোপের মতো ঘরের দরজাগুলো বাইরে থেকেই স্পষ্ট। হয়তো অন্যগুলোর মতোই কখনও এই বাড়িটাকেও ভাড়া দেওয়া হত বা সস্তায় লজিং এর জন্য ব্যবহার করা হত। আলাদা বিশেষত্ব কিছু নেই শুধু একটা সাইনবোর্ড ছাড়া। কলকাতা পৌরসংস্থার তরফ থেকে এর গায়ে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে বেশ বড়ো বড়ো করে লেখা, 'সাবধান। বিপজ্জনক বাড়ি।'

সে আপনমনেই ইতিবাচক মাথা নাড়ে। নিজেকে লুকোনোর জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে মানে বাড়িটা পরিত্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। অন্যান্য বাড়িগুলোর মতো এখানে জন সমাগমের চিহ্নমাত্রও নেই। প্রাচীন বিধ্বস্ত অট্টালিকার বাইরে নীরবতা ছেয়ে আছে। লম্বা বারান্দায় কোনো দড়ি টাঙানো নেই, জামাকাপড়ও ঝুলছে না। দরজাগুলো হাট করে খোলা। ভেতরে অন্ধকার খাঁ খাঁ করছে। বাইরে পায়রারা মনের সুখে বাসা বানিয়েছে। তাদের ডানার ঝটপট আর বকবকম ছাড়া কোনোরকম শব্দ নেই। কোনো মানুষের অস্তিত্বের লক্ষণ নেই। দেখলেই বোঝা যায়, বাসিন্দারা সবাই এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। লুকোনোর জন্য একদম পারফেক্ট প্লেস।

অধিরাজ খুব সন্তর্পণে নিজের কানে ব্লু টুথ ইয়ারসেটটা পরে অর্ণবকে ফোনে ধরল। ওপ্রান্ত থেকে তার সাড়া আসতেই নীচুস্বরে বলল, "মনে হচ্ছে ওর কারেন্ট লোকেশনের খোঁজ পেয়েছি। যদি ভুল না করি তবে ওর গেট-আপ চেঞ্জ হচ্ছে অর্ণব। এখন আর ওয়ার্ডবয়ের ইউনিফর্ম দেখে ওকে চেনা যাবে না। রূপ বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।"

"আমিও ওখানে আসব?" অর্ণব উদ্বিগ্ন, "পোষাক পালটে গেলে এখান থেকেও তো চেনা যাবে না। ধরব কী করে?"

"ইজি।" সে জবাব দেয়, "হয় আমিই ওকে ধরব। নয়তো ওকে চেজ করব। এখানে যারা আছে, তারা বড়োজোর দ্রুতগতিতে হেঁটে গলি থেকে বেরোবে। একমাত্র ওই একজনই দুড়দাড় মারমার করে দৌড়বে। আমি ওকে দৌড় করাবই। তাড়িয়ে নিয়ে আসব। যে লোকটাকে গলি থেকে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো ছুটে বেরোতে দেখবে, তাকেই ধরার চেষ্টা করবে। সে পুরুষ-মহিলা যে হুলিয়াতেই থাকুক না কেন। ক্লিয়ার?"

"ক্রিস্টাল ক্লিয়ার স্যার।"

অর্ণব কানের ইয়ারসেটটা সামান্য চেপে দেয়। অধিরাজ লাইন কাটেনি। ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রয়োজনে যে কোনো মুহূর্তে ওপ্রান্ত থেকে নির্দেশ আসতে পারে। তার বুকের মধ্যে একটা অস্থির অনিশ্চয়তা। স্যারকে একা ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? আবার কোনো ব্লান্ডার হবে না তো! সবসময়ই একটা অদ্ভুত ভয় কেন যে তাকে তাড়া করে বেড়ায় কে জানে। প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেও এই আতঙ্ককে তাড়াতে পারছে না সে। আবার বার্নিং শিখ আর অধিরাজ মুখোমুখি। যতবার এই দু-জনের সম্মুখ সমর হয়েছে, ততবারই কোনো-না কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর আগেরবার তো আচার্য স্যার থেকেও বার্নিং শিখকে আটকাতে পারেননি। ওটা তবু অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছিল। এবার যদি আরও মারাত্মক কিছু হয়? যদি তেমন কিছু হয়ে যায়, তবে নিজেকে কী জবাব দেবে অর্ণব?

সে আপনমনেই মাথা নাড়ে। শুনবে না। গোঁয়ার, অবাধ্য লোকটা কিছুতেই কারোর কথা শুনবে না! কেন যে বারবার রিস্ক নেন তা উনিই জানেন। প্রাণটা কি এতই সস্তা? একবার কি প্রিয় মানুষগুলোর মুখও মনে পড়ে না? তার মধ্যে কি অর্ণব নেই? জানে না! আপাতত ও নিজে এটুকুই জানে যে এখন এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। এখন ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড কিংবা মাথার ওপরে বোম ফাটলেও কিছুতেই নড়বে না। ওই একটি মানুষের অবাধ্য হতে সে জানে না, জানতেও চায় না। গোটা দুনিয়া একদিকে আর অধিরাজ অন্যদিকে। তাই নিজের মনের চিন্তাভাবনাকে একরকম অগ্রাহ্য করেই অর্ণব চুপচাপ গলির ঠিক মুখেই দাঁড়িয়ে পজিশন নিল।

অধিরাজ অত্যন্ত সাবধানে পা টিপে টিপে বাড়ির ভেতরে ঢোকে। মাথার ওপরে পায়রার

ঝটপটানি ছাড়া আপাতত আর কোনো আওয়াজ নেই। গোটা বাড়িটাই ফাঁকা পড়ে আছে। তার ডান ভুরু কৌতূহলে একটু উঠে যায়। ও কি আগে থেকেই জানত যে এরকম একটা গা ঢাকা দেওয়ার জায়গা এখানে রয়েছে? সেটার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ আজ পর্যন্ত বার্নিং শিখ যত ক্রাইম করেছে সবটাই প্রি-প্ল্যানড। যে মুহূর্তে চৌধুরী পরিবারকে এখানে শিফট করা হয়েছিল, সেই মুহূর্তেই সে পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখে নিয়েছে। মিস্ বোস যদি না-ও থাকতেন, তাও চৌধুরী পরিবারকে হত্যা করার পর এখানেই এসে হুলিয়া বদল করার প্ল্যান ছিল। কী অদ্ভুত মস্তিষ্ক। কী অসাধারণ হিসাব! মনে মনে লোকটার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না সে।

তার সতর্ক হাতে ফের উঠে এল আগ্নেয়াস্ত্র। সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে পা টিপে টিপে প্রায় অন্ধকার করিডর ধরে এগোল। দিনের বেলাতেও এই প্রাচীন বাড়িগুলোয় সূর্যালোক কম ঢোকে। তার ওপর প্রায় কুড়ি ইঞ্চির দেওয়ালগুলোও এখনকার ফ্ল্যাট বা আধুনিক বাড়ির তুলনায় অনেক বেশি পুরু। তাই এই শীতের সময়ও ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ছ্যাঁৎ করে আরও একরাশ হিমশীতল ড্যাম্প ধরা অনুভূতি স্পর্শ করে গেল। পুরসভা এটাকে বিপজ্জনক বাড়ির তকমা দিয়ে বিন্দুমাত্রও ভুল করেনি। খসে পড়া ছাত, দাঁত বের করা ইটের নোনা ধরা ভাঙা ভাঙা দেওয়াল দেখলেই বোঝা যায় যে এ বাড়ি আদৌ বাসযোগ্যই নয়। তাও হয়তো নিরুপায় মানুষগুলো কোনোমতে এখানেই মাথা গুঁজে পড়ে ছিল। শেষপর্যন্ত পুরসভার হুড়ো খেয়ে ঘর ছাড়তে হল তাদের।

একতলার প্রত্যেকটা ঘর অত্যন্ত সতর্কভাবে জরিপ করল অধিরাজ। তারপর নীচু স্বরে ব্লু টুথ স্পিকারে অর্ণবকে জানায়, "গ্রাউণ্ড ফ্লোর ক্লিয়ার। লোকটার ফার্স্ট ফ্লোরেই থাকার চান্স বেশি। আমি ওদিকেই যাচ্ছি। বি অ্যালার্ট।"

ওপ্রান্ত থেকে উত্তর এল, "ওকে স্যার।"

খুব ধীর ভঙ্গিতে করিডর পেরিয়ে সে সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। সিঁড়ির অবস্থা দেখে একমুহূর্তের জন্য হলেও সেই কালান্তক স্লটারহাউজের দৃশ্য তার চোখের সামনে ফের হঠাৎই ভেসে ওঠে। সেই ভেঙে পড়া, নড়বড়ে, চিড় ধরা সিঁড়ি। পুরোনো সেই কেসটা মাথায় আসতেই আবার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি। যা সে ভুলে যেতে চায়, সেটাই বারবার এমনভাবে মনে পড়ছে কেন? যখন তখন এসে চোখের সামনে হানা দিচ্ছে। বলতে কী চায়? সেই একই দৃশ্য সামনে। দিনের বেলাতেও অন্ধকার সিঁড়ির ধাপ উঠে গিয়েছে ওপরের দিকে। পা ফেলতেই ভয় লাগে। মনে হয়, হুড়মুড়িয়ে এখনই ভেঙে পড়বে না তো!

অধিরাজ ঠোঁট কামড়ে ধরে। যে করেই হোক, সেই ভয়াবহ স্মৃতিকে মস্তিষ্ক থেকে দূর করতেই হবে। নয়তো তার নার্ভের ওপর দ্বিগুণ চাপ পড়ছে। বর্তমানের বার্নিং শিখ আর অতীতের সার্জিক্যাল স' কিলার-দু-জনেই ঘাড়ে চেপে বসছে। সে প্রাণপণে বর্তমানের দিকেই মনোসংযোগ করল। নীরব ও হালকা পা ফেলে একরকম গুড়ি মেরেই উঠছে ওপরের দিকে। হাতে জাগ্রত রিভলবার। এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরছে না সামনে থেকে। গোল্ডেন ব্রাউন চোখ দুটোয় শিকারীর তীব্র চাউনি। রোদের সরলরেখা চোখের ওপর পড়ে থেকে থেকে ঝিকিয়ে উঠছে। একবার শুধু শিকারকে হাতে পাওয়ার অপেক্ষা।

একতলার মতো দোতলাতেও সেই একই লম্বা করিডর। ডানদিকে খুপরি খুপরি ঘর। ওদিকের জানলা বন্ধ বলে প্রায় অন্ধকার। যেটুকু ক্ষীণ আলো আসছে তা দরজা দিয়ে। কিন্তু তা সবটা দেখার জন্য যথেষ্ট নয়। তবু ছায়াময় পরিবেশটাকে চোখে সইয়ে নিয়ে সে একের পর এক ঘরে উকি মারতে শুরু করল। ঘরগুলো সব ফাঁকা। অবস্থা খুবই খারাপ। মনে হয় না জীবনেও এই বাড়ির বিন্দুমাত্রও যত্ন নেওয়া হয়েছে। সত্যি বলতে কী, মানুষে এরকম ঘরে থাকতে পারে না। তবু পরিস্থিতির চাপে থাকতে হয়।

তার রন্টজেন দৃষ্টি একটার পর একটা ঘরকে দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে থাকে। এগোতে এগোতেই হতাশ হচ্ছিল অধিরাজ। লোকটা গেল কোথায়! কোথাও কিছু তো

থাকবে। একটা লঘু পায়ের আওয়াজ, কিংবা নিঃশ্বাসের শব্দ, অথবা তার খুলে ফেলা সাজসজ্জা, একটা ক্লু, একটা ইশারা, একটা ইঙ্গিত, কিছু তো থাকার কথা। কিন্তু কোথায়? আততায়ীকে কি এই ক্ষুধিত পাষাণমার্কা বাড়িই গিলে নিল? না সে অদৃশ্য হওয়ার শিল্প জানে?

নিজের মনেই এসব ভাবতে ভাবতে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল সে। আচমকাই একটা জিনিস চোখে পড়তেই থমকে গেল। চোখের পলকে তার দীর্ঘ দেহ টানটান হয়ে যায়। সারা দেহে তড়িৎপ্রবাহ। এতক্ষণের প্রতীক্ষার পর একটা চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

একটা ছোট্ট দশ ফুট বাই দশ ফুটের ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে ওয়ার্ডবয়ের ড্রেস। হালকা নীল রঙের হাফ হাতা শার্ট, নীল প্যান্ট। ওই রঙেরই টুপি, গ্লাভস। সঙ্গে একটা মাস্কও আছে। কিন্তু ভীষণ অবিন্যস্ত। যেন কেউ চরম অবহেলায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ধীরে সুস্থে চেঞ্জ করলে এমন হওয়ার কথা নয়। যেভাবে ছুড়ে ফেলেছে তাতে স্পষ্ট, ওর ভীষণ তাড়া ছিল। এর সঙ্গে আর কিছু আছে কি? অধিরাজ একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জামাকাপড়গুলো পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হসপিটালের একটা আই ডি কার্ডও তো পড়ে আছে সঙ্গে। নাম কী?...স্যাম ত্রিবেদী....! স্যাম না শ্যাম? বানান তো...!

“শি-ট!”

পোষাক স্পর্শ করতেই আসন্ন বিপদের সঙ্কেত টের পেল ও। পোষাকগুলোয় এখনও কারোর দেহের উষ্ণতা লেগে রয়েছে। ঠান্ডা হয়নি। এমনকি ঘামের ছাপ তো বটেই, সুক্ষ্ম বিন্দুও শুকোয়নি। তার মানে সদ্যই চেঞ্জ হয়েছে। লোকটা ধারে কাছেই আছে। সে কোথাও যায়নি...!

অধিরাজের মাথায় সবে এই সম্ভাবনার কথাটা এসেছিল। আকস্মিকভাবেই পেছনে খচমচ করে প্লাস্টিকের অস্ফুট শব্দ। পরক্ষণেই ওর মুখের ওপর সপাটে এসে পড়ল একটা মোটা প্লাস্টিকের প্যাকেট! এতটাই আকস্মিক, দ্রুত ও অতর্কিতে ঘটনাটা ঘটল যে বাধা দেওয়া তো দূর, আক্রমণটা বুঝে ওঠার সুযোগও পায়নি। কিছু করার আগেই শ্বাসরোধী প্লাস্টিক তার মুখ আর গলা সাপটে ধরে মাথা দিয়ে ঢুকিয়ে গিয়েছে। দুটো লৌহকঠিন প্রচণ্ড শক্তিশালী হাত তাকে সেই অবস্থাতেই পিছমোড়া করে ধরে আছড়ে ফেলল দেওয়ালের গায়ে।

এতখানি অসহায়তা অধিরাজ নিজের গোটা কেরিয়ারেও কখনও অনুভব করেছে কিনা সন্দেহ। খুনি তাকে বেকায়দায় দেওয়ালের গায়ে ঠেসে ধরেছে। তার সম্পূর্ণ দেহের ভার অধিরাজের ওপর। হাত দুটো পেছনের দিকে নিয়ে গিয়ে এক হাতে এমন টেকনিকে চেপে ধরেছে যে টানাটানি করেও ছাড়াতে পারছে না। আর এক হাত দিয়ে তার মুখের ওপরের প্লাস্টিকটা শক্ত করে টেনে ধরে আছে। একেবারে বজ্র আঁটুনি। প্লাস্টিকটা ক্রমাগতই টাইট হয়ে চেপে বসে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর বেড়ি লাগাচ্ছে। শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না!...শ্বাস নেওয়া সম্ভব নয়... ক্রমশই দম বন্ধ হয়ে আসছে... অক্সিজেন... একটু তাজা হাওয়া... একটু অক্সিজেন... আঃ!

তার নিঃশ্বাস প্লাস্টিকের গায়ে ধোঁয়া হয়ে জমছে। গরম কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঝাপটায় প্রশ্বাসের লাগাম ছুটছে। অসহ্য কষ্টে দরদর করে ঘামছিল অধিরাজ। মুখটা প্লাস্টিকসুদ্ধ দেওয়ালে ঘষা খাচ্ছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে হাতদুটোকে ছাড়ানোর। কিন্তু কব্জির ‘টেন্ডন’কে এমন কায়দায় লক করেছে প্রতিদ্বন্দ্বী যে একটা আঙুলও সে ঠিকমতো নাড়াতেই পারছে না, প্রতিঘাত করা তো দুর। ওই পরিস্থিতিতেও হাড়ে হাড়ে বুঝল, কম্ব্যাট স্টাইলে এ লোক কিছু কম যায় না। খুনি তাকে দেওয়ালে চেপে ধরেছে ঠিকই, কিন্তু অধিরাজের মনে হচ্ছিল, কেউ বুঝি তাকে জ্যান্তই দেওয়ালে কবর দিচ্ছে। নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেই চতুর্দিক ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখে ঠিকমতো দেখতেও পাচ্ছে না। তার ছটফটানির চোটে দুর্বল দেওয়ালের চাঙড়ও সশব্দে মেঝেতে খসে পড়ল। ওদিকে প্লাস্টিকটা আরও এঁটে বসছে। গোটা দুনিয়া থেকেই বুঝি অক্সিজেন নামক বস্তুটাই গায়েব হয়ে গিয়েছে। কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা ...মনে হচ্ছে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড সমেত গোটা বুকটাই বুঝি এবার ফেটে যাবে...।

শ্বাস নিতে না পারার দুর্বিষহ কষ্টে দেওয়ালের গায়ে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে ও... দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যেন শূন্যেই একটু বাতাস আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল, কিন্তু হাত আটকা পড়েছে বলে ব্যর্থ হচ্ছে... বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবু পারছে না! চোখদুটো বিস্ময় ও যন্ত্রণায় বিস্ফারিত, কষ্টে জলও বেরিয়ে আসতে চাইছে... ওষ্ঠাধর ফাঁক হয়ে গিয়ে বুকে বাতাস ভরার আকুলিবিকুলি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে.... কিন্তু হচ্ছে না... কিচ্ছু হচ্ছে না!... দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি চোখে আর মুখেই এসে জমেছে... দেখলে আশঙ্কা হয় এখনই চোখ-নাক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত বেরিয়ে আসবে! ...মৃত্যুযন্ত্রণা কি একেই বলে?...সব শেষ হওয়ার আগের অনুভূতি কি তবে এটাই?...

যত সময় যাচ্ছিল, ততই তার প্রাণান্তকর বাঁচার লড়াই ব্যর্থ হচ্ছিল। এখন চোখের সামনে ক্রমশই ঝিম ধরা অন্ধকার ছেয়ে আসছে। দৃষ্টিতে শূন্যতা। দেহটা অক্সিজেন না-পেয়ে ধড়ফড় করতে-করতে এখন অনেকটাই নিস্তেজ। লম্বা শরীরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মৃত্যুর নেশায় নিঃসাড় হয়ে এলিয়ে পড়ছিল অধিরাজ। যা গুলি, বম্ব, ছুরি, ছোরা করতে পারেনি, আজ বুঝি একটা নিরীহ প্লাস্টিকের প্যাকেটই তা করে দেখাবে। সে বুঝতে পারল, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হতে চলেছে। এই নিঃসঙ্গ প্রাচীন বাড়িতেই পড়ে থাকবে তার লাশ। অর্ণব কিছু জানতেও পারবে না! সে ক্যাসাবিয়াঙ্কার মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলির সামনেই তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ভাববে, স্যার কোথায় গেলেন! যখন জানবে, তখন...!

কথাটা মনে পড়তেই কোথা থেকে যেন এক আসুরিক শক্তি ভর করল তার দেহে না, এভাবে হারতে পারে না সে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক। কিন্তু কোনো না কোনো রাস্তা তো খোলা থাকবে। হাত আটকা, মুখ আটকা, মস্তিষ্ক নয়। সে অতিকষ্টে চোখ বুজে মনে মনে বলে, "থিঙ্ক... থিঙ্ক মিঃ ব্যানার্জি। কোনো রাস্তা... কোনো ফাঁক...কোনো দুর্বলতা। ফর গড সেক, ফা-ই-ট ব্যা-ক!"

এক লহমায় মস্তিষ্কের মধ্যে যেন বিদ্যুৎরেখা খেলে গেল। হাত আটকা, কিন্তু কনুই বা এলবো উন্মুক্ত। পা দুটোও খোলা। অসহনীয় যন্ত্রণায় কাঁপছে। তবু স্থির তাকে হতেই হবে। খুনির বুকের পাঁজর একদম এলবোর কাছে। ওর পায়ে বুলেটের ক্ষতটা নিশ্চয়ই এখনও শুকোয়নি। সে নিজেই মনে মনে ধমকে উঠল, "স্টে-ডি!"

শুধু ওইটুকু ভাবতেই এবং পুরো অঙ্কটা কষতে যেটুকু সময় লাগে। পরক্ষণেই প্রচণ্ড শক্তিতে 'মোয় থাই'য়ের বিপজ্জনক ব্যাকওয়ার্ড এলবো থার্স্ট আর মারাত্মক ব্যাকওয়ার্ড কিক একসঙ্গে চালাল অধিরাজ। ওই অবস্থাতেও তার মার একদম অভ্রান্ত ও মোক্ষম আঘাতটা একদম যথাস্থানে গিয়ে পড়েছে। দুষ্কৃতী ব্যথায় 'আঁক' করে কাতরে উঠল। পালটা মারের অভিঘাতে হাতের গ্রিপও স্খলিত। হাত ছুটে গিয়েছে। সেই সুযোগেই মুখের প্লাস্টিকের থলিটা একটানে খুলে ফেলে ঘুরে দাঁড়াল অধিরাজ। সারা মুখ, চোখ, নাক লাল হয়ে গিয়েছে! এবার কোনোমতে জোরে জোরে শ্বাস টানছে সে। ভীষণ একটা কাশির দমক কিছুতেই স্থির থাকতে দিচ্ছে না। তবুও নিজেকে একরকম সামলে নিয়ে আক্রমণে গেল। এখন খুনি তার সামনে! একটা গুঁফো লোক, যার সঙ্গে আগের একটা হুলিয়ারও মিল নেই। এতটাই সাধারণ যে আলাদা করে চেনাও যায় না। কিন্তু নিঃসন্দেহে ইনিই তিনি। এই মুহূর্তে শহরের মোস্ট ওয়ান্টেড 'বার্নিং শিখ' ওরফে গুল্লু।

অধিরাজকে ওইভাবে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সে। প্রচণ্ড রাগে ঠিকই করে ফেলেছিল, এই মানুষটাকে আজ সরিয়েই দেবে। হাতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। সময় চলে যাচ্ছে। অথচ দুটো পরিবারের একজনকেও সে ছুঁতে পারেনি। চীনের প্রাচীরের মতো তার আর ওদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই আই জি, হোমিসাইড! ও বুঝেছিল, এই প্রাচীরকে ভাঙতে না পারলে এই প্রথম তাকে ব্যর্থ হতেই হবে। তাই তার কাহিনি আজই শেষ করতে চেয়েছিল। নির্মমের মতো প্রায় মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দিয়েছিল। সামনা-সামনি পেরে উঠবে না বুঝেই পেছন থেকে অ্যাটাক করেছে। জানত, এটা কাপুরুষের কাজ। তবু, জীবন

তাকে শৈশব থেকেই কাপুরুষ আর শয়তান হওয়ার শিক্ষাই দিয়েছে যে! যে শিক্ষা পেয়েছে, তেমনই তো কাজ করবে।

কিন্তু তখন কে জানত যে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী এভাবেও ঘুরে দাঁড়াতে পারে?

সে তো নিশ্চিত ছিল ওই পজিশন থেকে কেউ বেঁচে ফিরতেই পারে না। তার বিশ্বাস কিছুটা সত্যিও হয়েছিল। আর কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে পারলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। অথচ আশ্চর্য। যেভাবে উলটোদিকের মানুষটা যুদ্ধে ফিরল, গোটাটাই বুঝি অবিশ্বাস্য। মুহূর্তের ভুলে সে অস্ফুটে বলল, "সরতাজ!"

আর কিছু বলার আগেই মুখের ওপর জোরদার ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়ল বার্নিং শিখ। উঃ! ধারালো কিছুতে গালের একপাশটা বুঝি কেটে গেল। মানুষের হাতের আঙুল, কিংবা নখও এত ধারালো হয় না যে প্রস্থেটিকের নকল চামড়া ভেদ করবে। প্রস্থেটিক মেক-আপের দরুণ ক্ষতটা খুব গভীর হয়নি। কিন্তু কীসে লাগল সেটা পরমুহূর্তেই বোধগম্য হল। শত্রু তখনও হাঁফাচ্ছে, কাশছে। সেই ফাঁকেই ওর দু হাতের আঙুলে বড়ো আর চোখ ধাঁধানো হীরের আঙটি দুটো দেখতে অসুবিধে হল না। এই সামান্য আলোতেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছে! ওই হীরের আংটির খোঁচাতেই গাল কেটে গিয়েছে! আরও যদি কয়েকটা এরকম ঘুষি এসে পড়ে তবে হয়তো প্রস্থেটিকের মুখোশও তার আসল মুখকে আর ঢেকে রাখতে পারবে না। সব মাটি হয়ে যাবে... সব কিছু...!

সে মনে মনে প্রমাদ গুণল। এখনও বিপক্ষ নিজেকে ঠিকমতো গুছিয়ে নিতে পারেনি। চোকড হয়ে যাওয়ার কষ্টে এখনও হাঁফাচ্ছে, কাশছে। এই ফাঁকে পালিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অধিরাজের অবিন্যস্ত অবস্থার সুযোগ নিয়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বার্নিং শিখ। তারপর একটা শব্দও খরচ না করে হাঁচোড় পাচোড় করে সোজা পিটটান! বুঝেছে, এখন বীরত্ব দেখাতে যাওয়া একেবারেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রতিপক্ষও জেদি ও শক্তিশালী।

তাকে ওভাবে পালিয়ে যেতে দেখে অধিরাজও আপ্রাণ ধাওয়া করল তাকে। হাঁপাতে-হাঁপাতেই কোনোমতে অর্ণবকে জানায়, "পাখি উড়ছে... গলির মুখ চলে এসো... ব্ল্যাক টি-শার্ট, গ্রে ট্রাউজার।"

অর্ণব তৈরিই ছিল। সে রিভলবারটাকে উঁচিয়ে ধরে উদ্বেগমিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বলল, "আপনার গলাটা এমন শোনাচ্ছে কেন স্যার?"

"চেজ... করছি।" অধিরাজ আসল কারণ চেপে যায়, "ওর পেছনেই আছি... হি ইজ এগেইন রানিং ইন জিগজ্যাগ ওয়ে... গলির মুখ থেকে দুশো মিটার দূরত্বে ... ডোন্ট শ্যুট... প্রচুর মানুষ রয়েছেন এখানে... নো ডিসপ্যাচ... জাস্ট ব্লক দ্য ফিউজিটিভ।" অর্ণব আর কথা বাড়ায় না। শুধু বলল, "রজার।"

গলির মধ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় তখন আরও বেড়েছে। ওষুধের দোকানগুলোয়ও লাইন বাড়ছে বই কমছে না। রাস্তা ফাঁকা থাকলে দুশো মিটার দৌড়ে আসতে কত সময় লাগবে তা আন্দাজ করা সহজ হত। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে, বাধা অতিক্রম করে পাখি কতক্ষণে এসে পৌঁছোবে তা বোঝা মুশকিল। অর্ণব তবু একটুও বিচলিত না হয়ে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে থাকল। অন্তত দুটো প্রয়োজনীয় তথ্য সে জানে। খুনির ড্রেস ও তার দৌড়োনোর ভঙ্গি। এই দুটো জিনিস কমন পেলেই চলবে। স্যারের নির্দেশ স্পষ্ট। এর মধ্যে গুলি চালানো চলবে না। অপরাধীকে জ্যান্ত ধরতে হবে।

অন্যদিকে অধিরাজ প্রায় মারমার করে বার্নিং শিখের দিকে ছুটে যাচ্ছে। সে ওই ভিড়ভাট্টার মধ্যেও যতটা দ্রুত সম্ভব স্প্রিন্ট টানছিল। লেপার্ড যেমন অপূর্ব নমনীয় ভঙ্গিতে রাস্তার সব বাধাকে কখনও লাফিয়ে, কখনও বিদ্যুতের ছন্দে এড়িয়ে যায়, সে-ও তাই যাচ্ছিল। বার্নিং শিখের মনে হল, তার পেছনে কোনো মানুষ নয়, ওইরকমই কোনো দ্রুতগামী চারপেয়ে বন্য প্রাণী দৌড়োচ্ছে। অদ্ভুত বন্য মানুষ একটা। একমুহূর্তের জন্য ফের মুগ্ধ হয়ে আপনমনেই বলল, "বাঃ!" পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, এ মানুষটা আদৌ বন্ধু নয়, বরং শত্রু।

অগত্যা দাঁতে দাঁত চেপে সে নিজের গতিবেগকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। যে করেই হোক, এখান থেকে বেরোতেই হবে। নয়তো নিস্তার নেই।

যারা ভাতের হোটেলে, বা ফাস্টফুডের দোকানে ভিড় করেছিল, তারা হঠাৎ দুটো লোককে হুড়মুড় করে দৌড়োতে দেখে ঘাবড়ে যায়। এক বেচারা দোকানি আলুকাবলি, ভেলপুরির ঠ্যালা নিয়ে ধীরে সুস্থে চলেছিল। বার্নিং শিখ তাকে ধাক্কা মেরে, তার ঠ্যালাটা রাস্তা ব্লক করার জন্য অধিরাজের দিকে সজোরে ঠেলে দিয়ে কেটে পড়ল। ভেলপুরী বিক্রেতা হাঁ হাঁ করে ওঠে। বেচারার সমস্ত সরঞ্জাম- মুড়ি, তেল, মশলা, লেবু, আর টকজল থেকে শুরু করে আলু, টম্যাটো, ধনে পাতা, কাঁচালঙ্কা, ছোলা মটরেরের মতো সব্জিও ওই ঠ্যালাতেই সাজানো। ধাক্কা খেয়ে তার বেশ কিছুটা মাটিতেই ছড়িয়ে পড়ে গেল। তার ওপর যে লম্বা টাওয়ার টর্নেডোর গতিতে ধেয়ে আসছে, সে-ও যদি আছড়ে পড়ে তবে আজকের পুরোদিনটাই মাঠে মারা যাবে। গরীব মানুষের একদিনের রোজগার চলে গেলে দিনযাপন বড়োই কষ্টের হয়ে দাঁড়ায়। সেই ভয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঁ-চা-ও! বাঁ-চা-ও। মেরি গাড়ি...।"

অধিরাজ যেন বার্নিং শিখের এই কাণ্ডের জন্য প্রস্তুতই ছিল। সবার বিস্মিত, ভয়ার্ত দৃষ্টির সামনেই সে বিদ্যুতের মতো এক মসৃণ লাফ মেরে গাড়িটাকে পেরিয়ে গেল। ভেলপুরীওয়ালা বুঝি শ্বাস নিতেই ভুলে গিয়েছিল। এবার একটু স্বস্তির শ্বাস নিল। অধিরাজ দৌড়োতে দৌড়োতেই মুখ ঘুরিয়ে কোনোমতে বলল, "স্যরি।"

আশেপাশের মানুষেরা কী রি-অ্যাকশন দেবে বুঝে পায়নি। তার মধ্যেও কেউ কেউ মোবাইলে রেকর্ড করছে এই দুটি মানুষের প্রাণপণ দৌড়। আদতে যে কী হচ্ছে তা কেউ বোঝেইনি। বরং হয়তো এটাকে কোনো রোডরেস জাতীয় কিছু ভেবে নিয়েছে। বার্নিং শিখ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল, যে তার তৈরি করা বাধা অধিরাজ ব্যানার্জি অনায়াসেই অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে। অদ্ভুত টিম এদের। প্রথমে ম্যাডামরা ছুটিয়ে মারলেন, এখন স্যারেরা হাত-পা ধুয়ে পেছনে পড়েছেন। কেউ ছেড়ে কথা বলছে না। সে ভয় পেলেও হাল ছাড়ল না। জানে, এই গলিতেই বরং ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি। কোনোমতে যদি একবার মেইন রোডে গিয়ে পড়তে পারে তবে কিছু-না কিছু ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।

"তোমার দিকেই স্ট্রেট আসছে...!" অধিরাজ ছুটতে ছুটতেই বলল, "আর একবার সারপ্রাইজ দিয়ে দাও।"

কথাটা শোনামাত্রই অর্ণব উদগ্রীব দৃষ্টিতে সামনের দৃশ্যটা মেপে নেয়। বিশেষ কষ্ট করতে হল না। একটু দূরেই ছুটন্ত ব্ল্যাক টি-শার্ট আর গ্রে ট্রাউজারকে দেখতে পেল। উল্কার বেগে ছুটে আসছে। তার পেছনেই অধিরাজের দীর্ঘ চেহারা। দু-জনের মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব নেই। কিন্তু মাঝখানে কিছু লোকের ভিড় আর লাইন পড়েছে বলে ডাইভ বা ফ্লাইং কিক মেরে উলটে ফেলাও অসম্ভব। অপরাধীকে আক্রমণ করতে গেলে ফালতু কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির আহত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেজন্যই সে চেষ্টাও করছে না। অর্ণব সামনে দিয়ে হামলা করার জন্য তৈরি হল। অনেক হয়েছে লুকোচুরি। এবার খেল খতম।

ধুরন্ধর আততায়ী তাড়া খেয়ে একদম কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো এলোপাথাড়ি দৌড়োচ্ছিল। সে ঠিক গলির মুখে চাউমিনের দোকানটার সামনে এসে একজন ক্রেতাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। মানুষটার হাত থেকে খাবারের প্লেটটা মাটিতে ছিটকে পড়েছে। আশেপাশের লোকজন 'কী হচ্ছে... কী হচ্ছে' করে ওঠে। অর্ণব ঠিক সেই মুহূর্তেই বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরেছে তার টি-শার্ট। হ্যাঁচকা টান মেরে সাইডে সরিয়ে এনে বলল, "অনেক দৌড়েছিস। এবার রেস্ট নে।"

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অর্ণবের উপদেশ তার আদৌ পছন্দ হয়নি। অর্ণব সবিস্ময়ে দেখল ওর ডানহাতটা স্প্রিং এর মতো দ্রুত লাফিয়ে উঠে এসেছে একদম মুখের সামনে। সে কোনোমতে প্রাথমিক হিটটাকে ডজ করলেও তাকে বিন্দুমাত্রও সুযোগ না দিয়ে বার্নিং শিখ এবার বাঁ-হাতে তার চোয়ালে জোরাল একটা আপারকাট বসাল।

বাঁ-হাতেও কী মারাত্মক জোর! কোনো সন্দেহই নেই, সে সব্যসাচী। একমুহূর্তের জন্য অর্ণবের চোয়াল থেকে মাথা অবধি একটা তীব্র ব্যথার রেশ ছড়িয়ে পড়ল। সে কাতরোক্তি করে ওঠে, "ওঃ!"

বার্নিং শিখ এবার এক ধাক্কায় তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মেইন রোডে দৌড়োল। ততক্ষণে অধিরাজও এসে পৌঁছেছে। অর্ণবকে কিছু বলার বা জিজ্ঞাসা করার আগেই ওরা দু-জনেই সবিস্ময়ে দেখল ব্ল্যাক টি-শার্ট পরা খুনি একলাফ মেরে উঠে গিয়েছে একটি ফুল স্পিডে চলা চলন্ত বাসে। অর্ণব প্রচণ্ড রাগে বাসটাকে চেজ করতেই যাচ্ছিল কিন্তু তার হাত টেনে ধরল অধিরাজ। সে মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু। যেতে দাও। কতক্ষণ আর পালাবে!"

অর্ণব করুণ দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকায়। অধিরাজের চোখ, মুখ তখনও স্বাভাবিক হয়নি। ঘেমে নেয়ে একসা হয়েছে। এতটাই ঘামে ভিজেছে যে বলিষ্ঠ ও অসম্ভব সুগঠিত দেহরেখাও স্পষ্ট। দেখলে মনে হয়, এই শীতে তার পোষাকের ওপর কেউ জল ঢেলেছে। মাথার চুলগুলোর ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত। এখনও হাঁপিয়ে যাচ্ছে! প্রশস্ত ও কবাট বুকের হাঁপরের মতো ওঠানামা স্পষ্ট। কোনোমতে বাঁহাত দিয়ে ডানহাতের ঘড়িটাকে ঠিক করছে। লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। স্রেফ একটা ঘুষিতেই চিৎপাত হয়ে গেল! স্যার এত ঝুঁকি নিয়ে, এত কষ্টে তাড়িয়ে আনলেন লোকটাকে। একেবারে রসোগোল্লার মতো প্লেট থেকে প্রায় মুখেই তুলে দিয়েছিলেন বলতে গেলে। অথচ সে ধরতেই পারল না! মিথ্যাই পবিত্র আচার্যকে দোষারোপ করছিল। আদতে সে নিজেই একটি অপদার্থ।

"স্যরি স্যার।" অর্ণব মাথা নীচু করেছে, "মাই ফল্ট! হাতে এসেও ফসকে গেল!" অর্ণবের পিঠ আলগোছে চাপড়ে দেয় অধিরাজ, "ইটস ওকে অর্ণব। এখনও অনেক সুযোগ আসবে। আমি যদি ঠিক রাস্তাতেই ভাবি, তবে এখনও কিছু হয়নি। আর হবেও না। আসল শো তো সূর্যাস্তের পর শুরু হবে। রেডি থেকো। তখন দেখা যাবে।"

"তবে কি মিঃ চৌধুরীর পরিবার এখন সেফ?"

ক্লান্তভঙ্গিতে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেটের বাট আলতো কামড়ে ধরে মাথা নাড়ল সে, "না। ও আবার ফিরে আসতে পারে। যেমন অ্যান্টি শিখ রায়টের দুষ্কৃতীরা টানা বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে ফিরে ফিরে এসে আক্রমণ করছিল। ওই স্টাইলটাই ও নেবে। তবে এবার প্রণবেশদাকে বলো ওঁর টিম নিয়ে এসে এখানে পাহারা দিতে। বার্নিং শিখ যে হারে হোমওয়ার্ক করেছে, তাতে ও নিশ্চয়ই জানে যে প্রণবেশ লাহিড়ী ঠিক কোন্ লেভেলের এনকাউন্টার এক্সপার্ট। হসপিটালের বাইরে থেকে ভেতর অবধি যেন গোটা টিম ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। একবার মিস্ বোসের কাছে তাড়া খেয়েছে। ওয়ার্ডবয়ের ছদ্মবেশ, নকল আইডেন্টিটি কার্ড আর ওর কাছে নেই। এত কম সময়ে নিশ্চরই একাধিক ইউনিফর্ম আর কার্ড জোগাড় করে বসে নেই। ওগুলো রেডি করতেও মিনিমাম একটা সময় লাগে। সুতরাং এবার তাকে আন-প্রিপেয়ার্ড অবস্থাতেই আসতে হবে। কনফিডেন্স কম থাকবে। প্রণবেশদাকে ঘুরঘুর করতে দেখলে আর চান্সই নেবে না। উনিও বসে বসে পাহারা দিয়ে বোর হয়ে গিয়েছেন। এনকাউন্টারের সংখ্যা বাড়ানোর চান্স পেলে খুশিই হবেন।"

"কিন্তু যদি লাহিড়ী স্যারকেও ঘুমের ওষুধ, ক্লোরোফর্ম বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে ইন-অ্যাকটিভ করে দেয়?"

অর্ণবের গলায় আশঙ্কা। বার্নিং শিখের কাণ্ডকীর্তির যা বহর দেখছে তাতে তাকে একটুও বিশ্বাস করতে পারছে না। সে সব পারে। যদি প্রণবেশ লাহিড়ীর খাবারে বা চায়ে ক্লোরোফর্ম বা সিগারেটে গাঁজা জাতীয় কিছু মিশিয়ে দেয়?

অধিরাজ এবার গোল্ড প্লেটেড লাইটারটা দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে হেসে ফেলল, "প্রণবেশদার হ্যাবিট সম্পর্কে তুমি জানো না? উনি নিজের টিমমেটদেরই বিশ্বাস করেন না! সবাইকে দড়ির ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখেন। মেয়েদের সঙ্গে রুড ব্যবহারের কথাটা যদিও

আজই প্রথম জানলাম। কিন্তু এটা জানি, প্রণবেশদা বউদিকেও বিশ্বাস করেন না। উনিই একমাত্র পুরুষ যিনি বউয়ের সঙ্গেও ঝগড়ায় জেতেন। বাইরের খাবার একদমই খান না, পঞ্চাশটা ডাব্বায় করে নিজের খাবার আর ফ্লাস্কে চা নিয়ে ঘোরেন। এনকাউন্টার স্পেশালিস্টের শত্রু তো কম না। তাই প্রচণ্ড সাবধানী। প্যাকেট প্যাকেট সিগারেটও নিজের হাতেই কেনেন আর টানেন। ওঁকে কোনো খাবার অফার করতে গেলে বার্নিং শিখ নিজেই গুলি খাবে। সিগারেটে গাঁজা আর চায়ে ক্লোরোফর্ম তো...!"

বলতে বলতেই হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সে। অর্ণব দেখল তার বাদামি দুই চোখ যেন দামি রত্নের মতো জ্বলজ্বল করছে, ঝিলিক দিচ্ছে। একবার বিমূঢ়ের মতো নিজের হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত ধূমায়িত স্টিকটার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অধিরাজ। পরক্ষণেই বিড়বিড় করল – "ক্লোরোফর্ম ... গাঁজা।..... সিগারেট। মাই গড! মা-ই গ-ড। এটা আগে কেন মাথায় আসেনি! মা-ই গুডনেস!"

কী মাথায় আসেনি। সিগারেট-গাঁজা কিংবা ক্লোরোফর্মের মধ্যেই বা স্যার কী পেলেন তা অর্ণবের মাথায় ঢুকল না। সে কিছু বলার আগেই অধিরাজ অন্যমনস্কভঙ্গিতে তার কাঁধে আলতো হাত রেখে বলল, "অর্ণব। ইউ আর আ জিনিয়াস ইনডিড।"

অর্ণব আবার কী করল। সে নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "অ্যাঁঃ!"

"অফকোর্স ইউ আর আ জিনিয়াস...!" অধিরাজ ক্রমশই চিন্তার গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, "সব বুঝিয়ে দেব। কিন্তু আপাতত মিস চাউমিন বন্ডের বিলটা পে করতে হবে। সেই কখন থেকে উনি লোকটাকে শ্যাডো করে চলেছেন। রাস্তায় কতবার আছাড় খেয়েছেন তার ঠিক নেই। ওঁর জন্যই আজ চৌধুরী পরিবার বেঁচে গেল। এইটুকু তো করতেই পারি।"

"চাউমিন বন্ড!"

যদিও অর্ণবের দৃষ্টি দত্তকে কৃতিত্ব দেওয়াটা মোটেই পছন্দ হয়নি। এরকম অপদার্থ খবরি সে কমই দেখেছে। কিন্তু তবু তার নিকনেম শুনে অবাক না হয়ে পারল না। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "চাউমিন কেন স্যার? ওটা তো খাওয়ার জিনিস?"

"জেমস যদি বন্ড হতে পারেন, তবে চাউমিন কী দোষ করেছে?" সে মুখ টিপে হাসছে, "ক্যাডবেরি জেমসও তো একধরনের ক্যান্ডি। কী যেন? জ্যায়াদা মস্তি, জ্যায়াদা চকলেটি, জেমস! সেটাও তো খাবারই। ওঁর আসল নামের চেয়ে চাউমিন বন্ড নামটাই আমার বেশি মনে থাকবে।"

অর্ণব মনের মধ্যে গরগর করলেও মুখে কিছু প্রকাশ করে না। কোথায় সুপার স্পাই জেমস বন্ড, আর কোথায় এই তোতলা খবরি! তুলনাই হয় না। তবু চুপচাপ কিছু না বলে সে-ও অধিরাজের পেছন পেছন ক্যাফের দিকেই গেল। কে জানে, আরও কী কী অর্ডার করেছে ওই মেয়ে! যেভাবে মহারানির মতো অর্ডার করছিল, তাতে গোটা ক্যাফেটাই না পেটায় নমঃ করে ফেলে। যে বেচারি অর্ডার নিচ্ছিল, তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল ক্যাফেতে বুঝি ডাকাত পড়েছে।

মিস 'চাউমিন' তখন আয়েশ করে বসে পেল্লায় হাঁ করে বার্গারে কামড় দিচ্ছিল। অধিরাজকে আসতে দেখেই গপাৎ করে মুখের গ্রাসটা গিলতে গিয়ে প্রথমে বিষম টিষম খেয়ে অস্থির হল। অধিরাজ তার মাথায় আলতো চাপড় মারতে মারতে বলল, "আস্তে... আস্তে সেনোরিটা। জল খাবেন?"

চাপড় খেয়ে ততক্ষণে দৃষ্টি একটু ধাতস্থ হয়েছে। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "জ...জ...জল তো আমি খাব। কিন্তু আপনি বিনা জল আর উইদাউট ক্যাটরিনা কাইফেই 'টিপ টিপ বরসা পানি'র অ...অ..অক্ষয়কুমার হয়ে গেলেন কী করে ব...ব... বস?" অর্ণবও এবার পেল্লায় বিষম খেল।

* * * *

(২৭)

আই জি, সি আই ডি, হোমিসাইডের কেবিনে এখন নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা। একের পর এক ইন্ডিয়া কিংসের শ্রাদ্ধ হচ্ছে। অ্যাশট্রে ক্রমশই ভরে উঠছে গুচ্ছ গুচ্ছ দগ্ধ সিগারেটের বাটে। টেবিলের ওপর কফির একগাদা কাপ। একটা ছাড়া বাকিগুলো শূন্যগর্ভ। কফির উগ্র গন্ধ আর সিগারেটের পোড়া তামাকের সুবাস মিলে মিশে একসা। কফির পাশে একটা প্লেটে কিছু স্যান্ডউইচ আর ডিমসেদ্ধও রেখেছিল অর্ণব। সেগুলো এখনও পর্যন্ত স্পর্শ করাই হয়নি। বরং সিগারেট আর কফি দিয়েই ব্রেকফাস্ট চলছে।

অফিসে ফেরার পর বিগত আধঘণ্টা ধরেই অধিরাজ একদম চুপ মেরে গেছে। তার দু-চোখে যথারীতি সেই আত্মমগ্ন দৃষ্টি। কোন চিন্তায় ডুবে আছে তা বোঝা মুশকিল। কিন্তু কিছু যে বুঝেছে বা বুঝতে চাইছে তা ভঙ্গিতেই স্পষ্ট। মাঝেমধ্যে নিজের মনেই বিড়বিড় করে অস্ফুটে কিছু বলছে যা উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। তার এই রূপ অর্ণবের এতটাই পরিচিত যে সে বাজি ধরে বলতে পারে, স্যান্ডউইচ আর ডিমসেদ্ধ-র কপালে আজ আর ওঁর পেটে ভ্রমণ করা লেখা নেই। ওরা ক্যান্টিনেই ফেরত গিয়ে অন্য রুট ধরবে।

একটু আগেই অবশ্য পবিত্র এসে খবর দিয়ে গিয়েছে যে মিস বোস এখন ঠিক আছে। ক্ষত গভীর হলেও প্রাণঘাতী নয়। বেশ কয়েকটা সেলাই পড়লেও ডিউটি ছাড়তে তার আপত্তি আছে। সে নিজের শুশ্রূষা করিয়ে, মিস অরোরার সঙ্গেই ব্যুরোয় ফিরছে। কৌশানী এ-ও জানিয়েছে যে লোকটা নিজের নাম 'স্যাম' বলেছিল। অধিরাজ তথ্যটা শুনে আদৌ অবাক হয়নি। বরং অন্যমনস্ক স্বরে বলেছে, "জানি। ওর ফেক আইডেন্টিটি কার্ডেও ওই নামটাই লেখা ছিল। স্যাম ত্রিবেদী।"

"স্যাম!" অর্ণব আমতা আমতা করে বলে, "ওটা তো মিস দত্ত-র কাজিন সিস্টারের নিকনেম বোধহয়। মিস্ দত্ত একবার বলেছিলেন যে স্যাম আপনার খুব ফ্যান!"

"মিস দত্ত-র কাজিন সিস্টার একখানা মোচ গজিয়ে বার্নিং শিখ সেজে অটোগ্রাফ নিতে এসেছিলেন বলছ? না খোদ বার্নিং শিখ মিস দত্ত-র কাজিন সিস্টার সেজে বসে আছে?" সে উদাসীন স্বরে জবাব দেয়, "দুটোই বোধহয় অসম্ভব ব্যাপার। যাক গে, তোমরা দু-জনেই তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলে। হায়ার সেকেন্ডারিতে বায়োলজি ছিল। কখনও খোলা আকাশের নীচে ব্যাঙ কেটেছ?"

"ব্যাঙ!" অর্ণব আকাশ থেকে পড়ে, "সে তো বায়োলজি ল্যাবেই কেটেছি। এমনকি প্র্যাকটিক্যালের সময়ও ল্যাবেই কাটতে হয়েছে। ওপেন তো কখনও কাটিনি। সে সুযোগ কখনও হয়নি।"

"ধুর ব্যাঙ!" পবিত্র বিরক্ত, "এটা কী জাতীয় প্রশ্ন? বলতে কী চাও? এখন ব্যুরোর ছাতে গিয়ে ব্যাঙ কাটব? তাছাড়া এই শীতে ব্যাঙ আসবেই বা কোথা থেকে? বর্ষাকাল হলে তবু পুকুরের ধার থেকে গোটা দুয়েক ধরে আনতে পারতাম। চায়না টাউনের কিচেনে খোঁজ করব?"

"বুঝলাম।" সে আপনমনেই টেবিলের ওপর পেপারওয়েটটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, "তুমি কতদিন বাড়ি যাওনি পবিত্র? বউদি ঠিক কতদিন ধরে তোমার বিরহে কাঁদছেন?"

"ব্যাঙের সঙ্গে আমার বউয়ের আবার কী সম্পর্ক। যাত্তারা! হ্যাঁ, দু-জনেই কানের কাছে গলা ফুলিয়ে গ্যাঙরগ্যাঙ করে ঠিকই। তবু ব্যাঙের একটা নির্দিষ্ট মরশুম আছে। বউ তো টোয়েন্টিফোর সেভেন অন। ব্যাঙকে 'হুশ হুশ' করে তাড়ালে পালিয়েও যাবে। বউকে 'হুশ হুশ' করে দেখো, শিল নোড়ার বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে দেবে।" অফিসার আচার্য এবার বিমর্ষমুখে বলল, "তাছাড়া আমার বউ কাঁদবে কেন? প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ের আগে একে অপরের জন্য কাঁদে। আর বিয়ের পর একে অপরকে কাঁদায়। ও তুমি বুঝবে না। তোমার বউদি কতদিন কেঁদেছেন জানি না, তবে আমি কতদিন কাঁদিনি তা বলতে পারি।"

“নাঃ। তা বুঝব না ঠিকই।” সে অদ্ভুত সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি করেছে, “তাহলে এক কাজ করো। সূর্যাস্ত অবধি তোমার আপাতত তেমন কোনো কাজ নেই। আজ কয়েকঘণ্টার জন্য বউদিকে সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়েই এসো। রাতেও হয়তো বাড়ি ফিরতে পারবে। কিন্তু তখন আর পরস্পরকে কাঁদাবার এনার্জি থাকবে না বলেই আমার ধারণা।”

“বাড়ি যাব!” পবিত্র হতবাক, “কিন্তু এদিকের ব্যবস্থা কী হবে? প্রণবেশদাও তো হসপিটাল পাহারা দিতে গেলেন। মিস্ বোস, মিস্ অরোরা এখনও এসে পৌঁছোননি। মিস্ দত্তও তো একা কুম্ভ হয়ে ভূপেন্দ্র দত্তা-র বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন। ব্যাক আপ নেই। এই পরিস্থিতিতে আমি বাড়ি ফিরি কী করে?”

“কিছুক্ষণ পরে মিস্ বোস আর মিস্ অরোরা দু-জনেই চলে আসবেন। ততক্ষণ তুমিই না হয় প্রণবেশদার জায়গায় মোতায়েন থাকো আর মিস্ দত্তকে ব্যাক আপ দাও, মিস্ বোস এলে তোমার এ বেলার জন্য ছুটি।” অধিরাজ দুষ্টু হাসল, “তারপর বউদিকে চাঁদমুখ দেখিয়ে এসো মামা। সঙ্গে গোলাপের বোকে নিয়ে যেতে ভুলো না। আর অর্কিড দিয়ে সাজানো সারপ্রাইজ কেক। বলো তো বুক করে দিই।”

“ওকে।” পবিত্র কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুঃখ দুঃখ মুখ করেছে, “অ্যাজ ইউ উইশ। করে দাও। কিন্তু ‘মামা’ বোলো না বস! বড়ো প্রাণে লাগছে আজকাল ওই শব্দটা শুনলেই। বাড়িতেও মামা, এখানেও মামা।”

চায়না টাউনের কিচেনে ব্যাঙ থাকে শুনে অর্ণব মর্মান্তিক চটেছিল। এবার 'মামা' শব্দের প্রতিক্রিয়া দেখে অতিকষ্টে হাসি সামলাল। সিনিয়রদের সামনে হো হো করে হাসা উচিত নয়। নয়তো নির্ঘাত হেসে ফেলত। বেশ হয়েছে। বউদি নির্ঘাত অফিসার আচার্যকে বাঁশ দেওয়ার জন্যই ছেলেকে এসব শেখাচ্ছেন। মিসেস আচার্যও কিছু কম যান না। ডক তো রাজশ্রী বউদিকে বিশেষ পছন্দ করেন। একবার অধিরাজকেই বলেছিলেন, “রাজশ্রী খুব মিষ্টি মেয়ে। অবিকল আমার মতো।”

কথাটা শুনে পরে অধিরাজ ফিশফিশ করে অর্ণবকে বলেছিল, “রাম... রাম... রাম। বউদি ডকের মতো মিষ্টি। বুঝেছ তো? শুনেই আমার সবকটা হাড় কেঁপে গেল।” সুতরাং রাজশ্রী বউদির পক্ষে এরকম দুষ্টুমি অসম্ভব নয়। পবিত্র আচার্যকে জব্দ করার মতো কোয়ালিটি নিঃসন্দেহে ডকের মিষ্টি ফিমেল ভার্সানটির আছে। অধিরাজও এবার হেসে ফেলে, “তা ঠিক খুড়ো। প্রেমিকার ছেলেও মামা বললে এত দুঃখ হয় না, যতটা নিজের বউয়ের ছেলে বললে হয়। এখন থেকে তবে খুড়ো, বস্, ব্রো, গুরু—এসবই ডাকব। মামা একদম নয়।”

“মনে থাকে যেন।”

ব্যাজার মুখ করে পবিত্র বিদায় নিল। এখন তাকে আর্বানায় গিয়ে মিস দত্তকে ব্যাক-আপ দিতে হবে। কৌশানী ফিরে এলে তবেই তার ছুটি। সে চলে যেতেই অধিরাজ অর্ণবের দিকে তাকায়, “তোমারও যদি মিস দত্তের হাতের স্পেশাল চা খাওয়ার ইচ্ছে হয় তবে পবিত্র-র সঙ্গে যেতে পারো। একদমই বারণ করব না। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে কোনো কাজ নেই। ওদিকে যা করার প্রণবেশদা করবেন। আর করবে বিশ্ব। যদি রমানাথ চক্রবর্তী চিরঞ্জীব জয়সওয়ালকে পটিয়ে পাটিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর রেকর্ডিংগুলো যথাসময়ে পাঠাতে পারেন তবেই। আমার এখন একটাই ইম্পর্ট্যান্ট কাজ। স্রেফ ভাবা।”

কথাটা শুনেই অর্ণব ভয়ে ভয়ে চোরের মতো আড়চোখে বসের দিকে তাকায়। এখন মিস্ দত্ত-র হাতের চা পেলে মন্দ হত না। মনে মনে সেই কথাই ভাবছিল। কিন্তু স্যার কী করে বুঝে ফেললেন?

“ওই বম্বাস্টিক আই সাইড আমায় দেখিও না।” অধিরাজ বলল, “গোয়েন্দাগিরি আমার শখ নয়, পেশা। এর জন্য খোদ সরকার আমায় মোটা পে প্যাকেজ দেয়। কে কার হাতের চাউমিন, চা আর কুকিজ খেয়ে ধন্য হচ্ছে তা খুব ভালোভাবেই জানা আছে। কিন্তু প্রশ্ন সেটা

নয় অর্ণব। প্রশ্ন হল, স্পেশাল চায়ে স্পেশাল ঠিক কী আছে?"

"মানে?" সে প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝতে না পেরে আমতা-আমতা করে বলে, "উনি সত্যিই ভীষণ ভালো চা বানান।"

"বটে?" তার একটা ভুরু ফের উঠে গিয়েছে, "উনি আর কী কী ভীষণ ভালো করেন অর্ণব?"

"কে? মিস দত্ত?" অর্ণব এবার চিন্তায় পড়েছে, "মিস দত্ত ভীষণ শান্ত ঠান্ডা। খুব ঘরোয়া। খুব সুন্দর ঘর গোছাতে পারেন। আর রান্নার হাতও চমৎকার। যে কোনো কুইজিন ফটাফট বানিয়ে ফেলতে পারেন। আর ওর ড্রেসিং সেন্সও খুব ভালো।"

"স্কীঃ!" অধিরাজের চোখ কুঁচকে যায়। সে বিস্মিত স্বরে বলল, "এইগুলো ওঁর স্পেশ্যালিটি?"

"হ্যাঁ।" সে একটু ঘাবড়েই যায়, "নয়তো আর কী?"

"গ-শ!" অধিরাজের সুন্দর মুখে এবার যেন একটু বিরক্তির ছোঁয়া, "কা-ম অ-ন! শি ইজ আ কপ্! তোমার মতো, আমার মতো একজন রক্ষক। শেষে এই স্পেশ্যালিটিটাই চোখে পড়ল? স্পেশাল চা? মিস্ আত্রেয়ী দত্ত একজন দুর্দান্ত স্প্রিন্টার অর্ণব। ন্যাশনালে ওমেনস চারশো মিটারে গোল্ড মেডালিস্ট। ইন্টারন্যাশনালে যাননি, কারণ তোমার আমার মতোই রানার হওয়ার থেকে পুলিশ হওয়ার ভূত মাথায় বেশি চেপেছিল। শি ইজ আ হাই ক্লাস ব্ল্যাক বেল্ট অলসো। ট্রেনিং পিরিয়ডে ওঁর রেকর্ড দেখার মতো ছিল। শ্যুটিং স্কিলও যথেষ্ট ভালো। ওসব যদি বাদও দাও, ম্যাথমেটিকসে ফার্স্টক্লাস নিয়ে এম.এস.সি. করা তোমার সহজ কাজ মনে হয়? শি ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট পার্সন! চুপচাপ থাকেন, শান্ত-নিরীহ, কিন্তু তোমার আমার থেকে অনেক বেশি দেখেন, শোনেন ও বোঝেন। সাইলেন্ট অবজার্ভার। ওঁর মধ্যে আমি মিস মার্পলের সমস্ত গুণগুলো দেখতে পাই। মিস্ অরোরা বা মিস্ বোসের মতো অ্যাগ্রেসিভ নন, কিন্তু তীক্ষ্ণ শাণিত মস্তিষ্কটিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তার ওপর চমৎকার গুছিয়ে কথা বলেন। আজ পর্যন্ত আমি ওঁর কাছে যতটুকু এক্সপেক্ট করেছি, উনি তার থেকে বেশিই দিয়েছেন, নিরাশ করেননি। এখনও বার্নিং শিখের মতো মারাত্মক ক্রিমিনালের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এগুলো তোমার চোখে পড়ল না? নাকি জানতেই না?"

অর্ণব একটু অপ্রতিভ হয়। আত্রেয়ী সম্পর্কে এত কথা স্যার জানেন। অথচ আজ পর্যন্ত সে নিজে কখনও অর্ণবকে বলেনি। সে একটু চুপ করে থেকে বলে, "আমি কী করে জানব স্যার? মিস্ দত্ত আমায় কখনও বলেননি।"

"মিস্ দত্ত খামোখা বলেই-বা বেড়াবেন কেন? ওঁর ফাইলেই তো সব লেখা আছে সার্টিফিকেট সমেত। তুমি জুনিয়রদের ফাইল, তাদের স্পেশালিটি পড়ে নাও না?

আমিও তো বলে বেড়াই না যে আমি কী কী করতে পারি। তুমি কি জানো সেগুলো?"

"আপনি চমৎকার গান গাইতে পারেন। গিটার, স্প্যানিশও দারুণ বাজান। কোবিয়া কেসের সাসপেক্টকে শোনালেন, কিন্তু আমাকে কখনও শোনাননি।" একটু অভিমানে তার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত, "সেদিন নিজের কানে না শুনলে জানতেও পারতাম না যে আপনি রীতিমতো প্রোফেশনালদের মতো গেয়ে থাকেন।"

"এটা আমি বলিনি। কিন্তু তুমি জেনেছ। কারণ সামনা-সামনি দেখেছ। তবে কর ইয়োর কাইন্ড ইনফর্মেশন, শুধু গিটার নয়, যে কোনো তারের যন্ত্র বা স্ট্রিং ইনস্ট্রুমেন্ট আমি বাজাতে পারি। ওটা আমার মা, মানে প্রিন্সেসের গুণ। ওঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ও শেখা। এটা বলেই দিলাম।" অধিরাজ একটু থেমে বলে, "কিন্তু তুমি কি মিস দত্তকে কখনও স্প্রিন্ট টানতে দেখোনি? ফায়ার করতে দেখোনি? একবারও ওর পুলিশি মূর্তি দেখোনি? অতন্দ্র পাহারায় থাকতে দেখোনি? সেগুলো কি সব মিস করেছ? রান্নাটাই দেখলে? আর রান্নারই বা কী আছে? ছুটির দিন তুমি সকালে যদি বাড়িতে চলে আসো তবে আমাকেও নানারকমের ক্যুইজিন রান্না করতে দেখবে। একা মিস্ দত্ত নয়, ও কাজটা আমিও পারি। তবে কি তুমি আমায় শেফ বলবে?"

এবার অর্ণবের চক্ষু চড়কগাছ। স্যার আর কুকিং। সে বিস্ময়ের ধাক্কায় তোতলাতে তোতলাতে বলল, “আ-আ-আপনি রান্না ক-করেন!”

“অফকোর্স। তার প্রমাণও তুমি পেয়েছ।”

“প্রমাণ? কীভাবে?”

“চোখে দেখে এবং চেখে দেখে।” অধিরাজ চোখ সরু করেছে, “এই কেসটা আসার দু-সপ্তাহ আগে রবিবারের লাঞ্চে দই কাতলা, ইলিশের পাতুরি, আর কচি পাঁঠার ঝোল খেয়ে তো উলটে পড়েছিলে। প্রিন্সেসকে কমপ্লিমেন্টেও ঢেকে দিলে। জানতেও চাইলে কোমরে ওরকম বেল্ট পরে এত কিছু রান্না করল কী করে? তোমার একবারও মনে হয়নি যে কোমরে অত কষ্ট আর ব্যথা নিয়ে ঠায় উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক রান্নাই করতে পারে না?”

“তবে ওগুলো...!”

এবার অর্ণবের মনে পড়ল ওর প্রশংসা শুনে অধিরাজের মা, তথা ‘প্রিন্সেস’ কেমন যেন আমতা আমতা করছিলেন। অবিকল চোরের চাকরের মতো অপ্রতিভ হচ্ছিলেন। আর পপসি, তথা বাবা মুচকি মুচকি হেসে রহস্যময়ভাবে খুকখুক করে কাশছিলেন। তখন ব্যাপারটা বোঝেনি। এতক্ষণে বুঝল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তার মাথায় ইন্দ্র সোজা বজ্রটাই ছুড়ে মেরেছেন। সে কোনোমতে বলে, “আপনি রেঁধেছিলেন? আপনি তো মিস্ দত্তকেও হার মানাবেন স্যার। আর আমি গবেটের মতো কাকিমাকে দ্রৌপদী বলে এলাম!”

“একা দ্রৌপদী নয় অর্ণব। ভীমও দুর্দান্ত রান্না করতেন।” অধিরাজ সখেদে মাথা নাড়ল, “সেটাই তোমাদের মনে থাকে না। রান্নাটা নিঃসন্দেহে আর্ট। ওটাকে ছোটো না করেই বলছি, তুমি কি এরপর আমাকেও মিস্ দত্তের মতো গ্রেট শেফ-কপ্ উপাধি দেবে? দ্রৌপদী চমৎকার রান্না করতেন, কিন্তু বিরাট রাজের রয়্যাল কুক ছিলেন ভীম। একটা রাজবাড়ির হেঁশেল সামলাতেন তিনি। রাজাদের টেস্টবাডকে খুশি করা মোটেই সহজ কাজ নয়। ভীম ‘বল্লভ’ ছদ্মনামে সেটা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তার মানে, রান্নাটা হয় তিনি দ্রৌপদীর সমানই জানতেন, অথবা তার থেকেও ভালো। অথচ কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার সময়ে তুমি প্রিন্সেসকে ‘রান্নায় দ্রৌপদী' বলে এলে। ভীম বললে না কেন অর্ণব?”

অর্ণব তখন প্রায় খাবি খাচ্ছে। এই সামান্য একটা কথার পেছনে যে স্যার একেবারে গোটা মহাভারত এনে ফেলবেন তা কে জানত। সে ইতস্ততঃ করে বলে, “ইয়ে... মানে...!”

“মানে একটাই। ভীম যতই চমৎকার রান্না করুন, আর অর্জুন যতই ভালো নৃত্যশিক্ষক হোন—দিনান্তে ওঁরা পুরুষ। তাই মধ্যম ও তৃতীয় পান্ডবের আসল পরিচয়, ওঁরা বীর। আর যেহেতু দ্রৌপদী নারী, তাই তিনি যতই ধৃতরাষ্ট্রের সভায় দাঁড়িয়ে নিজেকে পাঁচজন মহান ও বীর স্বামীর চেয়েও বেশি বুদ্ধিমতী, যুক্তিবাদী ও বীরাঙ্গনা প্রমাণ করুন, যতই দেখা যাক যে তিনি অবলা নন-জয়দ্রথ আর কীচকের মতো ষাঁড়কে একধাক্কায় উলটে ফেলেছিলেন, রীতিমতো বাগ্মী, জ্ঞানী কিংবা যতই অগ্নিসম্ভূতা হন—শেষপর্যন্ত তিনি শ্রেষ্ঠ রাঁধুনীর শিরোপাই পাবেন। হাউ টিপিক্যাল! আমিও একজন পুলিশ অফিসার, মিস্ দত্তও তাই। আমাকে তোমরা হিরো বলো, আর মিস্ দত্ত চা-ওয়ালি? এটা কী ধরনের বিচার হল?”

অর্ণব অবনতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কী বলবে বুঝে পায় না। সে স্যারের মতো করে ভাবতে পারে না। সারাজীবন যা দেখেছে, সেটাই তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী বলতে সে সিগারেট বা চুরুট ফোঁকা রণচণ্ডীকে মেনে নিতে পারে না। যে নারী নিজের মুখে পুরুষের সামনে এসে তাকে নিজের ভালোবাসা বা কামনার কথা জানায় তাকে তার নির্লজ্জ বলে মনে হয়। বিড়ালের মতো নারী সে মানতে পারে, কিন্তু ঘোড়ার মতো দামাল নারীদের দেখলে অস্বস্তি হয়। নিজের বাড়িতেও আজীবন মা, কাকিমা, জেঠিমাদের মধ্যে শান্ত গৃহলক্ষ্মীর মূর্তিই দেখেছে। যাদের নেশা বলতে বড়োজোর জর্দা, দাঁত মাজার তামাক কিংবা পান সুপারি। যাদের গা থেকে সর্ষের তেল আর হলুদের গন্ধই আসে। যারা পাঁচালি পড়েন কিন্তু শেক্সপীয়র পড়েন না। এমন নারীই যদি তার কাছে আদর্শ হয় তাতে অন্যায় কী?

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অর্ণবের মধ্যে কিছু সোশ্যাল

ট্যাবু আছে তা তারও অজানা নেই। তার সমস্ত দোষ-গুণ সমেতই ওকে ওর মতো করেই গ্রহণ করেছে, ভালোবেসেছে। বুঝিয়েছে, তবে কোনোভাবে পালটানোর চেষ্টাই করেনি। আগেও কয়েকবার অর্ণবের মেল শভিনিজম তার চোখে পড়েছে। নম্রভাবে বোঝালেও মাথা ঘামায়নি। কিন্তু এবার সেটা যেন বড়ো বেশিই কেসটার ওপর প্রভাব ফেলছে। সে আস্তে আস্তে বলল, “তোমার মিস চাউমিন বন্ডকেও বোধহয় পছন্দ হয়নি, তাই না?”

এবার অর্ণব মরিয়া, “কাম অন স্যার! ওই পুতুলের মতো মেয়ে ইনফর্মার? ইনফর্মারদের কত কিছু জানতে হয়। উনি মারাত্মক খুনিদের স্টক করবেন? তাদের খবর তুলে আনবেন? যে কথায়-কথায় আছাড় খায় আর তোতলায়? উনি ‘ডর’ ফিল্মের শাহরুখের মতো ‘ক্...ক্... কিরণ’ করতে-করতে যতক্ষণে খুনি সম্পর্কে একটা খবর দেবেন ততক্ষণে আরও চার পাঁচটা খুন হয়ে যাবে। আর কেউ যদি আক্রমণ করে? ওঁর জন্যই তো চার-পাঁচটা বডিগার্ড মোতায়েন রাখতে হবে। তার ওপর যাতে আছাড় না খান সেটার জন্য বেবিসিটার এক্সট্রা। এরকম খবরি কোন্ কাজে লাগবে?”

“এমন খবরিই তো বাজি মাত করে।” সে মৃদু হাসল, “তুমি আছাড় আর ধাক্কা খাওয়াটাই দেখলে? আমি যখন ওঁকে ধরেছিলাম তখন ওঁর কপালে ঘামের বিন্দু দেখেছি অর্ণব। ইসমাইল আর রকির মতো মারাত্মক ধুরন্ধর ইনফর্মারকে যে অত সহজে স্বর্গে ডিপোর্ট করে দেয়, সেই মারাত্মক খুনিকে উনি সেই ভোর থেকে স্টক করেছেন। আঠার মতো সেঁটে আছেন অথচ বার্নিং শিখের মতো ধুরন্ধর লোক টেরও পায়নি! এমনকি সে হসপিটালে ঢোকার পর গোটা এলাকা ঘুরেও দেখেছেন। কতখানি পরিশ্রমী হলে ও উপস্থিত বুদ্ধি থাকলে লোকে এ কাজ করে! আর তুমি বলছ ওঁকে দিয়ে কাজ হবে না?”

“গোটা এলাকা ঘুরে দেখেছেন কী করে বুঝলেন?”

“নয়তো জানলেন কী করে যে বার্নিং শিখ যে গলিটায় ঢুকেছে, সেটার শেষে স্রেফ ডেড-এন্ড?” অধিরাজ মুচকি হাসল, “উনি জ্যোতিষী নন যে জানবেন যে বার্নিং শিখ তাড়া খেয়ে ওই গলিটাতেই ঢুকবে। আর দেখলেই তো, নিজে চেজ করতে গিয়ে মাঝরাস্তাতেই উলটে পড়লেন। তবে মিস চাউমিন জানলেন কী করে যে গলিটার ও প্রান্তে ডেড এন্ড ছাড়া কিছু নেই। আগেই চারপাশটা দেখে না নিলে বলতে পারতেন না। ভেরি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড ইম্প্রেসিভ!”

“ইম্প্রেসিভ অন হোয়াট সেন্স?” সে বিরক্ত, “ওঁকে দেখলে কোন্ দিক দিয়ে পোটেনশিয়াল ইনফর্মার মনে হয়? টিপিক্যাল আনস্মার্ট, বাচ্চা বাচ্চা হাবভাব। সবকিছু ভন্ডুল করতে ওস্তাদ। এরকম খবরি দেখলে ক্রিমিনালরা হাসবে। উনি র‍্যাম্পেই ঠিক আছেন। এখানে মানায় না।”

“সব কিছুই তুমি দেখে বিচার করবে?” অধিরাজ হাসল, “তুমি নিজেই তো আবার কবি। উর্দু শায়েরি লেখো, পড়ো। কেউ তোমার আড়ংধোলাই দেখলে বলবে ইনিই আবার গালিবের শিষ্য? তোমার মধ্যে যদি বা একটু কবি কবি লুকও থাকে, আমায় দেখলে কেউ বলবে যে রং তুলির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে?”

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে অর্ণব থ। রং তুলির সঙ্গে সম্পর্ক? অধিরাজ ছবি ভালোবাসে সে জানে। ওর বেডরুমে প্রচুর অপূর্ব অপূর্ব নেচারের পেইন্টিং দেখেছে। পোর্ট্রেটও দেখেছে যেগুলো দেখলে মনে হয় যে কোনো প্রোফেশনাল নামজাদা আর্টিস্ট এঁকে দিয়ে গিয়েছেন। সে মুক্তকণ্ঠে ছবিগুলোর প্রশংসাও করেছে। কিন্তু শিল্পীর নাম খেয়াল করেনি। খেয়াল তো দূর, শিল্পীর নামই বোধহয় ছিল না। তার মনে এবার সন্দেহ জাগে। তবে কি...!

অধিরাজকে প্রশ্ন করতেই সে হেসে ফেলল, “ধরেছ ঠিকই। ওটা আমার টাইমপাসের আরও একটা মাধ্যম। আমার মামা নামজাদা আর্টিস্ট ছিলেন। জিনটা রক্তে রয়েছে। নয়তো কোন পিকাসো আমার বেডরুম ছবিতে সাজিয়ে দেবেন? এখন অবশ্য পপসি পিকাসোর সঙ্গে ফুল-লতা-পাতাও আমদানি করেছেন। আমি অফিসে বসে ঝটপট ছবি আঁকতে পারি না

বলে, একেবারেই পারি না-তা সঠিক নয়। যে হাত রিভলবার ধরে, মারপিট করে, সেই হাতই স্প্যানিশ, গিটার, এস্রাজ, ভায়োলিন, সেতার ধরে, হাতা খুন্তিও ধরে, রং-তুলিও ধরে। কিন্তু সেটা কি তুমি আমায় দেখে বুঝতে পারো? না আমি বলতে গিয়েছি?”

অর্ণব কী বলবে ভেবে পায় না। সে নিজের প্রকাশের সমস্ত ভাষাই বুঝি হারিয়ে ফেলেছে। তবু গোঁয়ারের মতো বলল, “কিন্তু স্যার, ওই মডেলের মতো নরম সরম মেয়ে...।”

“দেখতে সুন্দরী ও নিরীহ জাপানি পুতুল বলেই উনি অসম্ভব পোটেনশিয়াল খবরি অর্ণব। ভদ্রঘরের মেয়ে, স্টুডেন্ট, ওয়েল এডুকেটেড, বুদ্ধিমতী তার ওপর ওঁর যে কোয়ালিটিগুলোকে তুমি নেগেটিভ ভাবছ, ওগুলোই সবচেয়ে বড়ো প্লাস পয়েন্ট। তুমি সি.আই.ডি. হোমিসাইডের একজন ঘুঘু অফিসার হয়েই ওঁকে একজন ইনফর্মার হিসেবে কল্পনাও করতে পারছ না।” অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসে, “বার্নিং শিখ-ও ওঁকে স্পট করতে পারেনি সম্ভবত ওই আনস্মার্ট হাবভাবের জন্যই। তোমার কি মনে হয়? বড়ো বড়ো হিস্ট্রিশিটার কিংবা তুখোড় ক্রিমিনালরাও মিস বন্ডকে খবরি হিসেবে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করবে? ইভেন ওঁর তো কাউকে স্টক করারও দরকার নেই। অমন ফুটফুটে নিষ্পাপ তরুণী দেখলে মদন বা কার্লোসের মতো চরিত্রের আর্চ ক্রিমিনাল বা গ্যাংস্টাররাও বলবে, ‘এত কষ্ট করে হাঁটবেন কেন সেনোরিটা? ইয়ে হসি পৈর জমি পে মতো ডালিয়েগা। মৈলা হো যায়েগা। আসুন আমিই আপনাকে ড্রপ করে দিচ্ছি।' যে-কোনো কেসে উনি আমাদের তুরুপের তাস হতে পারেন। সেটা আমি বুঝতে পারছি। কারণ আমি ওঁকে দেখে বিচার করিনি। দেখেই যদি মানুষকে বিচার করা যেত তবে আমাদের এম কে স্তালিন আর এ পি জে আবদুল কালাম জেলে থাকতেন। শ্রীপ্রকাশ শুক্লা বা দাউদ ইব্রাহিম দেশের রাষ্ট্রপতি হত। স্টিফেন কিং জঙ্গী হতেন আর আজমল কাসভ বিশ্ববিখ্যাত শায়র।” ,

অর্ণব এর বিপক্ষ কোনো যুক্তি খুঁজে না পেলেও ঠিক ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না। একটা ভদ্রঘরের মেয়ে শেষে কিনা গ্যাংস্টারের পেছনে খবরিগিরি করে বেড়াবে। রাত-বিরেতে তাদের সঙ্গে বা পিছু পিছু ঘুরবে। একজন পুরুষ যা পারে, একজন মেয়ে কি তা পারে? স্যার ভুল ঘোড়ার ওপরে বাজি রাখছেন না তো।

“আর রইল সেলফ ডিফেন্সের কথা।” অধিরাজ আপনমনে সিগারেট বের করে আনতে আনতে বলে, “ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি বেশ কিছু অথেন্টিক মার্শাল আর্ট অ্যাকাডেমির খোঁজ জানি। আচ্ছা করে মিক্সড মার্শাল আর্ট আর কালারিপায়াত্তুর ডেডলি কম্বিনেশন গুলিয়ে খাইয়ে দেবে ওরা। মিস্ বন্ড একাই একশো হয়ে দাঁড়াবেন। কোনো বডিগার্ড লাগবে না। যদিও ওঁর তোতলানো আর আছাড় খাওয়ার দুরারোগ্য ব্যাধি তাতে যাবে না। তবে ও দুটো থাকলেও কোনো অসুবিধে নেই। তুমি ওঁর চিন্তা ছাড়ো। বরং এক কাজ করো। বিশ্বকে একটু ফোন করে দেখো যে দরকারি ফাইলগুলো এল কিনা।”

তারপর থেকেই সে নির্বিকল্প সমাধি নিয়েছে। অর্ণব তাকে আর বিরক্ত করেনি। সে জানে, লোকটা যখন ভাবে তখন তাকে ডিস্টার্ব করা একেবারেই উচিত নয়। তাই আর একটুও ঘাঁটায়নি। তাছাড়া সময় এখন শেষের পথে যাচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্ত অমূল্য। সেইজন্য সে আর কথা বাড়ায়নি। বরং নিয়মিত প্রণবেশ লাহিড়ীর সঙ্গে কন্ট্যাক্ট রাখছে। ওদিকে বিশেষ কোনো আপডেট নেই। তবে এতদিনে একটু অ্যাকশন করার সুযোগ পেয়ে তিনি মহানন্দে হাত-পা ঝাড়া দিচ্ছেন। তাঁর বিশ্বাস, বার্নিং শিখ অবশেষে এনকাউন্টারেই মরবে।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো খবরাখবর নেই। বিশ্বজিতের কাছে এখনও রমানাথ চক্রবর্তীর তরফ থেকে কোনো মেইল আসেনি। সে নিজেও ওই বিশেষ মেইলটির অপেক্ষাতেই বসে আছে। আর লাগাতার জগদীপ সিং ভাট্টিকে ট্র্যাক করে চলেছে। মেইল এলেই জানাবে। ভাট্টিসাহেব আপাতত নিজের পার্টনারের সঙ্গে বিজনেস রিলেটেড ভাট বকছেন। কেঁউমেউ করে আর্গুমেন্টও করছেন। দাঁতের ব্যথা অনেকটাই কমেছে হয়তো। ‘নাশতা ও করেছেন। ওদিকেও সন্দেহজনক কিছু নেই।

এর ঠিক ঘণ্টাখানেক পরই খবর এল যে মিস্ বোস ব্যুরোয় না এসে আপাতত ডাইরেক্ট আর্বানায় পৌঁছে গিয়েছে। পবিত্র-র কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিয়ে কৌশানী আপাতত সেখানেই প্রহরারত। পবিত্র আচার্য আপাতত অধিরাজের বুক করা ফুল আর কেক নিয়ে মিসেস আচার্যকে খুশি করতে বাড়ি রওনা দিয়েছে। মিস অরোরা ব্যুরোয় এসে এখনও পৌঁছয়নি। কে জানে তার হয়তো আবার খিদে পেয়েছে। ফের হয়তো কোনো রেস্টোর‍্যান্টে বসে পরোটা-টরোটা খেয়ে নিজের ব্যাটারিতে চার্জ দিচ্ছে। অথবা সিগার টিগার ফুঁকতেও পারে। অর্ণবের টুইঙ্কলের এই ফোঁকাফুঁকির ব্যাপারটায় বিরক্তি থাকলেও সে চেষ্টা করছে নিজের পার্সোনাল পছন্দ অপছন্দকে প্রোফেশনাল লাইফ থেকে সরিয়ে রাখতে।

এর ফাঁকে ডঃ চ্যাটার্জির ফোনও একবার এল। তিনিও বেশ উদ্বেগে আছেন। ক্লোরোফর্ম অ্যাটাকের খবর আহেলির কাছ থেকে আগেই পেয়েছিলেন। আপডেটও নিয়েছেন। আর একপ্রস্থ অর্ণবকেও জেরা করে জেনে নিলেন যে ওরা সবাই ঠিক আছে কিনা। অধিরাজের মা-বাবাকেও আশ্বস্ত করল অর্ণব। এই বিশেষ সময়গুলোতে অধিরাজের ফোন সাইলেন্ট বা ডু নট ডিস্টার্ব মোডে থাকে বলে সবাই তার খোঁজ অর্ণবের কাছ থেকেই নেয়। অর্ণবের মা-বাবাও চিন্তায়। তার মধ্যেই মিডিয়ার অজস্র ফোন। হসপিটালের পাশের গলিতে দৌড়ের ভিডিও ফুটেজ তাদের কাছেও পৌঁছেছে। অধিরাজ ব্যানার্জিকে চিনতে তাদের অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তার সামনে কে দৌড়চ্ছে, কেন দৌড়চ্ছে, কত কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে দৌড়চ্ছে-সব না জানলে তাদের শান্তি হচ্ছে না। এদের ফোন নম্বর দেয় কে!

এই অলস সময়টুকুতে খুঁটিনাটি কাজগুলো করে গেলেও অর্ণব সতর্কদৃষ্টি রেখেছে অধিরাজের দিকে। খাবারগুলো আদৌ পেটে গেল কিনা, ক-কাপ কফি আর ক-প্যাকেট সিগারেট উড়ল, সবই নিঃশব্দে দেখে চলেছে। তবে তার সঙ্গে আরও একটা জিনিস তার চোখ এড়ায়নি। অধিরাজের কপালে চিন্তার ভাঁজ আর চোখে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব। কিছু একটা নিয়ে সে সংশয়ে আছে তা দৃষ্টিতেই প্রকট। দীর্ঘ দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছে চেয়ারে। ঠোঁট বেয়ে গল গল করে পারফেক্ট ধোঁয়ার রিং বেরোচ্ছে। কিন্তু হাতের আঙুলগুলো অস্থিরভাবে পেপার ওয়েটটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

এভাবেই অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পর শেষপর্যন্ত অধিরাজ বাহ্যচেতনা ফিরে পেল। অর্ণব তার মুখের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দেখতে পেয়ে দরজা খুলে কেবিনের মধ্যে উঁকি মারে, "আসবো?"

"চলে এসো।" অধিরাজ একটু চিন্তান্বিত মুখেই বলল, "অত অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই। বাইরের কোনো খবর পেলে?"

অর্ণব যতটুকু যা জানত সবই বলল। ডঃ চ্যাটার্জি ফোন করেছিলেন শুনে সে একটু সচকিত হয়ে ওঠে, "সহিংস লামা ফোন করেছিলেন? রিংব্যাক করো তো ওঁকে।" বলাই বাহুল্য, বৌদ্ধ লামাদের মতো ন্যাড়ামুণ্ডি মস্তকের জন্যই ডঃ চ্যাটার্জির এই নতুন নামকরণ। তবে তিনি আর যাই হোন, কোনোমতেই অহিংস নন। সেইজন্যই 'সহিংস' শব্দটা ওঁর নামের আগে বসেছে। অর্ণব হাসি সামলে বিনাবাক্যব্যয়ে ডঃ চ্যাটার্জিকে ফোনে ধরে। এপ্রান্ত থেকে অধিরাজ 'হ্যালো' বলতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল সেই আদি ও অকৃত্রিম গজগজ, "আর কত হেলাবে? তোমার কর্মকাণ্ড দেখে হেলে হেলে হেলেসাপ হয়ে গেছি। বলি কী অদ্ভুত আক্কেল তোমার? লোকে মুখে ক্রিম মাখে, লোশন মাখে, পাউডার মাখে, ডিম-মধু কিংবা শশা-কমলালেবুর রস মাখে, ফেস-প্যাক নাকি—সেসবও মাখে শুনেছি। তুমি ক্লোরোফর্ম ছাড়া আর কিছু মাখার পেলে না?"

"কী করব বলুন।" অধিরাজ গোবেচারা মুখ করেছে, "আপনার মতো ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির স্টক নেই বার্নিং শিখের কাছে। যা ছিল, তাই দিয়েই রূপচর্চা করিয়েছে। ক্লোরোফর্ম ফেশিয়াল হিসাবে কিন্তু খারাপ নয়। ট্রাই করে দেখতে পারেন।"

"শোনো জ্যাঠা ছেলে!" গাঁক গাঁক করে ওঠেন তিনি, "নিজের ফান্ডা নিজেই মারো। ওনাকে হুঁশে আনতে আহেলির প্রাণ গেছে, আর উনি চামচিকের মতো চিক্ চিক্ করছেন।"

“মিস্ মুখার্জি ওঁর প্রাণ যাওয়ার রিভেঞ্জ আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় মড়ার ট্রলিতে শুইয়েই ষোলো আনা পুষিয়ে নিয়েছেন। ওঁর কথা আপাতত থাক। আপনি আমাকে একটা ইনফর্মেশন দিন।” অধিরাজের বাদামি চোখ চকচক করছে, “সেদিন যে অসোউইক ফোর্টের 'অ্যাটাক অব দ্য ডেড ম্যানের' গল্পটা বলছিলেন সেটা ঠিক কখন ঘটেছিল?”

“তুমি কি আমায় উইকিপিডিয়া পেয়েছ যে সন তারিখ সব যখন তখন গড়গড়িয়ে বলে দেব? ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় ঘটেছিল। দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।”

“সে কী। আপনি উইকিপিডিয়ার নাম জানেন?” কৌতুকে তার একটা ভুরু ফের উঠে গেল, “উইকিপিডিয়ার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, প্রপ্রপিতামহ-সবাই এতদিনে ধন্য হল ডক্।”

“শুধু তাই নয়, ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলও খুলেছি। কুক্কু শিখিয়েছে।” ডঃ চ্যাটার্জি খ্যাঁক করে ওঠেন, “তোমার এত আজাইরা আহ্লাদ কীসের হে ছোঁড়া? নিজের ডিপিতে তো আমার মুখ সাঁটিয়েছ। আমি কি টাইগার শ্রফের ছবি সাঁটাব?”

এই রে! বুড়ো দেখে ফেলেছে। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেই বিপদ হল। কুকুমিঞাকে আগেই চেতিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। না জানে এবার তিনি কতক্ষণ এই ইস্যু নিয়ে তাণ্ডব করে বেড়াবেন!

“তা পারেন। তবে তাতে 'টাইগার মুর্দা হ্যায়' না হয়ে যায়।” অধিরাজ ফিচেল হাসছে, “আই মিন টাইগার শ্রফ আনন্দে না হার্টফেল করেন। লোকে আজকাল 'সেভ টাইগার' স্লোগান দিচ্ছে কিনা। আপনি বরং অর্জুন কাপুরকে ট্রাই করতে পারেন। তিনি রাগ হলেও যা এক্সপ্রেশন দেবেন, আনন্দিত হলেও সেই একই এক্সপ্রেশন! পত্থর কো কহো তো ভি শায়দ এক্সপ্রেশন দে দে, লেকিন এক্সপ্রেশন কা ক্যায়া মজাল কে অর্জুন কাপুরকে শকল মে আয়ে!”

“তোমার প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি কী? আমি, টাইগার শ্রফ, অর্জুন কাপুরের এক্সপ্রেশন না অসোউইক ফোর্ট?”

“আপাতত অসোউইক ফোর্ট। আপনি শুধু জানান যে অ্যাটাকটা কখন হয়েছিল। দিনে না রাতে?”

“দিনের বেলা।” তিনি জানালেন, “এটা একদম শিওর।” “কেন?”

“কারণ রাশিয়ান সেনারা ক্লোরিনের ক্লাউডটা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিল। সেটা যে আস্তে আস্তে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সেটাও দেখেছিল। কিন্তু তখনও বোঝেনি যে কী হয়েছে। রাতের বেলা ঘটলে দেখতে পেত না।”

“প্রতিপক্ষ ক্লাউডটা দেখতে পাবে জেনেও জার্মানরা ক্লোরিন-ব্রোমিনের মিক্সচারটাকে দিনের বেলাতেই রিলিজ করল কেন? এক্ষেত্রে রাতটাই তো সেফ ছিল।”

“ওরা কি আর অত ঠিক করে অ্যাটাক করেছে? আমার সঙ্গে পরামর্শ করেও তো করেনি।” তিনি একটু থেমে বললেন, “তবে যতদূর জানি, বেসিক্যালি অ্যাটাকটা আরও আগে যে কোনো সময়ে হতে পারত। ওরা বেশ কিছুদিন ধরেই চেষ্টাও চালাচ্ছিল। তখন তো টেকনোলজি এত উন্নত ছিল না। গ্যাসগুলোর পা-ও নেই যে হেঁটে যাবে। তাই উইন্ডের যথেষ্ট প্রেশার দরকার ছিল। জার্মানরা হাওয়াটা কোনদিকে বইছে সেটাই আগে কিছুদিন ধরে ট্র্যাক করছিল। যে মুহূর্তে হাওয়ার গতিপথ অসোউইক ফোর্টের দিকে ঘুরল, উপযুক্ত জোর পেল, সেই মুহূর্তেই কন্টেনার খালি করে দিয়েছিল ওরা।”

“আচ্ছা। আর ভোপাল গ্যাস কাণ্ডটা তো বোধহয় রাতে। তাই না?”

“হ্যাঁ। কিন্তু ওটা তো মিথাইল আইসোসায়ানেট লিক করে হয়েছিল। যদিও ওখানে ফসজিনের অস্তিত্বও ছিল। কিন্তু সর্বনাশটা এম আই সি-ই বেশি করেছে।” “ওটা যদি রাতের বেলা না হয়ে দিনের বেলা ঘটত, তবে কি ডেথ টোল আরও বাড়ত?”

“জানি না, যাও তো!” গজগজ করে ওঠেন ফরেনসিক বিশারদ, “এক্ষেত্রেও কোনো

গ্যাসই আমার পারমিশন নিয়ে লিক করেনি। তাই দিনের বেলা হলে কী হত তা বলতে পারছি না। আমার ধারণা ফলাফল প্রায় একই হত। তবে যেহেতু দিনের বেলা রাস্তাঘাটে মানুষজনের ভিড় থাকে, সেহেতু ইনস্ট্যান্ট ডেথ হয়তো বেশি হত। কিন্তু আল্টিমেট ডিজাস্টার সেমই হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আগে হোক পরে হোক, মরতই।"

"বুঝলাম। বাই দ্য ওয়ে, ইনস্টাগ্রামে কিন্তু মিস্ কাটামুণ্ডু নিজেই আছেন। ওঁকে ফলো করে আমার তরফ থেকে 'হাই" বলে দেবেন প্লিজ। আর জানতে চাইবেন, এত বিটকেল বিটকেল মার্ডার ওয়েপন ওঁর মাথায় আসে কী করে। এবার শুনলাম নাকি বিরাট একটা মোটকা বই কার মাথার ওপর ফেলে খুন করেছেন। মার্ডার ওয়েপন শেষে বই। তাহলে তো কালীপ্রসন্ন সিংহমশাইয়ের মহাভারতের চেয়ে বড়ো মার্ডার ওয়েপন আর ত্রিভুবনে নেই।"

ডঃ চ্যাটার্জি আর কোনো কথা না বলে রেগেমেগে ঘটাং করে লাইন কেটে দিলেন। অর্ণব এতক্ষণ চুপচাপ গোটা কনভার্সেশনই শুনছিল। এবার কৌতূহলী স্বরে জানতে চায়, "স্যার, এর সঙ্গে অসোউইক ফোর্ট বা ভোপাল গ্যাস ডিজাস্টারের সম্পর্ক কী?" অধিরাজ মৃদু হাসল, "একটা দিনে হয়েছে। অন্যটা রাতে। এটাই সম্পর্ক।"

"কিন্তু দুই জায়গায় তো গ্যাসগুলো আলাদা!"

অধিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার মুখে একটা অচ্ছাভ বিষণ্ণতা লক্ষ করে অর্ণব। অদ্ভুত ব্যাপার তো। স্যারের হল কী! হঠাৎ এমন বিষাদ ওঁর মুখে ছেয়ে গিয়েছে কেন? বার্নিং শিখকে ধরতে না পারার হতাশায় কি?

অর্ণব জানতে চাইতেই আলতো মাথা নাড়ল সে, "না। সমস্যাটা সেটা নয়। বার্নিং শিখকে ধরা ঠিকই যাবে অর্ণব। তাকে মারাও যাবে, শেষও করা যাবে। কিন্তু তার পেছনের লোকটাকে আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, তবে ওই তথাকথিত "গুল্লুকে ধরা যাবে না। ওকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারব না আমরা।"

"মানে?"

তার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারে না অর্ণব। এ আবার কী হেঁয়ালি। বার্নিং শিখকে ধরা যাবে, মারাও যাবে। কিন্তু গুল্লুকে ধরা যাবে না! এ কেমন কথা! দু-জনেই তো এক ব্যক্তি!

"নাঃ।" অধিরাজের মুখ গম্ভীর, "আগেও বলেছি যে বার্নিং শিখকে তুমি ভূতও বলতে পারো। একটা মানুষের ভয়াবহ শৈশব থেকে উঠে আসা একটা পচাগলা পোড়া ইতিহাসের ভূত। আর গুল্লু সেই ভূতের হাতে পজেড একটা মানুষ। এতটাই সে ওই প্রেতের দখলে যে চাইলেও নিষ্কৃতি পাবে না বা তাকে থামাতে পারবে না। আর যে মুহূর্তে দু-জন আলাদা হবে, বার্নিং শিখ ধরা পড়বে কিন্তু গুল্লুর মরা ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। ইউ নো অর্ণব...?"

"উঁ?"

তার দীঘল চোখের পাতায় ফের বিষণ্ণতার ছায়া, "কখনও কখনও মনে হয়, এই কেসটা নিয়ে কি আদৌ ঠিক করলাম? অনেস্ট কনফেশন, লোকটা যদি ওর টার্গেটদের ইনোসেন্ট পরিবারকে না মেরে সোজা টার্গেটদেরই মারত, তবে এই কেসটা হাতে নিতামই না আমি। নেহাৎ কতগুলো নিরপরাধ মানুষের প্রাণের দায়। নয়তো বার্নিং শিখকে আটকানোর চেষ্টাই করতাম না।"

অর্ণব স্তম্ভিত! এ কী কথা বলছে অধিরাজ! একজন খুনির প্রতি এতখানি সহানুভূতি কেন তার? বার্নিং শিখ লোকগুলোর পরিবারকে না মেরে লোকগুলোকে মারলে কিনা তাকে আটকাতই না! তাছাড়া সে এখন থেকেই বা কী করে বলতে পারে যে গুল্লুকে জ্যান্ত ধরা যাবে না-সে মরবেই।

তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটার উত্তর অধিরাজ অন্যমনস্কভাবে নিজেই দিয়ে দিয়েছে, "লোকটা জগদীপ ভাট্টিকে কী বলেছিল মনে আছে? নিজের কবরটাও ও খুড়ে রেখেই এই পাপকাজে নেমেছে। যে মুহূর্তে বার্নিং শিখ ধরা পড়বে, সে মুহূর্তে গুল্লুর বেঁচে থাকার একমাত্র কারণটাও শেষ। ও আর বাঁচবে না কারণ বাঁচার ইচ্ছেই ওর নেই। সে মারতে শিখেছে। মরতেও শিখেছে। এর শেষ গ্রেফতারিতে নয়, মৃত্যুতেই হতে চলেছে... ।"

কথাটা শেষ করতে-না করতেই এবার অধিরাজের ফোন সশব্দে বেজে ওঠে। একটু আগেই সে নিজের ফোনটাকে অ্যাকটিভ করেছে। হোয়াটস্‌অ্যাপের দিকে তাকিয়েই তার চোখ কুঁচকে যায়, "আবার পবিত্র মেসেজ করছে! কী হল হঠাৎ? নতুন কোনো অঘটন?"

সে তাড়াতাড়ি মেসেজটা খুলে পড়ল। উদ্বেগে তার বুকের মধ্যে একটা কম্পন হচ্ছিল। কে জানে, বার্নিং শিখ আক্রোশবশত আবার কাউকে ওপরে পাঠাল কিনা। কিন্তু পড়া মাত্রই ফিক্ করে হেসে ফেলেছে, "আর একজনও আজ নির্ঘাৎ মরবে। বউয়ের হাতে! দেখো, কী পাঠিয়েছে।"

অর্ণব সবিস্ময়ে মেসেজটা পড়ে। পবিত্র লিখেছে, "এখনই কয়েকঘণ্টার জন্য বাড়ি আসছি। মামার ভাগনেকে কিছুক্ষণের জন্য মামাবাড়িতে পাচার করে দাও। ফিলিং হর্নি। আজ আমি তোমাকে পাগল করেই তবে ছাড়ব।"

সে-ও এবার হেসে ফেলল। আচার্য স্যার রাজা আর রাজশ্রী নাম দুটোতে গুলিয়েছেন! মেসেজটা যাওয়ার কথা রাজশ্রী বউদির কাছে। উত্তেজনার চোটে চলে এসেছে 'রাজা'র হোয়াটস্‌অ্যাপে। দুটো নামের প্রথম কিছু অক্ষর এক হওয়ার ফলাফল!

অধিরাজ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ভাবল কী করবে। কারণ পবিত্র যাঁকে মেসেজ পাঠাচ্ছিল, তাঁর কাছে সংবাদটি যায়নি। উপরন্তু মেসেজটা এসেছে বসের কাছে। উত্তর দিলেও পবিত্র সেটা লক্ষ করে দারুণ লজ্জায় পড়বে। আবার ওকে না জানিয়েও উপায় নেই। পবিত্র যদি জানতেই না পারে যে এমন রোম্যান্টিক বার্তাটি আসল লোকের কাছে আদৌ পৌঁছয়নি, তবে কপালে দুঃখ আছে। মামার ভাগনে বাড়িতেই থাকবেন। উপরি পাওনা বউদির ঝাড়! দিনটাই চৌপাট।

অগত্যা সে অবশেষে ভেবেচিন্তে মেসেজটার রিপ্লাইয়ে লিখল, "এতে আর আশ্চর্যের কী আছে হর্নি খুড়ো? সানি লিওনির কসম, বিগত কয়েকবছর ধরে তুমি তো গোটা ব্যুরোর সবাইকে, এমনকি আমাকেও প্রতিদিন পাগল করেই ছাড়ছ।"

এত টেনশনেও এবার অর্ণবের বেদম হাসি পেয়ে গেল! অর্জুন কাপুরের এক্সপ্রেশনের কথা জানা নেই। কিন্তু এই মেসেজ পেয়ে পবিত্র-র কী এক্সপ্রেশন হতে পারে তা সে একেবারে দিব্যদৃষ্টিতে দেখে ফেলেছে।

* *

(২৮)

"একটা ব্যাড নিউজ আছে সরকার।"

ফোনের ওপ্রান্তে এডিজি সেনের বিধ্বস্ত কণ্ঠস্বর! যেন ওঁর মাথার ওপরই কোনো অ্যাটম বম্ব পড়েছে। কিংবা কেউ বুঝি হিমালয় সুদ্ধ গোটা ভারতবর্ষকেই উড়িয়ে দিয়েছে। এই কেসটায় এত অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটেছে, এত রক্তের গঙ্গা বয়েছে যে 'ব্যাড নিউজ'শব্দটা শুনলেই মনে হয় আবার কার সর্বনাশ হল! অন্তত শিশির সেনের গলার স্বরে মনে হল, বুঝি ওঁরই চরম সর্বনাশ হয়েছে।

এই মুহূর্তে অধিরাজ ও অর্ণব আবার ফরেনসিক ল্যাবের পথে। অধিরাজের নাকি আহেলির সঙ্গে কী দরকার আছে। প্রয়োজনটা এতটাই বিশেষ যে আর কাউকে বলা যাবে না। তার মাথায় যে কী ঘুরছে তা একমাত্র সে-ই জানে। অর্ণবকে যখন বলার তখন ঠিকই বলবে। তাই সে আর ও নিয়ে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেনি। তার ডিউটি সে নিশ্চুপে করতেই অভ্যস্ত। বেশি কৌতূহল কোনোদিনই প্রকাশ করে না। একটাই উদ্বেগ। এর আগের বার টাওয়েল ছোঁড়াছুড়ির ওপর দিয়েই ফাঁড়া গিয়েছে। এবার ল্যাব ভাঙাভাঙিই না হয়ে যায়!

ওদের গাড়ি যখন প্রায় ফরেনসিক ল্যাবের কাছাকাছি, ঠিক তখনই অধিরাজ একটা চাইনিজ রেস্টোর‍্যান্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একগাদা খাবার প্যাক করিয়ে আনতে গিয়েছিল। নিজে থেকেই বলল, "তুমিও লাস্ট কখন খেয়েছ মনে নেই। আমারও মনে পড়ছে না। আর মিস মুখার্জি এরপর বারো ঘণ্টা কিছু খেতে পারবেন না। একেই বার্নিং শিখ মাথার ওপর লাফাচ্ছে, তার ওপর খামোখা কানের কাছে কমপ্লেইনের রেকারিং ডেসিমালের ধ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা শুনতে আমি একটুও রাজি নই। যদিও আগেই ওঁকে লাঞ্চ করে রেডি হয়ে থাকতে বলেছি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি সেটা মোটেও করবেন না। অগত্যা ওঁর মুখ বন্ধ রাখার জন্যও চাইনিজ জরুরি। তোমারও ফেভারিট। তাই ওটাই নিয়ে আসি।"

কথাটা বলেই সে নেমে রেস্টোর‍্যান্টের দিকে চলে গিয়েছিল। অর্ণব সবে ভাবছিল যে এই বারোঘণ্টার চক্করটা কী! আহেলি মুখার্জি আগামী বারোঘণ্টায় কিছু খেতে পারবে না কেন! এমন কী হতে চলেছে এই বারো ঘণ্টায়? ভাবা তখনও শেষ হয়নি, ঠিক তখনই তার ফোন বেজে ওঠে। ডিসপ্লেতে এডিজি সেনের নাম দেখে অবাক হয়েছিল সে। সচরাচর উনি অধিরাজের সঙ্গেই কন্ট্যাক্টে থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন না পড়লে অর্ণবকে ফোন করেন না। অথচ আজ তাকেই ফোন করছেন। সে একটু চিন্তান্বিতভাবে ফোনটা তুলতে না তুলতেই উলটোদিক থেকে দুঃসংবাদের আভাস এল। অর্ণব সভয়ে বলে, "কী হয়েছে স্যার? আবার কোনো খুন...?"

"না। বার্নিং শিখ কেস রিলেটেড কিছু নয়। বাট স্টিল, ব্যাড নিউজ।"

রহস্যের পর রহস্য। এডিজি সেন নিজেই মাঝেমধ্যে অ্যালফ্রেড হিচকক হয়ে যান। বার্নিং শিখ রিলেটেড কিছু নয়, অথচ খারাপ খবর। সে আবার কী। এই তাণ্ডবের মধ্যেই আবার কোনো হাই প্রোফাইল কেস?

"আজ সকালেই প্রিয়া বাজাজ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন তাকে জেল থেকে হসপিটালে ট্রান্সফার করা হচ্ছিল। কিন্তু হসপিটালের পথেই সে পুলিশি হেপাজত থেকে, খোদ পুলিশের চোখেই ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। এ কাজ তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। সে যেমন ম্যানিপুলেশনে এক্সপার্ট, তাতে সন্দেহ হচ্ছে এর পেছনে আরও বড়োসড়ো হাত আছে। ইনফ্যাক্ট সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকার সম্ভাবনা প্রবল।"

ভগ্নদূত নয়, শিশির সেনের অবস্থা অবিকল কাটা সিপাহীর মতো। যেভাবে উত্তেজনার সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে গড়গড়িয়ে সংবাদটা পেশ করলেন, তাতে এই মুহূর্তেই তাঁকে আজ তক বা এবিপি আনন্দের লুফে নেওয়া উচিত। 'সর্বনাশিনী'-র পুলিশ হেপাজত থেকে পালিয়ে

যাওয়ার খবর যে সর্বনেশে তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। খবরটা শুনে অর্ণবেরই হৃৎপিণ্ডটা বিশাল হাইজাম্প দিয়ে উঠল। প্রিয়া বাজাজ ফেরার! তার মানে 'সর্বনাশিনী' আবার ফিরবে! এবার কী মূর্তি নিয়ে ফিরবে কে জানে! আগেরবার অ্যামাটক্সিন এক্স ছিল। এবার কী আসছে?

"শুধু তাই নয়, জেলে থাকাকালীনই তার কাছে একটা মোবাইলও ছিল। সঙ্গে একগাদা সিম। সেগুলো কে তাকে দিয়েছিল, কীভাবে দিয়েছিল, কিছুই জানা নেই। তবে মোবাইলটা পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। সিমগুলোও। সবকটা সিমে একটাই নম্বর সেভড। ব্যানার্জির। ব্যানার্জির ফোনে একাধিক কলও গিয়েছে ওগুলো থেকে। ক্যান ইউ বিলিভ ইট! জেলের মধ্যে কে তাকে ফোন বা সিম এনে দেবে? কে ব্যানার্জির নম্বর ওকে দেবে? পুলিশের ভেতরের লোক ছাড়া সম্ভবই নয়।"

আপনমনেই একগঙ্গা কথা বলে অবশেষে থামলেন এডিজি সেন। ততক্ষণে অবশ্য অর্ণবের যা বোঝার তা বোঝা হয়ে গিয়েছে। স্যার বলছিলেন ওঁর ফোনে অজানা নম্বর থেকে একটা ফোন আসছে, কিন্তু কেউ কিছু বলে না। সে স্বকর্ণেও সেই কলটা শুনেছে। ওপ্রান্তে নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। টুইঙ্কল ধমক দেওয়ায় ফোনটা কেটেও গিয়েছিল। মিলে যাচ্ছে। সবটাই মিলে যাচ্ছে। এখন অর্ণব নিশ্চিতভাবে জানে যে ওই ফোনটা কার ছিল। সে মৃদুস্বরে বলল, "স্যার।"

"এ বিষয়ে জেল অথরিটিকে জবাবদিহি তো করতেই হবে। তদন্তও হবে। সে আমি পরে দেখে নিচ্ছি। কিন্তু ভুললে চলবে না যে প্রিয়াকে ব্যানার্জিই ধরেছিল। ও টক্সিক মহিলা রিভেঞ্জ নেওয়ার চেষ্টা করবেই। সেজন্যই হয়তো ব্যানার্জিকে ফোনে ট্রাই করছিল। কিছু তো ওর উদ্দেশ্য আছেই। তবে এখনই ওকে এই নিউজটা দেওয়ার দরকার নেই। বার্নিং শিখ এই মুহূর্তে বার্নিং প্রবলেম। ও ওকে নিয়ে ব্যস্ত আছে থাকুক। আজকের রাতটা ভাইটাল, ব্যানার্জিকে ডিস্টার্ব করে লাভ নেই। তুমি এই খবরটা জেনে রাখো। সতর্ক থেকো। সুযোগ বুঝে সময়মতো ব্যানার্জিকেও জানিয়ে দিও।"

"ওকে স্যার।"

অর্ণব কথাটা বলামাত্রই এডিজি সেন লাইন কেটে দিলেন। এটাই ওঁর স্টাইল। উনি বিশেষ কিছু শুনতেও চান না, প্রয়োজনের বাইরে একটি শব্দও বলতে চান না। কিন্তু অর্ণবের মনের মধ্যে অনেক আশঙ্কা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর কেউ না জানুক, সে জানে প্রিয়া রিভেঞ্জ নিতে আসছে না। তার উদ্দেশ্য আলাদাই। এবং যতদূর তাকে চেনা আছে, নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সে যে কোনো পর্যায়ে যেতে পারে। বিষাক্ত সে বটেই। তার থেকেও বেশি বিষাক্ত ও ভয়াবহ তার ভালোবাসা। "হ্যালেলুয়া। রাইট হ্যান্ড টাইম।"

অধিরাজের কণ্ঠস্বরে অর্ণবের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। সে তাকিয়ে দেখে অধিরাজ একগাদা খাবারের প্যাকেট গাড়ির ভেতরে রাখছে। দুটো প্যাকেট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "চিকেন মোমো আর সেজওয়ান মিক্সড হাক্কা নুডলস উইথ ফিশ সুইট অ্যান্ড সাওয়ার। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। নয়তো মিস মুখার্জি নিজের প্যাকেটটা শেষ করে তোমার হাতও খামচে দিতে পারেন।"

অর্ণব একরকম জোর করেই মুখ থেকে চিন্তার ছাপ সরিয়ে ফেলে একটু হাসে। প্রিয়ার ফেরার হওয়ার কথা এখন অধিরাজকে বলা যাবে না। অপরপক্ষে চিকেন মোমোর সুগন্ধও তার নাকে এসে ঝাপটা মারল। পেটের ভেতর খিদেটাও চনমনিয়ে উঠেছে। সে একটু চুপ করে থেকে জানতে চাইল, "আপনি খেয়েছেন স্যার? সকালের স্যান্ডউইচ আর ডিমসেদ্ধ তো ফেরতই গেল।"

"আমিও খাবার নিয়ে এসেছি। যেতে যেতেই গিলে নেবো।" অধিরাজ মৃদু হাসল, "ডোন্ট ওরি।"

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন ওরা ফরেনসিক ল্যাবে পৌঁছোল, ততক্ষণে আহেলি তার সব কাজ শেষ করে একটা ফাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘড়ি দেখছে। তার পাশে

অতন্দ্র প্রহরীর মতো মিস মণীষা চক্রবর্তী। প্রণবেশ লাহিড়ীর টিমের দ্বিতীয় লেডি অফিসার। দুই মূর্তি গুটিগুটি পায়ে তার কাছে যেতেই একটু অনুযোগ মাখানো স্বরে বলল, "আপনারা পাঁচ মিনিট লেট! আমি এতক্ষণ ধরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সব দেখে টেখে রিপোর্ট তৈরি করে বসে আছি। আর আপনারা মনের সুখে মোমো খেয়ে বেড়াচ্ছেন।"

এই রে! সেরেছে। অর্ণব মনে মনে জিভ কাটে। মোমোর সসের গন্ধটা এতটাই তীব্র যে সহজে ঢাকা পড়ে না। সেইটা ঠিক মহিলার নাকে গেছে। অধিরাজের ভুরু কুঁচকে যায়, "শুধু মোমো কেন, আমরা এতক্ষণ মনের সুখে বার্নিং শিখের সঙ্গে হাডুডুও খেলে বেড়াচ্ছিলাম। আপনি খেলবেন? যদিও আপনার দ্বারা কোনো পয়েন্টই স্কোর হবে না। হামাগুড়ি দেওয়াই সার।"

আহেলি গুগলি খেয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমি কি তাই বলেছি নাকি? আমার বুঝি খিদে পায় না?"

"কেন?" সে ফের গম্ভীরভাবেই বলে, "আমি তো আপনাকে আগেই লাঞ্চ কমপ্লিট করে নিতে বলেছিলাম। বলিনি?"

"তার সঙ্গে একগাদা এভিডেন্সও তো ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো দেখতেও সময় লাগে৷ আমার দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত নেই।" আহেলি মুখভঙ্গি করেছে, "তার সঙ্গে তো হিটলার-মুসোলিনী মার্কা হুকুমও করে গেলেন যে বারোটার মধ্যে সব সেরে রাখতে হবে। রেখেছি, কিন্তু খাওয়ার সময় পাইনি।"

"বুঝলাম। ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্ট কী বলছে?"

"আপনার সন্দেহই সঠিক। প্রথম যে দুটো স্যাম্পল দিয়েছিলেন, দুটোই নিঃসন্দেহে এক লোকের। আর আত্রেয়ী মিঃ সরকারের হাতে যে ক-টা ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাঠিয়েছে, তার মধ্যে একটার সঙ্গে আগের দুটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট হুবহু মেলে। মানে ওই তিনটে আঙুলের ছাপই একজনের। শুধু তাই নয়, কৃপাণেও ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে। সেটা বার্নিং শিখ ছাড়া আর কারোর হওয়া সম্ভব নয়। সেটাও আগের স্যাম্পগুলোর সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলছে। আমি অনেকবার চেক করেছি। সবক-টা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেম। সেক্ষেত্রে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে সবকটা আঙুলের ছাপই বার্নিং শিখের।"

সে থেমে যোগ করে, "কৃপাণ আর তরোয়ালগুলোতে ব্লাড ট্রেস আছে। ডি.এন.এ.-ও পেয়েছি। ওগুলোই নিঃসন্দেহে মার্ডার ওয়েপন। তবে ডি.এন.এ. অ্যানালিসিস এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়...।"

"ওসব পরে হলেও চলবে।" অধিরাজ হাত বাড়িয়ে তার হাতের ফাইলটা নিয়ে একঝলক চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বেশ সন্তুষ্ট ভঙ্গিতেই বলল, "ফাইন। ভেরি গুড ওয়ার্ক ইনডিড। আসুন!"

বলতে-বলতেই সে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিয়ে সসম্মানে দীর্ঘদেহটা ঝুঁকিয়ে 'বাও' করে বলল, "প্লিজ, অ্যাবোর্ড।"

আহেলি তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। এই লোকটা যতই ট্যারাবাঁকা হোক না কেন, এই ভদ্রতাগুলো তার ভারি ভালো লাগে। সচরাচর খুব কম লোকই এগুলো করে। কোনো রেস্টোর‍্যান্টে গেলে সঙ্গের নারীটির জন্য সিট টেনে ঠিকঠাক করে দেওয়া, লিফটের, ব্যুরোর বা যে কোনো জায়গার দরজা খুলে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে সসম্মানে 'আফটার ইউ' বলা, মহিলা অফিসার চুরুট ধরানোর জন্য লাইটার খুঁজে না পেলে স্বহস্তে তার চুরুটটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়তো এগুলো কিছুই নয়। তবে এগুলো অধিরাজের অভ্যাস। তার সঙ্গের লেডি অফিসাররাও এই ভদ্রতার কথা সবসময়ই বলে। আত্রেয়ীর মুখে তো শোনেইই। এখন টুইঙ্কলও এগুলো বলে বলে তার কান মাথা খেয়ে ফেলেছে। তার বক্তব্য, "সি.আই.ডি. হোমিসাইডে এমন একখানা পারফেক্ট জেন্টলম্যান আছে তা জানাই ছিল না! যতদিন ধরে কাজ করছি, ততদিন শুধু 'ধুর-ছাই'-ই শুনে এলাম। লাহিড়ী স্যার তো মনে করেন লেডি অফিসাররা নাকি 'আই ক্যান্ডি'। দাঁড়িয়ে থাকলে দেখতে ভালো লাগে ঐ পর্যন্তই। কোনো

কাজেরই না। আর বাকিরা স্মোক করলে ট্যারা চোখে তাকায়, বাঁকা হাসি হাসে। দিদি, এই প্রথম জিন্দগিতে জানলাম, মেয়েদেরও কিছু সম্মান আর ইচ্ছে আছে। তারাও আজাদ। আজ পর্যন্ত সবাই আমার এই ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পাওয়া নিয়ে স্রেফ মজাক্ উড়িয়েছে। এই প্রথম কাউকে দেখলাম যে আমার ওপর না হেসে একগাদা খাবারের বন্দোবস্ত করে রাখল। যারা স্যারের সঙ্গে কাজ করে তারা খুব লাকি।" এগুলো যে আহেলির অজানা তা নয়। শুধু এইটুকুই নয়, এক অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী নারীকে অধিরাজ গিটার বাজিয়ে এলভিসের গানও শোনাতে পারে সে সাসপেক্ট হওয়া সত্ত্বেও। এক বৃদ্ধা অপরাধীর শেষ সময়ের আরামের জন্য নিজেই দায়িত্ব নিয়ে হাউজ অ্যারেস্টের বন্দোবস্ত করে। এসবই তার জানা। সেজন্যই লোকটাকে আরও ভালো লাগে। কিন্তু ব্যাটা বুঝলে তো। সবসময়ই যে কেন যুদ্ধং দেহী মোডে থাকে কে জানে!

"নট ব্যাড!"

আহেলি গায়ের শালটা ভালো করে পেঁচিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। অধিরাজ ফের সেই সবুজ কাশ্মীরী শালটা দেখে মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। একঝটকায় যেন সারা পৃথিবী দুলে উঠল। মাথার ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করছে। তার চোখের সামনে হুট করে ভেসে উঠল অদ্ভুত কিছু দৃশ্য। এমনই একটা সবুজ রঙের শাল... একটা আবছা অবয়ব... একটা নিরাপত্তা ঘেরা উষ্ণ আলিঙ্গন... স্নেহমাখা কয়েকটা শব্দ...কী ছিল?...কী যেন ছিল.... .... আলতো পারফিউমের গন্ধ...। এসব কী! কবে হল। কখন...?

সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আহেলির গায়ের শালটার দিকে তাকিয়ে থাকে। পরিচিত ঠেকছে। ভীষণ চেনা চেনা লাগছে। একটু ইতস্তত করে বলল, "মিস্ মুখার্জি, এই শালটা আপনার?"

আহেলি ও অর্ণবের মধ্যে শঙ্কিত দৃষ্টি বিনিময় হয়। এই সবুজ রঙের দামি শালটার কথা কি মনে পড়ছে অধিরাজের? কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যে একটা যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাসও জুড়ে রয়েছে। শালটার কথা মনে করিয়ে দিলে আবার সেই ট্রমা ফিরে আসবে না তো! এখনও সে দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার কথা ভুলে উঠতে পারেনি। ক্ষত এখনও তাজা! আবার যদি তার ওপর আঘাত পড়ে?

"আজ্ঞে না।" আহেলি মাথা নাড়ল, "এটা আমি 'শোলে' ফিল্মের সঞ্জীবকুমারের কাছ থেকে ধার নিয়েছি। ইয়ে শাল মুঝে দে দে ঠাকুর।"

অধিরাজের দৃষ্টি একটু বিহ্বল আর দুর্বল হয়ে এসেছিল। এবার খোঁচা খেয়ে প্রখর হয়ে উঠল। তেলেবেগুনে জ্বলে বলল, "আপনি সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে পারেন না? সবসময়ই জলেবি বাঈ হয়ে আছেন!"

"এটা কোন্ দিক দিয়ে সোজা কথা?" আহেলি নাকের পাটা ফুলিয়েছে, "আমিই যখন গায়ে দিয়েছি তখন আমার শালই তো হবে। থোড়াই প্রতিবেশীর শাল গায়ে দিয়ে আসব! আর এই শীতে শাল পরব না তো কি বিকিনি পরব?"

"এর মধ্যে বিকিনি কোথা দিয়ে টপকে পড়ল?" সে বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করাই ঝকমারি দেখছি। প্লিজ উঠুন।" বলতে-বলতেই লেডি অফিসারটির দিকে তাকিয়েছে, "আপনিও সেনোরিটা। প্লিজ অ্যাবোর্ড।"

মিস্ চক্রবর্তী গাড়িতে উঠতে উঠতেই স্বপ্নালু দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকিয়ে আহেলির কানে ফুসুর ফুসুর করে, "হাউ সুইট! উনি কী ভদ্র তাই না? আর কী মিষ্টি করে ডাকেন সেনোরিটা!"

লেডি অফিসারের আদিখ্যেতা দেখে চিড়বিড়িয়ে ওঠে আহেলি। তার মনের ভেতরটা যথারীতি কুটকুট করে উঠেছে। সে একটু কঠিন স্বরে জানায়, "সুইটের কিছু নেই। নির্ঘাত আপনার নাম ভুলে গিয়েছেন। তাই ওইসব সেনোরিটা, মাদমোয়াজেল দিয়ে মেক-আপ করছেন। উনি সবসময়ই লেডি অফিসারদের নাম ভুলে মেরে দেন। তাই ওইসব ভুজুং ভাজুং!"

মিস চক্রবর্তী একটু অপ্রস্তুত হাসল। কিন্তু তার চোখের স্বপ্নালু ভাব যায়নি। অধিরাজ

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। তার পাশের সিটে অর্ণব সিটবেল্ট বাঁধতে ব্যস্ত। সে একটু উচ্চস্বরেই বলে, "মিস মুখার্জি, আপনার পেছনের সিটটাতে দেখুন চাইনিজের প্যাকেট আছে। মোমো, নুডলস্, ব্লা ব্লা। আপনার আর সেনোরিটার, দু-জনের জন্যই আছে। আর অর্ণব আর আমি আগেই খেয়ে নিয়েছি। আপনার খাবারের দিকে তাকানো তো দূর, গন্ধও শুঁকবো না। তাই কারোর হাত খামচে, আঁচড়ে বা কামড়ে দেওয়ার দরকার নেই। আপনি নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।"

বেচারা অর্ণব সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতেই অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে একবার পেছন দিকে তাকিয়েছিল। অধিরাজের কথাটা কানে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ টুই করে দ্রুতবেগে মুণ্ডু ঘুরিয়েও নিয়েছে। কিন্তু আহেলির শ্যেন দৃষ্টিতে তা এড়ায়নি। এমনিই খামচা মারার কথা শুনে সে চটেইছিল। তার ওপর অর্ণবকে তাকাতে দেখে আঙুল তুলে বলে উঠল, "ওই যে, উনি তাকাচ্ছেন!"

অধিরাজ আড়চোখে অর্ণবের দিকে তাকায়। অর্ণব অপ্রস্তুত। মিউমিউ করে বলল, "স্যার, আমি তো এমনিই...!"

"অর্ণব! ভেরি ব্যাড!"

তার মুখ গম্ভীর। সে আহেলির দিকে না তাকিয়েই বলে, "এখন তো তাকাচ্ছেন না। এখন আপনি নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।"

"আগে তো তাকিয়েছেন। নজরও দিয়েছেন।" আহেলি নাছোড়বান্দা, "এখন যদি আমার পেট খারাপ হয় তবে তার দায় কে নেবে?"

এ তো মহা জ্বালা! এইবার অধিরাজ বিরক্ত হয়ে প্রায় পঁচাত্তর ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আপনার পেট খারাপের জন্য অর্ণব, অর্ণবের চোদ্দোপুরুষ, আমি এবং আমার সাড়ে চোদ্দশো পুরুষ, গোটা পশ্চিমবঙ্গ, গোটা ভারতবর্ষ, চায়না ও তাদের ক্যুইজিন, চাইনিজ শেফদের বাপ-ঠাকুর্দা, গোটা বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ড, আমীর খানের 'পিকে' আর হৃত্বিক রোশনের 'যাদু', স্টিভেন স্পিলবার্গের 'ইটি' আর জুরাসিক পার্কের ডাইনোসররা, সবাই দায়ী থাকবে। স্যাটিসফায়েড? এখন দয়া করে ঠুসুন। কারণ এরপর দশ-বারো ঘণ্টা আর কিছু খেতে পাবেন না। জলও নয়। এখন থেকেই বলে রাখলাম। কোনো কমপ্লেইন শুনতে চাই না।"

"দশ-বারো ঘণ্টা!" সে ব্রহ্মতালুতে চোখ তুলে ফেলেছে, "কেন? কেন খেতে পাব না শুনি? আমার কি খিদে পেতে পারে না? কী এমন রাজকার্যে যাচ্ছি আমরা?" "আমরা নই, আপনি যাচ্ছেন। আমার বন্ধু প্রীতমের পার্লারে। কিঞ্চিৎ সাজুগুজু করতে।" সে দায়সারা ভাবে জবাব দেয়, "পার্লার বলছি বটে। তবে ওটা আস্ত একটা মেক-ওভার স্টুডিও। আর প্রীতম নামকরা মেক-আপ আর্টিস্ট। বহুবছর মুম্বাইয়ে কাজ করেছে। এখন কলকাতায় আছে। আপনার ওপর ও-ই একটু ডিজাইন করবে।"

"অ্যাঁ!"

আহেলি আর অর্ণব দু-জনেই শব্দটা একসঙ্গে উচ্চারণ করে। অর্ণব ব্যোমকে ব্যোমকেশ হয়ে গিয়েছে। আহেলি বিস্ময়ে প্রথমে কোনো শব্দই খুঁজে পায় না। তারপর কোনোমতে বলল, "আমি একটা কথা বলব?"

অধিরাজ ঠোঁট টিপে হাসল, "তাহলে এতক্ষণ ধরে কে বকছিল? শামস্ তাহির খানের ভূত?"

"এত কিছু থাকতে মেক-আপ করব কেন? তাছাড়া দশঘণ্টা ধরে তো বিয়ের কনেরাও বোধহয় মেক-আপ করে না।"

"না। কনেরা করে না।" সে রহস্যময় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে, "কিন্তু ভূতেরা করে। বার্নিং শিখের ভূতকে ভয় দেখাতে একমাত্র আপনিই পারবেন। বিশেষ কিছু করতে হবে না। ওই বড়ো বড়ো জায়ান্ট স্কুইডের মতো চোখ পাকিয়ে তাকালে ও বেচারিরও কালঘাম ছুটে যাবে।"

"মানে?"

সে যথারীতি ফের অ্যাংরি বার্ডের মতোই ভয়াবহ মুখ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই অধিরাজের ফোন ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছে। বিশ্বজিৎ ফোন করছে। এই ফোনটার প্রতীক্ষাতেই সে এতক্ষণ অধীর আগ্রহে বসেছিল। তাড়াতাড়ি কলটা রিসিভ করে বলল, "হ্যাঁ বিশ্ব...!"

বিশ্বজিৎ ওপ্রান্ত থেকে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে, "ভাইয়োঁ ঔর প্যায়ারি বেহনোঁ, আপনে যো ইতনা প্রেম ঔর উৎসাহ ভরা সোয়াগত্ কিয়া উসকে লিয়া ম্যায় আভারি হুঁ, ঔর আপকো ধন্যওয়াদ দেতি হুঁ। অব বতাইয়ে আপকে লিয়ে ম্যায় ক্যায়া কর সকতি হুঁ?"

তার বলার ভঙ্গিতেই অধিরাজ বুঝে গেল যে প্রয়োজনীয় অডিও ফাইলগুলো বিশ্ব-র কাছে এসে পৌঁছেছে। ও ইন্দিরা গান্ধীর বিখ্যাত স্পিচ থেকেই ডায়লগ দিচ্ছে। সে খুব উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "ইয়ে ক্যায়া কর রহে হো?"

"হেঁ!" বিশ্বজিৎ-ও অবাক, "ম্যায়নে ক্যায়া কিয়া?"

"কুছ নেহি কিয়া। পর করনা তো পড়েগা না? ইসি লিয়ে তো পুঁছ রহা হুঁ। ইয়ে ক্যায়া কর রহে হো?"

বিশ্ব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে হেসেই ফেলল। সে জিনিয়াস টেক এক্সপার্ট। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে। হাসতে হাসতেই বলল, "ওকে বস্। গট্ ইট। কর রহা হুঁ।"

"গুড।"

সে ফোনটা নামিয়ে রেখে ড্রাইভিংয়ে মন দেয়। উপস্থিত তিনজন নারী-পুরুষ পরস্পরের মুখ দেখছে। কেউই কিছু বোঝেনি যে ওদের মধ্যে কোন্ কথার আদানপ্রদান হল। কেনই বা হল! এই কনভার্সেশনের ভেতরের ইঙ্গিত বিশ্বজিৎ নিশ্চয়ই বুঝেছে। কিন্তু আহেলি বা অর্ণব কিছুই বোঝেনি। মিস মণীষা চক্রবর্তীও অবশ্য বোঝেননি। তবে তিনি বিশেষ বোঝার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না। আপাতত লেডি অফিসার মোমো নিয়ে মহাব্যস্ত।

"লিসন ভেরি কেয়ারফুলি।" অধিরাজ এবার ড্রাইভ করতে-করতেই বলল, "বার্নিং শিখ আসলে ১৯৮৪ সালের ভূত। ভূত বলতে আমি 'ঘোস্ট' নয়, 'পাস্ট'কে বোঝাচ্ছি। ভূতকাল। সে ১৯৮৪ সালের ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে। তাই তাকে শেষ করার জন্য সেই ১৯৮৪ সাল থেকেই আর এক ইতিহাসকে তুলে আনতে যাচ্ছি আমরা। বলা যায়, আর একজন ভূতকে আমদানি করছি। এই ভূতের সামনেই একমাত্র হার মানতে পারে বার্নিং শিখ। আমরা তাকে হারাতে পারব না। কিন্তু মিস্ মুখার্জি...।" বলতে বলতেই সে গভীর দৃষ্টিতে ফের আহেলির দিকে তাকায়। সবুজ রঙের শালটা চোখে পড়তেই আবার যেন একটু অস্থিরতা ছুঁয়ে গেল তাকে৷ আজকাল কী যে হচ্ছে কে জানে! তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "আজ এই গল্পের শেষ আপনাকেই করতে হবে। আপনিই আজকের হিরো। শো স্টপার। যদি সামান্যতম ভুলও করেন তবে সব কিছু জলে যাবে। আপনার কাঁধের ওপরই এখন গোটা সি.আই.ডি. হোমিসাইডের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার দায়ভার।"

আহেলির চোখের রং বুঝি একটু গাঢ় হয়ে আসে। এরকম অপ্রত্যাশিত সংবাদে একটু নার্ভাসও। তবু দুরন্ত সাহসে বুক বেঁধে দৃঢ়ভাবে বলল, "আমাকে কী করতে হবে?"

"সব বলে দেব। বুঝিয়েও দেব। শুধু ভয় পাবেন না।"

মিস মুখার্জি মৃদু হাসল, "নাঃ। ভয় পাবো না।"

"সাউন্ডস গ্রেট।" বলতে-বলতেই সে ফের চোখ কুঁচকেছে, "বাই দ্য ওয়ে, আপনার এই শালটার ডানকোণে কি কোনো ইনিশিয়াল আছে? স্টিচ বা ট্যাটু করা? কবে কিনেছেন এটা?"

অধিরাজ আবার শাল নিয়ে পড়েছে দেখে আহেলি মনে মনে প্রমাদ গোণে। এখনই সব কিছু তাকে বলা উচিত হবে না। এখনও সে ডঃ মনোহর চৌধুরীর ট্রিটমেন্টে আছে। যা অবচেতনে আছে তাকে বাইরে এনে কাজ নেই। হিতে বিপরীত হতে পারে। তাই চেপে যাওয়াই ভালো। সে মৃদু স্বরে বলে, "দশ-বারোদিন আগেই কিনেছি। ইনিশিয়াল বা ট্যাটু জাতীয় কিছুই নেই। এরকম শাল তো রাস্তাঘাটে আকছার দেখা যায়। খুবই কমন। কেন

বলুন তো?”

অধিরাজ একটু যেন হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল। কেন জিজ্ঞাসা করছে, কী জিজ্ঞাসা করছে তা নিজেও বুঝতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে এই শালটাকে সে ভীষণ কাছ থেকে চেনে। দেখেছে, অনুভবও করেছে। আর চকিতে একবার মনে হল, একটা ইনিশিয়ালও বোধহয় ওর গায়ে থাকার কথা। অক্ষরগুলো ঝাপসা। তবু কিছু বুঝি ছিল...!

সে ড্রাইভিং করতে করতেই বলল, “নাঃ। কিছু না। আমারই ভুল।”

(২৯)

আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তা! কোনোদিন ভুলব না লোকটাকে। ওকে ভোলা সম্ভবই নয়। এখনও লোকটা একটুও পালটায়নি। পার্টি বদলেছে, চোলা বদলেছে কিন্তু 'তেবড়' একই। যতবার ও সামনে আসে, হাতদুটো নিষপিশ করে। মনে হয়, এখনই গলা টিপে মারি। হারামখোর সরতাজকে কীভাবে মেরেছিল....! ধোঁকা দিয়ে, ভুলিয়ে ভালিয়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করে...!

আজকাল কাউকে দেখলে সরতাজকে বড্ড মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই খতরনাক চাল, যুদ্ধ করার যজবা, সহজে হাল না ছাড়ার জিদ, মাটি কামড়ে পড়ে থাকার অনমনীয়তা, বাঘের মতো জ্বলজ্বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দুই চোখ! মনে হচ্ছে একটা মানুষেরই বহুযুগ পরে রিপিট টেলিকাস্ট দেখছি। মাঝেমধ্যেই ভুল হয়ে যাচ্ছে। আর এই ভুলই কখনও কখনও দুর্বল করে দিচ্ছে আমায়। ঠিকমতো যুদ্ধটাও করতে দিচ্ছে না। শত্রুর 'হোঁশ'' আর 'জোশ' দুইয়েরই প্রশংসা করে ফেলছি, যা আদৌ করাই উচিত নয়। দুশমন তো দুশমনই। তাকে সমূলে উৎখাত করে দিতে হয়। তার বীরত্ব, সাহস, লড়ে যাওয়ার ক্ষমতার তারিফ করতে নেই। বাপু তো বলেছিল, শিখরা নিজেদের শত্রুদেরও সম্মান করতে জানে। কিন্তু বাস্তব আমাকে তা শেখায়নি। শুধু শিখেছি, দুশমনের শেষ রাখতে নেই। ছলে, বলে, কৌশলে তাকে পরাস্ত করতেই হবে। যে করেই হোক, হয় আমি তাকে শেষ করব, নয় সে আমায় শেষ করবে। এই দুই 'নতিজা'র মাঝামাঝি আর কোনো রাস্তাই নেই। মাঝখানের রাস্তাতেই তো হেঁটেছিল বাপু, সরতাজরা। সন্ধি করতে গিয়েছিল। 'সুলাহ' করে অনেকগুলো মানুষের প্রাণ বাঁচাতে চেয়ে মধ্যমপন্থী হয়েছিল ওরা সবাই। তাতে ফায়দা কী হল?

এখন প্রায়ই স্বপ্নের মধ্যে দিদি এসে হাজির হয়। যসমিত দিদিকে স্পষ্ট দেখতে পাই। কুচকুচে কালো লম্বা বিনুনিটাকে ঝাঁকিয়ে বলে, "ও গুল্লু। কবে আসবি রে? আমরা তো সব ইন্তেজার করছি। দৌড়কে ইখে হমরা নাল আ যা না!

দিদি থাকলে এতদিনে আমি কোনো চঙ্গা মুন্ডা বা চঙ্গি কুরির মামা তো হতামই, এমনকি তাদের বাচ্চাদের 'নানাজি' বা 'দাদাজি'-ও হয়ে যেতাম। ছোটো ছোটো ফুলের কুড়ির মতো শিশু আমার কোলে খেলা করত। তাদের খিলখিল হাসিতে ঘর ভরে উঠত। যস্যিদিদি নিশ্চয়ই এতদিনে অন্যান্য মাঝবয়সী 'কৌর দের মতোই একটু ভারি চেহারার হয়ে যেত। রংটা মোটা হওয়ার জন্য আরও ফেটে পড়ত। মাথার চুলে নিশ্চয়ই অনেক রুপোলি ঝিলিক দেখা যেত। চোয়াল আর গাল একটু বেশি ভারি হত, যেমন পাঞ্জাবি মেয়েদের হয়। ছেলেপুলে, নাতিপুতি নিয়ে জিজার সঙ্গে সুখে সংসার করে ভারিক্কি গিন্নী-বান্নি হয়ে যেত এতদিনে।

আমি দিদির সেই সুখী সুখী গিন্নিমার্কা ডাকসাইটে জাঁদরেল চেহারাটাকে কল্পনা করার অনেক চেষ্টা করেছি। অথচ কিছুতেই পারি না। বরং যসমিত দিদির বয়েসও বাড়ে না, তাকে কারোর বেবে বা দাদি, নানির মতোও দেখায় না। অতীতের বুক থেকে ভেসে ওঠে সেই চিরযৌবনা যসমিত কৌর যার বয়েস একদিনেই থমকে গিয়েছিল চিরদিনের জন্য। আমি দিদিকে বলি, "দাঁড়া যস্যিদিদি, সবর কর। তুই তো এখনও একইরকম আছিস্। কিন্তু তোর নান্না ভাই তো আর ছোটো নেই। বুড়ো হয়ে গেছে। এ কী সেই পুঁচকে ছেলেটাকে পেয়েছিস যে একলাফে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোর কোলে? বয়েস হয়ে গেছে রে। নড়তে চড়তে একটু তো ওয়াক্ত লাগবেই।"

দিদি মুচকি হাসে, "বুডটা হয়েছিস বলে এত দুঃখে মরছিস কেন রে শুরু? বুড়ো হয়ে মরার যে কী সুখ তা তো আমাদের জানাই হল না। তোর 'অচ্ছি কিসমত' যে বুড়ো হওয়ার সুযোগ পেয়েছিস। গোটা জীবন, জওয়ানি, উমর বাড়া, তজুরবা, বুঢ়াপার সব সুখ

পেয়েছিস। আমাদের তো জানাই হল না, আস্ত একটা জিন্দগি শুরু থেকে একেবারে শেষ অবধি মৌজ সে কাটাতে কেমন লাগে।"

ওর কথা শুনে ভীষণ অপরাধবোধে ভুগি। সত্যিই তো। অন্যায়ভাবে এতখানি উমর অবধি বেঁচে থেকে বড়োই জুর্ম করেছি। আমার তো বচপন থেকে জওয়ানিতে আসারই কথা নয়। সবার ক্ষেত্রে সময় থমকে গেল। শুধু ওদের বঞ্চিত করে আমি থামলাম না। ওরা সবাই চলে গেল, একা আমিই ফাঁকি দিয়ে রয়ে গেলাম। নতুন জীবন শুরু করলাম। বাঁচলাম। যতটুকু প্রাণ ভরে নেওয়ার ছিল, দুনিয়ার রং-রূপ সব ভোগ করলাম। অন্যায় নয়?

আমি ফিশফিশ করে দিদিকে বলি, "দাঁড়া যস্যিদিদি। আর শুধু শেষের কয়েকঘণ্টা বাকি। জিতে গেলে ভালো। নয়তো তোদের কাছেই তো আসব।" শেষের কয়েকঘণ্টা গুল্লু?"

সে মৃদু মৃদু হাসে, "

শেষের কয়েকঘণ্টা। শুনতেই যেন খুন ফের গরম হয়ে উঠল। হ্যাঁ, সেই ধ্বংসাত্মক দিনগুলোর শেষের কয়েক প্রহর। আখরি কুছ ঘন্টে। কেমন ছিল? মানুষ এখন আর সেসব কথা নিয়ে ভাবে না। ও তো কোন্ জন্মের ইতিহাস! কোথায় ছিল তখন মানুষের প্রতিবাদ? সোশ্যাল মিডিয়ার দাপাদাপি। কোথায় ছিল মোমবাতি মিছিলের ঘটা! উঁচুতলার মানুষেরা, সেলিব্রিটিরা কেউ কোনো কথা বলেননি। 'দিখাওয়া'র আঁসুও টপকাননি। কেউ প্রতিবাদ করেননি। আজ কোনো মেয়ের বলাৎকার-খুন হলে মানুষ প্রতিবাদে নামে। ফেস্টুনে রাস্তা ঢেকে যায়। টিভিতে, খবরের কাগজে সেই নিয়ে 'গ্যায়মা-গ্যায়মি'চলতে থাকে। অথচ তখন কতহাজার 'কৌর' বিধবা হল, ধর্ষিতা হল, খুনও হল। তিনহাজার শিখের মৃত্যু কিংবা মতান্তরে পাঁচহাজার-কোনোটাই খুব কম নয়। তাও এটা সরকারি হিসাব! বেসরকারি অঙ্কটা গোণার চেষ্টা না করাই ভালো। আর সমস্ত দেশ মিলিয়ে পনেরো থেকে আঠেরো হাজার। আমরা শেষ হলাম। কতগুলো নিরপরাধ 'মাসুম'আদমি-ঔরতের রক্তে ভেসে গেল গোটা দিল্লি। তা নিয়ে দিল্লির রাজপথে একটা 'বাগী' প্ল্যাকার্ডও তো চোখে পড়ল না! যারা বিচার চেয়ে পথে নেমেছিল, তারা সেই অত্যাচারিত শিখেরই অবশিষ্ট পরিবার। এছাড়া একটিও মানুষ মোমবাতি তো দূর 'মাচিস' নিয়েও তাদের পাশে দাঁড়ায়নি। যেন শিখ প্রজাতিটা এ দেশের কেউ নয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে 'খালিস্তানের' দাবি করে কিছু হারামখোর 'শিখ'দের আগেই ভারতবর্ষের থেকে আলাদা করতে চেয়েছিল। এবার বেয়ন্ত সিং ও সতবন্ত সিং-এর কর্তৃত্বে যেন বাস্তবেই আজন্ম হিন্দুস্তানি শিখেরা ভারতের হৃদয় থেকে খসে পড়ল। বরং কিছু লোক এটাকে পলিটিক্যাল ইস্যু করে নাচানাচি করেছিল। বিরোধী দল রাজীব গান্ধীর সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল। ব্যস্। ওখানেই সব শেষ! রাজীব গান্ধী বললেন, ***"একটা বড়ো গাছ উপড়ে পড়লে মাটি তো কাঁপবেই!"*** ওটাই তাঁর জবাব।

এখন ভাবলে বুঝি সাচি বাত। মাটি তো কেঁপেছিলই। ধরিত্রী মায়েরও রুহ কেঁপেছিল সেই মৃত্যুমিছিল দেখে। কিন্তু 'দাঙ্গাই'দের হাত কাঁপেনি। নিরীহ, গরীব শিখদের ধড় থেকে মাথা উড়িয়ে দিতে তাদের বুকও কাঁপেনি। ওরা কারা ছিল যারা প্রিয় নেত্রীর মৃত্যুর বদলে 'খুন কা বদলা খুন' নারা লাগিয়ে ফিরে ফিরে আসছিল? ওরা কি আদৌ কোনো নির্দিষ্ট দলের মানুষ? কিছু শোকার্ত, ক্রুদ্ধ মানুষের দল? সজ্জনকুমার, এইচ কে এল ভগৎ কিংবা জগদীশ টাইটলারের মতো 'বরিষ্ঠ' নেতারা শিখ পুরুষদের টার্গেট করেছিল। তারা বুক ফুলিয়ে সে কথা প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছে। পাগড়ির 'কিমৎ' লাগিয়েছিল ওরা। তবে চুনরি বা দুপাট্টার কিমৎ কে বা কারা লাগাল? সর্দার গদ্দার হ্যায় স্লোগান তবু বুঝি। কিন্তু কৌররাও কি গদ্দার ছিল?

এখানেই দিল্লির সেই দাঙ্গাইদের দ্বিচারিতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। কিছু জায়গায় 'দাঙ্গাইরা' শিখ পুরুষদের মেরে ধরে, কুপিয়ে জ্বালিয়ে খুন করে, তাদের ঘর লুটপাট করে, ঘর জ্বালিয়েই ক্ষান্ত দিয়েছিল। মেয়েদের গয়নাও কেড়ে নিয়েছিল কিন্তু কৌরদের 'ইজ্জত' নিয়ে টানাটানি করেনি। নিষ্ঠুরভাবে তাদের চোখের সামনে গোটা পরিবারকে শেষ করে দিলেও বিধবাদের

'ইজ্জত' আর 'জান' বখ্শ্ দিয়েছিল। মেয়েরা অন্তত বুক চাপড়ে কেঁদে 'ইনসাফ' চাওয়ার জন্য বেঁচে ছিল। দিল্লির তিলকবিহার *'উইডো কলোনি'* অন্তত সেই প্রমাণই দেয়। দিল্লির কিছু কলোনির সৌভাগ্যবতী কৌররা নিস্তার পেয়েছিল এই 'মর্'-এর হাত থেকে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল দিল্লিতে একটিও শিখ পুরুষকে জিন্দা না রাখা। মেয়েরা টার্গেট ছিল না।

কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় ছবিটা একদমই উলটো। কলোনির পর কলোনি নারীদের বিকৃত, 'নাঙ্গা', রক্তমাখা -ছিন্নবিচ্ছিন্ন, দলিত-মথিত শবদেহে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমি হলফ করে বলতে পারি, ওরা কোনো শোকার্ত কিংবা ক্রুদ্ধ প্রতিশোধকামী মানুষ ছিলই না যারা 'ইন্তেকামে'র আগুনে জ্বলছিল। ওরা না কোনো দলের, না কোনো রঙের। কিছু বিকৃতমস্তিষ্ক সুবিধাবাদী 'হ্যায়ওয়ান' ওই ভিড়ের মধ্যেই নিজেদের শয়তানি লালচ আর হওয়স্ নিয়ে ঢুকে পড়েছিল। তাদের না ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুতে কোনো শোক ছিল, না শিখদের বিরুদ্ধে কোনো 'ইন্তেকাম'। ওদের পলিটিক্যাল কোনো এজেন্ডাই ছিল না। তারা ঢুকেছিল এই সুযোগে মেয়েদের সর্বনাশ করে, তাদের ছিঁড়েখুঁড়ে নিজেদের হ্যায়ওয়ানিয়তের ভুখ আর বিকৃত হওয়স্ মেটাতে। এরকম রাক্ষস সব ভিড়ের মধ্যেই নিজের আশ মেটাতে ঢুকে পড়ে। আর 'ভিড়' পদার্থটা এমনই মূর্খ যে কিছুই না বুঝে এদের বেশি বেশি করে প্রশ্রয় দেয়। রাগের মাথায় ভেবেও দেখে না, কতগুলো ক্রিমিনাল ওদের দলে লুকিয়ে ঢুকে আছে! তখন পুলিশ, প্রশাসনের মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। তারাও এই ক্রিমিনালদেরই বাড়তে দিয়েছিল, আমদানিও করেছিল। যার ফলাফল সবাই না ভুগলেও অনেক কলোনিই ভুগেছিল! সেই হতভাগ্যদের মধ্যে আমরাও ছিলাম...।

খুন সে লপত বাপুর চেহারাটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তাঁর কান্না কিছুতেই থামছিল না। সরতাজের রক্তমাখা লাশটার ওপর ভিড়ের নৃশংস অত্যাচার তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। একটা মানুষের 'মওত' হয়ে যাওয়ার পরও তার মৃতদেহকে কেউ এমন অপমান করতে পারে। এত গায়ের জ্বালা কীসের যে প্রাণহীন শরীরটাকেও বেইজ্জত করতে ছাড়বে না!

কলোনির লোকেদের মুখে কথা সরে না। সবাই ভেতরে ভেতরে সাময়িক শান্তি পেয়েছিল যে হয়তো মিটমাট হয়ে গেলে এবারের মতো প্রাণটা রক্ষা পাবে। কিন্তু 'সুলাহ'-এর বাহানার পেছনে যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ছিল তা বুঝতে পেরে তারা সবটাই আগে থেকে পরিকল্পনা করা। এই অবস্থায় ভিড় আমাদের মারতে এলে ওরা বাধা তো দেবেই না, বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। হাথিয়ার 'জব্দ' করা, সরতাজকে আমাদের থেকে আলাদা করা, শিখদের নির্বিঘ্ন, নিরস্ত্র করে দেওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, নিরাপত্তা দেওয়া নয়। আর আমরাও ওদের ওপর, সিস্টেমের ওপর অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছিলাম। কত বড়ো ভুল সিদ্ধান্ত। যার মাশুল এবার গুণতেই হবে।

তাওজি এবার মরিয়া হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। তরোয়াল, লাঠি, চাপাতি দিতে হবে না সাব। কৃপাণগুলো তো অন্তত দাও। অন্যগুলো ঔজার বা হাথিয়ার হতে পারে। কিন্তু কৃপাণ তো আমাদের ধর্ম। শিখের কোমরে কৃপাণ থাকবে না তা কী করে হয়। শিখরা সব ছাড়তে পারে, কিন্তু পাগড়ি আর পঞ্চ *'ক'* নয়। যার মধ্যে কৃপাণ অন্যতম আর ওটা আমাদের গুরু গোবিন্দ সিং মার-দাঙ্গা করার জন্য রাখতে বলেননি। ওটা 'স্বাভিমান', স্বাধীনতা, পরোপকারিতা আর না-ইনসাফির বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতীক। 'কৃপা' মানে ক্ষমা, আর 'আন' মানে 'অসমত্', ইজ্জত। এই দুই নিয়েই 'কৃপাণ।" ওটা আর যাই হোক, খুনোখুনি করার জিনিস নয়। পবিত্র জিনিস। ওটা তো ফেরত দিতেই পার।"

"না।" সে ফের মাথা নাড়ে, "মুখে যতই কৃপার কথা বলিস, ওই পবিত্র কৃপাণ দিয়ে তোরা মানুষ খুন করেছিস। তাই ওগুলো এখন মার্ডার ওয়েপন হিসাবে পুলিশি হেফাজতে আছে। মার্ডার ওয়েপন এভাবে ফেরত দেওয়া যায় না। তার জন্য আগে কোর্ট কাছারি করতে হয়। লম্বা কেস চলে। কোর্ট যদি মনে করে ওই কৃপাণ দিয়ে কোনো খুন হয়নি, তোরা বেকসুর— তবেই ফেরত পাবি।"

বেকসুর! মার্ডার ওয়েপন। ওর কথা শুনে বাপুরা কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। যারা

শয়ে শয়ে মানুষ খুন করছে তাদের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার জন্য পুলিশ আদৌ তৎপর নয়। বরং যারা নিজেদের বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করছিল, তাদের শেষ সম্বল পবিত্র কৃপাণটাও কেড়ে নেওয়ার জন্য কী অসামান্য উদ্যোগ। ওই ধর্মীয় পবিত্র জিনিসটা কিনা ওদের কাছে মার্ডার ওয়ে! কৃপাণের মূল অর্থ বুঝতে ওদের বয়েই গিয়েছে। ওরা জানত ঐ আট ইঞ্চির কৃপাণও শিখের হাতে পড়লে মারাত্মক হতে পারে। মুখে 'মারো মারো' বললেও কাপুরুষগুলো শিখদের শক্তিকেও ভয় পাচ্ছিল। সেইজন্যই এই 'টেরামেরা প্যায়ড়া"! খুনের দায় আমাদেরই ঘাড়ে চাপিয়ে দিল ওরা। দাঙ্গাইরা নয়, কাঠগড়ায় আমরা।

বাপু, তাওজি আর কলোনির বাকি লোকেরা কি বোঝেননি যে শত কথা বললেও কোনো কাজই হবে না? তবু তারা প্রত্যেকটি প্রহরীর কাছে গিয়ে হাত জোড় করে মিনতি করছিলেন। ওদের পায়ে ধরে 'গির-গিরাচ্ছিলেন।" এই চোখদুটো দেখেছে তাদের সকরুণ আর্তি। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের উচ্ছ্বসিত কান্না। পেছন থেকে কোনো আওয়াজ এলেই ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সবাই পেছন দিকে তাকাচ্ছিল। এর মধ্যেই কি এসে পড়ল ওরা? এমনকী নিজের মানুষদের পদধ্বনিও বুঝি অচেনা লাগে। অতি পরিচিত কাউকে দৌড়ে আসতে দেখলেও ভয়ে রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। এমনকি প্রহরারত পুলিশদের দেখে রক্ষী নয়, যমদূত বলে মনে হয়। ওরা নাকি আমাদের নিরাপত্তা দিতে এসেছে। অথচ দু-চোখে কী আক্রোশ। পারলে ওখানেই ধরে গুলি মারে!

একটা আট বছরের শিশুও তখন বুঝতে পেরেছিল যে আর নিস্তার নেই। উর্দিওয়ালাদের পাথরের মতো মুখ, কঠিন চোয়াল দেখেই সে বুঝেছিল, এরা তাদের মরতে দেখলে খুশিই হবে। বুজুর্গেরা হাত পেতে নিজেদের নয়, পরিবারের প্রাণের 'ভিখ' চাইছিলেন। কলোনির মেয়েরা, বেবে, তাইজি, এমনকি দাদি-নানির বয়সী বৃদ্ধা মহিলারাও ওদের পায়ে পড়ছিলেন। ওদের শক্ত বুট তাদের চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল। কান্নাবিকৃত গলায় বলছিলেন, "কৃপাণটা অন্তত দাও, ও সাব! অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও দাও। একটা বেলা অন্তত আমার ঘরের মানুষগুলো বেঁচে থাকুক। আমার পোতা-পোতি, মরদ, মেয়ে-ছেলেদের মরার আগে আর এক পহর চোখ ভরে দেখি। বাত আর হাত যদি আমাদের 'অসমৎ'-এ পৌঁছায়, তবে কথা দিচ্ছি, ওই কৃপাণ শত্রুর বুকে নয়, নিজেদের বুকেই মারব। আমরাই মরব কিন্তু ওয়াহেগুরুর 'কৃপা' আর নিজেদের 'আন'নিয়ে। এটুকু নয় শেষ সময়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে দাও ...।" কিন্তু পুলিশেরা দম দেওয়া কলের পুতুলের মতো এদিক ওদিক ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "কিচ্ছু দিতে পারব না। অর্ডার নেই। তাছাড়া মরবিই বা কেন? আমরা আছি না? এত সহজে মরতে দেব?"

কথাগুলো একেবারে যেন গুলির মতোই এসে বিঁধল। কথার বাঁকা ভঙ্গিতেই স্পষ্ট যে ওরা আছে বলেই আরও বেশি বিপদ! আর যা-ই হোক, সহজ মৃত্যু ওরা দেবে না। একজন তো বলেই ফেলল, "ইন্দিরাজিকে মারার সময় মনে ছিল না?"

অসম্ভব ত্রাস, আতঙ্ক মনের ভেতর নিয়ে আর্ত, বিপন্ন মানুষগুলো অনেক কাকুতি-মিনতি করে, ভিক্ষা চেয়েও ব্যর্থ হল। শেষে ক্লান্ত হয়ে নিজেদের বধ্যভূমিতেই ফিরে এল তারা। হ্যাঁ, আমরা সবাই জানতাম, এটাই আমাদের 'শশান' হতে চলেছে। যদি কেউ প্রাণে বেঁচেও যায়, নিজের আত্মীয়র নশ্বর দেহটাও শেষকৃত্যের জন্য খুঁজে পাবে না। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা দেহ অন্তত লাগে। কিন্তু চতুর্দিকের পরিস্থিতি দেখে আমার মতো একটা বাচ্চাও বুঝেছিল, সেটুকুও বাকি থাকবে না। এটাই 'আখরি' ময়দান। আর এখানেই জিন্দা সবার চিতা জ্বলতে চলেছে। হরি সিং, আমাদের কলোনিরই ছেলে। আমার থেকে বছরখানেকের বড়ো ছিল সে। তার বাপু ছিল না। সে হরির শৈশবেই ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল। ওর বেবে রশ্মি কৌর চেয়েচিন্তে, এর ঘরে, ওর ঘরে কাজ করে, রসোই-বর্তন সাফ করে, লঙ্গর রেঁধে কোনোমতে দুটো 'রোটি' কামাত। নিজে ভুখা থাকলেও হরিকে কোনোদিন উপবাসী রাখেনি। বিধবা মায়ের বড়ো আদরের ছেলে। আজও এই প্রবীণ চোখদুটোর সামনে ভেসে ওঠে তার নিষ্পাপ করুণ মুখটা। চোখদুটো কেঁদে কেঁদে টকটকে লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে।

নোনতা অশ্রুর ছাপ গালে নিয়ে সে শুকনো ঠোঁট চেটে প্রশ্ন করেছিল, "হাঁ রে ক্কাকে, ওরা আমাকে পুড়িয়ে মারবে না তো? আমি একবার তাড়াতাড়ি গরম রোটি খেতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা খেয়েছিলাম। বড়ো জ্বালা করেছিল। ফোস্কা পড়ে চামড়া উঠে গিয়েছিল। বেবে ফুঁ দিয়ে, মরমপট্টি করে ব্যথা কমিয়েছিল ঠিকই লেকিন তারপর থেকে আগকে আমি বড়ো ভয় পাই। পুরোটা পুড়ে গেলে আরও বেশি জ্বালা করবে, আরও দর্দ হবে, তাই না?"

হরির চোখদুটোয় একটু ধূসরের ছোঁয়া ছিল। সবাই বলত, 'বিল্লোরি আখে"। ওর সেই ধূসর মার্বেলের মতো কাচস্বচ্ছ আর্দ্র দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম, কাকেই বা কীসের কথা জিজ্ঞাসা করছে! কিছুক্ষণ আগেই নিজেই ভাবছিলাম আমার মৃত্যুটা ঠিক কোন্ পথে আসতে চলেছে! গরম রুটির ছ্যাঁকার কষ্ট, আর জ্যান্ত মশাল হয়ে আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাঁক হওয়ার যন্ত্রণার মধ্যে যে কতটা পার্থক্য তা এখনও কল্পনাই করতে পারছে না। আমি একটু একটু পারছি কারণ চোখের সামনে অনেক জ্বলন্ত হতভাগ্যের অন্তিম চিৎকার স্বকর্ণে শুনেছি যা শোনা যায় না। তাদের 'তড়প' স্বচক্ষে দেখেছি যা দেখা অসম্ভব। গলায় জ্বলন্ত টায়ার পরা অবস্থায় সর্দারদের মরণযন্ত্রণার সাক্ষী ছিলাম আমি। তাই ওর কথাটা শুনে হাসিও পেল, আবার কান্নাও বেচারা হরি জানেও না ঠিক কতখানি 'দর্পনাক' মৃত্যুর কথা সে বলছে!

আমার দুই পা-জি সরবজিত আর আমনপ্রীত কোনো কথাই বলছিল না। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল অকালেই বার্ধক্য ওদের খেয়ে নিয়েছে। একা ওরাই নয়, কলোনির সবক-টা শিশু বুঝি অকালবৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারো মুখে কোনো শব্দ, শোর-শরাবা কিচ্ছু নেই। কেউ 'লঙ্গরের' কথা ভুলেও বলছে না। বাচ্চাগুলোর শুকনো মুখে স্পষ্ট ছিল ভুখ আর প্যায়াস। তবু কেউ 'রোটি' শব্দটাও উচ্চারণ করেনি। রোজ এই সময় 'কঞ্চে' খেলার ধুম পড়ে। ছোট্ট ছোট্ট রং-বেরঙের কাচের মার্বেলগুলো আমাদের সবার কাছে হীরে-মানিকের চেয়েও বেশি দামি। অথচ আজ সেই নার্বেলের বয়ান অযত্নে, অবহেলাতেই পড়ে রয়েছে ঘরের অন্ধকার কোণে। কেউ সেদিকে তাকিয়েও দেখছে না। ইন্দিরা গান্ধীকে খুন করার অপরাধ নিয়ে ছোট্ট শিশু খুনিদের দল অন্ধকার ভরা দৃষ্টিতে এ ওর মুখের দিকে দেখছিল। বারবার বড়োদের মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল যে এই 'অন্ধেরা'য় একবিন্দু আশার আলোও আছে কিনা। তারা ভয়ে কাঁপছিল যে কখন বিচারকেরা হাত জ্বলন্ত টায়ার, তেল, রড, চপার, সেই ভয়াবহ সাদা পাউডার আর তরোয়াল নিয়ে এসে হানা দেবে।

সেই খুনিদের ভিড়ে দাঁড়িয়েছিল এক আট বছরের শিশু-ও। বাইরে সূর্যের আলো। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যে সে অন্ধকার এক নিষ্ঠুর কারাগারের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে ফাঁসিঘরের দিকে চলেছে! সামনে কতগুলো কালো কালো সিঁড়ির ছায়া। সেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেই তার ঘাতক অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সঙ্গে অপেক্ষা করছে। তখন ওসবের নাম জানা ছিল না। বাপুর মুখেই শুনেছিলাম, যে এমন অন্ধকার রাস্তা পেরিয়েই ভগৎ সিং, উধম সিং ফাঁসিতে চড়েছিলেন। কোনোদিন দেখিনি, তবে ওঁর মুখের বর্ণনা এতটাই জীবন্ত ছিল যে সেই বধ্যভূমিতে যাওয়ার রাস্তাটা কল্পনায় দেখতে পেতাম। দু-দিকে কঠিন পাথুরে জেলের দেওয়াল শ্বাস রোধ করে দেয়। সামনে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। সঙ্কীর্ণ কালো পথ চলে গিয়েছে মৃত্যুর দিকে। আর কোনো রাস্তা নেই।

এখন টেকনিক্যাল টার্মগুলো জানি। তাই হয়তো আরও স্পষ্টভাবে বলতে পারি। আমার অবস্থা সেই ফাঁসির আসামীর মতো ছিল, যার ব্ল্যাক ওয়ারেন্টে সই হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। দেশ আমাদের ক্ষমা করেনি। ভয়াবহ মৃত্যুশীতল 'ডেথ রো'তে একটা আট বছরের শিশু মূক ও বধিরের মতো দাঁড়িয়েছিল। কখনও কাঁপছে, কখনও মূর্তির মতো স্থির। চোখের ভেতরটা কড়কড় করছে, তবু জল আসছে না। তার চোখের সামনে শুধু অপেক্ষমাণ 'গ্যালোজ' ক্রুর হাসি হাসছে। সে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে জহ্লাদ এসে তাকে টেনে হিঁচড়ে ফাঁসিতে চড়িয়ে দেবে! কখনও মনে হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃত্যু হোক। আবার কখনও মনে হচ্ছে, আরও কয়েকটা মুহূর্ত কি পাবে না প্রাণভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য? এখানেই সব শেষ?

“বাবা কর্নৈল সিং বৈঠা সি দুকান তে
বাবা কর্নৈল সিং গিরেয়া ধড়াম্ সে
পিন্ড্ দে লোগ ফির আ কে কেহন লগ্‌গে,
বাবা কর্নৈল সিং তে গয়া হুঁ কাম সে!”

একটা কান্নামাখা গুনগুনানি শুনে দেখলাম হরি সিং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কবিতা বলছে। এখন যাকে বলে নার্সারি রাইম। শহীদেরা ফাঁসি কাঠে চড়ার আগে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বা 'বন্দেমাতরম' বলত। দোষীরা চিৎকার করত, গালাগালি দিত, শাপশাপান্তও করত। কিন্তু এই প্রথম বোধহয় কোনো ‘মওতের’ সাজা পাওয়া খুনি ‘নার্সারি রাইম' বলতে বলতে ডেথ রো থেকে গ্যালোজের দিকে যাচ্ছিল। এখন ভাবলে বড়ো কান্না পায়। হরি বুঝতেই পারেনি ওর মনের ‘খওফ’ কী করে প্রকাশ করবে। নিষ্পাপ শিশু বড়ো কোনো বুলি জানত না। চিৎকার করে কাঁদার শক্তিও তার ছিল না। মাসুম বাচ্চা তো গালাগালি, শাপশাপান্ত করতেও শেখেনি। তাই শেষ মুহূর্তে ওর বাবা কর্নৈল সিং-এর করুণ পরিণতির কথাই মনে পড়েছিল। যে বেচারি নিজের দোকানে শান্তিতে বসে ছিল। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, ধড়াম করে পড়ে গেল। আর উঠল না। গ্রামের সবাই এসে বলতে শুরু করল, বাবা কর্নৈল সিং তো মরেই গেল!

এই কবিতাটা আগে আমাদের বেশ হাসি-মজাকের বিষয়বস্তু ছিল। এখন হরির মুখে শুনে মনে হল, এর থেকে ভয়ংকর কবিতা আর নেই! ও মুখে ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারেনি। কিন্তু ওর দেহ সেই প্রচণ্ড ভয়কে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেছিল। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেই যাচ্ছিল, “বাবা কর্নৈল সিং...বাবা কর্নৈল সিং তে গয়া হুঁ কাম সে .... তে গয়া হুঁ কাম সে!... তে গয়া হুঁ...!” আর সবার চোখেই পড়েছিল যে ওর পরনের পাজামাটা ‘গিলা' হয়ে গিয়েছে।

আমরা, ‘বাবা কর্নৈল সিং'-এর দল ওখানেই নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন যে ধড়াম করে নিজেদের জায়গা থেকে পড়ে গিয়েছি তা কেউ টেরই পায়নি। তবে এখন যে ‘কাম তামাম’তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। সবার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল জ্যান্তই ‘রাখ’ হয়ে গিয়েছে। কাউকে আর পোড়ানোর দরকারই নেই। আশা জিনিসটা নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু মিথ্যে আশার আলো যদি হঠাৎ করে নিভে যায়, তবে তার চেয়ে হৃদয়বিদারক আর কিছু নেই। তৃষ্ণার্তরা কোনোমতে তৃষ্ণার কষ্ট সইয়ে নিচ্ছিল। নিজেদের মতোই চেষ্টা চালাচ্ছিল বাঁচার। কোনো-না-কোনো সময় ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়ে নিজেরাই ধুঁকে ধুঁকে মরত। আচমকা মরীচিকার ছল কি খুব প্রয়োজন ছিল তাদের বাঁচার লড়াইটুকুকেও একেবারে সমূলে শেষ করে দেওয়ার জন্য?

আমি তখন ভাবছিলাম, যদি সমস্ত সমস্যার ‘জড়’কেই এক নিমেষেই উৎখাত করে দেওয়া যেত! কাশ আমি আরও একটু বড়ো হতাম! কাশ প্রধানমন্ত্রীর দফতরে নোকর-চাকরও হতাম। কাশ, ওই দুই সর্বনেশে শয়তানের বন্দুকের সামনে গিয়ে নিজেই খাড়া হয়ে যেতে পারতাম। আমি ঝাঁঝরা হয়ে মরে যেতাম, তবু সর্দারদের নামের আগে ‘গদ্দার’ কলঙ্কটা মুছে দিয়ে যেতাম। ইন্দিরা গান্ধী তবে আজকে সলামত থাকতেন। সরতাজ আর দেশের বীর শিখ সিপাইরাও নিশ্চিন্তেই থাকত। একদল 'খুন কা প্যায়াসা ভেড়িয়া' তাদের পেছনে দৌড়ত না!

আমার অসম্ভব কান্না পাচ্ছিল। আমার কাছে পুলিশ, ফৌজি দেশের নায়ক ছিল। আদর্শ। সেই ফৌজি, যে পুলিশেরই গুলি খেয়ে রাজপথেই লুটিয়ে পড়ল! যে ফৌজিরা এখন দেশ তো দূর, নিজেদেরই কীভাবে বাঁচাবে ভেবে পাচ্ছে না! কানে অল্পস্বল্প খবর যা এসেছিল তাতে জানতে পেরেছি যে ‘মহাবীরচক্র’ সম্মান পাওয়া ফৌজি গ্রুপ ক্যাপ্টেন মনমোহনবীর সিং তলোয়ার অনেক চেষ্টা করেও, নির্বোধ ভিড়কে নিজের সম্মান, পদমর্যাদার কথা বলে, বুঝিয়ে, ইন্দিরা গান্ধীর অমর থাকার স্লোগান দিয়েও নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে পারেননি। দাঙ্গাইরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হলে তিনি বাধ্য হয়েই ভয় দেখানোর জন্য গুলি

চালিয়েছিলেন। যতক্ষণ জনতা তাঁর বাংলো পোড়ানোর চেষ্টা করছিল ততক্ষণ ওঁর শত অনুরোধেও অকুস্থলে পুলিশ আসেনি। কিন্তু যেই গ্রুপ ক্যাপ্টেন তলোয়ার আত্মরক্ষার্থে ফায়ার করতে শুরু করলেন অমনি পুলিশ গিয়ে হাজির। দাঙ্গাইরা ফায়ারিঙের ভয়ে ভেতর থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও বাংলোর বাইরেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ তাদের হাতে অস্ত্র, মশাল, সফেদ পাউডার, তেল, কাটারি-রক্তাক্ত তরোয়াল, সব দেখেছে। অথচ তারা কেউ গ্রেফতার হয়নি। পুলিশ তাদের একজনকেও ধরার চেষ্টাও করেনি, উলটে মনমোহনবীর সিং তলোয়ারকেই 'খুনি' বলে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে। এই হল ফৌজির দশা! আর এই হল আমার প্রিয় পুলিশের ভূমিকা! যাদের আমি ভালোবাসতাম, চোখ বুজে বিশ্বাস করতাম। পুলিশ চৌকি দেখার আমার খুব ইচ্ছে ছিল। ওই উর্দির মধ্যে নায়কদের দেখতে পেতাম। স্বপ্ন দেখতাম, আমিও খাঁকি পরেছি। কিংবা বর্ডারে দাঁড়িয়ে রাইফেল উঁচিয়ে দেশ পাহারা দিচ্ছি। সরতাজকে বলেছিলাম, "বড়ো হয়ে আমিও পুলিশ হব, দেশের ফৌজি হব। দেশের জন্য জান দেব...।"

আমার চোখ পড়ল সেই খাঁকি উর্দিওয়ালাদের দিকে। কানের মধ্যে তরল সীসার মতো শব্দগুলো যেন আবার ঝনঝন করে বেজে উঠেছে, "এত সহজে মরতে দেব?...ইন্দিরাজিকে মারার সময় মনে ছিল না? ইন্দিরাজিকে মারার সময়?"

জীবনে সেই প্রথমবার টের পেলাম, মৃত্যুর চেয়েও স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা অনেক বেশি 'দর্পনাক'। 'সাঁস' টুটে গেলে কয়েক মুহূর্ত লাগে মরতে। আর 'বিশোয়াস্' টুটে গেলে মানুষ প্রতি মুহূর্তে জ্বলতে জ্বলতে মরে। আট বছরের শিশু জলভরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছিল, তার নায়কেরা আজ সবাই 'খলনায়ক।' উর্দির গৌরবের রোশনির ওপরে কেউ যেন এক দোয়াত কালো 'সিয়াই" ঢেলে দিল। কলঙ্কিত কতগুলো অদৃশ্য রক্তাক্ত উর্দি শুধু আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তার মধ্যে কোনো মানুষকে দেখতে পাইনি। কোনো মানুষ ছিল না সেখানে! আমি কি এটাই হতে চেয়েছিলাম? নির্বোধ। নির্বোধ শিশু!

আমার কী হল কে জানে! বেবে আমায় জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়েছিল। আমি এক ঝটকায় বেবের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে গেলাম সবচেয়ে কাছের উর্দিটির দিকে। প্রচণ্ড রাগে, ঘৃণায়, কান্নায় আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে বলেছিলাম, "ইন্দিরাজি কো ম্যায়নে নেহি মারা। সুন রহে হো তুম? ইন্দিরাজিকে আমি মা-রি-নি!"

পুলিশওয়ালা আমার দিকে নৃশংস চোখে তাকাল। আমার সমস্ত সাহস, বীরত্ব উবে গেল এক লহমায়। এ কি কোনো দেশসেবকের চোখ? আমার মনে হয়েছিল, দুঃস্বপ্নে দেখা কোনো রাক্ষসের দপদপে চোখ বুঝি। ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম। না, এটা আমি কখনও হতে চাইনি। এ তো খুনির দৃষ্টি! এমন হওয়ার তো কথা ছিল না। টের পেলাম, কত কিছু ভাঙছে আমার ভেতরে! ভেঙে চুরে 'বিখ্‌রে' যাচ্ছি। এতটাই চূর্ণ-বিচূর্ণ যে জোড়া-তালি দেওয়ার কোনো উপায় নেই।

উর্দি পরা লোকটা আমার দিকে আগুনে দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বাঁকা হাসি হেসে অন্যদিকে তাকিয়ে শিস্ দিয়ে উঠল, "গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই, কিকো খবর কৌন হ্যায় উয়োহ্‌, অনজান্ হ্যায় কোই...!" গানটা এর আগে সহস্রবার রেডিওতে শুনেছি। অনেক পুরোনো গান। প্রায়ই পুরোনো দিনের গানের আসরে বাজত। শুনলেই গা ছম্‌ছম্ করত। ভূতে খুব ভয় পেতাম। আর ঐ ভৌতিক সুর একটা শিরশিরে অনুভূতি রেখে যেত। তার বেশি কিছু ছিল না। গানটা মনে রাখারও বিশেষ কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। এমন গান তো রেডিয়োতে আকছারই শোনা যায়। বিশেষ করে ওই বছরে অমিতাভ বচ্চনের 'শরাবি' রিলিজ করেছিল। লোকে বাপ্পি লাহিড়ীর সুরে মস্ত্‌ ছিল। বলতে গেলে গোটা বছরটাই বুঝি বাপ্পি লাহিড়ীরই ছিল। 'শরাবি' একা নয়। সঙ্গে 'তোহফা'ও সুপার ডুপার হিট। তখন 'যহাঁ চার ইয়ার মিল যায়ে', 'ইন্তেহা হো গয়ি ইন্তেজার কী', 'দে দে প্যায়ার দে' কিংবা 'লোগ কেহতে হ্যায় ম্যায় শরাবি হুঁ' সব মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। দিদিও

মাঝেমধ্যে কাজ করতে করতে গুনগুন করত, ‘মুঝে নওলখা মঙ্গওয়া দে রে ও সইয়াঁ দিওয়ানে’। আর বাপু হুঁ হুঁ করতেন, ‘মনজিলেঁ অপনি জগাহ হ্যায়' সরবজিৎ আর আমনপ্রীত সুযোগ বুঝে গাইত, ‘এক আঁখ মারু তো পর্দা হঠ যায়ে’ কিংবা ‘প্যায়ার কা তোহফা তেরা'। বেবে শুনতে পেয়ে দু-একবার প্রা-জিদের কানও টেনে ধরেছিল। আমিও এই গানগুলো শুনে শুনেই প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। এর মধ্যে গুমনামের মতো ভয়াবহ সুরের জায়গাই ছিল না। একে তো অনেক পুরানো। তার ওপর ভূত আমার মোটেই পছন্দ নয়। তাই গানটা মনে রাখার কোনো কারণও খুঁজে পাইনি। অথচ এইমাত্র শুনে মনে হল, এটা কোনো সাধারণ গানই নয়। আসলে এটা মৃত্যুর সুর! যে ‘খওফনাক’ মরণ দাঁত নখ বের করে ওঁত পেতে বসে আছে, এ বুঝি তারই আওয়াজ। ‘মাতমের ধুন।’ লোকটা যেন আমাকে ভয় দেখানোর জন্যই শিস্ দেওয়া থামিয়ে কথাগুলো আরও স্পষ্ট করে গেয়ে উঠল, “কিস্কো সমঝে হাম অনা/ কল্ কা নাম হ্যায় এক সপ্না/ আজ অগর তুম জিন্দা হো/ তো কল্ কে লিয়ে মালা জপনা! '

আমার রক্ত বুঝি হিম হয়ে জমে গিয়েছিল। গানটার পেছনের অর্থ ওই বয়েসেই সাফ সাফ বুঝেছিলাম। ওই লম্হাতেই সমস্ত সুর, গান ছাপিয়ে ওই ‘মাতমের ধুন’-টাই ‘জেহনে’ এমন মিশে গেল যে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে আর কোনো সুর নেই। সব গানই বুঝি বেসুরো বাজছে। শুধু আশপাশ থেকে ফিশফিশ্ করে কারা যেন একটানা গেয়েই যাচ্ছে, ‘গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই... কিকো খবর কৌন হ্যায় উয়োহ্... অনজান্ হ্যায় কোই... গুমনাম হ্যায় কোই...!”

“গুল্লু, পুত্তর।”

বাপু আর বেবে এসে আমায় ওখান থেকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন। দেখলাম সমস্ত কলোনিবাসীরা তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। ভেতর থেকে খিল এঁটে দিচ্ছে। বোকা মানুষগুলো জানত যে দুর্বল খিল বা হুড়কো ‘ভিড়ের’ তাকতকে ঠেকাতে পারবে না। তবু কাঠবিড়ালীর মতো কোটরের মধ্যে ঢুকে চোখ বুজে ভাবছিল, বুঝি তাদের কেউ দেখতে পাবে না।

“চল্ পুত্তর, ঘর চল্...!”

বাপু আমাকে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। যস্যিদিদি তো ঘরের ভেতরেই উন্মাদিনীর মতো চুপ করে বসেছিল, বাইরে আর যায়নি। সরবজিত আর আমনপ্রীতও ঘরের এককোণে সাদা ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে প্রেতের মতো বসেছিল। বেবে আর বাপু আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজায় ভেতর থেকে খিল, ছিটকিনি, এমনকি তালাও লাগিয়ে দিলেন। সবাই বুঝতে পেরেছিল, আসলে ‘ডেথ সেলের’অন্ধকারেই ঢুকছে। এখন শুধু জল্লাদের আসা বাকি।

বাইরে তখনও সেই উর্দিধারী শিস্ দিয়ে চলেছে, “গুমনাম হ্যায় কোই...!”

***

(৩০)

“বেবে, আমাদের ওরা মারবে কেন? আমরা কী করেছি?”

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমনপ্রীত প্রা-জিই প্রথম মুখ খুলেছিল। এতক্ষণ নীরবতা পালনের পর যদি বা সে কথা বলল, তাও এমন প্রশ্ন করে বসল যার উত্তর কেউ জানত না। হিন্দিতে প্রবাদ আছে ‘করতা কোই, ভরতা কোই।' আমার এখন বয়েস হয়েছে বলে প্রবাদটা জানি। কিন্তু আমনপ্রীত এই ‘মুহাবড়া’ জানার সুযোগই কোনোদিন পায়নি। এই প্রশ্নটা হয়তো শুরু থেকেই তার মনের ভেতরে ‘খলবলি' তৈরি করছিল। এতক্ষণ প্রকাশ করতে পারেনি। এতক্ষণে তার অব্যক্ত জিজ্ঞাসা শব্দের রূপ পেল।

সেই অন্ধকারের মধ্যে আমনের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। বাইরে ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। তবু ভয়ের চোটে কোনো ঘরে আলো জ্বলেনি। বেবেও আলো জ্বালায়নি। সরতাজের মৃত্যু ও কলোনির মানুষের বিশ্বাসভঙ্গের পর কেটে গিয়েছে আরও কয়েক ঘণ্টা। এখনও আশ্চর্যজনকভাবে কোনো ভিড় এসে উপস্থিত হয়নি আমাদের শেষ করতে। তবে হ্যাঁ, বেশ কয়েকবার ভারি ভারি বুটের আওয়াজ আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করেছে। তার সঙ্গে আরও কিছু চাপা পায়ের শব্দ। বুটগুলো পুলিশদের ছিল তা জানতাম। কিন্তু তাদের সঙ্গে যে ‘অনজান্’ সতর্ক পায়ের শব্দগুলো ছিল, তারা কারা তা জানা নেই। শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম, তারা আর যে-ই হোক, এই কলোনির লোক হতেই পারে না। সমস্ত বাসিন্দারাই এখন গৃহবন্দি হয়ে ওয়াহেগুরুর নাম নিচ্ছে। এখন তো কান্নার শব্দও আর শোনা যায় না। একেবারে পিনপতনের নিস্তব্ধতা। যেন কোনো গোরস্থানে, অথবা মৃত্যুপুরীতে এসে গিয়েছি। কলোনির বাড়িগুলো বাড়ি নয়, কবর। যার মধ্যে জিন্দা লাশেরা পাকাপাকিভাবে ‘দফন’ হওয়ার অপেক্ষায় বসে আছে। এক এক করে মুহূর্ত খসছে আর তারা গুণে চলেছে ‘অনসুনি’ মৃত্যুর পদক্ষেপ। এই ‘লাচারি', নিরূপায় অবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা কোনো শব্দে বোঝানো সম্ভব নয়। এই চূড়ান্ত শ্বাসরোধকারী বিপন্নতার গুরুভার কান্নাও লাঘব করতে পারে না। তাই কেউ কেঁদে সময় নষ্টও করছে না। বরং প্রত্যেকটা শ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে ভাবছে, এটাই ‘আখরি সাঁস' নয়তো? পরের বার ভাবছে, আরও একটু বেশি হাওয়া ফুসফুসে ভরে নিই। কে জানে, আর কতক্ষণ, কত সেকেন্ড, কত মিনিট বা ক-ঘণ্টা এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সুযোগটুকু থাকবে।

প্রাণ ভরে ‘সাঁস’ নিলেও যে দম ‘ঘুটতে’ পারে তা ওই মুহূর্তগুলোই শিখিয়ে দিচ্ছিল। যতটা হাওয়া ‘ফেফরায়' যাচ্ছিল, তার অর্ধেকটাই আতঙ্ক কুরে কুরে খেয়ে নিচ্ছিল। ছোট্ট বুকের ফুসফুসের আর কতটাই বা ক্ষমতা। কেউ আমার নাক চেপে ধরেনি, গলা বা মুখ টিপে ধরেনি, তবু যেন শ্বাস নিতে পারছিলাম না। টের পাচ্ছিলাম বুকের ওপর একটা অসহ্য ভার চেপে বসে আছে। যার ওজন নেওয়ার ক্ষমতা তখনও আমার হয়নি। পায়ের শব্দগুলো যতবারই আমাদের বাড়ি ঘেঁষে চলে যাচ্ছিল, ততবারই মনে হচ্ছিল বাইরে কারা যেন নীচুস্বরে হাওয়ার মতো ফিশফিশ করছে। বোধহয় চাপা গলায় ষড়যন্ত্র করছে। হয়তো কীভাবে আমাদের মারবে সেই চক্রান্ত করতেই ব্যস্ত।

আমনপ্রীতের মুখে কতটা ভয় ছিল তা দেখতে পাইনি। কিন্তু গলার ফ্যাঁসফ্যাঁসে ভাঙা স্বর জানিয়ে দিল তার ঐ আপাত সরল প্রশ্নের পেছনে যে কতটা মারাত্মক বাস্তব লুকিয়ে আছে তা সে খুব ভালোই বুঝতে পেরেছে। একটু থেমে সে অধৈর্যভাবে তীক্ষ্ণ ও উঁচুস্বরে যোগ করল, “আমরা কেউ বাঁচব না, তাই না? ওরা এখনও আসছে না কেন? ওদের আসতে বলো। অব কিস্ কা ইন্তেজার কর রিয়া হৈ?”

বাপু কথাটা শুনেই যেন কেঁপে উঠলেন। আমনের মুখ সজোরে চেপে ধরেছেন তিনি, “চুপ কর। চুপ কর পুত্তর। এমন বলতে নেই। কে জানে, হয়তো আশেপাশেই সব ঘুরে

বেড়াচ্ছে। চুহা-বিল্লির খেল খেলছে। অ্যায়সে উনকো লঙ্কার মৎ। এমনও তো হতে পারে যে ওরা কিছু করার আগেই রাজীবজি আর্মি নামাবেন, আর আমরা বেঁচে যাব।”

“হায় রব্বা!” এবার বেবে নীচুস্বরে ফুঁপিয়ে উঠেছে, “কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হওয়ার নয়। কোই নেহি বচেগা। হাম ভি নেহি। বাচ্চাদের এই মুহূর্তে আর ঝুটি দিলাসা দিও না। অনেক ঝুঠ শুনেছে ওরা। মরার আগে অন্তত সত্যিটার সামনে দাঁড়াতে দাও।” চুহা-ি [-বিল্লির খেল যে চলছে তা আমিও বুঝতে পেরেছিলাম। পুলিশি বুটের নিজের আওয়াজ লুকোনোর কোনো চেষ্টাই ছিল না। বরং সে নিজের অস্তিত্ব সরবে ঘোষণা করছিল। তার সঙ্গে যে অন্যপক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল তা চাপা এবং সতর্ক হলেও নিজেকে গোপন করার কোনো ইচ্ছে তাদেরও ছিল না। এমনকি একাধিক গলার স্বরের ফিশফিশে কথা অস্পষ্ট ঠিকই, তবে সহজেই কানে আসে। বাসিন্দারা যাতে শুনতে পারে সেভাবেই ওরা কথা বলছিল। শুধু কী বলছে সেটা বুঝতে না পারলেই হল। পুলিশের যে ‘রওয়াইয়া' আর তৎপরতার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম তাতে ওদের উপস্থিতিতে নিশ্চিন্ত হওয়ার বদলে যে সবাই ভয়ই পাবে তা ওরাও খুব ভালো করেই জানত। সবাই বুঝেছিল যে উর্দিধারীরাও এই যড়যন্ত্রে সামিল রয়েছে। তাই তাদের পদশব্দ আর মৃত্যুর ‘আহট’ একই।

তার সঙ্গে এই অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বিরতি! অদ্ভুত এক যতি বা বিলম্ব আমাদের হাল আরও খারাপ করছিল। বিল্লি কখনও চুহাকে এক লপ্তে মারে না। শেরও এক ঝটকায় শিকার করে না। বরং শিকারকে খেলাতে থাকে। শিকার বাঁচতে বাঁচতে, লড়তে লড়তে অবশেষে পালাতে পালাতে একসময় ‘থকে-হেরে’ ভাবতে থাকে কতক্ষণে এবার যম এসে তার প্রাণটা নেবে। তখন আর সে বাঁচার জন্য নয়, মরার জন্য আকুলি-বিকুলি করতে থাকে। তবু মৃত্যু তখনই আসে না। বরং তাকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। চক্কর দিতে দিতে সীমারেখা ছোটো করে আনে। তার হতাশার, হাল ছেড়ে দেওয়ার আর মরণ প্রার্থনার ‘লুৎফ’ নেয়। ভয়ে আধমরা, ক্লান্ত শিকারের চোখে ভয়ানক ‘খওফ’ দেখে আনন্দের আমেজ চেটেপুটে খায়।

অবিকল সেটাই আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটছিল। তখন সেই জুতোর শব্দ, ফিশফিশে চাপা গলার স্বর আমাদের সবার মধ্যেই এমন ‘খওফ’জারি করেছিল যে আমনপ্রীতের মতো একজন নাবালকও অধৈর্য হয়ে উঠে চেঁচাচ্ছিল, “ওদের আসতে বলো... ওরা কীসের অপেক্ষা করছে?” সে আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে স্বয়ং মৃত্যুকেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল। একা সে নয়, গোটা কলোনি জানত, সরতাজ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নেই, ভিড়ের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কলোনির অনেক পুরুষই ইতোমধ্যে মারা গিয়েছে, তাদের লাশগুলো এখনও পড়ে আছে, অন্তিম সংস্কারের সুযোগ কেউ পায়নি। লড়ার জন্য কৃপাণটাও নেই। এমনকী বুজুর্গদের হাতের মজবুত লাঠিগুলোও ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে নিয়েছে পুলিশ। এখন যা ঘটবে তার গোটাটাই একতরফা। ওরা আসবে। আমরা মরব। প্রতিরোধ, প্রতিবাদের সুযোগ নেই। তাই সেই মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে নিতে, বধ্যভূমিতে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে থাকতে হয়তো আমনের মতোই পাগল হয়ে যাচ্ছিল বাকি মানুষগুলোও মানসিক ভারসাম্যহীন লোকগুলো ভাবছিল, এবার সব শেষ হোক। শেষটা যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক, এর থেকে বেশি অসহ্য বোধহয় হবে না।

আমাদের শিকারীরাও ঠিক এটাই চাইছিল। ওদের ইঙ্গিত স্পষ্ট। আমাদের নিজেদেরও ইচ্ছেমতো মরার কোনো অধিকার নেই। ওই পায়ের আওয়াজ আর কণ্ঠস্বরই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে আততায়ীদের একটা অংশ আমাদের পাহারা দিচ্ছে। তবু আক্রমণ করছে না। যেন বলতে চাইছে, এ কঁহানির শেষ তোদের হাতে নেই। তোরা শত গিরগিরালেও মওত আসবে না। মওত তখনই আসবে যখন আমরা চাইব। তোদের মরতে মরতে বেঁচে থাকা আমাদের হাতে। শেষ পরিণতিও আমাদের হাতে। যখন খুশি তখন মারব।

যখন ইচ্ছে হবে তখন জ্বালাব, কাটব। যা পারিস কর। একঝটকায় নয়, তিলে তিলে মর।

অনেক বছর পরে ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমাদের আয়ু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা স্রেফ 'এক্সটেনশনে' বাঁচছিলাম। নোকরিতে যারা

এক্সটেনশনে থাকে তারা সবসময়ই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে, এই বুঝি মেয়াদ শেষ হল। আমাদেরও অবস্থা তাই। আমরাও মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসেছিলাম। কিন্তু যতই মেয়াদ অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘ হচ্ছিল, ততই বাঁচার ইচ্ছে কমে আসছিল। আর ভাবছিলাম, বাইরে ও কাদের ফিশফিশ শোনা যায়! যদি ওরা এসেই থাকে তবে এখনও আমাদের খতম করছে না কেন। ওরা কারা!

কে জানে আমাদের 'কাতিল' অন্তর্যামী ছিল কিনা। যখনই এসব ভাবছিলাম ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে সেই তীব্র শিস্ ভেসে এল, 'গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই, কিসকো খবর কৌন হ্যায় উয়োহ, অনজান হ্যায় কোই...!'

দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে জানতে পেরেছিলাম, ওই চাপা স্বরের কথাবার্তা আদতে ঠিক কী ছিল। আততায়ীরা ভোটার লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিল, কোন্ বাড়িটা পবনজ্যোত সিং বা গুরশরণ সিং-এর, কোন্টা কুলদীপের কিংবা কোন্টা রশ্মি কৌরের। তারা বুঝে নিতে চেয়েছিল, শিখদের ভিড়ের মধ্যে কোনো হিন্দু বা অন্য ধর্মের পরিবারের ঘরও নেই তো! তার কারণ প্রথমত, অন্য ধর্মের লোকগুলো তাদের টার্গেট ছিল না। দ্বিতীয়ত, হিন্দু, মুসলিম বা ক্রিশ্চানদের ঘর থাকলে শিখরা সেখানেও আশ্রয় চাইতে যেতে পারে। ওরা আগেই খুঁজে খুঁজে আশেপাশের কলোনির হিন্দু, মুসলিম বাসিন্দাদের বের করে ধমকি দিয়েছিল যেন তারা কোনোমতেই শিখদের ঘরে লুকিয়ে না রাখে। তাতে শিখদের মৃত্যু তো নিশ্চিতই, বেইমান স্বজাতিকেও রেয়াত করবে না তারা। এর প্রমাণও দিয়েছিল সেই হিংস্র মব্। শিখদের বাঁচানোর জন্য এক হিন্দু ব্যক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। বাধা দিয়েছিলেন। শিখদের সঙ্গে তাঁকেও পুড়িয়ে মেরেছিল ওরা। তার চেয়েও মজার কথা 'দাঙ্গাইদের' হাতে ওই বিরাট ভোটার লিস্ট তুলে দিয়েছিলেন খোদ কালেক্টর সাহেব! সেই আই.এ.এস. অফিসার, যাঁর হাতে আইন ও অনুশাসন রক্ষার ভার।

"ওই ধুন বন্ধ করতে বলো বাপু!"

আমনপ্রীতের পর এবার সরবজিতও খেপল। 'গুমনামের' তীব্র শিস আমরাও কেউ নিতে পারছিলাম না। মাথার, কানের সব নস্ যেন ফেটে যাচ্ছিল। স্পষ্ট বোঝা যায় যে ওরা আমাদের আতঙ্কেই রাখতে চাইছে। চাইছে ভয়েই যেন আমরা পাগল হয়ে যাই। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিলাম। কিন্তু সরবজিতের আর সহ্য হল না। সে দু-হাতে কান চেপে ধরেছে। চিৎকার করে বলল, "উসে রোকো। এই সুর বন্ধ করো। আমার মাথা ফেটে যাবে। সর ফট্ রিয়া হৈ মেরা। চুপ করতে বলো ওকে। নেহি তো.... নেহি তো...!"

বলতে বলতেই সে বেবের বাহুপাশ থেকে নিজেকে একঝটকায় ছাড়িয়ে নেয়। পরক্ষণেই দৌড়ে গিয়েছে এক কোণের দেওয়ালের দিকে। পাগলের মতো আমার নাবালক দাদা তার কচি মাথাটাকে দমাদ্দম ঠুকতে শুরু করল ওই কঠিন দেওয়ালে। তার সঙ্গে মানসিক রোগীর মতো চেঁচানি, "সর ফট্ যায়েগা মেরা... রুকতা হি নেহি... তোড় দুঙ্গা... খুদ হি সর ফোঁড় দুঙ্গা... ।"

বাপু পড়ি কি মরি করে দৌড়লেন সরবজিতের দিকে। সে খ্যাপা 'সাণ্ডের' মতো দেওয়ালে মাথা ঠুকেই যাচ্ছিল। বাপু কোনোমতে টেনে হিঁচড়ে তাকে সরিয়ে আনলেন। অত জোরে মাথা ঠুকলে যে কোনো শক্তিশালী মানুষেরও কপাল ফাটবে। সরবজিত তো ছেলেমানুষ। বাপু অন্ধকারের মধ্যেই তার মাথা স্পর্শ করে অনুভব করলেন উষ্ণ ও চটচটে তরল! খুন!

"ইয়ে ক্যায়া কর দিয়া তুনে পুত্তর!" তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "সরবের বেবে, তাড়াতাড়ি রুমাল বা কাপড় কিছু দাও। সরবের কপাল কেটে রক্ত পড়ছে যে!"

বেবে কিছু বলার বা করার আগেই সজোরে খিলখিল করে হেসে উঠল যস্যিদিদি। তার হাসির অপ্রকৃতিস্থ খলখল শব্দ শুনলে আরও ভয় লাগে। এমন হাসি তো ডাইনি বুড়িরা হাসে জানতাম। কী বুঝে সে এত মজা পেয়েছে কে জানে। হাসতে হাসতেই বলল, "কত খুন তোমরা থামাবে বাপু। কত রক্তের ওপর মরম-পট্টি করবি বেবে? তোরা তো জানিসই না,

টুকরো টুকরো হতে কেমন লাগে! মাথা ফুঁড়ে বুলেট চলে গেলে কেমন লাগে। পিঠ, পেট কেটে ফালাফালা হয়ে গেলে যত রক্ত ঝরে তা কেমন করে থামাবি?” বলতে বলতেই তার কণ্ঠস্বর কান্নায় বিকৃত হয়ে ওঠে, “না জানি নভজ্যোত কত কষ্ট পেয়ে চলে গেল। না জানি সরতাজের কত খুন পানির মতো বয়ে গেল। কত ‘দর্দ’, ব্যথা সয়ে রাস্তার ওপরেই এমন ঘুমিয়ে পড়ল যে আর উঠলই না। আমি সালি ‘খসমানু খানি' কারোর খুন থামাতে পারলাম না! যাকে বিয়ে করতে গেলাম, সে রইল না। যাকে স্বামী ভেবে আজীবন ভালোবাসলাম সে-ও গেল! আমিই সবাইকে খেলাম! এখন নিজেকেও খেতে পারলে বাঁচি।”

‘খসমানু খানি’ শব্দটার অর্থ নিজের স্বামীকে যে নারী খেয়ে ফেলে। অর্থাৎ মরদখাগী। দিদি নভজ্যোতের দায় এড়ায়নি। কিন্তু সঙ্গে সরতাজের মৃত্যুর জন্যও সে নিজেকে প্রকাশ্যে বিধবা ও ‘খসমানু খানি' ঘোষণা করেছিল। বেবে এবার সভয়ে বলল, “চুপ কর যস্যি। কীসব বলছিস্?”

“তোমরা কেউ জানো না!” দিদি বিড়বিড় করে, “আমি নভজ্যোতের সঙ্গে আগকে সাক্ষী করে সাত চক্কর লাগাতাম। কিন্তু সরতাজের সঙ্গে যে মনে মনে কতবার ‘লাওয়ার ফেরে নিয়েছি। আগ নয়, গুরু গ্রন্থসাহিবকে সাক্ষী মেনে চার চক্কর লাগিয়েছি স্বপ্নে। ও কী করে আমায় একা ফেলে রেখে যেতে পারে? একসঙ্গে বেঁচেছি, একসঙ্গে মরব না? লাওয়ার ফেরে নেওয়া মানে সির্ফ পতি-পত্নী নয়, এক “জান।” একজন মরলে অন্যজনও মরবে। কত খুন রুকবি তুই বেবে?”

“পুত্তর....!”

“যস্যি, পুত্তর!” বাপু অসহায়ভাবে বললেন, “এমন পাগলামি করিস না। চুপ রেহ।” আমরা সবাই নিজেদের ‘রোনাধোনা’ ছেড়ে যস্যিদিদির ছায়ামূর্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, শোকে দুঃখে ওর মাথাটাই গেছে! কীসব বলছে! আরও কিছু ভাবার আগেই ফের শুনতে পেলাম ওর থিক থিক হাসির শব্দ। বীভৎস হাসিতে ফেটে পড়ে সে-ও প্রেতগ্রস্তের মতো গাইতে শুরু করে দিল ওই ভয়াবহ পংক্তিগুলো—

‘কৌন্ বলা তুফানি হ্যায়,/ মওত কো খুদ হ্যায়রানি হ্যায়/ আয়ে সদা ভিরানোঁ সে যো প্যায়দা হুয়া উয়ো ফানি হ্যায়!/ গুমনাম হ্যায় কোই...!”

মৃত্যুও যেন এই ধ্বংসাত্মক মৃত্যুমিছিল দেখে হয়রান হয়ে গিয়েছে। নির্জনতার বুক চিরে কার যেন ডাক ভেসে আসছে। সে বলছে, যার জন্ম হয়েছে, সে ‘ফানি’, অর্থাৎ নশ্বর। তার মৃত্যু অবধারিত। আগেই বলেছি, গানটার ওই ভুতুড়ে সুর শুনে এতই ভয় পেতাম যে কোনোদিন মন দিয়ে কথাগুলো শুনিনি। বোঝার চেষ্টাও করিনি। ওই বয়েসে দ্রুত সুর বা গানের তালে তালে নেচে মৌজ করতাম। কোনো গানেরই কথা বোঝার মতো ধৈর্য বা গভীরতা তেমন ছিল না।

অথচ আজ প্রথমে ওই পুলিশের মুখে, তারপর দিদির মুখে গানটার মর্মার্থ বুঝে সিঁটিয়ে গেলাম। কত বছর আগে এই গানটা লেখা হয়েছিল। তখন কি গীতিকার জানতেন যে প্রায় উনিশ কুড়ি বছর পর, ভবিষ্যতে কখনও এই গানটার একেবারে যথাযথ প্রয়োগ হাজার হাজার মানুষের ওপর হবে? একটা পুরোনো সিনেমার গান যে আমাদের জীবনের ‘মাতম্’ হয়ে দাঁড়াবে তা কেউ জানত না! অর্থ বোঝামাত্রই সর্ব শরীর শিরশির করে উঠল। বুঝলাম, দিদি নয়, আমাদের নিয়তিই এই গানের মাধ্যমে ইশারা করছে। ছায়া ছায়া শরীর নিয়ে ক্রমশই কাল ঘনিয়ে আসছে। যে-কোনো সময়েই হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের ওপর।

দিদি হাসতে-হাসতে, কাঁদতে-কাঁদতেই আবার একসময়ে চুপ করে গেল। বাইরে এখন আর শিসের শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। ঘরের ভেতরে আমনপ্রীত বা সরবজিতের সিসকিয়াঁও থেমে গিয়েছে। বোধহয় ভয়ের চোটে আওয়াজও বেরোচ্ছে না মুখ থেকে। ঠিকমতো কিছু দেখতে না পেলেও বাপু আর বেবের ছায়াশরীর দেখে বুঝতে পারছিলাম বাপু বেবেকে জড়িয়ে শক্ত করে ধরে রেখেছে। বেবে বাপুর বুকে মুখ গুঁজে রেখেছে। কাঁদছে কিনা

বুঝতে পারছি না। তবে জোরে জোরে ঘন শ্বাস ফেলছে। বেবে আর বাপুর কোল ঘেঁষে বসে আছি আমরা তিনজন। সরবজিত প্রা'জির কনকনে বরফ ঠান্ডা হাত আমার একটা হাত ছুঁয়ে আছে। অন্য হাতটা আমনপ্রীতের মুঠোর মধ্যে। আমনের হাত দরদরিয়ে ঘামছিল। ওই অন্ধকারে ভূতের মতো সবাই সবার হাত ধরে বসে চুপ করে 'অহোনি'র প্রতীক্ষারত। মৃত্যু প্রত্যেককে আলাদা করে দেওয়ার আগে শেষবারের জন্য গোটা পরিবার পরস্পরকে লতার মতো আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা নড়ছে। গোটা কলোনির একই অবস্থা। খওফ আর সন্নাটা ছেয়ে ছিল চারিদিকে। আমরা বুঝতে পারছি একটু একটু করে রাত বাড়ছে। বাইরের দৃশ্য দেখা সম্ভব ছিল না। তবু কখনও কখনও 'পঞ্জি েদের সন্ত্রস্ত ডাকাডাকি শোনা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর যখন পাখিরাও নিস্তব্ধ হয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম রাত আস্তে আস্তে আরও গভীর কালো হচ্ছে। পরিবেশ এতটাই গুমোট যে বাড়ির ভেতরটাই বিনা আগুনেই জতুগৃহ মনে হয়। বাইরেও হাওয়া বইছিল না। বোধহয় 'মন্জর' দেখে পবনদেবও থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। রোজ রাতে ঘুমোবার সময় খিড়কি দিয়ে মিষ্টি ফুরফুরে একটা ঠান্ডা বাতাস রোজ ঘুমপাড়ানি স্পর্শ দিয়ে যেত। তার সঙ্গে একটা বুড়ো গাছের পাতার খসখস শব্দও শুনতে পেতাম। আজ না সেই ঠান্ডা হাওয়া আছে, না সেই পাতার মর্মরধ্বনি। গাছের পাতাগুলোও যেন স্তম্ভিত! তারা একটুও নড়ছিল না। অব্যক্ত আশঙ্কায় তারাও যেন স্থির হয়ে অপেক্ষা করছিল 'আনেওয়ালা' তুফানের। ওরাও বুঝেছিল যে এই নিস্তব্ধতা স্বাভাবিক নয়, ঝড়ের পূর্বাভাস।

আমাদের ব্লকের চারদিকে তখনও ধোঁয়া, মাংস পোড়ার উৎকট গন্ধ। দাঙ্গাইরা মাঝেমধ্যেই কোনো-না কোনোদিকে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে তার প্রমাণ ওই 'বদবু'তেই পাওয়া যাচ্ছিল। তারা শান্ত হয়নি, বসেও নেই তা বুঝতে পারছিলাম। এর মাঝখানে আমাদের এলাকার এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিই সবচেয়ে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় তো আমিও ভাবতে শুরু করলাম, এখনও ওরা আসছে না কেন! শুনলে মনে হবে পাগলের প্রলাপ, কিন্তু তখন ওই আট বছরের শিশুর মাথায় একটাই চিন্তা কাজ করছিল। অনেক তো হাঙ্গামা হল। লড়াই হল। প্রতিরোধও হল। আর কেন? এবার সব খতম্ হলে হয় না?

দেওয়ালে আবছা অন্ধকারে ওয়াহেগুরুর ছবিটা ঝুলছিল। হঠাৎই সেদিকে চোখ যেতেই মনে হল, সেটা বুঝি একটু কাত হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন উদ্ভট একটা চিন্তা বিদ্যুতের মতো মাথায় খেলে গেল। ছবিটা যখন সোজা থাকে, ওয়াহেগুরু তখন শান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। ওটা কোনোদিন ওখান থেকে একচুলও নড়ে না। আজ তবে এই বদ্ধ ঘরের মধ্যে নিজের জায়গা থেকে সরে গেল কী করে? ছবি কাত হয়ে গেলে তো তিনি আর আমাদের দিকে তাকাবেন না! তবে কি তিনিও আমাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন! তাঁর কৃপাদৃষ্টিও তবে এই অন্তিম মুহূর্তে সরে গেল...!

"খু-উ-উ-ন কা বদলা খু-উ-উ-ন! গ-দ্দা-র সা-ফ ক-রো।"

কানের কাছে আচমকাই বুঝি সহস্র তোপ গর্জন করে উঠল। উন্মত্ত জনতার হিংস্র চিৎকারে গোটা কলোনিটাই কাঁপছে। আমার বুকের পাঁজরগুলো হাড় নয়, কাচের মতো ঝনঝন করে ওঠে তার ধাক্কায়। আর একটু হলেই বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেত। সরবজিত প্রা-জি ওই অন্ধকারেই অস্ফুটে 'আঁ-ক' করে উঠল। আমনপ্রীত বুঝি স্তব্ধ হয়ে তখনও ভাবছিল, গদ্দার কাকে বলছে ওরা? আমাদের কেউ মারতে কেন চায়? সে তো শুধু অ্যাম্বুলেন্স চালাতে চেয়েছিল। আমাদের গরীব বাপুর ছোটখাটো নিরীহ অটো তার পছন্দ নয়। সেজন্যই বড়োসড়ো অ্যাম্বুলেন্স গাড়িকে বেছে নেওয়া। আর সরবজিতের একমাত্র স্বপ্ন ছিল গোলগপ্পে বেচা বা মেয়েদের নরম হাত চেপে ধরে রেশমি কাচের চুড়ি পরিয়ে দেওয়া। সরব প্রা জির কাচের চুড়ির ঠুঠুন, রিনরিন ঝঙ্কার বড়ো পছন্দের! মেয়েদের নরম ফর্সা হাত আরও বেশি। সবচেয়ে ছোটো ভাই গুল্লু তো আবার সিপাহী বা ফৌজি হতে চায়। এর মধ্যে কোন্টা পাপ? কোল্টা গদ্দারি? অ্যাম্বুলেন্সওয়ালা, অটোওয়ালা দেশদ্রোহী, চুড়িওয়ালা না

সিপাহী? এই প্রশ্নের উত্তর সে শুধু খুঁজেই মরল। এ জীবনে সে জবাব আর পাওয়া হয়নি তার...!

জনতার গর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে এল বিপন্ন মানুষের পরিত্রাহী চিৎকার। নর-নারী যুগ্মকণ্ঠের আর্তনাদ ও কান্না। তার সঙ্গে সমস্বরে কোলাহল, "ব-চা-ও! ব-চা-ও! ঘর মেঁ আগ লগা দিয়া! কোই বচাও মৈনু।"

ব্যাপারটা বুঝতে খুব বেশি দেরি হল না। দিদি হেসে কেঁদে সাময়িক বিরতি নিয়েছিল। এবার ফের সেই খলখলে হাসি হেসে বলল, "আ গয়া রে! আ গয়ি মেরি বারাত!"

বারাত। ওর কথা শুনে বেবের কান্না আরও বেড়ে গেল। সত্যিই তো। ওর বাড়িতে তো 'বারাতি'দেরই আসার কথা ছিল। সেই প্রস্তুতিই তো চলছিল। কয়েকঘণ্টা আগেও ঢোলকি, সঙ্গীত আর রিশতেদারের সমাগমে আনন্দ উপছে পড়ছিল এই বাড়িতে। আজও চোখ বুজলে ওর হাতের গাঢ় রঙের মেহেন্দির কারুকাজ স্পষ্ট দেখতে পাই। তখনও সমস্ত 'জেবর', কনের পোষাক, লেহেঙ্গা পড়ে ছিল কাঠের আলমারিতে। গলার ভারি রানিহার-জুগনি হার-মোতি হার, পিপলপত্তি কানের বালি, কঙ্গন, সগগি ফুল, নথনি, চুড়িয়াঁ, অঙ্গুঠি, মেহঙ্গা পাজেব, মাঙ্গটিক্কা, আরও কত কী! পাজেব ছাড়া সব সোনার। মেয়েকে রাজকন্যার মতো সাজিয়ে নভজ্যোতের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন বাপু। তার জন্য নিজেকেও নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। যত জমা পুঁজি ছিল সবকিছু 'দাঁও' লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কী চেয়েছিলেন তিনি, অথচ কী হল! বারাত এল ঠিকই, তবে মৃত্যুর।

বাইরের উন্মত্ত ভয়াবহ চিৎকার ক্রমাগতই বাড়ছে। একদল চেঁচাচ্ছে, "মারো...

মারো...!" আর একদল কাঁদছে, "বচাও...বচাও...।" তার সঙ্গে চড়চড় করে একটা অদ্ভুত শব্দ। দিদি ফের আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, "আতশবাজি হচ্ছে বুঝি?" তারপরই সে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে একখানা জানলা সজোরে দড়াম করে খুলে দিয়েছে। জানলা খোলা মাত্রই উৎকট ধূমকুণ্ডলী আর পোড়া গন্ধের ঝাপটা ভেতরে এসে দম বন্ধ করে দিল। অদম্য কাশিতে ভেঙে পড়ল সরব আর আমন। চোখ, নাক সব জ্বলছে! এমনকি জ্বালার চোটে চোখ জলে ভরে যাচ্ছে, তাকাতেও কষ্ট হচ্ছে। আমি কাশতে কাশতেই অতিকষ্টে ঝাপসা চোখে বাইরের দৃশ্যটা দেখলাম। ধোঁয়ার আড়াল একটু সরতেই বুঝলাম সর্বনাশের 'ঘড়ি' এসে গিয়েছে। যে 'আফতে'র অপেক্ষায় ছিলাম, সে দুড়দাড় মারমার করে এসে উপস্থিত। আমাদের কলোনির বাড়িগুলো এবার ধূ ধূ করে জ্বলছে। এতক্ষণ এই এলাকার আশেপাশে এই ছবিই দেখছিলাম। এখন সেই আগুনই মাত্র ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে আমাদের পরিচিত জনের বাড়িগুলোকে সাপটে ধরেছে! 'আগ কি লপ্টে' একেবারে শেষনাগের মতো লাল লাল সহস্র ফণা তুলে লকলক করে উঠছে। তার সঙ্গে বদবুদার কালো ধোঁয়ার মোটা কুণ্ডলী জড়িয়ে জড়িয়ে, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। চতুর্দিকে শুধু গাঢ় রক্তবর্ণের আগুন। আর তার মধ্য দিয়েই আততায়ীরা সগর্বে হাতে জ্বলন্ত মশাল, তরোয়াল নিয়ে 'রে রে' করে ছুটে আসছে এদিকেই! আমি সেদিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। আকাশের তারাও বুঝি গুণে শেষ করা যায়। কিন্তু মশালের যে শেষ নেই। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত কলোনির এ মাথা থেকে ও মাথা গিজগিজ করছে অগুণতি ক্রুদ্ধ মশালের গনগনে জ্বলন্ত চোখ। তার 'তাদাত' গোটা মঙ্গলপুরী ছাড়িয়ে কতদূর চলে গিয়েছে তার ঠিক নেই। এই একটা ব্লকের কয়েক ঘর শিখ পরিবারকে মারার জন্য কি গোটা ভারতবর্ষই চলে এসেছে।

হতভাগ্য শিখেরা জানত যে এই দুর্বল বাড়ি তাদের বাঁচাতে পারবে না। যতই খিল, হুড়কো দিক না কেন, কয়েকটা লাথি মারলেই ভেঙে পড়বে দরজা। তারপর জুহ্লাদদের আটকানোর আর কোনো উপায়ই থাকবে না। পরিণতি তাদের জানাই ছিল। কিন্তু যেতই বা কোথায়? 'দাঙ্গাইরা' এক তারিখ থেকেই গোটা মঙ্গলপুরীকে ঘিরে রেখেছে। যখন খুশি যে কোনো গলিতে ঢুকছে, কাটছে, মারছে, চলে যাচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পরেই দ্বিগুণ উৎসাহ আর শক্তি নিয়ে ফিরে এসে পাশের গলির লোকগুলোকে মারছে, জ্বালাচ্ছে, ফের ফেরত যাচ্ছে। এত কাটাকুটির পর বোধহয় ক্লান্ত হয়ে নাশতা-পানি করছে। খুনে ভরা হাত, আঙুল, কবজি

ডুবিয়ে খানা খেয়ে নিজেদের চাঙ্গা করেই আবার নিধনযজ্ঞে নেমে পড়ছে। দলে দলে পালা করে পাহারা দিচ্ছে, তবু জমি ছেড়ে নড়ছে না!

এর মধ্যে এতটুকুও বিরাম ছিল না যে কেউ ওখান থেকে পালিয়ে বাঁচবে। যারা চেষ্টা করেছে, তাদের ওরা আগেই মেরেছে। শুনেছি কিছু সৌভাগ্যবান শিখদের তাদের হিন্দু, মুসলিম বন্ধু বা প্রতিবেশীরা লুকিয়ে রেখেছিল। কেউ আবার খোদ এইমস্ হসপিটালে গিয়েই আশ্রয় নিয়েছিল। তবে কয়েক ঘণ্টা পর দাঙ্গা এমন উগ্র হয়ে উঠেছিল যে এইস কর্তৃপক্ষও সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে শিখ পরিবাররা হসপিটালের ভেতরেও সুরক্ষিত নয়। 'মব্' যে কোনো মুহূর্তে এসে হসপিটালেও আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। কয়েকজন শিখের জন্য গোটা হাসপাতাল পুড়িয়ে দিতেও তারা কসুর করবে না। প্রভাবশালী ও ধনবান শিখেরা নিজেদের ঘাম-রক্ত দিয়ে গড়া সম্পদ, গাড়ি-বাড়ির মোহ মায়া ছেড়ে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। দাঙ্গাইরা তাঁদের না পেয়ে ঘর ভাঙচুর করেছিল। দামি জিনিসপত্র-অলঙ্কার, টাকা-পয়সা লুটপাট করে শেষে বড়ো বড়ো বাড়ি, বাংলো, দামি গাড়ি—সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল। হতভাগ্য মানুষগুলোদের মধ্যে যে ক-জন একটু প্রভাব খাটিয়ে বিদেশি দূতাবাসে গিয়ে আশ্রয় নিতে পেরেছিলেন, তাঁরা প্রাণে বেঁচেছিলেন। আর যা-ই হোক, ফরেন এম্ব্যাসিতে গিয়ে মারপিট করার দুঃসাহস 'দাঙ্গাই দের ছিল না। বৈদেশিক সম্পর্ক নষ্ট করতে গেলে ওদের নিজেদেরই কপালে দুঃখ ছিল। কিন্তু তাও বা ক-জন পারত? যেখানে স্বয়ং দেশের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং বিপন্ন, সেখানে সাধারণ-গরীব মানুষগুলো কোথায় যেত? খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকত না দিল্লির রাস্তায়?

অগত্যা তারা ঘরেই আশ্রয় নিয়েছিল। ঘর শব্দটা তখন কবর বা চিতারই সমার্থক। আগেও বলেছি, এখনও বলছি-আসলে মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের কবরে বা চিতায় উঠে তৈরি হয়েই বসেছিল। ওই গোটা দেশে কোথাও শিখদের কোনো 'ঘর' ছিল না। তবু জেদি মানুষগুলো প্রথমেই হার মানতে চায়নি। কেউ দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে তালা এঁটেছে। কেউ দরজার ওপরে আলমারি, খাট, টেবিল, আরও যা যা সামান্য আসবাব ছিল তা চাপিয়ে, ঠেকা দিয়ে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছিল। কী করুণ আর অবুঝ আশা! যেন ওইটুকু বাধাতেই ভঙ্গুর দরজা হয়ে উঠবে গড়ের লৌহপ্রাচীর। হয়তো আততায়ীরা তা অতিক্রম করে ঢুকতে পারবে না!

দাঙ্গাইরা শিখদের এত কাণ্ড দেখে বোধহয় মনে মনে হেসেছিল। প্রথমে বেশ কয়েকবার লাথি মেরে দেখল। আরও একটু জোর 'আজমালে'ঠিক ভেঙে যেত। কিন্তু এতঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে ভাঙাভাঙি করে তারাও বুঝি বিরক্ত আর অধৈর্য হয়ে গিয়েছিল। তারপর আর দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টাই করল না। বরং দোর বন্ধ দেখে বিনাবাক্যব্যয়ে হাতের মশালগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে শুরু করল বাড়ির ছাতে। নারকীয় উল্লাসে তার ওপর তেলের জেরিকেনও উলটে দিতে ভুলল না। ফলস্বরূপ চিঙ্গারি নয়, একলপ্তেই দাবানলের মতো আগুন জ্বলে উঠেছে। কী ভয়াবহ তার ব্যাপ্তি। কী আগ্রাসী সে শিখা!

যারা দরজা ভেতর থেকে এঁটে বসেছিল, তাদের যে কী হাল হয়েছিল তা বলার নয়। ওদিকে মাথার ওপর আগুনের শিখা ভলকে ভলকে উল্কা উগরে দিচ্ছে। হা হা করে গ্রাস করার জন্য বিরাট দানবের মতো দ্রুত ধেয়ে আসছে তাদের পেছন পেছন। খিড়কি, ছাত সব জ্বলছে। বাইরে না বেরোলে ঘরের ভেতরই পুড়ে মরবে। আবার বাইরে যমদুতেরা টায়ার, তরোয়াল, আগুন—সব নিয়ে 'সোয়াগতের' জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যেদিকেই যাক, মরা নিশ্চিত। কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাচ্ছিল তারা। তাদের মনের অবস্থা শুধু 'ওয়াহেগুরু'-ই বুঝেছিলেন!

কথায় আছে 'অতি চালাকের গলায় দড়ি'। যারা দরওয়াজা পোক্ত করার জন্য ভারি ভারি আসবাবপত্র এনে চাপিয়েছিল, তারা এবার আগুনের ছ্যাঁকা খেয়ে চিৎকার করতে করতে বেরোনোর পথ খুঁজছে। কিন্তু কপালই এমন যে একমাত্র বাইরে বেরোনোর রাস্তাটা একটু আগেই নিজেদের হাতে বন্ধ করেছে যে! বেরোবে কোন্ পথে। 'আগ' তো মানুষ নয় যে

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবে। সে জ্বালানির ইন্ধন পেয়ে দ্রুত তেড়ে এসে মানুষগুলোকে পোড়াতে শুরু করেছে। জ্বলন্ত মানুষগুলো পরিত্রাহি চিৎকার করে বাইরে বেরোনোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। অথচ যে খাট, টেবিল, আলমারি দিয়ে তারা দরজায় ঠেস দিয়ে রেখেছিল, সেই অতি বিশ্বস্ত আসবাবই এবার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়াল। ওগুলোকে সরানোর জন্যও তো নির্দিষ্ট সময় লাগে। ভারি ভারি ফার্নিচারগুলো সরানো যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। যতক্ষণে ওরা ওগুলোকে হটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ততক্ষণেই আগ ওদের ধরে ফেলেছে। দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে চামড়া চড়চড় করে পোড়াতে পোড়াতে ক্রমাগতই মাংস পেশীর মধ্যে ঢুকছে। তখন কে কাকে দেখে, কারই বা দরজা খুলে বেরোনোর মতো জ্ঞান থাকে।

দাঙ্গাইরা বাইরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। অত্যন্ত উল্লসিত তারা। ভেতর থেকে যে পরিমাণ মরণ-আর্তনাদ ভেসে আসছিল তাতে বুঝেছে যে হতভাগা নির্বোধ শিকার এবার নিজের জালে নিজেই ফেঁসেছে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যে ভুল করেছে তা এখন ওদেরই মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা তবু হাল ছাড়বে না। একদল খোলা তরবারি, চপার নিয়ে সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এক দল সোৎসাহে একের পর এক জ্বালানি তেলের ডিব্বা শেষ করছে বাড়িগুলোকে ঘিরে ধরে। আর চরম আক্রোশে বলছে, "কী ভেবেছিস? এভাবে রক্ষা পাবি? এবার ভেতরেই পুড়ে মর! অররে ঔর পেট্রোল, ডিজেল, ঘাসলেট লাও রে! ঘর মেঁ ছিপকে বৈঠা হ্যায় চুহা! ঘর মেঁ হি ইনকি চিতা জলাতে হ্যায়!"

যস্যিদিদি চুপ করে খিড়কি দিয়ে আতশবাজি দেখছিল। সেই ফাঁকে আমি একঝলক দেখতে পেয়েছিলাম, জ্বলন্ত একটা বাড়ির খিড়কি আচকা খুলে গেল। সেই খিড়কিতে 'অফ্রা-তরি' করতে করতে এসে আছড়ে পড়েছে অজস্র মুখ! তাদের মুখগুলো শনাক্ত করার উপায়ও ছিল না। ততক্ষণে পুড়ে ঝামা হয়ে গিয়েছে। এরাও সেই হতভাগ্যদের মধ্যেই ছিল যারা দরজার ওপর পৃথিবীর সব ভার চাপিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই ভারেই চাপা পড়ে কাল হল। ওরা চেঁচাতে পারছিল না। কারণ চেঁচানোর জন্য গলাটা অক্ষত থাকতে হয়! ওদের কারোর মাথার চুলে, কারোর পাগড়িতে ঝলসে ঝলসে উঠছিল আগুন। আমি শুধু কয়েকটা বিস্ফারিত চোখ দেখেছিলাম, আর পোড়া কাঠের মতো বাড়ানো হাত! ওরা হাত বাড়িয়ে নিজেদের আততায়ীদেরই বোধহয় কিছু বলতে চাইছিল। হয়তো অনুরোধ করতে চাইছিল, 'বাঁচাও, আর পুড়তে পারছি না... আর সহ্য হয় না...।"

দাঙ্গাইরা তাদের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তাদের মৃত্যুযন্ত্রণার মজা নিল। তারপর বিদ্যুৎবেগে এক প্যাকেট সেই জ্বালাময়ী 'সফেদ পাউডার' ছড়িয়ে দিল ওদের সবার মুখের ওপরে। মানুষগুলো এতক্ষণ আগুনকে দেখে জ্বলছিল, এবার না দেখেই পুড়বে। আমি নিশ্চিত, মুখের চামড়া, মাংস কীভাবে গলে গলে খসে পড়ছে

তা দেখার জন্য ওদের একটাও চোখ আর আস্ত থাকবে না।

যারা অতটা বাড়াবাড়ি করেনি, তারা আগুনের আঁচ পেয়েই ছুটে বাইরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু যেই দরজা খুলেছে, অমনি তাদের ওপর সবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জল্লাদের দল। কৌরের দল বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদছিল। তাদের মুখের ওপর ধুঁয়াদার অ্যাসিড চলকে পড়ল! মুহূর্তের মধ্যে কান্না বদলে গেল প্রাণান্তকর 'চিঁখে'। সর্দারদের গলায় তরোয়াল, চপারের কোপ! কলোনির জমিন কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই 'রাখে', রক্তে ভরে গিয়েছিল। আর আসমা মানুষের মরণ-আর্তনাদে। শুনেছি দেবতারা নাকি আকাশে থাকে। সেদিন বোধহয় ঈশ্বরও আর সইতে না পেরে কানে আঙুল দিয়েছিলেন। অথবা কে জানে, হয়তো বা বধিরই হয়ে গিয়েছিলেন।

"সালে মাদারচৌদ। বহার নিকল!"

এবার আমাদের বাড়ির দরজায় প্রবল আঘাত। হালকা দরজাটা থরথর করে কেঁপে উঠল। আমরা কিছু বোঝার আগেই অনেকগুলো ভারি পদাঘাতে তালাসুদ্ধই ধড়াম করে ভেঙে পড়ল কাঠের দুর্বল দরজা। কতগুলো ভয়ংকর দর্শন মানুষ দুড়দাড় করে দুর্দান্ত

তুফানের মতো ঢুকে এসে আমাদের সবাইকে হিঁচড়ে-ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে বাইরের দিকে চলল। বাপুর কুর্তা তাদের টানেই ফড়ফড়িয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। ওরা ওঁর টুঁটি চেপে ধরে নিয়ে গেল। বেবে আর দিদির লম্বা চুল ধরে টানছিল ওরা। বেবের ভয়ার্ত চিৎকার আর কান্না শুনতে পাচ্ছি। দিদি ওদের সঙ্গে 'হাতাপাই' করছিল। কিছুতেই বাইরে যাবে না সে! প্রচণ্ড আক্রোশে হাত-পা চালাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, "তোদের সবাইকে শেষ করব শয়তান... আমার সরতাজকে ধোঁখে সে মেরেছিস তোরা!...এবার হয় তোরা মরবি, নয় আমি মরব!"

কিন্তু তা সত্ত্বেও দুষ্কৃতীরা তাকে মাটিতে ফেলে মাটির ওপর দিয়েই চুল ধরে হিড়হিড় করে নিষ্ঠুরভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। ওর কোমল মাখনের মতো ত্বক রুক্ষ মেঝে, মাটির ঘষা খেয়ে কেটেছড়ে যাচ্ছিল। তবু যস্যিদিদি পাগলের মতো লড়ে যাচ্ছে। কয়েকজন আমাদের ছোটো ছোটো পাগড়ির ওপরে এত জোর ফলাচ্ছিল যে মনে হল পাগড়ি সুদ্ধ মুণ্ডুটাই উপড়ে আসবে। আমাদের পাগড়ি আর ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা। সরব আর আমন তখন বলিপ্রদত্ত পশুর মতো আর্তচিৎকার করছে। আমি চিৎকার করতে চাইছি, তবু গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না!

ওই অবস্থাতেই শুনতে পেলাম গুরশরণ তাওজির কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর। ওঁকে আর তাইজিকেও একদল লোক টানতে টানতে নিয়ে আসছে। নিঃসীম আতঙ্কে তাওজির গলা থরথরিয়ে কাঁপছে। তা সত্ত্বেও উচ্চকণ্ঠে 'সুখমণি সাহিব' আওড়াচ্ছেন। মৃত্যুর আগের পবিত্র মন্ত্রজপ। কম্পিত অথচ তেজি স্বরে উচ্চারিত হচ্ছে -

"জিসু মনি বসৈ সুনৈ লায় প্রীতি, তিসু জন আওয়ৈ হরি প্রভু চীতি। জনম মরণ তা কা দুখু নিবারৈ, দুলভ দেহ তৎকাল উধারৈ। নিরমল সোভা অমৃত তা কী বাণী, একু নামু মন মাহি সমানি।

দুখ রোগ বিনসে ভয় ভরম, সাধ নাম নিরমল তা কে করম...!"

বাইরে তখন ক্রুদ্ধ, খুনি জনতার ভিড়। তারা রাগে, আক্রোশে ফুঁসছে। হাতে লাল রক্তে স্নান করা তরোয়াল, রড, চপার, চাকু—আরও কত অস্ত্র। তাদের কাউকে আমি চিনি না। এখন সবাইকে চাইলেও মনে করা সম্ভব নয়। কারণ ভিড়ের কখনোই নির্দিষ্ট কোনো মুখ থাকে না। তাদের সবাইকে দেখতে একরকম। ভেড়িয়ারা ভেড়িয়াই, তাদের আলাদা আলাদা চেহারা থাকে না। তবু তাদের মধ্যে কয়েকটা মুখকে চাইলেও এ জীবনে ভুলতে পারব না। ওই বয়েসেই সেই কয়েকটা মুখ আমার চোখে, মস্তিষ্কে আর আত্মায় বসে গিয়েছিল।

আশেপাশে যা ঘটছিল তা দেখে সেই আট বছরের শিশু 'হালাল' হওয়ার আগের 'বক্রা'—র মতো কাঁপছিল। তার আজন্ম পরিচিত কলোনির মানুষগুলোকে ওরা কাটছিল, জ্বালাচ্ছিল। চারদিকে শুধু মৃত্যু আর লাশ। কেউ সারা গায়ে আগুন নিয়ে দাপাচ্ছে। কেউ সফেদ পাউডারে জ্বলছে। মানুষ বলে ওদের কাউকে চেনাই যাচ্ছিল না। এক ধারে সারি সারি পোড়া কাঠের মতো শবদেহ। তাদের ঘরে তখনও আগুন জ্বলছে। কিন্তু একদল সেই জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকেই ভাঙচুর আর লুটপাট করতে ব্যস্ত। আর একদল কৌরদের কাপড় আর ইজ্জত 'ফাঁড়তে' নেমে পড়েছে! জন্তুর মতো তাদের উলঙ্গ করে সর্বসমক্ষেই গণহারে চড়াও হচ্ছে নির্লজ্জের দল! বয়েসের কোনো বাছবিচার নেই। সেই মেয়েদের ভিড়ে পাঁচ ছ-বছরের শিশুকন্যা থেকে শুরু করে বয়স্কা মহিলারাও ছিলেন। তাদের মধ্যে আমার তাইজিও অন্যতম। ওঁর, ওদের হাত পা সব অনেকগুলো লোক চেপে ধরে রেখেছে। পা দুটোকে দু-দিকে টেনে এমন ফাঁক করে ধরে আছে যে যোনিপথটাও সবার চোখের সামনে একদম স্পষ্ট! তারপর রাক্ষসেরা সব সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওদের ওপর। একসঙ্গে একাধিক লোক যে যেভাবে পারে সর্বশক্তি দিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে ব্যস্ত কারণ এক এক করে বলাৎকার করার মতো প্রয়োজনীয় সময় বা ধৈর্য কোনোটাই নেই। মেয়েগুলো সেই পৈশাচিক অত্যাচারের যন্ত্রণায় চিৎকার বা প্রতিবাদ করলে মুখে অ্যাসিডের শিশি উলটে দিচ্ছে! তাইজির মুখে অ্যাসিডের ধোঁয়া। এই নারীরা কেউ আমার দিদির মতো, কেউ বোনের মতো। কাউকে আবার শৈশব থেকেই বেবে-বুয়ার মতো দেখে এসেছি। তাইজির বুকে মাথা

রেখে 'লোরি' শুনেছি।

ওঁর পবিত্র বুক থেকে ধূপের গন্ধ আসত। এখন শুধু রক্তমাংসের নাঙ্গা দুটো গোলক। চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো থরথর করে কেঁপে উঠছে। ওরা সেটা দেখে মজা পাচ্ছে, গরম হচ্ছে। কেউ সেগুলোকে দাঁতে ছিঁড়ছে, কেউ নখে! ঐ পবিত্র বুককে দলিত-মথিত, মর্দিত করছে একাধিক মানুষের হাত। ওঃ ভগবান...!

আট বছরের মাসুম চোখ লজ্জায়, ঘেন্নায় বুজে আসতে চায়। আজ পর্যন্ত নারীদেহ সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না। কৌতূহল বা লোভও নয়। কলোনির কৌররা সবাই আমার আত্মীয় সমান। আজ তাদের সবার রক্তাক্ত নগ্ন দেহ দেখে চোখ বুজে ফেললাম। প্রচণ্ড একটা 'উলটি' আসছিল! এ আমার চোখের সামনে কী হচ্ছে। ওদের গায়ে তো একটা সুতোও নেই! কতগুলো উলঙ্গ কুৎসিত মানুষ ওদের ওপর চড়াও হয়ে এসব কী নোংরা, বিকৃত কাজ করছে। আমার কলোনির মেয়েরা... আমার তাইজি...। ওয়াহেগুরু! এ কী দৃশ্য দেখছি! এ যে স্বচক্ষে দেখাও মহাপাপ।

যে উর্দিধারী সিপাইরা আমাদের 'রক্ষা' করার জন্য দাঁড়িয়েছিল, তারা এখনও সেখানেই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখ, মুখ নির্বিকার। হাতে রাইফেল! অথচ ওটা কোনো কাজেই লাগবে না। ওর বদলে একটা কাঠের টুকরো ধরিয়ে দিলেও বিশেষ ক্ষতি হত না। ওদের দেখে মনে হচ্ছিল, আদৌ এখানে কিছু হচ্ছে না। গান্ধীজির তিন বাঁদরের মতো ওরাও অন্ধ, বধির ও মূক। উলটে তারিয়ে তারিয়ে শিখ নারীদের বলাৎকার দেখে উষ্ণ আমেজ নিচ্ছে। দু-চোখে তাদের যৌনাঙ্গ চাটছে। কেউ কেউ অস্ফুটে 'সি সি' করে শীৎকারও করছে! এই পুলিশ। এই আইন ও কানুনের রক্ষী।

কয়েকজন দাঙ্গাই হরি সিং-এর বেবে রশ্মি কৌরের কাপড় ধরে টানাটানি করছিল। হরি সিং তার মাকে বাঁচানোর জন্য ছোটো ছোটো হাত পা ক-টা সম্বল করে লড়াই করছে আর সেই 'নালায়ক' পুলিশদের উদ্দেশ্যে চেঁচাচ্ছে, 'ছোড়...ছোড় বেবে কো!...কোই বচাও...ব, চা, ও! ও থানেদার সাব! ব-চা-ও হ-মেঁ!"

"সুয়ার কি ঔলাদ!"

ওই পরিস্থিতিতে কে কাকে বাঁচায়? থানেদার সাবরা তো নিজেই ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। হরির কাতর প্রার্থনা কেউ শুনল না। খাঁকি উর্দি যথারীতি নিস্পৃহ, ভ্রূক্ষেপই নেই। উলটে দুটো লোহার রডের বাড়ি একসঙ্গে সপাটে হরির মাথায় পড়ল। আমি আঁতকে উঠলাম। ওর খুলিটা ভেঙেই গেল বুঝি। মাথা ফেটে গিয়ে গলগল করে রক্তের 'ফুহার' ছুটল। সে অর্ধ অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। তাজা রক্তে মাটি ভাসছে! রশ্মি মা হাতজোড় করে কেঁদে বলল, "ওকে মেরো না! রহম্ করো। ও আমার একমাত্র ঔলাদ। তোমরা যা চাও, নিয়ে নাও। আমার ইজ্জতও নাও। কিন্তু জানটা বখশ দাও।

এই ছেলে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ও আমার বংশের শেষ চিরাগ।" "চিরাগ!"

এই কণ্ঠস্বরটা শুনে চমকে উঠলাম। এই মোলায়েম আওয়াজ কোনোদিন ভুলবো না। এইবার খুনিদের ভিড়কে একসাইডে ঠেলে যে লোকটা এসে দাঁড়াল তার মুখ আমি আজও ভুলিনি। মশালের আলোয় নিষ্ঠুর চোখদুটো চকচক করছিল। চৌকো চোয়ালে নৃশংসতা। দিনের আলোতেও এই লোকটাকে দেখেছি। তখন ও উর্দিতে ছিল। এখন উর্দি নেই কিন্তু অমানুষটা একই। এই লোকটাই আমাদের ধোকা দিয়েছে। এ-ই সরতাজকে খুন করেছে! আ.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তা!

লোকটা মৃদু হেসে সেই একই ঠান্ডা স্বরে বলল, "বংশের একমাত্র প্রদীপ বলছিস্? তাহলে চিরাগকে 'লও' ছাড়া রেখেছিস কেন? বলিস্ তো জ্বালিয়েই দিই।" বলতে বলতেই সে ভিড়ের দিকে ফিরল, "চলো ভাইলোগ, চিরাগ কো থোড়া জলা দো। প্রদীপে আগুন লাগিয়ে দাও। দেশ অন্ধকার হয়ে আছে, একটু রওশন হোক।"

"দ-ত্তা-সা-ব!"

লোকটাকে চিনতে পেরে ও তার কথার অর্থ বুঝে রশ্মি মা কেঁপে ওঠে। সজল চোখে

নিরুপায় দুই হাত জুড়ে ফেলেছে, "এমন জুলুম কোরো না! তুমিই আমাদের জান-অসমত-ইজ্জতের রক্ষক। যে রক্ষা করে তাদের আমরা দেবতা বলেই মানি। এমন কথা তোমার মুখে মানায় না। রহম্ করো। মেরি জান লে লো। আমার পুত্তরকে বখশ্ দাও!"

"সাপের বংশকে দুধ কলা দিয়ে পালতে নেই। সাপোলা যত ছোটোই হোক, ফণা কুচলে দিতে হয়।" দত্তাসাব বিরক্ত হয়ে ফের জনতার দিকে তাকাল, " ক্যায়া হুয়া আও ভাইলোগ, এখানে শিখদের যত চিরাগ আছে, সবকো একসাথ জলা দো। দিওয়ালি ভি মনা লেতে হ্যায়।"

খুনিদের ভিড় নেকড়ের উল্লাসে ফেটে পড়ল। শুধু এই কথাগুলোরই বুঝি প্রতীক্ষা ছিল। আমার চোখের সামনেই হরি সিং, আমনপ্রীত, সরবজিত এবং আরও কিছু শিশু, কিশোর ও নাবালকের ওপর লাফিয়ে পড়ল ওরা। মুহূর্তের মধ্যে ওদের গলা দিয়ে বুক অবধি নেমে গেল কতগুলো কালান্তক মোটা টায়ার! হরি সিং-এর চোখ দুটো আতঙ্কে ফেটে যেন বাইরের দিকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো আতঙ্ক এবার বাস্তবের রূপ ধারণ করতে চলেছে। সরবজিৎ আকাশ পাতাল ফাটিয়ে আর্তনাদ করছিল। কখনও উন্মত্ত পশুর মতো ঝটপটিয়ে নিজেকে ছাড়াতে চাইছে, কখনও হাউহাউ করে কেঁদে প্রাণভিক্ষা করছে। আমনপ্রীত বিহ্বল। ওর শরীরের যা ওজন তার থেকে টায়ারটা বুঝি বেশি ভারি। সে বেচারি মৃত্যুর ভার নিতে না পেরে টলমল করছে দেখে একজন সজোরে এক লাঠির বাড়ি মেরে বলল, "হিলনা-ডুলনা নে-হি! সিধা খড়া রেহ!"

আমনপ্রীত এখন যেন মূক হয়ে গিয়েছে। তার মুখ যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলেও মুখে কোনো শব্দ নেই। প্রত্যেকটা শিশুই অবুঝের মতো, পাগলের মতো ছটফট করে নিজেকে মুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অথচ ওদের বুক থেকে শুরু করে 'বাজু'র ওপর এঁটে বসে আছে শক্ত ও টাইট টায়ার। হাত-পা ছোঁড়ার সুযোগটুকুও নেই, ঝটপটানিই সার। শত্রুর দল ওদের জোরে চেপে ধরে আছে। দৌড়ে যে পালাবে, তারই বা উপায় কই?

ওরা আমাকেও টায়ার পরাতে আসছিল। ভূপেন্দ্র দত্তা হাত তুলে থামাল। বলল, "আরে গাধা, সবগুলোকে একভাবে মারবি? মজা নেহি হ্যায় উসমেঁ। বোর নেহি হোতে তুম লোগ? বোর হো গয়া ম্যায় তো! এ তো ভয়ে অর্ধেক মরেই আছে। বাকিটা পরে হবে। যেগুলো আধমরা, সেগুলোকে ছাড়। অন্য প্ল্যান আছে। বাকিগুলোর গলায় আলোর নেকলেস পরা। একটু পাপ দূর হোক।"

বাপু এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে কোনো লাভ হবে না তা ওঁর আগেই জানা ছিল। তাঁর ঘাড় ধরে নতজানু করে বসিয়ে দিয়েছে 'মর্।' হাত পেছন থেকে কষে ধরে রেখেছে। মাথাটাও নড়াতে পারছিলেন না। তবু এবার কোনোমতে হাহাকার করে উঠে বললেন, "এ কেমন কথা সাব! ওরা নিষ্পাপ শিশু। ওদের ছেড়ে দাও। ইন্দিরাজির মৃত্যুর সঙ্গে ওদের কী সম্পর্ক? বদলে আমাদের জ্বালিয়ে দাও। কিন্তু ওরা মাসুম!"

"এগুলো সব বড়ো হয়ে বদলা নেওয়ার জন্য সেই ভিন্দ্রানয়ালে, বেয়ন্ত সিং, সতবন্ত সিংই তো হবে। শুনেছি পাঞ্জাবে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর উৎসব হচ্ছে। আমরা একটু উৎসব করব না?" দত্তাসাহেবের ইস্পাতের মতো ঠান্ডা কণ্ঠস্বরের মসৃণ উত্তর, "গদ্দারের খুন আছে তো! রিস্ক কিওঁ লেনা? চিন্তা করিস না। তোদের সপরিবারে নরকে পাঠাবো। ওখানে গিয়েই একসঙ্গে উৎসব করবি।" "স্যার!"

এবার ভিড় থেকে আর একটা লোক এগিয়ে এল। এখন সাদা পোষাক পরা থাকলেও তাকে চিনতে অসুবিধে হল না। এ-ও আর একজন পুলিশওয়ালা, 'আলা অস।' আই.পি.এস.। সকালে ভূপেন্দ্র দত্তার সঙ্গেই এসেছিল। এখনও পেছন পেছনই ঘুরছে। দত্তা তার দিকে ঘাড় ঘোরাল, "দেওধর চৌবে সাহাব। কী সমাচার?"

আই.পি.এস. দেবধর চৌবে আঙুল তুলে বাপু আর কম্পমান তাওজিকে দেখিয়ে বলল, "এই দুটোর খুব চর্বি চড়েছিল স্যার। একটা তরোয়াল নিয়ে হাতে মাথা কাটছিল। আর ওই বুড়টা লাঠি ঘুরিয়ে কত মানুষের মাথা ফাটিয়েছে তার ঠিক নেই। ওই ফৌজির সঙ্গে মিলে

'বোলে সো নিহাল'-এর নারা লাগাচ্ছিল, আর বহুত লাফাচ্ছিল। ওই বুড়ো শুয়োর বহুত নাচতে পারে।"

"বটে?" ভূপেন্দ্র-র ভুরু কুঁচকে গেল, "আমাদেরও একটু নাচ দেখাক তবে। দেখি কত লাফাতে পারে। বুঢ়াটাকে দিয়েই শুরু কর।"

"ও-য়া-হে-গু-রু।...ও-য়া-হে-গু-রু।"

তাওজির সারা শরীর তুফানের সামনে বুজুর্গ 'পেড়' এর মতো কাঁপছিল। তিনি ঠিকমতো নিজের পায়েই দাঁড়াতে পারছিলেন না। দুর্বৃত্তরা তাঁকে টানতে টানতে একপাশে নিয়ে গেল। তারা ওঁর মাথা দিয়ে টায়ার গলানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি কাঁপতে কাঁপতে মাথা এদিক ওদিক ঝাঁকিয়ে বাধা দিয়ে চলেছেন। কিছুতেই গলায় টায়ার পরবেন না। বয়স্ক মানুষটি বারবার মাথা ঝাঁকিয়ে আগুনের নেকলেস প্রত্যাখ্যান করছেন আর সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করছেন, "ও-য়া-হে-গু-রু। ও-য়া-হে-গু-রু!" "সর কো

পকড়!"

ভূপেন্দ্র দত্তা আর তার পুলিশবাহিনী চুপচাপ সব দেখছিল। এবার ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বেশ ষন্ডামার্কা মুরুব্বি লোক বেরিয়ে এসে নির্দেশ দিল, "কী রে! একটা বুডঢাকে সামলাতে পারছিস না? আরে, গলার পাশের একটা দুটো হাড্ডি ভেঙে দে না সালার! আবার পুরো মটকেই দিস্ না। শুধু একটু ভেঙে দিবি, মারবি না। তবে মাথা নাড়াতেই পারবে না। ইয়ে জিন্দা জনা চাহিয়ে।"

এই বুদ্ধিটা সবারই মনে ধরল। আরও একজন কালো, মুষকো চেহারার গুন্ডা ছুটে এসে 'তুরন্ত' তাওজির মাথাটা সজোরে চেপে ধরে সবেগে একটু ঘুরিয়ে দিল। ঐ চিল্লম-চিল্লি, অফরা-তফরির মধ্যেও স্পষ্ট শুনতে পেলাম হাড় ভাঙার শব্দ, "মট্!" এবার তাওজির মাথা একটু ঝুঁকে গেল। পাগড়িসুদ্ধ মাথাটা এলিয়ে পড়ল ঠিকই, কিন্তু তিনি তখনও বেঁচে আছেন। শুধু 'সর'বুঝি অসাড় হয়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় সজোরে কেঁদে উঠলেন, "ওয়াহেগুরু!"

সেই কান্নায় পাথরের বুক ফাটতে পারত। কিন্তু খুনিদের আত্মায় চিড়ও ধরল না। তাওজির মাথাটাকে ঝুলে পড়তে দেখে তারা আর দেরি করল না। ভূপেন্দ্র দত্তাও তাড়া দিচ্ছিল, "জলদি কর। কত সময় লাগাবি? টাইম বেশি নেই আর।" তাই দাঙ্গাইদের একটা অংশ ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ঝটপট জোর করে টায়ারটা পরিয়ে দিয়েছে তাওজিকে। হাত ওরা আগেই চেপে রেখেছিল, তাই হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নিরুপদ্রবে ওটাকে গুরশরণ তাওজির বুক অবধি আটকে দিয়ে ভালো করে কেরোসিন ছিটিয়ে দিল ওটার ওপরে। তাঁর পাগড়ি, লম্বা দাড়ি সুদ্ধ চামড়ার টায়ারও কেরোসিনে চপচপে হয়ে ভিজে গিয়েছে। আমার নাকে উগ্র তেলের গন্ধ এসে ঝাপটা মারল। আমি স্তম্ভিত হয়ে দেখছিলাম, একা তাওজি নয়, ওদের দল অন্যদিকে আরও অনেক সর্দারকে ধরে জবরদস্তি টায়ার পরাচ্ছে আর কেরোসিন ঢালছে। তার মধ্যে নভজ্যোতের দাদা পবনজ্যোত আর ওর বুড়ো বাপও আছে। পবনজ্যোত প্রাণপণে শত্রুদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে হট্টাট্টা চেহারার লোক। চার পাঁচজন মিলেও তাকে সামলাতে পারছিল না। কিছুতেই টায়ার পরবে না। বারবার ঝটকা মেরে ছিটকে দিচ্ছে সবাইকে। একটা শিখের বাচ্চাকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে সব বীরপুরুষ।

বেজন্মার বাচ্চা দেশের দেওয়া অমন জমকালো নেকলেস কিনা প্রত্যাখ্যান করে! এত বড়ো দুঃসাহস! এতক্ষণ তথাকথিত 'দেশসেবকরা' নরমে গরমে তাকে টায়ার পরানোর চেষ্টা করছিল। এবার তাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। একজন কোনো কথা না-বাড়িয়ে একটা তরোয়াল ঢুকিয়ে দিল তার পেটে। পবনজ্যোত ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠার আগেই আরও কয়েকটা তরোয়াল আর ছুরি আমূল তার বুক আর পেটে ঢুকে গিয়েছে। লোকগুলো সেখানেই থামল না। তারা সরোষে ঘপাঘপ কোপাতে শুরু করল তাকে পবনজ্যোতের অন্তিম আর্তনাদ তাদের উল্লসিত চিৎকারের মধ্যেই ডুবে গেল, "ইন্দিরা গান্ধী অ-ম-র র-হে! জান কা বদলা

জান!"

চোখের সামনে আমি পবনজ্যোতকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম। ওর পেট দু-ফাঁক হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র তরোয়ালের ঘায়ে আগেই বেরিয়ে এসেছিল। এতদিন শুধু আস্ত মানুষ দেখে এসেছি। মানুষের গুর্দা, যকৃত, পাকস্থলী কেমন হয়, তাও আজ দেখা হয়ে গেল। উলটিটা আর আটকে রাখতে পারিনি। ঐ বীভৎস অঙ্গ, আঁশটে গন্ধে হড়হড় করে বমি করে ফেলেছিলাম। পেটে কিছু ছিল না, তাই একরাশ তেতো জলই উঠল। আশ্চর্যের ব্যাপার, ওরা পবনজ্যোতের পুরো বুক, পেট চিরে ফাঁক করে দিয়েছিল। তবু ও মরেনি। খুনিরা ওর পূর্ণাঙ্গ অপারেশন করে যখন রক্তমাখা হৃৎপিণ্ডটাকে শিরা ধমনী সুদ্ধ বাইরে বের করে আনল, তখনও সেটা ধুকপুক করছে। আমি স্বচক্ষে তার স্পন্দন দেখছিলাম। পবনজ্যোতের নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে, তবু সে ধড়ফড় করতে করতে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল।

দাঙ্গাইদের ষণ্ডা নেতা পুরো কাণ্ডটা দেখে বেজায় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বলল, "এ বেহেনচোদ মরে না কেন! কলেজাটা কেটে টুকরো কর তাড়াতাড়ি। শালার বড়ো শক্ত জান।"

এতক্ষণ পবনজ্যোতের ওপর অপারেশন চলছিল। এবার ওর হৃৎপিণ্ডটার ওপর চলল। ওই ছোট্ট ধুকপুক করা অঙ্গটাকে যে কত অগুণতি ছোরা এফোঁড়-ওফোঁড় করে ঝাঁঝরা করে দিল তার হিসেব নেই। কলজেটাও বুঝি ভলকে ভলকে রক্তবমি করতে করতে অবশেষে একসময় টুকরো টুকরো হয়ে স্থির হল। তার লড়াইও খতম! পবনজ্যোতেরও।

"ও-য়া-হে-গু-রু। ও-য়া-হে-গু-রু।"

আট বছরের শিশু স্তম্ভিত হয়ে পবনজ্যোতের টুকরো টুকরো লাশটার দিকে তাকিয়েছিল। তাওজির বিকৃত কান্নায় সংবিৎ ফিরল। সে তাকিয়ে দেখল, গুরশরণ তাওজি জ্বলছেন! তাঁর সফেদ দাড়ি, পাগড়ি লেলিহান আগুন গিলে নিয়েছে। অসহায়ভাবে হাত দুটোকে বের করার চেষ্টা করছেন। টায়ার থেকে বহ্নিশিখা লাফিয়ে লাফিয়ে মুখের দিকে উঠছে, আবার পেটের দিকেও যাচ্ছে। অনেক ছটফট করেও ঐ শক্ত টায়ারের নাগপাশ থেকে যখন নিজেকে ছাড়াতে পারলেন না, তখন এলোপাথাড়ি এদিক ওদিক দৌড়োতে শুরু করলেন। দেখলাম, একটা উল্কাপিণ্ড, যে কখনও আমার তাওজি ছিল, সে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক ওদিক দৌড়চ্ছে আর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে। ঝুলন্ত মাথা লগবগ করে নড়ছে বলে যন্ত্রণা সামলানোর জন্য কখনও থেমে যাচ্ছেন। আর গলার শিরা ছিঁড়ে বলেই যাচ্ছেন, "ও-য়া-হে-গু-রু।

ও, য়া-হে, গু-রু-উ-উ-উ-উ!"

"অজীব মুসিবত হ্যায়।" মুরুব্বি ব্যাজার মুখে বলল,

"হাত আটকা, ঘাড় ভাঙা, কিন্তু পা দিয়েই বাজিমাত করবে দেখছি। চিল্লমচিল্লি করে কান ফাটিয়ে দিল।"

ভূপেন্দ্র দত্তা ফিক করে হেসে ফেলে, "দেওধর চৌবে ঠিকই বলেছিল। এ বুডটা ভালো নাচতে পারে। লাফাতেও পারে। কেরোসিন আছে তো আরও। যতবার গড়াগড়ি দেবে, থামবে, ততবার গায়ে কেরোসিন ঢালবি। তেলে স্নান করিয়ে দে। জমিতে পড়লে বা থামলেই তেল 'ডাল।' আরও দৌড় করা। দেখি, কত মণ তেল পোড়া অবধি রাধা নাচতে পারে।"

'মব্' ঠিক তাই-ই করল। গুরশরণ তাওজি যতবার গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেন বা থামলেন, ততবারই তাঁর ওপরে জ্বালানি তেল ঢালা শুরু হল। আগুন চড়চড় পড়পড় করে আরও জোরদার বেগ ধরল। তিনিও ওই জ্বলন্ত অবস্থাতেই বুঝেছিলেন যে মাটিতে পড়লেই কিংবা থমকে দাঁড়ালেই এরা স্তিমিত আগুনকে তেল ঢেলে 'বঢ়াওয়াহ' দেবে। কিন্তু দৌড়োতে থাকলে হয়তো আর কেরোসিন দিতে পারবে না। তাই নিরুপায় হয়ে শুধু দৌড়ে গেলেন... দৌড়ে গেলেন... দৌড়েই গেলেন! কখনও ইখে, কখনও উখে! মাথা

লটরপটর করতে থাকল, তবু থামলেন না। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও বাঁচবার কী আপ্রাণ চেষ্টা! তবে সবটাই বিফল। ক্রমাগত জোর বাড়ছিল আগুনের, আর শক্তি কমছিল তাঁর। কণ্ঠস্বর বিকৃত থেকে বিকৃততর, বিকৃততম হতে থাকল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু বলেই গেলেন, "ওয়াহেগুরু। ওয়াহেগুরু! ওয়াহেগুরু!" তারপরই নিষ্প্রাণ, নির্বাক জ্বলন্ত দেহটা আছড়ে পড়ল মাটির ওপরে। প্রাণ ছাড়ল, আগুন ছাড়ল না।

আমি যে ওখানে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিলাম, তা আর মনে নেই। শুধু এইটুকু জানি, না আমার কান্না পাচ্ছিল, না ভয় লাগছিল, না কষ্ট হচ্ছিল, না যন্ত্রণা! একেবারে পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। চোখের সামনে আমার প্রিয় মানুষগুলো এক এক করে মরছিল। জন্ম থেকে যাদের দেখে আসছি, সেই চাচা, তাও, মামা, দাদাদের জ্বালাচ্ছে কাটছে ওরা। নভজ্যোত, সরতাজরা আগেই গিয়েছিল। এবার পবনজ্যোতকে বীভৎসভাবে খণ্ড খণ্ড হতে দেখলাম। গুরশরণ তাওজি, যাঁর বুকে, পিঠে খেলেছি, যাঁর হাত থেকে বাদাম খেয়ে অভ্যস্ত, সেই মানুষটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমার দুই প্রাজি সরবজিত আর আমনপ্রীত বুকে টায়ার নিয়ে জ্বলবার অপেক্ষা করছে। হরি সমেত সমস্ত কলোনির বন্ধুরাও এখন আগুনের প্রতীক্ষায়। ওদের ওপর এখন গ্যালন গ্যালন তেল ঢালা হচ্ছে। ওরা সবাই পাগলের মতো চিল্লাচ্ছে! যে কোনো মুহূর্তে একটা দেশলাই জ্বলবে। আর সব শেষ। ওরা আকাশ ফাটিয়ে কান্নাকাটি করে পুলিশের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছে। কিন্তু কেউ কিছু করছে না। কেউ ওদের বাঁচাবে না।

শুধু পুরুষরা নয়। মেয়েদেরও মরতে দেখছি। যেদিকে তাকাই, খালি মৃত্যুর দৃশ্য। কিছু দাঙ্গাই মেয়েদের ছেড়েছিল। এরা ছাড়ল না। স্বচক্ষে মাসি, পিসি, দিদি, বোনদের 'সামূহিক বলাৎকার' দেখছি! নিজের মা সমান 'তাইজির' ওয়াহিয়াত' মৃত্যুও দেখেছি। আশ মিটিয়ে অত্যাচার করে যখন মন ভরে যাচ্ছে, তখন কারোর স্তন কেটে নিচ্ছে। কারোর যোনিতে ছুরা ঢুকিয়ে খোঁচাচ্ছে। অনেকের মুখে ঢেলে দিয়েছে অ্যাসিড। অ্যাসিডের জ্বালায় চিৎকার করছে, দাপাচ্ছে মেয়েগুলো। সেই অবস্থাতেই তাদের ওপর পাশবিক গণধর্ষণ করে চলেছে। কারোর আবার গোপনাঙ্গের রক্তক্ষরণে ভেসে যাচ্ছে কলোনির মাটি। এমনকি ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও চলে এসেছে বাইরে।

একেকজনকে দশ-বারোজন মিলে রাক্ষসের মতো 'বলাৎকার' করলে তার 'আঁতরি' তো বাইরে আসবেই। তাইজিরও পেটের ভেতরের মালমশলা সব বেরিয়ে এসেছিল। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ওঁর মুখ চেপে ধরে হাঁ করিয়ে অ্যাসিড খাইয়ে দিল। ঠোঁট, মুখ, জিভ থেকে শুরু করে পেট অবধি পুড়িয়ে ঝামা করে দিল সেই শক্তিশালী অ্যাসিড। আমি শুধু দেখলাম... শুধু দেখলাম!

আমার চোখের সামনেই দানবগুলো বলাৎকারের শেষে পরিচিত একজন দিদির দুটো পা নব্বই ডিগ্রিতে নিয়ে গিয়ে পুরো ছিঁড়ে ফেলল! তার কোমরের হাড্ডি ভাঙার আওয়াজটা পর্যন্ত পেয়েছি। দেখেছি নাভি অবধি ফট্ করে চিরে গেল। কিন্তু কী করব। কী করার ছিল? শুধু ভাবছিলাম, এরা আমার আপনার জন। আমার পরিচিত মানুষ। এদের উঠোনে কঞ্চে খেলেছি, এদের হাত থেকে কত যে দাল মাখনি, সর্ষো দা সাগ আর পরাঠা খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। এইমাত্র যে দিদিটার পা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলল, সে প্রতি বৈশাখিতে 'মিঠে পিলে চাওয়ল' আর 'অমৃতসরি ছোলে' নিয়ে আমাদের খাওয়াতে আসত। যে তাইজি আদর করে লস্যি খাওয়াতেন, তাঁকে অ্যাসিড খাওয়াল। যে বুয়াদের বলাৎকার করে মারল, স্তন কেটে নিল, তাদের স্নেহচ্ছায়ায় কখনও আদর, কখনও ডাঁট খেয়েছি। দস্যিপনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওরাই সস্নেহে জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়েছে। উৎসবে, অনুষ্ঠানে এরাই হাতে নানারকমের 'পকোয়ান' নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসত। 'লোহরিতে' রাতে আগুন জ্বালিয়ে নাচাগানা করত। যস্যদিদির বিয়ে উপলক্ষ্যে এরাই ঢোলকি বাজিয়ে গান গাইছিল, নাচছিল। তাইজি তো সবচেয়ে বেশি নেচেছিলেন। দিদির হাতেও অমন চমৎকার মেহেন্দি ওরাই লাগিয়েছে।

অথচ আজ সবাই শেষ। নিথর দেহগুলো সাক্ষী দিচ্ছিল, এ কলোনির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই মরেছে। যাদের প্রাণটুকু এখনও ধুকপুক করছে তারাও খুব শীগগিরিই মরবে। আমার বাপু, দিদি, বেবে, আমিও বাঁচব না। দিদি তখনও ধস্তাধস্তি চালিয়ে যাচ্ছে। আঁচড়ে, কামড়ে একসা করছে। অপরপক্ষ তাকে মেরেধরে একসা করছে, তবু হাল ছাড়বে না। বেবের ওপর এখনও অত্যাচার শুরু হয়নি। হয়তো অন্য কোনো পরিকল্পনা আছে। তাও কান্না পাচ্ছিল না। কোনো কিছু অনুভব করতে পারছিলাম না আমি। শুধু শূন্যতা। চতুর্দিকে স্রেফ লাশ আর শূন্যতা! আমি যেন আমি নই। অনুভূতিহীন একটা পাথর, যে কীভাবে কাঁদতে হয় তাও ভুলে গিয়েছে। অথবা জিন্দা লাশ!

"মা...মা!...মা-আ-আ-আ।...বে-বে...বে-বে-এ-এ-এ!"

সমবেত তীক্ষ্ণ কচি গলার হাহাকারে চমকে উঠে দেখলাম, এবার শিশু-কিশোরদের অগ্নিপরীক্ষাও শুরু হয়েছে। হরি, সরবজিত, আমনপ্রীত সহ সবার গায়ে আগুন উল্লাসে নাচছে! নরম মাংস পেয়ে যেন আরও ধেয়ে উঠেছে তার 'লালচ।" সরবজিতের চিখ সবার কান্নাকে ঢেকে দিচ্ছিল। সে চিৎকার করছে আর বলছে, "মা... ওয়াহেগুরু, জ্বলে গেলাম, পুড়ে গেলাম!"

নাবালক নিজের যন্ত্রণা আর অভিযোগ জানানোর জন্য ওই দু-জনকেই পেয়েছিল। জানত না, তার দুই আশ্রয়ই আজ নিরুপায়। হরি তখন প্রদীপ নয়, জ্যান্ত মশালের মতো ধু ধু করে জ্বলছে। সেই অবস্থাতেই হয়তো একটু 'রাহতের' আশায় নিজের মা রশ্মি কৌরের দিকে দৌড়চ্ছিল। হরি দুর্ভাগ্যক্রমে জানতে পেরেছিল যে আগুনে জ্বলতে বা পুড়তে কেমন লাগে। তার বিভীষিকা সাক্ষাৎ এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। কিন্তু সে বুঝতে পারেনি যে এটা রুটির ছ্যাকা নয় যে মা ফুঁ দিয়ে জ্বালা কমিয়ে দেবে! ছেলেমানুষটা ওই যমজ্বালা, বিষ-যন্ত্রণা নিতে পারেনি। তাই মুখে রক্ত তুলে সে-ও চেঁচাচ্ছিল, "বে-বে।...আগুন নিভিয়ে দে মা! জ্বালা...জ্বা-লা! ভীষণ জ্বা-লা-আ-আ-আ! ও মা...মা-গো... মা-আ-আ-আ!"

রশ্মি কৌর একমাত্র সন্তানের ওই অবস্থা দেখে বুক চাপড়ে প্রাণ কাঁপানো হাহাকারে ভেঙে পড়ল। সে কোনোমতে হাঁকপাক করে, নিজের শরীরটাকে ঐ শয়তানগুলোর 'চঙ্গুল' থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জ্বলন্ত মৃত্যুপথযাত্রী ছেলের কাছে যেতে চাইছিল। হয়তো নিজেকেও ছেলের আগুনে আলিঙ্গনেই সঁপে দিত। শেষমুহূর্তে আগুনে পোড়া কপালে একটা অশ্রুভেজা শীতল চুমো এঁকে দিত। চোখের জলে একটু 'ঠন্ডক' দিতে পারত। কিন্তু সে সুযোগও পেল না হতভাগিনী। কতগুলো জানোয়ার তার আগেই হরির মাথায় ফের দমাদম লোহার রডের বাড়ি মেরে তার ঘিলুই বের করে দিল। শেষে মাটিতে ফেলে দিল পুড়ে মরবার জন্য। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে লোহার 'সলাখে' দিয়ে তার পেট বেশ কয়েকবার ফুঁড়েও দিয়েছে। শেষবারের জন্য মায়ের স্নেহস্পর্শ পাওয়ার জন্য মরণাপন্ন হরি কোনোমতে নিস্তেজ হাত বাড়াল। কিন্তু ছেলের দিকে তাকিয়ে একবার শুধু চিৎকার করতে পেরেছিলেন রশ্মি মা।

"পু-ত্ত-র! মেরি পু-ও-র! র-ব জি! ওঃ!"

ওটাই তার বলা অন্তিম বাক্য। তারপরই একদল নরপশু তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল আমাদের নজরের আড়ালে। কানে আসতে লাগল শুধু ওর প্রাণান্তকর চিখে। এমনভাবে বুক, গলা ফাটাচ্ছিল রশ্মি মা যেন কতগুলো বন্যজন্তু ওকে জ্যান্ত ছিঁড়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ সেই একটানা আর্তনাদে মাটি কাঁপল। একটু পরেই সেটা গোঙানিতে রূপান্তরিত হল। শেষপর্যন্ত সব থেমে গেল। সব চুপ।

বাপু নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে এতক্ষণ নিজের অন্তিম প্রহরের জন্য দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে বসেছিলেন। কিন্তু চোখের সামনে নিজের সন্তানকে জ্বলতে, ছটফটাতে দেখে আর সহ্য করতে পারলেন না। আমার অমন শান্ত বাবা দুর্দান্ত শক্তিতে সব দুষ্কৃতীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ক-ঞ্জা-র। ছো-ড়!"

লোকগুলো ওই একধাক্কাতেই সব উলটে পড়ল। বাপু নিজেকে সামলে নিয়ে সবেগে

ছুটলেন জ্বলন্ত আমনপ্রীত আর সরবজিতের কাছে। কয়েক কদম এগোতে-না এগোতেই একটা শাণিত তরোয়াল সপাটে ছুঁয়ে গেল তাঁর গলা। বাপু বোধহয় টেরও পাননি যে কখন ধড় থেকে মাথাটা খসে পড়ে গিয়েছে। ওঁর মুণ্ডহীন কবন্ধ তারপরও কয়েক পা ছুটে গেল নিজের ছেলেদের উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। তারপর আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে, ধড়ফড় করতে করতে পড়ে গেল। এক দাঙ্গাই তাঁর পাগড়িসুদ্ধ মাথাটাকে নিয়ে সোল্লাসে ছুড়ে দিল নিজেদের দলের দিকে। দেখলাম, ওরা বাপুর কর্তিত, রক্তাক্ত মাথাটা নিয়ে লোফালুফি করছে আর বলছে, "পাঁচশো টাকা। পাঁচশো টাকা!"

সর্দারদের মাথার মূল্য পাঁচশো টাকাই নির্ধারিত করেছিল ওদের শ্রদ্ধেয় নেতারা। একজন স্নেহশীল পিতা, এক প্রেমপূর্ণ দায়িত্ববান স্বামী, এক নিরীহ ছাপোষা অটোওয়ালা জীবনের দাম পাঁচশো টাকা! আমার বাপু কি জানতেন তাঁর এত দাম? তিনি গোটা জীবনে একসঙ্গে পাঁচশো টাকা কতবার দেখেছেন কে জানে। মৃত্যুর সময়েও জানতেন না যে একসঙ্গে অতগুলো টাকা হাতে পেলে কী করবেন। তাঁর খুনিরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল। তারা তো পাগড়ি পরা মাথা সংগ্রহ করতেই নেমেছে।

ওঁর দেহটা তখনও অল্প অল্প নড়ছে। সেটাও ওদের পছন্দ হল না। ওরা মশাল দিয়ে ওই নিস্তেজ হয়ে আসা লাশটাকেও জ্বালিয়ে দিল। বিন্দুমাত্রও প্রাণের অস্তিত্ব থাকতে দেবে না। দেহটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠতেই পরম তৃপ্তিতে কাজ শেষ করে বাকিদের দিকে মনোনিবেশ করল।

"আরে! এই কুত্তার পিল্লা তো কান-মাথা খেয়ে নিল।"

জ্বলন্ত শিশুদের 'শোর-শরাবা' পছন্দ হচ্ছিল না ওদের। ভূপেন্দ্র দত্তা অবশ্য এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন চিৎকার নয়, সঙ্গীত শুনছেন। শিখদের মরণ-আর্তনাদ, হাহাকার ওর কাছে বুঝি স্বর্গীয় সুর। তাদের রক্তের গন্ধ, পোড়া মাংসের ব ওর কাছে 'ইত্তরের' খুশবু ছিল। কিন্তু ওই ষন্ডামার্কা ঘাড়ে গর্দানে মুরুব্বির সেটা সহ্য হল না। সে চেঁচিয়ে নিজের দলবলকে বলল, "আগুন নেভা তো! এদের চিল্লানো বন্ধ করা প্রয়োজন। একদম সুয়ার কা মাফিক চিল্লাচ্ছে।"

হরি সিং সহ আরও কিছু শিশু-কিশোর ততক্ষণে মারা গিয়েছে। যে ক-জন তখনও প্রাণপণ গলা ফাটাচ্ছিল, তাদের ওপর জল ঢেলে তাৎক্ষণিক আগুন নেভানো হল। পরক্ষণেই হুকুম হল, "যা! শক্ত দেখে সুই-ধাগা লে আ।"

এতক্ষণ আমিও নিস্পন্দ, নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, ওটা অন্য কেউ। যে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। আর আমার আত্মা শূন্য থেকে সব শুনছে, কিন্তু কোনো কিছুই বুঝি দাগ কাটছে না। আমার পরিবার ধ্বংস হচ্ছে, কাছের মানুষগুলো ভয়াবহ মওত মরছে। অথচ আমি শোক, দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ, কান্না, চিৎকার-কিচ্ছু টের পাচ্ছি না! শুধু বুকের ভেতরে ইস্পাত কঠিন কিছু একটা জমা হচ্ছে। হয়তো লোহা, হয়তো পাথর! মানুষপোড়ার গন্ধে আর বমি আসছে না। ধোঁয়ায় চোখ কড়কড় করছে, এক বিন্দুও জল আসছে না!

কিন্তু এবার যা হল তাতে এই পাথর কিংবা লোহারও বুকও ফেটে চৌচির হল। আট বছরের শৈশব মর্মান্তিক দৃষ্টিতে দেখল আর এক ভয়াবহ দৃশ্য। লোকগুলো বুঝি তৈরিই ছিল। আদেশ পাওয়া মাত্রই কতগুলো তার আর মোটা মোটা সুঁচ নিয়ে এসেছে। শিশুগুলো আধপোড়া অবস্থাতেই গোঙাচ্ছিল। মরণের আসতে বেশি বাকি ছিল না। কিন্তু ওই অবস্থাতেই ওরা সুঁচ সুতো নিয়ে সবলে ওদের ঠোঁট সেলাই করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মুখ বন্ধ করতে হবে যে! চিৎকার করে যন্ত্রণা প্রকাশের অবকাশও দেবে না! ওইটুকু করতে পারলেও বোধহয় একটু আরাম হয়। সেটুকুও ওদের নসিবে ছিল না!

সরবজিতের কচি নরম ঠোঁট ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল নিষ্ঠুর মোটা সুঁচ, সঙ্গে ধাতুর তার সে নির্জীব হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছিল। কিন্তু এবার ওর গলা দিয়ে যে আওয়াজটা আকাশ, বাতাস কাঁপিয়ে দিল, সেটা শুনলে মনে হয় ওর আত্মাটাও ওই 'চিখ' এর সঙ্গেই বেরিয়ে যাবে। ঠোঁটের নরম, কচি মাংস ফুটো হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। একা সরবজিত নয়,

আমনপ্রীত সহ অন্যান্য শিশুদেরও ঠোঁট আর থুতনি বেয়ে গলগল করে রক্তের ধারা ছুটছে। ওদের জীবনীশক্তি প্রায় খেয়ে ফেলেছিল আগুন। যেটুকু বাকি ছিল সেইটুকু জড়ো করেই 'ভেড়' বকরিদের মতো 'হাহাকার', আর্তচিৎকার করছিল ওরা। ততক্ষণ ওদের আর্তস্বর শোনা যাচ্ছিল, যতক্ষণ না পুরো ঠোঁটই এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত সেলাই হয়ে গেল। আধপোড়া শিশুগুলোর কচি ঠোঁট 'সুই'-এর আক্রমণে ফালাফালা হয়ে খুনে ভাসল। কিন্তু আর চিৎকার করার পথ রইল না। "

বড়িয়া হ্যায়।"

'মর্' এর নেতা মাথা নাড়িয়ে বলল, "অব্ ফির সে জলা দে মেরে ভাই!"

আবার সেই উগ্র কেরোসিনের গন্ধ। টায়ারগুলো আবার নতুন করে ভিজল। আমি দমবন্ধ করে দেখছিলাম। জানতাম, এখনই ফের আগুন লাগবে। তবে সরবজিত, আমনদীপ বা ওরা কেউ আর চেঁচাতে পারবে না। বোবা হয়ে মরাই নিয়তি। কিছু লোক ওদের দিকে এগিয়েও গেল। অথচ হঠাৎই অজানা কারণে থমকে গিয়েছে তারা। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আরে, মাচিসের তিলি খতম হয়ে গেছে। মাচি দাও কেউ, মাচিস....!" এত মানুষকে জ্বালাতে-জ্বালাতে দেশলাইও শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু এদের জ্বালানোর আশ মেটেনি। এখন ভাবি, দরকার কী ছিল! ওই শিশুরা আর কতক্ষণই বা বাঁচত? তার আগেই জীবন্ত চিতায় তুলে দেওয়া কি খুব জরুরি ছিল?

"মাচিস্ দে ভাই। মাচিস কীধর হ্যায়?... তিলি খতম হো গয়া রে। দেশলাই ফুরিয়ে গেছে...।"

দাঙ্গাইরা মহাব্যস্ত হয়ে পড়েছে একটা দেশলাই কাঠির জন্য। তাদের শশব্যস্ত শোরগোল কানে এল। দোকান পাটও তো বেশিরভাগই ভাঙা, নয় বন্ধ। কিনে যে নিয়ে আসবে তার রাস্তাও নেই। যখন এই কাজে নেমেছিল, তখন নিশ্চয়ই গুচ্ছ গুচ্ছ দেশলাই বাক্সের প্যাকেট কিনেছিল। অথচ এইমুহূর্তে সেটাও কম পড়ল। ওরা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না, তার আগেই ভূপেন্দ্র দত্তা নিজের দামি লাইটারটাই এগিয়ে দিয়ে বলল, "নালায়কের দল। এক্সট্রা মাচিস রাখিসনি? এটা নে। চলবে?"

রীতিমতো চলল। এবার যেন দেশলাইয়ের চেয়েও দ্রুত প্রকাণ্ড আগুন জ্বলল। আমার ভাইয়েরা আমার চোখের সামনে পুড়ছে। অন্তিম আর্তনাদ করার অধিকারও নেই। মৃদু 'কররানো'র জন্যও একটু ঠোঁট ফাঁকা করতে হয়। রব্ দি কসম, সেটুকুও ছিল না। তবু আমনপ্রীতের ঘাড়ে কী ভূত চেপেছিল কে জানে। কোথায় অন্যান্যদের মতো শান্তশিষ্ট হয়ে মরবে তা নয়, উলটে অদ্ভুত জেদে সে অন্তিম 'ঘড়ি'তেও দৌড়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছে কলোনির পাশ দিয়ে যাওয়া কাঁচা নালার মধ্যে। নোংরা কালো ঘোলা জলের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। এখনও তার দেহে লড়াইয়ের ক্ষমতা বাকি আছে। এখনও জান বাকি আছে। এখনও প্রাণ বাঁচানোর কী আকুলি-বিকুলি চেষ্টা!

তার সেই মরণান্তিক আপ্রাণ লড়াই দেখে বুঝি এবার মৃত্যুরও দয়া হল। স্বয়ং যমও তাকে আরও দশ মিনিট অতিরিক্ত আয়ু দিয়ে দিলেন। নালার জলে গড়ানোর ফলে আগুন নিভে গেছে দেখে যমদূতরা আবার তাকে টেনে এনে ফের সযত্নে জ্বালিয়ে দিল। আমনপ্রীত এখনও নাছোড়বান্দা। সে ফের নালার দিকেই দৌড়চ্ছে দেখে তার পায়ের ওপর আক্রমণ চালাল কাতিলরা। মোটা মোটা রডের আঘাতে পায়ের নরম হাড় ভাঙছিল নিঃসন্দেহে। তবু আমন থামবে না। সে ফের ঝাঁপিয়ে পড়ল নালায়। এবারও আগুন নিভল। আর এবারও তাকে দাঙ্গাইরা ফের টেনে হিঁচড়ে এনেছে। আবার জ্বালাল। কিন্তু আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি!

একবার নয়, বারবার তিনবার। তিন তিনবার আমন জ্বলল, আর তিনবারই নালার নোংরা জলে লাফ মেরে নিজেকে বাঁচাল। অর্ধদগ্ধ শিশু কিছুতেই মৃত্যুর কাছে হার মানবে না। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কী প্রচণ্ড বাঁচার আকাঙ্খা থাকলে আমনের মতো ছোটো একজন মানুষ এভাবে লড়ে যেতে পারে। সরবজিত সহ বাকিরা ততক্ষণে প্রায় কয়লা! কেউ বেঁচে

নেই। আর এই একটা বাচ্চা কিনা দাঙ্গাইদের এমন ঘোল খাওয়াচ্ছে!

"এ, মিলখা সিং!"

খুনিদের মধ্যে একজন আমনের ধৃষ্টতায় রীতিমতো গলদঘর্ম হয়ে কড়কে উঠল, "কিতনা বেশরম হ্যায় রে তু? মরতেই চাইছিস্ না শালা! আগুনে মরবি না তুই। তোর জন্য স্পেশাল জিনিস আছে। দাঁড়া!"

'স্পেশাল জিনিস' শুনেই অন্তরাত্মা একটা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল। দেখলাম, সে আশঙ্কা ভুল নয়। আমনকে জ্বালানোর জন্য এবার আগুন নয়, সাদা পাউডার এল। ওইটুকু ছোট্ট কলেবরে গোটা প্যাকেটটাই ঢেলে দিয়ে বাঁকা হাসল খুনি, "নে, এবার যত খুশি জলে গড়াগড়ি দে। তু ভি ক্যায়া ইয়াদ রকখেগা। যা খুশি কর। যাঃ, ভাগ। তোকে পালাতে দিলাম। জান বাঁচাতে পারলে বাঁচা।"

আমন জানত না যে এটা কী জিনিস! তার জানা ছিল না যে এটাও 'আগ' এবং এ আগুন আর শত চেষ্টাতেও থামবে না। সরল বিশ্বাসে ভেবেছিল, সত্যিই বুঝি ওরা তাকে এবারের মতো ছেড়ে দিল। সে প্রথমে হুড়মুড় করে ওই ভাঙা পায়ের ওপর ভর করেই দৌড়ে ওখান থেকে পালিয়েই যাচ্ছিল। কেউ তাকে বাধা দেয়নি। আমন ভেবেছিল, এ যাত্রায় রক্ষা পেল। কিন্তু যত জোরে ও ছুটতে লাগল সাদা পাউডার তত বেশি হাওয়ার সংস্পর্শে এসে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলে উঠতে শুরু করল। গায়ে জ্বালা ধরতেই প্রা'জি ভাবল আগুন বুঝি। যথারীতি সঙ্গে সঙ্গেই নালার জলে লাফিয়েও পড়ে সে। কিন্তু এবার নালার ওই একচিলতে জল যথেষ্ট ছিল না তাকে রক্ষা করার জন্য। বরং উলটে জলও ধোঁয়া হতে শুরু করেছে। আমন অনেক চেষ্টা করল। অনেক ছটফট করে মরল। তার 'জি-তোড় কোশিশে' সফেদ পাউডারের 'আগ' একটু কমলেও যেই সে উঠে পালাতে যায়, অমনিই আবার দ্বিগুণ বেগে জ্বলে ওঠে! তার হাড্ডি-পালি কুরে কুরে খেতে শুরু করে। ওর কাঁদার, চিৎকার করার উপায়ও ছিল না। শুধু মরার আগেও দাপাচ্ছিল। দাঙ্গাইরা তার অবস্থা দেখে হেসে খুন হচ্ছে। এবার আর কিছুতেই কিছু হল না। নালার মধ্যে তার রক্ত, খসে পড়া চামড়া, হাড় আর হাড়ের ছাই-ই পরে থাকল শেষপর্যন্ত! সফেদ পাউডার নিজের কাজ করে দিয়েছে। ছোট্ট মানুষের দেহটাও খেয়ে ফেলেছে সে জিনিস। কী রাক্ষুসে জিনিসই না আমদানি করেছিল! "আ-ম-ন!"

বেবে অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদছিল। এবার আমনের 'দর্শনাক' শেষমুহূর্তগুলো দেখে হাউ হাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ল, "আ-ম-ন! বে-টা!"

আমি কোনদিক ছেড়ে কোনদিকে তাকাব বুঝতে পারছিলাম না। ওদিকে একে একে আমার তাওজি, তাইজি, বাপু, দাদারা মরছে। এদিকে বেবের বন্দিদশা। অন্যদিকে দিদির জামা-কাপড় ছিঁড়ছে ওরা! আমি শুধু মূর্খ আর মন্দবুদ্ধির মতো এদিক ওদিক তাকাচ্ছি আর ভাবছি আমার মৃত্যুটা ঠিক কোথা দিয়ে আসবে। এরমধ্যেই চোখে পড়ল একদল লোক আমাদের ঘরে লুটপাট চালিয়ে দিদির বিয়ের সোনার গয়নাগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসছে। লুটপাট চলছিল নভজ্যোত, পবনজ্যোতদের বাড়িতেও। শাদি উপলক্ষ্যে দুই ঘরেই যথেষ্ট গয়না মজুত ছিল। ওরা সেগুলো বের করেছে। অনেকগুলো চকচকে লোভী চোখ সেগুলোকে দেখতে দেখতে বলল, "দেখো গুরু, সব সোনার! কী ভারি! ইয়াহাঁ তো লটারি লগ গয়ি ইয়ার!"

বাপুর অনেক কষ্টের খুন-পাসিনা এক করা ধন তাঁরই খুনির হাতে! ওরা আগেই কৌরদের গায়ে কাপড়ের সঙ্গে যে অলঙ্কার ছিল সেগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে। গরীবের ঘরে কতটুকুই বা সোনাদানা থাকে! অথচ যস্যিদিদির শাদি উপলক্ষ্যে লুটেরাদের জ্যাকপট লেগে গেল। ওরা দিদির হার, বালি, কঙ্গন সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল। হঠাৎই যস্যিদিদি মারপিট করতে করতেই চেঁচিয়ে উঠল, "ও আমার গয়না! খবর্দার! ছুবি না। কা-ট ডা-লু-সি....।"

দাঙ্গাইদের সর্দারের এক চ্যালা ভারি মজা পেল। হেসে বলল, "কীসের গয়না ছোড়ি! তোর শাদি নাকি?"

"হাঃ!" এবার ওদের নেতা স্বয়ং অবাক হওয়ার ভান করেছে, "এই কচ্চি কলি উর্বশী

শিখদের ঘরে কী করছে! তাও আবার কিনা মাত্র একজনকে শাদি করবে। একটা লোক এই পরমসুন্দরীকে ভোগ করবে? এ কেমন না-ইনসাফি! শাদি হয়নি, হয়নি, ছোড়ো। কিন্তু এর তো গণহারে সুহাগরাত হওয়া উচিত। কলি কে সবাই মিলে ফুল বানাও ভাই। এর সুগন্ধ নেওয়ার অধিকার পাবলিকের। অভি ভি কপড়া উতরা নেহি হ্যায় ইসকি? তোরা কী করছিস ভায়া?"

যারা দিদির সঙ্গে হাতাহাতি করছিল তারাই উত্তর দিল, "জংলি বিল্লি হ্যায়। বাগই মানছে না। হাথ-পৈর সব চালাচ্ছে।"

"জংলি বিল্লি তো ভালো।" সে কুৎসিত হাসল, "তিখি মির্চি। যত তেজ, তত ঝাঁঝ, তত সুখ।"

যস্যিদিদি তখন বোধহয় পুরো পাগল হয়ে গিয়েছে। থুঃ করে একদলা থুতু ছিটিয়ে বলল, "তোরা মর্দ? আমার সরতাজকে পেছন থেকে মেরেছিস তোরা। আমনে সামনে লড়ারও ক্ষমতা নেই, আর নিজেকে মর্দ বলিস? ধোঁকা দিয়ে, মিথ্যে বলে আমার সরতাজকে খুন করেছিস। উয়ো থা আসলি মর্দ। তোরা তো সব নামর্দের পিল্লা। আমাকেও মারবি? আয়...আ-য়!"

বলতে বলতেই উন্মাদিনী তার ওপর ঝুঁকে পড়া একটা গুণ্ডাকে লাথি মেরে সরাল পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে উঠে বসেছে। ওর পরনের যেটুকু কামিজ তখনও অক্ষত থেকে সামান্য হলেও লজ্জা রক্ষা করছিল, ফড়ফড় করে একটানে নিজেই ছিঁড়ে ফেলল। সবার চোখের সামনে প্রকট হল ওর সাদা শঙ্খের মতো অপূর্ব স্তন, কোমরের ভাঁজ, সুগভীর নাভি, ফর্সা ধবধবে মখমলি নগ্ন 'বদন' আর তার অপূর্ব বাঁক-কারুকার্য। ভেড়িয়াদের চোখে 'হওয়সের আগ' নেচে উঠছে। যমিত কৌরের চোখেও আগুন। তবে অন্যরকমের। সে নিজের নগ্ন ছাতি পেটাতে পেটাতে বলল, "আমাকে মারবি? আমিও শিখী। সরতাজ লড়েছিল। আমিও লড়ব। ও মরেছে। আমিও মরব। নপুংসক কোথাকার! আ-য়! আঃ ...আঃ...!

দিদি এমনভাবে ফুঁসছিল আর গর্জন করছিল যে আমিও স্তম্ভিত। তজনী তুলে এমনভাবে "আঃ!...আঃ!" বলে ডাকল, যেন কুত্তাকে ডাকছে! এই আমার যসমিত দিদি, যে জীবনেও কোনোদিন উঁচু স্বরে কথা বলেনি! এই তার চোখ, যে চোখ লজ্জায় সবসময় অবনত থাকত! শরম-হায়া ওর 'লিবাস' ছিল। আজ সেই আব্রুও নিজেই টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে একরাশ ঘৃণা উগরে দেয় সে, "আরে আমায় নাঙ্গা করবি তোদের ঔকাত কী সালোঁ। তোরা নিজেরাই নিজেদের ঘরের মেয়েদের আব্রু-ইজ্জতে হাত দিস। কাপড় খুলতে জানিস, পরাতে শিখিসনি। সাচ্চা মর্দ আব্রু রক্ষা করে, ছিনিয়ে নেয় না। তোরা তো মজাতের নামে কলঙ্ক! আমার আব্রু, আমার ভালোবাসাকে তো মেরেইছিস। এবার আমায় মার! তোরা আমার জামা খুলবি? আমি নিজেই নাঙ্গা হচ্ছি। এই দেশ আমার বেঁচে থাকার, আমার ইজ্জত রক্ষা করার লায়কই নয়। এ দেশে বাঁচতেও চাই না। বলাৎকার করবি? কর। আর কী-ই বা করতে পারিস তোরা। আয়.... আয়... মার আমাকে! মা-র! বুঝদিল! জা-নো-য়া-র। কা-য়-র। না-ম-দ!"

বলতে বলতেই সে সালোয়ারের দড়িও টান মেরে খুলে ফেলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে উঠে দাঁড়াল। উন্মাদিনী উলঙ্গিনী। তার সে রূপ দেখে দাঙ্গাইরাও বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। সেদিন ওর দুঃসাহস দেখে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। এখন বুঝি, ওদের আসল 'ঔকাত' সেদিন যমিত কৌর মুখের ওপরই বলেছিল। জানোয়ার, বুঝদিল, কায়র এবং নামর্দই বটে। ওদের 'মর্দানগির' গর্বিত ফানুসে পিন ফুটিয়ে দিয়েছিল। আয়না দেখিয়ে দেওয়ার জ্বালা ওরা সহ্য করতে পারেনি। খ্যাপা কুত্তার মতো লাফিয়ে পড়েছিল দিদির ওপরে। দিদিও ওদের সঙ্গে সমান বিক্রমে যুদ্ধ করে চলেছে। একজন যেই তার হাত চেপে ধরতে গেছে, সে ফুঁসে ওঠে তার চোখে খচ্ করে আঙুল ঢুকিয়ে দিল। লোকটা কেঁউ কেঁউ করে চোখে হাত চাপা দিয়ে লাফাতে শুরু করেছে, "সালি... আখে ফোঁড় দিয়া... আখেঁ

ফোড় দিয়া... মেরি আখে....।”

“মর্দানগি দেখেগি? দেখ্ কমিনি!”

এবার পুরো ভিড়টাই হুড়মুড়িয়ে ওর ওপরে গিয়ে পড়ল। কয়েকজন দিদির আঁচড়-কামড় খেয়ে ‘দুম্ দবাকে’ পালিয়েও গেল। কিন্তু একটা মেয়ে কতক্ষণই বা একদল পিশাচের সঙ্গে লড়বে। যাতে ও মারামারি করতে না পারে সেজন্য ওরা এবার অন্য পদ্ধতি নিয়েছে। দিদির হাত, পা, বুক, পেট-সারা শরীরের হাড় একটা একটা করে মুচড়ে মুচড়ে, লোহার রডের বাড়ি মেরে মেরে ভাঙতে শুরু করল। আমি আর বেবে প্রত্যেকটা হাড় ভাঙার মট্ মট্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। মড়াৎ মড়াৎ করে আওয়াজ আসছিল, আর কেঁপে কেঁপে উঠছিলাম। বুকের ভেতরটা মুচড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল। দিদির মুখে একটা শব্দও নেই। কিন্তু আমার ভেতর থেকে কে যেন যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। বেবে পাগলের মতো কপালে করাঘাত করছে। আর কাতরাচ্ছে। যেন দিদির নয়, বেবেরই হাড় কেউ ভাঙছে। চিৎকার করে বলল, ‘রহম্ করো! ও আমার লাডো। শোকে, দুঃখে মাথার ঠিক নেই। কী বলতে কী বলেছে। মাফ করে দাও।”

ষন্ডা লোকটা এবার থমকে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়ের দিকে তাকাল, “এটা তোর মেয়ে?”

“হাঁ জি!”

“অচ্ছি বাত হ্যায়।” সে ফের সেই কুৎসিত হাসিটা হাসল, “মা-মেয়ে দু-জনেই তো রসগুল্লা দেখছি। একজন সতরা কি খতরা, অন্যজন চালিসের চিজ। ভালো ভালো। তোর তো খুশি হওয়া উচিত। তোর মেয়ের সারা দেশ দিওয়ানা! সেও তো মর্দানগি দেখতে চাইছে। দেখাচ্ছি। তোকেও দেখাব। দাঁড়া।”

ততক্ষণে ভিড় দিদির সারা শরীরের ওপর প্রায় বুলডোজার চালিয়েছে। ওর মুখ, নাক, হাত, পা, কোনো জায়গা অক্ষত নেই। ভেঙে ভুঙে হাড্ডি-পালি এক করে দিয়েছে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও নেই। হাড় ভেঙে গেলে কতগুলো থলথলে মাংসপিণ্ডই থাকে। হাড়ের ‘চাঁচা’ ছাড়া তার পক্ষে নিজে খাড়া হওয়াই সম্ভব নয়। আর ওরা তো দিদির আঙুলও ভেঙে দিয়েছিল। ভালো করে দেহের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙে সেই মাংসের দলাকে উল্লসিত হয়ে ঘাড়ে তুলে নিল ওরা। কতগুলো দরিন্দার পিঠে ঝুলতে ঝুলতে চলল বাপুর আদরের নাঙ্গা রাজকুমারী। আমি দেখলাম, দিদির চোখ বেয়ে জল পড়ছে, মুখ বেয়ে রক্ত! দাঁতগুলোও সব ভেঙেছে একটা একটা করে। নাক, ঠোঁট থেঁতলে গিয়েছে। কথা বলার শক্তিও নেই। হাতের মেহেন্দির ওপর নিজেরই টকটকে তাজা রক্ত লেগে আছে। তবু সে হাসছে! ওর তো মৃত্যুই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সেই মুহূর্তেই বুঝে গেলাম, দিদি আর বাঁচবে না! ওর আর বাঁচার ইচ্ছেও নেই।

“এটাকে নিয়ে যা। তোদের আরও যত দোস্ত ইধার উধার আছে, সবাইকে নেওতা দে। এখানে না, দিল্লির রাজপথে খুল্লমখুল্লা সবার সামনে ‘সামূহিক সুহাগরাত” হবে।” সে আঙুল তুলে নির্দেশ দেয়, “লেকিন কোই রহম্ নেহি! ইসকি চিখে সারি দিল্লি সে সুনাই দেনা চাহিয়ে। আর এখন এটাকে ফেলে রেখে দেখে মজা নিতে পারিস। কিন্তু এটার ‘অকড়’ আর ‘নথ’ আমি ছাড়া আর কেউ ভাঙবে না। আমিই প্রথমে সালির চর্বি-গর্মি সব উৎরে দেব। তারপর যত লোকের আগুনে হাত সেঁকার আছে সবাই সুযোগ পাবে। কিন্তু তার আগে কিচ্ছু নয়। এদিকটা সাল্টেই আসছি। বুঝেছিস?”

ভিড়ের একটা অংশ মাথা নেড়ে হুকুম তামিল করল। দিদিকে নিয়ে চলে গেল ওরা। তখন বোঝার মতো অবস্থা ছিল না। ভাবছিলাম, এরা এই দেশের জনতা। এরা কি আদৌ প্রিয় নেত্রীর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মানুষ? এখন বুঝেছি, না ওরা মানুষ ছিল না। জাত ক্রিমিনাল ছিল। কতগুলো খুনি আর ধর্ষক যাদের রাজনীতি, নেত্রী তো দূর মানবিকতার সঙ্গেও ‘দূর দূর তক্’ কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমাদের কপালদোষে এরাই বেশি সংখ্যায় এই ব্লকে এসেছিল। ওরা মানুষ ছিল না, দরিন্দা ছিল। যাদের দরিন্দগির কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না!

মানুষের জাত হতে পারে, রং হতে পারে, দল, পার্টি, আদর্শও হতে পারে। কিন্তু

দরিন্দাদের কি আদৌ এসব কিছু থাকে? উয়োহ আখরি ঘন্টে...!

*** ** * ** *

(৩১)

একে একে ব্লকের মধ্যে শোর-শরাবা ক্ষীণ হয়ে আসছিল। এখানকার প্রায় সব পুরুষই মরেছে। হাতে গোণা যারা বাকি ছিল তারাও একে একে জ্বলল, টুকরো টুকরো হল। তাদের পাগড়িসুদ্ধ মাথাও গুণল ওরা। পাঁচশো টাকার হিসাব অনুযায়ী ওদের একদিনের রোজগার প্রায় দশ হাজার ছাড়িয়েছে। 'মর্' তাতেই খুশি। ওরা তখন ভোজ-দাওয়াতের প্ল্যান করছে। পাঞ্জাবের উৎসবের উত্তরে দিল্লিতেও উৎসব চলবে! দুই উৎসবই সমান ঘৃণ্য ও নারকীয়।

তখন মনে হয়েছিল যে কৌররাও বুঝি সব মরল। পরে অবশ্য শুনেছিলাম যে অত অত্যাচার সওয়ার পরেও আধমরা হয়ে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অ্যাসিড জ্বলা মুখ, আর ক্ষতবিক্ষত পঙ্গু দেহ নিয়ে বেঁচে ছিল। তখন টের পাইনি। মৃতবৎ দেহগুলোয় প্রাণের অস্তিত্ব এত ক্ষীণ ছিল যে দাঙ্গাইরাও ওদের লাশই ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু কথায় আছে, 'যকো রাখে সাঁইয়া, মার সকে না কোয়!" কয়েকজন নারীর ক্ষেত্রে এই প্রবাদটা সত্যি হয়েছিল। সত্যি হয়েছিল আমার ক্ষেত্রেও। আমাদের জান বোধহয় সবচেয়ে বেশি 'কড়ক' আর 'বেশরম' ছিল।

আমি আর বেবে অপেক্ষা করছিলাম যে মৃত্যুদূতেরা কতক্ষণে আমাদের কাছে আসবে। সবাই তো গেল। আমাদেরই বা এরা বাঁচিয়ে রেখেছে কেন! মৃত্যু নামক জিনিসটা যত তাড়াতাড়ি আসে, ততই মঙ্গল। ওই মুহূর্তে কয়েক মিনিটের অতিরিক্ত আয়ু কিছুতেই চাইছিলাম না। মনে হচ্ছিল, এবার প্রাণটা গেলেই বাঁচি। এখনই একটা তেলের ডাব্বা আর মশাল আসুক, কিংবা তরোয়াল-কাটারি।

কিন্তু তখন কে জানত, অত সহজ মৃত্যু দেওয়ার পরিকল্পনা ওদের ছিল না! এক ঝটকায় জান নিয়ে নেওয়ার মতো দয়ালু ওরা কেউ ছিল না। এখন মনে হয়, আমাদের মধ্যে বাপুই বুঝি সবচেয়ে পূণ্যবান মানুষ ছিলেন। তাই তাঁর অমন আসান আর দ্রুত মৃত্যু হয়েছিল। হয়তো সেটা জল্লাদদেরই ভুল কিংবা ওয়াহেগুরুর আশীর্বাদ। যন্ত্রণা তিনি পেয়েছিলেন ঠিকই, তবে সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য। বাকিরা অত সহজে মরতেও পারেনি। জীবন তাদের জন্য কঠিন ছিল ঠিকই। শেষে দেখা গেল, মরণ তার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন।

এমনই কিছু আমাদের জন্যও অপেক্ষা করছিল। বেশ কিছু শিশুকে ওরা জ্বালায়নি। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। এইটুকু মাথায় ঢুকেছিল যে এরা আমায় পুড়িয়ে মারবে না। অন্য কোনো উপায় নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছে। হয়তো পবনজ্যোতের মতো অপারেশন চালিয়ে দেখবে যে আমার ভেতরে কী কী আছে, অথবা এককোপে মাথাটাই উড়িয়ে দেবে। তারপর গোটা শরীরটাকে টুকরো করবে। পেটের ভেতরে তরোয়াল, খঞ্জর, চাপাতিও ঢুকিয়ে দিতে পারে কিংবা লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়েও মারতে পারে। ওদের হাতে মারার অনেকরকম তরকিব আছে। আমার মরা ছাড়া কোনো রাস্তাই নেই। তাই তখন ভাবাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দিদির পর এবার বেবের কাপড় খুলতে দাঙ্গাইরা মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভূপেন্দ্র দত্তা তখনও হাসি হাসি মুখে সব কর্মকাণ্ড দেখে চলেছে। ওর পেছনে দেবধর চৌবেও হাজির। একটা দৃশ্যও ছাড়তে রাজি নয়। প্রত্যেকটা মৃত্যু স্বচক্ষে দেখে তৃপ্তির আমেজ নিচ্ছে। সকালেও ওদের গায়ে উর্দি ছিল। আমি সেই উর্দির মোহে ভুলেছিলাম। কিন্তু একবারও ভাবিনি ওই উর্দির নীচে মানুষের চামড়া ছিল কিনা! এখন সন্দেহ হয়, ছিল না! থাকলে চুপ করে বসে দেখত না।

আমার দিকে একদল লোক এবার তরোয়াল, রড, আরও সব অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসছিল। আমরা হাতে গোণা কয়েকজন জীবিত বাচ্চামানুষ হাঁড়িকাঠে মাথা দেওয়া ছাগশিশুর মতো কাঁপছিলাম। বেবে সেই দৃশ্য দেখে ফের কঁকিয়ে উঠে বলল, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমার ছোটো ছেলেটাকে অন্তত ছেড়ে দাও। আমার পতি, জ্যেঠ, জ্যেঠানী,

মেয়ে, হবু দামাদ-তাদের পরিবার, দুই ছেলে—সবাইকে তো মেরেছ। ও একেবারেই কোলের। বড়ো মাসুম আর শান্ত। কোনোদিন কারোর ক্ষতি করেনি। আজ পর্যন্ত একটা 'চিটি'-ও মারেনি। ওকে মেরে তোমরা কী পাবে? মাত্র আট বছর বয়েস ওর। তোমাদের নিজেদের ঘরেও তো ওর বয়েসী বাচ্চা আছে। এই উমরের সন্তান কি তোমাদের কারোর নেই? তাদের কি জি-জান সে প্যায়ার, লাড করো না? তাদের কথা ভেবে, ওকে ছেড়ে দাও। এতদিন এত অভাবে, কষ্টেও কারোর কাছে হাত পাতিনি। কিন্তু আজ ওর প্রাণ ভিখ্ চাইছি। তোমাদের খুদার কসম্...!"

বেবের শেষের কথাগুলো কান্নায় জড়িয়ে গেল। আমি জানতাম, বেবে সব সত্যি বলছে। আমার মায়ের মতো খুদ্দার খুব কমই আছে। কোনোদিন শত অভাব-অনটনে কারোর কাছ থেকে কোনোরকম মুফতের সাহায্য চায়নি। যদি প্রয়োজনে ধারও নিয়ে থাকে তবে সময়মতো যে করেই হোক ফেরত দিয়েছে। যতটুকু পেয়েছে, তাই দিয়েই টানাটানির সংসার চালিয়ে নিয়েছে। তার জন্য কোনো অভিযোগ ছিল না। খুব বেশি চাহিদাও ছিল না। মা চিরকাল বড়ো স্বল্পেই সন্তুষ্ট। আজীবন শুধু ঈশ্বর ছাড়া আর কারোর সামনে এই হাতদুটো প্রার্থনা বা ভিক্ষার জন্য ওঠেনি। অথচ আজ উঠল! তাও ঈশ্বরের সামনে নয়, শয়তানের সামনে। সেই শয়তান যে তার পতিকে কেটেছে, ছেলেদের জ্বালিয়েছে আর মেয়ের চরম সর্বনাশ করেছে।

তরোয়ালধারীরা থেমে গেল। উৎসুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। তাদের মধ্যে একজন বলল, "এটা তোর ছোটো ছেলে?"

"জি। ছেড়ে দাও ওকে।" বেবের কাতর অনুনয়, "বদলে আমার সঙ্গে যা করার করো। কিন্তু ও এখনও বড়ো ছোটো। ওকে বাঁচতে দাও।"

একটা ভারি হাত হঠাৎই আমার মাথার ওপর এসে পড়ল। চমকে দেখি, সেই মুরুব্বি নেতা আমার পাগড়ির ওপর হাত রেখে অল্প অল্প আদর করছে। চোখের দৃষ্টি যেন একটু নরম। মৃদু স্বরে বলল, "হাঁ। সহি কহাঁ তুনে। আমার নিজেরও এইরকম একটা ছেলে আছে। ছোট্ট, নিষ্পাপ। নরম স্বভাবের। অবিকল এমনই। তাকে আমি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। তার জন্য আমি মরতেও পারি, মারতেও পারি।"

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই অমানুষটার মধ্যে আচমকা বাপু মহাত্মা গান্ধী জেগে উঠলেন কী করে। আমার গোটা পরিবারের কাতিল শেষে আমার মাথাতেই হাত বোলাচ্ছে। এ কী ধরনের অচন্তা! কিন্তু আরও কিছু ভাবার আগেই তার চোখ ফের দপ করে জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত পিষে সে বলল, "কিন্তু ও আমার ছেলে নয়। ও বেয়ন্ত সিং, সতবন্ত সিং আর ভিন্দ্রানয়ালের জাত! আমার ছেলে গদ্দার নয়। তবে এটা বড়ো হলে গদ্দার হবেই। তাই শাস্তি ওকে পেতেই হবে। কঠিন শাস্তি!"

বলতে বলতেই সে আমার টুটি টিপে ধরল। লোহার মতো তার হাতের 'জকড়'। আমি ব্যথায় কাতরে উঠেছিলাম। দম নেওয়ার জন্য হাঁকপাক করছিলাম। কিন্তু তার দয়া হল না। লোকটা আমার ঘাড় ধরে বেবের সামনে বসিয়ে দিয়ে বলল, "এটা তোর মা না? কখনও ভেবে দেখেছিস্-তেরি মা অন্দর সে দিতি ক্যায়সি হ্যায়?"

সেই শিশু স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েই থাকে। এর পেছনের গূঢ় অর্থ সে কিছুই বোঝেনি। লোকটা একদৃষ্টে সেই কচি মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে, "দেখেনি। চলো, দিখা দো। ন্যাংটো কর শালিকে। বাচ্চাও একটু মজা নিক্।"

বেবের ওপর প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন সঙ্গে সঙ্গেই হামলে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে গেল কামিজ। শত বাধা সত্ত্বে সালোয়ারও খুলল। আমার মা, এক অসহায় নগ্নিকা তার ধর্ষকদের সামনে এবার হাতজোড় করেছে। কতগুলো জন্তুর পায়ে ধরছে আর বলছে, "তোমরা আমার সঙ্গে যা খুশি করো। চাও তো অত্যাচার করতে করতে মেরেই ফেলো না কেন! আমি চু-চা কিচ্ছু করব না। কিন্তু আমার এই মাসুম 'ছোটুর' সামনে নয়। এই জিম থেকেই ও জন্মেছে! এটাই ওর জন্মভূমি। এভাবে ওর জন্মকে কলঙ্কিত কোরো না! এই কলঙ্ক নিয়ে ও যে

শান্তিতে মরতেও পারবে না! আমি তোমাদের সব কথা শুনতে রাজি। কিন্তু আমার বলাৎকার ওর সামনে কোরো না। দোহাই...।” মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান তখন চোখ বুজে ফেলেছে। বিগত কয়েকঘণ্টায় তার মাসুমিয়তের তো ধজিয়াই উড়ে গিয়েছিল। যে নারীশরীর সম্পর্কে তার ধারণাই ছিল না, আজ তার নারকীয় ঘৃণ্য দিকটাই দেখল। এতদিন তার কাছে মা শুধু মা-ই ছিল, তাইজি স্নেহময়ী মাতৃসমা, দিদি সস্নেহ অভিভাবিকা। সবমিলিয়ে বড়ো ভালোবাসার মানুষ। আজ জানল ওরা কেউ মানুষই নয়, কতগুলো মাংসপিণ্ড! যার ওপর কুত্তা, হায়নার দল হামলে পড়ে। ছিঁড়ে খেতে পারে। ওরা মা, বোনের থেকেও বেশি ভোগের সামগ্রী। কতগুলো অমানুষের দল আট বছরের শিশুকে এই পাঠ পড়িয়েই ছেড়েছিল।

“চোখ খোল্!”

কে যেন একটা ধমকে ওঠে। টের পেলাম আমার গলায় ধারালো কী যেন একটা খোঁচা মারছে। তার তীক্ষ্ণ মুখ নরম চামড়া ভেদ করে কিছুটা মাংসও কেটে ফেলল। একটা উষ্ণ তরলের গড়িয়ে পড়া অনুভব করলাম। সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা। গলায় ছুরি চেপে ধরেছে ওরা!

“চোখ খোল।” আবার গর্জন, “আখে ফাঁড়কে দেখ। যা যা হবে সব দেখবি। নয়তো গলার নলি কেটে দু-ফাঁক করে দেব। তোর মা-কেও জ্বালিয়ে দেব।” নিরূপায় বাচ্চাটা ভয়ে, যন্ত্রণায়, মা-কে আগুনে জ্বালানোর হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদে বাধ্য হয়ে চোখ খুলল। তার চোখের সামনে নিজের জননী, স্নেহময়ী জন্মদাত্রী সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে আছে। আজ পর্যন্ত তার মুখ, ধবধবে সাদা গ্রীবা, দুটো নরম হাত আর দুটো পায়ের পাতাই শুধু দেখেছে সে। ওই পায়ের সামনে ঝুঁকেছে, হাতের আশীর্বাদ পেয়েছে। অথচ এখন গোটা শরীর নগ্ন। বারবার পায়ে পড়ছিল, পা ধরছিল বলে এখন তার হাত দুটো চার পাঁচজন জোর করে ধরে রেখেছে। পা দুটোও বীভৎসভাবে ফাঁক করা! ছোট্ট মানুষটা বুঝেছিল এরপর কী হতে পারে। এ দৃশ্য সে আগেই দেখেছে বহুবার। কিন্তু এ যে তার নিজের মা! জন্ম থেকেই বেবের কোল, স্পর্শ, ঘ্রাণ তার কাছে জীবনের আর এক নাম। এই নারীর হাত ধরে সে হাঁটতে শিখেছে। এর স্তন থেকেই অমৃতধারা পান করে বেঁচে রয়েছে। এই হাতই তার মুখে তুলে দিয়েছে অন্ন-জল। এই দেহ তার কাছে সবচেয়ে পবিত্র। হয়তো ঈশ্বরের থেকেও বেশি ‘পাক'!

বেবে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, “আখে বন্ধ কর গুল্লু! রজির দোহাই, ওকে এখান কথাটা শেষ করার আগেই আর একজন ‘দাঙ্গাই’ বলে, “চোখ বুজলেই ছেলের গলা কেটে দু-ফাঁক করে দেব ছিনাল কঁহিকি। চিরদিনের জন্যই ছেলে চোখ বুজবে। চলবে তোর?”

বেবে কথাটা শোনামাত্রই কেমন যেন পাথর হয়ে গেল। তার দুই চোখে শুধু শূন্যতা আর অন্ধকার। আমার মনে হচ্ছিল, মা বোধহয় ওই মুহূর্তেই মরে গিয়েছিল। তার ঠোঁট বেশ কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠল। কিন্তু আর একটি কথাও বলল না। একবারও প্রতিবাদ করল না। মিনতি বা অনুরোধও নয়! বাধা দেওয়ার চেষ্টাও করল না। শুধু যেন দারুণ অভিমানে, অপমানে আর লজ্জায় নিজের সন্তানের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে সে। পণ করেছে, আর কোনোদিন ফিরে তাকাবে না।

দলের নেতা নোংরা হাসি হাসল, “তুই জানিস কী করে তোর জন্ম হয়েছে? তোকে পৃথিবীতে আনার আগে তোর মা-বাপ বিস্তরে শুয়ে কী করেছিল জানিস? কীভাবে বিস্তর গরম করছিল।”

কথা নয়, যেন গরম লোহার তীক্ষ্ণ শলাকা কানের পর্দা ছিড়ে দিল। এর আগে আমি সত্যিই জানতাম না। যতবার বেবে-বাপুকে নিরীহ কৌতূহলে আমার উৎপত্তির ইতিহাস জিজ্ঞাসা করেছি, ততবারই তাঁরা বলেছেন যে আমার জন্য ওঁরা দু-জনে গুরুদ্বারায় গিয়ে অনেক প্রার্থনা করেছেন। বেবে লঙ্গর করে ভক্তদের খাইয়েছে। বাপু ঈশ্বরের ঘর ঝাঁট দিয়েছেন। অনেক প্রার্থনার পর এক পবিত্র ভোরে, স্বয়ং ওয়াহেগুরুই নাকি আমায় কোলে করে মা-বাবার বুকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মনস্কামনা পূর্তি করতেই আমার পবিত্র মানব জন্মলাভ।

কী মহামুরখ ছিলাম আমি। কিছু ঘণ্টা আগেও আমার এই ধারণাই ছিল যে আমি ওয়াহেগুরুর দেওয়া 'তোহফা'। কিন্তু আজ খানিকটা আগেই বুঝেছিলাম যে এর মধ্যে অন্য কিছুও থাকতে পারে। মুষকোটা আমায় ঘাড় ধরে টেনে মায়ের 'জাঙ্গ' এর কাছে নিয়ে গিয়ে যোনিটা ওর নৃশংস আঙুল দিয়ে ফাঁক করে খুলে দেখাল। আমার গা গুলিয়ে উঠল। সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করছে। এটা কী! কতগুলো চামড়ার ভাঁজ, লাল মাংসের স্তর! এসব দেখার আগে অন্ধ হয়ে গেলাম না কেন। মনে হচ্ছিল ওদের বলি, "ওই সফেদ পাউডার আমার চোখে ছিটিয়ে দাও। অন্তত আমি বাঁচি!"

"এই দ্যাখ, এই গর্ত দিয়ে তুই মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছিস। ঢুকেছিলিও এইখান দিয়েই। তোর বাপু তোকে ঢুকিয়েছিল। কেমন করে দেখবি?" বলতে বলতেই সে নিজের প্যান্ট, অন্তর্বাস খুলে বেবের ওপর চড়াও হল। একা

আমার মাথার ভেতরে কে যেন তীক্ষ্ণ সূঁচ ফুটিয়েই চলেছে। 'সরে'র ভেতর, বুকের মধ্যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অথচ তা দেখানো যায় না! একের পর এক হায়না এসে লাফিয়ে পড়ছিল বেবের ওপরে। আপ্রাণ চোখ বুজতে চাইছিলাম। কিন্তু যতবার সে চেষ্টা করছি, ততবারই ওরা আমার গলায় ছুরি চেপে ধরেছে, বেবেকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। মনে মনে রজির কাছে আর্জি জানাচ্ছি, আমায় অন্ধ-বধির করে দাও এই মুহূর্তেই। এই দৃশ্য দেখতে চাই না। এই শীৎকার আর অশ্লীল শব্দ, বেবের গোঙানি শুনতে চাই না। কিন্তু আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি। স্তম্ভিত হয়ে দেখছি, ক্রমাগতই ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে আমার জন্মস্থান। গলগল করে খুন বেরিয়ে আসছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক। তবু লোকগুলো ছাড়ছে না। একের পর এক...একের পর এক...চার...পাঁচ...ছয়.... সাত...আট...নয়...। হায়নার কী শেষ নেই!

সে নয়, আশ পাশ থেকে আরও অনেকে। আমার চোখ বোঁজার উপায় ছিল না। তাই দেখতে বাধ্য হচ্ছিলাম যে কীভাবে আমার জন্মস্থান কুকুরের মতো জিভ দিয়ে চাটছে ওরা! যে বুকের দুধ আমায় জীবন দিয়েছে, কীভাবে সেই স্তনগ্রন্থির মাংস ভীষণ আক্রোশে আঁচড়ে, কামড়ে ফালাফালা করছে। জন্তুর মতো ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে দিচ্ছে। যত্রতত্র দাঁত বসিয়ে একসঙ্গে সবাই পারলে খাবলা খাবলা মাংস তুলে নেয়। কী বীভৎসভাবে জান্তব রাগে বেবেকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। আমি চিৎকার করে বলতে চাইছিলাম, 'থামো, এ আমার মা! কোনো খাদ্যবস্তু নয়!" কিন্তু মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরোচ্ছিল না! শুধু দেখছিলাম ওদের কঠিন আর কদর্য পৌরুষ নিষ্ঠুর তরোয়ালের মতো সবেগে বিদ্ধ করছে আমার মায়ের গোপনাঙ্গকে। বেবের শরীরটা শুধু জোরদার ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে উঠছে। থরথর করে কেঁপে উঠছে নগ্ন স্তন, পেট, কোমর, তলপেটের সামান্য মেদ। ওরা তার ওপরই নিষ্ঠুরভাবে ধারালো দাঁত বসিয়ে চলেছে। বেবে এখনও মুখ ঘুরিয়ে আছে। কিছুতেই তাকাবে না আমার দিকে। কয়েকজন বুকে এমন কামড় দিল যে স্তনবৃত্তই ছিঁড়ে গিয়েছে। মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু গলা, কাঁধ, ছাতি, পেট, নাভি, জাঙ্গ, নিম্নাঙ্গ। এমন কোনো জায়গাই ছিল না যেখানে কামড়ের রক্তাক্ত দাগ, ক্ষত, রক্তের ধারা নেই। বেবে চিৎকার করছে না, কাঁদছেও না। কিন্তু হালকা গোঙানির আওয়াজ শুনে বুঝলাম যে ভয়াবহ যন্ত্রণা আর কান্না চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

পুরো দুঘণ্টা ধরে চলল এই দুষ্কর্ম! নয় অবধি গিনতি করেছিলাম। তারপরও যে কত এল আর কত গেল তার হিসেব নেই। রাখা যায় না। এই গোটা সময়টা ধরে আমি মৃত্যুর পায়ে সর ঠুকছিলাম! অন্ধত্ব, বধিরত্বের কাছে গিরগিরাচ্ছিলাম। গোটা সময়টা বুঝি একটুও শ্বাস নিইনি। কিন্তু কেউ আমার কথা শোনেনি। না মানুষ, না শয়তান, না ঈশ্বর। বেবেকে মনে মনে কাতর অনুনয় করছিলাম, 'তুইও শেষে মুখ ফিরিয়ে নিলি মা। এই দদনাক লমহায় তুইও আমার দিকে একঝলক তাকিয়ে দেখবি না? একবারও মাথায় হাত রাখবি না। ওরা তোকে চিবোচ্ছে, মরছি তো আমি। কী অন্যায় করেছি যে আর আমার মুখ দেখবি না? একবারটি তাকা না বেবে। মরার আগে একবার তোর মুখটা দেখে যাই...! বস্ একবার তো দেখ্ লে!"

বেবে কথা রাখেনি। ভেবেছিলাম নিষ্ঠুর অভিমানে বুঝি পাথরই হয়ে গিয়েছে। অথবা

সন্তানকে তার বীভৎস রক্তাক্ত মুখ দেখাতে চায়নি। দু-ঘণ্টা ধরে বুঝি নীরবেই শুধু সয়ে গিয়েছে। কারণ একঘণ্টার মাথায় তার গোঙানিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি এত বড়ো নির্বোধ যে বুঝতেই পারিনি, ওই নীরবতার পেছনে অপমানের দুঃখ, লজ্জা বা অভিমান নয়, মৃত্যু ছিল। বেবে বাইরে থেকে ঠিকঠাক থাকলেও মাঝেমধ্যেই বুকে সামান্য ব্যথা, বুক ধড়ফড় করার কথা বলত। অল্প অল্প শ্বাসকষ্টের শিকায়ত'ও করত। কিন্তু সে নিজেও কখনও বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি, আমরাও এত 'এহমিয়ত' দিইনি। নিম্নবিত্ত ঘরের বউ-মেয়েরা যতক্ষণ না শ্বাস উঠছে ততক্ষণ ডাক্তারের কাছে যায় না। ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে কে মাথা ঘামায়?

তখন বুঝিনি যে বেবের হৃৎপিণ্ড দুর্বল ছিল। কিছু সমস্যা তার "দিল'-এ তো ছিলই। হয়তো শরীরে 'খুনও কম ছিল। তার ওপর এত অপমান, এত যন্ত্রণা, অবিরাম রক্তক্ষরণ, 'অন্দরুনি চোট', অঙ্গগুলোর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ার ধকল এই দুর্বল হৃদয় আর 'নাজুক' নারীদেহ আর নিতে পারেনি। আমার অজান্তেই তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একঘণ্টার মাথাতেই সেও আমাকে ছেড়ে রওনা দিল অসীমের পথে। এই রক্ত, জ্বালা, যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনার হাত থেকে শেষপর্যন্ত মুক্তি পেল।

যতক্ষণে বুঝলাম ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কাজ শেষ করে, মৃত্যুশীতল গোস্ত চিবিয়ে লোকগুলো বেশ তৃপ্ত মুখে, ঘাম মুছতে মুছতে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন বেবের নিথর দেহটা দেখে ভাবছিলাম, এরপর আর কী বেঁচে থাকল। আজ আমার গোটা পরিবার শেষ হল, আমার নিষ্পাপ মনকে খুন করা হল, স্বপ্নকে ভেঙে চৌচির করে দেওয়া হল, মনকে অপবিত্র আর আদর্শকে কলঙ্কিত করা হল, আত্মাটাকেও অভিশপ্ত করে তোলা হল। আমি সেই পাপের ঘড়া, যে নিজের মায়ের 'লাজ'-ও রক্ষা করতে পারেনি, শুধু বসে বসে তার বলাৎকার দেখেছে। আমার চেতনা, বিবেক, অনুভূতি, সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আর কী বাকি রইল?... শেষ হওয়ার জন্য আর কী-ই বা বাকি আছে!

লোকগুলো আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে চুকচুক করে মিথ্যে শোক প্রকাশ করল। আস্তে আস্তে বলল, "তোর মা বড্ড কমজোর। এইটুকুতেই মরে গেল। তেরি বেবে তো মর গয়ি। ক-টা জোয়ান লোককে সামলাতে পারল না!"

আমি নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। ওরা আমার চোখের সামনেই বেবের ছেঁড়াখোঁড়া শরীরটাকেও জ্বালিয়ে দিল। শিশু তার মৃত মাকে অন্তিমবারের মতো একটু ছুঁতেও পারল না! একবার তার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত নগ্ন দেহটাকে জড়িয়ে ধরে শেষবারের মতো অপমানিত দেহটার লজ্জা ঢেকে দেওয়ার চেষ্টাও করতে দিল না কেউ। মুখাগ্নি, অন্তিম সংস্কারের অধিকারও পেল না হতভাগা সন্তান। তার নিষ্পাপ চোখে তখন সেই জ্বলন্ত দেহের প্রতিবিম্ব আগুনের ফণা তুলে নাচছে। শোক প্রকাশের সুযোগও নেই। সব শেষ!

"চল্, অনেক মজা নিয়েছিস।" দলের নেতা রূঢ় গলায় বলল, "এবার তুইও নরকে যা!"

আর একটা কথাও খরচ করল না কেউ। চোখের পলক ফেলতে-না ফেলতেই আমার পেটের ভেতরে ঘ্যাঁচ করে ঢুকে গেল একটা বড়োসড়ো রক্তমাখা তরোয়াল। যে লোকটা তরোয়াল চালিয়েছিল সে ধারালো অস্ত্রটাকে পেটের মধ্যে থাকাকালীনই জোরদারভাবে একবার ডানদিকে ঘোরালো, আর একবার বাঁ-দিকে! এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যেন অস্ত্রসহ সমস্ত অঙ্গ টুকরো টুকরো হয়ে কেটে যায়। টের পেলাম, পেট থেকে কীসব যেন বেরিয়ে আসছে। গলগলিয়ে একটা উষ্ণ তরল ফিনকি দিয়ে ছুটেছে! এই প্রথম, যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম আমি।

আমার ঘাতক একটানে বের করে আনল অস্ত্রটা। আর বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে এবার বুক লক্ষ্য করে চালাল। হাড়-পাঁজর, মাংস-পেশী ভেদ করে ঢুকে গেল ইস্পাতের শাণিত ফলা। এবার আর যন্ত্রণায় চেঁচানোর অবকাশও ছিল না। চোখের সামনে শুধু 'অন্ধেরা'... মশালের তীব্র আলো, জ্বলন্ত দেহের আগুন, সব ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছেখএকটা নিরেট ঘুম পর্দার মতো নেমে আসছিল। সত্যি বলতে কী এ ব্যথা নিতান্তই সামান্য। হয়তো

কয়েকমুহূর্তের জন্য। এর আগে যা ভোগ করেছি, সেই নারকীয় যন্ত্রণার চেয়ে অনেক ভালো। হ্যাঁ, মৃত্যুও অনেক ভালো এই পৈশাচিক মন্জরের চেয়ে। আসুক সে। যত দ্রুত সম্ভব আসুক। জীবন যে বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে, মৃত্যু তা পালটে দিয়ে সবার সঙ্গে আমার মিলন করে দিক। জীবনে তো হল না। হয়তো মৃত্যুতেই সরতাজ আর দিদির শাদি হবে। আমরা নাচব, গাইব, আনন্দ করব। সেখানে কেউ আমাদের গদ্দার বলবে না। কেউ তরোয়াল নিয়ে, আগুন নিয়ে মারতে আসবে না। কেউ রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলবে না, "এদের শেষ কর।"

আমি আস্তে আস্তে স্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। যেন গভীর শীতল জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। শরীর থেকে উষ্ণতার শেষবিন্দুটুকুও বুঝি বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন মৃত্যুর শীতল শান্তিময় স্পর্শ মেহসুস করছিলাম। সে আমাকে আস্তে আস্তে দোলাচ্ছিল আর ফিশফিশ করে বলছিল, "ঘুম যা!... ঘুম যা পুত্তর। অনেক দর্দ সয়েছিস। অনেক জিল্লতের মুখে পড়েছিস। এবার আমার কোলে আয়... মেরি বাহোঁ মে সোযা... সো যা বেটা... আর ব্যথা নেই... কান্না নেই... কিচ্ছু নেই...!"

কানে এল তার মিষ্টি সুরের গান, "টিম টিম করদে নিকে নিকে তারে, লগ্ দে সানু

বহোত পিয়ারে, জি করদা মৈ তোড়ি যাওয়া, অপনে ওয়াড়ি ভিচ্ বিছাওয়......" মৃত্যুর গলাটা অবিকল বেবের মতো! আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বড়ো শান্তিতে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে কোনো শব্দ ছিল না। শোরগোল ছিল না। শুধু নক্ষত্রের ঝিকমিক দীপ জ্বলছে চারিদিকে। মনে হচ্ছিল রাতের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছি। মহাকাশের কোলে ঢুকে নিশ্চিন্তে ঘুম দিচ্ছি। সেখানে কেউ আমায় আর খুঁজে পাবে না। নিজের দেহে কোনোরকম কষ্ট, কোনোরকম যন্ত্রণা আর টের পাইনি। বরং খুব হালকা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছে, 'পঞ্জি'র মতো উড়ে বেড়াতে পারি। কাপাস তুলোর মতো ভেসে বেড়াতে পারি। পাখির পালকও বুঝি আমার চেয়ে ভারি। নিজেকে এত হালকা আগে কখনও মনে হয়নি। এত আরামের 'নিন্দ' আমায় ঘিরে ছিল যে চোখ খুলতেও ইচ্ছে করছে না।

"গুল্লু... পুত্তর!"

কতক্ষণ, কতঘণ্টা এভাবেই ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। আচমকাই বাপুর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে 'নিন্দ' ভেঙে গেল। চোখের ভারি পাতা অতিকষ্টে খুলে ঘোরের মধ্যে দেখলাম, বাপু, বেবে, সরবজিত, আমনপ্রীত, তাইজি, তাওজি—সবাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন! ওঁদের গা থেকে সোনালি আলো ঠিকরে পড়ছে। সেই আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। হীরের মতো দ্যুতি ছড়াচ্ছে ওঁদের দেহ। বেবের মুখখানা কী পবিত্র! যেন কোনো দেবী এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। আমি বেবের দিকে তাকাই, "তুই যাওয়ার আগে আমার দিকে একবারও ফিরে তাকালি না মা? আমি কী দোষ করেছি?"

বেবের চোখ বেয়ে মোতির মতো দানা দানা অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে, "বেটা, একমাত্র মায়েরাই জানে যে কখন তারা সন্তানের চোখে চোখ রাখার কাবিল থাকে না। দোষ তোর নয়। দোষ আমার নসিবের। আমি কোন্ লজ্জায় এ পোড়া মুখ তোকে দেখাতাম!"

ওরা সবাই এত ঝলমল করছে যে আমার চোখে ধাঁধা লাগছিল। সবাই ভীষণ সফেদ। বড়ো উজ্জ্বল। বুঝতে পারলাম, সবাই আমাকে নিতে এসেছে। ওদের গা থেকে মোগ্রার সুবাস আসছিল। সহস্র তারার কুঁচি বোধহয় সাদা পোষাকে লেগে 'জগমগাচ্ছে'। বেবে আর বাপুর মাথার পেছন থেকে চাঁদ উঁকি মারছে। এত বড়ো রুপোলি 'চন্দা' আমি জীবনে কখনও দেখিনি। ক্ষীণ স্বরে বললাম, "যস্যিদিদি কই? আমি কি মরে গেছি? তোমরা আমায় নিতে এসেছ?"

"যস্যি এখনও আসেনি।" বাপুর মুখ বিষণ্ণ, "তবে চলে আসবে। কিন্তু তোর এখনও আসার সময় হয়নি বাবা। তোকে এখনও অনেকখানি লড়তে হবে। তাই আমরা সবাই সাহস জোগাতে এসেছি। হিম্মত সে কাম লে অব্।" "তবে কি আমি মরিনি বাপু?"

তিনি মাথা নাড়লেন, "না পুত্তর। তোর খুশনসিবি বল্ কী বদ্‌সিবি, তুই এখনও বেঁচে

আছিস। আমরা বাঁচিনি। যস্যিও বাঁচবে না। লেকিন তুই বাঁচবি। তোর সাঁস এখনও চলছে। দুশমনরা চলে গেছে।"

"ওরা আমায় পোড়ায়নি?"

আমি হতবাক। ওরা তো কখনও এমন ভুল করে না। তরোয়াল দিয়ে কেটেই তো জ্বালিয়ে দিচ্ছিল! আমাকে ভুলে গেল কী করে?

"মাচিসের পর এবার ওদের তেলও খতম হয়ে গিয়েছিল।" তিনি সস্নেহ হাসলেন, "তাই আর কাউকে জ্বালায়নি। শুধু কেটেই শেষ করেছে। আর তোর যা অবস্থা হয়েছে গুল্লু, তাতে ওরা ভাবতেও পারেনি যে তুই বেঁচে আছিস। কিন্তু তোকে আরও কিছুদিন বাঁচতে হবে যে।"

"তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না আমার?"

"হবে।" বাপুর চোখদুটো ভীষণ শান্ত, "যখন সময় হবে তখন আমরা সবাই মিলে আবার আসব তোকে নিতে। লেকিন এখনও সময় হয়নি বাপ। তাই শুধু দেখা দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের দেখতে না পাস্, সঙ্গে সঙ্গেই থাকব। মিথ্যে লাশের ভিড়ে খুঁজতে যাস না। এখন একলাই বাঁচ।"

আমি কেঁদে ফেললাম, "এ কেমন কথা বাপু। আমি তোমাদের কাউকে ছাড়া বাঁচব কী করে? এই চোখদুটো যা যা দেখেছে, তারপর বেঁচে থেকে কী করব? এই জীবন এখন সাজা। সবকিছু যে আমার শেষ হয়ে গেছে। ঘর নেই, আপনজন নেই, পড়োসি নেই, গোটা দেশটাই নেই। বিশ্বাস নেই, বাঁচার কারণ নেই...!"

"বাঁচার জন্য যখন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন এমন কোনো 'ঠোস্ ওয়াজাহ' খুঁজে নিতে হয় যার জন্য অন্তত তুই মরতে পারিস।" বাবার মুখে সেই প্রশান্ত হাসিটা লেগে আছে, "আর কিছু না থাক হিম্মত তো আছে। তোকে উঠে দাঁড়াতেই হবে গুল্লু। রবৃক্তি যখন জিন্দা রেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কোনো মনজিল্ তোর জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। আর ঘুমিয়ে থাকিস্ না। ওঠ গুরু। জা-গ!" "লেকিন্...।"

"কোই লেকিন নেহি।" তিনি দৃঢ় স্বরে বললেন, "এই জঙ্গটা তোর। মনে রাখিস, যন্ত্রণাকে মাত না দিতে পারলে তুই বাজি জিতবি না। তোকে 'দর্দ' জিনিসটাকেই ভুলে যেতে হবে। তুই সাচ্চা শিখের ঔলাদ। হেরে যেতে শিখিসনি। উঠে দাঁড়া গুল্লু। ও-ঠ! ড-ট্-কে স-র্দা-রা!"

বাপুর মুখে এই লজটা যে কতবার শুনেছি। এবার যেন প্রচণ্ড জোরে ওঁর কণ্ঠস্বর অনুরণিত হতে হতে আমার কানে এল। এত জোরে এল যে আমি ধড়মড় করে উঠে বসি। কোথায় বাপু, কোথায় বেবে, কোথায় কী! এক লহমায় সমস্ত ঘোর, মৃত্যুর নেশা কেটে গিয়েছে। আবার সেই পোড়া কেরোসিনের গন্ধ, রক্তের বদবু সবকিছু ফিরে এসে ধাক্কা মারল আমাকে। তার সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হল ভয়াবহ যন্ত্রণা! পেট, বুক থেকে এখনও রক্ত ঝরে চলেছে। কী ভয়ংকর 'দর্দ।' বুঝলাম, বাপু ঠিকই বলেছে। জান আছে বলেই যন্ত্রণাও আছে। মওত জিন্দগির থেকে অনেক বেশি দয়ালু। সমস্ত কষ্ট মুছে দেয়। কিন্তু জীবন প্রতি পদে পদে ব্যথা দেয়, বুঝিয়ে দেয়, তুমি জিন্দা আছ!

আমার চতুর্দিকে তখন শুধু লাশের পাহাড়। কিন্তু কে যে কোনটা তা চেনার উপায় নেই। কোথায় বেবে, কোথায় বাপু, কোথায়ই বা সরবজিত বা আমনপ্রীত কে জানে! শুধু কতগুলো কাটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভিড়ের মধ্যে আমি শুয়েছিলাম। দাঙ্গাইরা তখন আশেপাশে নেই। অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে ওদের হালকা গুজগুজ ফুসফুস কানে এসেছিল ঠিকই। ওরা আমাকেও জ্বালাতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের হতাশ কণ্ঠস্বরও শুনেছিলাম, "তেল খতম হো গয়া রে!"

অন্য একজন একটু চুপ করে থেকে বলল, "চল্, ছোড় দে। হাল দেখেছিস? পেটের নাড়িভুঁড়ি সব বের হয়ে গেছে। বুকও ফুটো। মর গয়া ইয়ে। আর মাত্র কয়েকটাই বাল-বাচ্চা বাকি আছে। সেগুলোর ঘাড় থেকে গলা নামিয়ে দে। একবারেই মরুক। তাড়াতাড়ি কর। হাতে আর বেশি সময় নেই।"

কে যেন একটা হাসল, "হ্যাঁ। ওদিকে তো শুনলাম কয়েকজন রূপসী নাকি সুহাগরাতের

অপেক্ষায় আছে। তাড়াতাড়ি না গেলে সুযোগ পাওয়া যাবে না। সেইজন্যই এত তাড়া ভায়ার।”

“নেহি রে।” আগের গলাটাই আবার বলে, “সুহাগরাত তো হয়ে যাবে। কিন্তু তিন তারিখ যে পড়ে গেছে সে খেয়াল আছে? আর একপ্রহর পরেই ভোর হবে। আজই তো শুনেছি আর্মি নামবে। তারপর কী করবি? ঘন্টা? জলদি জলদি কাম নিপ্‌টা।” তারপর আর কিছু কানে আসেনি। বেহোঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমাকে মৃত ভেবে ওই লাশের স্তূপের মধ্যেই ফেলে গিয়েছিল। যখন হুঁশ এল, বুঝলাম বেঁচে আছি, তখন দেখি অন্ধকার বেশ কিছুটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। আলো ফোটেনি তখনও আকাশে হাল্কা হাল্কা মেঘ। পূবদিক এখনও আঁধার। তবে বুঝতে বাকি রইল না যে খুব শীগগিরিই ভোর হবে। হয়তো সেজন্যই তাড়াহুড়োয় চলে গিয়েছে ওরা। আই.পি.এস. দত্তা আর তার দলবলও নেই। ভালো করে ‘মোয়ায়না’ করেনি যে সবগুলোই লাশ ছিল, না তার মধ্যে একটা ছোট্ট দেহে তখনও ধুকপুক করছিল প্রাণের স্পন্দন।

আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যর্থ ‘তালাশে’ চারদিকটা দেখে নিলাম। চতুর্পাশে কারোর হাত, কারোর “টাঙ্গ”, কারোর শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ে আছে। একটা আস্ত মৃতদেহও ছিল না ওখানে। একটা পূর্ণাঙ্গ লাশও চোখে পড়েনি যাকে আলাদা করে চেনা যায়! যেগুলো আস্ত ছিল সেগুলো আপাদমস্তক পোড়া। বীভৎস তাদের রূপ। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া কয়েকটা হাড় গোড় ছাড়া কিচ্ছু নেই। বাপু ঠিকই বলেছিলেন। এর মধ্যে কাউকে চেনা সম্ভবই নয়। খুঁজে মরাই বৃথা!

আমার পিঠের নীচটা চটচটে আর পিছল! কোথাও এমন একটু জায়গা ছিল না যেখানটা শুকনো! তেল, রক্তে গোটা কলোনির মাটি পিচ্ছিল হয়ে আছে। আমি সন্তর্পণে উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়েই বেশ কয়েকবার পড়ে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম না কী করে এখান থেকে বেরোব। হাতে ভর দিয়ে উঠতে গেলেই স্লিপ করছে। আবার দড়াম করে আছড়ে পড়ছি! পেটের ভেতর থেকে কেটে যাওয়া নাড়িভুঁড়ি থেকে রক্ত পড়ছে। সেগুলো অবাধ্য হয়ে ক্রমাগতই বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তবু হাত দিয়ে সেগুলোকে ভেতরে ভরে পেট চেপে ধরে ওঠার ‘কোশিশ’ করছি। অথচ কিছুতেই ‘কাময়াব’ হচ্ছি না! ব্যথায়, কষ্টে, মরণযন্ত্রণায় ভুল করেই একবার কঁকিয়ে উঠলাম, “উঃ!”

“গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই... কিকো খবর, কৌন হ্যায় উয়োহ... অনজান্ হ্যায় কোই...!”

কানের কাছে আবার সেই তীব্র শিস্। হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফিয়ে উঠল যে মনে হল গলা দিয়েই বুঝি বেরিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে খটখট করে শক্ত বুটজুতোর শব্দ। এ আওয়াজ আমার অত্যন্ত চেনা। এই জুতো পুলিশের। আর যে শিসটা বাজছে সেটা আগেও শুনেছি। নিঃসন্দেহে এই সেই উর্দিওয়ালাই। কিন্তু ওরা আবার ফিরে এল কেন?

“কে রে? আওয়াজ কে করল?”

শিসের শব্দ থেমে যায়। শুনলাম একটা চাপা স্বর বলছে, “এখান থেকেই কে যেন শব্দ করল না? কোই অভি ভি জিন্দা হ্যায় ক্যায়া?”

এবার বুঝতে পারলাম কী ভুলটাই না করেছি। ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি একেবারেই চলে গিয়েছে। কিন্তু জানা ছিল না রাতের শেষ প্রহরে কয়েকজন ফের ফিরে এসেছে। তদন্ত করতে এসেছে যে সবাই মরে গিয়েছে কিনা। যদি কোনোভাবে বুঝতে পারে যে একজনও বেঁচে আছে, তবে তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেওয়ার ‘মনসা' নিয়েই এসেছে ওরা। হয়তো এখন ওদের সঙ্গে পর্যাপ্ত তেল আর দেশলাইও আছে। একটা মানুষকেও বেঁচে থাকতে দেবে না। নিস্তব্ধ মঙ্গলপুরীর এই ব্লকে কোনোরকম প্রাণের সাড়া না পেলে হয়তো চলে যেত। অথচ আমি বোকার মতো কাতর শব্দ করে ওদের এদিকেই ডেকে এনেছি।

ওই আট বছরের বাচ্চা ছেলে বুঝতে পেরেছিল যে কিছুতেই ওদের আভাস দেওয়া চলবে না যে সে বেঁচে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই টানটান হয়ে ওই চটচটে রক্ত মাখা, লাল টকটকে

ভেজা মাটিতেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। বুকের ভেতরে যেন ঢোল-নাগাড়া একসঙ্গে বাজছে। নাকে রক্তের আঁশটে গন্ধ! তবু নিজেকে একদম স্থির রেখে দম বন্ধ করে পড়ে রইলাম লাশের মতো। শিকারীরা যেন বুঝতে না পারে যে শিকার এখনও মরেনি। কিছুতেই ওদের বুঝতে দেওয়া যাবে না! মনে মনে নিজেকেই বললাম, "গুল্লু, তুমি এখন মৃত... তুমি একটা লাশ...!"

চোখ বন্ধ থাকার দরুণ কিছুই দেখতে পাইনি। কিন্তু সেই পুলিশি বুটের খটখট্ আর আরও কয়েকটা পায়ের আওয়াজ একেবারে আমার কাছেই এসে থামল। বুকের ভেতরের নাগাড়া এখন আরও তীব্র! ভয় লাগছে যে আমার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ না শুনে ফেলে। দাঁতে দাঁত চেপে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে একগাদা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাংশের মধ্যে অবিকল একটা লাশের মতোই পড়ে রয়েছি। তবু মনে হচ্ছে, ওরা ঠিক ধরে ফেলবে।

"আওয়াজ তো ইধর সে হি আয়া।" এবারের কণ্ঠস্বর একটু ভারি, "পর কিয়া কিনে? সব তো পুড়ে-ধুড়ে ঝামা হয়ে আছে। স্রেফ হাড়ই সার। জিন্দা থাকা নামুমকিন। হাড় কিংবা লাশের টুকরো আওয়াজও করে না। তবে কে শব্দটা করল?"

আমি দমবন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। জুতোর আওয়াজ আমার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে একটা তীব্র আলোর আভাসও পাচ্ছিলাম। টর্চের আলো। ওরা টর্চ জ্বেলে দেখছে যে কোনো দেহ একটুও নড়াচড়া করছে কিনা। লাশের ভিড়ে কোনো জীবন্ত মানুষ লুকিয়ে আছে, না নেই। জুতো দিয়ে খোঁচা, লাথি মেরে প্রত্যেকটা শবদেহ সরিয়ে সরিয়ে দেখছিল যে প্রাণের সাড়াটা এল কোথা থেকে! মৃত মানুষ কখনো 'উঃ' বলে না। তবে বলল-টা কে!

কিছুক্ষণ বাদেই চড়া আলোটা আমার মুখ ছুঁয়ে যায়। বুঝতে পারলাম, কাটা ছেঁড়া শবের মধ্যে একটা আস্ত মানুষের দেহকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। নিঃসীম আতঙ্কে সারা শরীরের রক্ত হিম! এবার বুঝি রে রে করে তেড়ে এল। খটাস্ খটাস্ শক্ত বুটের শব্দ ঠিক আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অন্য পদধ্বনিও। দম নিতে না পেরে বুক ফাটছিল। তবু একটুও নড়লাম না। একটা বিরাট ভুল অজান্তেই করে ফেলেছি। এখন যদি ভুলক্রমে একটুও নড়ি তবে যেটুকু শ্বাস আর আশ বাকি আছে, সেটুকুও যাবে।

"ইয়ে দেখো!" ভারি স্বর বলে উঠল, "এই পাবলিক এখনও এক পিসে আছে। এটাই কাতরাচ্ছিল না তো? মানুষের টুকরো আওয়াজ করে না, কিন্তু আস্ত মানুষ তো করতে পারে।"

ভেতর থেকে আতঙ্কে কে যেন 'রি রি' করে উঠল। কিন্তু বাইরে নৈঃশব্দ কায়েম। কোনো 'হলচল'নেই। ওই অবস্থায় কী করে যে স্থির হয়ে পড়েছিলাম তা শুধু আমার অন্তর্যামীই জানলেন।

"এক পিসে কোথায় আছে?" এবার আর একজন হালকা প্রতিবাদ করে উঠল, "পেটের অবস্থা দেখেছিস? আতেঁ নিকল গয়ি হ্যায় ইসকি তো! কট ভি গয়ি। রক্তে ভিজে আছে। বুকেও বিরাট ঘা। এইটুকু বাচ্চা এরপরও জিন্দা থাকতে পারে? উহুঁ, বেঁচে থাকা নামুমকিন। ওর মুখের দিকে তাকা। পুরো ফ্যাকাশে। অনেকক্ষণ হল প্রাণ বেরিয়ে গেছে।"

ওই শত্রুবাহিনীর ঘেরাটোপের মধ্যে এই একটা লোককেই ওই মুহূর্তে পরম বন্ধু বলে মনে হয়েছিল! ওই একটা লোকই আমায় নিঃসন্দেহে মৃত ঘোষিত করেছিল। এককথায় ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছিল। আমি জানতাম ও বিরাট ভুল করছে। কিন্তু তখন ওই ভুলটাই মনে প্রাণে চাইছিলাম।

"ডাগদরসাব!"

পাশ থেকে এবার যে ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ আওয়াজটা এল এটা আমার পরিচিত। ইনিই সেই উর্দিওয়ালা যিনি শিস্ দিচ্ছিলেন। একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলল সে, "আপনি নাড়ি দেখতে পারেন? না স্রেফ মুখ দেখেই বলে দিতে পারেন যে কৌন জিন্দা হ্যায় ঔর কৌন মর গয়া? আওয়াজটা কিন্তু আমিও শুনেছি।"

'ডাগদরসাব' উপাধি পাওয়া ব্যক্তি এবার রেগে গিয়েছে, "তোমার কী মনে হয়? নাড়ি দেখতে পারলে কি গুন্ডা হয়ে ঘুরতাম? লেকিন তজুরবা নাম কি ভি কোই চিজ হ্যায়। এ জীবনে খুন কম করিনি। তাই লাশও বহুত দেখেছি। এ বাচ্চাটা জিন্দা নয়, লাশই।"

"দেখ লেতে হ্যায়...।"

আমার নাকের সামনে দুটো আঙুলের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা সেটা কেউ 'জাঁচ' করে দেখছে। ফুসফুস দুটো তখন প্রায় ফাটতে বসেছিল। এ কী বিষম যন্ত্রণা। লোকটা তো নাকের সামনে থেকে হাতও সরানোর নাম করছে না। সেই কতক্ষণ থেকে দম বন্ধ করে আছি। এরকম চলতে থাকলে তো এই 'ঘুটনে'-ই শেষ হয়ে যাব।

"সাঁস চলছে না।" সেই ব্যক্তি বলল, "দাঁড়া, আরও একটু দেখে নিই।"

এরপর আরও কিছুক্ষণ ওরা আমার গলা আর ঘাড়ের মাঝখানের শিরা, হাতের 'নস্' পরীক্ষা করে দেখল। ততক্ষণে এত রক্ত বেরিয়ে গিয়েছে যে বোধহয় কোনোরকম স্পন্দনই পাচ্ছিল না ওরা। বেশ কিছুক্ষণ পর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "কুছ ভি তো মালুম নেহি পড় রহা"

"অভি মালুম পড়েগা। দেখ।"

সিপাহীর গলা ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার এলিয়ে পড়া ডানহাতের ওপর দুটো শক্ত বুটের বীভৎস চাপ! জুতোর তলায় আমার হাতটাকে নির্মমভাবে পিষছে। তাতেও ক্ষান্ত হল না। একজোড়া শক্তিশালী ভারি পা, আর নিষ্ঠুর বুট এবার ওই শিশুর নরম কচি হাতের ওপর ধুপধাপ লাফাতে শুরু করল। তার দেখাদেখি আরও কয়েকটা পা ওইটুকু হাতের ওপর উঠে এসেছে। কতগুলো পূর্ণবয়স্ক ষাঁড়ের মতো চেহারার ভারি মানুষ একটা ছোট্ট নরম অঙ্গের ওপরে ধপাধপ করে প্রায় তাণ্ডব করতে শুরু করল। আমি এবার সত্যিই নিদারুণ কষ্টে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম। এ কী ধ্বংসাত্মক অত্যাচার। সে বেদনা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। নিজের কানেই নিজের হাড়ের মড়মড় শুনতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ওঃ মা গো .... আমার হাত... আমার হাত...।

কিন্তু আট বছরের শৈশব চেঁচিয়ে উঠতে চাইলেও তার এক ধাক্কায় বেড়ে যাওয়া বয়েস, মনের অন্দরের অকালবার্ধক্য বুঝতে পেরেছিল যে 'চুঁ' শব্দ করলেই সব শেষ। এমনকি এই বিষব্যথায় চোখ থেকে জলও গড়িয়ে পড়া চলবে না। সে বুঝি কানের কাছে ফিশফিশ করে বলল, "ব্লাকে ... চুপ....একদম চুপ! এ 'পীড়া', এ 'তক্‌লিফ' কিছু নয়। কিন্তু এখন যদি চেঁচিয়ে উঠিস, চোখ দিয়ে একফোঁটাও জল গড়িয়ে পড়ে, তবে প্রাণে বাঁচবি না। বাপু কী বলেছে মনে কর। তুই শিখের বাচ্চা। যন্ত্রণাকে জয় না করতে পারলে বাঁচা যায় না। তোর পেট কেটে দু-ফাঁক হয়ে গেছে। বুকের নস্ কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। তারপরও তুই বেঁচে আছিস। হাতটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও খুব বেশি কিছু ক্ষতি হবে না। যে জ্বালা তুই 'পল্ পল্' সয়েছিস্, তার কাছে এ নিতান্তই সামান্য। চুপ করে থাক ব্লাকে। সহ্য করে যা। চোখকে শুকিয়ে খাঁ খাঁ মরুভূমি কর। আঁখে নম্ ভি না হো। সব ঠিক হয়ে যাবে..."

যন্ত্রণা কীভাবে সহ্য করতে হয় সেদিন সেই শিশু শিখে গিয়েছিল। তার ডান হাতের হাড়কে দুরুমুশ করার পরেও ওরা সন্তুষ্ট হল না। তার কানে একটা পেন ঢুকিয়ে সেটাকে এক জোরালো লাথি মেরে ফট করে প্রায় মস্তিষ্কেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কানের পর্দা ফেটে গলগলিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল। তবে পেনটা মস্তিষ্কে আঘাত করতে পারেনি। সেই শিশু নীরবে, চোখ বুজে সব 'সহন্' করে গিয়েছে। একটা শব্দও করেনি। তার মৃত্যুকঠিন মুখে একটা যন্ত্রণার রেখাও পড়েনি।

"নেহি রে। ইয়ে মর হি গয়া।" খাঁকি বলল, "নেহি তো জরুর চিখতা, চিল্লাতা। এইটুকু বাচ্চা এত বড়ো অভিনেতা নয় যে এত কিছু সহ্য করেও মরার অ্যাকটিং করবে। আমরাই বোধহয় ভুল শুনেছি। শায়দ কান বজ রহা থা...!"

বলতে বলতেই তার বুট খটখট করে ওঠে। টর্চের আলোও মুখের ওপর থেকে সরল। পায়ের আওয়াজগুলো এবার দূরে চলে যাচ্ছে। আরও একবার শোনা গেল সেই

বিভীষিকাময় সুর,

"গুমনাম হ্যায় কোই... বদনাম হ্যায় কোই...।"

ওরা ভুল বুঝেছিল। শুধু যন্ত্রণা সহ্য করা বা অ্যাকটিংই নয়, সেদিন সেই শিশু অনেক কিছু শিখে গিয়েছিল। আর সে শিক্ষা ওরা নিজেরাই হাতে ধরে দিয়েছিল আমায়। সে ওই একদিনেই শঠতা, ক্রুরতা, নৃশংসতা—সব শিখেছিল। কীভাবে প্রয়োজনে দানব হতে হয় তাও তার জানা হয়ে গিয়েছিল। নিষ্পাপ মনের অন্দরে একটা পাপী মানুষ ঢুকে বসেছিল সেদিনই। কতগুলো রাক্ষসই আমায় রাক্ষস হওয়ার পথ বাতলে দিয়েছিল। সে ব্যথাকে হারাতে শিখেছিল, অনুভূতিহীন হতে শিখেছিল, চোখের জল না ফেলতেও শিখে গিয়েছিল। সেদিনের পর আর কোনোদিন অতি বড়ো দুঃখেও গুলশন সিং কাঁদেনি।

তার সঙ্গে দায়ে পড়ে শিখেছিল বাঁ হাতের ব্যবহারও। লোকগুলো চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অবশেষে যখন সে ফের উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে, তখন টের পেল যে ডান হাতটা আর কোনো কাজের নয়। একটু নড়লেই ব্যথায় প্রাণ যাচ্ছে। অথচ আঙুলগুলো মুঠো করার সাধ্যও তার নেই। স্রেফ একতাল মাংস হয়ে লগবগ করছে ওই হাত। তবু হিম্মত হারেনি। পেট থেকে 'আঁত' আবার বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে অনেক কষ্টে বাঁ হাত দিয়ে সব মালপত্র ফের ঠেলে চেপে ধরে পেটের ভেতরে পাঠাল। রক্তবন্ধ করার জন্য অতিকষ্টে নিজের কুর্তাটাকে ওই একহাত দিয়েই পেটে বেঁধে সে কোনোমতে দৌড়োল। ওই গলিতে একটা পা ঠিকমতো রাখারও জায়গা ছিল না। গোটা পথে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কারোর মাথা, কারোর কবন্ধ, কারোর কাটা অঙ্গ! রক্তে এতই পেছল যে বারবার আছাড় খাচ্ছিল বাচ্চাটা। কিন্তু সে জানত যে করে হোক, এখান থেকে তাকে দিনের আলো ফোটার আগেই বেরোতেই হবে। তাই 'গিরতে-পড়তে', লহঁলুহান হয়ে, পায়ের তলায় লাশ মাড়াতে মাড়াতেই শিশুটি ছুটল গৌরী বিশ্বাসের বাড়ির দিকে। সে জানত, এখন গৌরীদিদিই একমাত্র তাকে বাঁচাতে পারে। দাঙ্গাইরা এদিকের কাজ 'খতম' করে অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। তাদের কাছে খবর ছিল যে তিন তারিখই আর্মি নামবে। তাই লাশ পাহারা দেওয়ার সময় নেই। গৌরীদিদিদের কলোনি পুরোটাই হিন্দুদের। তাই দাঙ্গাইরা ওদিকে ছিল না। যদি থাকত, তবে সেই শিশু আজ ডায়েরি লেখার জন্য বেঁচে থাকত না।

তবু আমি প্রাণ হাতে নিয়ে এস ব্লকের দিকেই দৌড়চ্ছিলাম। প্রতি পদে বিপদ ছিল। রাস্তায় শয়তানগুলো ধরে ফেলতে পারত। এবার ধড় থেকে মাথাও নামিয়ে দিতে পারত। কিন্তু ওয়াহেগুরু আমার সাথ দিলেন। কোনোমতে বিনা বাধায় গৌরীদিদির বাড়ি পৌঁছে গেলাম। অত রাতে দরজা খুলে উনি তো অবাক। আমাদের তিনজন ভাইকেই জন্ম থেকেই দেখেছেন, তাই ভালোভাবেই চিনতেন। আমার অবস্থা দেখে ওঁর মুখ শুকিয়ে গেল। মনে মনে সবই বুঝে গেলেন। বুঝলেন, আমার এ পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই! তখনই আমাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। অথচ তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা খুব খারাপ। তিনি জানতেন, কোনো হসপিটাল শিখদের চিকিৎসা করবে না।

"গুল্লু, বেটা...।" গৌরীদিদি কান্নাভেজা গলায় বললেন, "তোর ওয়াহেগুরুকে বলিস, যেন আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। জানি, অনেক বড়ো পাপকাজ করতে যাচ্ছি। কিন্তু এছাড়া আর উপায় নেই। আমি মজবুর।"

তিনি আর একটুও সময় নষ্ট না করে আমার পাগড়ি খুলে ফেলেছিলেন। আমি ক্রমশই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলাম। তার মধ্যেই টের পেলাম, গৌরীদিদি কাঁচি দিয়ে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে আমার লম্বা চুল কেটে ছোট করে দিচ্ছেন। হাত থেকে টান মেরে কড়াটাও খুলে নিলেন। এইটুকুই টের পেয়েছিলাম। তারপর আবার সব অন্ধকার...

আজও গৌরীদিদির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা হেঁট হয়ে আসে। আজ তিনি আর ইহলোকে নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই দেবদূতী হয়ে 'সিতারা' হয়েছেন। গৌরী বিশ্বাস না থাকলে আমি বেঁচে থাকতাম না। উনিই এক এক করে আমার দেহের সমস্ত শিখ হওয়ার চিহ্ন মুছে দিয়েছিলেন। আমার অচেতন, রক্তাক্ত দেহটাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। গুরু

নানক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে আমি তাঁর বোনপো। অন্য কলোনির শিখদের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করার সময়ে দাঙ্গাইরা ভুল করে আমার ওপরও আক্রমণ চালিয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবার কোনো আপত্তিই করেনি। হিন্দু শিশুকে বাঁচানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হয়েছিল। তারা একটার পর একটা অপারেশন করে আমার ছেঁড়াখোঁড়া নাড়িভুঁড়ি, জখম বুক ঠিক করে দিয়েছিল। ফাটা কানের পর্দার পরিচর্যা হল। ভাঙা হাতে রডও বসল। কিন্তু বহুবছর ওই হাতটা অকেজো হয়ে পড়েছিল। ডান হাতে কোনো কাজ করতে পারছি না দেখে গৌরীদিদিই শিখিয়েছিলেন, বাঁ হাতের সমান ব্যবহার কীভাবে করতে হয়। ওই মানুষটির জন্যই আমার নতুন জীবন শুরু হল। সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে, নতুনভাবে এবং কিছু নতুন মানুষদের সঙ্গে। আমার শিখ পরিচয় লুপ্ত হল। আর কোনোদিন চুল রাখিনি, কড়া পরিনি, পাগড়িও পরিনি।

তিন তারিখ 'দোপহরে' সত্যি সত্যিই আর্মি নেমেছিল। ওইদিন রাজঘাটে ইন্দিরা গান্ধীর পার্থিব দেহের অন্তিম সংস্কারও করলেন রাজীব গান্ধী। কিন্তু ততক্ষণে দাঙ্গাইরা যেন বেবাক ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। একজন দাঙ্গাইকেও আর পাওয়া যায়নি। যেমন হঠাৎ করে তারা এসেছিল, তেমনই হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল। যেন একত্রিশ তারিখে কেউ একটা সুইচ অন করে দিয়েছিল। তিন তারিখে সেটা আবার টুক করে অফও হয়ে গেল। এতে অবশ্য একটুও আশ্চর্য হইনি। আমি জানতাম যে ওদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে তিন তারিখেই আর্মি নামবে। দিল্লির মাটি থেকে শিখদের সাফায়া করার জন্য বাহাত্তর ঘণ্টাই বরাদ্দ করেছিল কোনো অদৃশ্য শক্তি। গোটাটাই প্রি-প্ল্যানড্। আসলে ওটা দাঙ্গা ছিলই না, একতরফা ষড়যন্ত্র বলা যেতে পারে। আর তিন তারিখে যতক্ষণে আর্মি নামল, ততক্ষণে দিল্লিতে বোধহয় কোনো শিখ পুরুষই বেঁচে নেই। তার সঙ্গে কৌরদের লাশ উপরি পাওনা।

যসমিত দিদিও তাদের মধ্যে একজন। তার নাঙ্গা লাশও পাওয়া গিয়েছিল রাজপথের ওপরে। গৌরীদিদিও খবরের কাগজে ওর ক্ষতবিক্ষত দেহের ছবি দেখে চিনতে পারেননি। কিন্তু আমি পেরেছিলাম। জেনেছিলাম, দিদিকে একশোরও বেশি লোক বারবার লাগাতার ধর্ষণ করেছিল। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণেই তার মৃত্যু হয়। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পরও তার লাশটাকে আততায়ীরা বহুবার জন্তুর মতো বলাৎকার করে গিয়েছিল। আমার যসমিত দিদি। ফুলের মতো কোমল... নরম.... শান্ত...।

আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল। আমার ডানহাতটাও সেরে গেল। নতুন পরিবারের সঙ্গেও মানিয়ে নিলাম। তবু মনের মধ্যে তখনই বার্নিং শিখের বিষাক্ত বীজ পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। বাপুর মুখে শুনতাম, শক, হুণ, পাঠান, মোগল, আফগান, ইংরেজ এমনকি ফিলহালের পাকিস্তান, চীনও শিখদের আন-বান-শানকে ধ্বংস করতে পারেনি। কিন্তু আমি নিজে বুঝেছিলাম বৈদেশিক শক্তি যা পারেনি, তা আমাদের আপনজনেরাই করে দেখাল। দুশমনদের দিয়ে যা হয়নি, খোদ ভারতবাসীদের দিয়েই হল। দিল্লি শিখদের রক্তে ভাসল। তারপরও নেতারা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "যথেষ্ট মাত্রায় শিখদের মারতে পারিনি আমরা।"

"হামেঁ তো অপনোঁ নে লুটা, গ্যায়রোঁ মে কহাঁ দম থা
হমারি কশতি উস জগাহ্ ডুবি, জহাঁ পানি কম থা...।"

আমার ওই আট বছরের জীবন আগাগোড়া মিথ্যায় ভরা ছিল। পোড়া কেরোসিন তেলের মিষ্টি গন্ধে নেশা হত, আজ বমি আসে। আগে পুলিশেরা আমার নায়ক ছিল, এখন তাদের ঘৃণা করি। ওই উর্দি দেখলেই 'নফরত' হয়ে যায়। তখন এই দেশটার আইনের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল, আজ নেই। তখন আমি 'মাসুম' গুরু ছিলাম, আজ জ্বলতে জ্বলতে বার্নিং শিখ হয়ে দাঁড়িয়েছি। যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে লোকে আজ 'রাক্ষস', 'দরিন্দা' বলছে, তাকে এই দেশ, এই কানুন, এই সিস্টেমই সযত্নে বানিয়েছে। যা অর্জন করেছি, তাই তো ফেরত দেব

এখন আমার যুদ্ধের 'আখরি ঘণ্টা।' অস্ত্র কম পড়ছে। উলটোদিক থেকে ক্রমাগতই বাধা। বেশ কয়েকবার নিজেও ব্যর্থ হয়েছি। তবে ওরাও আমাকে ধরতে পারেনি। এখনও

আমার চোখের সামনে সেই লোকটা আর তার পরিবার জিন্দা আছে। আই.পি.এস. ভূপেন্দ্র দত্তা। আজও ওকে দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তবু --ডকে সর্দারা। বার্নিং শিখের ‘কহর’ কলকাতা এবার সূর্যাস্তের পর দেখবে

* *

(৩২)

অধিরাজের ডিডাকশন একদম সঠিক ছিল। সূর্যাস্তের পর থেকেই আসল খেলা শুরু হল। আর সে খেলা একদম অপ্রত্যাশিত ও অভিনব। অর্ণবের মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি একখানা দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। একটু এদিক ওদিক হলেই শেষ! পুলিশ ও প্রশাসন বুঝে উঠতে পারছিল না যে কী করবে, কী করা উচিত কিংবা কোনদিকে দৌড়বে। মিডিয়া ফের ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে যত্রতত্র দৌড়োতে শুরু করল। গোটা কলকাতা স্তম্ভিত হয়ে দেখছিল এই অদ্ভুত লড়াই। কেউ বুঝতেই পারছিল না, আদতে হচ্ছেটা কী! কেনই বা হচ্ছে!

সারাদিন মোটামুটি সব ঠিকই ছিল। অধিরাজ মিস্ চাউমিন তথা দৃষ্টি দত্ত-কে আর বার্নিং শিখের পেছনে পাঠায়নি। তাকে ফোনে নির্দেশ দিয়েছিল, "আপনি বরং ভালো করে লাঞ্চ টাঞ্চ সেরে বিড়ালঘুম দিয়ে নিন। আমিই আপনার জন্য লাঞ্চ পাঠিয়ে দিচ্ছি অ্যাজ গ্র্যাটিটিউড, আরাম করে খান। আপনি তো অন্যদের মতো টাকা নিতে চান না, তাই গিফটই সই। আপাতত আপনার কাজ শেষ। ওকে ট্র্যাক না করলেও অসুবিধে নেই।"

"ক্...ক্...কিন্তু ব...ব...ব...বস্।" দৃষ্টি তোতলাতে তোতলাতে বলল, "যদি ও ব্যাটা ফ্...ফ্...ফের কিছু গোলমাল করে!"

"সূর্যাস্তের আগে ও আর তেমন কিছু করবে বলে মনে হয় না। যে তীরটা মারার ছিল সেটা ফস্কে গেছে।" সে একটু হাসল, "আপাতত ওর কাছে নতুন তির নেই। ও নিজের ঘাঁটিতেই ফিরবে। ওখানেই চুপ করে বসে থাকবে। ও 'মঞ্জা হুয়া খিলাড়ি' সেনোরিটা। ঠিক বুঝেছে কোনো-না কোনো ইনফর্মার ওকে স্টক করছে। সেটা বুঝতে পেরে এবার ও ফেরোশাস হয়ে উঠতে পারে। আপনাকে হয়তো স্পট করতে পারবে না, কিন্তু যাকেই সন্দেহজনক মনে হবে তাকেই মারবে। এমনিতেই অনেক নির্দোষ প্রাণ গেছে। আরও যাক, আমরা চাই না। কোনো লুজ বল আর দেব না। তবে স্লগ ওভারে ও পেটাবেই। বাউন্সার পেলেও মারবে। সেটাও ওকে ফলো করে ঠেকানো যাবে না। তাই ছেড়ে দেওয়াই ভালো।"

"তা ঠিক!" চাউমিন সায় জানাল, "বাট্ ব...ব...বস্, যদি বড়ো কোনো হাঙ্গামা করে?"

"তার থেকেও বড়ো হাঙ্গামা হবে যদি আপনি এখন রেস্ট না নিয়ে চোখে ডার্ক সার্কেল ফেলেন মাদমোয়াজেল। সেই ভোর থেকে লেগে আছেন। শরীরটাকে তো ঠিক রাখতে হবে।" অধিরাজের চোখে দুষ্টুমি, মুখে সেই পেটেন্ট দুষ্টু হাসি, "কিংবা উত্তেজনার চোটে আরও গোটা কয়েক আছাড় খেয়ে কালশিটে বাঁধান। সি.আই.ডি. হোমিসাইডের সুন্দরী ইনফর্মারের কোনো ক্ষতি হলে আমরা বড়োই দুঃখ পাবো।"

"হো...হো...হোমিসাইডের ই...ইনফর্মার!" দৃষ্টির বুঝি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে, "আ...আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাখঠাট্টা করছেন ব...ব....বস্?"

"বিন্দুমাত্রও নয়।" সে হাসছে, "ওয়েলকাম টু দ্য ডিপার্টমেন্ট মিস্ বন্ড। তবে আপনাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে।"

"সব শিখ... শিখ... শিখ...।"

অর্ণব কপাল চাপড়ায়, "ব্যস্, শি-তেই আটকে গেলেন। হয়তো এবার লাফাতে লাফাতে দুটো আছাড়ও খাবেন!"

"সব শিখে নেব...!" ওদিক থেকে জলতরঙ্গের মতো কণ্ঠস্বর কলকল করে ওঠে, "দ্যাখো ব্রো, এই হাঁড়িমুখো কাকতাড়ুয়া অ্যাটিটিউড ছাড়ো। ওরকম নিপাট ভালোমানুষ পাপ্পু বেটা মার্কা মুখে গোগা কাপুর টাইপ এক্সপ্রেশন একটুও মানায় না। আর রইল আছাড়ের কথা? এখন থেকে আমি সগর্বে আছাড় খাব। বল্লে বলে...শাবা শাবা...।"

অর্ণব জ্বলে গিয়ে অসহায় দৃষ্টিতে অধিরাজের দিকে তাকায়, "স্যার। আমায় পাপ্পু বেটা বলল! আর দেখেছেন? এখন কিন্তু একটুও তোতলাচ্ছে না!"

অধিরাজ সজোরে হেসে ওঠে, "ওকে মিস্ বন্ড। আছাড়ের সঙ্গে আর কী খেতে পছন্দ করেন আপনি?"

"যে-কোনো পাঞ্জাবি কুইজিন। 'অওধি'ও চলে।"

"ঠিক আছে। তবে মহারাজা থালি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" সে হাসতে হাসতেই বলে, "সঙ্গে আইসক্রিম ট্রিট। ছাড়ছি। সি ইউ সুন।"

"ওকে ব...ব...বস্।"

লাইন কাটার সঙ্গে সঙ্গেই ফের অর্ণবের নালিশ, "সঙ্গে হাঁড়িমুখো কাকতাড়ুয়া আর গোগা কাপুরও বলেছে।"

সে হাসিমাখা সস্নেহ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়, "তাতে কী হল? আমাদের তথাকথিত পাপ্পু বেটা কিন্তু রীতিমতো সুদর্শন। যেমন রূপ, তেমন রং। ঘুরিয়ে তো তোমায় হ্যান্ডসামই বলেছেন।"

অর্ণব চোখ সরু করেছে, "কাকতাড়ুয়া আর গোগা কাপুরও হ্যান্ডসাম?"

"না। তবে কাকতাড়ুয়া খুব কাজের জিনিস। আর গোগা কাপুর অলটাইম লিজেন্ড। শুনেছি ফিল্মে যতই ভিলেন বা মহাভারতের কংস হোন না কেন, বাস্তব জীবনে অত্যন্ত ভদ্র ও ভালোমানুষ ছিলেন। আমি এর মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখছি না।" অধিরাজ একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল, "তোমার কমপ্লেইনের কোটা যদি কমপ্লিট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমরা বার্নিং শিখ কেসে ফিরে আসতে পারি?"

সে আর মিস্ চাউমিনের বিষয়ে কথা বাড়ায় না। স্যারের পেয়ারের খবরি হয়ে মেয়েটা সাপের সাত পা দেখেছে। আবার বলে কিনা সগর্বে আছাড় খাবে! আহ্লাদ দেখো! যদিও অর্ণব মনে মনে বেজায় চটেছে। কিন্তু এখন ওসব আলোচনার সময় নয়। একটু উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "আপনি শিওর যে সন্ধেবেলা বার্নিং শিখ কিছু করবে?"

"আলবাত করবে।" অধিরাজের মুখে চিন্তার মেঘ, "আজই শেষ রাত। মরণ-কামড় দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা ও করবেই। কিন্তু ঠিক কী করবে সেটা জানি না। সেটা জানার জন্য সূর্যাস্তের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। লেটস সি।"

কথা শেষ করেই সে প্রথমে বিশ্বকে ফোন করল। জানতে চাইল যে তার কাজ কতদূর। বিশ্বজিৎ জানায়, "অলমোস্ট ডান বস্। একটুখানি বাকি আছে। ওটা কমপ্লিট করেই তোমায় পাঠাচ্ছি।"

"ওকে।"

রমানাথ চক্রবর্তীকেও ধন্যবাদ জানাতে চাইছিল অধিরাজ। কিন্তু তাঁর ফোন সুইচড অফ! কে জানে কোথায় আছেন! সচরাচর ক্রাইম রিপোর্টারদের ফোন বন্ধ থাকে না। অথচ এই হাই টাইমে ভদ্রলোক ফোন-টোন অফ করে হাওয়া। অধিরাজ বিস্মিত হলেও বিশেষ মাথা ঘামাল না। বরং মিস চাউমিনের জন্য প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে তারপর প্রীতমকে ফোন করে আহেলির খবর নেয়। প্রীতম জানাল, "এমনিতে উনি খুবই সুইট। কিন্তু নাকটা নিয়ে বড়োই ঝামেলায় পড়েছেন। আর চুল কেটে ছোট করেছি বলে একটুখানি আর্গুমেন্টও করেছেন। উইগও নাকি কুটকুট করছে...!"

"তোর কাছে তুলো আছে?"

"আছে। কেন?"

"কানে দিয়ে বসে থাক্। নয়তো কান আর মাথা দুই-ই খেয়ে ফেলবেন।" অধিরাজ বিরাট একটা হাই তুলে বলে, "আর বলে দিস যে ওঁর কপাল ভালো যে চুল শুধু ছোট করে কেটে দেওয়া হয়েছে, ওঁর টপ বসের মতো 'টাকশ্রী' করে দেওয়া হয়নি। বেশি খ্যাচখ্যাচ করলে পুরোটাই উড়িয়ে দিস্।"

প্রীতম অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে, "তুই শুধরোবি না রাজা। শি ইজ ভেরি প্রিটি ওম্যান। চুলও খুব সুন্দর। একটু আপত্তি করতেই পারেন।"

"প্রিটি ওম্যান তো কী? আমি কি শাহরুখ খান হয়ে, আমেরিকান ফ্ল্যাগ উড়িয়ে,

মাঝরাস্তায় নাচতে নাচতে গান গাইবো?” সে মাথা নাড়ে, “আমার কাজ না হলে প্রিটি, সুইটি, প্রীতি জিন্টা, মাথার সুন্দর চুল, সবই গোল্লায় যাক।”

“কাজ হয়ে যাবে। ডোন্ট ওরি।”

প্রীতমের ফোনটা ডিসকানেক্টেড হতে না হতেই টুইঙ্কল এসে রিপোর্ট করল ও কারেন্ট স্টেটাস জানাল। মিস্ বোস আপাতত আত্রেয়ীকে ব্যাক-আপ দিতে গিয়েছে। ওর কাছে এখন আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আর্বানায় এই মুহূর্তে একমাত্র গুরশীল ছাড়া বাকি সব নারীরাই উপস্থিত। গুরশীলের কেসটা দেখে ও জেনে সবারই চোখ ছানাবড়া। যদিও তার গ্রেফতারির পরই শ্রীদর্শিনী ও তার মা শপিং মলে গিয়েছিল। তিতলিও নাকি কীসব কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিল। কোকিলাও মাঝখানে বেশ কিছুক্ষণের জন্য হাপিশ হয়েছিল। তবে সে কোথায় গিয়েছিল তা মিস্ দত্ত-র জানা নেই। হয়তো এই মুখরোচক ঘটনাটি অন্য কাউকে পেশ করার শখ হয়েছে তার। তবে সকলেই একটু আগেই ফিরে এসেছে।

প্রণবেশ লাহিড়ী সদলবলে হসপিটালে মোতায়েন আছেন। যথারীতি হাঁক-ডাক করে টিমমেটদের ধমকে চমকে রেখেছেন। তবে তাঁর কড়া নজর ও সতর্ক প্রহরার ফাঁক গলে একটি মাছিও হসপিটালে ঢুকতে পারবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়াই যায়। অফিসার লাহিড়ীর এসব ক্ষেত্রে রেকর্ড অত্যন্ত ভালো। এছাড়া আর কোথাও কোনোরকম ঘটনা ঘটেনি। শহরবাসীরা যদিও খুব নিশ্চিন্তে নেই। তবু জনজীবন আটকে যায়নি।

“হুঁ।”

অন্যমনস্কভাবেই বলল অধিরাজ। তারপর নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল এবং অভ্যাশবশত সেটাকে ঠিক করতে-করতে বলল, “অর্ণব, তুমি এই ফাঁকে একটু রেস্ট নিয়ে নাও। সেনোরিটা, আপনিও। আপাতত বেশ কিছুক্ষণ আর কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। এই ক-দিন কারোরই কোনো রেস্ট হয়নি। অর্ণব, তুমি আমার কেবিনের সোফাটায় লম্বা হতে পারো। আর মিস্ অরোরা, আপনি চাইলে কনফারেন্স রুমের সোফাতে একটু গড়িয়ে নিতে পারেন। একা একা যদি ভয় লাগে তবে আপনার সিকিউরিটির জন্য...!”

“ভয় লাগবে! আ-মা-র!” টুইঙ্কল চোখ কপালে তুলে ফেলে, “বরং কেউ যদি আমাকে খোঁচানোর তাল করে তবে তারই ভয় পাওয়া উচিত। আপনি জানেন না স্যার। অনেক আচ্ছা আচ্ছা বদমায়েশ, লুচ্চা, লফঙ্গাকে আমি পিটিয়ে সিধা করেছি। অনেক রেপিস্টের হাড় ভেঙেছি। আমার হাত আর পেট...!”

“একদম সলমন খানের মতো সলিড।” তার কথাটাকে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে অধিরাজ, “স্যরি, মাই ব্যাড। ভুলেই গিয়েছিলাম মাই লেডি। আপনার সিকিউরিটির সত্যিই প্রয়োজন নেই। তবে আমি একটু ভীতু মানুষ তো। কনফারেন্স রুমে আমারও একটু দরকার আছে। একা একা যাব কিনা ভাবছিলাম। একটু ফাঁকা ফাঁকা কিনা। আপনি যদি আমায় একটু সিকিউরিটি প্রোভাইড করেন তাহলে ভালোই হয়। আফটার অল, আপনি একজন সাহসী কপ্। এবং বদমায়েশদের দাঁত আর হাড় ভাঙার অভিজ্ঞতা আপনার আছে।”

টুইঙ্কল সরল হলেও বুদ্ধিহীন নয়। কথাটার পেছনের আসল অভিসন্ধি বুঝতে তার বাকি নেই। সে হেসে ফেলেছে, “ওকে স্যার। আপনার সিকিউরিটির দায়িত্ব আমার। ভেরি সুইট অব ইউ।”

কেবিনের দরজা খুলে মৃদু ঝুঁকে ‘বাও’ করল অধিরাজ, “আফটার ইউ।”

তারপর থেকেই সময় বড়ো আস্তে আস্তে কাটছিল। অর্ণব প্রথমে অধিরাজের কেবিনের সোফায় শুতে রাজি হচ্ছিল না। সে জানে, স্যার নিজেই প্রয়োজন হলে ওই সোফায় একটু রেস্ট নিয়ে নেন। আজ যদি অর্ণব সেটা দখল করে তবে তিনি যাবেন কোথায়! কিন্তু অধিরাজের সহাস্য মন্তব্য, “আমি এমনিতেই আজ মড়ার ট্রলিতে বডি ফেলে দিয়েছিলাম। ‘রেস্ট ইন পিস' না হলেও কিছুটা রেস্ট পেয়ে গেছি। কিন্তু তোমরা তো দু-চোখের পাতা এক করার সামান্য সুযোগও পাওনি। পবিত্র আজ বাড়ি গেছে। মিস্ দত্তও আজ দুপুরে একটু রেস্ট নিতে পারবেন। মিস্ বোসও গাঁজার কল্যাণে কিছুটা ঘুমিয়ে নিয়েছেন। প্রণবেশদার

এখন ঘুমোনোর উপায় নেই। তবে ওঁকে যতটুকু চিনি গত দু-দিনে নিশ্চয়ই ফাঁক বুঝে নিজেকে চার্জ দিয়ে নিয়েছেন। মিস মুখার্জিও সাজুগুজুর মধ্যে বেশ এসিরুমে, আরামদায়ক নরম কাউচে ঘুমোনোর সুযোগ পাবেন। বাকি রইলে তুমি আর মিস্ অরোরা। মিস্ অরোরা অলরেডি শয়নে পদ্মলাভ করেছেন। উনি আপত্তি করলেও বাইরে গার্ড দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। ওই দিকটা ফাঁকা, আর মানুষকে বিশ্বাস নেই। এবার তুমিও রেস্ট নিয়েই ফেলো!"
"কিন্তু স্যার... আপনি....?"

অর্ণব তখনও ইতস্ততঃ করছে দেখে সে মৃদু হাসল, "মানুষ যে কোনো অবস্থায় ঘুমের সঙ্গে চুক্তি করে নেয় ডার্লিং। নেপোলিয়ন চলন্ত ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুমোতে পারতেন, আর আমি একটা রিভলভিং চেয়ারে কেৎরে পড়ে রেস্ট নিতে পারব না? তবে হ্যাঁ, পুরো ডিপ স্লিপে চলে যেও না। আমার মন বলছে, ঠিক সন্ধে নামার পরই কিছু একটা হবে। তার আগেই উঠে পড়বে।"

অর্ণব আর কী করে! স্যারের প্রবল যুক্তির সামনে কিছু বলাই মুশকিল। অগত্যা সে চুপচাপ সোফায় লম্বা হয়ে শুয়েই পড়ল। নিদ্রাহীন রাত্রিগুলোর ধকলের ক্লান্তিতে গোটা দেহ অবসন্ন ছিল। কিন্তু ঘুম অত সহজে এল না। আধো তন্দ্রা, আধো জাগরণের মধ্যেই শুনছিল যে অধিরাজ একের পর এক ফোনে নির্দেশ দিয়ে চলেছে। গোটা কলকাতার পুলিশকে বলা হল হাই অ্যালার্টে থাকতে। ট্র্যাফিকের ডিউটি যাদের, তাদেরও সাবধান করে দেওয়া হল। বলা হল প্রত্যেকটা সিসিটিভি ফুটেজ যেন তারা সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে। রাস্তার ওপর কোনো সন্দেহজনক বেওয়ারিশ বস্তু বা ভেহিক্‌ল্স দেখলেই যেন সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেয়। রেলপুলিশের কাছেও 'চেতাবনি' গেল। ডগ স্কোয়াড নির্দেশ পেল স্নিফার ডগ নিয়ে রেলস্টেশন, বাস ডিপো, শপিং মলের মতো জনবহুল জায়গায় রাউন্ড মারার। অর্ণবের কানে এল যে বম্ব স্কোয়াডকেও চেতিয়ে দিল অধিরাজ। কোনোরকম প্রয়োজন পড়লেই যাতে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত তাদের সাহায্য পাওয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেড থেকে শুরু করে সমস্ত এমার্জেন্সি সার্ভিসের ঘোড়ায় জিন দিয়ে রাখল সে। জানে, বার্নিং শিখের হাতে এখন বম্ব নেই। কিন্তু ওদের ডাইভার্ট করার জন্য কিছু-না কিছু কাণ্ড তো করবেই লোকটা! কোমলের তৈরি করা সেই ভয়াবহ বম্ব স্টকে না থাকলেও তার যা পরিচিতির লেভেল, তাতে শেষমুহূর্তে একটা দুটো বম্বের মশলাপাতি সে আনিয়েও নিতে পারে। আজকাল ছোটখাটো বম্ব বানানো খুব কষ্টকর নয়। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও লোকে লিকুইড সোপ বা সাবান দিয়েও বিস্ফোরক বানাতে পারে! প্রাণঘাতী না হলেও দৌড় করানোর জন্য যথেষ্ট। প্যানিকও তৈরি করতে পারে। অথবা তার অন্য কোনো বিপজ্জনক প্ল্যানিং থাকলেও অবাক হবে না। এই মুহূর্তে বার্নিং শিখকে বিন্দুমাত্রও আন্ডার এস্টিমেট করতে চায় না। লোকটা সব কিছু করতে পারে। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। ঠিক কী করবে সেটা যদি জানা থাকত...।

প্রথম চমকটা এল ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ-টা নাগাদ। ততক্ষণে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠেছে হোমিসাইড টিম। পবিত্র বউয়ের সঙ্গে বহুদিন পর প্রেমালাপ সেরে টেরে একেবারে ফুল চার্জড হয়ে ফিরে এসেছে। যদিও মুখ কাঁচুমাচু করে অধিরাজের কানে কানে বলেছে, "খুড়ো, ওই রেডিও-অ্যাকটিভ মেসেজটা যে তোমার কাছে এসেছিল তা বউয়ের কাছে ফাঁস করে দিও না। তবে আমি কিন্তু ফুলটু গেছি।"

অধিরাজ তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায়, "কোন্ মেসেজ? তুমি আমায় কোনো মেসেজ করেছিলে? আসলে আজকাল আমারও শর্ট টাইম মেমোরি লস্ হয়ে যাচ্ছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি তো!"

পবিত্র একগাল হাসে, "থ্যাংকস বস্। আন্ডারস্টুড।"

টুইঙ্কল অরোরা দিব্যি ঘুমিয়ে টুমিয়ে নেওয়ার পরে খানকতক কুলচা আর ডাল মাখানি, চিকেনভর্তা দিয়ে নামমাত্র আর্লি ডিনার করে যথারীতি ফুলফর্মে। এখন সে আয়েশ করে চুরুট টানছিল। আজ সবাইকেই আর্লি ডিনার করার নির্দেশ দেওয়া আছে। অধিরাজ আগেই অনলাইন খাবার অর্ডার দিয়ে রেখেছিল। পবিত্র লেট লাঞ্চ করেছে বলে আর কিছু খায়নি।

অর্ণব আর অধিরাজ ছ-টার আগেই স্যুপ, স্যান্ডুইচ, বেকড ফিশ স্টিক আর স্যালাড দিয়ে নমো নমো করে ডান হাতের কাজ সেরে রেখেছে। এই মুহূর্তে পেট যেমন খালি না রাখাই ভালো, তেমনই একদম পেট ঠেসে খাওয়াও উচিত নয়। অন্যদিকে আহেলির চিন্তাও অবশ্য তার মাথায় আছে। প্রীতমকে বলেই রেখেছে সে যেন সময়মতো ওকে একটু সুইট কর্ন চিকেন স্যুপ, মিষ্টি, শরবত বা সম্ভব হলে নরম কোনো খাবার পেটপুরে খাইয়ে দেয়। অধিরাজের হাঞ্চ বলছে, আজ বেজায় দৌড়োতে হবে। টুইঙ্কলের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। সে একেবারে অগস্ত্য মুনির নাতনি। ইল্বল-বাতাপি তো দূর, বোধহয় আস্ত মহিষাসুরকেও খেয়ে মেরে দেবে। কয়েকটা নিরীহ কুলচা তার আর কী ক্ষতি করবে!

অর্ণবের একটু রেস্ট নিয়ে বেশ তরতাজা লাগছিল। অধিরাজ অবশ্য ঘুমোয়নি। সে টিভিটাকে মিউট করে অনেকক্ষণ ধরেই চ্যানেল বদলে বদলে নিউজ দেখে যাচ্ছে আর ধূমপান চালিয়ে যাচ্ছে। হাবেভাবেই স্পষ্ট, সে উত্তেজিত। কোথাও কোনো তুচ্ছ, অথচ অদ্ভুত ঘটনা ঘটল কিনা সেটাই জানা উদ্দেশ্য। পুলিশের হট লাইন, এমার্জেন্সি নম্বর, ওয়েবসাইটগুলোকে বারবার মনিটর করার জন্য কন্ট্রোল রুমের পুলিশকর্মীরা একদম টানটান উত্তেজনায় সতর্ক হয়ে বসে। সমস্ত কলকাতার পুলিশও তৎপর। ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরায় আর পি এফ মোতায়েন রয়েছে। রেলস্টেশন, বাস ডিপো, শপিং মল বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল জায়গায় রাউন্ড মারছে পুলিশ কুকুর। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হাত শূন্য। কোনোদিক দিয়েই আক্রমণের আভাস নেই।

অর্ণব বাইরের দিকে তাকায়। যতক্ষণ বাইরে আলো ছিল ততক্ষণও এত ভয় লাগেনি, যতটা অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই শীতের অন্ধকারের মধ্যেই কোথাও ওঁত পেতে আছে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্র। এখনই বুঝি একটা কুৎসিত কদাকার দানবীয় রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে বাইরে আসবে। কী ঘটবে। কী ঘটতে চলেছে? বিস্ফোরণ? খুন? অগ্নিকাণ্ড? বার্নিং শিখের স্টাইলই তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা বা কেটেকুটে একসা করা। এই মুহূর্তে তরোয়াল বা কৃপাণ নেই ঠিকই। কিন্তু ফুয়েল তো কিছুটা আছেই। ছুরি-ছোরাও থাকতেই পারে। তার থেকেও বড়ো অস্ত্র তার শাণিত মস্তিষ্ক। সেটাকেই সবচেয়ে বেশি ভয়। পুলিশকে ডাইভার্ট করার জন্য সে আবার কোনো নিরীহ মানুষের হত্যা করবে না তো।

ঘড়িতে ঢংঢং করে ছ-টা বাজা মাত্রই ওদের সবারই বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠেছিল। অধিরাজের মুখ চিরকালই ভাবলেশহীন। দেখে বোঝা মুশকিল। কিন্তু জ্বলন্ত সিগারেট আর ঘন ঘন ধোঁয়ার রিং বলে দিচ্ছিল যে সে ঠিক কতটা চাপে আছে। একদিকে মিস্ বোস আর আত্রেয়ীর কাছ থেকে রেগুলার আপডেট নিয়ে চলেছে। অন্যদিকে প্রণবেশ লাহিড়ীর কাছ থেকে। দু-দিকই আপাতত নিস্তরঙ্গ। অর্ণবের বোধহয় ব্লাডপ্রেশারই বেড়ে গিয়েছে। তার মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে গিয়ে থমথম করছে। পবিত্র অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। এমনকি মিস্ অরোরাও অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মতো ছটফট করে বেড়াচ্ছে। সবার মনেই একটা প্রশ্ন। এবার কী? এই নীরবতা মোটেই সুখকর নয়। ঝড়টা ঠিক কোন্ দিক দিয়ে ধেয়ে আসছে?

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সন্ধে সাড়ে ছ-টায় পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ফোনগুলো যেন একসঙ্গে ত্রাহি ত্রাহি করে বেজে উঠল। হট্ লাইনও ক্রমাগত বেজে চলেছে। কর্মীরা তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ফোন রিসিভ করতেই ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল মানুষের চেঁচামেচি আর উত্তেজিত স্বর, "হ্যালো, কন্ট্রোল রুম?"

"বলছি।"

"তাড়াতাড়ি আসুন আপনারা।" এক নিঃশ্বাসে গড়গড়িয়ে কে যেন বলে গেল, "বার্নিং শিখকে এখানে দেখা গেছে। সে এখনও রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর শিস দিচ্ছে...।" লোকটি কথা শেষ করার আগেই হেডসেটে হুইলের সুর শুনতে পেল পুলিশকর্মীটি,

"গুমনাম হ্যায় কোই/ বদনাম হ্যায় কোই...।"

"আপনি লোকেশনটা বলুন।"

লোকেশন পার্কস্ট্রিটের কাছেই। পার্কস্ট্রিট পুলিশ স্টেশন থেকে পুলিশের গাড়ি তৎক্ষণাৎ তড়িঘড়ি পৌঁছোল স্পটে। তারা ভেবেছিল, বার্নিং শিখ বোধহয় ততক্ষণে ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, যেমন দিল্লির রাজপথ থেকে হুটহাট করে চোখের পলক ফেলতে-না ফেলতেই কুয়াশায় মিলিয়ে যেত। কিন্তু তাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না যখন দেখল লোকটা তখনও ওখানেই আছে! এবং আলো-আঁধারি ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে শিস দিয়ে চলেছে তার পেটেন্ট সুরে। গুমনাম হ্যায় কোই। জনতা ভয়ে তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাচ্ছে। চতুর্দিকে ভয়ার্ত কোলাহল। বার্নিং শিখ ডাইনে-বাঁয়ে কোনোদিকেই তাকাচ্ছে না। স্রেফ হেঁটে যাচ্ছে আর হুইসল দিচ্ছে।

লোকটাকে সামনা-সামনি দেখে পুলিশেরও আক্কেল গুড়ুম! এতদিন শুধু ছবিতে, ফুটেজে দেখেছিল বা মিডিয়ায় বিবরণ শুনেছিল। এবার স্বচক্ষে দেখে তাদেরও রক্ত হিম হয়ে যায়। এ কি আদৌ মানুষের চেহারা! এইমাত্রই বুঝি চিতা থেকে পুড়তে পুড়তে আধপোড়া হয়ে নেমে এসেছে ও! পরনে সেই ট্র্যাডিশনাল শিখের পোষাক। চোলা, পাগড়ি! তবে হাতে কোনো তরোয়াল নেই। নিস্পৃহ এক চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে পুলিশদের দিকে তাকিয়ে ফের শিস্ দিতে দিতে এগিয়ে গেল। কোনো তাপ-উত্তাপই নেই! নেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও!

লোকটার দুঃসাহস দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারও হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। পরক্ষণেই গুছিয়ে নিয়ে সবাইকে নির্দেশ দিলেন, "টেক পজিশন্স্।" পুলিশকর্মীরা তাকে ঘিরে ধরতে ভয় পাচ্ছিল। বার্নিং শিখের যা নিষ্ঠুরতার রেকর্ড আর পুলিশদের কেটেকুটে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে যে কীর্তি করেছে তাতে ভয় পাওয়ারই কথা। অথচ এদিকে ডিউটির দায়। তাছাড়া লোকটাকে এখন তেমন বিপজ্জনক বলেও মনে হচ্ছে না। আপাতদৃষ্টিতে কোনো অস্ত্রও নেই। তাই একরকম বাঁশ গিলেই বার্নিং শিখকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ধরল পুলিশ। অফিসার চেঁচিয়ে বললেন, "হ-ল্ট!"

এই অবধি সব ঠিকই ছিল। পুলিশ অফিসারের কথা শুনে সে একটু থমকেও দাঁড়াল। পরক্ষণেই ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল তার চোখ। কেউ কিছু বোঝার আগেই সে টেনে দৌড় মেরেছে উলটোদিকের রেস্টোর্যান্ট ও দোকানগুলোর দিকে। সেখানে তখন ভয়ার্ত মানুষেরা একটু কভার নিয়েছিল। বার্নিং শিখকে ছুটে আসতে দেখে উচ্চকিত শোরগোল ফেলে দিল। অফিসার বিন্দুমাত্রও দেরি না করে সার্ভিস রিভলভার তাক করেছেন। এই বিপজ্জনক লোকটাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না! ওদিকে দৌড়োচ্ছে যখন তখন নিশ্চয়ই কোনো মারাত্মক প্ল্যানিং আছে...। "ফা-য়া-র।"

পরপর গানশটের শব্দে কেঁপে উঠল পার্কস্ট্রিট। বারুদের গন্ধে ভরপুর। এর আগে দেখা গিয়েছে যে লোকটা গুলিতেও মরে না। তাই যতগুলো বুলেট পেরেছিল ওর শরীরে ভরে দিয়েছিল পুলিশ। একরকম প্রায় ঝাঁঝরাই করে দিল দেহটাকে।

জনতা ও পুলিশ, দু-জনকেই স্তম্ভিত করে দিয়ে রাস্তার ওপরে লুটিয়ে পড়েছে বার্নিং শিখ। একবার তার গোটা দেহ কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই নিথর। পুলিশেরা এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। যে লোকটা এত ঘণ্টা ধরে শহরে 'কোরাম' লাগিয়ে রেখেছিল, সে কিনা কয়েকটা গুলিতেই শেষ। এত সহজ? কোনোরকম প্রত্যাঘাত তো দূর, বাধা দেওয়ার চেষ্টাও নেই। ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটল? না স্বপ্ন দেখছে!

অফিসার নিজেই এবার সম্পূর্ণ কনফিউজ হয়ে এগিয়ে গেলেন পড়ে যাওয়া দেহটার দিকে। ভালো করে পরীক্ষা করে বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, "অ্যাঃ। মরে গেল!" "হো-য়া-ট! বার্নিং শিখ ইজ ডেড!"

ওভার ফোন এই সংবাদটা পেয়ে অধিরাজের এটাই প্রথম প্রতিক্রিয়া। আর একটু হলেই বোধহয় বিস্ময়ের আঘাতে তার হাত থেকে ফোনটাই পড়ে যাচ্ছিল। অপ্রত্যাশিত ধাক্কাটা কোনোমতে সামলে নিয়ে বলল, "ইম্পসিব্‌ল্! এটা কী করে সম্ভব? ওটা বার্নিং শিখ, মহাত্মা

গান্ধী নয়। ভালোমানুষের মতো স্রেফ গুলি খেয়ে মরার লোকই নয়। আপনারা ঠিক দেখেছেন তো?"

"হ্যাঁ স্যার।" ওপ্রান্ত থেকে উত্তর আসে, "নিঃসন্দেহে বার্নিং শিখই। হুলিয়া হুবহু এক।"

"ওকে।"

অধিরাজ কথা না বাড়ালেও তার মুখ থমথম করছে। টিভিতেও তখন এই খবরটাই ব্রেকিং নিউজ হিসাবে চলছে। মিডিয়া বার্নিং শিখের উপস্থিতির খবর পেয়েই ছুটে গিয়েছিল ওদিকেই। তারা এখন মৃতদেহটাকে লাইভ দেখাতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে জোরদার খবর, পার্কস্ট্রিট পুলিশের গুলিতে নিহত বার্নিং শিখ! পবিত্র বেশ কিছুক্ষণ হাঁ করে খবরটা শুনে উদ্ভট বিমূঢ় এক্সপ্রেশন দিয়ে বলল, "এটা কী হল রাজা! লোকটার কি হঠাৎ করে মরার শখ হয়েছিল? নাকি ভেবেছিল, পুলিশের গুলি তো কখনও খাইনি, একটু চেখে দেখি।"

অধিরাজ মাথা নাড়ল, "না পবিত্র। আমার বিশ্বাস হয় না! বড়োসড়ো ঝোল আছে... ঝোল আছেই...!"

পার্কস্ট্রিটে বার্নিং শিখের মৃত্যুর খবর টিভিতে বোধহয় দশ মিনিটও চলেনি, তার মধ্যেই আর একবার পুলিশ কন্ট্রোলরুম ফোনের শব্দে কেঁপে উঠল। এবার শিয়ালদার মৌলালি চত্বরে বার্নিং শিখকে দেখা গিয়েছে। সে ওখানেই আছে। এবং ঘুরতে ঘুরতে শিস দিয়ে বেড়াচ্ছে।

পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। তারা কিছু করার আগেই মোবাইলে মোবাইলে ছড়িয়ে পড়ল জীবন্ত বার্নিং শিখের ভিডিও। পার্কস্ট্রিট নয়, সে এখন মৌলালিতে। সেই একই হুলিয়া! পোড়া মুখ, সেলাই করা ঠোঁট, খোবলানো চোখ, বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নেই। অথচ কোথায় পার্কস্ট্রিট, কোথায় মৌলালি! এক জায়গায় যার গুলিতে ঝাঁঝরা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, অন্যদিকে সেই লোকটাই দিব্যি সশরীরে ইভনিং ওয়াক করে বেড়ায় কী করে। এ কী জাতীয় ভুতুড়ে কাণ্ড! বার্নিং শিখ কি চলমান অশরীরী? ফ্যান্টম!

এবার এন্টালি থানা থেকে পুলিশবাহিনী শশব্যস্তে দৌড়োল। কিন্তু তারা পৌঁছোনোর আগেই এবার উলটো ট্র্যাজেডি ঘটেছে। এমনিতেই বার্নিং শিখকে নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ভয়াবহ আতঙ্ক ছিলই। সমস্যা হল, আতঙ্ক মানুষকে অনেক সময় মরিয়া করে দেয় যার বাইপ্রোডাক্ট হচ্ছে জনরোষ। পার্কস্ট্রিটের জনতা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু মৌলালিতে দেখা গেল অন্য চিত্র। পাবলিক সেখানে বার্নিং শিখকে ঘিরে ধরে তাকে গণধোলাই দিতে ব্যস্ত ছিল। সেই 'মর্' হাতের কাছে যা পেয়েছে, লাঠি, ইট, পাথর, রড, সব নিয়ে চড়াও হয়েছে তার ওপর। সঙ্গে লাথি-ঘুষি তো আছেই। পুলিশ যখন গিয়ে পৌঁছোল ততক্ষণে প্রায় শ'খানেক মানুষ ওকে পিটিয়ে চলেছে। জনগণ লোকটাকে এমনভাবে ছেঁকে ধরেছিল যে পুলিশ ওকে দেখতেই পাচ্ছিল না। অবশেষে যখন ভিড় হঠিয়ে তাকে উদ্ধার করা হল, তার আগেই সে পার্মানেন্টলি উদ্ধার হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মরেই গিয়েছে। ভয়ার্ত ও ক্রুদ্ধ জনতার মার খেয়েই মরে গেল বার্নিং শিখ।

একটা লোকই মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে দু-জায়গায় দু-বার মারা গেল! একবার পুলিশের গুলি খেয়ে, পরের বার গণধোলাইয়ে। পুলিশ বুঝতেই পারছিল না যে এটা কী করে সম্ভব। যে অপরাধীর পেছনে সি.আই.ডি. হোমিসাইড দিনরাত এক করে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, অফিসারদের হাতে মরতে মরতে, ধরা পড়তে পড়তেও সে মারাত্মক চাতুর্যে পালিয়ে গিয়েছে, সেই ভয়াবহ খুনি এত সহজেই দুই জায়গায় দু-ভাবে মরল এই ঘটনার পেছনের তাৎপর্য বুঝে ওঠার আগেই ফের হটলাইন আর কন্ট্রোলরুমের ফোন মিনিটে মিনিটে বেজে উঠতে শুরু করল। এবার আর পরপর নয়। একসঙ্গে, একইসময়ে বার্নিং শিখকে নানা জায়গায় দেখা যাচ্ছে। কখনও বালিগঞ্জে, কখনও ঢাকুরিয়া, কখনও তারাতলায় ঘুরছে। কখনও আউটরাম ঘাটের কাছে শিস্ দিতে দিতে চলে যাচ্ছে সে। এমনকি শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের সামনেও তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হাতিবাগানের লোকেরা ত্রস্তব্যস্ত, ভয়ার্ত হয়ে দেখল তাদের নাকের সামনে দিয়েই চলে

যাচ্ছে 'কুখ্যাত' বার্নিং শিখ। মুখে সেই ভয়ানক শিস্—"গুমনাম হ্যায় কোই....!"

পুলিশ কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। একটা বার্নিং শিখ কি কম আপদ ছিল যে এবার এতগুলো এসে জুটেছে! কার পেছনে দৌড়বে, কাকে ধরবে, কাকে মারবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না তারা। যেটা সবচেয়ে চিন্তার বিষয় ছিল যে আগে যে দু-জন পুলিশের গুলি আর জনতার মার খেয়ে মরে গেল তারা তবে কে। তাদের মধ্যেই যদি বার্নিং শিখ থাকে, তবে এরা কারা! সবাইকেই একরকম দেখতে। পোষাক এক, চলনবলন এক। এমনকি শিস্টাও একই। কোনো ফারাক নেই।

অধিরাজ, অর্ণব ও পবিত্র-র ফোন মুহুর্মুহু বেজে চলেছে। দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ। নিঃশ্বাস ফেলার সময়টুকুও নেই। হোমিসাইডের ল্যান্ডলাইনগুলোও রক্ষা পায়নি। সব জায়গা থেকেই একটাই খবর। গোটা শহরে বার্নিং শিখের অজস্র ক্লোন প্রকট হয়েছে। তারা স্থান ও সময়ের নীতিকে অগ্রাহ্য করে একই টাইমিঙে, একাধিক জায়গায় ঘুরছে। পুলিশ কী করবে বুঝতে না পেরে আরও একজনকে বোকার মতো গুলি মেরে উড়িয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক খবর যে এই আকস্মিক শ্যুট আউটের মাঝখানে পড়ে একটি দশ বছরের শিশু প্রাণ হারিয়েছে, ও তিনজন পথচারী গুরুতরভাবে জখম! অন্যদিকে গণরোষের শিকার হয়েছে আরও দু-জন। উন্মত্ত মানুষ তাদের মেরে পাটপাট করে দিয়েছে। তবে কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ সেখানেও আছে। ভিড়ের নীচে চাপা পড়ে পদপিষ্ট হয়ে এক বৃদ্ধও মারা গিয়েছেন। আরও একজন আহত। সব মিলিয়ে মোট পাঁচবার মারা গিয়েছে বার্নিং শিখ। কিন্তু তারপরও সে অক্ষত শরীরে সর্বত্র ঘুরছে। ক্রমাগতই যেন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার ছায়া। এক জায়গায় তার মৃত্যু হলেই রক্তবীজের মতো আরও একাধিক জায়গায় ওই একটা লোকেরই আবির্ভাব হচ্ছে। এসব আদতে হচ্ছেটা কী!

"মাই গড।...মা-ই গ-ড।"

অধিরাজ বজ্রাহতের মতো বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে এবার অবশেষে মুখ খুলল। তার চোখদুটো জ্বলছে। ওষ্ঠাধরের ফাঁক দিয়ে ধারালো দাঁতের রেখা দেখা গেল। সে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে, "ওদের মধ্যে একটাও বার্নিং শিখ নয়। যে ক-জন লোক গুলিতে বা পাবলিকের হাতে মারা গেল, তারা সবাই ইনোসেন্ট! ইশশশ! সঙ্গে আরও দু-জন মানুষ স্পটডেড, কয়েকজন ইনজিওর্ড। তাদের কী হবে কে জানে! ...ওঃ ভগবান!"

অর্ণব, টুইঙ্কল ও পবিত্র দেখল আফশোশে অধিরাজের মুখ বিবর্ণ। সে বিধ্বস্ত ভঙ্গিতে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছে, "পুলিশ আর পাবলিকের হাতে সাতটা নির্দোষ প্রাণ গেল। সাত সাতটা তাজা প্রাণ। এর থেকে খারাপ আর কী হতে পারত। পাঁচজন ছদ্মবেশীর সঙ্গে আরও দু-জন নিরপরাধের খুন করে ফেললাম আমরা আর আমাদের সিস্টেম। মব্... সেই খুনিদের মবকে সে ইচ্ছাকৃতভাবেই আবার ফিরিয়ে আনছে... তাদের হাতে, পুলিশের হাতে কতগুলো ইনোসেন্ট লোকের প্রাণ নিচ্ছে... ও আবার পুলিশ, প্রশাসন আর রাক্ষুসে মবকে কাঠগড়ায় তুলছে, কলঙ্কিত করছে। ফের সেই অদৃশ্য ম্যানিপুলেশন। আমরা কিচ্ছু করতে পারছি না!...কিচ্ছু না...।" বলতে-বলতেই টেবিলের ওপর প্রচণ্ড হতাশায়, রাগে দুমদুম করে কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিল, "শি-ট! শি-ট!"

অর্ণব সভয়ে দেখল ঘুষি খেয়ে কাচের টেবিলটায় ইতিমধ্যেই সামান্য চিড় ধরেছে। অধিরাজের এই ঘুষি মারার অভ্যাস আজকের নয়। ভাগ্যিস টেবিলের কাচটা ভীষণ মোটা। নয়তো এতক্ষণে ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ত আর অধিরাজের হাত কেটেকুটে একসা হত। সে অস্ফুটে বলল, "স্যার!"

পবিত্র এতক্ষণ সংশয়ে ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়েছিল, "কিন্তু যদি এরা ইনোসেন্ট হয়, তবে এতগুলো বার্নিং শিখ আমদানি হল কোথা থেকে? এরা জানে না যে বার্নিং শিখের হুলিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়ালে পুলিশ কিংবা জনতা পেটাবেই? গত দু-দিন ধরে কী চলছে জানে না? না এটাকে ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি ভেবেছে! তুমি বলছিলে না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই একগুচ্ছ ক্লোন

নিয়ে রাস-ডান্স করতেন? এ তো তাঁকেও হার মানাল!"

"সেটাই তো আফশোশ পবিত্র।" অধিরাজ চোখ বুজে ফেলে, "নির্ঘাত এ লোকগুলো জানে না। কেন জানে না তা বুঝতে পারছি না। তবে এইটুকু বুঝি, জেনে বুঝে কেউ নিজের এই সর্বনাশ করে না! বাইরে থেকে মেক-আপ আর গেট-আপ বার্নিং শিখের। কিন্তু ভেতরের লোকগুলো আদৌ সে-ই নয়। মানুষ জানেই না যে লোকটাকে আসলে কেমন দেখতে। তারা ওই হুবহু এক প্রস্থেটিক মেক-আপ দেখে মাসমার্ডার করে বসে আছে! সঙ্গে পুলিশ দোসর। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, এদের মধ্যে একজনও বার্নিং শিখ নয়। সে এখনও মাঠে নামেইনি। বরং লুকিয়ে থেকে মজা দেখছে আর আমাদের ব্যর্থতায় হাসছে। তার ম্যানিপুলেশন সার্থক! সে একটা সন্দেহ আর ভয়কে নিজের অস্ত্র বানিয়ে আমাদেরই দিয়ে খুনগুলো করাচ্ছে। মাঝখান দিয়ে কতগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল। মারাত্মক ট্র্যাজেডি। ঠেকাতে না পারলে আরও যাবে... আরও...নাঃ...নাঃ!"

বলতে বলতেই সে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। আর একটাও কথা না বলে ফোনে তড়িঘড়ি এডিজি সেনের নম্বর ডায়াল করছে। তার হাত উত্তেজনায় কাঁপছিল। এডিজি সেনও বোধহয় এইসব কাণ্ড দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। একবার রিং হতে-না হতেই ব্যগ্রভাবে রিসিভ করলেন ফোনটা। প্রায় হাহাকার করেই উঠলেন, "এসব কী হচ্ছে ব্যানার্জি। এতগুলো বার্নিং শিখ কোথা থেকে এল! আর মরার সঙ্গে সঙ্গেই ফের পটাপট গজাচ্ছে কী করে?"

"স্যার, এরা কেউ বার্নিং শিখই নয়। শুধুমাত্র ওর গেট-আপে থাকা কতগুলো ইনোসেন্ট লোক। কেন এই ছদ্মবেশ ধরেছে তা এখনও জানি না। কিন্তু এটা কনফার্ম, এর ফলে কতগুলো নিষ্পাপ লোক মরল। আমরাই মারলাম!" অধিরাজের মুখ কঠিন, "নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ও হারামজাদা এত সহজে মরার লোকই নয়। যে লোক আপাদমস্তক বুলেটপ্রুফ হয়ে বসে থাকে, সে কয়েকটা গুলিতে কিছুতেই মরবে না। এই সর্বনাশটা আমিই করেছি। কিছু একটা ঘটবে বুঝতে পেরে আমি নিজেই পুরো শহরের পুলিশকে অ্যালার্ট করেছিলাম। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। সেই সতর্কবাণীর ফলাফল হিসেবেই পুলিশ এখন জিরো টলারেন্সের রাস্তা নিয়েছে। আর জনসাধারণও প্যানিকে রেসিপ্রোকেট করছে। 'মব্' চিরকালই একটা স্টুপিড কিন্তু ভয়াবহ অস্ত্র। মানুষকে বোঝানো যায়, ভিড়কে বোঝানো যায় না। তারা ধ্বংসই করে। আমি নিজের জালে নিজেই আটকে গেছি। ও আমাকে দিয়ে এটাই করাতে চেয়েছিল, যেটার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। নিরপরাধ মানুষের খুন!"

"এখন তবে কী করণীয়?" এডিজি সেন অসহায়ের মতো বললেন, "পুলিশ তো ওকে দেখলেই শ্যুট করবে। তেমনই অর্ডার আছে। ওকে বাঁচিয়ে রাখার রিস্ক নেবেই না। আবার তুমি বলছ যে এরা কেউ বার্নিং শিখই নয়। ভেতরে কে আছে তা কে দেখতে যাবে? বাইরের চেহারা তো সেম। তাছাড়া যদি কোনোভাবে মেক-আপ সরানোও যায়, তবু তার আসল চেহারাও আমরা চিনি না। ওদিকে পুলিশের হাতে ইনোসেন্ট লোকের এনকাউন্টারের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকবে। কো-ল্যাটারাল ড্যামেজই বা থামাবো কী করে? ইমিডিয়েটলি অর্ডার দিলেও সেটা সর্বত্র পৌঁছোতে সময় লাগবে। তার মধ্যেই কত লাশ পড়বে তার ঠিক নেই।"

"খুব তাড়াতাড়ি কার্ফিউ কিংবা এমার্জেন্সি জারি করার বন্দোবস্ত করা যায় কি স্যার? স্টেট অব এমার্জেন্সির ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট কিন্তু এটা করতে পারে। জনসাধারণকে যদি ঘরবন্দি করে ফেলা যায় তবে আর কোনো ড্যামেজ হবে না।" সে কাতরভাবে জানায়, "আমি থানাগুলোকে অ্যালার্ট করার চেষ্টা করছি যাতে তারা বার্নিং শিখের পোষাক পরা লোকগুলোকে শ্যুট না করে অ্যারেস্ট করে। পুলিশ যেরকম খেপে আছে তাতে তাদের সঙ্গে এখন যোগাযোগ করাও সমস্যা হবে। তবু আমি যত দ্রুত সম্ভব আবার জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনি একবার ওপরমহল আর মিনিস্টারদের সঙ্গে কথা বলবেন? মিনিস্টাররা যদি আপনাদের সঙ্গে ইমিডিয়েটলি প্রেস কনফারেন্স করে জনগণকে একটু শান্ত থাকার অনুরোধ করেন, আইন নিজেদের হাতে তুলে নিতে বারণ করেন, তবে কাজ হলেও

হতে পারে।”

“সেটা হতে পারে। আমি চেষ্টা করছি ব্যানার্জি।” তিনি বলেন, “কিন্তু তার জন্যও একটা মিনিমাম টাইম লাগবে। তাছাড়া এমনও তো হতে পারে যে যে মুহূর্তে পুলিশ এই নকল ফ্যান্টম শিখের দলকে শ্যুট করা থামাবে, ঠিক তখনই এদের মধ্য দিয়ে আসল লোক ফাঁড়া কেটে গিয়েছে বুঝে স্বমহিমায় এই ভিড়ের মধ্য দিয়েই হেঁটে চলে যাবে।”

“হতে পারে না।” অধিরাজের কণ্ঠস্বর দৃঢ়, “সেটাই হবে। যে মুহূর্তে ও বুঝবে যে পুলিশ আর পাবলিক নিজেদের ভুলটাকে আইডেন্টিফাই করেছে, সেই মুহূর্তেই ও একই ছদ্মবেশে নকল লোকগুলোর ভিড়ে ঢুকে যাবে। ও জানে তখন বার্নিং শিখের অবতারকে দেখলেও পুলিশ ফায়ার করবে না বা ভিড় তেড়ে আসবে না। ওর যে ছদ্মবেশ ওর মৃত্যুর কারণ হত, সেই ছদ্মবেশই এখন ওকে সেফ জোনে রাখবে।”

“তাহলে?”

এডিজি সেন বোধহয় চোখে একসঙ্গে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-রামধনু আর ব্ল্যাকহোল দেখছিলেন। স্খলিত স্বরে বললেন, “পুলিশ অ্যাকশন নিলেও বিপদ, না নিলেও বিপদ। এ কী প্যারাডক্স।”

“না।” সে আত্মবিশ্বাসী, “কোনো বিপদ নেই। ও লোকটা আমাদের যতই ডাইভার্ট করুক, আমরা জানি ওর আল্টিমেট গোল কোনটা। সেই জায়গাতে ওকে কোনোভাবেই ঢুকতে দেব না স্যার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। শুধু যেভাবেই হোক্, এই খুনগুলো ঠেকান। কতগুলো নির্দোষ লোক ফালতু ফালতু মরছে!”

“আই অ্যাম ট্রাইং মাই বেস্ট।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রত্যেকটি থানাকে ইনফর্ম করা হল। বার্নিং শিখ দেখা দিলেও তাকে মারা চলবে না। শ্যুট করাই চলবে না। হোমিসাইড টিম উন্মাদের মতো প্রত্যেকটি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ফোন করে চলেছে। প্রতিটা থানায় ফ্যাক্স যাচ্ছে। একটাই নির্দেশ, ‘ডোন্ট শ্যুট বার্নিং শিখ। বরং অ্যারেস্ট করুন।' কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোবাইলে মোবাইলে, ওয়াকিটকিতে, টু-ওয়ে রেডিও, এমার্জেন্সি নম্বরের মাধ্যমে আগুনের মতো ছড়িয়ে গেল একটাই বার্তা, ‘ডোন্ট শ্যুট বার্নিং শিখ।' তড়িঘড়ি আবার প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন এডিজি সেন। সেখানে নগরবাসীদের কাছে অনুরোধ করা হল, তারা যেন দয়া করে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। বার্নিং শিখকে দেখলে শুধু যেন পুলিশকে ইনফর্ম করে। এর থেকে বেশি কিছু করার প্রয়োজন নেই। সবাইকে এ-ও বলা হল যে পারলে তারা যেন অবিলম্বে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায় ও নিজেকে আপাতত গৃহবন্দি রাখে। জনগণের সুরক্ষার স্বার্থেই এমন আবেদন।

অধিরাজের অস্থিরতা ক্রমাগতই বাড়ছিল। তাকে দেখলে মনে হয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বুঝি শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখের চিন্তার ভাঁজেই স্পষ্ট এই সম্ভাবনার কথা সে ভেবেই দেখেনি। অর্ণব মনে মনে অবাক হচ্ছিল। এই বার্নিং শিখের হাতে আর কী কী তুরুপের তাস আছে! লড়াইটা শুরু হয়েছিল বর্ণাঢ্য অস্ত্র দিয়ে। এখন সম্পূর্ণ হাতাহাতিতে এসে ঠেকেছে। অথচ কী অদ্ভুত লোকটার ম্যানিপুলেট করার শক্তি। মানুষের মনকেই সে অস্ত্র বানিয়ে নেমে পড়েছে রণক্ষেত্রে। লোকটা সাইকায়াট্রিস্ট নয়তো? আতঙ্কবাদীরাও এরকম মগজধোলাই করে। তবে সেটা সরাসরি। সেই ভাষণ শোনা যায়, বক্তাকে দেখা যায়। এখানে সবই অদৃশ্য। ইনডাইরেক্ট অথচ অব্যর্থ। সে সবার নজরের আড়ালে থেকে দিব্যি অন্যদের দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এডিজি সেন ঠিকই বলেছেন। বার্নিং শিখের মুখোশের পেছনে নিরীহ মানুষগুলোকে খুন করার ভয়ে পুলিশ গুলি চালাবে না। আবার সেই সুযোগ নিয়েই আসল বার্নিং শিখ বাজি মাত করে বেরিয়ে যেতে পারে। পুলিশের পুরো শাঁখের করাতের মতো দশা। যেতেও কাটছে, আসতেও কাটছে।

পবিত্র এতক্ষণ উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফোনে কথা বলছিল। এবার দ্রুত এসে বলল, “রাজা, বার্নিং শিখের এক অবতারকে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা অ্যারেস্ট করেছে। লোকটা পালিয়ে

যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ওকে পুলিশ তুলে নিয়েছে। কিন্তু প্রবলেম হল, ব্যাটা কী বলছে তা কেউ বুঝতেই পারছে না!"

"অ্যাঃ!" অধিরাজ নিজেই যেন কথাটা বুঝতেই পারল না, "কী বলছে কেউ বুঝতে পারছে না মানে? পশ্চিমবঙ্গের লোক যখন বাংলাতেই তো কথা বলবে। থোড়াই অ্যালিয়েনদের ভাষায় ডায়লগ মারবে!"

"ভাষাটা জুলু থেকে শুরু করে হিব্রুও হতে পারে।" পবিত্র মাথা নাড়ছে, "কিন্তু কিছুতেই বাংলা নয়। তার বক্তব্য পুলিশ একবর্ণও বুঝতে পারছে না, কিছু জানতে চাওয়া তো দূর। আমাকেও ওভার ফোন শোনাল। কীসব ফি ফু, শিঙ্গু-মিঙ্গু-পিঙ্গু বলেই চলেছে গড়গড়িয়ে।"

"ক্কীঃ! শিঙ্গু, মিঙ্গু, পিঙ্গু মানে?"

সে আর কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেওয়ার আগেই হুড়মুড়িয়ে এসে ঢুকল টুইঙ্কল অরোরা, "স্যার, যাদবপুর থানাও একজন বার্নিং শিখকে তুলেছে। ও ব্যাটা ঢাকুরিয়ার কাছাকাছিই ঘুরছিল। পাবলিক ওকে পেটায়নি। তবে যাদবপুর পুলিশও তার কথা কিস্যু বোঝেনি। ও মাল যে কোন দুনিয়ার 'জাদু', নিয়ানডারথ্যাল না এনসিনো ম্যান তা বুঝতেই হিমশিম খাচ্ছে।"

"কিউরিঅ-সা-র অ্যান্ড কিউরিঅ-সা-র!"

অধিরাজ দু-জনের দিকে তাকিয়েই বলল, "দুই থানাতেই বলে দাও যে প্রেমালাপ যেন পরে করে। আগে ব্যাটাদের কয়েক কেজি'র মেক-আপ যেন তাড়াতাড়ি সরায়। কী কথা বলছে সেটা পরে বোঝা যাবে। কিন্তু ওই হরর মেক-আপের পেছনের মানুষটাকে বের করা আগে জরুরি। সেনোরিটা, আপনিও ইনফর্ম করে দিন। এটাও বলে দিন, আমরা আসছি। যতক্ষণ না যাচ্ছি, ততক্ষণ যেন কিচ্ছু না করে।"

"ওকে স্যার।"

টুইঙ্কল ও পবিত্র মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

*

(৩৩)

আর বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে অধিরাজবাহিনী দুই পুলিশ স্টেশনে গিয়েই উপস্থিত!

আমহার্স্ট স্ট্রিটের বার্নিং শিখের ততক্ষণে হুলিয়া পালটে গিয়েছে। ওই ভয়াবহ হ্যালোউইন মেক-আপের তলার মানুষটাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল অধিরাজ। একদম নিরীহ ধাঁচের মঙ্গোলিয় মুখ। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে অবশ্য বার্নিং শিখের সমানই। কিন্তু এ লোক আর যা-ই হোক, কিছুতেই 'শিখ' হতে পারে না। ওর থ্যাবড়া নাক, চ্যাপ্টা ঠোঁট, খুদকুড়ি চোখ যা প্রায় টর্চ মেরে দেখতে হয়, মুখের মঙ্গোলিয় আদল দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে নেপালি, ভুটানি, তিব্বতি, চাইনিজ, জাপানিজ, লেপচা—সব কিছু হতে পারে, কিন্তু কিছুতেই শিখ নয়।

বেচারা ওসি প্রায় কাঁদোকাঁদো মুখে বললেন, "স্যার, আমাদের দোষ নেই। এ হতভাগা কী যে বলছে তা ভগবানই জানেন। একটা শব্দও বুঝতে পারছি না। চেহারা দেখে নেপালি মনে হয়েছিল। তাই একজন নেপালি দোভাষীকেও ডেকেছিলাম। কিন্তু সেও স্রেফ মাথা চুলকে চলে গেল। এ লোকটা নেপালিও নয়। ভুটানিও নয়। দার্জিলিং এর লোক হলে অন্তত বাংলা জানত। চাইনিজ জাপানিজ হলে জানি না। আর এই দেখুন। এটাও ওর কাছে পাওয়া গেছে।"

বলতে বলতেই তিনি একটা সস্তা দামের নতুন মোবাইল এগিয়ে দিলেন। সেটাতে একটা রেকর্ডেড টিউন খোলা। স্টার্ট বাটন প্রেস করতেই ভেসে এল সেই শিসের সুর, 'গুমনাম হ্যায় কোই...।

অধিরাজ একদৃষ্টে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। চাইনিজ বা জাপানিজ হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। চীন বা জাপান থেকে যারা ভারতবর্ষে আসে, তারা অল্পবিস্তর হলেও কাজ চালানোর মতো ইংরেজি জানে। আর এর যেরকম দুঃস্থ চেহারা তাতে বিদেশি মানুষ বলে মনে হয় না। লোকটার মঙ্গোলিয় মুখ হলেও সে নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষেরই অধিবাসী। কিন্তু বাংলা না জানলেও অন্তত হিন্দি তো জানবে। গোর্খা প্রজাতির লোকেরা দিব্যি গড়গড়িয়ে হিন্দি বলে। সন্দেহে তার ভুরু কুঁচকে যায়। হিন্দিও যখন জানে না তখন কোনো উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোক নয় তো। লোকটার সঙ্গে কমিউনিকেটই যখন করা যাচ্ছে না তখন জানা যাবে কী করে? এই লোক 'গুমনাম'-এর গানও জানবে না, সেইজন্যই রেকর্ডিং করা হয়েছিল। কমদামি হলেও ঝকঝকে নতুন মোবাইলও ওর কাছে থাকার কথা নয়। একা সে-ই নয়। বাকিদেরও নিশ্চয়ই এই শিস সুদ্ধ মোবাইল গিফট করা হয়েছিল। তাদেরও এই একই রেকর্ডেড টিউন চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার জন্য শিসের সুরটা সবার ক্ষেত্রেই অবিকল এক ও নিখুঁত। কোনোরকম পার্থক্যই বোঝা যায়নি। কী মস্তিষ্ক লোকটার। সে মানুষটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কী মনে করে একটা শ্বাস টেনে মোবাইলটাকে তুলে ধরে ফিশফিশ করে কী যেন বলল। লোকটাও পিটপিট করে তার দিকেই তাকাচ্ছে। অধিরাজ এবার হঠাৎই আকাশের দিকে হাত তুলে ঘটা করে নমস্কার করে বলল, "দেবা দেবা।"

"উ ব্লেই নংথ।"

ওই মানুষটাও সাষ্টাঙ্গে প্রণামই ঠুকছে বোধহয়। এবার জোর গলায় বলে, "উ ব্লেই নংথ।"

"কী?"

সে প্রশ্নটা বুঝল কিনা কে জানে, আবার বলল, "উ ব্লেই নংথ।"

পবিত্র ফিশফিশ করে বলল, "ওরে আমার হুলো মামার কুটি মামী—কী ভাষায় কথা বলছিস বাপ!"

সে আরও কিছু বলার আগেই একটা যান্ত্রিক স্বর শোনা গেল! যান্ত্রিক স্বরটা অধিরাজের

মোবাইল থেকে ভেসে আসছে। কেউ কিছু বোঝার আগেই এক নারী কণ্ঠস্বর নির্লিপ্তভাবে বলল, "উ ব্লেই নংথ ইজ দ্য ক্রিয়েটর গড অব খাসি পিপ্‌ল...!"

"কুটি মামী নয়, গুগল মামী মিস্ট্রি সলভ্ করছেন!" পবিত্র-র বিস্ময়ে চোখ চাঁদিতে চড়ে গিয়েছে, "রাজা, তুমি 'ওকে গুগল' মার্কা ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট খুলে বসেছিলে?"

"আজকাল টেকনোলজি এত উন্নত যে দোভাষীর দরকারই ছিল না।" অধিরাজ ওসির দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করেছে, "এই বুদ্ধিটা আপনাদের মাথায় এল না? ও ফি ফু, শিঙ্গু মিঙ্গু যাই বলুক না কেন, গুগলের ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টের সাহায্য তো নিতেই পারতেন। কিছু জিনিস আছে যা ইউনিভার্সাল। ভাষা বুঝুক না বুঝুক, ইশারা ঠিক বুঝবে। আমি যেই আকাশের দিকে হাতজোড় করে নমস্কার করেছি, ও বুঝেছি আমি ঈশ্বরের কথা তুলেছি বা বলছি। সঙ্গে সঙ্গেই ও নিজের দেবতার নামই বলে দিল। গুগল ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট রেডিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভয়েস ক্যাচ করে নিয়ে যা বলার বলে দিয়েছে। উনি খাসি ভাষা বলছেন। খাসি উপজাতির হলেও ক্রিশ্চান ধর্মাবলম্বী নন। ট্র্যাডিশনাল দেবতার পুজো করেন। মেঘালয়ের বাসিন্দা। আমি যদি ভুল না করি, তবে বেচারি গরীব মানুষ। পেটের দায়ে পাহাড়ের সৌন্দর্য আর শান্তি ছেড়ে সদ্য সদ্যই ইট কাঠ পাথরের দুনিয়ায় এসে পড়েছেন। দিনমজুর হতে পারেন। অথবা এখনও যখন ভাষা জানেন না, তখন আনএমপ্লয়েড হওয়ার চান্সই বেশি। একটা চাকরি পেয়েছিলেন বটে, তবে আর একটু হলেই মেঘালয়ে নয়, সোজা যমালয়ে যেতেন। ইনি যে বার্নিং শিখের কীর্তির কথা জানবেন না, শুনবেন না বা কাগজে টিভিতেও দেখবেন না তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ ইংরেজিকে তো শিকেয় তোলো, এ অবতার বাংলা, হিন্দি—কোনোটাই জানে না।"

এইবার বোঝা গেল যে এই লোকটা বার্নিং শিখের মতো অমন বিপজ্জনক ছদ্মবেশ নিয়ে ঘুরছিল কেন! সে বেচারার পক্ষে জানা সম্ভবই ছিল না, আদতে এটা কী জাতীয় বেশ। টিভির নানা ভাষার খবর, বাংলা, ইংরেজি-হিন্দি কাগজের হেডলাইন, জনতার ফুসুর ফুসুর, কিছুই সে বোঝেনি। তাই ও যে একজন ভয়াবহ খুনির রূপ ধরেছে, তা ওকে বোঝাতই বা কে। অজান্তেই পুলিশের গুলি বা গণপিটুনি খেয়ে মরাই ওর ভবিতব্য ছিল। স্রেফ বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছে।

যাদবপুর থানার লোকটির ইতিহাসও গুগল ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্সই বলে দিল। সে বেচারি আবার তামিলভাষী। এই তথ্যটি জানার পর অবশ্য তার পরিচয় দ্রুত খুঁজে বের করা সহজ হয়েছিল। তার নাম মাধভন পিল্লাই। তার গ্রামতুতো জামাইবাবু মুখুস্বামীর ফুটপাতে একটি ইডলি-দোসার দোকান আছে। পিল্লাই সেখানেই অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করতে সম্প্রতি এসেছে। তামিলভাষীরা একেই হিন্দি বলতেই চায় না। তার ওপর এরা তো গরীব মানুষ। ইংরেজি বা অন্য কোনো বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রশ্নই ওঠে না। মেঘালয়ের বাসিন্দাটির মতো পিল্লাইয়ের পক্ষেও বার্নিং শিখের ঘটনা জানা সম্ভব নয়। তার গ্রামতুতো জামাইবাবুও খুব ভালো বাংলা জানে না। কাজ চালাবার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই বোঝে। এমনিতেও ফুটপাতে খাবার বিক্রি করার জন্য সুললিত বাংলায় ভাষণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ও না। ইডলি, সাম্বর, দোসা, বড়া—এই শব্দগুলো বুঝলেই চলে। তবু কপালগুণে একজন তামিল দোভাষী পেয়ে যাওয়ায় এর পেছনের গল্পটি বেরোল।

পিল্লাই জানাল যে এক বৃদ্ধ তাকে ও তার সদ্য গ্রাম থেকে আসা আরও তিনজন বন্ধুকে একটা মজার খেলা খেলার জন্য পাঁচহাজার টাকা মাথা পিছু দিয়েছিল। সঙ্গে একটা করে নতুন মোবাইলও। ওর বাকি তিনবন্ধুও ওর মতোই তামিল ছাড়া আর কিছু বোঝেই না। তারা বিভিন্ন সাউথ ইন্ডিয়ান হোটেলে ছোটোখাটো বয়ের কাজ করত। রেস্টোর্যান্টের মালিকেরা নিজেরাই তামিলভাষী তাই খুব অসুবিধা কিছু হয় না। একমাসও হয়নি কলকাতায় এসেছে। গ্রামতুতো জামাইবাবু সামান্য মাইনে দিলেও থাকার ব্যবস্থা কিছু করেনি। তাই ওরা একটা বস্তির এক কামরার ঘরে গাদাগাদি করে থাকে, দিবারাত্রি পরিশ্রম করে। টিভি তো দূর, মাথার ওপর একটা পাখাও নেই। শোবার জন্য স্রেফ কতগুলো চাটাই সম্বল। তাই টিভি

দেখারও প্রশ্ন ওঠে না। দেখলেও কিছুই মাথায় ঢুকত না। বেঙ্গালুরুর ঘটনাও ওদের প্রত্যন্ত গ্রাম অবধি পৌঁছোয়নি। মাথা পিছু পাঁচহাজার টাকা ওদের কাছে অনেক। আর উপরি পাওনা নতুন মোবাইল। ওরা খুব খুশি হয়েই রাজি হয়ে গিয়েছিল। বুড়ো মানুষটা বলেছিল যে বিশেষ কিছুই করার দরকার নেই। শুধু তাদের একটু ভয়াবহ রকমের সাজিয়ে দেওয়া হবে। সেই রূপ নিয়ে ওই মোবাইলে রেকর্ডেড একটা বিশেষ শিসের সুর বাজিয়ে, সিটি বাজানোর ভঙ্গি করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। কিছুই না, লোককে একটু ভয় দেখানো আর কী! যেমন অনেক ইউটিউব চ্যানেল বা অন্যান্য চ্যানেল প্র্যাঙ্ক করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে তারপর হাসাহাসি করে, ব্যাপারটা তেমনই। বয়স্ক মানুষটি চমৎকার তামিল ভাষায় কথা বলছিলেন। তাই নিজেদের লোক হিসাবে তাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে একটুও সময় লাগেনি

কিন্তু তখন কে জানত যে ব্যাপারটা আদৌ হাসির বা মজার নয়। যে পাঁচজন মারা গিয়েছিল, তাদের মেক-আপহীন চেহারা যখন পিল্লাইকে দেখানো হল, সে তৎক্ষণাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল। প্রথমবার পুলিশের গুলিতে যে মারা গিয়েছিল সে ওরই এক বন্ধু। বাকি চারটে লাশের মধ্যেও নিজের আরও দুই বন্ধুকে মৃত অবস্থায় পেয়ে তার কান্না থামতেই চাইছিল না! বারবার সে তামিল ভাষাতেই জানতে চাইছিল, ওরা কেন মারা গেল? ওদের কী অপরাধ ছিল? ওরা তো কিছুই জানত না, তবে পুলিশ আর জনতা কেন ওদের শেষ করে দিল!

এর উত্তর কী দেবে তা অধিরাজ কেন, উপস্থিত কেউই ভেবে পায়নি। সকলেই নীরবে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। কতগুলো গরীব, নিরীহ, খেটে খাওয়া মানুষকে বার্নিং শিখ ভেবে পুলিশ গুলি করে মারল, আর জনতা পিটিয়ে খুন করল। অধিরাজের বুক দুরুদুরু করছে। সম্ভবত যে ক-জন রেপ্লিকাকে দেখা গিয়েছে তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসই এমন। এরা সব পরিযায়ী শ্রমিক, বা সদ্য বাইরে থেকে কাজের খোঁজে এসেছে যারা কেউ বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজিও জানে না। হয়তো নিরক্ষরও। কী করে গুল্লু নামের লোকটি এদের ট্র্যাক করছে বা খুঁজে বের করেছে তা ঈশ্বরই জানেন। এটা ঘটনা যে বাইরে থেকে বহু মানুষ কলকাতায় মজুরি বা ছোটোখাটো কাজ করতে আসে। তারা কেউ শিক্ষিত নয়। অর্ধেকের বেশি তো বাংলা, ইংরেজিও জানে না! উত্তরপ্রদেশ আর বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকরা হিন্দিটা জানে। তবে এ লোকটা বোধহয় তাদের কাউকে বাছেনি। তার শিকারদের নমুনা তো সামনেই। একজন মেঘালয়ের, চারজন তামিল! কিছু টাকা আর মোবাইলের লোভ দেখিয়ে তাদের জেনেশুনে মৃত্যুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। কে জানে এমন ট্র্যাজেডি আরও কতজনের সঙ্গে ঘটবে। যদিও পুলিশ এখন গুলি চালাচ্ছে না, জনতাও নিজেদের কিছুটা হলেও সামলেছে। কিন্তু বিশ্বাস নেই... কাউকে বিশ্বাস নেই!

"লোকটা প্রতিশোধস্পৃহায় পাগল হয়ে গেছে। নয়তো এমন কাণ্ড কেউ করে।" অধিরাজ গাড়িতে বসে বিড়বিড় করল, "এতখানি শয়তানি প্ল্যান! ও শিশুর শট জানত যে পুলিশ ওকে এনকাউন্টার করার মুডেই আছে। তারপরও কতগুলো নিরীহ লোককে মরতে পাঠাল। শুধু এইজন্যই ওর আর বেঁচে থাকাই উচিত নয়।"

এই মুহূর্তে ওদের গন্তব্যস্থল বাইপাসের পাশের হসপিটাল। যেখানে এই মুহূর্তে পি সি চৌধুরীর পরিবার ভরতি। প্রণবেশ লাহিড়ী সেখানে অতন্দ্র প্রহরায় আছেন। বারবার ওঁকে ও মিস্ দত্তকে সতর্ক করা হচ্ছে। মিস্ অরোরা আর অর্ণব মূর্তির মতো স্থির। পবিত্র নীরবে ড্রাইভ করছে। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। এ কী কাণ্ড! আগের খুনগুলোকে যদি বা জাস্টিফাই করা যায়, এই মৃত্যুগুলোর কোনো অর্থই নেই। পুলিশকে বোকা বানানোর জন্য শেষপর্যন্ত এইরকম বিপজ্জনক রাস্তাই পেয়েছিল সে। একবারও ভেবে দেখল না যে এই লোকগুলোর সঙ্গে তার কোনো শত্রুতাই নেই? এরাও তার মতোই সাধারণ মানুষ। কিছু টাকার বিনিময়ে ওরা নিজেদের অজ্ঞাতেই একটা মরণ খেলায় নেমেছিল। একবারও কি তার মনে দ্বিধা আসেনি? একবারও ভেবে দেখেনি এরাও কারোর বাবা, কারোর স্বামী, কোনো পরিবারের একমাত্র সহায়। সে নিজের হাতে ওদের মারেনি। কিন্তু বোড়ের মতো এগিয়ে

দিয়েছে। আর সি.আই.ডি. হোমিসাইড, পুলিশই বা কী জবাব দেবে এখন। তাদের ঘাড়েই তো সাতটা খুনের দায়। মিডিয়া ইতিমধ্যেই পুলিশকে দোষী সাব্যস্ত করে বসে আছে।

"লোকটা সাউথ ইন্ডিয়ান ভাষা জানে তা আগেই বুঝেছিলাম যখন বেঙ্গালুরুতে ছিল।" অধিরাজ অস্থিরভাবে বলল, "কিন্তু খাসি ভাষা তো অত সহজ নয়। মেঘালয়ের লোকটার সঙ্গে কমিউনিকেট করল কী করে?" বলতে বলতেই সে পবিত্র আর অর্ণবের দিকে তাকায়, "এতক্ষণ পর্যন্ত মোট কতজন বার্নিং শিখকে পাওয়া গেছে? মৃতদের সবার পরিচয় কি জানা গেছে? তাদের কাছেও নতুন মোবাইল ছিল কি? খোঁজ নাও তো।"

পুলিশ নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় আর মিডিয়ার গালিগালাজে মরমে মরে গিয়ে এখন উঠেপড়ে তদন্ত করছিল। তারা জানাল যে প্রত্যেকের কাছ থেকেই একটা করে নতুন মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। আর সব ফোনেই শুধু ওই ভয়াবহ শিসটাই রেকর্ড করা আছে। এখন সব মৃতদেহেরই মেক-আপ তুলে দেওয়া হয়েছে। তার তলা থেকে যারা বেরোল তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যায় এরা সব হাভাতে মানুষ। তিনজনকে আগেই পিল্লাই শনাক্ত করেছিল। বাকি দু-জনের মধ্যে একজনের আবার পুলিশ রেকর্ডও আছে। পুলিশই আইডেন্টিফাই করল তাকে। নামজাদা হিস্ট্রিশিটার নয় অবশ্য। একেবারেই ছোটখাটো গাঁটকাটা! একবার প্রকাশ্য রাস্তায় পিক-পকেট করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। কলকাতারই বাসিন্দা। এই লোকের বাংলা জানার কথা। কিন্তু এখানেই আবার ট্যুইস্ট। চোর হলেও সে মুক ও বধির। বিদ্যার দৌড় টিপছাপ। পুলিশ শিসের শব্দটা শুনে বুঝতেও পারেনি যে লোকটা বোবা! ওই ভয়াবহ রেকর্ডিংই তাদের বোকা বানিয়েছে।

শেষ মৃতদেহটিকেও অবশেষে অনেক গলদঘর্ম হয়ে শনাক্ত করা গেল। এর রেকর্ড পুলিশের কাছে নেই। তবে পুলিশের তৎপরতায় তাকেও চেনা গিয়েছে। এ ফুটপাথবাসী এক বদ্ধ পাগল ভিখারী। খাওয়ার পয়সা না থাকলেও গাঁজা ছাড়া ওর চলে না। একেই মানসিক ভারসাম্যহীন, তার ওপর গাঁজা খেয়ে সবসময়ই ভোম্ হয়ে বসে থাকত। বার্নিং শিখ, লতা মঙ্গেশকর কিংবা পুতিন, সবাই ওর কাছে একই। যার মস্তিষ্কেরই ঠিক নেই, সে শহরে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাই জানবে না। তার শুধু গাঁজা টানতে পেলেই হল। আর ওটাই হয়তো টোপও ছিল। ওদের মতো দুঃস্থ লোক হাতে গরম টাকা আর মোবাইল পেলে বিনাবাক্যব্যয়ে সব কিছু করবে।

"টোট্যাল এগারোজন বার্নিং শিখের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে স্যার।"

অর্ণব আপডেট নিয়ে জানায়, "তার মধ্যে পাঁচজন ডেড। দু-জনকে পুলিশ আগেই তুলেছিল। বাকি চারজনের মধ্যে তিনজনকেও এইমাত্র অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এদের সবার ইতিহাসই প্রায় একরকম। কেউ কর্ণাটক থেকে জুয়েলারির দোকানে ডিজাইনের ছোটখাটো কাজ করতে এসেছে। কিন্তু কন্নড় ছাড়া কিছু বোঝে না। একজন কোঙ্কনি লোকও আছে। সে এইসান হাউমাউ করে কোঙ্কনি বলছিল যে অফিসারদের 'রক্ষে করো রঘুবীর' অবস্থা। তারা কোন্ দিকে পালাবে ভেবে পাচ্ছিল না। কিন্তু আপনার পরামর্শ মতো গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের সাহায্যে শেষপর্যন্ত ভাষা ডিটেক্ট করতে পেরেছে। আর একজন অবশ্য বিহারী দিনমজুর। তবে সে মদের বোতল ছাড়া আর কিছু চেনে না। এরা কেউ বার্নিং শিখের ইতিহাস, ভূগোল, অতীত, বর্তমান, কিচ্ছু জানে না। তাকে নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। টাকা পেয়েছে, সেলফোন পেয়েছে, চুপচাপ কাজ করেছে। এদের কারোর কাছে বৃদ্ধ মানুষ গিয়েছিল, কারোর কাছে আবার সুন্দরী মেয়ে!"

"জিনিয়াস টাইপের রাক্ষস! কতগুলো ভাষা বলতে পারে তার ঠিক নেই। কত রূপ ধরতে পারে তারও সীমা পরিসীমা নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, গোটা কলকাতাকে হাতের তালুর মতো চিনে বসে আছে। নয়তো এই লোকগুলোকে কোথায় পাওয়া যাবে বা তাদের হিস্ট্রি কী করে জানল! যে টাকাটা ও মেক-আপ, নগদ ক্যাশ, মোবাইল আর অন্যান্য জিনিসের পেছনে ছড়াচ্ছে নিঃসন্দেহে সেটা কোমল কৌরের। কিন্তু ওর শয়তানের মস্তিষ্কটিকে অবহেলা করা যাচ্ছে না।" অধিরাজের মুখে আফশোশ, "ও নিজেও অলমোস্ট খ্যাপা কুকুরই

হয়েছে অর্ণব। বারবার বাধা পেয়ে ওর আর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই। নিজেই জানে না কোথায় গিয়ে থামবে। টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি অন্য জাতীয় থ্রেটের কথা ভেবেছিলাম। এতখানি নিষ্ঠুর হবে তা ভাবিনি। শি-ট্!" বলতে বলতেই সে অর্ণবের দিকে তাকায়, "দশজনের হিসাব তো পেলাম। বাকি একজন কোথায়? এগারো নম্বর?"

অর্ণব বলতেই যাচ্ছিল যে এগারো নম্বরের খবর এখনও পাওয়া যায়নি। সে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা দিয়েই ভ্যানিশ হয়েছে। কিন্তু তার আগেই অধিরাজের মোবাইল ফের বেজে ওঠে। ফোনের ওপ্রান্তে এডিজি সেন।

"স্যার।" তাড়াতাড়ি কলটা রিসিভ করল অধিরাজ, "এনি আপডেট?"

"ব্যাড নিউজ ব্যানার্জি।" এডিজি সেনের বিপন্ন গলার পেছনে প্রচুর মানুষের চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এল। তিনি গলার স্বর যতখানি সম্ভব উঁচু করে বললেন, "তোমাদের মোবাইলে কোনো নিউজ চ্যানেলের লাইভ টিভির অপশন থাকলে এখনই অন করো। ইটস আর্জেন্ট!"

"ইয়েস স্যার।"

অর্ণব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিখ্যাত নিউজ চ্যানেলের লাইভ টিভি মোবাইলে চালিয়েছে। কিন্তু তাতে যা দেখল ও শুনল তাতে চক্ষু চড়কগাছ! একটা পেট্রোল পাম্প ভয়াবহ আগুনের আলিঙ্গনে দাউ দাউ করে জ্বলছে! ভেতরে যে ক-টা গাড়ি তেল নিতে ঢুকেছিল, সেগুলো একটাও আস্ত নেই। তার মধ্যে আবার একটা বেসরকারি বাসও আছে। গাড়ি বা বাসের সওয়ারিরাও বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ! যেভাবে একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছে, আর ভলকে ভলকে আগুন ফুঁসে উঠছে, তাতে শুধু সওয়ারি তো দূর, পেট্রোলপাম্পের একজন কর্মীরও বাঁচার কথা নয়। ভাগ্যিস ফায়ার ব্রিগেড বিকেলের পর থেকেই হাই অ্যালার্টে ছিল তাই যথাসময়ে পৌঁছে গিয়ে আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তার ফলে অগ্নিকাণ্ড আরও বিধ্বংসী রূপ নিয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তবু যতটুকু হয়েছে তাকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে নাজেহাল হচ্ছে তারা।

অধিরাজ অনিমেষে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েছিল। সে রীতিমতো দরদর করে ঘামছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক সাংবাদিক জানালেন যে কিছুক্ষণ আগেই বাঁশদ্রোণী পেট্রোল পাম্পের সামনে বার্নিং শিখ আবির্ভূত হয়েছিল। যথারীতি অ্যাপিয়ারেন্স একই। সেই ভয়াবহ মুখ, ঠোঁটে সেই 'গুমনাম' মার্কা শিস। পুলিশও জনগণ মারফত তার আগমনবার্তা পেয়েই ছুটতে ছুটতে নিমেষের মধ্যেই হাজির। যেহেতু এর আগে পাঁচটা ব্লান্ডার হয়ে গিয়েছে ও কো-ল্যাটারাল ড্যামেজের ধাক্কা এখনও কেউ সামলাতে পারেনি তাই দু-পক্ষই এবার সতর্ক ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী পুলিশ বার্নিং শিখকে সারেন্ডার করতে বলেছিল। কিন্তু তাকে শ্যুট করার কোনো চেষ্টাই করেনি। যেহেতু ওপরমহল থেকে শ্যুট না করার অর্ডার এসেছিল তাই তারাও নিরুপায় নগরবাসীরাও এত বড়ো ম্যাসাকারের পরে কী করবে বোঝেনি। সেই ফাঁকেই এগারোতম বার্নিং শিখ দ্রুত ঢুকে পড়েছিল পেট্রোল পাম্পের ভেতরে। সেখানে কয়েকটি গাড়ির ফুয়েল ট্যাঙ্কে তখন তেল ভরা চলছে। সে চোখের পলকে একটা গাড়ির খোলা ফুয়েল ট্যাঙ্কে জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রায় মুহূর্তের মধ্যেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। একটি গাড়ির বিস্ফোরণের ধাক্কায় আশেপাশে যে গাড়িগুলো তেল নিচ্ছিল সেগুলোও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে ওঠে ও আগুন বিধ্বংসী রূপ নেয়। যে কর্মীরা বাইরের দিকে ছিল, তারা কোনোমতে পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। যারা ভেতরে জ্বালানি তেল ভরছিল, তাদের বাঁচার সম্ভাবনা শূন্য!

অধিরাজের কপালে হাত, "এই ভয়টাই ছিল। এটাই আসল বার্নিং শিখ! এতগুলো ফলস অ্যালার্ম দেওয়ার পর যে মুহূর্তে দেখল পুলিশ ঘাবড়ে গিয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেছে, সেই মুহূর্তেই শুয়োরের বাচ্চাটা ওই ছদ্মবেশ নিয়ে এসে ফের পেট্রোল পাম্প উড়িয়ে দিল। আগেরবার পারেনি, সে শোধটা এবার তুলল। অর্ণব, শেম অন মি। অগ্নিকাণ্ড করাটা ওর অন্যতম স্টাইল! এর ফলে ও আবার কতগুলো নিরীহ লোককে পুড়িয়ে ছাই শুধু করল না

গোটা ব্যালেন্সটাই বিগড়ে দিল। এরপর কী হবে বা হতে পারে সেটা ভেবেই আমার ভয় করছে! ১৯৮৪ তে যেরকম নৈরাজ্য, অরাজকতা চলেছিল, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল, এবার সেটাই হবে। কেউ কিছু বুঝবে না, শুনবে না, একে অপরকে মারবে! আবার সেই মুহূর্তগুলো রি-ক্রিয়েট হবে। চোখের সামনে পটাপট লাশ পড়ছে। কেউ গুলিতে মরছে, কেউ মলিঞ্চিং এ, কোথাও ব্লাস্ট হচ্ছে...

আরও কত লাশ পড়বে জানি না। 'শেম্ অন্ মি ... শেম্ অন্ মি ...' বলতে বলতেই সে একটু থেমে উত্তেজিত স্বরে বলল, "হস্পিটালে পরে যাব পবিত্র... অন্যদিকে নাও। প্রণবেশদা আর মিস্ দত্তকে বলো একদম এক্সট্রিম অ্যালার্মিং পজিশনের জন্য তৈরি থাকতে। মিস্ দত্ত প্রয়োজন পড়লে যেন মিস্ বোসকেও সঙ্গে নিয়ে নেন। আপাতত শিখ কলোনিগুলোতে পেট্রোলিং বেশি জরুরি। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের সমস্ত অফিসারদের ইমিডিয়েটলি রাস্তায় নামতে বলো। ...অন্য সব কেস চুলোয় যাক... এটাই এখন প্রায়রিটি...বলে দাও, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যেন পেট্রোলিং চালায় সবাই। আমার ধারণা মব্ অ্যাটাক আর ভায়োলেন্স আবার শুরু হবে... ।"

অধিরাজের ভয়টাই বাস্তব! এতক্ষণ কিছু অপ্রত্যাশিত ট্র্যাজেডিতে মিডিয়া এবং মানুষের মন কিছুটা নরম হয়েছিল। কিন্তু চোখের সামনে এরকম একটা ব্লাস্ট দেখার পর সবাই যেন আরও পাঁচগুণ খেপল। চোখের সামনে দাউ দাউ করে জ্বলা গাড়ি, তার ভেতরের জ্বলন্ত মানুষগুলোকে মর্মান্তিকভাবে শেষ হতে দেখার পর মানুষও এবার কাণ্ডজ্ঞান হারায়। বার্নিং শিখের কাণ্ডকীর্তি এতদিনে সবারই জানা হয়ে গিয়েছে। সে যে ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ তা কারোরই অজানা নয়। তাই আতঙ্কে, রাগে ক্ষিপ্তপ্রায় জনতা এবার শহরজুড়ে তাণ্ডব শুরু করে। প্রথমে যত পাগড়ি পরা শিখদের হাতের কাছে পেল তাদেরই ধরে একতরফা মারদাঙ্গা চালাল। এক সর্দারজির ট্রাক জ্বালিয়ে দিল। একদল লোক শিখ বসতিতে গিয়ে আক্রমণও করেছে। তাদের ধারণা বার্নিং শিখ ওখানেই আত্মগোপন করে আছে। শুধু তাই নয়, দু-চারজন নিরীহ পথচারী, উলোঝুলো পাগল, যাদেরই হাবভাব দেখে একটু সন্দেহ হল, তাদেরই ধরে পেটাতে শুরু করল।

ট্র্যাজেডির পর ট্র্যাজেডি। তবু ভাগ্য ভালো শিখরা অল্পবিস্তর মার খেলেও টিম অধিরাজ যথাসময়ে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করতে পেরেছিল। মব্ অবশ্য থামবার নাম নিচ্ছিল না। তাদের প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে বোঝানোর ব্যর্থ চেষ্টাও হয়েছে, তবু তারা কিছু শুনবেই না। কিন্তু যখন অধিরাজ খেপে গিয়ে পাবলিককে ধরেই বিনাবাক্যব্যয়ে পেটাতে শুরু করল, তখন তার দেখাদেখি অর্ণব, পবিত্র ও টুইঙ্কলও পালটা মার দিতে থাকে। বিশেষ করে রণচণ্ডিটির ভয়ালমূর্তি দেখার মতো ছিল। 'হা রে রে রে করে তেড়ে আসা ভিড় চার অফিসারের হাতে মারধোর খেয়ে চম্পট দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সর্দারজির ট্রাকটা জ্বললেও মানুষটা রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। অধিরাজ আগেই আন্দাজ করেছিল যে উন্মত্ত জনতাদের প্রাথমিক টার্গেট হয়তো শিখেরাই হবে। তাই একদম সঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়ে অধিরাজ ও তার বাহিনী অতিকষ্টে শিখদের বাঁচাতে পেরেছে। সেখানে কোনোরকম ক্যাজুয়ালটি ঘটেনি। সমানতালে চক্কর দিচ্ছে হোমিসাইডের অন্যান্য অফিসাররাও। তার সঙ্গে রাস্তায় নেমেছে গোটা শহরের পুলিশ। তাই কিছু মানুষ বেঁচে গেল। তবে সবার ভাগ্য অত অনুকুল ছিল না। দু-জন পাগল ভিখিরি মানুষের সন্দেহের শিকার হয়ে গণপ্রহারের বলি হল। যেহেতু বার্নিং শিখ বৃদ্ধের ছদ্মবেশ নিয়েছিল, তাই রক্ষা পেলেন না সিনিয়র সিটিজেনরাও। এক অচেনা বয়স্ক ধূপবিক্রেতাকেও মানুষ পিটিয়ে মারল। দু-জন বৃদ্ধকে পুলিশ একরকম মারপিট করেই ভিড়ের হাত থেকে উদ্ধার করল। নয়তো তাদের কপালেও ফাঁড়া নাচছিল।

সত্যিই সারা শহর জুড়ে নেমে এল অরাজকতা! বার্নিং শিখের আর টিকিটিও দেখা গেল না ঠিকই, কিন্তু সন্দেহ বড়ো বিষম বস্তু। বার্নিং শিখ সেই সন্দেহের আগুনে ঘৃতাহুতি, বা বলা ভালো পেট্রোল ঢেলে দিয়ে কেটে পড়েছে। কিন্তু তারপর থেকেই মবকে সামলাতে পুলিশের নাজেহাল দশা। কোথাও কোথাও বাধ্য হয়ে ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাসও

ব্যবহার করেছে। তাতেও যখন কাজ হয়নি তখন লাঠি চার্জ করতেই হয়েছে তাদের। ফলস্বরূপ মিডিয়া ফের পুলিশের বাপান্ত শুরু করল। এর আগেরবার অভিযোগ ছিল, নির্দোষ মানুষদের কেন শ্যুট করা হল। এবার অভিযোগের আঙুল উঠল, আসল বার্নিং শিখকে কেন ওখানেই গুলি করে মারা হল না। খোদ পুলিশের নাকের সামনে দিয়ে সে আস্ত একটা পেট্রোল পাম্প জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল, অথচ পুলিশ কেন মিউ মিউ করছিল? কেন তার দেহ তখনই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হল না। পুলিশের অপদার্থতার জন্যই আজ এই অবস্থা। তারা আসল বার্নিং শিখকে কেন চিনতে পারেনি? সঠিক লোকটাকে চিনে নিয়ে ওখানেই এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত ছিল। তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি বলেই শহরে এমন বিশৃঙ্খলা! এখন সি.আই.ডি. হোমিসাইড আর পুলিশও পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে পেশীশক্তির প্রদর্শন করছে, জনগণের ওপর লাঠিচার্জ করছে, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারও করছে!

বার্নিং শিখ এই শেষ মুহূর্তে পুলিশের সামনে ভয়াবহ প্যারাডক্স ও চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশও প্রচণ্ড ডায়লেমায়। তাদের হয়েছে উভয়সংকট। কোনটা আসল, কোন্‌টা নকল চিনবেই বা কী করে। বার্নিং শিখের মুখ তো অর্ধেক পোড়া। যেটুকু দেখা যায় তাও দাড়ি গোঁফে এমন আচ্ছন্ন যে তার পেছনে কে আছে বোঝাই দায়। ওই মেক-আপে যদি অমিতাভ বচ্চন কিংবা এডিজি শিশির সেনকেও নামিয়ে দেওয়া হয়, তাও একই মনে হবে। এভাবে চেনা সম্ভব? কেউ বুঝতেই পারছে না, যে ফের যদি তার আবির্ভাব হয়, তবে কী করণীয়! শ্যুট করলেও বিপদ। না করলেও বিপদ! পুলিশ ও সি.আই.ডি.-র হোমরা চোমরারা নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে মিটিং করেও সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না যে বার্নিং শিখের জন্য 'শ্যুট অ্যাট সাইটের' অর্ডার দেওয়া হবে কিনা। মড়ার ওপর খাড়ার ঘায়ের মতো মিডিয়ার পর মানবাধিকার কমিশনের লোকেরাও পুলিশের এই অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হলেন। তাদের একটা দল সি.আই.ডি.-র অফিস ঘেরাও করে স্লোগান দিচ্ছে। এডিজি সেন প্রেসের উদ্ভট সব প্রশ্নে জেরবার হয়ে রণেভঙ্গ দিয়ে প্রেস কনফারেন্স থেকে উঠে চলে গিয়েছেন। অধিরাজ কোন্ দিকে যাবে বুঝতে পারছিল না। গোটা শহর জুড়ে মারপিট চলছে। যত্রতত্র মারামারি-ভাঙাভাঙি! বার্নিং শিখের জ্বালানো ত্রাসের আগুনকে আরও বেশি ছড়িয়ে দিচ্ছে মিডিয়া। ওরা পেট্রোলিংয়ের ফাঁকে ফাঁকেই লাইভ টিভিতে দেখছিল বিশেষজ্ঞদের প্যানেল ফের নানারকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে বসে গিয়েছে। তারা যে যার অভিমত প্রকাশ করছেন। একজন নামজাদা বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত সমাজসেবক বললেন, "আগেই বলেছিলাম যে এই বার্নিং শিখ একজন খালিস্তানি জঙ্গি। হি ইজ আ টেররিস্ট। অনেক আগেই ওকে সমূলে বিনাশ করা উচিত ছিল। এর আগেও ও পেট্রোল পাম্প ওড়ানোর প্ল্যানিং করেছিল। সেবার হোমিসাইডেরই এক অফিসার তেলের ট্যাঙ্কারের ওপর র‍্যান্ডম ফায়ারিং করে ওকে সুযোগ দিয়ে দিয়েছিলেন। কোনোরকমে শেষরক্ষা করা গিয়েছিল। কিন্তু আজ তো পুলিশ স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।"

এক সুন্দরী অভিনেত্রী জড়ানো জড়ানো আধো উচ্চারণে কচিখুকির মতো নিজের মতামত পেশ করেন, "আগেই আমরা সন্দেহ করেছিলাম যে ব্লাস্ট হবে। প্রথম ব্লাস্টটা হয়েছে। আমার ধারণা এটা সবে শুরু। মুম্বাই ব্লাস্টের মতোই এবার কলকাতাতেও র‍্যান্ডম ব্লাস্টের 'সিলসিলা' শুরু হবে। আর কত লোক মরবে কে জানে!"

কারোর বা আবার বক্তব্য, "বার্নিং শিখকে আরও সিরিয়াসলি নেওয়া উচিত ছিল। ওকে শুরুতেই শেষ করে দিলে আজ এই অবস্থা হয় না। পুলিশের অপদার্থতায় সে এতখানি বেড়েছে।"

কেউ মতামত পেশ করেন, "সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবছে না। তাদের কী হবে? যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো জনবহুল এলাকায় এরকমই মারাত্মক ব্লাস্ট হতে পারে। ক-টা বিস্ফোরণ হবে কে জানে। শয়ে শয়ে হাজার হাজার লোক মারা পড়বে। আমরা কেউ এই শহরে সুরক্ষিত নই। রাস্তায় সাধারণ নাগরিকদের প্রাণ হাতে করে চলতে হচ্ছে। পুলিশের

উচিত ছিল এগারোজন বার্নিং শিখকেই গুলি মেরে উড়িয়ে দেওয়া। আমি তো ভিড়কে দোষ দিতে পারছি না। তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাই পুলিশের যা করা উচিত ছিল তা নিজেরাই করছে।"

"বন্ধ করো তো এই প্যাঁচা-পেঁচীর ভাষণ। কতগুলো বিরিঞ্চিবাবার ফালতু বাতেল্লা।" পবিত্র খেপে গিয়েছে, "আমরা কী নিয়ে, কাকে নিয়ে ডিল করছি তার ধারণা তো এদের নেই-ই। উলটে নিজেরাই প্যানিক ছড়াচ্ছে। বার্নিং শিখ আতঙ্কবাদী? তার চেয়েও বড়ো আতঙ্কবাদী এরা নিজেরা! শালা, যত রাজ্যের টেররিস্টের দল।"

অধিরাজ বিষণ্ণ মুখে মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিল। তার দিকে তাকালেই বুক মুচড়ে উঠছে অর্ণবের। লোকটার কী শোচনীয় দশা। সে জানে যে বার্নিং শিখের মূল টার্গেট হসপিটাল আর ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাট। কিন্তু সেখানে যাওয়ার উপায় নেই। উলটে গোটা শহরে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াতে হচ্ছে। কখনও শিখ কলোনিতে ছুটছে। কখনও খবর আসছে কোনো গুরুদ্বারায় লোকে হামলা করেছে, সেখানে দৌড়োচ্ছে। একের পর এক জনরোষ ও ভিড়ের অ্যাটাকের খবর আসছে রেডিয়োতে বা মোবাইলে আর ওরা গত দু-ঘণ্টা ধরে উদ্ভ্রান্তের মতো এদিকে-ওদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। ভিড়কে সামলাতে গিয়ে নিজেরাও ইনজিওর্ড। তবু থামবার উপায় নেই। উলটে গোটা শহরের পরিক্রমা করছে। কাছের লোকেশনগুলোয় যেখানেই গোলমাল শুনছে, সেখানেই পৌঁছে যাচ্ছে। তবু ভালো যে যথাসময়ে শিখ কলোনি ও গুরুদ্বারায় পৌঁছতে পেরেছিল। সর্বনেশে মব্ নয়তো প্রতিহিংসায় সব জ্বালিয়ে দিত৷ কলকাতার মতো এক শান্তিপ্রিয় শহরে মানুষের এই দানবীয় চেহারা! যে কল্লোলিনী তিলোত্তমা তার বিশাল হৃদয় ও উদার জনগণের জন্য বিখ্যাত, আজ সেখানেই প্রবল অবিশ্বাস ও হিংসার গন্ধ! ভাবা যায়! একটা লোকখমাত্র একটা লোক সব ছারখার করে দিল। কলকাতার প্রাণ, বিশ্বাস, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব-সব...!

অধিরাজের মোবাইল আবার বেজে উঠেছে। সে এবার সভয়ে বলল, "প্রণবেশদা...।"

"লাউড স্পিকারে দাও রাজা।"

পবিত্র-র বলার দরকার ছিল না। অধিরাজ ফোনটা রিসিভ করেই লাউডস্পিকারে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলে, "হ্যাঁ। বলুন।"

ওপ্রান্ত থেকে প্রণবেশ লাহিড়ীর উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসে, "রাজা, এটা শোনো।" তিনি কথা শেষ করতে-না করতেই ব্যাকগ্রাউণ্ডে একটা তীব্র শিস শোনা গেল। অর্ণবের গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। পবিত্র-র মনে হল তার শিরায় শিরায় বরফের স্রোত বইছে! এ সেই বিখ্যাত হন্টিং টিউন! গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই কে যেন মহা উল্লাসে ভয়াল শিস্ দিয়ে চলেছে। 'অনজান হ্যায় কোই'তে যেখানে সুরটা তীক্ষ্ণ হয়ে চড়ার দিকে উঠছে সেখানে ভয়াবহ গা ছমছমে অনুভূতি। লোকটা ওখানে পৌঁছে গিয়েছে। এবং সগর্বে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

"শা-লা!" অধিরাজ দাঁতে দাঁত পিষল, "লোকটা কোথায় প্রণবেশদা?"

প্রণবেশ লাহিড়ী ঘড়ঘড় করে ওঠেন, "লোকটা কোথায় জানলে ও মাল সিটি মারার জন্য এতক্ষণ বেঁচে থাকত না। ওরই সিটি বাজিয়ে ছাড়তাম। প্রবলেন ওটাই। আমি বা আমার টিমের কেউ খানকির ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু এই নিয়ে পাঁচবার এই একই সিটি শুনতে পেলাম।"

"কোন্ দিকে বাজছে বুঝতে পারছেন?"

"ওটা আরও বড়ো প্রবলেম।" প্রণবেশের গলায় বিরক্তি, "কখনও শ্লা ডানদিকে মনে হচ্ছে, কখনও বাঁ-দিকে। কখনও একদম কাছে বাজছে। কখনও দূরে। দূরে বাজতে বাজতে কাছে আসছে। আবার কাছে বাজতে বাজতে দূরে যাচ্ছে। যেন ব্যাটা শিস ভাঁজতে ভাঁজতে পায়চারি করছে। কিন্তু কেউ যদি সিটি বাজায়, তাও এত কাছে, তবে অন্তত চোখে তো দেখতে পাবো। আমাদের সামনে এত ভিড়ও নেই যে একটা লোক হুইসল দিতে দিতে হেঁটে যাচ্ছে, পায়চারি করছে অথচ কেউ দেখবে না!"

“আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?”

“হসপিটালের মেইন এন্ট্রান্সের সামনে।”

“ওখানে আর কোনো ঢোকার রাস্তা আছে?”

“এমার্জেন্সি একটা এক্সিট আছে ঠিকই। ফায়ার এক্সিট যাকে বলে। কিন্তু ওখান দিয়ে ঢুকতে গেলে পুলিশ কুকুর ওকে খেয়ে ফেলবে। ও মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে মারতে বা সরাতে পারে। সেইজন্য আমি সঙ্গে ফেরোশাস হিসাবে কুখ্যাত কুকুর 'ফ্যাং'কেও নিয়ে এসেছি। ও কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে ওই গেটেই দাঁড়িয়ে আছে। একটু এদিক ওদিক করে দেখুক। হাড়গোড় সব চিবিয়ে ফেলবে।”

“আশেপাশে কোনো বয়স্ক মানুষ, শিখ বা সন্দেহজনক কাউকে দেখছেন?”

“সব পেশেন্ট পার্টি বলেই মনে হয়। পাগড়ি তো দেখছি না। বুড়োবুড়ি অবশ্য আছে। কিন্তু সে তো একাধিক।”

“আচ্ছা।”

তখনও প্রণবেশের কণ্ঠস্বরের ব্যাকগ্রাউণ্ডে সুরটা শোনা যাচ্ছিল। জোরালো সিটি বাজতে বাজতেই আচমকা মাঝপথে খুব আস্তে হয়ে গিয়েছে। তারপরই ফের তার জোর বেড়ে যায়। অধিরাজের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। শিসের মাঝখানে হঠাৎ অমন ছেদ পড়ল কেন? যে সুর ভাঁজছিল, তার দম শেষ হয়ে গিয়েছে? কিন্তু তাহলে পরের মুহূর্তেই অত জোর এল কোথা থেকে? দম নিতেও তো ন্যূনতম সময় লাগে।

“প্রণবেশদা...।” সে উত্তেজিত স্বরে বলে, “যা বলছি খুব মন দিয়ে শুনুন। লাইনটা কাটবেন না। ব্লু টুথে কানেক্ট করে রাখুন। ওখানে লোকজনের ভিড় তেমন নেই বলছিলেন। একটা রাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে পারবেন?”

“ব্ল্যাঙ্ক কেন?” তিনি অসন্তুষ্ট, “একবার হুইস্লধারীকে দেখতে পেলে আসল ফায়ারই করব। আমার হাফ সেঞ্চুরি হয়ে যায়।”

লোকটা কিছুতেই শুধরোবে না। অধিরাজ বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকায়, “আসল ফায়ার পরে করবেন। আমি ডামি ফায়ার বা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে বলছি। ব্ল্যাঙ্ক কার্ট্রিজ আছে?”

“আছে।”

“তবে ওটাই ফায়ার করুন।” সে আবার রিপিট করল, “কিন্তু লাইন কাটবেন না।”

“হসপিটালের সামনে এমনি এমনি দুমদাম ফায়ার করব?” তিনি গরগর করেন, “তারপর মিডিয়া এসে ক্যাঁচাল করবে ‘গুলি কেন চালিয়েছেন’? ‘ফায়ার করার মানে কী? পেশেন্ট পার্টিকে ভয় দেখাচ্ছেন কেন? এটা কি দিওয়ালি না আপনার শালার বিয়ে যে ক্যাপ বন্দুক ফাটাচ্ছেন?' মামাবাড়ির আবদার জুড়ে কান এঁটো করে দেবে ইয়েগুলো...!”

অধিরাজ ভ্রূ-ভঙ্গি করে, “আপনি কবে থেকে মিডিয়ার তোয়াক্কা করছেন? তেমন হলে বলে দেবেন এডিজি সেনের অর্ডার। এমার্জেন্সি ছিল।”

“বেশ।”

প্রণবেশের গলা কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হল। কয়েকটা অস্থির মুহূর্ত। পরক্ষণেই প্রচণ্ড জোরে ফায়ারিং-এর আওয়াজ। অধিরাজ, অর্ণব, পবিত্র বা টুইঙ্কলের বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে ওটা ব্ল্যাঙ্ক রাউন্ড ফায়ারই বটে। তারা ফায়ারিং-এর আওয়াজ শুনে অভ্যস্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে পার্থক্য বোঝা সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ভয়ার্ত চেঁচামেচি, শোরগোল ও দৌড়াদৌড়ির শব্দ ভেসে এল ফোনের ওপ্রান্ত থেকে শিসের সুর তখনও অব্যাহত! কী আশ্চর্য! লোকটা একটুও ভয় পায়নি। এখনও আরামসে সিটি দিয়ে চলেছে!

“প্রণবেশদা।” অধিরাজের চোখ দুটো দপ করে জ্বলে ওঠে, “আপনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। পৃথিবী উলটে গেলেও আপনি আপনার টিম সহ ওখান থেকে নড়বেন না। বার্নিং শিখ ওখানেই আপনার চোখের সামনে আছে। কিন্তু এই হুইসল সে আদৌ বাজাচ্ছে না।”

“হুইসল সে বাজাচ্ছে না মানে? তার হয়ে অন্য কেউ প্রক্সি দিচ্ছে বলছ?”

"কেউ প্রক্সি দিচ্ছে না।" সে বুঝিয়ে বলল, "আদতে কোনো মানুষই সিটি বাজাচ্ছে না। এটা রেকর্ডেড। যদি লাইভ কেউ বাজাত, তবে আপনার ফায়ারিং-এর জোরালো শব্দে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুম্ করে থেমে যেত। যত সাহসী লোকই হোক না কেন, এটা সাধারণ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। আমরা ফায়ারিং-এর আওয়াজ শুনে সিজন্ড। তাও কথা বলতে বলতেই কানের কাছে যদি জোরালো কোনো শব্দ- যেমন গাড়ির টায়ার বার্স্ট বা ব্লাঙ্ক ফায়ারের আওয়াজও পাই, তবে আমরাও কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ হয়ে যাই। কিন্তু অত জোরে ফায়ারিং-এর শব্দেও শিসটা একটুও থামল না। অথচ একটু আগেই বিনা কারণে একদম হালকা হয়ে এসেছিল। এটা কোনো মানুষের আওয়াজই নয়। সাউন্ডটা পুরো রেকর্ডেড। সম্ভবত কারোর বুকপকেটে মোবাইলে বাজছে। মোবাইলে নোটিফিকেশন বা মেসেজ এলে অনেক সময় সাউন্ড হালকা হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অথচ ফায়ারের সাউন্ডেও থেমে যায়নি। ও আপনাকে মিসলিড করছে। চাইছে আপনি ওই সাউন্ডটা খুঁজুন, তার পেছনে দৌড়ান ও মিসগাইডেড হয়ে যান। বুঝেছে যে 'ফ্যাংকে বোকা বানানো যাবে না। ওদিকে আপনাকে টপকেও হসপিটালে ঢুকতে পারছে না। তাই নাকের সামনে রাঙা মুলো ঝোলাচ্ছে। আপনি সেটা হতেই দেবেন না। যা-ই ঘটুক একদম ঠায় নিজের পজিশনেই দাঁড়িয়ে থাকুন। আমরা আসছি।"

"ওকে। গট ইট।"

ফোনটা কেটে দিয়েই অধিরাজ শশব্যস্তে পবিত্র-কে বলে, "ফুল স্পিড নাও। হসপিটালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছোতে হবে। ও পাবলিক ওখানেই আছে। কিছু করার চেষ্টা ও নিশ্চয়ই করবে। তার আগেই পৌঁছোনো দরকার।"

"ফের ওয়ার্ডবয় হয়ে ঢুকবে বলছ? ফাঁকা সিরিঞ্জ বা লেথাল ইঞ্জেকশন?"

পবিত্র-র কথায় মাথা নাড়ল সে, "না। ওই পাঁয়তাড়া ফ্লপ। এখন শিফট চেঞ্জ হওয়ার সময় নয়। ওয়ার্ডবয়ের ড্রেস বা আইডেন্টিটি কার্ড এখন ওর কাছে নেই। সিরিঞ্জ অবধি পৌঁছোতে পারবে না। মরিয়া হয়ে একটা কাজই করতে পারে।"

"কী?"

টুইঙ্কল অরোরা রুদ্ধশ্বাসে জানতে চায়, "চাকু বা বন্দুক?"

"১৯৮৪'-র শিখ রায়টে বন্দুক ইউজ হয়নি সেনোরিটা। চাকু অবশ্য ইউজ হয়েছিল। কিন্তু সেসব নিয়ে আই সি ইউ-র ভেতরে ঢুকতেও পারবে না। লোকটা উন্মাদ; কিন্তু সেয়ানা পাগল। ও সেটাই করবে যা অলরেডি করে দেখিয়েছে। আর সেটা আই সি ইউ'র বাইরে থেকেও করা যায়।"

"মানে...!"

পবিত্র-র বাচালতাও যেন লোপ পেল। অর্ণব শ্বাস টেনে বলল, "আগুন?"

"ওই একটা অস্ত্রই আছে অর্ণব যেটা ও ইউজ করতে পারে।" অধিরাজ আত্মমগ্নস্বরে বলে, "১৯৮৪ সালের অ্যান্টি শিখ রায়টে বন্দুক, রাইফেল ইউজ হয়নি। কিন্তু শিখদের কলোনি, ব্লকগুলোকে সব কিলোদরে পুড়িয়েছিল 'মব্'। এমনকি 'এইমস' বা 'সফদরজঙ্গ' হসপিটালে শিখরা আশ্রয় নিয়েছে জানতে পেরে তারা গোটা হসপিটালকেই ভাঙচুর আর আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করেছিল। যদিও শেষপর্যন্ত তেমন সর্বনাশ হয়নি। হসপিটাল কর্তৃপক্ষ শিখদের আশ্রয় দেয়নি। এমনকী তাদের চিকিৎসাও করেনি। যা-ই হোক, ওই রায়টে আগুনের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। আর বার্নিং শিখের প্যাটার্ন হুবহু ওই রায়টকেই ফলো করছে। তাই হসপিটালে আগুন লাগার সম্ভাবনাই বেশি।"

"কয়েকটা লোককে মারার জন্য গোটা হাসপাতালেই আগুন ধরাবে! ওখানে তো কয়েকশো পেশেন্ট...!" পবিত্র শিউরে ওঠে, "এ কী ধরনের পাগলামি!"

"আজ একজন এরকম পাগলামি করছে। ১৯৮৪ সালের ওই বাহাত্তর ঘণ্টা হাজার হাজার লোক এই পাগলামি করেছিল পবিত্র। এবং সেটাকেই 'ন্যায়' হিসাবে সাপোর্ট করেছিল সবাই। কত হাজার শিখ পুড়ে মরেছে, কত হাজার ঘর, কত কলোনি জ্বলেছে, তার ইয়ত্তা

নেই। সরকারি ফাইলে মৃত্যুর যে সংখ্যাটা আছে, সেটাও নেহাতই আই ওয়াশ! দিল্লির সমস্ত গুরুদ্বারা শিখদের সমেত পুড়েছিল। ব্লকের পর ব্লক জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা। পোড়া, কাটা শবদেহের ভিড়ে গলির মধ্যে পা ফেলার জায়গা ছিল না।" সে একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "আজ ও অবিকল সেই কাজটাই করছে। আর ওকে এই কাজটা ১৯৮৪ সালের দাঙ্গা শিখিয়ে দিয়েছে! প্যাটার্ন একদম সেম!"

"তুমি এত কথা জানছ কী করে? লোকটাকে বুঝছই-বা কী করে?" পবিত্র বলে, "১৯৮৪ সালে তোমার জন্ম হওয়া তো দূর, আমার জন্মও হয়নি। এডিজি সেনও বোধহয় বড়োজোর টিন বাজাচ্ছিলেন। অবশ্য যদি তুমি পূর্বজন্মে শিখ হয়ে থাকো, আর ওই দাঙ্গাতেই পটল তুলে থাকো, তাহলে কিছু বলার নেই। আমি জাতিস্মরদের থেকে দূরে থাকতেই চাই।"

"এসব জানার জন্য জাতিস্মর হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু একটু কৌতূহল আর পড়াশোনা থাকলেই হয়। যখন বার্নিং শিখের তাণ্ডব অন্যান্য শহরে চলছিল, তখনই আমি কৌতূহলবশতই একটু রিসার্চ চালাচ্ছিলাম। যেখানে দুটো গুলি মারলেই গল্প শেষ হয়, সেখানে কেন লোকটা এত কষ্ট করে নেকলেসিং করছে, তরোয়ালের মতো ব্যাকডেটেড জিনিস ইউজ করছে, কেন তার অমন অদ্ভুত পৈশাচিক ছদ্মবেশ, এইসব প্রশ্নই মনে আসছিল। তখনই সঞ্জয় সুরির **'নাইন্টিন এইট্টি ফোর, দ্য অ্যান্টি শিখ ভায়োলেন্স অ্যান্ড আফটার'** বইটা পড়ি। তারপর বিক্রম কাপুরের সম্পাদনায় 'নাইন্টিন এইট্টি ফোর, ইন মেমোরি অ্যান্ড ইম্যাজিনেশন', পাভ সিং-এর 'নাইন্টিন এইট্টি ফোর, ইন্ডিয়াজ গিলটি সিক্রেট', জর্নেল সিং-এর 'আই অ্যাকিউজ...', মনোজ মিত্তা আর এইচ এস ফুলকা'র 'হোয়েন এ ট্রি শুক ডেলহি', সনম সুতিরথ ওয়াজিরের 'দ্য কৌরস্ অব নাইন্টিন এইট্টি ফোর, দ্য আনটোল্ড, আনহার্ড স্টোরিজ অব শিখ ওমেন', ইশমিত কৌর চৌধুরির 'ব্ল্যাক নভেম্বর', নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'শিখস্ দ্য আনটোল্ড অ্যাগোনি অফ নাইন্টিন এইট্টি ফোর, সরবপ্রীত সিং এর 'নাইট অফ দ্য রেস্টলেস স্পিরিটস'-এর মতো অজস্র বই পড়েছি। বেশিরভাগ নামই নিতে পারলাম না, কারণ পুরো লিস্ট দিলে সেটা মহাভারতের থেকেও বড়ো মহাকাব্য হয়ে যাবে। তার মধ্যে অর্ধেক বই আবার ব্যান্ড! কী করে যে পড়েছি তা আমিই জানি। এখানে নিজের প্রভাবটা কাজে লেগেছে আর কী।" সে চুপ করে থেকে বলে, "শুধু তাই নয়, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দ্য হিন্দু, হিন্দুস্থান টাইমস্, দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে অমর উজালা, দৈনিক জাগরণ, নবভারত টাইম্স, পঞ্জাব কেসরী, রাজস্থান পত্রিকা, দ্য স্টেটসম্যান, দ্য ট্রিবিউন, দৈনিক ভাস্কর, আনন্দবাজার পত্রিকা অবধি যত নিউজপেপার নিউজগুলোকে কভার করছিল, তাদের ওই বাহাত্তর ঘণ্টার প্রত্যেকটা প্রতিবেদন লাইব্রেরি, আর্কাইভ থেকে বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। থার্টি ফার্স্ট অক্টোবরের মতো ফিল্ম, এবিপি নিউজের 'দর্পকে চৌত্রিস সাল', 'যব জলি থি দিল্লি', এবিপি লাইভের টিভি সিরিজ, শেখর কাপুরের 'প্রধানমন্ত্রী', ফার্স্টপোস্টের ডকুফিচার, বিবিসি নিউজের 'দ্য নাইন্টিন এইট্টিফোর রায়টস্', দিল্লি তকের ডকুমেন্টারি, এন ডি টিভির 'দ্য হরর দ্যাট স্টিল হন্টস্', 'ফরগটেন চ্যাপ্টার?' ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এইচ এস ফুলকার ইন্টারভিউ, সঙ্গত টেলিভিশনের 'নাইন্টিন এইট্টি ফোর শিখ জেনোসাইড ডকুমেন্টারি' থেকে যত ডকুমেন্টারি এমনি পেয়েছি, রাজীব গান্ধীর স্পিচ থেকে সমস্ত আসল ফুটেজ, যত ফিল্ম এখনও পর্যন্ত হয়েছে, সব দেখেছি। নানাবতি কমিশন, কপুর মিত্তল কমিটির রিপোর্ট, সজ্জনকুমার এবং অন্যান্য নেতাদের কোর্ট কেসের সমস্ত নথি, ক্লাসিফায়েড ফাইল, ব্যান্ড ফিল্ম-ডকুফিচার, ব্যান্ড জার্নাল, খুশবন্ত সিং এর লেখা, মনমোহনবীর সিং তলোয়ারের এফিডেবিট, কেস ফাইল, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান-ইন্টারভিউ কিচ্ছু ছাড়িনি। এই সব কিছুর মূলে যে ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর সম্পর্কেও যতখানি জানা সম্ভব, জেনেছি। তাই সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে আছে।"

"সব প্রশ্নের উত্তর তুমি জানো?"

"হ্যাঁ।" সে একটু বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে, "ওর মনের অবস্থা, অবসেশনগুলো অন্তত

বুঝতে পারি। ওর প্যাটার্ন, মোডাস অপারেন্ডিও একদম স্পষ্ট। ওই বাহাত্তর ঘণ্টা দিল্লিতে কী হয়েছিল তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না। লোকটা শয়তান, রাক্ষস, দানব-সব হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে কপালপোড়াও বটে।"

"হ্যাঁ, সেইজন্য এখন অন্যের কপাল পোড়াচ্ছে। গ্যালন গ্যালন তেল দিয়ে।" পবিত্র ড্রাইভ করতে করতেই জিজ্ঞাসা করে, "কিন্তু তুমি বুঝলে কী করে যে শিসের আওয়াজটা রেকর্ডেড? এমনও তো হতে পারে যে লোকটা ফায়ারিং সাউন্ডটা শুনেও শিস্ দেওয়া বন্ধ করেনি।"

"তোমার মনে হয়- তা হতে পারে?"

"এমন কী অসম্ভব ব্যাপার? ও যা ডেঞ্জারাস টাইপের ডেসপারেট লোক, একটা ফায়ারিং-এর আওয়াজও হয়তো ওকে থামাতে পারেনি। হয়তো...।"

আকস্মিক একটা জোরালো 'ক্রিং ক্রিং' শব্দে পবিত্র নিজেই কথাটা বলতে বলতে ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেল। অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে দেখে অধিরাজ মোবাইলটা তুলে দেখায়। সে নিজের ফোনেই একটা রিং বাজাচ্ছিল। আঙুল তুলে বলল, 'তুমিও তো একজন ডেঞ্জারাস ডেসপারেট কপ্। ওর যা অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশি গান ফায়ারিং, ব্লাস্ট, বম্বের ধামাকা শুনে অভ্যস্ত। এটা তো জাস্ট নিরীহ একটা ফোন রিং। তবে তুমি ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেলে কেন?"

সে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মাথা ঝাঁকায়, "বুঝলাম। এর পেছনে ডেয়ার ডেভিল, ডেসপারেট বা ডেঞ্জারাস হওয়ার কোনো ফান্ডা নেই। এটা মানুষের স্বাভাবিক রি-অ্যাকশন।"

অধিরাজ ঘড়ি দেখছে, "বুঝে ধন্য করেছ। এবার টপ গিয়ারে চালাও প্লিজ। আমরা লোকেশন থেকে বেশি দূরে নেই। আমাদের যত তাড়াতাড়ি হোক পৌঁছোতে হবে। অন্য কেউ হলে চাপ ছিল না। কিন্তু প্রণবেশদার ধৈর্যের ওপর আমার বিশেষ আস্থা নেই। লোকটা ওঁকে প্রোভোক করছে। উনি কখনো-না কখনো ঠিক অধৈর্য হয়ে শিসের মালিককে গুলি করতে তেড়ে যাবেনই। আর ওটাই ও চাইছে...!"

কথাটা মুখ থেকে খসাতে-না খসাতেই আবার ফোন বেজে উঠেছে। আবার প্রণবেশ লাহিড়ী। এবার ভিডিও কল। এমন কী হল যে ভদ্রলোক ভিডিও কল করছেন? অধিরাজ উদ্বেগে কাঁটা হয়ে কল রিসিভ করে, "হ্যাঁ প্রণবেশদা...।"

অন্যদিক দিয়ে প্রণবেশের গর্জন ভেসে আসে, "ওই দেখো, হারামজাদা আমার সামনে...!"

কথাটা বলার প্রয়োজন ছিল না। ক্যামেরাটা ঘোরানোই ছিল। অধিরাজের মোবাইলে তখন বার্নিং শিখের লাইভ ফুটেজ ভেসে উঠেছে। সেই এক বেশভূষা, এক ভয়ংকর মুখ। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত। সেলাই করা ঠোঁট। প্রণবেশের সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত রেখে অবলীলায় শিস দিচ্ছে, গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই... 1

আশেপাশের মানুষজন আগেই ফায়ারিং-এর আওয়াজ শুনে বোধহয় পালিয়ে গিয়েছিল। কারণ বার্নিং শিখের ধারে কাছে কেউ নেই। সে একাই দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। মুখে ভয়ের কোনো ছাপ নেই। বাইরে শীতের রাতের অন্ধকার থাকলেও সম্ভবত হসপিটালের গেটের সামনে জোরালো আলোর বন্দোবস্ত আছে। তাই লোকটাকে একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখে অর্ণব এক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল। একে তো রাতের প্রেক্ষাপটে ওইরকম ভয়াবহ চেহারা! সেই 'আনক্যানি' শিরশিরে হুইসল। তার ওপর সে মানুষটার ঔদ্ধত্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রণবেশ লাহিড়ী হাতের কাছে বার্নিং শিখকে পেয়ে নির্ঘাৎ জপমালা নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। এতক্ষণে ওঁর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র উঠে আসার কথা। কিন্তু গানপয়েন্টে দাঁড়িয়েও শিকারের কোনোরকম হেলদোল নেই। সে খুচখুচ করে মাথা চুলকোচ্ছে। আর নিজের কৃতিত্বে বেজায় খুশি হয়ে আপনমনেই সুর ভাঁজছে, "গুমনাম হ্যায় কোই...।"

ভিডিও কলের মধ্যেই শোনা গেল প্রণবেশের বাজখাঁই গলার হুঙ্কার, "চো-প্-স্না! আজ তোর খেল খতম্...!"

এ পাশ থেকে অধিরাজ প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওঠে, "নো.....না... নো...নো। প্রণবেশদা...ডোন্ট ডু দিস্... ....ইটস্ আ ট্র্যাপ...।"

কে শোনে কার কথা! যিনি এনকাউন্টারের সংখ্যা গুণতে ওস্তাদ তিনি ফাঁদের তোয়াক্কা করবেন? মুহূর্তের মধ্যে শোনা গেল ফায়ারিং-এর শব্দ। কিন্তু এবার ব্ল্যাঙ্ক নয়! আসল ফায়ার। তবে বার্নিং শিখ বোধহয় রেডিই ছিল। সার্ভিস গান তাকে লক্ষ করে গর্জে ওঠার আগেই সে পেছন ফিরে দৌড় মেরেছে। যাকে বলে পিটটান দেওয়া প্রণবেশ লাহিড়ীও অত সহজে ছাড়ার লোক নন্। তিনি এবং তাঁর জুনিয়র অফিসাররাও দুড়দাড় করে বার্নিং শিখের পেছনে ধাওয়া করেছেন। তাঁদের দেখতে না পেলেও একাধিক বুটজুতোর ধপাধপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মোবাইলের ক্যামেরাও সমানতালে লাফাচ্ছে-ঝাঁপাচ্ছে, কাঁপছে।

"প্রণবেশদা...!" সে কাতর কণ্ঠে বলল, "ওর পেছনে যাবেন না। হোল্ড দ্যাট পজিশন। শুনছেন আপনি? ডোন্ট শ্যুট... ডোন্ট শ্যুট.... ডোন্ট চেজ হিম....।" প্রণবেশ কিছু শুনলেন কিনা কে জানে। তাঁর চিৎকার ভেসে এল, "স্ট-প! দাঁড়া বলছি।"

পরক্ষণেই প্রচণ্ড ফায়ারিং-এর আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। লাইনও কেটে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তিনি নিজেই কাটলেন, না দৌড়োদৌড়ি লাফালাফির চোটে কেটে গেল কে জানে। শুধু এইটুকু বোঝা গেল যে প্রণবেশ আপাতত হাফ সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছেন। তাঁর স্কোরবোর্ড আটকানোর সাধ্য কারোর নেই। "হে-ল্!"

নিষ্ফল আক্রোশে, রাগের মাথায় হাতের মোবাইলটাকেই গাড়ির মেঝেতে সবলে আছাড় মারল অধিরাজ। ফোনটা দড়াম করে পড়ল গাড়ির মেঝেতে। তবে বিশেষ ক্ষতি হয়নি। অর্ণব আর পবিত্র আগে এমন দৃশ্য অনেকবার দেখেছে। তাই ওদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু টুইঙ্কল হাঁ। অধিরাজের বন্য রাগ সে এই প্রথমবার দেখছে! অবাক হয়ে বলল, "স্যার, লাহিড়ীস্যার তো ঠিকই করছেন। চোখের সামনে বার্নিং শিখকে দেখে কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন? পুলিশ ওকে শ্যুট না করে সারেন্ডার করতে বলেছিল। তার 'নতিজা' কী হয়েছে তা আমরা দেখেছি...!"

তার মুখে ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু। সজোরে শ্বাস টানতে টানতে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "মিস্ অরোরা, ওই ঘটনাটা যে ঘটিয়েছে সে আসল বার্নিং শিখ। কিন্তু যার পেছনে এই মুহূর্তে প্রণবেশদা ও ওঁর টিম দৌড়চ্ছেন, সে আদৌ বার্নিং শিখই নয়! ওর বারো নম্বর অবতার! যাকে ওই একই ড্রেস আর মেক-আপে সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আবার ফলস্ খেলেছে।"

"ফলস্!" টুইঙ্কলের চোখে বিস্ময়, "বুঝলেন কী করে?"

"লোকটা শিস দিতে দিতে মাথা চুলকাচ্ছিল। কোনো শিখকে আমি আজ পর্যন্ত পাগড়ি পরা অবস্থায় মাথা চুলকাতে দেখিনি। ও চুলকোচ্ছিল তার একটাই কারণ, পাগড়ি পরার অভ্যাসই ওর নেই। তাই আনইজি ফিল করছে। বার্নিং শিখ কখনও এটা করবে না। সে একজন শিখ। জানে যে পাগড়িসুদ্ধ মাথা চুলকাতে গিয়ে পাগড়ি খুলে যেতে পারে, সরে যেতে পারে। যেটা ওর ধর্মের অপমান।"

এতক্ষণে টুইঙ্কল ব্যাপারটা বুঝল। সে ইতিবাচক মাথা নাড়ে, "সহি! পাগড়িকে কেউ ছেড়ছাড় করে না। এ ব্যাটা শিখই নয়।"

"তাছাড়া ওর চোখ দেখলেই চেনা যায়।" অধিরাজের গলা কাঁপছে, "পুলিশ আর মব্ খামোখাই কতগুলো নির্দোষ মানুষকে মারল। তারা যদি সামনের বার্নিং শিখের চোখের দিকে তাকাত তাহলেই ফারাকটা বুঝত। একটা মানুষ সব লুকোতে পারে। শুধু চোখ ও চোখের দৃষ্টি নয়!"

"কিন্তু স্যার...।" অর্ণব এতক্ষণে মুখ খোলে, "ওর তো একটা চোখ নেই।"

"দুটোই আছে। ওটা দুরন্ত মেক-আপ। একটা চোখ দেখা যায় না, মুখোশের আড়ালে থাকে। কিন্তু আর একটা চোখ তো দেখা যায়। সেটা কখনও মন দিয়ে দেখেছ?" সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে বলে, "ওর ওই চোখটায় যেন আগুন জ্বলে। অন্য মেক-আপে ওটা

হয় না। যেই বার্নিং শিখের গেট-আপে আসে, সম্ভবত সেই মুহূর্তেই তার ওই উনিশশো চুরাশির হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ে যায়। নিজের স্বজনদের কীভাবে মরতে দেখেছে, ওই পাগড়ি কীভাবে জ্বলতে বা কাটতে দেখেছে সেসব ওর চোখের সামনে ভাসে। সেইজন্য ওর চাউনিটাও ভয়াবহ। কিন্তু যে লোকটা প্রণবেশদার সামনে দাঁড়িয়েছিল তার চোখ আমি দেখতে পেয়েছি। একদম শান্ত, নিরুত্তাপ ও ভাসাভাসা দৃষ্টি। ওটা কিছুতেই বার্নিং শিখের চোখ নয়। হতেই পারে না।”

অর্ণবের হৃৎপিণ্ড বুঝি কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্থির হয়ে গেল, “তার মানে হুইস্লের ইশারার টোপে যখন লাহিড়ী স্যার গেট থেকে নড়লেন না, তখন বার্নিং শিখের আর একটা রেপ্লিকাকে ওঁর নাকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল।”

“এগজ্যাক্টলি। ও জাস্ট আরও একটা টোপ।” সিটের ওপর সজোরে চাপড় মারল অধিরাজ, “আর এই মুহূর্তে ওই নকল লোকটাকেই খ্যাপা মোষের মতো তাড়া করছেন প্রণবেশদা আর ওঁর টিম। লোকটা পুরো টিমটাকেই নিজের পেছনে ছুটিয়ে ওদের অন্যদিকে সরিয়ে দিল। এখন হসপিটালের গেট ফাঁকা। আর আমার ধারণা, বার্নিং শিখ এখন ওই রূপে নেই। অন্য কোনো ছদ্মবেশে আছে। ওয়ার্ডবয় বা সিস্টারের ছদ্মবেশের দরকার নেই, জেনারেল যে কোনো চেহারা হলেই চলবে। আই সি ইউ আর তার টার্গেটই নয়। সে হসপিটালের ইলেক্ট্রিসিটি রুম বা মেইন পাওয়ার রুমটাই এবার খুঁজবে! স্রেফ যে-কোনোভাবে শর্ট সার্কিট করতে পারলেই কেল্লা ফতে। আমরা যদি সময়মতো গিয়ে না পৌঁছোতে পারি, তবে লোকটা স্রেফ ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে বেরিয়ে যাবে! পি সি চৌধুরীর পরিবারকে তো বাদ দাও, কতজন অসহায় পেশেন্ট পুড়ে বা নিঃশ্বাস নিতে না পেরে বিষাক্ত ধোঁয়ায় মরবে তার ঠিক নেই। মরার জন্য সবসময় আগুনের প্রয়োজন নেই। আই সি ইউ তে ভেন্টিলেটর, এসি চলে। বাইরের হাওয়া ঢোকে না। এসি ডাক্টের মাধ্যমে কার্বন মনোক্সাইড ঢুকলেই সব শেষ...! ”

“কেউ মরবে না।”

অনমনীয় সংকল্পে, প্রচণ্ড জেদে পবিত্র গাড়ির গতিবেগ বাড়ায়। তার চোয়াল শক্ত। অ্যাকসিলেটরের ওপর চাপ ক্রমাগতই বাড়ছে। পিচের রাস্তা দিয়ে ফুল স্পিডে ওদের গাড়ি এগোল হসপিটালের দিকে। খোলা জানলা দিয়ে হিমেল হাওয়া ফের ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেখে অর্ণব দ্রুত গাড়ির কাচ তুলে দেয়। টুইঙ্কল অরোরা কী করবে বুঝতে না পেরে টেনশনে ফের একটা জবরদস্ত চুরুট মুখে দিয়ে নিজের দেশলাই বা লাইটারটা খুঁজছিল। কোনো কারণে উত্তেজিত হয়ে গেলে সে আর লাইটার খুঁজেই পায় না। অগত্যা অধিরাজই সেটা লক্ষ করে সসম্মানে ফের তার সিগারটাতে অগ্নিসংযোগ করে দিয়েছে। টুইঙ্কল একটু লজ্জিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে ফের নম্রভাবে বাও করে বলল, “হেইল সেনোরিটা।”

কথাটা বলেই নিজেও অন্যমনস্কভাবে বুক পকেট হাতড়াচ্ছে। অস্থিরভাবে আবার ধূমপানের তাল করছে। অর্ণব মৃদুস্বরে বলল, “ড্যাশবোর্ডে রেখেছেন।”

“থ্যাংকস অর্ণব।”

অধিরাজ আর একটাও কথা না বলে ফের ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেটটা তুলে নেয়। গাড়ির ভেতরে এখন পিনপতনের নিস্তব্ধতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। মনে মনে সকলেই প্রমাদ গুণেছে। প্রণবেশ লাহিড়ী যতক্ষণ পাহারায় ছিলেন, ততক্ষণ কোনো চিন্তা ছিল না। অনেকক্ষণ ধরেই লোকটা ওঁকে সরানোর প্ল্যান করছিল। সে প্রণবেশ লাহিড়ীর দুর্বলতা সম্পর্কে নির্ঘাত জানে। অ্যাকশন পেলে উনি আর কিছু বোঝেনই না। সঠিক, বেঠিক, কিছুই মাথায় ঢোকে না। তাই একদম মাস্টারস্ট্রোক খেলেছে। আর এক নকল বার্নিং শিখকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওঁকে তার পেছনে দৌড় করাচ্ছে। হাসপাতালের গেট এখন সম্পূর্ণ অরক্ষিত! প্রণবেশের ধারণাও নেই যে ওঁর এই ভুলটায় কত বড়ো সর্বনাশ হতে চলেছে! হসপিটালে যদি সত্যিই আগুন ধরে তবে কী জবাব দেবে ওরা! পি সি চৌধুরীর পরিবারকে

বাঁচানোর জন্য এত ঘণ্টা ধরে যে আপ্রাণ লড়াই করে চলেছে, তার কোনো মূল্য তো থাকবেই না। উলটে কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ হিসাবে এতগুলো রোগীর প্রাণ...!

মসৃণ রাস্তা বেয়ে তীব্র বেগে হু হু করে গাড়ি এগিয়ে চলল। এদিকে আপাতত আর কোথাও কোনো মারদাঙ্গা নেই। হয়তো লাগাতার এতক্ষণ মারপিট করে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কে জানে ওদিকে এডিজি সেন কী করছেন! শেষপর্যন্ত শহরকে স্তব্ধ করতে পারা যাবে কিনা তাও নেতা-নেত্রী-মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এডিজি সেন এবং বাকি উচ্চপদস্থ আই.পি.এস.-রা প্রেস কনফারেন্স ছেড়ে এখন গভর্নমেন্টের সঙ্গে দর কষাকষি চালাচ্ছেন। তাঁরা অবিলম্বে কার্ফিউ কিংবা এমার্জেন্সি জারি করতে চান। অথচ রাজনীতি আবার জনগণের ভোটব্যাঙ্কের ওপর চলে। তাই মন্ত্রকের কর্তা-ব্যক্তিরা আমতা আমতা করছেন। কিছুদিন আগেই কোভিডের ঠ্যালায় মানুষ গৃহবন্দি হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। আবার তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে সেটা শহরবাসীদের আদৌ পছন্দ হবে না। তারা সরকারের ওপর ক্ষিপ্ত হতে পারে। এডিজি সেন ও বাকিরা আপ্রাণ তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র আগামীকাল সূর্যোদয় অবধি নিলেই চলবে। জনগণের এতে রাগ হওয়া উচিত নয়, কারণ এটা তাদের নিরাপত্তার জন্যই। কিন্তু নেতা-নেত্রীরা মানবেন না। তাদের বক্তব্য, "এই কয়েকঘণ্টার জন্য এত কাণ্ড করার কী দরকার? তার চেয়ে বার্নিং শিখকেই ধরুন। প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে।"

এডিজি সেনের মেসেজ মারফত এই সংবাদ শোনার পর থেকেই আরও বেশি মাথা বোঁ বোঁ করছে অর্ণবের। সরকার কি দেখতে পায় না যে শহরে কী ঘটছে? অধিরাজ আগেই আন্দাজ করেছিল যে লোকটা ওদের ডাইভার্ট করার জন্য সবকিছু করতে পারে। কিন্তু সেটা এইভাবে! ধড়াধড় নিরীহ মানুষের লাশ ফেলে। জনগণকে খেপিয়ে তুলে। সে নিজের এতগুলো ক্লোন বানিয়ে ফেলবে তাই বা কে ভেবেছিল? তার একটা চালেই সি আই ডি কুপোকাত। এতক্ষণ ধরে শুধু গোটা শহর চষে বেরিয়ে ঘেমে নেয়ে অস্থির হল। সম্পূর্ণ একটা ক্যাওয়াস তৈরি করে অযথা ছুটিয়ে মারল। নয়তো হসপিটালে আগেই পৌঁছে যেত ওরা। আর এখন যদি ঠিক সময়ে পৌঁছোতে না পারে, তবে কী হবে!

পবিত্র গাড়িটাকে প্রায় উড়িয়েই নিয়ে চলেছে। আর মাত্র মিনিট দুয়েকের রাস্তা। অধিরাজ শুধু অধৈর্যভাবে ঘড়িই দেখছে। ওদিকে প্রণবেশ লাহিড়ীর তরফ থেকে এখনও কোনো ফোন আসেনি। ওরা ফোন করলে স্রেফ বেজে বেজে কেটে যাচ্ছে, তিনি তুলছেন না। আফসোসে অধিরাজ ঠোঁট কামড়ায়! এই ভদ্রলোক ডোবাবেন। কী হচ্ছে ওদিকে তাও ওদের জানা নেই।

দ্রুত একটা রাইট টার্ন নিতেই এবার হসপিটালটাকে নাক বরাবর পরিষ্কার দেখা গেল। কিন্তু সে দৃশ্য দেখে ওদের সকলেরই আত্মারাম খাঁচাছাড়া! বার্নিং শিখ বা গুলশন নিজের কার্যসিদ্ধি করে ফেলেছে। অধিরাজ যা ভেবেছিল, অবিকল তাই। হসপিটালের দোতলার জানলা দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়া। কম্পাউন্ডের ধারে কাছে এখনও যায়নি। অথচ ধোঁয়ার প্রাবল্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে বাতাসে পোড়া গন্ধ! যতখানি দেখা যাচ্ছিল, তাতেই চারজনের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে প্রকট হয়েছে ধূম্রদানব আর আগুনের রেখা। লোকটা সত্যিই গোটা হসপিটাল জ্বালিয়ে দিল।

"ক্র্যা-প!"

গাড়িটাকে তখনও পবিত্র গেটের ভেতরে ঢোকাতে পারেনি। তার মধ্যেই কানে এল অজস্র মানুষের বিপন্ন আর্তচিৎকার। কিছু লোক ওই জ্বলন্ত হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। তারা প্রাণের দায়ে দৌড়োচ্ছে গেটের দিকে। তাদের মধ্যে ডাক্তার, সিস্টার, ওয়ার্ডবয়রাও আছে। সারিসারি কালো মাথা পিলপিল করে বাইরের দিকে ছুটছে। আর হসপিটালের ভেতর থেকে ভেসে আসছে পরিত্রাহি আর্তনাদ—"বাঁ-চা-ও ...বাঁ-চা-ও। ...হে-ল্প!... হে-ল্প।"

অধিরাজ আর বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা না করে ওই চলন্ত গাড়ি থেকেই ভল্ট খেয়ে লাফিয়ে

পড়েছে বাইরের দিকে। টুইঙ্কল তার কাণ্ড দেখে সবিস্ময়ে বলল, "ও তেরি।" তারপর নিজেও একইরকমভাবে বাইরে ঝাঁপাল। পবিত্র সজোরে ব্রেক কষে গাড়িটাকে কোনোমতে দাঁড় করিয়ে প্রাণপণে ছোটে দু-জনের পেছন পেছন। সঙ্গে অর্ণব।

"ভেতরে যাবেন না দাদা।"

ভিড়ের মধ্য থেকেই কোনো একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "আগুন লেগেছে। শর্ট সার্কিট। আগুন হসপিটালের কিচেন অবধি পৌঁছে গেছে। যে-কোনো মুহূর্তে কিচেনও বার্স্ট করবে। প্রচুর গ্যাসের সিলিন্ডার আছে ওখানে।"

"ইলেক্ট্রিক রুম কোথায়? আর কিচেন?"

অধিরাজ দৌড়োতে দৌড়োতেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে। এবার এক ভয়ার্ত ওয়ার্ডবয় হাঁপাতে হাঁপাতে জানাল, "দুটোই ফার্স্ট ফ্লোরে।"

সে আর কথা না বাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের দিকে দৌড়োল। এই পরিস্থিতিতে কেউ লিফ্ট ব্যবহার করে না। কপালগুণে এখনও আগুনটা ফার্স্টফ্লোর ছেড়ে ওপরে ওঠেনি। ওপর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। তবে একবার কিচেন ব্লাস্ট করলে আর রক্ষে নেই। ওটাই এইমুহূর্তে সবচেয়ে অ্যালার্মিং। ওপরের ফ্লোরগুলোয় আর আই সি ইউতে আগুন এখনও পৌঁছোয়নি। কিন্তু এসি ডাক্টের মাধ্যমে এই প্রাণঘাতী কালো ধোঁয়া পৌঁছোলেও পৌঁছোতে পারে। অধিরাজ ছুটতে ছুটতেই পকেট থেকে রুমাল বের করে এদিক ওদিক তাকায়। স্টেয়ারকেসের সামনেই কপালগুণে জেন্টস ওয়াশরুম ছিল। পেছনে টুইঙ্কল, পবিত্র আর অর্ণবকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, "সবাই রুমাল ওয়াশরুম থেকে ভালো করে জলে ভিজিয়ে নাক-মুখ আটকে নাও। সময় নেই। পবিত্র, তুমি-সেনোরিটা আর অর্ণব শীগগিরিই আই সি ইউতে যাবে। ভগবান জানে, পেশেন্টদের কী অবস্থা! যদি ওখানে এখনও কিছু ওয়ার্ডবয়-ডাক্তার আর সিস্টাররা থেকে থাকেন তবে ওদের হেল্প নাও। প্রথমেই যারা ভেন্টিলেটরে, লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে আছে এবং আই সি ইউতে সিরিয়াস অবস্থায় ভরতি তাদের বের করে অ্যাম্বুলেন্সে অন্য হসপিটালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করো। আমি এখনই পাওয়ার অফ করছি না। কিন্তু একটু পরে হলেও পাওয়ার অফ করতেই হবে। তোমাদের হাতে খুব কম সময়। তার আগেই ওদের বের করো। এক্ষুনি হসপিটাল ইভ্যাকুয়েট করতে হবে। মিস্ অরোরা, ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করুন। আমি কিচেনের দিকে যাচ্ছি। ওটা ব্লাস্ট করলে আর কিছু করার নেই।"

"ইয়েস স্কিপি।"

পবিত্র ছোট্ট নড করে তাড়াতাড়ি নির্দেশ পালনে মন দেয়। ওরাশরুমের বেসিনে ওরা চারজনেই রুমাল ভালো করে ভিজিয়ে নিয়ে নাক-মুখ দ্রুত বেঁধে নিল। অধিরাজ কোনোমতে নাক মুখ বেঁধেই কিচেনের খোঁজে দৌড়োল। বাকিরা ওপরের দিকে। এই হসপিটালের গলিঘুঁজিগুলো বড়োই কনফিউজিং। কোন্‌টা যে কোনদিকে গিয়েছে তার ঠিক নেই। তার মধ্যে আবার কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চড়চড় শব্দ। ওপরের ইলেক্ট্রিকের তার থেকে স্ফুলিঙ্গ যত্রতত্র খসে খসে পড়ছে। প্লাস্টিক পোড়ার গন্ধে কাশি আসছিল। ইলেক্ট্রিক রুম থেকে আগুনের রেখা করিডর বেয়ে চলে গিয়েছে সোজা পথে। যেখানে যেখানে পর্দা, কাপড় বা অন্য কোনো দাহ্যবস্তু পেয়েছে, জ্বালিয়েছে। অধিরাজ ছুটতে ছুটতে প্রত্যেকটা রুমই ভালো করে দেখে নিচ্ছে। উত্তেজনায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এবার একটু এগোতেই শুনতে পেল ফায়ার অ্যালার্মের একটানা আওয়াজ। জেনারেল ওয়ার্ড থেকে ভয়ার্ত মানুষের একটা দল আগুনকে এড়িয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে এদিকেই আসছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মোটামুটি সুস্থ পেশেন্ট। তারা চলাফেরা করতে সক্ষম। কিন্তু ভেতর থেকে এখনও চিৎকার ভেসে আসছে, 'হেল্প! হেল্প!' যে বেচারিরা এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম নয় বা নড়াচড়া করতে পারে না, সম্ভবত সেই দুর্ভাগারাই চেঁচাচ্ছে।

"অ্যা-ই!" পলায়নপর মানুষের ভিড়ে কয়েকজন ওয়ার্ডবয়কে দেখে থমকে দাঁড়াল সে। ধমকে উঠল, "ই-উ!"

ওয়ার্ডবয়রা একজন মানুষকে ওভাবে ধমকাতে দেখে একটু থেমে যায়। তারা কিছু বলার আগেই অধিরাজ গর্জন করে ওঠে, "লজ্জা করে না? পেশেন্টদের ফেলে পালাচ্ছেন আপনারা? ওদের রক্ষা করার ডিউটি আপনাদের। কোথায় ওদের আগে বের করবেন, তা নয় আপনারাই আগে পালিয়ে যাচ্ছেন?"

"তুই বলার কে রে?" একজন পালটা রুখে দাঁড়ায়, "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

"বাপের নাম মনে করাতে হবে?"

অধিরাজ ভ্রূকুটি করল। সাহস তো কম নয়! সে এক মুহূর্ত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে পরক্ষণেই সপাটে এক চড় মারল। পুলিশের হাত হাত নয়, হাতুড়ি! তার থাপ্পড় আচ্ছা আচ্ছা ক্রিমিনালরা নিতে পারে না, এ তো একটা ওয়ার্ডবয়। লোকটা তৎক্ষণাৎ হাউ হাউ করতে করতে উলটে পড়ে।

পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে বাকিদের অবস্থাও খারাপ! চতুর্দিকে আগুন। সামনে দাঁড়ানো মানুষটার চোখেও যেন ধ্বক ধ্বক করে দাবানল জ্বলছে। ওদের মধ্যেই একজন একটু নিরীহ গোছের ছিল। সে হাতজোড় করে বলে, "স্যার, মারবেন না! এই হারামজাদাটা ভুলভাল বলে ফেলেছে। ও বুঝতে পারেনি আপনি সাধারণ লোক নন। ক্ষমা করে দিন।"

"ফাজলামোর জায়গা পায় না? আমি সাধারণ বা অসাধারণ যা-ই হই না কেন, নিজের ডিউটি করবে না? ওর মাইনের টাকাটার যোগান কমন পিপল দেয়, কোনো ভি.আই.পি. নয়।" সে এবার রুদ্রমূর্তি ধরেছে। জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ করল, "কেউ এখান থেকে পালাবে না। আগুন নেভানোর চেষ্টা চলছে। আপনারা সবাই ওয়ার্ডগুলোয় ফিরে যান। যে পেশেন্টরা এখনও বেরোতে পারেনি, তাদের বের করে নিয়ে আসুন। প্রত্যেকটা পেশেন্ট যেন জ্যান্ত অবস্থায় বাইরে যায়। যতক্ষণ না এই ফ্লোর পুরো খালি হচ্ছে, ততক্ষণ আপনারা কেউ বেরোবেন না।" অধিরাজ থেমে হিংস্রভাবে যোগ করল, "আমিও একটু পরেই ফিরে এসে হাত লাগাবো। তখন যদি দেখি কেউ মিসিং, বিলিভ মি, তার বা তাদের মাথায় বুলেট ভরে দিতে একটুও খারাপ লাগবে না আমার।"

অনেক সময় মিষ্টি কথা বা অনুরোধের চেয়ে হুমকি বেশি কাজে লাগে। ততক্ষণে কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ডও দৌড়ে এসেছে। তারা বলল, "স্যার, কেউ যাবে না। আমরা সবাইকে বের করে তবেই যাব। আপনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।"

"ফেয়ার এনাফ।" সে আর কথা বাড়ায় না, "কিচেন কোন্ দিকে?"

"সোজা গিয়ে লেফট সাইড।"

অধিরাজ আর কথাবার্তায় সময় নষ্ট না করে সোজা সেদিকেই দৌড়োল। জ্বলন্ত করিডরের ওদিকটাতেই ধোঁয়ার প্রকোপ বেশি। রীতিমতো চোখ জ্বালা করছে তার। তবে একটাই আশার কথা, এখনও কোনোরকম ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়নি। হলে আগুনের রেখা নয়, বিরাট আগ্রাসী হলকা থাকত। তাকে থামানো যেত না। নিমেষের মধ্যে সব পুড়িয়ে দিত। সচরাচর প্যান্ট্রিতেই গ্যাস সিলিন্ডারের মতো মারাত্মক জিনিস মজুত থাকে। এত বড়ো হসপিটালে তো একসঙ্গে অনেক সিলিন্ডার থাকার সম্ভাবনা। দিনরাত এখানে রান্না হচ্ছেই। যে কোনো অজ্ঞাত কারণেই হোক, আগুন এখনও গোটা কিচেনটাকে গ্রাস করতে পারেনি। কিচেনের সিলিন্ডারগুলো যদি একবার ফাটে তবে গোটা ফ্লোরটাই উড়বে। হিটিং, ভেন্টিলেশন এবং এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, তথা গোটা এইচ ভি এ সি সিস্টেমটাকেও নিয়ন্ত্রণ করে এল পি জি গ্যাসই। বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট ও লন্ড্রির বয়লারও এই গ্যাসের সাপোর্টে চলে। এছাড়াও হসপিটালে অক্সিজেন সিলিন্ডার, অক্সিজেন সাপোর্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে যা আগুনকে আরও বাড়ায়। সুতরাং গোটা হসপিটালটাই জতুগৃহে পরিণত হতে বিশেষ সময় নেবে না। সবসুদ্ধ উড়বে। একটা লোকও বাঁচবে না।

সে পড়ি কী মরি করে কিচেনে দৌড়ে গিয়ে দেখল, আগুনের শিখা একগাদা সবজি, কাঁচা বাজার পোড়ানো শেষ করে সবে দুটো সিলিন্ডারকে বেড়ে ধরেছে। বাকিগুলো এখনও সুরক্ষিত। হয়তো আলু, কপি, মাছ, মাংস মাঝখানে পড়ে তার গতিবেগকে শ্লথ করে

দিয়েছিল। তাই গ্যাস সিলিন্ডার অবধি পৌঁছোতে সময় লেগেছে। বিরাট কিচেন জনশূন্য। উনুনে এখনও অর্ধেক রান্না করা খাবার দাবার বসানো। অর্থাৎ কুক এবং অন্যান্য কর্মীরা ফায়ার অ্যালার্ম শোনামাত্রই পালিয়েছে। চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা মেথড। অথচ কেউ যদি এখানে উপস্থিত থাকত, তবে অন্তত আগুনটা নেভানোর চেষ্টা করতে পারত। সিলিন্ডারের গায়ে আগুন ধরলেও ওগুলো সিলড্ বলে এখনও ক্ষতি কিছু হয়নি। তবে ক্রমাগতই যদি তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, কিংবা অগ্নিশিখা আরও একটু ছড়িয়ে পড়ে তবে সর্বনাশ অবধারিত।

অধিরাজ আশেপাশে তাকিয়ে দেখল কোথাও কোনো ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে কিনা। প্রায় গোটা ফার্স্ট ফ্লোরই সে কভার করে এদিকে এসেছে। এত বড়ো হসপিটাল, অথচ কোথাও কোনো অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র চোখে পড়েনি। আশ্চর্য! হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম ফায়ার ফাইটিং এজেন্টগুলোও রাখার প্রয়োজন বোধ করে না! এটা সাধারণ আগুন নয়, শর্ট সার্কিটের ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার। জল ঢাললে আগুন তো নিভবেই না, উলটে বিপদ বাড়বে। এখানেই তো ফায়ার এক্সটিংগুইশারের প্রয়োজন ছিল। এমনই কপাল যে গোটা হসপিটালে একটাও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র নেই।

সে বাধ্য হয়েই নিজের গায়ের ভারি কোটটা খুলে সেটাকেই পাগলের মতো সিলিন্ডারগুলোর গায়ের আগুনের ওপর আছড়ে আছড়ে মারতে থাকে। তাতে আগুন একটু স্তিমিত হলেও চট করে নেভেনি। তবে তার ধাক্কায় ছড়িয়ে পড়তে সময় নিচ্ছে। তার রোষ প্রতিহত হচ্ছে। ভারি ব্ল্যাঙ্কেট গোছের কিছু থাকলে সবচেয়ে ভালো হত। কিন্তু এখন ব্ল্যাঙ্কেট খুঁজতে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সময় হাতে নেই। তার সন্ধানী চোখ আঁতিপাতি করে কিচেনে 'বেকিং সোডা' খুঁজছিল। হসপিটাল বা রেস্টোর‍্যান্টের কিচেনে এই পদার্থটি থাকবেই। একেই বেকিং সোডা পোটেনশিয়াল অ্যান্টাসিড। যে কোনোরকমের অ্যাসিডিক রেসিপিতে এর ব্যবহার হয়। বিশেষ করে দুগ্ধজাত দ্রব্য, ক্রিম কিংবা দইয়ের প্রিপারেশনে তার হালকা অস্তিত্ব থাকে। লেবুর শরবতেও ইউজ হয়। পাঁউরুটি বা যে-কোনো ধরনের ব্রেড তো বেকিং সোডা ছাড়া হবেই না। এছাড়াও কাঁচা বাজার, ফল পরিষ্কার করার জন্যও বেকিং সোডা লাগে। তার ওপর হসপিটাল বা রেস্টোর‍্যান্টে এতগুলো মানুষের জন্য তিনবেলার রান্না করার জন্য অনন্ত সময় থাকে না। শেফ বা কুকদের দ্রুত কাজ সারতে হয়। ডাল বা ওই জাতীয় কিছু সময়সাপেক্ষ জটিল রেসিপিতে একছিটে বেকিং সোডার প্রয়োগ করলে সেটা অনেক কমসময়ে সুসিদ্ধ ও তৈরি হয়ে যায়। আর একদম সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করলে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকে না।

তবে এটা কোনো রেসিপির ব্যাপার নয়। ইলেক্ট্রিক্যাল ফায়ার যদি তেমন ভয়ংকর বিধ্বংসী মূর্তি না ধরে তবে বেকিং সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট সে আগুন নেভাতে ওস্তাদ। বেকিং সোডা আগুনের সংস্পর্শে এসে সোডিয়াম কার্বোনেটে পরিণত হয় ও কার্বন ডাই অক্সাইড ও জল রিলিজ করে। ইলেক্ট্রিক্যাল ফায়ার অক্সিজেনের ইন্ধনে জ্বলে। কার্বন ডাই অক্সাইড তাকে স্তিমিত করে ও ব্ল্যাঙ্কেটের এফেক্ট দেয়।

আগুন অবশ্য সর্বত্রই জ্বলছে। কিন্তু অধিরাজ আপাতত অন্যদিকে মন না দিয়ে গ্যাস সিলিন্ডারগুলোকে নিয়েই পড়ল। একটু খুঁজতেই বেকিং সোডার কন্টেনার চোখে পড়ে। গোটা ফ্লোরের জন্য পর্যাপ্ত না হলেও আপাতত কাজ চলবে। সে আর বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট না করে গোটা কিচেনেই মুঠো মুঠো বেকিং সোডা ছড়াতে শুরু করেছে। একবার যদি কিচেনের আগুনটাকে নেভানো যায় তবে ইলেক্ট্রিক্যাল রুমের পাওয়ার টার্ন অফ করে দিয়ে, ফিউজগুলো খুলে নিলেই কিছুটা হয়তো রক্ষা পাওয়া যাবে। কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবে অসম্ভব নয়। অন্তত কোনোভাবে চেষ্টা তো করতে হবে। গোটা ফ্লোরের আগুন নেভানো একমাত্র ফায়ার ব্রিগেড ছাড়া কারোর একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের আসতেও খানিকটা সময় লাগবে। তাই ততক্ষণ অবধি যতখানি ঠেকানো যায়। ঠিক যেমন সে ভেবেছিল, তেমনই ঘটল। বেকিং সোডা পড়তেই কিচেনের আগুন স্তিমিত হল। তারপর

আস্তে আস্তে নিভেও গেল। সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখল এ যাত্রা গ্যাস সিলিন্ডারগুলো বেঁচে গেছে। একটাও যদি কোনোক্রমে ফাটত তবে আর দেখতে হত না! এখানে যত সিলিন্ডার আছে সব বার্স্ট করলে কেউ বাঁচবে না! আপাতত কিচেনটা তো বাঁচল। এবার ইলেক্ট্রিক রুম!

ইলেক্ট্রিক রুম বা মেইন পাওয়ার রুম আবার উলটোদিকে। অধিরাজ কিচেনটাকে সাময়িক নিরাপত্তা দিয়ে বেকিং সোডার কন্টেনার নিয়েই ইলেক্ট্রিক রুমের দিকে প্রাণপণে দৌড়োয়। সময় নেই। হাতে একদমই সময় নেই। পথে যেখানে যেখানে আগুন দেখল কোনো কথা না বাড়িয়ে বেকিং সোডা ছড়াতে শুরু করল। ততক্ষণে হুমকির ঠ্যালাতেই হোক, কিংবা মানবিকতার খাতিরে, সিকিউরিটি গার্ড আর ওয়ার্ডবয়রা পেশেন্টদের প্রায় কোলে তুলে নিয়ে নীচের দিকে দৌড়চ্ছে। কিছুটা আগুন নির্বাপিত হল ঠিকই, কিন্তু যতক্ষণ না মেইন পাওয়ার সোর্স টার্ন অফ হচ্ছে ততক্ষণ আগুন ছড়াতেই থাকবে। তাই আপাতত কিছুটা ম্যানেজ করে সে সোজা পাওয়ার রুমেই ঢুকল।

ইলেক্ট্রিক রুমের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। গোটা ঘরটাই প্রায় ফার্নেসে পরিণত হয়েছে। তারগুলো পুড়ছে, গলে গলেও পড়ছে। ব্রেকার বক্স আর খোলা ইলেক্ট্রিক্যাল বক্সের ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেলের দিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল সে। কেউ ইম্পর্ট্যান্ট তারগুলোকে কেটে লন্ডভন্ড করেছে। যেখানে সেখানে এক্সপোজড ইলেক্টিক্যাল ওয়্যার ঝুলছে। শুধু তাই নয়। কাটা তারগুলোর গা বেয়ে এখনও টপ টপ করে জলবিন্দু পড়েছে। অর্থাৎ কেউ তার ওপরে জলও ঢেলে দিয়েছে। শর্ট সার্কিট অবধারিত! “স্কাউন্ডেল!”

ইলেক্ট্রিক প্যানেল আর বক্সে তখনও আগুন জ্বলছে। এক্সপোজড তারও আছে। ওগুলোকে ছুঁতে যাওয়া তো দূর, ধারে কাছে যাওয়াও বিপজ্জনক। মুহূর্তের মধ্যে অমিত শক্তিশালী শক্ মেরে প্রাণটাই কেড়ে নিতে পারে। কিংবা আগুনও আঁকড়ে ধরতে পারে। অধিরাজ দরদর করে ঘামছে। সে একমুহূর্তের জন্য চোখ বুজল। বোধহয় সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে শেষবারের মতো ভেবে দেখল। এখানে হাত দিতে গেলে তার লাশটাও কাল বাড়িতে পৌঁছোতে পারে। অথবা এত হাজার ভোল্টের ইলেক্ট্রিসিটি শরীর বেয়ে চলে যেতে পারে যে প্রায় ভুনে যাওয়া দেহটাও শনাক্ত করতে মা-বাবার অসুবিধে হবে। কিন্তু এছাড়া আগুনকে মাত দেওয়ার আর উপায় কী? পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ না করলে আগুন থামার নামও নেবে না। যতটুকু সে নিভিয়েছে, হয়তো দ্বিগুণ উদ্যমে আবার জ্বলতে শুরু করে দেবে। এবার আরও বড়ো আকারে। স্প্রিঙ্কলার, ফায়ার এক্সটিংগ্যুইশার, কিচ্ছু নেই! ওদিকে ওয়ার্ডবয় আর সিকিউরিটি গার্ডরা, অন্য ফ্লোরে অর্ণব, টুইঙ্কল ও পবিত্ররা নিশ্চয়ই আপ্রাণ চেষ্টা করছে ইভ্যাকুয়েট করার। ওদের প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। ফায়ার ব্রিগেড এখনও এসে পৌঁছোয়নি। তার কাছে ইলেক্ট্রিসিটির সঙ্গে লড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণও নেই। বিশেষ ধরনের সেফটি গ্লাভস ছাড়া এই জ্বলন্ত প্যানেল স্পর্শ করাই মূর্খামি! অথচ এই মুর্খামিটাই তাকে জেনেবুঝে করতে হবে। অধিরাজের এই পরিস্থিতিতেও হাসি পেয়ে গেল। একেই বলে ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার!

সে অতি সাবধানে গোটা প্যানেলটাকেই দেখতে থাকে। মেইন ইলেক্ট্রিক্যাল সাপ্লাই সিস্টেমটাকে বুঝে নিতে যতটুকু সময় লাগল। পরক্ষণেই অগ্রপশ্চাৎ কিচ্ছু না ভেবে একটি বিশেষ সুইচের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। তার হাত যখন সুইচবোর্ড স্পর্শ করেছিল তখনই ফের চোখ বুজে ফেলেছিল অধিরাজ। এবার ভয়ে। তার বুকের ভেতরে উথাল-পাথাল। কপালের রগ ঘেঁষে টপ টপ করে ঘামের ফোঁটা পড়ছে। তর্জনীও ইতস্ততঃ কাঁপছে। কারণ প্লাগটা কী পরিমাণে স্ফুলিঙ্গ উগরে দিচ্ছে তা তার চোখ এড়ায়নি। আগুনে জ্বলছে। পোড়া গন্ধে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। সাক্ষাৎ মৃত্যু আবার সামনে! এটা তার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত হয়ে ওঠার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এত বড়ো একটা সিস্টেম কয়েকহাজার ভোল্ট ইলেক্ট্রিসিটি উৎপাদন করতে পারে। একবার যদি শক্ মারে... একটুও যদি গোলমাল হয়... তবে সব শেষ...!

সুইচটাকে তার আঙুল স্পর্শ করা মাত্রই ফট্ করে একটা জবরদস্ত স্পার্ক। চিড়বিড়ে আওয়াজ। অধিরাজ অনুভব করল তার সারা শরীর বুঝি ঝনঝন করে উঠেছে। অসম্ভব দ্রুত একটা যন্ত্রণাময় অনুভব তার আঙুল সুদ্ধ হাতকে ঝটকা মারল। পেশী, স্নায়ু, শিরা উপশিরাগুলোকে কেউ বুঝি মুচড়ে দিয়েছে। ভাগ্যিস, সময় থাকতেই দ্রুত আঙুল সরিয়ে নিয়েছে। নয়তো টেনে ধরত! আপাতত ঝঙ্কার ওপর দিয়েই গেল। তার ধাক্কায় পড়ে না গেলেও বেসামাল হয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়েছে। তবে এখানেই থামলেই চলবে না। ওটাকে আনপ্লাগ করাও জরুরি। তাই ঝটকাটাকে সামলে নিয়েই কোনোমতে এক টানে মেইন প্লাগটাই খুলে নিয়েছে সে। এবার আগুনও ফোঁস করে ওঠে। হাতে জোরদার ছ্যাঁকা। সে কাতরোক্তি করে ওঠে, "আঃ!"

আঙুলটা বুঝি পুড়েই গেল। কিন্তু যা করতে চেয়েছিল তা হয়েছে। গোটা পাওয়ার সাপ্লাই-ই থেমে গিয়েছে। আশেপাশের আলোগুলো সব দপ্ করে নিভে গেল। এবার সব ফিউজ খুলে দিতে হবে। এখন থামলে চলবে না... কিছুতেই না...!

হাতে ভীষণ জ্বালা। তবু সে একের পর এক প্রত্যেকটা ফিউজ খুলতে শুরু করল। বৈদ্যুতিক সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলেও যেটুকু আগুন ধরেছিল তা এখনও জ্বলছে। হাতে বারবার ছ্যাঁকা খাচ্ছে। তবু প্রত্যেকটা ফিউজ খুলে না দেওয়া অবধি শান্তি নেই। শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রেই সাবধানের মার নেই। একটা লুপ হোলও চরমতম সর্বনাশ করতে পারে।

"স্যা-র!"

প্রায় সমস্ত ফিউজ যখন খোলা হয়ে গিয়েছে তখন পেছন থেকে অর্ণবের আওয়াজ শুনতে পেল সে। অর্ণব বিচলিত স্বরে বলে, "এ কী অবস্থা! আপনি ফিউজ খোলার রিস্ক নিচ্ছেন কেন? পাওয়ার অফও কি আপনিই করেছেন? কিছু যদি হয়ে যেত....?"

"কিচ্ছু হয়নি অর্ণব।" প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে গিয়ে বলল সে, "ওপরের ফ্লোরগুলোর খবর কী? পেশেন্টরা ঠিক আছেন?"

অর্ণবের মুখ দেখলে মনে হয় বুঝি তার মুখে কেউ কালি মাখিয়ে দিয়েছে। পুরো মুখে কালিঝুলি। রুমালটাও কার্বনের গুঁড়োয় কালো! অধিরাজ নিজের মুখ দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছিল যে এই একই অবস্থা তারও। সাধারণ একটা ভিজে রুমালই তাদের কার্বন মনোক্সাইডের বিষাক্ত গ্যাসচেম্বার থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদিকে পেশেন্টদের অবস্থা কী কে জানে। তার মনের মধ্যে আশঙ্কা ফণা তুলল। অর্ণবের মুখ কার্বনে কালো হওয়ার অর্থ এসি ডাক্টের মাধ্যমে কার্বন মনোক্সাইড ওপরের ফ্লোরগুলোতেও পৌঁছেছে। পেশেন্টরা সার্ভাইভ করতে পেরেছেন তো! নাকি...

অর্ণবের মুখ ঢাকা থাকলেও চোখ দুটো হাসছে, "সবাই ঠিক আছে স্যার। ইনফ্যাক্ট আমাদের দৌড়োদৌড়ি দেখে ওয়ার্ডবয়-সিস্টার, সিকিউরিটি গার্ড আর ডাক্তাররাও হাত লাগিয়েছিল। যে ক-টা জানলা খোলা যেত, খুলে দেওয়া হয়েছে। যদিও বেশিরভাগ জানলাই জ্যাম হয়ে বসে আছে। এমনকি যারা প্রথমে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারাও মিস্ অরোরার মুখ-ঝামটা খেয়ে পরে ফেরত এসেছে। ইনফ্যাক্ট লাহিড়ী স্যারও টিমসমেত চলে এসেছেন। আশেপাশের লোক্যালিটি থেকেও জনা তিরিশ ইয়াং ছেলে মুখে ভেজা গামছা টামছা বেঁধে হাজির। তারাও হাত লাগিয়েছে। ফিফটি পার্সেন্ট পেশেন্টকে অলরেডি বের করে অন্য হসপিটালে শিফট করে দেওয়া হয়েছে। যারা ভেন্টিলেটরে ছিল, তাদেরও কোনো ক্ষতি হয়নি। ইনফ্যাক্ট আই সি ইউ আর ভেন্টিলেটরে থাকা পেশেন্টদেরই প্রথমে বের করে একদম তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে কাছের হসপিটালটাতেই শিফট করার ব্যবস্থা করেছেন ডাক্তাররা। ওরা একদম সেফ আছেন। বাকিদেরও বের করা হচ্ছে। গ্রাউন্ড ফ্লোর, ফার্স্ট ফ্লোর পুরো ফাঁকা সেকেন্ড আর থার্ড ফ্লোরে এখনও কিছু পেশেন্ট আছেন। তবে সবাই মিলে তাদের মুখে ভেজা ব্ল্যাঙ্কেট বেঁধে বের করছে। সাদা ব্ল্যাঙ্কেটগুলো পুরো কালো। এখন তো পাওয়ারও অফ হয়ে গিয়েছে স্যার। ক্যাজুয়ালটির সম্ভাবনা আর নেই।" অর্ণব জানায়, "এ যাত্রা বোধহয় ফাঁড়া কাটল।"

"পি সি চৌধুরীর ফ্যামিলি?"

"ওদের গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি।" সে শান্তভাবেই জানায়, "সবাই ফিট অ্যান্ড ফাইন।"

"প্রণবেশদার হাফ সেঞ্চুরি হয়েছে?"

এবার অর্ণব সশব্দে হাসল, "না। নকল বার্নিং শিখটি কিছুদুর দৌড় করিয়েই ফের হাঁউমাউ করে সারেন্ডার করেছিল। লাহিড়ী স্যারও ওর ভাষা বুঝতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। ইনিও কোঙ্কনি। তবে এইটুকু বুঝেছিলেন যে ইনি আর যা-ই হোক, বার্নিং শিখ নন। তাই ও পাবলিক বেঁচে আছে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে।

হতচ্ছাড়া দৌড়বীড় ওঁদের অনেক দৌড় করিয়েছে বলে দুটো থাপ্পড় অবশ্য কষিয়েছেন। আর কিছু করেননি। তবে আসল বার্নিং শিখকে লাহিড়ী স্যার না পেলেও এক ওয়ার্ডবয় বোধহয় লক্ষ করেছে। তার বয়ান অনুযায়ী সে নাকি এক বুড়ো থুরথুরে লোককে হাতে পেল্লায় জলের বোতল নিয়ে গুটিগুটি ইলেক্ট্রিক রুমের দিকে যেতে দেখেছিল। তবে পেশেন্ট পার্টি ভেবে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। ওদিকে আরও একটা ওয়াশরুমও আছে। তাছাড়া সে নিজেও ব্যস্ত ছিল।"

"বুঝলাম।"

শব্দটা উচ্চারণ করতে-না করতেই বাইরে থেকে ফায়ার ব্রিগেডের সাইরেন ভেসে এল। ওঃ, ঈশ্বর! ফায়ার ফাইটাররা চলে এসেছে। এখন আর বিশেষ চিন্তার কোনো কারণ নেই। বাকি পেশেন্টদের ওরাই বের করে নিয়ে আগুন নিভিয়ে দেবে। আপাতত তাদের আর কিছু করণীয় নেই।

অধিরাজের নিজেকে অসম্ভব ক্লান্ত লাগছিল। সারা দেহ অবশ হয়ে আসছে। পা-দুটো টলছে। সে কোনোমতে উচ্চারণ করল, "এডিজি সেনকে একবার ধরো তো।"

এডিজি সেন এদিককার অবস্থা কিছুই জানতেন না। সম্ভবত এই অগ্নিকাণ্ডের কথা এখনও মিডিয়ার কানে যায়নি। গেলেই তারাও চলে আসবে। তিনি অধিরাজের মুখে সবকিছু শুনে বললেন, "কী করি বলো তো! সরকারপক্ষ তো আমাদের কথা শুনছেই না। ভাবছে বুঝি দেয়ালা করছি। উলটে আমাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এগারোটা হোক কী একডজন — সব বার্নিং শিখকেই নাকি অন দ্য স্পট মেরে ফেলা উচিত ছিল। যা-ই বলি ওই একই উত্তর। বার্নিং শিখকে ধরুন, মারদাঙ্গা নিজে থেকেই থেমে যাবে। ওদিকে হিউম্যান রাইটস্ চেঁচাচ্ছে...!"

"দরকার নেই স্যার, ছাড়ুন।" অধিরাজ স্খলিত ক্লান্ত স্বরে বলল, "শুধু বলুন, আরও কয়েকটা এক্সপ্লোশনের পর না-হয় আমরাই ওঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করতে যাব। একা নয়, উইথ অল মিডিয়া। সে প্রশ্নের উত্তর যেন আগে থেকেই ওঁরা তৈরি করে রাখেন।"

"অ্যাঁ।" এডিজি সেন বিষম খেলেন, "আরও এক্সপ্লোশন হবে? কী সর্বনাশ!" সে বিষণ্ণ হাসে, "নাঃ। আর সে সম্ভাবনা নেই। এবার শুধু ফাইনাল শো-ডাউন বাকি।"

*** *

(৩৪)

শতচেষ্টাতেও কিছুতেই শহরে আর্মি নামানো গেল না!

একটা বদ্ধ পাগল লোকের জন্য গোটা শহরকে স্তব্ধ করে দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রবল আপত্তি। তাতে জনতার হেনস্থা হবে। মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে। বিরোধীরা এমনিতেই ইস্যু তৈরি করার জন্য বসে আছে। তারাও চেঁচাতে শুরু করতে পারে। তাছাড়া বার্নিং শিখ-এর আগে আরও তিনটে শহরে ভিজিট মেরে এসেছে। কোথাও তো তার জন্য আর্মি নামানো হয়নি বা কার্ফিউ জারিও করা হয়নি। তবে খামোখা কলকাতায় কার্ফিউ জারি করার মানে কী! এই সাইকোকে কোন আনন্দে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দিতে হবে? এ কী উদ্ভট আবদার! এরপর তো সে রেডকার্পেট আর একুশ তোপের সেলামির বায়নাও করে বসতে পারে।

বার্নিং শিখ কতবড়ো বদ্ধ পাগল জানা নেই। তবে মাঝেমধ্যে এই রাজনীতিবিদদেরই মানসিক ভারসাম্যহীন বলে মনে হয়। যে জনগণের ভোটের কথা ভেবে তাঁরা চিন্তিত, তারা বাঁচবে তবে তো ভোট দেবে। যেখানে পুরো শহরটা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, জনমানস বল্গাহীন আক্রোশে ফুঁসছে, সেখানে লাগাম লাগানো জরুরি। প্রয়োজনে জবরদস্তি রাশও টানতেই হয়। কিন্তু সে কথা ওঁদের কে বোঝাবে! ওঁরা সর্বক্ষণই মাথা নেড়ে বলে গেলেন, "নাঃ। এটা কোনোমতেই সম্ভব নয়। আপনারাই বরং নিজেদের কাজটা ঠিকভাবে করুন। অপরাধীকে ধরুন। তারপর চিফ মিনিস্টার ভাষণ দিয়ে জনগণকে শান্ত থাকার অনুরোধ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অবস্থা দেখে ও শুনে অধিরাজ ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে বলেছিল, "এভাবে হবে না স্যার। আপনিই বরং অর্ডার দিন। আর্মির দরকার নেই। পুলিশই যেখানে মবলিঞ্চিং-এর আশঙ্কা দেখবে সেখানেই একদম পিটিয়ে সবাইকে পেটাই পরোটা বানাক। ডান্ডা না মারলে এরা ঠান্ডা হবে না। কোনোদিকে তাকানোর দরকার নেই। ঠেঙিয়েই বাজিমাত করব। দশ-বারোটাকে পটাপট গ্রেফতার করলে বাকিরা এমনিতেই পিছু হটবে। আমাদের হাত খুলে দিন স্যার। আমরা পাবলিক সার্ভেন্ট। তাদের সুরক্ষা আগে। নেতা-নেত্রী বা সরকারের হাতের পুতুল হয়ে এখন নাচার সময় নেই। আপনি জাস্ট ইশারা করুন। তারপর দেখছি এই পেঁয়াজি কতক্ষণ চলে।"

এডিজি সেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "গভর্নমেন্ট কিন্তু আমাকেই চেপে ধরবে। কী জবাব দেব? তুমি এর দায় নিতে রাজি আছ?"

"আপনি নিশ্চিন্তে গান্ধীজির তিন বাঁদর হয়ে যান। দরকার পড়লে আমার দিকেই আঙুল তুলবেন।" তার নিখুঁত, অপূর্ব মুখ রাগে কঠিন হয়ে ওঠে। চোয়ালের কাটা জায়গাটায় আঙুল ঘষে সে বলল, "শহরে একসঙ্গে এতগুলো গুন্ডা থাকতে পারে না স্যার। আর এখানকার গুন্ডার নাম বার্নিং শিখও নয়—আই জি, অধিরাজ ব্যানার্জি। বাকি গুন্ডাদের সরিয়ে নিই। তারপর যা উত্তর দেওয়ার আমিই দেব। আপনি শুধু কাল সকাল অবধি কিচ্ছু শুনবেন না, কিচ্ছু দেখবেন না, কিচ্ছু বলবেনও না। ব্যস্।"

"অ্যাজ ইউ উইশ।"

অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে সি.আই.ডি. আর পুলিশই লজ্জা, ঘেন্না, দ্বিধা—সব শিকেয় তুলে দুমদাম একগাদা লোককে গ্রেফতার করে, পিটিয়ে পাটিয়ে উন্মত্ত ভিড়কে তাড়ায়। প্রাথমিক কিছুক্ষণ একতরফা হিংসা চলার পর যখন পুলিশও সমালোচনা, নিন্দার কোনোরকম তোয়াক্কা না করেই পালটা পেটাতে শুরু করল তখন 'মব'ও একসময়ে ক্লান্ত হয়ে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হল। মিডিয়া পুলিশের গুন্ডাগিরিতে 'ছি ছি' করলেও আসল কাজের কাজটা ওই র‍্যাম্পার্ট 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' দেওয়াতেই হয়েছে। জলকামান, কাঁদানে গ্যাস আর 'কিলিয়ে কাঁঠাল' বানানোর প্রক্রিয়ায় শেষপর্যন্ত হিংসা থামল। কতগুলো নিরীহ লোক মরল।

তাদের যারা মারল, তারা কেউ মার খেয়ে ঘরমুখো হল, কেউ হাজতে গেল। সময় লাগল, অযথা শ্রম নষ্ট হল, ঘাম রক্ত ঝরল, অনেক কিছু ভেঙেচুরে গেল, কিছু সাধারণ মানুষ ক্রিমিনাল হয়ে গেল, তবু শেষমেষ জনগণকে বলপূর্বক হলেও থামানো গেল।

এখন রাত প্রায় তিনটে বাজে। রাস্তাঘাটও একদম শুনশান। সন্ধে নামার পর থেকে পরিবেশ যেরকম উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তাতে ভাবাই যায়নি যে কোনো একসময় এমন অদ্ভুত শীতলতা আর শান্তিও নেমে আসবে। আপাতত চতুর্দিকে আদর্শ শীতের রাত্রির নীরবতা, শূন্যতা ও শৈত্য বজায় রয়েছে। মাঝেমধ্যেই ঠান্ডা কনকনে হাওয়া গাছের পাতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। পিচের রাস্তার ওপর এখনও অশান্তির চিহ্ন হিসাবে কোথাও কোথাও রক্তের ছিটে, রক্তমাখা লাঠি, ছেঁড়া চপ্পল, শূন্য ওয়ালেট, ইট-পাথরের টুকরো, জল, গ্যাসের ক্যানিস্টার—ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। আশা করা যায় কাল ভোরে সাফাইকর্মীরা ঝাঁট-জল দিয়ে পুরোটাই সাফ করে দেবে। রাস্তার মনের মধ্যে বহু ক্ষত, বহু ইতিহাস জমা হয়ে থাকলেও তার দেহে কোনোরকম স্মৃতি বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। রাজপথ আজ পর্যন্ত অনেক লাশ দেখেছে। তাদের বুকে করে শুয়েও রয়েছে। কিন্তু কয়েকঘণ্টা পরেই শোকের বিহ্বলতা কাটিয়ে তাকে আবার সব কিছু মুছে ফেলে নগরসুন্দরী হয়ে উঠতে হয়েছে। কে বলতে পারে, ওই মসৃণ দেহের নীচে কোথাও চিড় বা ফাটল ধরেছে কিনা। হয়তো পাথরেরও বুক গোপনে ফাটে, মানুষের ফাটে না।

এতক্ষণের উত্তপ্ত শহর এই শীতল রাতে শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে। যথারীতি কুয়াশার মোটা চাদর ঢেকে দিচ্ছিল সমস্ত প্রেক্ষাপট। এখন রাতচরা পাখির ঝটপট আর বেওয়ারিশ কুকুরের কেঁউ কেঁউ ছাড়া কোনো অতিরিক্ত শব্দ নেই। কুকুরেরা মাঝেমধ্যেই শীতের কামড় সহ্য করতে না পেরে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। তারপর আবার কী মনে করে একেবারে কুণ্ডলী পাকিয়ে, গোল হয়ে শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ে। মাঝখান দিয়ে তাদের উচ্চকিত কান্নায় কিছু মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। অমঙ্গল আশঙ্কায় কারোর কারোর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কেউ বা আবার সুখের নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় সারমেয়কুলের গুষ্টির তুষ্টি করতে করতে পাশ ফিরে শোয়। পৃথিবীতে যেখানে যত বড়ো অশান্তিই হোক না কেন, যত কষ্ট, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ, আতঙ্ক থাক না কেন, দিনের শেষে সকলেই শান্তিতে একটু ঘুমের দেশে যেতে চায়। স্বপ্ন দেখতে চায়।

একমাত্র গোটা শহরে বুঝি তারই চোখে ঘুম ছিল না। অনেকদিন ধরেই ঘুম নেই বিনিদ্র রাত্রির অভ্যাস এমন হয়ে গিয়েছে যে এখন আর ক্লান্তিও আসে না। বরং কখনও যদি ভুলবশতঃ ঘুমিয়েও পড়ে, তবে পাপবোধ হয়। মনে হয়, এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! এখনও তার বিশ্রাম নেওয়ার সময় আসেনি। আজও সে চিরঘুমের ডাকের প্রতীক্ষায় বসে আছে। দিদি আজকাল বড়ো বেশি দেখা দিচ্ছে। ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে যে সময় হয়ে এসেছে। তবু আজও ইঙ্গিত চিরনিদ্রা তার অস্থিরতাকে শান্ত করতে পারেনি। বরং ক্রমাগত যেন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে মস্তিষ্ক। বুঝতে পারছে, যুদ্ধে বারবার পশ্চাদপসরণ করতে করতে নিজের ওপর ক্রমাগতই নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে সে। তার ভেতরের দানব ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম, কোনো কিছুরই আর তোয়াক্কা করছে না। যেন তেন প্রকারেণ তার শুধু প্রতিশোধ চাই। তার জন্য গোটা পৃথিবীতেও আগুন জ্বালাতে সে কসুর করবে না।

লোকটা অভ্যস্ত হাতে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতেই আয়নার দিকে তাকায়। সামনের কাচে ওটা কার প্রতিবিম্ব! না, সে কোনোমতেই গুলশন সিং নয়। আট বছরের সেই ছোট্ট নিষ্পাপ 'গুল্লু' ও হতে পারে না। ও বার্নিং শিখ। যে এতদিন ধরে শুধু তিলে তিলে জ্বলে এসেছে। মানুষ নয়, একজন দরিন্দা। যে আজ প্রয়োজনে নিরীহ মানুষদের রক্তে নিজের হাত রক্তাক্ত করতেও দু-বার ভাববে না। এত বছরের জ্বালার প্রতিশোধ নিতে সে নীচতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করতে পারে। ছাইভস্ম মাখা এক প্রেত, যার মধ্যে আজ তিলমাত্রও মানবিকতা নেই।

আয়নার প্রতিবিম্বের মুখ কঠিন। আজ ভীষণ ব্যর্থ আর ক্লান্তও লাগছে। এত তোড়জোড়,

এত চেষ্টা, অর্থনষ্ট, লোকবল, এত শয়তানি—সব বিফলে গেল। খুঁজে খুঁজে এগারোটা লোককে সে শেষমুহূর্তের ব্যাক-আপের জন্য তৈরিও রেখেছিল। কোমলদিদি মরার আগেই গুচ্ছ টাকা তাকে দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল-"গুরু, যদি সবকিছু মিটে যাওয়ার পর বেঁচে থাকিস, তবে টাকাগুলোকে কাজে লাগাস। নতুন কিছু করিস।"

কিন্তু সে শুরু থেকেই জানত, এ টাকা তার ভোগে কোনোদিনও লাগবে না। কাজ যদি শেষ হয়ে যায়, তবে ইহজগতে তারও আর কোনো কাজ নেই। বার্নিং শিখ যতদিন বেঁচে থাকবে, তার কাজ শেষ হবে না। সে মারতেই থাকবে, মারতেই থাকবে-যতক্ষণ না স্বয়ং মৃত্যু এসে তাকে শান্ত করছে। এক অদ্ভুত অটোম্যাটিক কিলিং মেশিন, যার বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। অগত্যা নিজের প্ল্যানের জন্যই সে টাকাগুলোর সদ্ব্যবহার করেছিল। কতগুলো হাঘরে, হাভাতে মানুষকে পুলিশের বন্দুকের সামনে এগিয়ে দিয়ে পেছন থেকে তামাশা দেখছিল।

প্রাথমিকভাবে তার পরিকল্পনা সফলও হয়েছে। গোটা শহরে আতঙ্ক, অবিশ্বাস, অরাজকতা নামিয়ে আনতে সম্পূর্ণ সফল। এমনকি ওই মাথামোটা অ্যাকশন কুমারকেও হসপিটালের মেইন গেট থেকে সরাতে পেরেছিল তার তৈরি করা নকল 'মোহরা'। সকালে লেডি অফিসারের তাড়া খাওয়ার আগেই ওয়ার্ডবয়ের ছদ্মবেশে সে হসপিটালের ইলেক্ট্রিকরুমের তালার ছাপ নিয়ে নিয়েছিল। চাবি তৈরি করা এরপর জলভাত। প্ল্যান 'এ' ফ্লপ করলে সবসময়ই প্ল্যান 'বি' তৈরি করে রাখতে হয়, তা নিজের জীবন দিয়েই শিখেছে। তাই ইলেক্ট্রিক রুমে ঢুকে শর্টসার্কিটের বন্দোবস্ত করতেও কোনো অসুবিধা হয়নি। যখন এনকাউন্টার এক্সপার্ট নকল বার্নিং শিখকে তাড়া করছিল, সেই ফাঁকেই নিজের কাজ সেরে সে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। জানত, এবার আর কেউ পি সি চৌধুরীর পরিবারকে বাঁচাতে পারবে না। অধিরাজ ব্যানার্জি গোটা শহরের মারদাঙ্গা থামাবে, জবাবদিহি করবে না হসপিটালে দৌড়োবে?

অথচ আবার ব্যর্থ! সাত কাণ্ড রামায়ণ লেখার পরেও রাবণবধ হল না! সে ভেবেছিল ওই আগুনেই বুঝি শেষ হয়ে যাবে পি সি চৌধুরীর গোটা পরিবার। বাকি পেশেন্টরা গোল্লায় যাক। বার্নিং শিখ নিধনযজ্ঞে নেমেছে। তার আগুনে কিছু নিরীহ মানুষ পুড়লেও কিচ্ছু আসে যায় না। যে লোকটা বারবার চীনের প্রাচীর হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে সে তো এই অপ্রত্যাশিত কাণ্ডে বেসামাল হয়ে শহরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তেমনই তো প্ল্যানিং ছিল।

কিন্তু কে জানত ঠিক সময়ে মানুষটা ওখানেও পৌঁছে যাবে। এ কী অদ্ভুত সুপারম্যান। কিছুতেই ওকে হারানো যাচ্ছে না। মারা তো দূর, মাত দেওয়াও এখন অসম্ভব ঠেকছে। সে বুঝেছিল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্মি নামাবে না। যে সরকার কোভিডের প্যান্ডেমিকের মধ্যেও মিষ্টি আর মদের দোকান খোলা রাখে, তারা এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতেও কিছুতেই কার্ফিউ ডাকবে না। রাজীব গান্ধীও ১৯৮৪ সালে যথাসময়ে আর্মি নামাননি। এরাও নামাবে না। এটাই তো সুবর্ণ সুযোগ ছিল।

আফশোশে মাথা ঝাঁকায় বার্নিং শিখ। তার মাস্টারপ্ল্যানে কোনো খুঁত ছিল না! তবু ফের ফ্লপ। একটু আগেই লাইভ খবরে দেখেছে যে একজন পেশেন্টও মারা যায়নি ওই অগ্নিকাণ্ডে। এমনকী কোনো স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যুও হয়নি। যারা তুলনামূলক সুস্থ হয়ে এসেছিল ও ডিসচার্জের অপেক্ষা করছিল, তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের অন্য হসপিটালে নিরাপদে শিফট করা হয়েছে। সমস্ত নিউজ চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে একই খবর পঞ্চাশবার দেখল। সকলেই তোতাপাখির মতো একই কথা বলে চলেছে, আসল কথাটা ছাড়া। কেউ জানাচ্ছেই না যে কোন্ হসপিটালে শিফট হয়েছে পেশেন্টরা। পি সি চৌধুরীর পরিবারকেও সেখানেই রাখা হয়েছে না ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়েছে কে জানে। বাহাত্তর ঘণ্টার মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি। এর মধ্যে গোটা কলকাতা ঘুরে ঘুরে একটা বা একাধিক নির্দিষ্ট হসপিটালকে খুঁজে বের করা আদৌ কি সম্ভব? আর যদি ওদের ডিসচার্জও করা হয়, তবু নিশ্চয়ই নিজেদের ওই পুড়ে যাওয়া বাড়িতে ফিরবে না। এত বড়ো শহরে ওদের কোথায় খুঁজে বেড়াবে সে?

তার একদিকের চোখ জ্বলে ওঠে। নাঃ, স্বীকার করতেই হচ্ছে যে এই গেমটা সে হেরেছে। জেতার আর কোনো রাস্তাই নেই। বাহাত্তর ঘণ্টা পরে এমনিতেই তার ডেস্টিনেশন চেঞ্জ করার কথা। সেই মতোন ট্রেনের টিকিটও আগে থেকেই কেটে রেখেছে। তার অন্যথা কোনোদিন হয়নি, আজও হবে না। তাই পি সি চৌধুরীর হিসেবটা অসম্পূর্ণ রেখেই চলে যেতে হবে তাকে। আবার অন্য শহর, অন্য টার্গেট ওরা না হয় আরও কিছুদিন বেঁচে থাকুক। তারপর দেখা যাবে।

ভাবতেই তার ঠোঁটে একটা তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর হাসি ভেসে ওঠে। সামনে এখন আই পি এস ভূপেন্দ্র দত্তা! একটা শিকার হাতছাড়া হয়েছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। এই মহাভারতের দুর্যোধনের পরিবার একটু আগেও হয়তো বেঁচে ছিল। তবে এখন নিশ্চয়ই আর নেই। অধিরাজ ব্যানার্জি সব পেরেছে, শুধু এই বাহাত্তর ঘণ্টায় মাছের চোখের নিশানায় লক্ষ্যভেদটা করতে পারেনি। ওস্তাদের মার শেষ রাতে, এই আপ্তবাক্যটা চিরদিনই খাটে। আজও খাটবে!

ওদের ঘরে যে লেডি অফিসার সতর্ক পাহারায় আছে তা আগেই জানা ছিল। কিছুক্ষণ আগেই মেয়েটি শুনতে পেয়েছিল, আশেপাশে কোথাও কে যেন একটানা শিস্ দিয়ে চলেছে—'গুমনাম হ্যায় কোই, বদনাম হ্যায় কোই...।' এই অফিসারটি বড়োই জেদি আর অনড়। সহজে নড়তেই চায় না। নিজের জায়গা থেকে দু-ইঞ্চি সরাতেও প্রাণ যায়। সেইজন্যই বার্নিং শিখের উপস্থিতির ইশারা দেওয়া খুব প্রয়োজন ছিল। জানা ছিল, এই সুর তাকে উত্তেজিত করে তুলবে। অত্যন্ত সাহসী মেয়েটি এবার উত্তেজনার মুহূর্তে কোনো-না কোনো ভুল করবেই। ওর আত্মবিশ্বাস আর দুঃসাহসই ওকে দিয়ে ভুল করাবে।

ঠিক যেমন গুল্লু ভেবেছিল, তেমনই হল। অফিসারটি বাইরে বেরিয়ে বার্নিং শিখের খোঁজ করছিল। কিন্তু সুরের উৎস আর কিছুতেই খুঁজে পায় না। পাওয়ার কথাও নয়, কারণ শিসটা একদম বাইরে বাজছিল। একটি ছোট্ট অথচ শক্তিশালী রেকর্ডারে। তা তার জানার কথা নয়। ওদিকে আওয়াজ শুনেও চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। সে মরিয়া হয়ে একেবারে খুঁজতে খুঁজতে বিল্ডিঙের বাইরে চলে যাওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল গুল্লু। ভূপেন্দ্র দত্তাদের ফ্যামিলিকে একটু আগেই বাইরে যেতে দেখেছে। জুজুৎসুও সঙ্গে গিয়েছে। শুধু এই মেয়েটাই ঘরে ছিল। ওদের বিল্ডিঙে আজ এক দম্পতির বিরাট অ্যানিভার্সারি পার্টি। সেখানেই এই ফ্লোরের সবাই ডিনার করতে গিয়েছে। অদ্ভুত এই উঁচুতলার মানুষগুলো! বাইরে ধরপাকড় চলছে, খুনোখুনি হচ্ছে, আর এরা নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে চিলড বিয়ার, শ্যাম্পেনের বোতল খুলছে! বিরিয়ানি, মাংস, মদ খাচ্ছে, মহানন্দে পার্টিও করছে। তারও নেমন্তন্ন ছিল। তবে অসুস্থতার অজুহাত দিয়ে আগেই এড়িয়ে গিয়েছে। এখন ডিনার পার্টিতে আনন্দ করে বেড়ানোর সময় নয়। যারা আনন্দ করতে গিয়েছে, তাদের সর্বনাশেই তার আনন্দ

তাই সে একেবারে তৈরি হয়েই বসেছিল। লেডি অফিসার ভুল পদক্ষেপ নেওয়া মাত্রই ওই ফ্ল্যাটে ঢুকে যা যা করার করে এসেছে। ওর উপস্থিতিতেও করা যেত। শুধু আজ এই সুযোগটা পেয়ে কোনোরকম ঝুঁকিই নিতে চায়নি। আর একজন লেডি অফিসারের সিগারেটে গাঁজা মেশানো তুলনামূলক সহজ ছিল। ইনি আবার কোনো ফাঁদেই পা দেন না। মিষ্টি হেসে এড়িয়ে যান। তাই ব্যাকপ্যাকের জিনিসপত্রেও ভালো করে ক্লোরোফর্ম মিশিয়ে এসেছে। ও মেয়ে কখনও না কখনও চা, বিস্কুট, কফি, কুকি, স্যান্ডউইচ, স্ন্যাকস কিংবা জল, কিছু তো খাবেই খাবে। তারপর ঘুমোবে। আর কোনোদিন সে ঘুম ভাঙবে না! একটা মেয়ে বেঘোরে মারা যাবে এই যা দুঃখ। কিন্তু এখন সে তার তোয়াক্কাও করে না। ,

সে আপনমনেই হিংস্র হাসল। অধিরাজ ব্যানার্জি নেকলেসিং-এর স্টাইলটা আটকে দিয়ে বড়োই খারাপ কাজ করেছে। ওটা তার প্রিয় স্টাইল ছিল। চোখের সামনে কত মানুষকে ওভাবে মরতে দেখেছে। জবাবে ওই টায়ারগুলো ফেরত দেবে না? কয়েকশো জ্বলন্ত টায়ারের হিসাব নিয়ে সে বসে আছে। অথচ সেই অস্ত্রটাও কেড়ে নিল। অত্যন্ত অন্যায়।

তবে টায়ার না থাকলেও যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোল আর আগুন তো আছে। আর আছে সেই মোক্ষম মারণাস্ত্র। আজ ঘুম থেকে উঠে ভূপেন্দ্র দত্তা দেখবে, তার প্রিয়জনের শবদেহগুলো সব পুড়ে ছাই! অন্তিম সংস্কার করার জন্য কিচ্ছু বাকি নেই...কিচ্ছু না! লাইটার এগিয়ে দেওয়া, অ্যাঁ? সরতাজকে খুন...! দ্যাখ, কেমন লাগে! নিজের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মানুষগুলোর মর্মান্তিক, অভিশপ্ত মৃত্যু দেখেও বেঁচে থাকা কতখানি ভয়াবহ, এবার নিজেই উপলব্ধি কর। ভোগ শুয়োরের বাচ্চা। তুইও ভোগ।

সে একটা শ্বাস টেনে টানটান হয়ে উঠে দাঁড়াল। হাতের কাছেই পেট্রোলের জেরিকেন রয়েছে। দেশলাই বাক্সও। এখন সময় হয়েছে। ওই ফ্ল্যাটে তার হিসেবমত একমাত্র ভূপেন্দ্র দত্তা ছাড়া এতক্ষণে আর কারোর বাঁচার কথা নয়। সবাই নিশ্চয়ই শেষ। আর দেরি করা উচিত হবে না। কাজ শেষ করেই এই শহর ছাড়তে হবে তাকে। হাতে আর বিশেষ সময় নেই। তাছাড়া মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করলেই আশেপাশের ফ্ল্যাটের লোকেরাও টের পেয়ে যাবে। ফায়ার অ্যালার্মও বাজবে। টাইট সিকিউরিটি জোন। তাই খবরও চাপা থাকবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।

বার্নিং শিখ চোরের মতো তার ফ্ল্যাট থেকে বেরোল। এক হাতে পেট্রোলের জেরিকেন, অন্য হাতে চাবির গোছা। আই.পি.এস ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাটেরই ডুপ্লিকেট চাবি। এ ব্যাটা আবার একাধিক লক সিস্টেম লাগিয়ে রেখেছে সব দরজায়। অন্যান্যদের মতো ল্যাচ ফিট করেনি। তাই ওর ঘরগুলোর দরজা খুলতে একগাদা চাবি লাগে৷ সে আপনমনেই হেসে ফেলে। লোকটার মুখেই যত হম্বিতম্বি আর ধমক চমক। আসলে পয়লা নম্বরের ভীতু। দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস করে না! নিজের প্রাণের এতই ভয় যে যতরকম তালা আছে সব আমদানি করে রেখেছে। কিন্তু গুলশন সিংকে ও চেনে না। অনেক ধৈর্য ধরে, একটু একটু করে সে ঠিক নিজের পথ খুঁজে নেয়। সারা দুনিয়ার তালাও ওকে আটকাতে পারবে না। ওয়াহেগুরু তাকে মাফও করবেন না, তবে বাধাও দিতে পারবেন না। মানুষের জেদের সামনে ঈশ্বরও অসহায়।

অত্যন্ত সতর্ক ও নীরব পায়ে গুটিগুটি সে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। বিড়ালের মতো নিঃশব্দ তার চলার ভঙ্গি। ছায়াটাও বুঝি নিজেকে গোপন করে রেখেছে। এতটাই সাবধানী যে বাইরের ক্ষীণ আলোতে তাকে রক্তমাংসের মানুষের চেয়েও বেশি ছায়ামূর্তি বলেই মনে হয়। জেরিকেনটা সে খুব সাবধানে, একপাশে নামিয়ে রাখল। তারপর ধীরেসুস্থে ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাটের মেইন ডোরের তালা খুলতে মন দিল। আশেপাশের সব প্রতিবেশী এখন গলা অবধি মদ্যপান করে, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এখন এদিকে কারোর আসারও সম্ভাবনা নেই। এতদিন তো দেখল। সবার দৌড় বোঝা আছে। রাত হলেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ঢুকুঢুকু করতে বসে যায়। তারপর ঘণ্টাখানেক মাতলামি করার পরে সব মড়ার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোবে! কানের কাছে কামান দাগলেও সহজে চোখ খোলে না এদের। খোঁয়ারিও কাটে না।

খুট্ করে কয়েকটা চাপা ধাতব শব্দ। তারপরই নির্বিবাদে খুলে গেল ফ্ল্যাটের মেইন ডোর। সে ভেতরে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এগুলো সব অটোম্যাটিক লক। দরজা বন্ধ হওয়া মাত্রই নিজে থেকেই ফের লকড্ হয়ে যায়। এখন চাইলেও কেউ বাইরে থেকে এখানে এসে ঢুকতে পারবে না। মনে মনেই ফের একচোট হেসে নেয় বার্নিং শিখ। একটা মারাত্মক উত্তেজনা ও ভয়াবহ মজা টের পাচ্ছে সে। বেডরুমগুলোয় এখন প্রতীক্ষা করছে সার সার লাশ! শেষকৃত্যের জন্য অপেক্ষা করছে তারা। প্রত্যেকবারই বীভৎস, রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো তাকে বড়ো সুখ দেয়। আজ তারও আনন্দের দিন। আই পি এস হওয়ার বড়ো গর্ব ছিল হারামখোর দত্তার! স্পর্ধায় ধরাকে সরা জ্ঞান করেছিল লোকটা। আজ ওর নিজের রক্ত তার হিসাব দেবে! খুন কা বদলা খুন। তুমহারা খুন কা এক এক কত্রা...!

নৈঃশব্দ বজায় রেখেই আস্তে আস্তে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। তার প্রত্যাশামতই শুধু নীরবতাই ছেয়ে আছে। কারোর সামান্য শ্বাস টানা, বা নাসিকা গর্জনও

শোনা যায় না। মৃত মানুষেরা এর কোনোটাই করে না। সামনেই বিলাসবহুল বিরাট হলঘর। রাতেও সিলিঙে হালকা আলো জ্বলছে। রোজই জ্বলে। এই আলোগুলো চোখকে আরাম দেয়। তার ওপর অদ্ভুত একটা আলো আঁধারি পরিবেশও তৈরি করে। কিছু জিনিস দেখা যায়, আবার কিছু দেখা যায় না। সব মিলিয়ে রাতের নিরবিচ্ছিন্ন শান্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নরম আলো ছায়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে। আর কয়েক মুহূর্ত তারপরই এই আলো-ছায়ার মধ্যেই আগুনের তীব্র আলো জ্বলে উঠবে...।

"খট... খট... খট...!"

অদ্ভুত একটা জোরালো শব্দে ঘাবড়ে গেল সে। এ কী! এখনও এ ঘরের বাসিন্দারা জীবিত। তা কী করে হয়? এ অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া এ তো জুতোর জোরদার শব্দ। ভূপেন্দ্র দত্তার ফ্ল্যাটে এত রাতে এরকম জুতোয় খটখট শব্দ তুলে কে ঘুরে বেড়ায়?

লেডি অফিসার নাকি? সে-ই বা ঘরের মধ্যে জুতো পরবে কেন? ভূপেন্দ্র আবার ঘরের ভেতরে জুতো পরার কট্টর বিরোধী। স্লিপার অবধি ঠিক আছে। কিন্তু এ তো কোনো স্লিপারের আওয়াজও নয়। এ বাড়ির প্রত্যেকটি নারী-পুরুষকে সে চেনে। এরকম শক্ত জুতো তারা কেউ ঘরের মধ্যে পরে না। সবাই ঘরে ঘাসের তৈরি নরম চটি পরে যার কোনো আওয়াজই হয় না। তার অভিজ্ঞ কান বলে দিল, এটা পুরুষদের ভারি জুতোর খটখটানিও নয়। নিঃসন্দেহে মেয়েদের জুতো। সোনালি বা শালিনী বাইরে আধুনিক হিলওয়ালা জুতো পরেন ঠিকই, তবে এটা তাদেরও পদধ্বনি নয়। ওদের চলন খুব কমনীয়, পদক্ষেপও নম্র। দু-জনেই রীতিমতো আলতো চরণে ক্যাটওয়াক করেন। এমন উদ্ধত খটখট্ আওয়াজও হয় না। আসলে এই ধ্বনি হিলের সাইজের ওপর নয়, বরং চলনের ওপর নির্ভর করে। মেয়েদের পায়ের সামান্য হিলতোলা জুতো পরে যদি কেউ ছেলেদের মতো গটগট করে হাঁটে তবেই এরকম শব্দ হয়...!

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে অন্ধকার ঘরের এক কোণে লুকিয়ে ফেলল গুলশন সিং। সতর্ক চোখে তাকায় সামনের দিকে। কিন্তু তার মস্তিষ্কের ভেতরটা যেন জোরদার ঝটকা দিয়ে ওঠে। আচমকাই চোখের সামনে ভেসে উঠল একজোড়া শক্ত, কালো রঙের চকচকে খুব সামান্য হিলতোলা জুতো। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপ। ব্যক্তিত্বময়ী এবং তেজি বিচরণ। দুটো কোমল পায়ের পুরুষের মতো কঠিন ঔদ্ধত্যে সোজা গটগটিয়ে হেঁটে যাওয়া...! এই জুতোর খট্ খট্ শব্দ তার অত্যন্ত পরিচিত। বহুবার কানের কাছে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই পদধ্বনি...! এই আওয়াজ সে এজন্মে কোনোদিন ভুলবে না...! অজস্রবার শুনে শুনে তার মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়েছে ...। চোখ খুঁজেও এ জুতোর মালকিনকে চিনে নেবে। কিন্তু...কিন্তু...এ অসম্ভব! অবিশ্বাস্য।... কিছুতেই হতে পারে না... নিশ্চয়ই তার ভ্রান্তি...। তার অসুস্থ মন ও মস্তিষ্কের বিভ্রম...! সে শ্বাসরোধ করে তাকিয়ে থাকে আগন্তুকের অপেক্ষায়। কে আসে?...কে?...

বার্নিং শিখ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল, সামনের অন্ধকার ঘর থেকে হলের দিকেই কে যেন হেঁটে আসছে! হালকা হালকা আলোতে তার অবয়বও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। ক্রমশই কাছে আসছে জুতোর খট্ খট্ শব্দটাও। পরনের হালকা গেরুয়া রঙের শাড়িটা চিনতে ভুল হল না। খোঁপার ওপর আলতো করে ঘোমটা। হাতের লাল রঙের ঝোলানো ব্যাগটাও বহু পরিচিত। হাঁটার ধরনটা। যেন পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির ছোটোখাটো নারীদেহে গোটা বিশ্বের 'শাহেনশাহ' টানটান হয়ে হাঁটছে। নম্র আলো পড়ে মাথার রুপোলি তারগুলো যেন ঝলসে উঠছে। কে এই নারী। বড্ড চেনা যে! এই মুখ...!

এই ধারালো অপূর্ব তীক্ষ্ণ তরোয়ালের মুখ সে কী করে ভুলবে...। বাস্তবে, স্বপ্নে লক্ষবার দেখেছে...। সেই বড়ো বড়ো টানা টানা চোখদুটোয় আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব ও ঈষৎ উষ্মা মাখানো... দীঘল ও টিকলো নাক... সেই কাশ্মীরী আর্য সৌন্দর্য...! অসম্ভব ব্যক্তিত্বময়ী নিখুঁত মুখের আদল... কিন্তু... নামুমকিন। কী করে হয়....! কী করে সম্ভব...। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে বিহ্বল অবস্থায় ঝুলছিল সে। তবু হেঁটে আসা মানুষটার চেহারা বুঝি

তার বুক আর চোখ দুই-ই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল। না আগুন নয়। দু-চোখ চিকচিকিয়ে উঠছে ঠিকই। তবে অশ্রুতে। যে চোখটা প্রস্থেটিক মেক-আপের পেছনে ঢাকা ছিল, নিজের অজান্তেই সে টান মেরে ওই অংশটাও খুলে ফেলে। মেক-আপটা অক্ষতই রয়েছে। শুধু এখন দুটো চোখই দেখা যাচ্ছে তার। আর সে চোখ জ্বালা করে জলে ভেসে যাচ্ছে! আপ্রাণ নিজেকে সামলাতে চাইছে, পারছে না। মুখের প্রত্যেকটা পেশী উচ্ছ্বাসে থরথর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু কিছুতেই কাঁদতে চায় না ও। কখনও অসহ্য যন্ত্রণাতেও কেঁদে-কঁকিয়ে ওঠেনি। সে জানে চোখের জলে বুকের সমস্ত আগুন নিভে যায়। সমুদ্রের জলে জ্বলন্ত লাভাও শীতল হয়। তার তো বুকে এখন লাভা জমিয়ে রাখার কথা। অথচ আজ বুঝি সেই আট বছরের গুল্লুর নিদারুণ অভিমান-অভিযোগ-নালিশ, সমস্ত দুঃখ, সব জ্বালা মেঘ হয়ে নেমে এসেছে তার চোখে। বার্নিং শিখ নয়, এক নিষ্পাপ আটবছরের শিশু অভিমানী স্ফুরিতাধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শুধু আর্দ্র স্বরে অস্ফুটে বলল, “মা!”

সামনের দৃশ্যটা ঝাপসা দেখছিল গুলশন সিং। কিন্তু তার মধ্যেও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল ওই নারীমূর্তির সামনে আলো-আঁধারিতেই যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল দুই পাগড়িধারী সর্দার! তারা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের হাতের উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র দুটো নজর এড়াল না। নজর এড়াল না নারীমূর্তির টানা টানা বড়ো বড়ো চোখের বিস্ময়। তিনি প্রথমে মৃদু হেসে হাতজোড় করে দু-জনকেই নমস্কার জানিয়েছিলেন। তার জবাবে বিদ্যুৎবেগে উঠে এল পয়েন্ট থ্রি এইট বা নাইন পয়েন্ট সেভেন এম এম-এর রিভলভার আর স্টার্লিং সাব-মেশিনগান। কানে ভেসে এল সেই উত্তেজিত অন্তিম ও চরম বিপজ্জনক শব্দগুলো। সেই কণ্ঠই বটে! আর কোনো সন্দেহ নেই। সংশয় নেই, ভুল নেই। সেই শেষ কথাগুলো গমগমিয়ে উঠল গোটা হলঘরে। নিজেরই নিরাপত্তারক্ষীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন তিনি, “ইয়ে ক্যায়া কর রহে হো!”

“নেহি! নে-হি!...নে-হি! সা-লা! হ-রা-ম কে পি-ল্লোঁ। গ-দ্দা-র। রু-ক্।” সব কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মানুষটা। বাস্তব-অবাস্তব, লৌকিক-অলৌকিকের সমস্ত সীমারেখাকে ভেঙে দিয়ে তীর বেগে বর্তমানের আড়াল থেকে উনিশশো চুরাশির সেই অভিশপ্ত ও কলঙ্কিত মুহূর্তটার দিকে মরতে মরতে পড়তে পড়তে দৌড়োল গুলশন সিং। যা উনিশশো চুরাশিতে হয়নি তা আজ হবে। যা তখন করা উচিত ছিল, তা আজ করবে। আটবছরের গুল্লু প্রতিক্ষণ যে সম্ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতে জ্বলে গিয়েছে, আজ তাতে ওয়াহেগুরু মলম লাগানোর সুযোগ দিয়েছেন। আজ সে মরে যাবে, তবু সেই সুযোগ নিয়েই ছাড়বে।

“বে-ই-মা-ন! ন-ম-ক-হা-রা-ম!”

দুই সর্দার আর কিছু করার আগেই তাদের একজনের মাথা লক্ষ করে তেলের জেরিকেনটা সপাটে বসিয়ে দিয়েছে সে। মাথায় জোরে আঘাত লাগার দরুণ একটু বেসামাল হতেই তাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিল বার্নিং শিখ।

চেঁচিয়ে বলল, “হারাম কি ঔলাদ! বদজাত্। খালিস্তান চাইয়ে ত্যায়? এ-লে। এলে।” বলতে বলতেই হাতের সাব-মেশিনগানের বাঁট দিয়ে এলোপাথাড়ি দুমদাম মারতে শুরু করেছে দুই পাগড়িধারীকে। পাগলের মতো মারছে, কাঁদছে, আর চিৎকার করে হিন্দি আর পাঞ্জাবিতে খিস্তি খেউড় করে বলছে, “ভোঁসড়ি কে....! শুধু তোদের জন্য পুরো শিখজাতির সর্বনাশ হয়েছে কঞ্জারোঁ! তোরা গোটা শিখজাতির কলঙ্ক। আমাদের গুরুরা এই ভারতবর্ষের জন্য লড়ে মরেছেন। সেই ভারতবর্ষকে তোরা টুকরো করতে চাস্। জালিয়ানওয়ালাবাগ ভারতবাসীদের রক্তে লাল হয়েছিল, খালিস্তানিদের রক্তে নয়। ভগৎ সিং, উধম সিং ভারতমাতার জন্য মরেছে, খালিস্তান সালা কোন্ ক্ষেতের মূলি? আর তোদের মতো কতগুলো বেজন্মার জন্য গোটা দিল্লি লাল হয়ে গেল। ভারত টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মর। মরিস না কেন তোরা! একেবারে মরে যা পাঞ্জাবে তোরা আবার শহীদের সম্মান পেয়েছিস! অমন শহীদির মুখে লাথ মারি আমি। মর সা-লা! ম-র!”

বলতে বলতেই সাব-মেশিনগান ফায়ার করল সে। প্রচণ্ড কান ফাটানো 'অন্ধাধুন'

ফায়ারিং-এর শব্দে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল। দুই সর্দারের দেহ ঝাঁঝরা করে দিতে দিতে পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, "পাগল কুত্তাকে এভাবেই মারা উচিত। ম-র।"

একগাদা গুলি খেয়ে দুই শিখ বডিগার্ডই ওখানে উলটে পড়েছে। গুলশন সিং তাদের ওপরেই সমস্ত রাউন্ড শেষ করে দিয়ে মেশিনগানটাকে অবহেলায় ছুড়ে ফেলল। সামনের নারী বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে গোটা ঘটনাটা দেখছিলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। তিনি ঘাবড়ে গিয়ে এবার আবার ওই একই বাক্য উচ্চারণ করলেন, "ইয়ে ক্যায়া কর রহে হো!"

বার্নিং শিখ এবার ওঁর দিকে জলভরা দৃষ্টিতে তাকায়। এটাই তো সে আজীবন চেয়েছিল। উনিশশো চুরাশি সালের একত্রিশে অক্টোবরের ওই ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার 'জুনুন' তার মাথায় সওয়ার ছিল। কতবার ভেবেছে, যদি কোনোভাবে আটকে দেওয়া যেত ওই হত্যাকাণ্ডকে। ইতিহাসকে ফিরিয়ে আনা যায় না। অতীত কখনও বর্তমান হয় না। ক্ষণিকের জন্য বোধহয় সে সব কিছু ভুলে গেল। পৃথিবী আর সময়ের বাঁধাবন্ধন রইল না। মানুষটা ধীরে ধীরে নতজানু হয়ে বসে পড়েছে ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী, তথাকথিত 'আয়রন লেডি'র পায়ের কাছে। ব্যাকুল স্বরে বলল, "কুছ নেহি... কুছ নেহি ইন্দিরা মা... ডর মত্। তু ঠিক হ্যায় না? তুঝে কুছ হুয়া তো নেহি? হাঁ?"

উত্তরে আর কোনো বাক্য এল না। কিন্তু সেই নারীর হাত আলতো করে স্পর্শ করল গুলশন সিং-এর মাথা। যেন সস্নেহ আশীর্বাদ এঁকে দিল বার্নিং শিখ নামক ভয়াবহ রাক্ষসের কপালে। বুলেট তাকে ক্ষতবিক্ষত করতে পারেনি, আগুন তাকে জ্বালাতে পারেনি, আঘাত তাকে ব্যথা দিতে ব্যর্থ, কতগুলো নিষ্ঠুর বুট তার ডান হাত ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল, তবু তাকে কাঁদাতে পারেনি, কেউ তাকে শেষ করতে পারেনি। কিন্তু ওই নরম স্নেহস্পর্শ, সেই স্পর্শের পেছনের গভীর আস্থা, আদর আর বিশ্বাসের উষ্ণতা বুঝি আজ তার পাথর হয়ে যাওয়া সব অনুভূতিকে গলিয়ে বাঁধ ভেঙে দিল। ওই সম্রাজ্ঞীর পা দুটো আকুলভাবে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই বিধ্বংসী দানব! না, দানব নয়, এক আটবছরের শিশু!

"মৈনু মাফ করা বেবে...আমায় মাফ করে দে ইন্দিরা মা!" সে কান্নাজড়ানো অভিমানী কণ্ঠে তাঁর পায়ে মাথা ঘষতে ঘষতে বলল, "আমরা কেউ খুনি ছিলাম না। আমরা কেউ গদ্দার ছিলাম না। বিশ্বাস কর। হামনে তুঝে নেহি মারা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিলাম ওদের 'ম্যায়নে ইন্দিরা গান্ধী কো নেহি মারা!" কেউ বিশ্বাস করেনি। তুই তো জানিস, বিশ্বাসও করিস, তাই না? তোর এ কেমন ভুল মা! সবাই বলেছিল, অপারেশন ব্লু স্টারের পর বেয়ন্তের মতো সমস্ত শিখ বডিগার্ডকে সরিয়ে দিতে। সরিয়েও দিয়েছিল। তুই জানতি যে এই গদ্দারগুলো তোকে মারার ষড়যন্ত্র করছে। তারপরও বলে দিলি, "যতক্ষণ বেয়ন্তের মতো 'ওয়াফাদার' শিখেরা আমায় রক্ষা করছে, ততক্ষণ আমার প্রাণের কোনো ভয় নেই!" ওই গদ্দারকে আবার ডেকে নিয়ে কোলে বসালি! এত বিশ্বাস তোর শিখদের ওপর যে বলেই দিলি, "আমি আমার সমস্ত শিখ রক্ষীদের বিশ্বাস করি। ওদের কাউকে সরাতে দেব না।" এত অন্ধ হয়ে গেলি যে সও'বার বলার পরেও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরলি না। শিখদের ইমানদারি', 'ওয়াফাদারির ওপর তোর বিশ্বাস ভুল ছিল না। কিন্তু যাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করলি, উয়ো বন্দা হি গলত থা। তোর একটা গলতি, দুটো বেইমানের জন্য গোটা প্রজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, সব ধ্বংস হয়ে গেল। দুটো বজাতের জন্য সব শিখ মরল। আমরা সবাই শেষ হলাম। কত আগুন জ্বলল, কত মুণ্ডু কাটল ওরা। তোকে অনর করার জন্য আমরা পুড়লাম। অথচ মা, আমি তো তখন তোকে চিনতামই না! আমার গরীব বাপু অটো চালাত। সরবজিত চুড়িওয়ালা হতে চেয়েছিল, আর আমনপ্রীত অ্যাম্বুলেন্স চালাতে চাইত। আমি সিপাহী হতে চাইতাম। কলোনির গরীব লোকদের সঙ্গে দূর দূর তক্ বেয়ন্ত সিং, সতবন্ত সিং-এর কোনো সম্পর্কই ছিল না! আমরা রাইফেল তো দূর, ক্যাপ বন্দুকও চোখে দেখিনি। পটকার শব্দে ভয় পেতাম। ভিন্দ্রানয়ালে কোন্ সালার ব্যাটা, খালিস্তান কী, কিচ্ছু জানতাম না। আমরা কী দোষ

করেছিলাম মা! আমাদের মেয়েরা, যস্যিদিদির মতো অজস্র দিদি, ছোটো ছোটো বোন, বুয়া, মামী, মাসি, তাইজি, বেবেরা কী গুনাহ করেছিল? হরি সিং, সরবজিত, আমনপ্রীতের মতো ছোটো ছোটো বাচ্চারা, কিংবা যে শিশু তখনও জাত-পাত-ধর্ম তো দূর, পৃথিবীর আলোই দেখেনি, সেই গর্ভজাত ভ্রূণ কেন শাস্তি পেল? তুই তো ভারতবর্ষের রানি। সমস্ত ভারতীয় তোকে 'দুর্গা' মানত, যে অসুরের বিনাশ করে। যে দেবী সন্তানদের রক্ষা করে, আশ্রয় দেয়। তবে তোর নামে নারা দিয়ে কতগুলো অসুর কেন দিল্লির রাস্তায় নামল? এ কেমন অবিচার তোর? বল্ মা... কী অন্যায় করেছিল ওই আটবছরের মাসুম গুল্লু? তোকে অমর করার জন্য কেন তাকে সব কিছু হারাতে হল? বল্ না ইন্দিরা মা!...জবাব দে...! তবে কি আমরা তোর সন্তান নই? ভারতবাসী নই...?"

আট বছরের গুল্লু তার সমস্ত জীবনের অনুযোগ ক্রন্দনবিকৃত কণ্ঠস্বরে গলগলিয়ে উগরে দিচ্ছিল তার 'ইন্দিরা' মায়ের কাছে। তার পায়ে পড়ে হু হু করে কাঁদছিল। বেরিয়ে যাচ্ছে! এতদিনের পাহাড়প্রমাণ জমানো ব্যথা সব চোখের এ কূল ও কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে আসছে বাইরে। সে বিকৃত উচ্চারণে কাঁদতে কাঁদতেই বড়ো করুণ, বড়ো অবুঝ নালিশ জানিয়েই চলেছে, "তুই বলেছিলি যে যদি তোকে কেউ খুন করে, তবে হিংসা খুনির মনে থাকতে পারে, তোর মৃত্যুতে থাকবে না। জ্ঞানী জৈল সিংকে গোটা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপিতা তুই-ই করেছিলি। ভারতবর্ষের প্রথম শিখ রাষ্ট্রপতি জ্ঞানীজি। তুই-ই বলেছিলি, তোর খুনের 'কতরা' ভারতবর্ষের একতাকে মজবুত করবে, বেঁধে রাখবে। কই? তেমন কিছু তো হল না। ঐক্য তো ছাড়, দাঙ্গা হল। হিংসার চরম! সবাই মিলে ভারতবর্ষ থেকে শিখকে কেটে ফেলে দিতে চাইল। দমদমি টাকশালের কটা পাগলের সঙ্গে আমাদের সবাইকে এক করে দেওয়া কেন হল? সরতাজের মতো সিপাই, যে ভারতমায়ের জন্য জান দিতে চাইত, তার কপালে অমন বেইজ্জতির মওত কেন? ওরা কারা ছিল যারা তোর স্বজন হওয়ার দাবি করছিল? তোর কথা তো কেউ রাখল না মা-গো? তোর নিজের ছেলেও না। সে তো চুপ করেই রইল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতিও অসহায়ভাবে দেখেছিলেন তাঁর সন্তানরা তাঁরই সন্তানদের খুন করছে। গোটা জাতিটাকে ভরসা করে তুই একটা নালায়ককে ভালোবাসলি। আর ওই একটা নালায়কের জন্য গোটা জাতই গদ্দার হল। আঠেরো হাজার। মা, আঠেরো হাজার নিষ্পাপ প্রাণ নিল তোর অন্ধ বিশ্বাস! আজ তোর জন্য আমার এই অবস্থা... তোর জন্যই আজ আমি দরিন্দা... তুই দায়ী... আমার গুনাহগার তুই ইন্দিরা মা। হ্যাঁ, তুই। জবাব দে... আমায় আজ তোকে জবাব দিতেই হবে... কেন এমন হল?...কেন?... সব জেনেশুনেও বেয়ন্ত সিংকে 'ভরোসাত করতে তোকে কে বলেছিল? এক সর্দার বেইমান হলে সব সর্দার গদ্দার কোন নিয়মে হয়? ...বল্...বল্ না।..."

বলতে বলতেই সে সজোরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। পাগড়িসুদ্ধ কপাল ঠুকছে তার ইন্দিরা মায়ের পায়ে। তার সেই আকুলি-বিকুলি কান্না রোধ করা অসম্ভব। সেই বুকফাটা হাহাকার, অভিমানমাখা অনুযোগের সামনে বুঝি আয়রন লেডিও অসহায়। সেই নারী নিশ্চুপে এক রাক্ষসের মাথায় হাত বোলাচ্ছে। যেন তাকে সস্নেহে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু উন্মত্ত কান্না থামার নামই নেয় না। চতুর্দিকে শুধু নীরবতা। তার মধ্যে উজাগর স্রেফ এক শয়তানের দমফাটা যন্ত্রণাকাতর ক্রন্দন!

কতক্ষণ যে সে অমন করে ডুকরে ডুকরে, ফুলে ফুলে কেঁদেছিল তা নিজেও জানে না। সমস্ত বিষ, জ্বালা উগরে দেওয়ার পর অবশেষে একসময় শান্ত হল। আস্তে আস্তে নিজেকে সামলেও নিল। এতক্ষণ বুঝি বাহ্যচেতনা লোপ পেয়েছিল। এবার সমস্ত বোধ ফিরে পেতেই গুলশন সিং বুঝল, পুরো ঘটনাটাই অসম্ভব! আবেগের বশে একটা ভ্রান্তিকে সত্য বলে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু গোটাটাই মরীচিকা। একটা ভ্রম মাত্র। তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সব মিথ্যে!

নিজের ভুল বোঝামাত্রই তার ফুঁসে ওঠার কথা। আবার দপ করে জ্বলে ওঠার কথা। অথচ আশ্চর্য! তার মধ্যে আর কোনো আগুনই নেই! কোনো জ্বালা আর বোধ করছে না।

ভেতরটা কেমন যেন শান্ত, শীতল হয়ে গিয়েছে। এখন বহুদিন পর তার বড়ো ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। হয়তো এখন সত্যিই সময় হয়েছে। কারণ সে মর্মে মর্মে বুঝল, তার ভেতরের 'বার্নিং শিখ' নামের পিশাচের এইমাত্রই মৃত্যু হয়ে গেল। আর বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই...। আর কোনো অজুহাত নেই প্রাণটাকে রক্ষা করার...| "নেহি... ইয়ে হো নেহি সকতা।"

সে সজল চোখদুটো তুলে সেই নারীর দিকে তাকিয়ে খুব শান্তভাবেই বলল, "ধোঁকা দিয়ে আপনে। ...ইয়ে সারা নাটক থা...হ্যায় না?"

"অ্যাবসোলিউটলি কারেক্ট। কিন্তু তুই নিজে কোথাকার ধোয়া তুলসীপাতা?"

একটা গমগমে মোলায়েম স্বর ভেসে এল। তার সঙ্গে ভারি পুরুষালি বুট জুতোর শব্দ। সে অনাবিল বিস্ময়ে দেখল এক দীর্ঘ চেহারার পুরুষ লম্বা লম্বা পা ফেলে সিংহের মতো চলনে হেঁটে আসছে তার দিকে। সে আবার ভুল করে। ফের অস্ফুটে বলেই ফেলল, "সরতাজ!"

"নাটক কি তুই একাই করতে পারিস গুল্লু?"

এবার ছ-ফুট চার ইঞ্চির টানটান দীর্ঘ দেহটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেবশিশুর মতো মুখে মৃদু হাসি, "আজকাল অনুপ্রেরণার যুগ চলছে। আমরাও তোকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়েছি। তাই প্রস্থেটিক মেক-আপ, আর একটু ছদ্মবেশ দিয়ে আমরাও অল্পস্বল্প নাটক করে নিলাম। তুই একাই উনিশশো চুরাশিকে ফিরিয়ে আনবি কেন? আমরাও এনেছি। কাম অন্ বয়েজ। গেট আপ!"

এতক্ষণ যে সর্দারজিরা গুলি খেয়ে উলটে পড়েছিল, তারা এবার দিব্যি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। অধিরাজ কৌতুকমাখা দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়েছে, "রাবার বুলেট খেয়ে বিশেষ কষ্ট হয়নি তো?"

"কষ্ট?" বেয়ন্ত সিং-এর ভূমিকায় থাকা পবিত্র একটানে পাগড়ি আর চাপদাড়ি খুলতে খুলতে বলল, "রাবার বুলেট ছাড়ো, আসল বুলেটেও এত কষ্ট হত না যতটা এই নকল দাড়িতে হচ্ছে। কোথা থেকে এই হতচ্ছাড়া দাড়ি তুলে এনেছ? ক-টা উকুন আছে এর মধ্যে কে জানে! কুটকুট করে, চুলকিয়ে আধমরা করে ফেলেছে। কী কষ্টে যে এতক্ষণ সামলে ছিলাম তা আমিই জানি। আর জানে অর্ণব।"

অর্ণবও ততক্ষণে সতবন্ত সিং-এর ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে। কপালদোষে তার কপালেই পড়েছিল জেরিকেনটা। তবে পাগড়ির জন্য বেঁচে গিয়েছে। শিখেরা এতবড়ো ঢাউস পাগড়ি পরে ঘুরে বেড়ায় কী করে। সে তো পাগড়ির ভারেই গলদঘর্ম হয়েছে। গালদুটোও অনেকক্ষণ ধরেই বেজায় চুলকোচ্ছিল। গোঁফটাও সমানতালে নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে শত্রুতা করে চলেছে। আর একটু হলেই চূড়ান্ত মুহূর্তে হেঁচে ফেলত। ভাগ্য ভালো, যে শেষ রক্ষা হয়েছে। এতক্ষণে সব ঝুলমি-ঝালমি খুলতে পেরে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বেঁচে থাক তার ক্লিন শেভড মুখ

বার্নিং শিখ এবার অনাবিল বিস্ময়ে দেখল, সি আই ডি হোমিসাইডের গোটা টিমই কখন যেন নিঃশব্দে এসে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অধিরাজ, অর্ণব, পবিত্র তো ছিলই। এখন নিঃসাড়ে আত্রেয়ী দত্ত, কৌশানী বোস, টুইঙ্কল অরোরা এমনকি প্রণবেশ লাহিড়ীও তাকে ঘিরে ধরেছে। শুধু তারাই নয়, উপস্থিত স্বয়ং ভূপেন্দ্র দত্তা, তাঁর স্ত্রী শালিনী, মেয়ে সোনালি, জামাই বিরূপাক্ষ এবং জুজুৎসুও। আয়ান আর তানিশা এখানে না থাকলেও নিশ্চয়ই তারাও নিরাপদেই আছে। ওরা কেউ মরেনি। আশ্চর্য। এতক্ষণে তো সবার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা!

তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা ধরতে পেরে বলল অধিরাজ, "আয়ান আর তানিশাও বহাল তবিয়তে আছে। বাচ্চাদের এসব গোলাগুলি থেকে দূরে রাখাই ভালো। তাই ওরা আপাতত মিস্ বোসের ফ্ল্যাটে শুয়ে আরামসে ঘুমোচ্ছে। এই ফ্ল্যাটের ঘরগুলো সব পার্শিয়ালি সাউন্ডপ্রুফ। বাইরের শব্দ ভেতর থেকে শোনা যায় ঠিকই। তবে ভেতরের সাধারণ আওয়াজ

বাইরে যায় না। তাই গোলাগুলির শব্দ বাইরে গেলেও প্রচণ্ড জোরে যায়নি। আই অ্যাম রিয়েলি সরি। তোর এই প্ল্যানটাও মাঠে মারা গেল। মিস্ দত্ত যে মুহূর্তে বার্নিং শিখের সিগনেচার টিউন শুনতে পেয়েছিলেন, সেই মুহূর্তেই আমায় ফোন করেছিলেন। আমিই ওঁকে চুপচাপ ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলি। তুই আগে যা খেল দেখিয়েছিস তাতে বুঝতে বাকি ছিল না যে সাউন্ডটা ফের রেকর্ডেড। যেরকম খেপেছিলি, তাতে মিস্ দত্ত যদি না বেরোতেন, তাহলে হয়তো আরও ভয়ানক কিছু করে ওঁকে খুনই করতি। তাই চান্সই নিইনি। তুই যা চাস্, সেটাই করতে বললাম। মা মনসাকে বেশি ধুনোর ধোঁয়া না দেওয়াই ভালো। তাই উনি তোর তালেই তাল মেলালেন। শুধু দুটি কাজের কাজ করেছিলেন। ফিরে আসার পর ভূপেন্দ্র দত্তা ছাড়া বাকি সকলের বেডরুমের মসকুইটো লিকুইডেটরগুলো সরিয়ে ফেলে অন্য লিকুইডেটর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। যেগুলোর কথা ভাবছিস, ওগুলো নেই। আমরা সরিয়ে দিয়েছি। আপাতত আমাদেরই হেফাজতে আছে। আর ভুলেও নিজের ব্যাকপ্যাকের কোনো ফুড বা লিকুইডে হাতও লাগাননি। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর থেকেই আমরা চুপচাপ এখানে এসে বসে আছি। বাকিটা বুঝতেই পারছিস। পালাবার আর পথ নেই গুল্লু। হাতে নাতে ক্যাচ কট কটা৷” আত্রেয়ী অধিরাজের দিকে তাকিয়ে একটু অপ্রস্তুত হাসে। যদিও কৃতিত্বটা স্যার ওর ঘাড়েই চাপিয়েছেন, কিন্তু এগুলো সবই সে প্রায় কিছুই না বুঝে করেছে। মসকুইটো লিকুইডেটর চেঞ্জ করে দেওয়ার অর্ডারও স্যারেরই দেওয়া। চাপা স্বরে বলেছিলেন, “এমন সপ্রেমে যখন বাঁশিতে, আই মিন শিস বাজিয়ে ডাকছে, তখন বাইরে থেকে ঘুরেই আসুন মাদমোয়াজেল। বেশ কিছুটা টাইম স্পেন্ড করেই ফিরবেন। তবে ফিরে এসেই ভূপেন্দ্র-র বেডরুম ছাড়া বাকি সবক-টা মাস্টার বেডরুমের মসকুইটো লিকুইডগুলো স্রেফ সরিয়ে দেবেন। কিংবা সিলড কন্টেনারের সঙ্গে পালটে দেবেন। আর নিজের ব্যাগের খাবার-দাবার, জল ভুলেও স্পর্শ করবেন না। ক্লিয়ার?”

“ক্রিস্টাল স্যার।”

তখন সপ্রতিভভাবে উত্তর দিলেও সে বুঝতে পারেনি যে মসকুইটো লিকুইডের সঙ্গে প্রাণঘাতী ফজিন আর মাস্টার্ড গ্যাসের সম্পর্ক কী। ব্যাকপ্যাকের খাবারে বার্নিং শিখ কিছু মেশাতে পারে। কিন্তু লিকুইডের শিশি থেকে গ্যাস আসবে কী করে। ওইটুকু শিশিতে এতখানি গ্যাস আঁটাও তো সম্ভব নয়।

পবিত্র কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলল, “কীঃ। মসকুইটো লিকুইড! আমরা তো ফজিন আর মাস্টার্ড গ্যাস খুঁজছিলাম। এর মধ্যে মশা মারার তেল আবার কোথা থেকে এল। ওটায় তো মশা মরে। মানুষ মারার ফান্ডাটা কী?”

“ওকেই জিজ্ঞাসা করো।” সে বার্নিং শিখের দিকে নির্দেশ করে, “তবে মনে হয় না পুরো ফান্ডাটা ও জানে। যাঁর মাথা থেকে এই জিনিয়াস প্ল্যানিং বেরিয়েছিল সেই কোমল কৌর তো স্বর্গে গিয়েছেন। তাই পুরো গল্পটা না হয় আমিই পরে বুঝিয়ে বলব।”

বার্নিং শিখের ভয়াবহ মুখে এতক্ষণে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল, “ঠিকই ধরেছেন স্যার। আপনি শেষপর্যন্ত ধরেই ফেললেন। ওটার রহস্যটা আমিও সবটা জানি না। কোমলদিদি শুধু দেখিয়ে দিয়েছিল কী করে কী করতে হবে। এর বেশি আমারও জানা নেই। কিন্তু যে নেই, তাকে টানবেন না। আমিও বলতে পারব না। আপনিই বরং পরে বুঝিয়ে বলবেন খন। এরপর তো অনেক সময় পাবেন।”

“হ্যাঁ।” সে মাথা নাড়ল, “সময় তো অনেক পাবো। তবে তার আগে সবার সঙ্গে তোর পরিচয়টা করিয়ে দিই। এদের সবাইকেই তুই চিনিস। অর্ণব, পবিত্র, মিস্ দত্ত, প্রণবেশদা, মিস্ বোস—সবারই খবর রাখিস তুই। উনি নিউ রিক্রুট? মিস্ অরোরা। আর যিনি এইমুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধীর নিখুঁত মেক-আপে তোর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিও অচেনা নন। উনি মিস্ আহেলি মুখার্জি। ফরেনসিক এক্সপার্ট। ডঃ চ্যাটার্জিকে তো তুই হুমকি দিয়ে প্যাভিলিয়নে পাঠাতে পেরেছিলি। কিন্তু মিস্ মুখার্জি নট আউট ছিলেন। ব্রেভো মিস মুখার্জি, গ্রেট পারফরম্যান্স। গ্রেট ওয়ার্ক।”

পবিত্র এই তথ্যটা পেয়ে চমকে উঠল। ঢোঁক গিলে বিড়বিড় করে বলে, "মিস্ মুখার্জি শেষে ইন্দিরা গান্ধী টু পয়েন্ট জিরো!" মিস্ বোস, মিস্ অরোরাও বিস্মিত।

মিস্ দত্ত প্রায় আঁৎকে উঠেছে। প্রণবেশ লাহিড়ী ভিরমি খেয়ে বললেন, "এটা আহেলি। মাই গড়। আমি সত্যিই ইন্দিরা গান্ধীর ডুপ্লিকেট ভেবেছিলাম।"

"ডুপ্লিকেটটা বানাতে প্রায় দশ ঘণ্টা লেগেছে প্রণবেশদা। বিশেষ করে ওঁর মুখের রিঙ্কলগুলো। যা-ই হোক্।" অধিরাজ হাসি হাসি মুখে বার্নিং শিখের দিকে ফিরেছে, "পরিচয় জেনে স্যাটিসফায়েড?"

ওই ভয়ংকর মুখ সত্ত্বেও এতক্ষণে ওকে মানুষ বলেই মনে হচ্ছিল। তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, "আপনি আমায় ব্যথা দিয়েছেন স্যার। আমার 'দুখতি রগে' হাত রেখে দিয়েছেন। আমায় বোকা বানিয়েছেন। তবু রাগ করতে পারছি না! জানতাম না, মিথ্যেও মানুষকে এত শান্তি দেয়। ব্যথাও এত সুখ দিতে পারে। আপ জিত গয়ে স্যার, ম্যায় হার গয়া! বার্নিং শিখ আজ মর গয়া। সে শেষ হয়ে গেল। তবু দুঃখ পাচ্ছি না।"

অধিরাজের মুখের হাসিটা এবার মিলিয়ে গিয়েছে। সে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওঁকে তো তোমরা সবাই চেনো। এমনিতে বার্নিং শিখ বা ফ্যান্টম শিখ নামেই ন্যাশনালি বিখ্যাত। এই রূপটাও ফেমাস। তবে অন্য অনেক নাম আর রূপও রয়েছে। একগাদা হুলিয়া, একগাদা নাম। সব কি আর মনে থাকে? তবু উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা বলি। যেমন ফাদার স্টেফানো মাইনো, ড্রাইভার কেহর সিং, বিরজুর বন্ধু নাথুরাম, রাজেন্দ্র কুমার, মহম্মদ ইউনুস, পরমেশ্বর নারায়ণ রেড্ডি, রামেশ্বর রাও, সমা বিবি, বৌদ্ধ লামা বুদ্ধদত্ত, বুড়ি রাঁধুনী কমলা, ওয়ার্ডবয় স্যাম ত্রিবেদী। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এখানে, প্রিয়দর্শিনী।"

"প্রিয়দর্শিনী।"

প্রায় প্রত্যেকেই মূর্তিবৎ স্থির। আর কত বিস্ময় বাকি রয়েছে। এটা ওদের সবার চিন্তার বাইরে ছিল। আত্রেয়ী হাঁ, "অ্যাঁ। শ্রীদর্শিনীর মা? মা-ই-গ-ড। আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি!"

"আসল মা নন্। শ্রীদর্শিনী নিঃসন্দেহে আসল। কিন্তু এখানে মা-টি নকল। শ্রীদর্শিনীর আসল মা কোথায়? বেঁচে আছেন? না তাঁকেও খুন করে ফেলেছিস?"

বার্নিং শিখ মাথা নাড়ল, "না। প্রায় মরা মানুষকে আর কী মারব? তিনি ক্যান্সারে ভুগছেন। লাস্ট স্টেজ। শ্রীদর্শিনী অভিনয় করে ঠিকই, কিন্তু ওর আমদানি তেমন সাঙ্ঘাতিক নয়। যা পায়, তার চেয়ে বেশি গচ্চা দেয় নানারকম শখে। আইয়াশ লড়কি। কোমল দিদির সঙ্গে কী করে যেন ওর আলাপ হয়েছিল। দিদিই ওকে টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে। আর্বানার দামি ফ্ল্যাট, গাড়ি, সব কোমল দিদিরই দেওয়া। ভূপেন্দ্র দত্তার পাশে রাখার জন্যই এত তোড়জোড়। তার ওপর ওর মায়ের চিকিৎসাও মুম্বাইয়ে হচ্ছে। মুম্বাইয়ের হসপিটালই ওঁর বাড়িঘর। সে খরচও কোমল দিদিই দিত। এখন আমার কাছ থেকে টাকা নেয়। শর্ত একটাই ছিল। আমার পরিচয় গোপন করে, ওর মা বানিয়ে সঙ্গে রাখতে হবে। আমি পুরুষ বলে প্রথমে মানা করছিল। তারপর টাকার অঙ্ক শুনে রাজি হয়ে গেল।"

"শ্রীদর্শিনী তোর আসল পরিচয় জানে?"

"প্রথমে জানত না। ওর টাকার দরকার ছিল, তাই ভাবনা চিন্তা না করে কোমলদিদির কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল।" গুলশন সিং অধোবদনে বলে, "কিন্তু পরে সন্দেহ করেছিল। তখন ভয় দেখিয়েছিলাম, ওর মায়ের চিকিৎসা আর হবে না। যে মোটা টাকাটা এখন পাচ্ছে সেটাও পাবে না। তাই বাধ্য হয়ে...।"

"বুঝলাম।" সে আবার একঝলক উপস্থিত সকলকে দেখে নেয়, "উনি বহুনামে পরিচিত ঠিকই। তবে ওঁর আসল নাম গুলশন সিং ধিলোঁ ওরফে গুল্লু। অন্তত যতদিন উনি মঙ্গলপুরীতে ছিলেন, ১৯৮৪ সালের আগেও ওই নামই ছিল।"

"এটা সবাই জানে।

পবিত্র নিস্পৃহ মুখে বলল, "যার জন্য আমরা প্রায় প্রত্যেকেই ওকে খবরি গুল্লু, মানে

গুলাব সিং-এর সঙ্গেই গুলিয়ে ফেলছিলাম। অর্ণব তো রীতিমতো সন্দেহই করেছিল যে ইনফর্মার গুল্লুই আসল বিশ্বাসঘাতক।"

"অর্ণবের সন্দেহ অর্ধেক ভুল, অর্ধেক ঠিক।" অধিরাজের কণ্ঠস্বরে এবার তিক্ততা, "ইনি ইনফর্মার গুলাব সিং নন্। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক তো বটেই। আমি ভাবতেই পারি না, এই লোকটা অর্ণবের দিকে অ্যাসিড ছুড়েছে, আমাকে তো অজস্রবার খুন করতে গিয়েছিল, অর্ণবকে ঠান্ডা মাথায় গাড়িতে বন্ধ রেখে আর একটু হলেই উড়িয়ে দিচ্ছিল, ইসমাইল, রকি, সনৎকে অমন বীভৎসভাবে শেষ করেছে, পুলিশগুলোকে কেটে কুচিকুচি করেছে। অথচ সবাই ওকে চোখ বুজে বিশ্বাস করেছিল। এত বড়ো বেইমানি। আবার বেয়ন্ত সিংকে গদ্দার বলে! তুই নিজে কী?"

গুলশন সিং একেবারে চুপ। ভর্ৎসনা শুনে তার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। সে কোনো জবাব দিল না। তার নীরবতায় অস্থির হয়ে এবার ব্যথিত স্বরে ভীষণ আফসোসে অধিরাজ বলে ওঠে, "এটা তুই কী করলি? কারোর কথা একবারও ভাবলি না? ছেলেটার একমাস পরে বিয়ে। এত সাধ করে, ঘটা করে বিয়ে দিচ্ছিস, ছেলের বউয়ের মুখও তো দেখতে পাবি না। পুপুল আর রতি বউদির কথা একবারও তোর মনে পড়ল না ঘন্টু? ওদের কী হবে? তুই তো ফাঁসিতে চড়বি। আর সারাজীবন সাজা ওরা ভোগ করবে। কী করলি তুই। কেন করলি? এত বছরের বিশ্বাসের এই মূল্য দিলি?"

ঘন্টু! এটা খবরি ঘন্টু? বার্নিং শিখ ওরফে গুলশন সিং আদতে সি.আই.ডি. হোমিসাইডেরই অতি বিশ্বস্ত সুপারস্টার খবরি ঘন্টেশ্বর দাস। সকলের মাথাতেই যেন প্রচণ্ড কানফাটানো শব্দে বাজ পড়ল। শুধু বাজ নয়, তার সঙ্গে যতরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, তুষারঝড়, অগ্ন্যুৎপাত সবই যেন হুড়মুড়িয়ে চলে গেল ওদের ওপর দিয়ে। অর্ণবের পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। এটাই বোধহয় শোনা বাকি ছিল! তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে ঘন্টুর সেই চিরপরিচিত সদাহাস্যময় মুখ, প্রশান্ত চোখ আর রহস্য করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলার ভঙ্গি। কুড়ি বছর ধরে একটানা কত কেসে সে হাসিমুখে সাহায্য করে গিয়েছে তার হিসেব নেই। সেই চেনামুখই কিনা এই বিকট দৈত্যের মুখোশের পেছনে লুকিয়ে ছিল! স্যার এসব কী বলছেন? এটা কি বাস্তবেই ঘটছে, না ভয়াল দুঃস্বপ্ন! ঘন্টু তাকে ওইভাবে খুন করতে চেয়েছিল? সি.আই.ডি.-র কুড়ি বছরের বিশ্বস্ত সঙ্গীর কিনা শেষে এই রূপ। এসব কি সত্যি!

"কেন করলাম স্যার সে তো আপনি জানেনেই। যেদিন থেকে জয়েন করেছিলেন, সেদিন থেকেই তো দেখছি। আপনার অজানা কি কিছু থাকে?" বার্নিং শিখ তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলল না। কোনো প্রতিবাদও করল না। যেন জানতই যে ওর আসল নাম অধিরাজের অজানা থাকবে না। বরং খুব আস্তে আস্তে জানায়, "অনেকদিন নিজেকে আটকে রেখেছিলাম। বহুবছর...! উনিশশো চুরাশি থেকে দু-হাজার আঠেরো অবধি সময় লেগে গেল। তবু মানুষের মতোই অপেক্ষা করছিলাম। চৌত্রিশ বছর ধরে কেস চলল। বিচার আসার আগে সাক্ষীরাই মরে গেল, অর্ধেকের বেশি বিধবা, ধর্ষিতা, ভুক্তভোগীরা বুড়ো হয়ে স্বগগে গেল। চোখের সামনে একে একে রাক্ষসগুলো সব ছাড়া পেয়ে ঘুরতে লাগল। মৌজ করে জীবন কাটিয়ে কেউ ফৌত হল, তো কেউ বেকসুর খালাস। দু-চারটে চুনোপুঁটির স্রেফ ফাঁসি হয়েছিল। আর পাঞ্জাবের শিখরা দিল্লির প্রতিশোধ নিতে কয়েকটাকে খুন করেছিল। কিন্তু ওগুলো তো বোড়ে। আর কাউকে ছুঁতেই পারেনি আপনার আইন। অপরাধ করল ভিন্দ্রানয়ালে, বেয়ন্ত সিং, সতবন্ত সিং। অথচ ওদের পরিবারকে কেউ ছোঁয়নি। উলটে আদর করে পার্লামেন্টে বসিয়েছে! মরল কারা? কাটা পড়ল কারা? তবু কানুনের ওপর ভরসা ছাড়িনি। কিন্তু তারপর আর সহ্য হল না! আশায় ছিলাম, রাক্ষসদের সবচেয়ে বড়ো সর্দার, সজ্জনকুমারটা অন্তত ফাঁসিতে ঝুলবে। কিন্তু শেষে কিনা যাবজ্জীবন? একা নির্ভয়ার বলাৎকার ও খুনের জন্য চারটে লোকের ফাঁসির সাজা ছাড়া গোটা দেশ, কোর্ট অন্য কিছু ভাবলই না! দু-হাজার কুড়িতে তাদের ফাঁসিও হল। আর যে লোকটা আঠেরো হাজার

মানুষের রক্তে স্নান করে বসে আছে, তার স্রেফ যাবজ্জীবন। জীবন বাকি থাকলে তবে তো সাজা ভুগবে। এই একচোখামি সহ্য হয়?" এবার তার কণ্ঠস্বরে আগুনের আঁচ। সে আঙুল দিয়ে ভূপেন্দ্র দত্তাকে দেখায়, "এই হারামজাদাটাকে তো দেখছেনই। আমার তাওজিকে কীভাবে পুড়িয়ে মেরেছিল জানেন? ঘাড় ভেঙে, জ্বলন্ত টায়ার পরিয়ে দৌড় করিয়েছিল। তিনি দাঁড়িয়ে পড়লে বা শুয়ে পড়লেই বোতল বোতল তেল ঢেলেছে তাঁর গায়ে। দাদাদের পোড়ানোর জন্য লাইটার এগিয়ে দিয়েছিল শুয়োরের বাচ্চাটা! মেয়েদের বলাৎকার বসে বসে দেখেছে মাদারচোদ। আমরা আর্মির জওয়ান সরতাজ সিং-এর নেতৃত্বে দাঙ্গাইদের ঠেকিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছিলাম। এই 'বাঞ্চোত'টা ওখানে এসে মিটমাট করার ভাঁওতা দিয়ে, ভালোমানুষির অ্যাকটিং মেরে আমাদের সব অস্ত্র নিয়ে চলে গেল। শুধু এখানে নয়, আরও বহু জায়গায় ওর মতো শয়তান পুলিশেরা এই একই রাস্তা নিয়েছিল। সরতাজকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে শ্যুট করে দিল। শ্লা, এখনও দেখুন কেমন ভাঁজ মেরে ঘুরছে। হয়েছে কিছু? ঘন্টা করেছে আপনার আইন!"

"অ্যা-ই খানকির ছেলে!" ভূপেন্দ্র গর্জে উঠলেন, "একদম মিথ্যে কথা বলবি না। আমি কাউকে মারিনি। সরতাজ সিং আবার কে?"

"চো-ও-প্ শ্লা!" এই প্রথম হুঙ্কার দিয়ে ওঠে চিরদিনের শান্তশিষ্ট ঘন্টু। এবার ঘন্টেশ্বর দাসের জায়গা নিল ক্রুদ্ধ গুলশন সিং, "এখনও তোর বুড়ো কলজেতে এত জোর আছে যে ঝুট পে ঝুট বলছিস্! ক্যাপ্টেন সরতাজ সিংকে চিনিস না? দেশের রিভলবার দিয়ে দেশেরই 'ওয়াফাদার' যোদ্ধার মাথা ফুঁড়ে দিয়েছিলি? ভুলে গেছিস? তা তো ভুলবিই। সরতাজ সাচ্চা সিপাহী ছিল, আর তুই একটা বজ্জাত! বজ্জাত লোকেরা সব ভুলতে পারে। নিজেদের দুষ্কর্মও।"

"কিন্তু সজ্জনকুমারের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হলেও তো তুই লোকগুলোকে মারতি।" অধিরাজ জানতে চায়, "খুনগুলো তুই পরদিন থেকে করলেও রেডি তো অনেক আগে থেকেই হয়ে গিয়েছিলি। মার্ডারের প্ল্যান আর ওয়েপন ও অনেক আগে থেকেই রেডি ছিল। প্রায় একবছর আগেই দিল্লিতে তুই তেল গরম করছিলি। সাজা হওয়ার আগেই তুই ওদের ঘরে ঢুকে বসেছিলি। ওরা এমনিও মরত, অমনি ও মরত। তবে সজ্জনকুমারের ভার্ডিক্ট আর আদালতের মিথ্যে দোহাই দিচ্ছিস কেন?"

সে নেতিবাচক মাথা নাড়ল, "মরত না। কেউ মরত না। আমি একবছর আগে থেকেই রেডি হয়েছিলাম কারণ আদালতের হাবভাব দেখে দিমাগ বলছিল, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হবে না। কিন্তু মন বলছিল, শেষমুহূর্তে সব পালটেও যেতে পারে। যদি মনের কথা ঠিক হত, শেষ মুহূর্তে ওর ফাঁসি হত, তবে ফাদার স্টেফানো মাইনো, কেহর সিং, নাথুরাম, সবাই যেমনভাবে এসেছিল, তেমনভাবেই হঠাৎই গায়েব হয়ে যেত। পরিবারগুলো কিছুদিন ওদের খোঁজাখুঁজি করে আবার নতুন লোক বহাল করত। বার্নিং শিখ দেখাই দিত না। একটা লোকও মরত না। আমার মরা পরিবারের কিরে।"

পবিত্র-র মতো বকিয়ে লোকও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে এটা ঘন্টু! এবার কোনোমতে বলল, "কিন্তু তাই বলে আইন নিজের হাতে তুলে নিবি? খুন কা বদলা খুন, কান কে বদলে কান, আঁখ কে বদলে আঁখ! এমন করলে তো গোটা পৃথিবীই অন্ধ, বধির, মৃত হয়ে যাবে ঘন্টু।"

এতক্ষণে বার্নিং শিখের মুখে ঘন্টুর সেই বিখ্যাত রহস্যময় হাসিটা ঝলমল করে ওঠে। হ্যাঁ, এখন ওকে চেনা যাচ্ছে। এটা নিঃসন্দেহে ঘন্টুই বটে। সেই পেটেন্ট রহস্যমাখা কণ্ঠে বলল, "যে পৃথিবীতে আঠেরো হাজার মানুষের চিৎকার কেউ শুনতে পায় না, দিল্লির রাজপথে হাজার হাজার শিখদের টুকরো টুকরো দেহ কেউ দেখে না, মৃতরা শিখ বলে অন্য ধর্মের লোকেরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামে না, চৌত্রিশ বছর অপেক্ষা করার পরেও সুবিচার আসে না, বিচারের নামে হাস্যকর নৌটঙ্কি আর তামাশা হয়, সেই পৃথিবীতে কি আদৌ কেউ বেঁচে আছে আচায্যি স্যার? সেই পৃথিবীর চোখ, কানের দরকার কী?"

অদ্ভুত প্রশ্ন! কিন্তু মোক্ষম। এর জবাব দেওয়ার সাধ্য বোধহয় উপস্থিত কারোরই ছিল না। সকলেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কেউই কিছু বলতে পারছে না। একটা দীর্ঘসময় নিশ্চুপ থাকার পর অধিরাজই ফের স্তব্ধতা ভাঙল, "বেয়ন্ত সিং প্রায় দশ বছর ডিউটি করেছিল। তুই তো বেইমানিতে তাকেও মাত দিলি। কুড়ি বছরের রেকর্ড তোর! শুধু সি.আই.ডি. নয়, গোটা পুলিশ মহল তোকে চেনে, তোর দেওয়া খবরে চোখ বুজে বিশ্বাস করে। পি সি চৌধুরীর বাড়িতে যে পুলিশেরা পাহারা দিচ্ছিল, তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই কেউ কেউ তোকে চিনত। কী করে কেটেছিলি ওদের? চা খাইয়ে অজ্ঞান করে? ক্রাইম স্পটে চায়ের প্লাস্টিকের কাপ ছিল। তোর তো আবার চায়ের দোকান। চায়ের দোকানের আড়ালে একমাত্র তুই-ই পুলিশের টপ্ খবরির কাজ করিস। বাকিরা কেউ পানের দোকানি, কেউ সবজি বিক্রি করে, কেউ বাজারে ফলের ঠ্যালা লাগায়। চা-টা শুধু তোরই স্পেশ্যালিটি। গরম গরম খবর দেওয়ার বাহানায় ওদের সবাইকে ঘুমের ওষুধ মেশানো গরম চা খাইয়েছিলি, তাই না? তারপর ওদের কাটতে তোর হাত একবারও কাঁপল না! যেহেতু এত বছরের চেনা বিশ্বস্ত খবরি, তাই ওরা ভাবতেও পারেনি যে বন্ধুর রূপে যম সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কী করে পারলি তুই?"

এবার অনুতাপে ফের ওর মাথা চিবুক ছুঁয়েছে। চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ল, "মানছি স্যার, আমি বেয়ন্তের চেয়েও বড়ো নেমকহারাম আর শয়তান। ঠিকই ধরেছেন আপনি। যারা ওখানে গার্ড দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে তিনজন আমায় চিনত। ওদের ওপরওয়ালার সঙ্গেও কাজ করি আমি। ওরাই বাকিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। আগে থেকেই সাবধান ছিল যে বাইরের কোনো খাবার বা জল খাবে না। কিন্তু যেহেতু আমার লম্বা রেকর্ডে কোনো দাগ নেই, সি.আই.ডি. হোমিসাইডের আই জি সাহেবেরও প্রিয় ইনফর্মার, তাই আমার হাত থেকে চা খেতে কোনো আপত্তি করেনি। আমাকে ওরা নিজেদের লোক বলেই ধরেছিল। আর আমিও সেই সুযোগটাই নিয়েছিলাম। প্রতিশোধের জ্বালায় অন্ধ হয়ে গেছিলাম স্যার...কিচ্ছু দেখিনি... কিছু ভাবিনি....কিচ্ছু না... শুধু নিজের ভয়টাকেই সবার মধ্যে কায়েম রাখতে চেয়েছিলাম .... ডিপার্টমেন্টের লোকেদের মধ্যেও...।"

"পুলিশের গার্ডদের ওই অবস্থা দেখেই আমার সন্দেহটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ওই মুহূর্তেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম যে বার্নিং শিখ ওদের অত্যন্ত পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। দিল্লি, কানপুর বা বেঙ্গালুরুকে যদি ছেড়েও দিই, কলকাতার পুলিশ অন্তত জানত যে বার্নিং শিখ সিকিউরিটি গার্ডদের কীভাবে কচুকাটা করে। তাই মরে গেলেও অপরিচিত ব্যক্তির হাত থেকে কিচ্ছু খাওয়া যাবে না।" অধিরাজ একটু থেমে বলল, "ক্রাইমসিনে চায়ের কাপ দেখেই বুঝেছিলাম কী হয়েছে। আর তোর দোকানে বসে তোর হাতের চা খায়নি, এমন কোনো পুলিশ অফিসার বা কনস্টেবল নেই। ওটা একমাত্র তোরই ব্যাকগ্রাউন্ড। তোর ওই চায়ের দোকানের কভারই তোকে ধরিয়ে দিয়েছিল ঘন্টু। বেয়ন্ত সিঙের বেইমানিতে তোদের মতো যেমন নিরীহ লোক মরেছিল, তেমন তোর কীর্তিতেও তো একগাদা ইনোসেন্ট লোক মারা পড়ল। কতজনকে ইচ্ছে করে এনকাউন্টার করালি। এমনকি তোর কাণ্ডকীর্তিতে গোটা শহরেই ফের মারপিট শুরু হয়ে গিয়েছিল। তোর জাতভাইরাও বিনা দোষে খুন হয়ে যেত যদি না আমরা ঠিকসময়ে গিয়ে পড়তাম। তোর আর বেয়ন্তের মধ্যে পার্থক্য কী রইল? এর জবাব কী দিবি?"

"এর জবাবও দিতে পারব না।" সে মাথা নাড়ল, "তবে আমার কাজে বড়োজোর কতজন নির্দোষ মরেছে? একশো, দুশো? আঠেরো হাজার সংখ্যাটার কাছে ওটা কিচ্ছু নয়। আমরা সকলেও তো নির্দোষ ছিলাম। সে কথা কেউ ভেবেছে? তবে আমি কেন ভাববো? হ্যাঁ, হয়েছি আমি একটা চরম শয়তান, রাক্ষস, পিশাচ। মেনে নিচ্ছি, আমি দরিন্দা। বেইমানও। তবু যা করেছি, বেশ করেছি। তার শাস্তিও ভোগ করতে আপত্তি নেই।"

"দিল্লির লাস্ট খুনটা করলি না কেন? দয়া হল?"

"দয়া!" সে আবার হাসল, "নাঃ। যেটাকে টার্গেট করেছিলাম, সেটা নিজে থেকেই শেষ

মুহূর্তে যমের দোরে গেল। হারামজাদা এমনিতেই বয়েস আর অসুখ-বিসুখে আধমরা হয়ে গিয়েছিল। কিছু করার আগে নিজেই টপকে গেল। ভোগার জন্য যখন আসল লোকটাই বেঁচে নেই, তখন তার পরিবারকে মেরে কী করতাম? দরকার ছিল না।"

"ইসমাইল, রকি আর সনৎ-ওদেরই বা মারার দরকার কী ছিল? ইসমাইল আর রকি তো তোর মতোই ইনফর্মার। নিজের বন্ধু, সহকর্মীদেরও ছাড়িসনি তুই!"

একটু উত্তেজিত স্বরে বলে ঘন্টু, "আমি ওদের মারতে চাইনি। কিন্তু কী করতাম? আপনি ওদের পি সি চৌধুরী আর ভূপেন্দ্র দত্তার বাড়িতে যারা যারা আসে যায়, সবাইকে স্টক করতে বলেছিলেন। ওখানেই সত্যনাশ হয়েছিল। ওরা ভীষণ ধূর্ত খবরি আর মারাত্মক স্টকার। আর একটু হলেই ধরে ফেলছিল যে পি সি চৌধুরীর বাড়ির কমলা, আর আর্বানার প্রিয়দর্শিনী একই লোক! সন্দেহও করেছিল। আপনাদের বলার আগেই ওদের থামাতে হত। নয়তো আমি ধরা পড়তাম। তবে ওরা এটা জানত না যে দুটোই আমি। আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিল। তাই ওদের মারতে অসুবিধে হয়নি। সনৎকে মেরেছিলাম চ্যাটার্জি স্যারকে ভয় দেখাতে। কারণ ওঁর ক্ষমতাকেই আমি ভয় পাই। ভেবেছিলাম, ঠিক সব কারিকুরি ধরে ফেলবেন।"

"কারিকুরি তো এমনিই ধরা পড়ল। তোর বেইমানিও।"

"হ্যাঁ। মানছি বার্নিং শিখ অনেক 'হাথকন্ডে' করেছে।" ঘন্টু নিস্তেজভাবেই বলে, "কিন্তু স্যার, খবরি ঘন্টু কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত নিজের ডিউটি ঠিক করে গেছে। আপ্তে শেঠের কাছে আপনাকে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। কুড়ি লিটার কেরোসিনের কেসটাও বলেছি। কোমলদিদির বাড়িতে আপনারা গেলে কী হতে পারে তা জানা সত্ত্বেও ওর লিড আমিই দিয়েছিলাম। কোমলদিদি মরবে জেনেও বুকে পাথর রেখে আপনাদের ওর খবর দিয়ে গেছি। শত বেইমানির মধ্যেও এইটুকু ইমানদারি খবরি ঘন্টুর ছিল। সেখানে খাদ ছিল না।"

"হুঁ। অদ্ভুত ইমানদারি। ছাড়।" অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "গুলশন সিং থেকে খবরি ঘন্টেশ্বর দাস হলি কী করে?"

সে আবার করুণ হাসে। সেই পরিচিত স্বরেই বলল, "শেষবারের জন্য একটু মাখন মারুন। গলাটা শুকিয়ে গেছে। মাখনের সুখটানটা দিয়ে নিই। তারপর বলছি।"

বিনাবাক্যব্যয়ে অধিরাজ ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট এগিয়ে দেয়। নিজের লাইটার দিয়ে সেটাতে অগ্নিসংযোগও করে দিল। খুব আয়েশ করে সিগারেটটা ধরিয়ে বুকে একরাশ ধোঁয়া ভরল ঘন্টু। আরামসূচক একটা শব্দ করে বলল, "আঃ। ব্র্যান্ডটা বড়ো ভালো আপনার স্যার! ধ্বকের কড়া মৌতাতটা হেবি। আর একটা হবে?" সে নির্বিবাদে আর একটা সিগারেট দিল, "কাজের কথায় আয়।"

অধিরাজের গলা কঠিন। ঘন্টু ফ্যাকাশে হেসে অন্য সিগারেটটা কানে গুঁজে বলে, "শ্রীদর্শিনীর ফ্ল্যাটে আমার একটা ডায়েরি আছে। একটু খুঁজলেই পাবেন। ওখানে আমার দিল্লির পরিবার আর তাদের গল্পও লেখা আছে। পড়লেই সব জানতে পারবেন। আমি বরং তারপরের কথা বলি।"

"বল্।"

"আমাকে যিনি বাঁচিয়েছিলেন তিনি বাঙালি ছিলেন। গৌরীদিদি ওরফে গৌরী বিশ্বাস। তিনিই আমার পাগড়ি খুলে, চুল কেটে, কড়া খুলে নিয়ে, শিখ হওয়ার সব চিহ্ন মুছে নিজের হিন্দু বোনপোর পরিচয়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর বোন গায়ত্রী দাসও দিল্লিতেই থাকতেন। গৌরীদিদি 'বিশ্বাস' হলেও ওঁর বোন গায়ত্রী বিয়ে করে 'দাস' হয়েছিলেন। স্বামী থাকলেও সন্তান ছিল না। গৌরীদিদি সত্যিই আমাকে বোনপো বানিয়ে ফেললেন। গায়ত্রী দাস আর ওঁর স্বামী আমায় 'গোদ' নিয়েছিলেন। সেখানেই গুলশন সিং ধিলোঁর শেষ আর ঘন্টেশ্বর দাসের জীবন শুরু। গায়ত্রী মা বাবা ঘন্টেশ্বরের' কাছে সন্তানের জন্য মানত করেছিলেন কিনা। তাই আমার নামও ঘন্টেশ্বরই হল। তারপরই আমরা দিল্লি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসি।" ঘন্টু আরাম করে গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, "আমিও নতুন বাবা-মায়ের

হাত ধরে কলকাতায় এলাম। বাংলা বলতে পারতাম না। তবে সেটা অস্বাভাবিক ছিল না। যেহেতু দিল্লি থেকে গোটা পরিবারটা এসেছিল, তাই পড়শিরা ভাবল, ছেলেমানুষটা বিদেশে বিভুঁইয়ে থেকে বাংলাই শেখেনি। মা-ও তাদের সঙ্গে তাল দিল। সবাই মিলে আমায় দিব্যি বাংলা শিখিয়ে দিল। বাঙালি হয়ে গেলাম আমি, কিন্তু পুরোনো স্মৃতি ভুলব কবে? আমার নতুন বাবা-মা আমায় উচ্চমাধ্যমিক অবধি পড়িয়েছিলেন। তার বেশি সাধ থাকলেও আর সাধ্য ছিল না। তখন থেকেই ছোটোখাটো কাজ করতে চালু করলাম। যখন যে কাজ পেতাম করতাম। আমার পালক-পিতা চাবি বানাতেন। তাঁর সঙ্গে বহু বছর চাবিওয়ালার কাজও করেছি। তাই চাবি বানানোর বিদ্যে খুব ভালো জানি। কাজ করে কামানোর পাশাপাশি নিজের চেষ্টাতেই ইংরেজি পড়তে আর বুঝতে শিখেছিলাম। ১৯৮৪-তে অত ভালো বোঝার বা জানার বয়েস হয়নি। একটু বয়েস বাড়ার পর নিজের ইচ্ছের জোরে লাইব্রেরিতে গিয়ে একের পর এক অ্যান্টি শিখ রায়টের ওপর বই পড়তে শুরু করলাম। হিন্দি বা গুরুমুখী আগেই পড়তে পারতাম। ইংরেজিও চলনসই করে নিলাম। তখন সব কিছু বুঝলাম। আর যত বুঝলাম, ততই রক্ত গরম হতে শুরু করল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করত। তবু দেশের আইনের ওপর ভরসা রেখেছিলাম। গুল্লুর স্বপ্ন ছিল উর্দি পরার। সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার যোগ্যতা তার বিশেষ ছিল না। কনস্টেবল হতে পারত, কিন্তু হাইট আর পরীক্ষায় আটকে গেল। তবে চালাক চতুর ঘন্টু একবার এক হাই র‍্যাঙ্কের পুলিশ অফিসারকে সাহায্য করেছিল। সেই অফিসারই তাকে একটু একটু করে ট্রেনিং দিয়ে নিজের খবরি বানিয়ে নিলেন। আমার দক্ষতা আর বুদ্ধি দেখে উনি এতটাই মোহিত হলেন যে নিজের ক্ষমতায় বেশ কিছুবছর আন্ডারগ্রাউন্ড ইনফর্মার আর এসপিওনেজও বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে আমার একদম যৌবনকালের ঘটনা। তখন তো আপনারা স্কুলে যেতেন বোধহয়! ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ঘুরতে হত। আর ভাষা শিখে ফেলা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। তামিল, কন্নড়, গুজরাটি, নেপালি এমনকি উপজাতিদের ভাষাও শিখে ফেলেছিলাম। তাই খাসি, গারো ভাষাও জানি।”

“হ্যাঁ। সে প্রমাণও আমরা পেয়েছি। তারপর?”

“গুলশন সিং পুলিশ হয়নি, কিন্তু ঘন্টু পুলিশের খবরি ঠিকই হল। বহুবছর প্রাণ হাতে নিয়ে আন্ডারগ্রাউণ্ডে কাজ করার পর কর্তারা খুশি হয়ে ঝুঁকির কাজ থেকে মুক্তি দিলেন। তখনও আইন-কানুন-আদালত -পুলিশের ওপর বিশ্বাস ছিল... কিন্তু...!”

“দু-হাজার আঠেরোতে আর রইল না।” অধিরাজ বলল, “গুলশন সিং থেকে ঘন্টেশ্বর দাস অবধি সব ঠিক ছিল। কিন্তু এরপর একেবারে বার্নিং শিখ। কী ছিলি! কী হলি!”

“বুঝবেন না স্যার।” ঘন্টু মাথা নাড়ে, “আমার জ্বালা আপনি কেন, কেউ বুঝবে না। নতুন পরিবার, নতুন জীবন সব হল, কিন্তু পুরোনো স্মৃতি যাবে কোথায়? তবু নিজের ঘর সংসার বসালাম। যখন রতিকে বিয়ে করলাম তখন বুঝতে পারলাম ভালোবাসার নারী কাকে বলে! পতি-পত্নীর সম্পর্ক কী। তাদের ইজ্জত নিয়ে যখন কতগুলো জানোয়ার চোখের সামনে খেলা করে, তবে কেমন লাগতে পারে! কত অসহায় পুরুষ যে নিজের বউকে চোখের সামনে বলাৎকার করতে দেখেছিল...!” তার চোখে বাষ্প, “তারপর যখন পুপুল এল, তখন বুঝলাম বাপ হওয়ার সুখ কী। পুপুল একটু পড়ে গেলে, ওর হাত পা ছড়ে গেলেই আমার বুকে বাজত। একবার ওকে মাস্টার থাপ্পড় মেরেছিল। মনে হয়েছিল আমারই বুঝি গাল জ্বালা করছে। আর আমার বাপু তার দুই ছেলের গায়ে আগুন লাগতে দেখেছিলেন। ওর চোখের সামনে দুই ছেলেকে পোড়ানো হচ্ছিল। তাঁর তখন কেমন লেগেছিল? ওঁর জ্বালা তখন বুঝেছি... আর সহ্য হল না। আর না...।”

“এখন রতিবৌদি আর পুপুলের কী হবে? যখন ওরা জানতে পারবে যে সবচেয়ে কাছের মানুষটাই আসলে একজন জঘন্য খুনি, তখন ওদের মনের অবস্থা কী হবে সেটা ভেবে দেখেছিস?”

সে সিগারেটটায় শেষ সুখটান দিয়ে ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসল, “আপনার কী মনে হয়? ওরা

জানে না?”

আবার বিস্ময়ের জোরদার ধাক্কা। অধিরাজ কিছু বলার আগেই অর্ণব বলে উঠল, “রতিবৌদি আর পুপুল সব জানে?”

“হ্যাঁ সরকার স্যার।” ঘন্টু মাথা নাড়ায়। বিধ্বস্ত কণ্ঠে বলল, “প্রথমে লুকিয়ে রেখেছিলাম। অন্য শহরে যখন ছিলাম তখন কিছু হয়নি। তারপর কলকাতায় যখন বার্নিং শিখ এল, তখন বার্নিং শিখের পোষাক আর প্রস্থেটিক মেক-আপগুলো ওরা হুট করেই একদিন দেখে ফেলেছিল। লুকিয়ে রেখেছিলাম, তবু ধরা পড়ে গেলাম। রতি তখনই আপনাদের ফোন করে সব জানিয়ে দিত। ওকে পুপুলের কসম দিয়ে কোনোমতে আটকেছি। কিন্তু ও বলল, আমার মতো শয়তান, জানোয়ার, খুনির সঙ্গে থাকতেও নাকি ঘেন্না করে। তাকিয়ে দেখলাম, পুপুলের চোখেও নফরত। ও বাবাকে নয়, একটা দরিন্দাকে দেখছিল। সেই থেকে বাঁচার একমাত্র কারণটাও চলে গেল স্যার। আমার আর কোনো ঘর রইল না! ওরা আমায় ত্যাগ করেছে। তারপর থেকেই কখনও কোমলদিদির বাড়ি, কখনও ওই পরিত্যক্ত খণ্ডহরই আশ্রয় হয়ে দাঁড়াল। রোজ আমি এখানে থাকতাম না। যখন প্রয়োজন পড়ত বাইরে যেতেই হত। তখন ও দুটো জায়গাই আমার মাথা গোঁজার ঠাঁই।” সে চোখ মুছল, “এইটুকু জানি, আমার লাশটা নিতেও ওরা আসবে না। ছেলের হাতের আগুন আমার কপালে নেই।”

ভূপেন্দ্র দত্তা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এবার বললেন, “আর কতক্ষণ এ ভাষণ চলবে? বাকি ভাষণটা কোর্টে দিলে হয় না? ওর ফাঁসি তো কেউ আটকাতে পারবে না। ডেথ সেলে বসে নিজের জীবনী লেখার বা বলার অনেক সময় পাবে। তখন শুনে নেবেন। এখন হয় মালটাকে অ্যারেস্ট করুন, নয়তো ইমিডিয়েটলি ঠুকে দিন।”

“ফাঁসি?”

এবার কান থেকে দ্বিতীয় সিগারেটটা নামিয়ে এনে আগের শেষ হয়ে আসা সিগারেটের অবশিষ্টাংশের স্তিমিত আগুন দিয়ে দক্ষ ভঙ্গিতে সেটাকে ধরায় ঘন্টু। নতুন সিগারেটটায় জোরালো টান মেরে মনের সুখে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “ফাঁসিতে আমাকে চড়াতে পারবি না দত্তা। বার্নিং শিখ হেরে গেছে। সে থেমে গেছে। তার গল্প শেষ, মানছি। কিন্তু গুলশন সিং-এর গল্প যে এখনও শেষ হয়নি। যে আইন তাকে চৌত্রিশ বছরেও সুবিচার দিতে পারেনি, সেই আইন কিনা তাকে ফাঁসিতে চড়াবে? অসম্ভব।.... মরে গেলেও গুল্লু সেটা সহ্য করবে না! তোর আইনের সে ঔকাতই নেই।”

বলতে বলতেই সে একঝটকায় তুলে নিয়েছে পাশে রাখা তেলের জেরিকেনটা। অফিসাররা হাঁ হাঁ করে ওঠার আগেই কয়েক লিটার পেট্রোল নিজের গায়ে আর চতুর্দিকে ঢেলে দিয়ে বলল, “সব জ্বালার শেষ আমি নিজেই করে যাই। নিজের চেষ্টায় বেঁচেছি, নিজের চেষ্টাতেই মরব। অন্য কেউ মারবে কেন?”

সবাই হাঁ করে দেখল যে ঘন্টু নিজের গায়ে তেল তো ঢেলেছেই, তার সঙ্গে আশেপাশেও কিছুটা তেল ঢেলে একটা বাউন্ডারি তৈরি করে ফেলেছে। বেশ কিছুটা তেল সামনের কার্পেটেও পড়ল। পবিত্র ঘাবড়ে যায়, “আরে! কী করছিস্? দাঁড়া...!”

“বার্নিং শিখের আগুন শেষ। কিন্তু গুল্লুর প্রতিশোধ এখনও বাকি আছে।” কথাটা বলেই অসম্ভব শীতলভঙ্গিতে জ্বলন্ত সিগারেটটায় আরও একটা জোরদার টান দিয়ে, তার মুখের আগুনটাকে জোরদার করে এক টুসকিতে সেটাকে একদম নিখুঁত লক্ষ্যে পেট্রোলে ভেজা কার্পেটের ওপর ফেলল ঘন্টু। সে যদি সরাসরি তেলের ধারার মধ্যে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলত তবে লিকুইড গ্যাসোলিনের সংস্পর্শে আগুন ধরার বদলে সিগারেটটাই নিভে যেত। কিন্তু তার বুদ্ধিই অন্য লেভেলের। সিগারেটটাকে ও কার্পেটের ওপর এমনভাবে ফেলল যে সিগারেটের জ্বলন্ত মুখের স্ফুলিঙ্গ থেকেই এক সেকেন্ডে চড়াৎ করে প্রথমে আগুন টেনে নিল সিন্থেটিক কার্পেটটা। পেট্রোল বাইরে ছড়িয়ে পড়লে স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই খুব দ্রুত গ্যাসোলিন ভেপার তৈরি করে। তাই সিগারেটের ছোট্ট আগুনও পেট্রোলের বাষ্পের সাহায্যেই মুহূর্তের মধ্যেই বড়ো হয়ে দাঁড়াল। সেটাকে নেভানোর আগেই জ্বালানি তেলের

সংস্পর্শে এসেই হু হু করে জ্বলে উঠল দাবাগ্নি। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে কারোর কিছু করারই ছিল না। দপ্ করে মুহূর্তের মধ্যে তার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল এক অগ্নিবলয়। এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে কেউ তার ধারে কাছে যেতেই পারবে না! বাঁচাবেই বা কেমন করে। আগুন এখন পেট্রোলের যথেষ্ট ইন্ধন পেয়ে সোজা ছুটে যাচ্ছে ঘন্টুর দিকে। একটা জ্বলন্ত সিগারেট থেকে এত বড়ো অগ্নিকাণ্ড! তাও কয়েক সেকেন্ডও লাগেনি!

"ঘন্টু... না!"

অধিরাজের চোখের সামনেই ঘন্টুর পা দুটো জুতোসহ জ্বলে উঠেছে। আগুন পা বেয়ে নিমেষে চড়চড়িয়ে উর্ধ্বগামী। অথচ আশ্চর্য। তার মুখে যন্ত্রণার একটুও চিহ্ন নেই। আগুনও বুঝি তাকে আর জ্বালাতে পারে না। এ বিশ্বচরাচরের কোনো কিছুরই কি ক্ষমতা আছে গুলশন সিংকে কষ্ট দেওয়ার? সে আবার সেই রহস্যমাখা হাসি হাসল, "একটাই দুঃখ রইল স্যার। উনিশশো চুরাশিতে যদি আপনি থাকতেন, বা আপনার মতো কয়েকটা উর্দিওয়ালা থাকত, তবে এ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন জন্মাতই না! পুপুলের বিয়ের দায়িত্ব এবার আপনার।"

বলতে বলতেই সে অসম্ভব নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে বিরূপাক্ষ-র দিকে তাকায়। অর্ণবের রক্তহিম হয়ে যায়। এখনও কী ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহা সে চোখে। সারা গায়ে আগুন জ্বলছে। কিন্তু সব যন্ত্রণার উর্ধে উঠে গুল্লু বা ঘন্টু নিজের অটুট সংকল্পে স্থির। প্রতিশোধ সে বুঝে নেবেই। চিৎকার করে ডানহাতটাকে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে বলল, "বো-লে সো-ও-ও নি-হা-ল!"

উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরেই অধিরাজ আগ্নেয়াস্ত্র তাক করেছে একদম ওর কপাল লক্ষ্য করে, "না ঘন্টু! একদম না!"

আগুন এবার পরম আদরে ঘন্টুর কোমরকে সাপটে ধরে উঠে আসছে বুকের ওপর। জ্বালানি তেলে আদৃত তার শরীরকে নির্বিবাদে পুড়িয়ে চলেছে। চতুর্দিকে উৎকট ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ। পবিত্র দিশেহারার মতো বেডরুমের দিকে দৌড়োতে দৌড়োতেই চেঁচায়, "ব্ল্যাঙ্কেট... ব্ল্যাঙ্কেট কোথায়...।" মিস্ দত্ত ওয়াশরুমের দিকে গেল। হয়তো জলের খোঁজে। আহেলি এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। এতক্ষণ সাহসে নিজের স্নায়ুকে শক্ত করে রেখেছিল। এবার নিয়ন্ত্রণ হারাল। তার সামনে আস্ত একটা জ্যান্ত লোক দাউদাউ করে জ্বলছে! সে থরথর করে কাঁপছিল। হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে অধিরাজকেই জাপটে ধরেছে। মিস্ অরোরার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারছে না। প্রণবেশ লাহিড়ী আর অপেক্ষা না করেই প্রথম ফায়ারটা করলেন। বুলেটটা তার কাঁধে লাগল। ঘন্টু তার ইমপ্যাক্টে শুধু একটু কেঁপে উঠল। অথচ আর কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই! একটা কাতরোক্তিও না। বরং তার চোখ এবার ঘুরল সোনালির দিকে। চোখের ভেতরেও যেন আগুন! সোনালির দিকে খুনির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফের চেঁচিয়ে উঠেছে, "বো-লে-এ-এ সো-ও-ও নি, হা, ল।"

"আই সেইড, নো! একদম না।"

অধিরাজ এখনও তার মাথা লক্ষ্য করে রিভলবার তাক্ করে আছে। আঙুল ট্রিগারে। এক পা এগোলেই সব ক-টা গুলি ভরে দেবে। ওই অন্তিম মুহূর্তেও ঘন্টু বুঝতে পারল যে এখানেও সে ব্যর্থ হতে চলেছে। সোনালির গায়ে আঁচড় কাটার আগেই তার মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে এই শাপশুট্যারের গুলি। অধিরাজ ব্যানার্জি তাকে এক পা-ও এগোতে দেবে না!

আগুন এবার তার কণ্ঠলগ্না হয়েছে। পাগড়িটাও জ্বলছে। সারা শরীরে অগ্নিশিখা একদম সম্পূর্ণ আগ্রাসী জিহ্বা বের করে চেটে খাচ্ছে তার মাংস-পেশী। তবু মুখের একটা রেখাও নড়ছে না। তার চোখ ভয়ার্ত শালিনীকে একবার ছুঁয়ে গেল ঠিকই। তবে বড়ো অবহেলার সঙ্গে। যেন বুঝে নিল, এই মানুষটিকে দিয়ে তার কাজ হবে না। পরক্ষণেই স্থির প্রতিজ্ঞায় ন্যস্ত হল ভূপেন্দ্র দত্তার ওপর। দপদপে জিঘাংসা যেন দু-চোখ দিয়ে ফেটে পড়ছে। আগুন সমেত জ্বলন্ত হাতটাকে ছুড়ে দিয়ে সে ফের সেই বিখ্যাত রণহুঙ্কার দিল, "বো-লে-এ-এ-এ সো-ও-ও নি-হা-ল!"

অধিরাজ এবারও তার ওপর থেকে নিশানা একচুলও সরাল না। কিন্তু নীচু স্বরে বলল, "সৎ শ্রী অকাল!"

বোধহয় এই শব্দটারই অপেক্ষায় ছিল ঘন্টু। সমস্ত অফিসাররা উত্তরটা শুনে বিহ্বল বিস্ময়ে একমুহূর্তের জন্য অধিরাজের দিকে তাকায়। সেই ফাঁকেই জ্বলন্ত লোকটা সবার ক্ষণিক অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে 'মার মার' করতে করতে গিয়ে লাফিয়ে পড়েছে ভূপেন্দ্র-র ওপরে। একটা আগুনপাখি যেন বিরাট দুই ডানা ছড়িয়ে জাপটে ধরল এক্স পুলিশকর্তাকে! অগ্নিদেব মুহূর্তের মধ্যে এবার ভূপেন্দ্র-র অগ্নিপরীক্ষা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠেছেন। প্রণবেশ আর টুইঙ্কল অরোরা ফায়ার করতে গিয়েও থমকে গেল। ঘন্টু এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে ভূপেন্দ্র দত্তাকে যে তাকে গুলি মারতে গেলে দত্তাসাহেবের গায়েই লাগার প্রবল সম্ভাবনা! তবু প্রণবেশ মরিয়া হয়ে লোকটার দুই পা লক্ষ্য করে একাধিক ফায়ার করলেন। সে আবার কেঁপে উঠল। তবু তার লৌহকঠিন আলিঙ্গন একটুও আলগা হল না! পা বেয়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই পায়ের ওপরই ভর দিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও টলছে না।

"অনেককে জ্বালিয়েছিস্! আমার দুই ভাই সুদ্ধ মহল্লার সব বাচ্চাকে ...।" তীব্র প্রতিশোধস্পৃহায় ভূপেন্দ্র-র টুঁটি টিপে ধরে হিড়হিড় করে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে আসতে বলল ঘন্টু, "এবার নিজে একটু জ্বলে দ্যাখ... চেঁচা... কত চেঁচাবি চেঁচা...।"

"সে-ভ মি-ই-ই-ই। হেল্প...হেল্প। অ-ফি-সা-র।"

এই কয়েকটা শব্দই বোঝা গিয়েছিল। বাকিটা আর্তনাদ। এমনভাবে গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছিলেন দত্তাসাহেব, যেন তিনি একা নন, তাঁর ভেতর থেকে উনিশশো চুরাশি সালের সেই সব জ্বলে যাওয়া, গলে যাওয়া, পুড়ে ছারখার হওয়া হাজার হাজার আত্মারা মরণযন্ত্রণায় বিকৃত হাহাকার করছে। শরীর প্রায় পুড়ে গিয়েছে। তাও কী আশ্চর্য জেদ ঘন্টুর। এখনও ওই জ্বলন্ত ক্ষীণ দেহে কী প্রচণ্ড আসুরিক শক্তি। ভূপেন্দ্র দত্তা নিজেকে তার জ্বালাময়ী আলিঙ্গন থেকে ছাড়ানোর জন্য আপ্রাণ লড়ছেন। সর্বশক্তি দিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন। চেষ্টা করছেন ওই অগ্নিবলয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার। কিন্তু ঘন্টু তাঁকে কিছুতেই ছাড়ছে না। দু-জনের ধস্তাধস্তির মধ্যে কেউ ফায়ারও করতে পারছে না। দু-জনেই এমন পজিশনে যে ঘন্টুকে গুলি করলে বুলেটটা ফুল ভেলোসিটি নিয়ে তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে সোজা ভূপেন্দ্র-র গায়েই লাগবে। সেই ন্যূনতম চান্সটুকুও কেউ নিতেই পারছে না। কোনোরকম সাহায্য করবে কী।

"বা-বা!" সোনালি চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, "প্লিজ... সামবডি সেভ হিম..... বা-বা!"

বিরূপাক্ষ ভয়ে বিবর্ণ। সে টলেই পড়ে যাচ্ছিল, জুজুৎসু তার পরিচর্যা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সোনালি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো কেঁদেই চলেছে আর সাহায্য চাইছে। অফিসাররা কী করবে, কীভাবে ভূপেন্দ্রকে বাঁচাবে বুঝতে পারছে না। তাঁর চতুর্দিকে এমন অপ্রতিরোধ্য আগুনের দেওয়াল যে তাকে টপকে যাওয়া অসম্ভব। তার চেয়েও অসম্ভব ঘন্টুকে ঠেকানো। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার। শালিনী একদম শীতল দৃষ্টিতে, অবিচলিত ভঙ্গিতে গোটা ঘটনাটা দেখছেন। যে লোকটা পুড়ছে সে যে ওঁর স্বামী, জীবনসঙ্গী, সন্তানের পিতা, তা মনেই হয় না! ওঁর নিরাসক্ত মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, উনি জানতেন এটাই হতে চলেছে এবং এটাই বোধহয় হওয়া উচিত ছিল!

ইতিমধ্যেই ফ্ল্যাটের দরজার বাইরে আতঙ্কিত হাঁকডাক শুরু হয়ে গিয়েছে। পার্শিয়াল সাউন্ডপ্রুফ রুমও ভেতরের এই মুহুর্মুহু ফায়ারিঙের কানফাটানো আওয়াজ, চিল চিৎকার, ধোঁয়া, পোড়া গন্ধকে ঠেকাতে পারেনি। আগেরবারের ফায়ারিঙের শব্দ পেলেও কেউ হয়তো অতটা মাথা ঘামায়নি বা গুরুত্ব দেয়নি। অনেকসময় পাশের বাড়ির টিভি থেকেও ওরকম আওয়াজ আসে। কিন্তু এবার সব মিলিয়ে শোরগোল, কোলাহল ডেসিবেলের সমস্ত মাত্রাকেই বোধহয় ছাপিয়ে গিয়েছে। সঙ্গে তাল মিলিয়েছে ফায়ার অ্যালার্মের আওয়াজ। বাইরের ভয়ার্ত চিৎকারে বোঝা গেল দরজার বাইরে লোক জড়ো হয়েছে। অথচ দরজা

ভেতর থেকে লকড্। কেউ ঢুকতেও পারছে না। শোনা গেল বাসিন্দাদের ও সিকিউরিটি গার্ডের ডাকাডাকি। তারা দরজায় অসহায়ভাবে ধাক্কা মারছে আর চেঁচাচ্ছে, "মিঃ দত্তা... দত্তাসাব... দরজা খুলুন... আগুন লেগেছে... তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন স্যার...।"

দত্তাসাহেব আর দরজা খুলবেন কী। তিনি নিজেই তো জ্বলছেন। আগুন ঘন্টুর গা থেকে দু-হাত বাড়িয়ে চূড়ান্ত আশ্লেষে, ভয়াবহ উল্লাসে তাঁকেও আপাদমস্তক সাপটে ধরেছে। যেন দাবাগ্নির হাজার হাজার হাত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ওঁকে। ভোক্যাল কর্ডও কালো ধোঁয়ায়, আগুনে পুড়ে প্রায় চোকড হয়ে এসেছে। তবু আপ্রাণ চেঁচিয়ে যাচ্ছেন। পবিত্র ততক্ষণে ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে ছুটে এসেছে। কিন্তু কার গায়ে জড়াবে! ঘন্টু আর ভূপেন্দ্র দত্তাকে বেড়ে ধরে আছে আগুনের গোল বাউন্ডারি। তাকে অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব। আত্রেয়ীও জল এনেছিল। সে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখল যে এই ভয়াবহ আগুন নেভানো এই সামান্য একবালতি জলের কাজ নয়। গোটা ট্যাঙ্কটাই ঘাড়ে করে আনতে হত।

"রা-জা!" পবিত্র উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, "তুমি ঘন্টুর মাথায় বা ঘাড়ে শ্যুট করো। ওই পোর্শনটা একমাত্র তোমার রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে...! কিল্ হিম রাইট নাও...!"

"না ব্রাদার! দু-জন একদম জড়িয়ে আছে। ওর মাথায় গুলি চালালে মিঃ দত্তারও মাথা ফুটো হবে। উনিও মরবেন। একজন সিনিয়র আই পি এস অফিসারের খুনের দায় নিতে পারব না আমি। স্যরি।"

অধিরাজ খুব শান্তস্বরে উত্তর দিয়ে এবার রিভলবারটা সরিয়ে নেয়। ভয়ার্ত আহেলিকে সযত্নে এক হাতে আলগোছে জড়িয়ে ধরে যেন আশ্রয় দিল। সে স্থির দৃষ্টিতে দেখছে ভূপেন্দ্র দত্তা প্রাণপণ আগুনের গণ্ডী পেরোনোর চেষ্টা করছেন, আর ঘন্টু বারবার তাকে টেনে হিঁচড়ে নিজের জ্বলন্ত আলিঙ্গনে ফিরিয়ে নিচ্ছে। ও মরে যাবে, তবু ছাড়বে না। দু-জনেরই জীবনীশক্তি শেষের পথে। যারা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে দু-জনই মরবে! দু-জনেই আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ভূপেন্দ্র দত্তার এখন আর আর্তনাদ করার শক্তিও নেই। তাঁর গোঙানি শোনা যাচ্ছে। চর্বি, মাংস সব পুড়ে ছারখার! ঘন্টুর পাগড়িসমেত চুল পুড়ে ছাই হয়েছে। সে তার ভয়াবহ মুখ তুলে কোনো এক অজানার দিকে তাকাচ্ছে। মুখে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল হাসি। যেন বহুদিন বাদে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মানুষের সঙ্গে মিলন হচ্ছে তার!

"টিম্ টিম্ করদে নিকে নিকে তারে, লগ্ দে সানু বহোত পিয়ারে, জি কর দা মৈ তোড়ি যাওয়া, অপনে ওয়াড়ি ভিচ্ বিছাওয়া...!"

ঘন্টুর কানে সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে এল বেবের সুরেলা কণ্ঠের 'লোরি'। তার চোখের সামনে এখন আর আগুন নেই। বরং আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চতুর্দিক।

বেবে, বাপু, দিদি, তাওজি, তাইজি, সরবজিত, আমনপ্রীত, সবাই সাদা নক্ষত্রের ঝালর পরে এসে দাঁড়াল তার চারপাশে। ওরা হাসছে। বেবে শ্বেতপাথরের মতো হাতদুটো ছড়িয়ে বলল, "গুল্লু পুত্তর... অনেক হয়েছে... অব বস্ কর। আ যা! অনেক কষ্ট পেয়েছিস্, ঘুম যা বেটা... আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়।"

ঘন্টু মনে মনে বলল, "আসছি মা... আসছি...। এই শরীরটা বড্ড বড়ো আর ভারি...। এটাকে ছেড়ে আমি সেই আট বছরের গুল্লু হয়ে আসছি... শুধু আর কয়েকটা মুহূর্ত দেখ!"

অর্ণব সবিস্ময়ে শুনল অধিরাজ খুব চাপা স্বরে বলল, "ডকে সর্দারা।"

আর মাত্র দু-মিনিট! মাত্র দু-মিনিট লেগেছিল। তার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। ঘন্টুর পুড়ে যাওয়া মৃতদেহটা যখন লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপরে তখনও সে মরণালিঙ্গনে জড়িয়ে রেখেছে ভূপেন্দ্র দত্তার পার্থিব শরীরকে। মরে গিয়েও ছাড়ল না নিজের অপরাধীকে। আই পি এস দত্তা বহু প্রচেষ্টাতেও সেই মৃত্যুর হাত থেকে বেরোতে পারেননি। দুটো শরীরই যখন নিথর হয়ে গেল তখনও আগুন জ্বলছে। কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না যে দু-জনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। আগুন এখন স্রেফ দুটো লাশকেই পুড়িয়ে যাচ্ছে। কোনো দেহেই প্রাণ নেই।

“রাজা!” পবিত্র সেদিকে একঝলক তাকিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় বলল, “এটা কী হল। আমরা যেদিকে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে ঘন্টুর মাথায় শ্যুট করা যাচ্ছিল না। আর ওর গায়ে গুলি মেরেও কোনো লাভ হয়নি। একমাত্র তুমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলে সেখান থেকেই ওকে শেষ করে দেওয়া যেত। অথচ তুমি একবারও চেষ্টা করলে না। অ্যাট লিস্ট মিঃ দত্তাকে তো বাঁচানোর চেষ্টা করা যেত!”

“আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে আরও হত না পবিত্র।”

অধিরাজ রাতের বেলাতেই বুক পকেট থেকে গগলসটা বের করে চোখে চাপিয়েছে। আর কেউ না বুঝলেও অর্ণবের বুঝতে বাকি নেই যে চোখদুটোকে রাতের বেলায় রোদচশমার পেছনে সে কেন লুকোল। দিনের শেষে বিজয়ীপক্ষ কখনও কাঁদে না। হিরোদের কাঁদতে নেই। অথবা কাঁদলেও তার অশ্রুকে সাবধানে ঢেকে ফেলতে হয়। লুকিয়ে ফেলতে হয় ভেজা চোখ। তবে সামান্য কম্পন তার স্বরে ধরা পড়ল ঠিকই। খুব আস্তে আস্তে বলল, “তোমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, সেখানে ল' অ্যান্ড অর্ডার ছিল। আর আমি যে স্ট্যান্ডে ছিলাম, সেখানে জাস্টিস। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।”

* * * *

(৩৫)

“মিস্ মুখার্জিকে অস্কার দেওয়া উচিত স্যার। উনি যে শেষে অমন মারাত্মক অ্যাকটিং করবেন তা বুঝতেই পারিনি। ওঁকে দেখলে কেউ বলবে যে এত দুঃসাহস ওঁর মধ্যে আছে!”

ধবধবে সাদা প্লেটে ধোঁয়া ওঠা গরম সুগন্ধী বিরিয়ানি হাতায় করে তুলতে তুলতে অর্ণবের কথা শুনে হাসল অধিরাজ, “সেইজন্যই তোমায় বলেছিলাম, যে বাইরে থেকে দেখে কাউকে বিচার কোর না। ডোন্ট বি জাজমেন্টাল। মিস্ মুখার্জির মতো নরম সরম মানুষই শেষপর্যন্ত কাজের কাজটি করে দেখালেন। যা আমাদের কারোর দ্বারা হল না, সেটা উনি অনায়াসেই করলেন। বার্নিং শিখকে শেষ করে দিলেন।”

“আপনি ভাবতে পেরেছিলেন যে উনি কাজটা পারবেন?”

অর্ণব অধিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা ছুড়ে দেয়। সে ঠোঁট টিপে হাসল, “অনেক কিছুই তোমার আমার ভাবনাচিন্তার বাইরে থাকে ডার্লিং। এই যে এত কাণ্ড হল, তার পেছনের আসল নায়িকাকে প্রথমে দেখে কেউ ভাবেইনি যে তিনিই ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হবেন।”

“ইন্দিরা গান্ধী?”

“ইয়েস, ইনডিড!” অধিরাজ প্লেটগুলো টেবিলে সাজাতে সাজাতে বলল, “ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসার একটুও ইচ্ছে ছিল না। তিনি এমনিতেই ফিরোজ গান্ধীকে নিয়ে বেজায় অশান্তিতে ছিলেন। তাঁর ওপর দুই ছেলেরও দায়িত্ব ছিল। শুরুতে শান্ত, নিরীহ, ইন্টেলেকচুয়াল গোছের একজন নারী ছিলেন। রূপসী, উচ্চশিক্ষিতা ও আধুনিকা মহিলাদের ফ্যান ফলোয়িংও প্রচুর। ওসব নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে, তাই আলোচনা না করাই ভালো। মোদ্দা কথা, লাইফে অনেক হেডেক ছিল। তার ওপর এসব প্রধানমন্ত্রীত্বের গুরুদায়িত্ব আর অশান্তি আমদানি করতে চাননি। কিন্তু ওই যে, পলিটিক্স! যখন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ‘তাসখন্দ চুক্তি' করতে গিয়ে রহস্যময়ভাবে মারা গেলেন, তখন কামরাজ নিরীহ মেয়েটাকেই পাকড়াও করে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দিলেন।” সে বলতে বলতেই ফিক্ করে হেসে ফেলল, “তখন ইন্দিরা এমন ক্যাবলা ছিলেন যে পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখতে গেলেও পঞ্চাশবার তোতলাতেন। বিরোধী নেতা নেত্রীদের সামনে ওঁর ‘বোলতিই বন্ধ' হয়ে যেত। কথাই বলতে পারতেন না। বিরোধীপক্ষের সঙ্গে মিটিং এর আগে ফিট্ পড়া বাকি থাকত। ইনফ্যাক্ট, পার্লামেন্টে যেতে হবে শুনলেই তাঁর নাকি এমন পেট খারাপ হত যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাথরুমে ঢুকে বসে থাকতেন। কিংবা ওঁর জ্বর আসত বা মাথা ধরত। পলিটিক্স শব্দটাতেই অরুচি। কামরাজ, মোরারজি দেশাই, ওয়াই বি চবনের মতো সিনিয়র কংগ্রেস নেতাদের কথাতেই তিনি উঠতেন বসতেন বলে রামমনোহর লোহিয়া ওঁর নাম ‘গুঙ্গি গুড়িয়া'ও রেখেছিলেন। বোবা পুতুল। কিন্তু তখন কে জানত যে সেই গুঙ্গি গুড়িয়া-ই ভারতের ‘আয়রন লেডি' হবেন। কেউ ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু তিনি হয়েছিলেন। তাই কে যে কী হবে তা না ভাবাই ভালো।”

অর্ণব সেই ক্যাবলাকান্ত গুঙ্গি গুড়িয়া ইন্দিরা গান্ধীকে কল্পনা করার চেষ্টা করছিল। ওইরকম একজন তেজি জাঁদরেল ব্যক্তিত্বময়ী নারী, ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রীদের অন্যতমা কিনা পার্লামেন্টে গিয়ে তোতলাতেন! এ ও কি সম্ভব? ওঁর চেহারা আর ব্যক্তিত্বই তো শাণিত তরোয়ালের মতো ছিল। আর চোখদুটো কী মারাত্মক! কিছু বলারও দরকার নেই। তাকালেই সামনের লোকটির বুক গুড়গুড় করবে।

“ছোটোবেলায় ছবিতে ওই চোখ দেখেই আমি বেজায় ভয় পেতাম।” অধিরাজ এবার কাবাবের প্লেট নিয়ে পড়েছে, “একে ওইরকম বড়ো বড়ো চোখ, তার ওপর ওইরকম সাদা চুল। স্যরি টু সে, তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ ছিলাম। তাই মনে হত ওঁর হাতে একগাছি ঝাঁটা ধরিয়ে দিলে দারুণ মানাত। তবে ভয় পেলেও কৌতূহল ছিল ষোল আনা। তাই বড়ো হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাকেও এক্সপ্লোর করতে শুরু করলাম। বলাই বাহুল্য ওঁর ফ্যান হতে বেশি সময় লাগেনি। যদিও তরুণী, আধুনিকা, নিখুঁত সুন্দরী ইন্দিরার চেয়েও আমার মধ্যবয়েসি, কাঁচা পাকা চুলের ডাকসাইটে 'আয়রন লেডি'-টিকেই বেশি মনে ধরেছিল। তাই ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্কে যত বই ছিল, প্রায় সবই পড়েছিলাম। আর সেই শিক্ষাটাই এখানে কাজে লেগে গেল। ইন্দিরা গান্ধীকে না জানলে বার্নিং শিখকে ধরা অসম্ভব ছিল।"

বলতে বলতেই সে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, "সেনোরিটাজ, ডিনার ইজ রেডি। কা-ম শা-র্প।"

বার্নিং শিখের কেস ক্লোজ হয়ে গিয়েছে প্রায় একসপ্তাহ হল। সেই রাতেই মিডিয়া জানতে পেরে গিয়েছিল যে বার্নিং শিখের সমাপ্তি শেষমেষ কলকাতাতেই হয়েছে। আর্বানাকে একদল রিপোর্টার, ক্যামেরা আর বুম যখন ছেঁকে ধরেছে তখন ভূপেন্দ্র দত্তা আর ঘন্টুর পোড়া লাশ অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে। অধিরাজকে দেখতে পেয়েই যথারীতি 'স্যার...স্যার' করতে করতে ঘিরে ধরেছিল তারা। একের পর এক প্রশ্ন ছুটে আসছিল তার দিকে। বার্নিং শিখ কে, তার আসল পরিচয় কী, কীভাবে তার মৃত্যু হল, কেন তাকে গ্রেফতার করা গেল না, ভূপেন্দ্র দত্তা কীভাবে মারা গেলেন, হাজার প্রশ্ন তাদের। অধিরাজের চোখ তখনও সানগ্লাসেই ঢাকা। একবারের জন্যও সে ওই কালো চশমা সরায়নি। যথারীতি সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই 'নো কমেন্টস্' বলেই চলে যাচ্ছিল। আচমকা এক তরুণী সাংবাদিক বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল, "স্যার, এমনিতেই সর্বনাশিনী আর সার্জিক্যাল স' কিলারের কেসের পর থেকেই আপনি 'টক্ অব দ্য টাউন'। শহরের নতুন সেনসেশন। এবার তো চ্যালেঞ্জ আরও বড়ো ছিল। বার্নিং শিখ শুধু কলকাতার নয়, ন্যাশনাল প্রবলেম। খোদ দিল্লি পুলিশও তাকে থামাতে পারেনি। কিন্তু আপনি করে দেখালেন। আপনার সাহসী ভিডিও তো গোটা দেশে ঘুরছে। এখন তো অধিরাজ ব্যানার্জি গোটা দেশের 'দুলারা', টক্ অব দ্য কান্ট্রি হবেন। প্রোমোশন তো অবধারিত। নিশ্চয়ই দিল্লি থেকেও বিশেষ সম্মানের জন্য ডাক আসবে। গ্যালান্ট্রি মেডেল বা মেরিটোরিয়াস সার্ভিস মেডেলও পাবেন। এরপর কী প্ল্যানিং আপনার? নেক্সট কী করতে চান?"

অধিরাজ একটু থমকে দাঁড়ায়। যিনি প্রশ্নটা করেছিলেন তার দিকে সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আমি শুধু বাড়ি যেতে চাই। দ্যাটস্ অল।"

বার্নিং শিখের পৈতৃক পরিচয় অবশ্য পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। লোকে তাকে মঙ্গলপুরী নিবাসী গুলশন সিং ধিলোঁ নামেই চিনল। চেহারার যা অবস্থা হয়েছিল তাতে চেনাই দায়। তবে গুলাব সিং আর যাদব বুঝতে পেরেছিল তার আসল পরিচয়। কিন্তু তারা সে রহস্য নিজেদের পেটেই চেপে রেখেছে। কাউকে বলেনি। কেউ জানতেও পারেনি যে গুল্লু আসলে সি.আই.ডি.-রই তুখোড় খবরি ঘন্টু ছিল।

পোস্টমর্টেমের পর সত্যিই ঘন্টুর লাশ দাবি করতে কেউ আসেনি। রতিবৌদি বা পুপুল কেউ ওই নৃশংস খুনির শেষকৃত্য করতে রাজি নয়। কিন্তু অধিরাজই দু-জনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষপর্যন্ত রাজি করাল। রতিবৌদি কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিলেন, "সব কিছুই তো ঠিক ছিল। মোটামুটি ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিল আমাদের দিন। পুপুলটারও সামনে বিয়ে ছিল। হঠাৎ করে লোকটার মাথায় এ কী দানো ভর করল স্যার? এতদিনের চেনা মানুষটাকে আর চিনতেই পারলাম না!"

অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরে নীরব থাকাই ভালো। তবে ওদের কনভিন্স করে ঘন্টুর মুখাগ্নি পুপুলের হাত দিয়েই করিয়েছে। জ্বলার আর বিশেষ বাকিই বা কী ছিল! তবু ছেলের স্পর্শটুকুই পাথেয় করে যাক্। তবে তার শেষ ইচ্ছের সম্মানটুকুও সে রেখেছে। পুপুলের বিয়েতে অধিরাজই বরকর্তা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবং ঘন্টুর স্বপ্নের মতো ছেলের বিয়ে যাতে সম্পূর্ণ জাঁকজমকে হতে পারে তার ব্যবস্থাও করছে।

শালিনী ও সোনালির কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে অধিরাজ। মিঃ দত্তাকে না বাঁচাতে পারার জন্য দুঃখপ্রকাশও করছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়েই শালিনী বললেন, "কর্মা ইজ

আ বিচ্ অফিসার ব্যানার্জি। আমি সারাজীবন লোকটার সঙ্গে ছিলাম। তাই জানি, যেটা ও ডিজার্ভ করত, সেটাই পেয়েছে। আপনার দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণই নেই। বরং আপনাকে ধন্যবাদ যে ওর কর্মের ফল আমার নিষ্পাপ সন্তান, নাতি-নাতনিরা পায়নি। সোনালি, বিরূপাক্ষ, আয়ান আর তানিশা যে ঠিক আছে, এর জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এখন আমি যদি বেশি শোকার্ত হই, তবে নরকে বসেও ভূপেন্দ্র হাসবে। তাই ক্ষমা চাইবেন না।”

অন্যদিকে মিডিয়া ফের নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে অধিরাজকে নিয়ে। এবার তো তাদের সঙ্গে ন্যাশনাল চ্যানেলগুলোও যোগ দিয়েছে। শামস্ তাহির খান ওকে 'বঙ্গাল কা শের' উপাধি দিয়ে বসে আছেন। ক্রাইম তকের একটি এপিসোডে ইন্টারভিউয়ের ডাকও এসেছিল। অধিরাজ মৃদু হেসে নম্রভাবে এড়িয়ে গিয়েছে। কোনো টেলিভিশন চ্যানেলকেই কোনোরকম এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার দেয়নি। তবে রমানাথ চক্রবর্তীকে প্রতিশ্রুতিমত একটা বিরাট ইন্টারভিউ দিয়ে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেনি। ওঁকে চমৎকার একটা সোনা বাঁধানো পেনও গিফট করেছে। প্রেস কনফারেন্সে খুব নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেছে, “আমরা পুলিশ। নিজেদের ডিউটিটুকুই জানি। হিরোগিরি করার বা মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যেস নেই। তাছাড়া আজ যে মিডিয়া আর জনতা আমায় মাথায় করে নাচছে, কয়েকঘণ্টা আগে তারাই আমাদের ‘অপদার্থ, ওয়ার্থলেস' বলছিল। আমার একজন এফিশিয়েন্ট অফিসারকে বসিয়ে দেওয়ার দাবি করছিল। প্রচুর সমালোচনাও হয়েছে। আমি সেগুলোকেও গুরুত্ব দিইনি। এখন এইসব প্রশংসা, ভালোবাসা, উপাধি বা নাচানাচিরও আমার কাছে কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ কেস ক্র্যাক না হলে এরাই আমাদের দিকে ফের আঙুল তুলতে এক সেকেন্ড সময়ও নেবে না। অতএব থাক্। নিজের ডিউটিটাই করি।”

এর ফাঁকেই প্রিয়া বাজাজের অন্তর্ধানের খবর অর্ণব তাকে জানিয়েছিল। সে একটু বিরক্ত হয়েই বলেছে, “ওঁকে আমার যে কেসে গ্রেফতার করার ছিল, সেটা ওভার। এখন উনি জেল অথরিটিকে বাঁদর নাচ নাচিয়ে ভেগে যান, কেটে পড়ুন, সরে পড়ুন, কী গোল্লায় যান, আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি ওঁর পেছনে হারগিস আর দৌড়োতে পারব না।” এডিজি সেন তার এই জবাব শুনে আর কথা বাড়াননি। কেসফাইলটা আপাতত প্রণবেশ লাহিড়ীর কাছেই আছে। অধিরাজ প্রিয়া বাজাজকে মাথা থেকে সরিয়ে আপাতত ড্রাগ মাফিয়া কার্লোসের দলবলকে নিয়ে পড়েছে। আমনদীপ আর আকাশ সিংকে পিটিয়ে পাটিয়ে গোটা গ্যাংটাকেই ধরেছে ওরা। ওদের কাছ থেকেই জানা গিয়েছে যে কার্লোসের ড্রাগের আর একটা ঘাঁটি শহরের অন্যতম প্রমোদ উদ্যান ‘গ্রীন ভ্যালি পার্ক'। ইট কাঠ পাথরের শহরে প্রায় সত্তর-বাহাত্তর একর জুড়ে সবুজের ঢল নামিয়ে অতি সযত্নে পার্কটাকে তৈরি করেছেন নির্মাতারা। রবীন্দ্র সরোবরের আদলে অনেকখানি জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃতির এই নির্মল শোভা। সেই প্রকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ড্রাগস র‍্যাকেটের বিষ। তবে সেটা কে বা কারা চালায় তা ওরা কেউ জানে না।

অধিরাজ আপাতত ‘গ্রীন ভ্যালি পার্ক' এর মিস্ট্রির পেছনেই পড়েছে। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে যে বার্নিং শিখ কেসের জন্য বড়োসড়ো গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডও সত্যিই তার কপালে নাচছে। এডিজি শিশির সেনের কাছে তেমন চিঠিও এসেছে। তা নিয়ে তার নিজের বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বলাই বাহুল্য অনেকেই তাতে সন্তুষ্ট হয়নি, যাদের মধ্যে প্রণবেশ লাহিড়ী অন্যতম। তবে টুইঙ্কলকে ছেড়ে দিতে তিনি বিন্দুমাত্রও আপত্তি করেননি। নতুন টিম, নতুন বস্ পেয়ে টুইঙ্কল এখন অক্টোপাসের ষোল পা দেখছে। আর সুযোগ পেলেই ক্রিমিনালদের ওপর কুচুপুচু আর গোলুগোলু অ্যাপ্লাই করছে। আহেলির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে। আত্রেয়ীর সঙ্গে তো গলায় গলায় ভাব। ডঃ চ্যাটার্জির টাক ফরেনসিক ল্যাবে ফিরে এসে তার শোভা আরও বাড়িয়েছে। সঙ্গে মিস্ ব্রকোলিও। যদিও তিনি এসেই দাবি করেছেন, “আমার দুটো টেস্টটিউব আর বীকার গায়েব কী করে হল?”

বার্নিং শিখ কেসের ফাইল পার্মানেন্টলি ক্লোজ করার আর কয়েকটা ফর্মালিটিই বাকি

ছিল। তার আগেই একদিন অধিরাজ তার বাড়িতে সবাইকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানায় সাংঘাতিক বিরাট কোনো পার্টি নয়। টিমের প্রমীলাবাহিনীর সাহস, দক্ষতা ও কৃতিত্বকে সেলিব্রেট করার জন্য ছোটোখাটো একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান। অধিরাজ নিজের হাতেই রান্না করে এ কেসের নায়িকাদের খাওয়াতে চায়। শোনামাত্রই মিস্ দত্ত হই হই করে ওঠে, "আপনি তো ছুপা রুস্তম স্যার! রান্নাটাও জানেন?"

"আজ্ঞে মিস্ দত্ত।" সে সসম্মানে ঝুঁকে পড়ে, "আপনি যেমন রান্নায় দ্রৌপদী, আমিও তেমন ভীম। দুঃখের বিষয় ওই ট্যালেন্টটা দেখানোর আর চাখানোর সময় আর সুযোগ বড়োই কম। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তো এক শাম্ বীরাঙ্গনাওঁ কী নাম। কী বলেন? হয়ে যাক?"

এ প্রস্তাবে আপত্তি জানায় কেউ? অগত্যা আজ প্রমীলাবাহিনীর অনারে পার্টি হচ্ছে।

আজ এডিজি সেন অধিরাজের গোটা দিনের ছুটিই মঞ্জুর করেছেন। তবে এক শর্তে। মেল অফিসারদের, এমনকি তাঁকেও ডাকতে হবে। এবং স্টার্টারে চিকেন পকোড়া রাখতেই হবে। প্রমীলাবাহিনীর সর্বসম্মতিক্রমে মেইন কোর্স ঠিক হয়েছে—কুলচা, ছোলে, ফিশ কাবাব, চিকেন বিরিয়ানি, মাটন নল্লি নিহারি, রায়তা আর ফিরনি। মেনুটা অর্ণবের বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না দেখে তার কানে ফিশফিশ করে বলে অধিরাজ-"কান্নাকাটি কোরো না। তোমার জন্য স্পেশাল চাইনিজও থাকবে।"

সেই পার্টিই আজ হচ্ছে। সারাদিন ধরে আজ সব ডিশ নিজের হাতেই সযত্নে রান্না করেছে অধিরাজ। আর অর্ণব বিস্মিত দৃষ্টিতে তার এই নতুন রূপ এক্সপ্লোর করছিল। আজ ভালো করে তার বেডরুমের শিল্পকর্মগুলোও দেখল। কী অসাধারণ আঁকার হাত মানুষটার! অথচ কখনও কিচ্ছু বলেননি। কেউ জানতেও পারেনি। অবশ্য একা সে-ই নয়। আজ বাকিরাও অধিরাজকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে। প্রথমেই তথাকথিত সিনিয়র মিঃ ব্যানার্জির তৈরি মোঘল গার্ডেনমার্কা ইন্টেরিয়র দেখে সকলেই চমৎকৃত। তার ওপর অধিরাজের শিল্পী সত্ত্বা দেখেও চক্ষু চড়কগাছ। পেইন্টিঙের রহস্যটা ফাঁস করেছে অবশ্য অর্ণবই। মিস্ বোস তো বলেই ফেলল, "স্যার, আপনি তো প্রোফেশনাল পেইন্টারদেরও হার মানাবেন!"

তার গান অবশ্য অর্ণব আগেই শুনেছিল। আজ লেডি অফিসারদের ফরমায়েশে একের পর এক গিটার বাজিয়ে বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ গান একটানা শুনিয়ে গেল। যেমন অপূর্ব কণ্ঠ, তেমন দরদ। আহেলি, কৌশানী আর আইভি, তিনজনেই অনিমেষে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। আহেলিও বেশ কয়েকটা গান গেয়েছে। অধিরাজের মতে, "শচীন তেন্ডুলকার গান গাইলে এমন কণ্ঠে গাইতেন। তবে বেশ গেয়েছেন। শুধু আমাকে ঝাড়ার সময়েই গলায় অত জোর আসে কী করে কে জানে।"

অর্ণব একটু লজ্জা লজ্জা করে অবশেষে নিজের লেখা শায়েরি আর কবিতা শুনিয়েছে। পবিত্র আর মিস্ অরোরা ট্যাঙ্গোর প্রদর্শনী করছিল। মিস্ আত্রেয়ী দত্ত চমৎকার ইংরেজি কবিতা লিখতে পারে। সে-ও দায়ে পড়ে কয়েকটা শোনাল। এমনকি এডিজি সেন আর ডঃ চ্যাটার্জি পর্যন্ত 'জুম্মা চুম্মা দে দে' গানে বলিউডি ডান্সের নমুনা দেখালেন। এখানে এডিজি সেন অমিতাভের ভূমিকায় আর ডক্ কিমি কাতকরের। তাঁর সঙ্গে একটা স্টেপ নাচতে গিয়ে শিশির সেন প্রায় উলটেই পড়েন আর কী! কোনোমতে সামলে নিয়ে বললেন, "অসীম, তুমি যদি অমিতাভের সঙ্গে এই নাচটা নাচতে তবে অমিতাভ তোমার ভার তুলতে গিয়েই ফের হসপিটালে যেতেন। ভুঁড়িটা একটু কমাও না কেন!"

চমৎকার একটা সন্ধ্যা। এখানে কেউ কারোর বস্ নয়, কেউ কারোর জুনিয়র নয়। সবাই মিলে বন্ধুদের মতো হইচই শোরগোল আর লেগ পুলিং লাগিয়ে রেখেছে। মেয়েদের সবার জন্য অধিরাজ দামি দামি সব উপহার, যেমন পারফিউম, তানিষ্কের জুয়েলারির বন্দোবস্তও রেখেছিল। মেয়েরা সবাই সেসব পেয়ে খুব খুশি। ডক্ আর শিশির সেন বোধহয় প্রায় ছেলেমানুষই হয়ে গিয়েছেন। মিস্ অরোরা সাত প্লেট স্টার্টার শেষ করে সবে আট নম্বরের দিকে ঝুঁকেছিল, এডিজি সেন কাঁচুমাচু মুখে তাকে গিয়ে বললেন, "মিস্ অরোরা, গিফ্ট তো

পেলাম না। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আমরাও কি একটু স্টার্টার পেতে পারি?"

ডঃ চ্যাটার্জি ঘটঘট করে টাক নাড়লেন, "আমার মনে হয় না আপনি পাবেন এডিজি সেন। মেইন কোর্সের আশাও ছেড়ে দিন৷ রাজা রান্নায় ভীম, আর এ মামণি খাওয়ায়। আপাতত জল আর কোল্ডড্রিঙ্ক খেয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। উনি কমপ্লিট করুন। তারপর যা পরে থাকবে তাই খাবেন।"

টুইঙ্কল লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল। কী বলবে বুঝতে পারছে না। তাকে শেষপর্যন্ত অধিরাজই উদ্ধার করল। সে নিজেই এক প্লেট স্টার্টার এনে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এই নিন্ সেনোরিটা। নিশ্চিন্তে খান। আরও আছে। ওঁরা সেখান থেকেই নিয়ে নেবেন।"

ডঃ চ্যাটার্জি গরগর করে ওঠেন, "এরকম ইনসাল্ট করার কোনো মানে হয়?"

"ফর ইওর কাইন্ড ইনফর্মেশন ডক্...।" অধিরাজ মৃদু হাসে, "আগেই বলা হয়েছে, এই পার্টিটা প্রমীলাবাহিনীর অনারে। আপনার মধ্যে কিন্তু প্রমীলা হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। ওঁদের আর যা-ই থাক, এতবড়ো টাক, আর মোচ থাকে না।"

"অসীমের মধ্যে প্রমীলার লক্ষণ নেই।" এডিজি সেন চিন্তায় পড়েছেন, "আমার মধ্যে আছে বলছ? আমি খেতে পারি?"

মেইন কোর্স সার্ভ করার পরও রীতিমতো আড্ডা সহযোগে খাওয়া শুরু হল। অর্ণবের জন্য আগেই একপাশে মিক্সড চাউমিন, চিলি মাশরুম, কুং পাও চিকেন আর মোমো সরিয়ে রেখেছিল অধিরাজ। তাই তার বিশেষ কোনো অসুবিধে হয়নি। শুধু আহেলি ট্যারা চোখে একটু লোভ দিয়েছে, আর টুইঙ্কল খাবলা মেরে এক প্লেট তুলে নিয়েছে বলে একটু চটেছে। তবে যেহেতু আজকের সন্ধেটা বিজয়িনী নায়িকাদের নামে, তাই এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করেনি।

খেতে খেতেই ফের বার্নিং শিখের কেসের প্রসঙ্গটা উঠল। এডিজি সেন জানতে চাইলেন, "ব্যানার্জি, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি কখন বুঝলে যে ঘন্টুই আসলে বার্নিং শিখ। আর মসকুইটো লিকুইডের কেসটাই বা কী?"

"ওটা তো ডক্ আমার থেকেও বেশি ডিটেলিং একদম পি পি এম সমেত বলতে পারবেন। তবু আগে এই অদ্ভূত মার্ডার ওয়েপনের কথাতেই আসি। বার্নিং শিখ বা গুলশন সিং-এর মোটিভ বা অন্যান্য মোডাস অপারেন্ডিগুলো নিয়ে কিছু বলার নেই। আপনারা সবই জানেন। কিন্তু এই অদ্ভুত মার্ডার ওয়েপনের কথাই আগে বলা যাক। ডক্ আপনি বলবেন?"

ডঃ চ্যাটার্জি মাংসের হাড় চিবোতে চিবোতে বললেন, "ওটাতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। টেকনিক্যাল ডিটেইলস্ সব রিপোর্টে লিখে দিয়েছি। শিশিরবাবু পড়ে নেবেন। আসল প্যাঁচ তুমিই আবিষ্কার করেছ। তুমিই বলো। তাছাড়া ব্রাহ্মণকে সুখাদ্য খাওয়ার সময়ে বিরক্ত করতে নেই। ব্রহ্মশাপ লাগবে।"

"সে কি আর বাকি আছে?" সে বিড়বিড় করে, "সাধে কি বলি দুর্বাসা?"

"কী?"

"কিছু না।" অধিরাজ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে শুরু করে, "মদনের বয়ানের সাহায্যে মিস মুখার্জিই ফসজিন আর মাস্টার্ড গ্যাসের সম্ভাবনাটা প্রথম বলেন। তারপর ফার্দার ইনভেস্টিগেশনে উনিই ডেডলি কম্বিনেশনটা কনফার্মও করেন। স্যালুট টু হার। একা হাতে পুরো ল্যাব সামলানো সহজ ছিল না। কিন্তু সেটা উনি করে দেখিয়েছেন। আমরাই গর্দভের মতো ফজিন আর মাস্টার্ড গ্যাসের হিডন্ কন্টেনার কিংবা গোপন প্রবেশ পথ, হিডন্ পাইপ, চেম্বার, এইসব খুঁজছিলাম। কারণ তখনও আমাদের ধারণা ছিল যে দুটো গ্যাসই বেডরুমগুলোয় বাইরে থেকে আসছিল। মজার কথা, আসল ঘটনাটা সম্পূর্ণ উলটো। কোনো গ্যাসই বাইরে থেকে এসে ভেতরে ঢুকছিল না। বরং ওই বেডরুমের ভেতরেই ফজিন আর মাস্টার্ড গ্যাস নিজে থেকেই তৈরি হচ্ছিল।" অর্ণব আর পবিত্র দু-জনেই চমকে উঠেছে। দুটো গ্যাসের আগমনপথ খুঁজতে খুঁজতে ওদের প্রায় পাগল হওয়ার দশা হয়েছিল। এমনকি এসি খুলে, দেওয়ালের প্রত্যেকটা ইট পিটিয়ে পিটিয়ে দেখতেও বাকি রাখেনি। অথচ বাঘ

কিনা ঘরেই গ্যাঁট হয়ে বসেছিল। গ্যাসটা ঘরেই তৈরি হচ্ছিল! সে আবার কী!

"সেটা তো সম্ভব নয় স্যার।" অর্ণব বলে, "মিস্ মুখার্জিই বলেছিলেন যে মাস্টার্ড গ্যাস রুম টেম্পারেচারে থাকলে লিকুইড সালফার মাস্টার্ড হয়ে যাবে, গ্যাস ফর্মে থাকবেই না। জেনারেলি দুশো কুড়ি থেকে দুশো আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিট লাগে ওটাকে ভেপোরাইজ করতে। ওঁর মতে যদি অত্যন্ত কম পরিমাণেও থাকে তবুও দেড়শো থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার তো লাগবেই। অথচ কোনো ঘরেই কোনো রুম হিটার ছিল না। তবে অত হিট এল কোথা থেকে ঘরের মধ্যে? আর ফসজিন রুম টেম্পারেচারেই সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস। উনি মোটামুটি একুশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলেছিলেন। যদি সালফার মাস্টার্ড থেকে ওই হিটে মাস্টার্ড গ্যাস রেডিও হয়ে যায়, তবে ফজিনের তো অত হিটে কাজ করার কথাই নয়। ইনফ্যাক্ট আগুনের তাপই ফসজিন নিতে পারে না। তবে দেড়শো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সার্ভাইভ করল কী করে? একটা ঘরের মধ্যে টেম্পারেচার একই সঙ্গে একবার একুশ ডিগ্রি আর একবার দেড়শো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় কী করে?"

"ব্রিলিয়ান্ট পয়েন্ট।" অধিরাজ অর্ণবের পিঠ চাপড়ে দেয়, "এর উত্তরটাও তুমি আমাকে নিজেই ওই হসপিটালের পাশের গলিটায় দাঁড়িয়ে দিয়েছিলে। মনে আছে? যার জন্য আমি তোমাকে জিনিয়াসও বলেছিলাম।"

মনে তো আছে। তবে সেদিনও সে কিছুই বুঝতে পারেনি। আজও যথারীতি বুঝল না। সেই একই উত্তর দিল অর্ণব, "অ্যাঁঃ?"

"হ্যাঁ।" অধিরাজ মুচকি হাসল, "সেদিন তুমি সিগারেট-গাঁজা আর ক্লোরোফর্মের কথা তুলেছিলে। সেই মুহূর্তেই গোটা ব্যাপারটা সাফ হয়ে গিয়েছিল।"

"কী রকম?" পবিত্র কৌতূহলী।

সে ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেটের স্টিক বের করে ঠোঁটে গুঁজেছে। অর্ণব শুনতে পেল কৌশানী বোসের ফিশফিশ, "ইন্ডিয়া কিংসের কী কপাল মাইরি!" সভয়ে দেখে আহেলি কটমটিয়ে কৌশানীর দিকেই তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ কথাটা কানে গিয়েছে। সর্বনাশ!

ফস্ করে সিগারেটটা ধরিয়ে অধিরাজ বেশ কিছুক্ষণ রিং বানাল। তারপর পবিত্র-র দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "টেনে দেখো।"

"টেনে দেখার কী আছে?" পবিত্র কথাটা বলেও একটা সুখটান মারে, "সিগারেট যখন সিগারেটের মতোই তো লাগবে। আমিও স্মোকার। তবে হ্যাঁ, স্মুদ।"

"স্মুদকে গুলি মারো।" সে জানতে চায়, "এই যে তুমি ধোঁয়াটা আরামসে টানছ, স্টিকটাকে আঙুলে ধরেও আছ, আদৌ কি জানো যে ওটা ঠিক কতটা হিট প্রোডিউস করছে?"

"এ আবার কী কথা।" এডিজি সেন বললে, "সিগারেট আমরা রাত দিন টানছি, ঠোঁটে লাগাই, আঙুলে ধরি। তাতে যখন আমাদের ঠোঁট, আঙুল বা মুখ পুড়ে যায় না, ইভেন ছ্যাঁকাও লাগে না তখন খুব কম টেম্পারেচারই হবে। নয়তো পুড়ে যেতাম না?"

"না স্যার।" অধিরাজ মাথা নাড়ল, "ওইখানেই প্যাঁচ। আপনি সিগারেট রোজ গন্ডায় গন্ডায় স্মোক করেন। আপনার আঙুল, ঠোট, জিভ, মুখ কিচ্ছু পোড়ে না। কিন্তু আপনি জানেন না যে ওইটুকু একটা ছোট্ট সিগারেটের স্টিক প্রায় চারশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিট প্রোডিউস করে তামাকটাকে ধোঁয়া করার জন্য। আর যত বেশি জ্বলতে থাকে হিটও তত বাড়ে। সাধারণ সিগারেটের ক্ষেত্রে টিপ অবধি পৌঁছোতে পৌঁছোতে ওটা ছশো থেকে আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশিও হিটেড হতে পারে। অথচ আপনি মনের আনন্দে সুখটান মারছেন। কোনো ধারণাই নেই যে আপনার দু-আঙুলের ফাঁকে একটা মিনি ফার্নেস ধরা আছে।" সে এবার অর্ণবের দিকে তাকায়, "এই সিগারেট-এর ক্লু-টা তুমি আমায় যে মুহূর্তে দিলে সে মুহূর্তেই বুঝলাম মসকুইটো লিকুইডেটরই হচ্ছে সেই পদার্থ যে ঘরের উত্তাপে থাকা নিরীহ লিকুইড সালফার মাস্টার্ডকে হিট দিয়ে মাস্টার্ড গ্যাস বানিয়ে দিচ্ছে। ফান্ডা একই।

মসকুইটো লিকুইডেটরকে তুমি অন থাকা অবস্থাতেও হাত দিয়ে ছুঁতে পারো। বারো ঘণ্টা চলার পরেও খুলতে গেলে ছ্যাকাও লাগবে না। ওটা বাইরের পরিবেশকে গরম করে না। ওটার মুখের স্টিকটাকে যদি টাচ করো, তবে সামান্য গরম লাগবে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু মজার কথা, ওটাও সিগারেটের মতোই একটা ছোট্ট ফার্নেস। ওর ভেতরে একশো কুড়ি ডিগ্রি বা তারও বেশি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ প্রোডিউস হয়। অথচ বাইরে থেকে দেখে কখনও বুঝতে পেরেছ যে ওর মধ্যের লিকুইডটা ঠিক কতখানি হিট নিচ্ছে? ঘরে হিটার চালানোর দরকারই বা কী যখন একটা আস্ত ফার্নেস সেখানে উপস্থিত! গ্যাসটা ঘরের টেম্পারেচারে তৈরিই হয়নি, হয়েছে মস্কুইটো লিকুইডেটরের মধ্যে। শুধু সেখানে মসকুইটো কিলিং লিকুইডের বদলে সামান্য সালফার মাস্টার্ড ছিল। আর কোমল কৌরের বুদ্ধিতে মেশিনটার তাপ উৎপাদন ক্ষমতা একশো কুড়ি ডিগ্রি থেকে বেড়ে একশো পঞ্চাশেরও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা এমনিতেই একশো কুড়ি ডিগ্রি অবধি টানতে পারে, সেটার ওপর সামান্য কারিকুরি করলেই একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিট এসে যাবে। এর জন্য রকেট সায়েন্সের দরকার নেই।”

ডঃ চ্যাটার্জি বিরিয়ানি খেতে খেতে চোখ বুজে ‘উম্ উম্’ করতে করতে বললেন, “আমি মশা মারার যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি। ওইটুকু মেশিনের কয়েলকে এইসান কারিকুরি করেছে যে ওটা একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস অবধিও টানতে পারে। উমম্। আর ওর ভেতরে যে লিকুইডটা ছিল, তার মধ্যে একটা সালফার মাস্টার্ডই। ওটা মসকুইটো লিকুইডেটরের হিট জেনারেট করার টেকনিকে মাস্টার্ড গ্যাস হয়ে যাচ্ছিল।”

“ওই দেখো।” অধিরাজ অঙ্গুলিনির্দেশ করল, “বিশেষজ্ঞের মতামতও এসে গিয়েছে। সুতরাং মাস্টার্ড গ্যাস বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকেই আসছিল। ওই পুঁচকে লিকুইডেটরের অবিশ্বাস্য ক্ষমতায়।”

অর্ণব সুদ্ধ সকলেরই তখন প্রায় চোখ কপালে উঠে গিয়েছে। অর্ণব তবু জানতে চায়, “কিন্তু মেইন ওয়েপন্ তো ফজিন। সেটাও কি ওই লিকুইডেটরে ছিল? তা কী করে হয়? অত টেম্পারেচার ফজিন নিতেই পারে না!”

“ফজিন লিকুইডেটরে ছিল না ডার্লিং।” সে হেসে ফেলেছে, “কিন্তু আরও একটা শব্দ তুমি উচ্চারণ করেছিলে। ক্লোরোফর্ম। আমি তো জিজ্ঞাসাও করেছিলাম যে কখনও ল্যাবের বাইরে ব্যাঙ কেটেছ কিনা! পবিত্র সেটা ঠাট্টা ভেবে চায়না টাউন যাওয়ার বায়নাও করছিল। আসলে জিজ্ঞাস্য একটাই। ব্যাঙ কাটতে গেলে প্রথমেই ক্লোরোফর্ম লাগে ব্যাঙটাকে অজ্ঞান করার জন্য। কিন্তু কোনোদিন কাউকে ক্লোরোফর্মের শিশি নিয়ে বাইরে ডে-লাইটে খুলতে দেখেছ?”

“না।” এডিজি সেন এবার প্লেটে কাবাব তুলে নিয়ে বললেন, “আমি তো জীবনে দেখিনি।”

“আমিও না।” পবিত্র তাঁকে সমর্থন করে।

“কেউই দেখেনি। কারণ ক্লোরোফর্মকে যদি তুমি সানলাইটে নিয়ে গিয়ে খুলে দাও, তবে ওটা বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসের সঙ্গে মিশে, সূর্যালোকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে কার্বনিল ক্লোরাইড ওরফে ফজিন তৈরি করবে। মস্কুইটো লিকুইডেটরের ওপরের অংশে ক্লোরোফর্মটাই বেশি পরিমাণে থাকত। ক্লোরোফর্ম বাষ্পীভূত হতে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ফোর কিলোজুলস্ পার মোল মানে অ্যারাউন্ড সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড লাগে। যে মেশিন একশো আশি ডিগ্রি অবধি তাপ উৎপাদন করছে, একষট্টি-বাষট্টি ডিগ্রি তার কাছে তো নস্যি। শুরুতেই সে ওই হিট জেনারেট করবে।”

“রাইট!” ডঃ চ্যাটার্জি কাবাব মুখে দিয়ে হুঁ হুঁ করতে করতে বললেন, “সেটাই হয়েছে। লিকুইডেটরে ক্লোরোফর্মই বেশি ছিল। লিকুইড সালফার মাস্টার্ড কম। কিন্তু মসকুইটো লিকুইডের কন্টেনারগুলোতে এই দুটোই ছিল। দেখতেও এত সাধারণ যে পার্থক্য বোঝাই

দায়। অবিকল মসকুইটো কিলিং লিকুইডের মতোই। বাইরে থেকে দেখে বোঝা অসম্ভব। অথচ যে পি পি এম ফসজিন তৈরি করছিল তাতে বাঁচা অসম্ভব।”

“কিন্তু রাতের বেলায় সূর্যালোক কোথা দিয়ে এল রাজা!”

পবিত্র-র প্রশ্নের উত্তরে মিস্ আত্রেয়ী দত্তকে নির্দেশ করেছে সে, “ওই যে! ওই

জিনিয়াস লেডিটিকে জিজ্ঞাসা করো। উনিই ব্যাপারটা প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন। বলেওছিলেন। আমিই গাধার মতো পাত্তা দিইনি। কিন্তু এই ক্লু-টা ওঁরই আবিষ্কার। এই বাড়িতেও দেখো, দিব্যি সূর্যালোকের ব্যবস্থা আছে। ইনফ্যাক্ট রাতেও এই মোঘল গার্ডেনে সানলাইট থাকে।”

আত্রেয়ী এবার পুরোটাই বুঝেছে, “ওঃ গড। গ্রীন হাউজ স্পেশাল সাদা ভিবজিওর আলট্রাভায়োলেট এল ই ডি লাইট। প্রত্যেকটা রুমেই ওগুলো ছিল। এখানেও তো আছে দেখছি। ন্যাচারাল সানলাইটের সম্পূর্ণ এফেক্ট দেয়। এতটাই এফেক্টিভ যে ওতে গাছেরা সালোকসংশ্লেষও চালাতে পারে। ওটা ছিল বলেই ক্লোরোফর্ম ফজিনে টার্ন নিয়েছে। কী জিনিয়াস প্ল্যানিং!”

“জিনিয়াস বলে জিনিয়াস! সেইজন্যই আমরা এতক্ষণ হাতড়ে মরছিলাম।” অধিরাজ সবার প্রস্তরীভূত দশা দেখে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়, “আমি বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি যে ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে হত। ইদানিং একটু হাই সোসাইটির লোকেরা আর মশারি টাঙিয়ে শুচ্ছেন না। প্রথমত তাতে এসির শীতল হাওয়া বা পাখার হাওয়া বাধা পায় না। দ্বিতীয়ত মশারি টাঙাও রে, এদিকে বাঁধো রে, ওদিকে বাঁধো রে, গোঁজো রে, অ্যাডজাস্ট করো রে, বেশি উঁচু না হয়, বেশি নীচুও যেন না হয়, আবার খোলো রে, গুছিয়ে রাখো রে, বাই এনি চান্স ফুটো হয়ে গেলে আবার তাপ্পি মারো রে, এত ঝকমারি আজকাল লোকে আর নিতে চায় না। মানুষ সবসময়ই ইজি টেকনিক আর কমফোর্ট খোঁজে। তাই মেট্রোসিটিগুলোয় এখন আধুনিক জনগণ আর মশারি পেতে শোয় না। ইনফ্যাক্ট আমার পলাপিসিকেই যদি মশারির কথা বলো, তাহলেই তিনি পালিয়ে যাবেন। মশারির ভেতরে ওঁর নাকি দমবন্ধ হয়ে আসে। তাই মসকুইটো লিকুইডই হচ্ছে সবচেয়ে স্মার্ট ব্যবস্থা। শোয়ার আগে অন করো। দমাস করে গিয়ে শুয়ে পড়ো। মশাও নেই, মশারির ঝামেলাও নেই। অনেকে আবার এমন সাবধানী যে মশারিও টাঙায়, সঙ্গে মসকুইটো লিকুইডেটরও চালিয়ে রাখে। যাতে রাতে যদি মশারি তুলে ওয়াশরুম বা অন্য কোথাও যেতে হয়, তবে সেই ফাঁকে রক্তচোষা হতভাগারা না ঢুকতে পারে। ডাবল শিল্ড সিস্টেম। এর উদাহরণও দেখেছি অনেক। আর এই সিস্টেমটারই সুযোগ নিয়েছিল কোমল কৌর আর বার্নিং শিখ।”

সে উপস্থিত জনতার দিকে তাকায়, “প্রথমে বার্নিং শিখ কোনো-না কোনো পরিচয়ে ফ্যামিলির ভেতরেই কিংবা আশেপাশে ঢুকে যেত। লম্বা সময় ধরে ফিল্ডিংও দিত। তার এই প্র্যাকটিসের কথা আমরা সকলেই জানি। আর একটা কথা সর্বজনোবিদিত। তার মারাত্মক ম্যানিপুলেশনের পাওয়ার। সে খুব সহজেই মানুষের মন নিয়ে খেলা করতে পারত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রত্যেকটা পরিবারের কাউকে-না কাউকে প্রভাবিত করে, বিশ্বাস জয় করে নিয়ে সে এই আলোগুলো আমদানি করিয়েছিল। এর ভালো এফেক্ট সম্পর্কে জ্ঞান-ট্যান দিয়ে ঠিক কারোর না কারোর ব্রেনওয়াশ সে করত। এ বিষয়ে ও ব্যাটা অদ্বিতীয়। বিশেষ করে সিনিয়র সিটিজেনরা তো আরও বেশি স্বাস্থ্যসচেতন। উদাহরণ হিসাবে পি সি চৌধুরীর মতো একপিস্ চোখের সামনেই আছেন যিনি স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য চুনের জল থেকে শুরু করে সরষের তেল—সবই ঢকঢকিয়ে খান! তাঁকে যদি কেউ বলে এই লাইটগুলো লাগালে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, স্কিন ভালো থাকে আর হাড় শক্ত হয়, তিনি কোনোরকম পরখ না করেই চোখ বুজে সব এই লাইটই লাগাবেন। এমন খুঁতখুঁতে বয়স্ক মানুষের বিশেষ অভাব নেই। কোভিডের সময় তো আরও সুবিধা। লোকে ঘরবন্দি, সূর্যালোকে যাওয়ার উপায়টুকুও নেই। তখন ঘরেই যাতে সানলাইটের এফেক্ট পাওয়া যায় তার জন্য এই জাতীয় আলো ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখনও কারোর মাথায় এই আইডিয়া ঢুকিয়ে দেওয়া কঠিন

ছিল না। বার্নিং শিখ প্রথমে সেটাই করত। ঘরের আলোগুলোকে বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল ফার্স্ট স্টেপ। কিন্তু সেটা আদৌ ক্ষতিকর কিছু নয়। একেবারেই নিরীহ ব্যাপার। উলটে আলোগুলো ব্রাইট বলে যাদের চোখ দুর্বল তাদের সুবিধাও হয়। স্বাভাবিকভাবেই কেউ সন্দেহ করবে না, বরং প্লিজড্‌ই হবে। উপকৃতই হচ্ছে তারা। তাই সন্দেহের জায়গাই নেই। কেউ ভাবতেও পারবে না যে এখান থেকেই তাদের মার্ডার ওয়েপন রেডি হতে শুরু করল।”

আইভি রুদ্ধশ্বাসে শুনছিল। বলল, “তারপর?”

“এরপর সে সুযোগ বুঝে এয়ার পিউরিফায়ারগুলোকে নষ্ট করত। এয়ার পিউরিফায়ার যদি ঘরের মধ্যে থাকে তবে গ্যাসগুলোকে বাধা দেবে। সেইজন্যই ওগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া বাধ্যতামূলক। মিস্ মুখার্জিও সব পিউরিফায়ারগুলোকে নন ফাংশনালই পেয়েছিলেন। তারপরই আসল মার। বার্নিং শিখ যে বেশেই থাকুক না কেন, সে দেখে নিত ঘরে মসকুইটো লিকুডেটর আছে কিনা। থাকলে সেটা কোন্ ব্র্যান্ডের? না থাকলেও বিশেষ অসুবিধে নেই। এমন কি একটাও পরিবার ছিল না যারা মসকুইটো লিকুইড ইউজ না করে মশারি ইউজ করত? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু যে লোক বন্ধ দরজার চাবি তৈরি করে, ল্যাচ বাইপাস করে দরজা খুলতে ওস্তাদ, সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর তার জাস্ট বেডরুমগুলোয় ঢুকে একটা করে লিকুইডেটর লাগিয়ে দিতে কতক্ষণ লাগত? যখন সবাই গভীর ঘুমে থাকে তখন অজান্তে কেউ যদি একটা লিকুইডেটর ফিট্ করে দেয় কারোর পক্ষে সেটা জানাও সম্ভব নয়। তারপর মানুষগুলো মারা গেলে তো ফাঁকা মাঠ। খুলে নিয়ে গেলেই হল। তবে এ কাজটা সে একদম শেষে করত। যেদিন ঠিক করত যে এই ফ্যামিলিটাকে মারবে সেদিন কোনো-না কোনো কায়দায় ওইদিন রাত্রে একদম লাস্ট মোমেন্টে তাদের ঘরের যন্ত্রগুলোকে চেঞ্জ করে একই রকম দেখতে, সেম কালার, সেম প্যাটার্নের যন্ত্র ফিট করে দিত। যন্ত্রগুলো দেখতে এক হলেও কোমল কৌর সেগুলোর কয়েলের ওপর কারিকুরি করে হিট প্রোডিউসিং পাওয়ার বাড়িয়ে দিতেন। আর মসকুইটো কিলিং লিকুইডের জায়গায় ক্লোরোফর্ম আর সালফার মাস্টার্ড থাকত। ভেবে দেখো, আমরা পি সি চৌধুরীর বাড়িতে যখন তল্লাশি চালিয়েছিলাম তখন সেখানেও সব ঘরে ইউজড্ লিকুইডের উপস্থিত ছিল। কিন্তু সেটা নিঃসন্দেহে অরিজিনাল। তাই কোনোরকম সন্দেহও হয়নি। যখন আমরা কমলাকে আইডেন্টিফাই করলাম তার আগে সে বিছানা পাতছিল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকেছিল। যা কারিকুরি করার ওই সময়টুকুতেই করেছে। যেই আমরা কিছু না পেয়ে বাইরে গেলাম, সে প্রত্যেকটা ঘরে ঢুকে একদম ইলেভেন্থ আওয়ারে স্রেফ মেশিনগুলো চেঞ্জ করে দিল। আমরা ওকে ত্রিসীমানা থেকে তাড়ালাম। পাহারা বসালাম। অত কাণ্ড করেও ফজিন আর মাস্টার্ড গ্যাসের অ্যাটাককে আটকানো যায়নি। এটাই ও প্রত্যেকবারই করত। মারণাস্ত্রটা প্রয়োগ করার জন্য ওকে ধারেকাছে থাকতেই হত না। তার আগেই কাজ সেরে সে বেরিয়ে যেত। ফাদার স্টেফানো মাইনো শেষদিন দিনের বেলা নয়, রাতে পবিত্র জল ছেটাতে গিয়েছিলেন। ওই সুযোগেই হাতসাফাই। ড্রাইভার কেহর সিং-এর ডিউটিও রাতেই শেষ হত। কোনো-না-কোনো বাহানায় ঘরে ঢুকে মেশিন চেঞ্জ করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। বিরজুর বন্ধু নাথুরামও নির্ঘাত এই পাঁয়তাড়াই কষেছিল। সে জানত ডিনারের পর সবাই ঘরের দরজা বন্ধ করে এগুলোকে অন করবে। সবক-টা খুনই যেহেতু শীতের রাতে, তাই কারোর ঘরের জানলা খোলা থাকার গল্পই নেই। শীতটাই তার ফেভারিট সিজন ছিল। কারণ তখন কেউ এসি চালায় না। ভেতরের হাওয়া বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। সবার বাড়ির জানলা দরজাও বন্ধ থাকে। যে মুহূর্তে লিকুইডেটর অন হল, সেই মুহূর্তেই ভেতরের ক্লোরোফর্ম গরম হতে শুরু করল। তারপর বাষ্পীভূত হয়ে যেই বাইরে এসে সাধারণ টেম্পারেচারের মধ্যেই বাতাসে মিশল, সঙ্গে সূর্যালোক তথা ভিবজিওর আলট্রা ভায়োলেটের এফেক্টও পেল। মুহূর্তের মধ্যে বিষাক্ত ফসজিন বা কার্বনিল ক্লোরাইড তৈরি হল। প্রথমে ওটার অস্তিত্ব বোঝা দায়। কারণ গন্ধটা মৃদু। কিন্তু টেম্পারেচার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়ছড়িয়ে ফস্জিনের মাত্রাও বেড়ে চলেছে। বাইপ্রোডাক্ট হিসাবে সামান্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও।

তার সঙ্গে ক্লোরোফর্মের বাষ্পে হয়তো অজ্ঞান না হলেও মানুষগুলো কিছুটা অবশ হয়ে গিয়েছিল। শেষে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা-লিকুইড সালফার মাস্টার্ডও হিটেড হয়ে মাস্টার্ড গ্যাস হিসাবে এসে হাজির। মানুষগুলো কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে অজান্তেই প্রায় আগুন ইনহেল করত। এর কী এফেক্ট হত তা তোমরা আগেই জানো। এরপর লোকগুলো মরে গেলে সে দিব্যি ঘরের ভেতরে ঢুকে নেকলেসিং করে দিত আর মসকুইটো লিকুইডেটরগুলোকে খুলে নিয়ে চলে যেত। নেকলেসিং এর আগুনে ফজিনের ট্রেস নষ্ট হত। আর জানলা খুলে দেওয়ায় মাস্টার্ড গ্যাস আর যেটুকু ফজিন বাকি থাকে তা বাইরে বেরিয়ে যেত। বাইরের শীতে মাস্টার্ড গ্যাস হাওয়া, ফজিনও ডিজলভ। কোনো ক্লুই রাখত না। ফরেনসিকের চোদ্দ পুরুষও ওই পোড়া হাড় আর দাঁত থেকে কিছুই বের করতে পারেনি। সেদিন হতভাগা মদন গিয়ে উপস্থিত না হলে মার্ডারগুলোর পেছনের প্যাঁচটাও কিছুতেই ধরা পড়ত না। সব নষ্টের গোড়া হচ্ছে ওই ভিবজিওর আলট্রা ভায়োলেট এল ই ডি লাইট আর ক্লোরোফর্ম, সালফার মাস্টার্ড ভরা লিকুইডেটর! আমরা কোমল কৌরের বাড়িতে বা বার্নিং শিখের আড্ডায় কোনো গ্যাসই পাইনি। তবে বেশ কিছু কেমিক্যালের সঙ্গে ক্লোরোফর্মও পেয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই ভেবেছিলাম যে কাউকে অজ্ঞান করার জন্যই ক্লোরোফর্ম আমদানি করে রেখেছে সে। তখনও মাথায় আসেনি যে ক্লোরোফর্মের সঙ্গে ফজিনের একদম সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। অজ্ঞান করা ছাড়া ক্লোরোফর্মের একটি বিধ্বংসী প্রোডাক্টও আছে। অর্ণব যদি সেদিন ক্লোরোফর্ম আর সিগারেট, এই দুটো শব্দ পরপর না বলত তাহলে হয়তো স্ট্রাইকও করত না। সো ক্রেডিট গো-জ টু অর্ণব। আর এটাই হচ্ছে সেই উদ্ভট মার্ডার ওয়েপন্!”

‘সেইজন্যই আপনি জানতে চাইছিলেন যে অসোউইক ফোর্ট আর ভোপাল গ্যাস ডিজাস্টার কখন ঘটেছিল? জানতে চাইছিলেন গ্যাস রিলিজের সময়ে সূর্যালোক ছিল কী ছিল না?”

“রাইট।” অর্ণবের কথায় মাথা ঝাঁকায় অধিরাজ, “এর পেছনের উদ্দেশ্য একটাই। ডক্ বিরক্ত হয়ে পুরোটা বলেননি। কিন্তু অসোউইক ফোর্টের ঘটনাটা অত মারাত্মক হত না যদি না সানলাইটের উপস্থিতি থাকত। ক্লোরিন আর ব্রোমিনের মিক্সচারটাকে চূড়ান্ত সর্বনেশে করার জন্যই জার্মানরা ওটাকে দিনের বেলায় রিলিজ করেছিল। ওরা অত বোকা নয় যে এমনি এমনিই প্রকাশ্য দিবালোকে শত্রুকে দেখিয়ে দেখিয়ে ক্লোরিনের মতো ভিজি গ্যাস রিলিজ করে দেবে। সূর্যালোক ফ্যাটালিটি রেটের জন্য মাস্ট ছিল। আর ভোপাল গ্যাস কাণ্ডে ইনস্ট্যান্ট ডেথ আরও বাড়ত যদি ওটা দিনের বেলায় ঘটত। সূর্যালোক অনেক সময় অনেক বিক্রিয়ায় হেল্প করে। সানলাইটের এফেক্ট দেওয়া আলোগুলোকে আমারও একটু সন্দেহ হয়েছিল। যেই ক্লোরোফর্মের ফান্ডাটা ক্লিয়ার হল, ঠিক তখনই বুঝলাম এখানেও সূর্যালোকের গল্প আছে। তবে অন্যভাবে। বোঝা গেল?”

“বুঝলাম।” পবিত্র মাথা নাড়ে, “কিন্তু ঘন্টুকে সন্দেহ করলে কখন? আমরা তো এখনও ভাবতে পারছি না।”

“ঘন্টু বা বার্নিং শিখ যা-ই বলো, তাকে বোঝা এবং ধরার জন্যও এক নারীই সাহায্য করেছিলেন। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী। যদি তাঁকে জানো, তবেই তুমি বার্নিং শিখকেও জানবে। বার্নিং শিখের ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি এই ভয়াবহ অবসেশন কেউ লক্ষ করল না কেন, সেটাই আশ্চর্য!”

“অবসেশন!” ডঃ চ্যাটার্জি মুখ লম্বা করেছেন, “তাও ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি!”

“ওটাই সবচেয়ে মজার বিষয়।” সে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে, “ইন্দিরা গান্ধীর অ্যাসাসিনেশনের প্রভাব শিখদের ওপর দু-ভাবে পড়েছিল। কেউ ভিন্দ্রানয়ালেকে সাঙ্ঘাতিক সাধুপুরুষ, বিপ্লবী বলে মনে করত। তাই ইন্দিরা গান্ধীকে যখন বেয়ন্ত সিং আর সতবন্ত সিং উড়িয়ে দিল, তারা খুব খুশি হয়েছিল। অপারেশন ব্লু স্টার তাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ছিল। ধর্মান্ধ মানুষগুলোর কাছে অকাল তখতের অবমাননা, স্বর্ণমন্দিরের ক্ষতি পাপ

ছাড়া আর কিছুই না। তার ওপর ভিন্দ্রানয়ালের কৃপায় খালিস্তানের দাবি ওঠার পর থেকে দিল্লি সরকার পাঞ্জাবকে সন্দেহের চোখেও দেখছিল। ১৯৮২ সালে যখন দিল্লিতে রাজীব গান্ধী এশিয়ান গেম্স বা এশিয়াডের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, সরকার সন্দেহ করেছিল যে ভিন্দ্রানয়ালে বা তার দলবল এই বড়ো ইভেন্টে কিছু একটা তান্ডব করবে। সন্দেহ করাটা অন্যায় নয়, ভিন্দ্রানয়ালে মহাশয়ের কাণ্ডকীর্তি তেমনই ছিল। যেটা অন্যায় হয়েছিল, সেটা হল ওই একটা লোকের উৎপাতের ভয়ে বড়ো বড়ো শিখ অফিসার, আর্মির কর্তাব্যক্তিকে, সম্মানীয় ব্যক্তিত্বদেরও পাঞ্জাব থেকে দিল্লিতে আসতেই দেওয়া হয়নি। কিংবা মাঝপথেই চরম হেনস্থা আর অপমান করা হয়েছিল। এটাও তাদের গায়ে ভয়াবহ লেগেছিল। তাই ইন্দিরা গান্ধী তাদের কাছে সুপার ভিলেন আর বেয়ন্ত সিং অমর শহীদ। আবার গুলশন সিং বা ঘন্টুর মতো কিছু শিখও ছিল যারা ভিন্দ্রানয়ালেকে সন্ত মনে করত না। ওর ডায়েরিটা আমি পুরোটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি। ইভেন জগদীপ সিং ভাট্টির মুখেও শুনেছি, নিজেরাও দেখেছি, সে মনে করত, যে লোক নিজেই পবিত্র মন্দিরের ভেতরে গোলা, গুলি, গ্রেনেড ঢোকায়, নিজেই অকাল তখতের ওপর চড়ে বসে থাকে, পবিত্র মন্দিরের সিঁড়িতে মানুষ খুন করে অপবিত্র করে, সে আবার কোথাকার সন্ত, কোথাকার বিপ্লবী!

কিন্তু তবু ধর্মীয় ব্যাপারে হয়তো অপারেশন ব্লু স্টারে স্বর্ণমন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটা তাদের কাছে দুঃখজনক বিষয়ই ছিল। তারা দুঃখ পেলেও 'ঠিক আছে' বলে একরকম মানিয়ে নিল। এর কিছু মাস পরেই তারা শুনতে পেল যে অপারেশন ব্লু স্টারের বদলা নিতে প্রধানমন্ত্রীকেই তাঁর বিশ্বস্ত শিখ বডিগার্ডরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। তার এফেক্টও তারা স্বচক্ষে দেখেছিল। যার জন্য ১৯৮৪ সালকে শিখেরা আমরণ ভুলবে না। কিন্তু গুলশন সিং-এর মতো কিছু মানুষ আবার ইন্দিরা গান্ধীকে ভিলেন নয়, বেয়ন্ত সিং-এর বেইমানির শিকার হিসাবে দেখেছিল। শৈশবে তারা অত বোঝেনি। কিন্তু বড়ো হয়ে যখন ধর্মকে সরিয়ে যুক্তি দিয়ে গোটা ঘটনাটাকে দেখল, তখন বুঝল ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পেছনে ওঁর শিখপ্রজাতির ওপর সম্মান ও অতিরিক্ত বিশ্বাসই দায়ী। অপারেশন ব্লু স্টারটা এড়ানো যেত কী যেত না সেটা তর্কের বিষয় হতে পারে। এটা বাস্তব যে ভিন্দ্রানয়ালেকে সঞ্জয় গান্ধী আর জ্ঞানী জৈল সিঙের কৃপা এত বেশি বাড়িয়েছিল যে ভারত সরকারকেও সে অবজ্ঞা করত। কথা বলে সমস্যা সমাধান করার চেষ্টাও ইন্দিরা চালিয়েছিলেন। কিছুতেই কিছু হয়নি। তার ওপর যেভাবে পাঞ্জাবের হিন্দুদের সে কচুকাটা করছিল সেটাও সমর্থনযোগ্য নয়। তাই শেষমেষ অপারেশন ব্লু স্টার ছাড়া আর কোনো রাস্তা ইন্দিরা খুঁজে পাননি। তাতে ধর্মান্ধ শিখরা ভয়াবহ খেপল। সব জেনেও অতবড়ো একজন দূরদর্শী, বুদ্ধিমতী নারী ভাবতেও পারেননি যে তাঁর শিখ বডিগার্ডরাই তাঁকে খুন করতে পারে। অথচ এমন ষড়যন্ত্রের আঁচ গোয়েন্দাবাহিনী আগেই পেয়েছিল। তবু বেয়ন্তকে তিনি সরাতে দেননি। উলটে পুনর্বহাল করেছিলেন। বিশ্বাস তাঁর এতটাই অটুট! তাই ইন্দিরা তাদের কাছে ভিলেন নন, ভিকটিম হলেন। আর বেয়ন্ত সিং, সতবন্ত সিং মূল ভিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি চিরবিশ্বস্ত শিখপ্রজাতির কলঙ্ক। এই সহানুভূতি থেকেই গুল্লুর ইন্দিরা গান্ধীর ওপর এতটাই অবসেশন তৈরি হল যে সব কিছু ছাপিয়ে সেই অবসেসড্ মনটাই বারবার বেরিয়ে আসছিল। পুলিশ সেটা লক্ষই করেনি।"

"পুলিশ কেন, আমরাও কেউ লক্ষ করিনি। তুমি বাপু সেটা লক্ষ করলে কীভাবে? এই সুর্মা ভোপালি মার্কা ডিডাকশন এল কোথা থেকে?"

ডঃ চ্যাটার্জির কথা শুনে অধিরাজ হাসল, "আজ্ঞে নাম থেকে।"

"নাম?"

"হ্যাঁ। বার্নিং শিখের অবতারগুলোর নামের প্যাটার্নটা লক্ষ্য করুন। স্টেফানো মাইনো, কেহর সিং, নাথুরাম, রাজেন্দ্র কুমার, মহম্মদ ইউনুস, পরমেশ্বর নারায়ণ রেড্ডি, রামেশ্বর রাও, সমা বিবি, বৌদ্ধ লামা বুদ্ধদত্ত, কমলা, ওয়ার্ডবয় স্যাম ত্রিবেদী এবং প্রিয়দর্শিনী!" অধিরাজ একটু থেমে বলল, "আপাতদৃষ্টিতে নামগুলো খুব সাধারণ। তেমন কোনো বিশেষত্ব

নেই। কিন্তু আমার মতো যদি আর এক পিস্ ইন্দিরা গান্ধী স্পেশালিস্ট কেউ থাকত তবে সে বুঝতে পারত যে নামগুলোর মধ্যে অদ্ভুত একটা মিল আছে। একটা আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য লিঙ্ক।”

“কী সেটা?”

“এই প্রত্যেকটা নামই ইন্দিরা গান্ধীর জীবন কিংবা মৃত্যুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। ‘স্টেফানো মাইনো' সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর বেয়াইমশাই হন। অর্থাৎ সোনিয়া গান্ধীর পিতাশ্রী। ‘কেহর সিং” তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্রকারী। কিন্তু সেখানেও প্যাটার্ন আছে। একমাত্র বোধহয় তাকেই গদ্দার বলা যায় না। বেয়ন্ত সবচেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতক। সতবন্ত সদ্য রিক্রুটেড হলেও তার কাজ ছিল প্রধানমন্ত্রীকে রক্ষা করা, যার উলটোটাই করেছে। একমাত্র কেহর সিং মাস্টারমাইন্ড বা শয়তান যাই হোক্-না-কেন নেমকহারাম নয়। ইন্দিরার নুন সে খায়নি। তাঁর বিশ্বস্ত হওয়ার দাবিও কখনও করেনি। শত্রুতা ছিল, ডাইরেক্ট শত্রুতাই করেছে। তাই বার্নিং শিখ কেহর সিং-এর নামটা ইউজ করলেও 'ভূলেও বেয়ন্ত, সতবন্ত বা জর্নেল সিং ভিন্দ্রানয়ালের নাম কখনও নেয়নি। এরপর....।”

“নাথুরাম। নাথুরাম গড়সে?” এডিজি সেন বিস্মিত, “কিন্তু সে তো মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নেহরু ফ্যামিলির লিঙ্ক নেই বলেই তো জানি।”

“আপনি ঠিকই জানেন। তার সঙ্গে এটাও ঠিক যে এই ‘নাথুরামে'র সঙ্গে নাথুরাম গড্রসে-রও কোনো লিঙ্ক নেই। সবাই নাথুরাম গডসে-কেই চেনে। কিন্তু আর এক ‘নাথুরাম’ও ছিল, যে জওহরলাল নেহরুর আমল থেকে নেহরু পরিবারের অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। তাকে কেউ চেনে না। অথচ ইন্দিরার সবচেয়ে কাছের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল তাঁর পার্সোনাল ‘ভৃত্য', ‘নাথুরাম’। যে ওই অভিশপ্ত দিনেও মালকিনের পেছন পেছন তাঁর অফিসের পথে চলেছিল। যার কোলেই রক্তাপ্লুত হয়ে লুটিয়ে পড়েন ইন্দিরা। ইতিহাস এই ‘নাথুরাম’কৈ মনে রাখেনি। তবে বার্নিং শিখ রেখেছে। এরপর আসুন ‘রাজেন্দ্র কুমার’-এ। রাজেন্দ্র কুমারের নাম শুনলেই আপনাদের সবার দারুণ হ্যান্ডসাম বলিউডের হিরোকেই মনে পড়বে। মজার বিষয় এই রাজেন্দ্র কুমারও তিনি নন। ইনি হচ্ছেন রাজেন্দ্র কুমার ধাওয়ন, ওরফে আর কে ধওয়ন, যিনি ইন্দিরা গান্ধীর পার্সোনাল সেক্রেটারি তো ছিলেনই, অত্যন্ত বিশ্বস্ত সঙ্গীও ছিলেন। আর কে ধওয়নকে ছাড়া ইন্দিরার চলত না। ইনিও নাথুরামের মতো ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার সময়ে ওঁর সঙ্গেই ছিলেন। অন্তিম যাত্রার সঙ্গী।”

“নেক্সট মহম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশের নোবেল জয়ী ইকোনমিস্ট?”

“না। মহম্মদ ইউনুস খান। ইন্দিরা গান্ধীর আর এক কাছের মানুষ। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ অবধি তিনি প্রধানমন্ত্রীর সচিব ও সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাতা ছিলেন। ভারতীয় অ্যাম্বাসাডরও হয়েছিলেন। ‘পরমেশ্বর নারায়ণ রেড্ডির নাম থেকে ‘রেড্ডি' পদবীটা বাদ দিন। পরে রইল ‘পরমেশ্বর নারায়ণ’। ইনি হলেন পরমেশ্বর নারায়ণ হকসর। বা পি এন হকসর। ইন্দিরা গান্ধীর কেরিয়ারের একদম প্রথম দিকের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। অনভিজ্ঞ ইন্দিরা তাঁর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতেন। নির্ভরও করতেন। ‘রামেশ্বর রাও’ এর রাওটা কেটে ‘দয়াল’করে দিন। ব্যক্তিটিকে চিনতে পারবেন। রামেশ্বর দয়াল ইন্দিরা গান্ধীর পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন। ইনিও অন্তিম মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পেছন পেছন চলছিলেন। ‘সমা’ বিবি হলেন দূরদর্শনের বিখ্যাত সুন্দরী নিউজ অ্যাঙ্কর সমা সুলতান। যিনি সজল নয়নে সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ টেলিভিশনে পড়েছিলেন। আপ্রাণ নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করেও পারেননি। খবরটা বলতে গিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন।”

“বাপ্ রে!” পবিত্র আঁতকে ওঠে, “এরকম বিটকেল প্যাটার্ন ফলো করলে কেউ ধরতেও পারবে না! নাম তো নামই। এতদিন শুনেছি নামে কী বা আসে যায়! এখন দেখছি, নামেই শালা ক্লু বসে আছে। বুদ্ধদত্ত কে ছিলেন? ইন্দিরা গান্ধী কি বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন, না বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?”

“কোনোটাই নয়। ওই নামটার পেছনের ইতিহাস আর বিড়ালদত্ত-র দুধ খাওয়ার রহস্য বললেই বুঝবে লোকটার অবসেশন কোন্ পর্যায়ে ছিল। আমি আগেই এই নামের প্যাটার্নটা লক্ষ করেছিলাম। তাই বার্নিং শিখকে রিড করতে সুবিধা হচ্ছিল। যখনই শুনলাম ত্রিপাঠীজির বাড়িতে বৌদ্ধ লামারা আসতেন, তখনই দুটো জিনিস মনে পড়ল। ইন্দিরা গান্ধী প্রথম পোখরানে যে নিউক্লিয়ার ওয়েপন্ টেস্টের সফল প্রোগ্রাম নামিয়েছিলেন সেটার নাম ছিল 'স্মাইলিং বুদ্ধ'। যদিও এই ‘বুদ্ধ’ আদৌ শান্তির প্রতীক নন্। সুতরাং এই মূর্তিমান অশান্তিটি স্মাইলিং বুদ্ধের মুখোশের আড়ালের পরমাণু বোমা হতেই পারে। আর দ্বিতীয়টা আরও ইন্টারেস্টিং। হিন্দুস্তান টাইমসের একটা নিতান্তই অনামী ছোট্ট ট্যাবলয়েড 'মর্নিং ইকো'কে ইন্দিরা গান্ধী একটি ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। তা নিয়ে পরে বিস্তর জলঘোলাও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে একটা মজাদার গল্প ছিল। এমার্জেন্সির পর ইন্দিরার পরাজয় নিয়ে একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান ‘মাই ডিফিট কামস্ কোয়াইট লাইক দ্য বুদ্ধা স্টোরি'। বুদ্ধের গল্পটি কী? বুদ্ধদেব একটি ‘পুল’ বা পুষ্করিণী খনন করেছিলেন। তিনি গ্রামের মানুষদের কাছে আবেদন করেন যে কিন্তু পুকুরটি ভরার জন্য তারা যেন পাত্রে করে বেশ খানিকটা দুধ নিয়ে আসে। প্রত্যেকেই ভাবল যে গ্রামের বাকি লোকেরা তো দুধ নিয়ে আসবেই। সেই ফাঁকে তালে আমি যদি খানিকটা জল মিশিয়ে দিই তাহলে দেখতে কে আসছে। সেই ভেবে সকলেই জলভরা পাত্র নিয়ে গেল। বুদ্ধের দুধপুকুর মানুষজনের ফাঁকিবাজিতে জলে ভরে উঠল। এটা বলে ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'অ্যান্ড দ্যাটস্ মাই স্টোরি'। এবার স্মাইলিং বুদ্ধ আর বুদ্ধের দুধপুকুরের গল্পের পরিণাম দেখো। মৃত্যু এল বুদ্ধের হাসি দিয়ে। সেইজন্যই বলেছিলাম যে লোকটার নামের শুরুতে বুদ্ধ থাকবেই। আর প্রস্থেটিক মেক-আপ নিয়ে শক্ত খাবার খাওয়া যায় না। নরম খাবার বা অন্য লিকুইড খেতেই পারত। কিন্তু ইন্দিরার বলা বুদ্ধদেবের দুধপুকুর আর দুধের বাটি নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা তার মনে এমন গেঁথে গিয়েছিল যে দুধ ছাড়া আর কিছু সে খেলই না। এই অবসেশন আমি শুরু থেকেই লক্ষ করেছি। আর বৌদ্ধ লামা শুনে দুটোই আমার মনে পড়েছিল। তাই আন্দাজ করেছিলাম। দেখা গেল, বাস্তবেও ঠিক তাই।”

“ওকে... ওকে...!” এডিজি সেন বললেন, “এবার বুঝতে পারছি। ‘কমলা'—কমলা নেহরু। ইন্দিরা গান্ধীর মা!”

“ঠিক তাই। এখানে যদিও কমলা আর ফিজিওথেরাপিস্ট রাজীব চন্দ—দু-জনকে নিয়ে কনফিউশন ছিল। ধরেই রেখেছিলাম হয় কমলা হবে, নয় রাজীব। একজন মিসেস গান্ধীর মা, অন্যজন সন্তান। কিন্তু কোনজন বোঝা যাচ্ছিল না। দু-জনেই হতে পারত। তাই ‘বোলে সো নিহাল'-এর সাহায্য নিতে হল। আর আর্বানায় তো আমি নিশ্চিতই ছিলাম প্রিয়দর্শিনী ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না। কারণ স্বয়ং ইন্দিরারই মিডলনেম ‘প্রিয়দর্শিনী’। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এই নামটি ওঁর নামের মাঝখানে বসত। ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী গান্ধী। বার্নিং শিখের এটা প্রিয়তম নাম। তাই প্রিয়দর্শিনীই যে বার্নিং শিখ তা শুরুতেই বুঝে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রমাণ করার উপায় ছিল না। এই যুক্তিটা ডিডাকশনের জন্য যতই মোক্ষম' হোক, আইনের কাছে হাস্যকর। কিচ্ছু প্রমাণ করা যেত না। তাই ব্যাটার খোঁজ জানলেও চুপচাপই থাকতে হল। যদিও মাঝখানে আমি গুরশীলের কেসটার সঙ্গে গুলিয়েছিলাম। ওটা আমারই ভুল। গুরশীল-আমনদীপের ইতিহাস অন্য ছিল। তবে গুলাব সিঞা মহাশয় এনাকেই ফলো করছিলেন।”

অর্ণবের পেটে অনেকক্ষণ ধরেই একটা প্রশ্ন সুড়সুড় করছিল। আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, “তাহলে এর মধ্যে স্যাম ত্রিবেদী কোথা থেকে এসে পড়ল? স্যাম তো মিস্ দত্তের কাজিন সিস্টার!”

“আরে, কাজিন সিস্টারকে মারো গুলি।”

কথাটা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলেই জিভ কাটল অধিরাজ, “সরি, মিস্ দত্ত। আপনার বোনকে শ্যুট করতে চাইছি না। জাস্ট বলছি, যে ওঁর এখানে কোনো ভূমিকাই নেই। অর্ণবের

মিস্ দত্তের বোন স্যামকে মনে পড়ল, কিন্তু 'স্যাম মানেক্‌শ' এর নাম মনে পড়ল না। বিখ্যাত 'স্যাম বাহাদুর'। ইন্দিরা গান্ধীর ডানহাত। অতি বিশ্বস্ত সেনাপতি। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তিনি স্যাম মানেকশ ছাড়া আর কারোর দিকে তাকাতেন না। স্যাম মানেকশ ওঁর তুরুপের তাস। আমি প্রথমে স্যাম ত্রিবেদী না শ্যাম ত্রিবেদী, তাই নিয়ে ধন্দে ছিলাম। ত্রিবেদীর সঙ্গে 'স্যাম' নামটা যায় না। তবে যখনই 'স্যাম বাহাদুর'কে মনে পড়ল, তখনই বুঝলাম শ্যাম নয় ওটা নিঃসন্দেহে 'স্যামই'। লক্ষ্য করো প্রত্যেকটা নাম কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর কাছের মানুষদের। একমাত্র কেহর সিংকে বাদ দিতে পারো। সে শত্রু, কিন্তু শত্রুতাটাও সৎ সাহসের সঙ্গে করেছিল। ষড়যন্ত্র করলেও নিজের হাতে মারেনি, বেয়ন্ত সিং-এর মতো হত্যার পরে কাপুরুষের মতো পালানোর চেষ্টা করে গুলিও খায়নি, সতবন্তের মতো ডায়লগবাজিও করেনি। চুপচাপ ফাঁসিতে চড়েছে। বাকিরা সবাই ওঁর বিশ্বস্ত ও আপনজন। এই নামগুলোর পেছন দিয়ে বার্নিং শিখ মিথ্যে হলেও 'ইন্দিরা মা'-এর কাছের মানুষ হতে চেয়েছিল। এটা ওর একটা মারাত্মক ফ্যান্টাসি, ইউফোরিয়া বা একরকমের লোভ। আর এই প্যাটার্নটা ঘন্টুর সঙ্গেও মিলল যখন ওর ছেলের বিয়ের কার্ডটা দেখলাম।"

"কী যে বলো!" পবিত্র মাথা নাড়ল, "বিয়ের কার্ড আমরা সবাই দেখেছি। ঘন্টেশ্বর দাস বা ঘন্টেশ্বর নামে ইন্দিরা গান্ধীর কোনো আত্মীয় বা কাছের মানুষ থাকতেই পারে না! থাকলে অ্যাসাসিনেশনের দরকার পড়ত না। উনি নিজেই জলে ডুবে মরতেন।"

"না। ঘন্টেশ্বর বলে কেউ ছিল না। কিন্তু রতি বলে থাকতে পারে, সত্যজিৎ বলেও থাকতে পারে। ইনফ্যাক্ট ছিলও। মিসেস গান্ধীর শাশুড়ির নামই 'রতিমাই' ছিল। ফিরোজ গান্ধীর মা। পার্শি মেয়েদের নামে 'মাই' বা 'বাই' থাকে। ছেলেদের ক্ষেত্রে 'বাওয়া' বা 'বাবা' অথবা 'জি'। রতিমাই-এর 'মাই' শব্দটা 'মা'-কে রিপ্রেজেন্ট করে। নিজের বউকে তো আর মা বলে ডাকতে পারে না। তাই 'মাই' বাদ দিয়ে শুধু 'রতি'। আবার অন্যদিকে সত্যজিৎ রায় - সত্যজিৎ রায়ই হতেন না, যদি না ইন্দিরা গান্ধী থাকতেন। তিনি সত্যজিতের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক! সত্যজিতের একনিষ্ঠ ভক্তও বটে। রে'র একটি ফিল্মও উনি মিস্ করতেন না। সত্যজিতের ছবি যাতে বিদেশে প্রচার ও প্রসার পায় তার জন্য ইন্দিরার প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য। দু-জনের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্বের সম্পর্কও ছিল। রতি বউদি মুসলিম ছিলেন। আসল নাম আয়েশা। ঘন্টুই আদর করে তার নাম রেখেছিল রতি। আমরা সবাই তা জানতাম। কিন্তু কখনও এ নিয়ে মাথাই ঘামাইনি। অ্যান্ড চেরি অন বটম, ঘন্টুর ছেলের ডাকনাম যে পুপুল সেটাও সর্বজনোবিদিত। অথচ বার্নিং শিখ কেসের আগে কখনও তা নিয়েও ভাবিনি। পুপুল তো ছেলেদের মধ্যে কমন নাম। হতেই পারে। তা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণই নেই। এখনও থাকত না, যদি না এই প্রত্যেকটা নামই কোনো না কোনোভাবে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে লিঙ্কড না হত।"

"পুপুল আবার কে। রাজীব গান্ধীর ডাক নাম নয়তো? নাকি...'

পবিত্র আরও কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল। এডিজি সেন প্রায় লাফিয়েই উঠেছেন।

"ওঃ গড! ওঃ গড!" তিনি প্রচণ্ড উত্তেজিত, "এটা এভাবে ভাবিনি কেন! পুপুল শুধু ছেলেদের নাম নয়, মেয়েদের নামও হতে পারে। পুপুল মেহতা বা পুপুল জয়াকর! ইন্দিরা গান্ধীর বেস্ট ফ্রেন্ড ও জীবনীলেখিকা। মিসেস গান্ধীর যে ক-জন হাতে গোণা একদম প্রিয় বন্ধু ছিল, পুপুল তাদের অন্যতম। ইন্দিরা গান্ধীর বন্ধু বললেই আমাদের তেজি বচ্চনের কথা মনে পড়ে। বাট্ ইয়েস, আই ক্যান কানেক্ট নাও। পুপুল জয়াকর! সবচেয়ে প্রিয় সখী, যাঁর কাছে ইন্দিরা নিজের গোপনতম কথাটিও বলতেন।"

"হ্যাঁ স্যার।" অধিরাজ মাথা ঝাঁকায়, "প্রথমে নামগুলো নিয়ে অত ভাবিনি। কিন্তু যখন বিয়ের কার্ডে আবার ভালো করে দেখলাম আর জানলাম যে পুপুলের ভালো নাম সত্যজিৎ তখন খটকা লাগল। একটা, দুটো নাম কো-ইনসিডেন্স হতে পারে। কিন্তু এখানে একমাত্র নিজের নামটা ছাড়া বাকি সবকটা নামই ঘন্টু রেখেছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেকটা নামই কমন। অথচ একসঙ্গে তিনটে নামের উপস্থিতি ও তাদের মধ্যে লিঙ্ক উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না! তখন

থেকেই ওর দিকে সন্দেহ গেল। তার আগেও অবশ্য বেশ কয়েকবার ইনফর্মারদেরও হালকা সন্দেহ করেছি। এরপর থেকে একে একে হিসাব মেলাতে বসলাম। মিলেও গেল!"

"ইনফর্মারদেরও সাসপেক্ট লিস্টে রেখেছিলে তুমি?"

"হ্যাঁ। কারণ প্রতিবারই বার্নিং শিখের কাণ্ডকীর্তি দেখে মনে হচ্ছিল এই লোকটা কোনো সাধারণ লোক নয়! প্রস্থেটিক মেক-আপে সিদ্ধহস্ত, একাধিক ভাষা তার দখলে, নানাবতি কমিশন-কপুর মিত্তল কমিটির রিপোর্ট অবধি সে পৌঁছোতে পারে, কোন্ লোকটা কোন্ শহরে আছে সেটা জানাও তার কাছে হালুয়া-পুরী, পুলিশ ও ইনভেস্টিগেটিং অফিসারদের অভ্যাস, দুর্বলতা, ভেতরের খবর সব জেনে বসে আছে, বে-আইনি অ্যাসিড, ড্রাগস, ওষুধ, গাঁজার র‍্যাকেট, বম্ব-সব তার হাতের মধ্যে, কোথায় গেলে কোন কাজটা হবে তা সে জানে, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট আমদানি করতে অসুবিধে হয়নি, কম্ব্যাটে আর মেন্টাল ম্যানিপুলেশনে ওস্তাদ আরও যা যা তার ধর্ম আমরা পেয়েছি তাতে মনে হয়েছে, লোকটা হয় ডিপার্টমেন্টেরই লোক, নিজেই কোনো পুলিশকর্তা, স্পাই, প্রাইভেট গোয়েন্দা বা আর্মিম্যান। কিংবা ওরকমই অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু। আমরা এত কিছু ভেবে ফেলেছিলাম ঠিকই, পাশাপাশি আমার কেন জানি না বারবার সার্জিক্যাল স কিলারের কেসটাও মনে পড়ছিল। সেখানেও কিলার এমনই পাওয়ারফুল ছিল। কিন্তু তখন আমরা সুমঙ্গল পণ্ডিতকে সন্দেহ করেছিলাম যে লোকটা খবরি মহলে 'শেয়াল পণ্ডিত' নামে বিখ্যাত ছিল। প্রায় 'মিথই' বলা যায়। যদিও শেষপর্যন্ত সে নিজেই খুনির শিকার হয়েছিল। বাট, দ্য পয়েন্ট ইজ—তাকে সন্দেহ করার পেছনে এই কোয়ালিটিগুলোর কিছুও ছিল। সেই অবিশ্বাস্য মেক-আপের ক্ষমতা, যে কোনো জায়গা থেকে গোপনতম খবর বের করে আনার দক্ষতা, কম্ব্যাট স্টাইল, ভয়াবহ চাতুর্য। অফিসারদের বিশ্বস্ত তাই তাদের সব খুঁটিনাটি, সব দুর্বলতা একজন ইনফর্মার জানবেই, পেশার প্রয়োজনেই অন্ধকার দুনিয়ায় তার অবাধ যাতায়াত। যে-কোনো শহরে সে নিজের গোপনীয় কাজে চলে যেতে পারে। পরিবারের কেউ প্রশ্ন করবে না। বে আইনি ড্রাগস, অ্যাসিড থেকে শুরু করে গাঁজা, কেরোসিন কোথায় পাওয়া যায়, কালোবাজারি কোথায় হয়, সবই তার নখদর্পণে। শুনতে আপনাদের হয়তো খুব ভালো লাগবে না, কিন্তু এটাই বাস্তব যে আমাদের ইনভেস্টিগেশনে ফিফটি পার্সেন্ট মদত যোগায় এই ইনফর্মার র‍্যাকেট! গুল্লু, ঘন্টু বা যাদবের মতো একজন তুখোড় ইনফর্মার অনায়াসেই মদনের মতো আর্চ ক্রিমিনাল কোথায় লুকিয়ে আছে, এবং কবে, কোথায় আসবে, এমন চূড়ান্ত গোপন খবরও বের করে আনতে পারে। তাই নানাবতি কমিশনের রিপোর্টের নামগুলোর মালিকেরা এখন কোথায় আছে, সেটা বের করা তো স্রেফ জলভাত। একাধিক ভাষাও সে জানবে কারণ অপরাধীরা বা তাদের কানেকশনরা যে সবাই বাঙালি হবে এমন কোনো কথা নেই। একজন গ্যাংস্টার বা টেররিস্টের ডানহাত একজন সাউথ ইন্ডিয়ানও হতে পারে। ম্যানিপুলেট করাটা তো খবরিদের অন্যতম সুপার পাওয়ার। যে লোকটা নিজেকেও বিশ্বাস করে না, সেই লোকটারও কাছের মানুষ হয়ে উঠতে তাদের জুড়ি নেই! আন্ডারওয়ার্ল্ডের লোকজন কাউকে বিশ্বাস করে না। আর সন্দেহ করলেই মৃত্যু কপালে নাচছে। তাই ওরকম হার্ড-নাটকেও এরা দিব্যি ক্র্যাক করে বসে থাকে। কী করে? ম্যানিপুলেশন ছাড়া আর কী! যত শক্ত ঠাঁই-ই হোক, ঠিক পটিয়ে পাটিয়ে কথা বের করে আনবেই। আস্থা তৈরি করতে এরা ওস্তাদ। সবটা দেখে মনে হল, আমরা স্পাই, পুলিশ, আর্মি, প্রাইভেট ডিটেকটিভ সব ভেবে ফেললাম, কিন্তু একজন ইনফর্মার নয় কেন?

ইনফর্মারদের নিজস্ব একটা শক্তিশালী নেটওয়ার্কও থাকে। তারা দিল্লি, কানপুর, বেঙ্গালুরুর খবরও সেই নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই আরামসে পেতে পারে। তারই ইনফর্মার সঙ্গী প্রয়োজনে তাকে ওখানকার পুলিশদের সঙ্গে গোপনে পরিচয়ও করিয়ে দিতে পারে, যার জন্য হয়তো সে তাদের বিশ্বাসভাজনও হয়ে উঠতে পারে। একটা জিনিয়াস ইনফর্মার কী করতে পারে তা পি সি চৌধুরীর বাড়ির গার্ডদের অবস্থা দেখেই বোঝা গেছে। একটা লোক কী সহজে অতগুলো লোককে কেটে ছড়িয়ে দিল! অন্য কেউ হলে তার হাতের জলও ছুঁত

না গার্ডরা। যার দোকানে বসে স্বয়ং তাদের ওপরওয়ালারা চা খান, এমনকি আমিও খেয়েছি, তাকে অবিশ্বাস করার জায়গাই নেই! আর বাকিরা একটু হাই প্রোফাইলের লোক। চাকর-বাকর সেজে বা লো প্রোফাইলের মানুষ হয়ে সবার পায়ের তলায় থাকতে তাদের অসুবিধে হয়। একজন ইনফর্মার এতটাই সাধারণ যে কিছুতেই তার কোনো সমস্যা নেই। সে সস্তা মদের ঠেকে বা বস্তিতে গিয়ে সদ্য শহরে আগত মজুরদের সঙ্গে আলাপ করতে পারে। যতরাজ্যের মাতাল, গাঁজাখোরদের সঙ্গে ঘুরঘুর করে। শহরে একটা নতুন বাসিন্দা এলেও ঠিক জেনে যায়। পরিযায়ী শ্রমিকদের আস্তানা, রাস্তার কোন ভিখিরির ইতিহাস কী—সব সে জানে। অন্যান্য খবরিদের অ্যাক্সেসও পেতে পারে। ইসমাইল আর রকির মতো ধূর্ত খবরিকে স্পট করে খুন করা, আর যা-ই হোক্ একজন দিল্লি থেকে আগত খুনির কীর্তি হতেই পারে না। ওদের স্টক করার ক্ষমতা আনবিলিভেল্। ছায়াকেও দেখা যায়, অথচ এই দুই স্টকারকে হলোম্যানও বলা চলে। ওরা কাউকে বিশ্বাসও করে না যে আশেপাশে ঘেঁষতে দেবে। তবু মরল! তার মানে ওরাও কাউকে বিশ্বাস করেছিল। সেই লোকটির আরও একজন ইনফর্মার হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল নয় কি?”

“পয়েন্ট আছে!” ডঃ চ্যাটার্জি ন্যাপকিনে মুখ মুছে বললেন, “ইনফ্যাক্ট ভেরি স্ট্রং পয়েন্ট।”

“শুধু একটা নয়। আরও অনেক পয়েন্ট আছে।” সে বুঝিয়ে বলে, “বার্নিং শিখ অতি বড়ো ক্রিমিনাল হলেও চোর নয়, রেপিস্টও নয়। ১৯৮৪তে দাঙ্গার সঙ্গে লুটপাট, গ্যাং রেপও হয়েছিল। তার যা ভয়াবহ প্রতিশোধস্পৃহা তাতে খুনের পাশাপাশি লুটপাট আর রেপ করার সুযোগও ছিল। সবক-টা বাড়িতে যা মালকড়ি আর গয়না ছিল তা যদি সে লোপাট করত তবে কমসে কম পঞ্চাশ থেকে ষাট লাখ টাকার সম্পত্তি হয়ে যেত। অথচ সেসব কিছুই হয়নি। এর পেছনে শিখধর্মের শিক্ষা রয়েছে। বার্নিং শিখ যে ধর্মভীরু তা বুঝতে বাকি নেই। এরকম একটা লোক খুন করার পর একবার মাফ চাইতে গুরুদ্বারা যাবে না? অন্তত খুন করার আগে তো যাবেই। অথচ গুলাব সিঞ্জা জনাব জানালেন গত একবছরে কোনো নতুন মুখ কোনো গুরুদ্বারায় দেখা যায়নি। কলকাতা দিল্লি নয় যে শিখ কমিউনিটির সংখ্যা বিশাল। এখানে শিখদের সংখ্যা কম এবং গুরুদ্বারার সংখ্যা সেই তুলনায় বেশি আর বসতিগুলোর আশেপাশেই গড়ে উঠেছে। সেই স্বল্প সংখ্যক দর্শনার্থীদের মধ্যে একটা নতুন মুখ কারোর চোখে পড়ল না? জ্ঞানী, গ্রন্থিরা যদি লক্ষ্যও না করেন, অ্যাট লিস্ট যারা গুরুদ্বারার বাইরে জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা তো দেখবেই! তখনই খট্‌কা লেগেছিল, এমন নয়তো যে মুখটা একেবারেই নতুন নয়, বরং পুরোনো? বার্নিং শিখ শৈশবে দিল্লিতে ছিল। তারপর মাইগ্রেটেড হয়ে কলকাতাতেই চলে আসেনি তো? কারণ ওই ঘটনার পর অনেক শিখই কলকাতাবাসী হয়েছিল। এই বিশ্বাসটা আরও পোক্ত হল যখন গুলাবোঁ মহাত্মা গান্ধী রোডের গুরুদ্বারা মুনি লাল শিখ সঙ্গতের সামনে জনৈক সর্দারের রহস্যজনক আবির্ভাবের কথা বলল। বেছে বেছে ওই গুরুদ্বারাটাই কেন? ওই লোকটাই যে বার্নিং শিখ সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। সে কোমল কৌরের বাড়িতে থাকত। সেক্ষেত্রে ওর কাছেই ইটালগাছা গুরুদ্বারা শিখ সঙ্গত আছে। সেখানেই যাওয়া স্বাভাবিক নয় কি? সেসব ছেড়ে ব্যাটা ত্রিশ মিনিট দূরত্বে মহাত্মা গান্ধী রোডে ‘ওয়াহেগুরু’র কাছে ক্ষমা চাইতে আসে! ব্যাপারটা অদ্ভুত যদি বার্নিং শিখ শহরে নতুন এসে থাকে। সেক্ষেত্রে সে নিকটবর্তী গুরুদ্বারাটিকেই বেছে নেবে। অথচ যদি এমন হয় যে বার্নিং শিখ আদতে পশ্চিমবঙ্গেই বসে আছে, এবং হয়তো সে নিয়মিত মহাত্মা গান্ধী রোডের ওই গুরুদ্বারাটিতেই যেতে অভ্যস্ত, সেক্ষেত্রে কোভিডের পর কোনো গুরুদ্বারাতেই নতুন মুখ না আসা, আর ইটালগাছার গুরুদ্বারা ছেড়ে বার্নিং শিখের মহাত্মা গান্ধী রোড অবধি ট্র্যাভেল করাটা জাস্টিফায়েড হয়ে যায়। আর মহাত্মা গান্ধী রোডেই তো আমাদের শ্রীমান ঘন্টুর বাড়ি ও চায়ের দোকান। গুরুদ্বারা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে।”

“হুঁ। এভাবে ভাবিনি।”

“কারণ ঘন্টু আমাদের সবার সন্দেহের উর্ধ্বে ছিল। মদন বলেছিল যে বার্নিং শিখের কথা শুনে ও বুঝতে পেরেছিল যে লোকটা দিল্লির। তার কারণ দিল্লির হিন্দিতে কিছু পেটোয়া শব্দ

আর স্ল্যাং থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের হিন্দির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এই জিনিসটাও আমার কানে লেগেছিল। যখন প্রথম কুড়ি লিটার কেরোসিন গায়েব হওয়ার খবরটা ঘন্টু দেয় আর আপ্তে সাহেবের বাড়িতে নিয়ে যায়, স্পষ্ট মনে আছে আপ্তেসাহেবের অর্ধাঙ্গিনী বলেছিলেন, 'রকেল' নেই। 'রকেল' হচ্ছে কেরোসিন তেল। মহারাষ্ট্রে, বিশেষ করে মুম্বাইয়ের মারাঠিরা কেরোসিনকে 'রকেলই' বলে। সাধারণ হিন্দিভাষীরা বলে 'ঘাসলেট' কিংবা 'কেরোসিন'। কিন্তু ঘন্টু শুরুতেই মুখ ফস্কে কেরোসিনকে 'মিট্টি কা তেল' বলে ফেলেছিল। 'হাম লোগ ইয়াহা মিট্টি কা তেল খরিদনে নেহি আয়ে ভাবিজি।' সেটা শোনামাত্রই আমার কানে খট্ করে লাগে। আমি দাঙ্গার ওপর যত ডকুমেন্টারি দেখেছিলাম সবগুলোতেই অন্যরা কেরোসিন বললেও সব শিখেরাই কেরোসিনকে 'মিট্টি কা তেল' বলছিল। পাঞ্জাবে কেরোসিনকে 'মিট্টি কা তেলই' বলা হয়। দিল্লিতেও অনেকে বলে। অথচ ঘন্টু বাঙালি! এখানেই শেষ নয়। আপ্তেসাহেবের সঙ্গে কথোপকথনেই যখন খুচরো টাকার প্রসঙ্গ ওঠে, তখন আপ্তেসাহেব বলেছিলেন ওঁর কাছে 'চিল্লর' ছিল না। 'চিল্লর-টাও মুম্বাইয়ের হিন্দি। অন্যান্য জায়গায় 'ছুট্টা প্যায়সা'। বাঙালিরা বলে খুচরো পয়সা। অথচ ঘন্টু বলল, 'খুল্লা পয়সা"! আবার চমক! খুল্লা পয়সা কথাটা বাঙালিরা হিন্দি বললেও বলবে না। ওটাও খাঁটি দিল্লিরই ভাষা বা কয়েনেজ। একমাত্র দিল্লিতেই খুচরোকে 'খুল্লা প্যায়সা' বলে। এছাড়াও কোমল সিং ভল্লার বাড়ির নতুন অতিথির শিস দেওয়া প্রসঙ্গে ও বলেছিল কেউ বুঝি মদ খেয়ে 'ভণ্ড' হয়ে শিস্ বাজাচ্ছে। বাক্যটা কিছুটা এরকম, 'মদ-গাঁজা ফুঁকে ভণ্ড হয়ে অসময়ে সিটি বাজাচ্ছে'। ভণ্ড শব্দটার বাংলায় অন্য অর্থে ব্যবহার হয়। কপট, শঠ বা ছদ্ম হিসাবে। কিন্তু দিল্লিতে মাতাল বা নেশা করে উলটে পড়াকেই 'ভণ্ড' হওয়া বলে। এরপর যখন কোমলের প্রসঙ্গ এল, তখন লক্ষ্য করো, প্রত্যেকেই ওঁকে কোমল সিং ভল্লা বলেছে। গুল্লু বা গুলাবোঁ স্বয়ং একজন শিখ হওয়া সত্ত্বেও ওঁর নাম কোমল সিং ভল্লাই বলল। কিন্তু একমাত্র ঘন্টুই বলল, 'কোমল কৌর'। প্রশ্ন হল একজন বাঙালির ছেলে টিপিক্যাল শিখদের এবং দিল্লির বিশেষ কয়েনেজ আর ভোক্যাবুলারি ইউজ করছে কেন! শিখনারীদের যে সম্মান দিয়ে 'কৌর' বলতে হয়, সেটা ক-জন বাঙালি জানে? আজকালকার শিখ মেয়েরাও 'কৌর' শব্দটা বিশেষ ব্যবহার করে না। যেখানে স্বয়ং একজন শিখ খবরি 'কৌর' শব্দটা উচ্চারণও করেনি, সেখানে একজন বাঙালি খবরি বলছে, 'কোমল কৌর'! আশ্চর্য নয়? ঘন্টু ঠিক সেই কয়েনেজগুলো ইউজ করছিল, যেগুলো শিখ বা দিল্লিবাসীদের স্পেশ্যাল ভাষা!"

"এটা তো আমিও শুনেছিলাম।" অর্ণব এতক্ষণে মুখ খুলল, "কিন্তু আমার অদ্ভুত লাগেনি।"

"লাগা উচিত ছিল।" সে বলল, "যেদিন সনৎ-ইসমাইল-রকি মারা গেল, সেদিনও একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। বার্নিং শিখ সনৎকে ব্রুটালি খুন করল। কিন্তু দ্রিঘাংচুর অস্তিত্ব কি সে জানতে পারেনি? দ্রিঘাংচু যে পরিমাণে টকেটিভ তাতে ওর বকবক শুনেই তো লোকে ওর উপস্থিতি টের পাবে। আমরা যখন গেলাম দ্রিঘাংচু তখনও বকবক করছিল, 'সি.আই.ডি. অফিস থেকে আসছি। তার মানে ওই ডায়লগটা সে শুনেছে ও নকল করেছে। খুনের সময়ে সে জেগেও ছিল। সনতের চেঁচামেচি শুনেও সে কোনো আওয়াজ করেনি? কোনো কথা বলেনি? যে বাক্যটা নকল করছিল, সেটাও নয়? অসম্ভব। নিশ্চয়ই ও পটর পটর করেছিল আর বার্নিং শিখও ওর উপস্থিতি নির্ঘাত টের পেয়েছিল। একটা নিরীহ মানুষকে যে অমন নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে পারে, নৃশংস একজন খুনি, যে পাখিটা ওর ডায়লগ নকল করে বসে আছে এবং ডায়লগের মাধ্যমে ওর টেকনিক পুলিশকে জানিয়ে দিতে পারে, সে কিনা তাকে ছেড়ে দিল! এত দয়া মায়া! কেন? অন্যদিকে ওইদিন ঘন্টুর ব্যবহার দেখো। তাকে যখন ডাকলাম, সে বলল, 'দুটো রুটি খেয়েই আসি' এ আবার কী জাতীয় কথা। কোন বাঙালি লাঞ্চে রুটি খেতে বসে। হাই সুগার থাকলেও বাঙালিরা দুপুরে একমুঠো ভাত-ই খাবে। আর ঘন্টু যেরকম ঢকঢকিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক খায়, তাতে সুগার থাকলে এতদিনে মরে যেত। তবে বাঙালির বাচ্চা লাঞ্চে 'দুটো রুটি' খাচ্ছে কেন? ওবেসিটির প্রবলেমও নেই! ওই তো

রোগাসোগা চেহারা। অবাঙালিরাও বলে 'খানা খাকে আতা হুঁ'। শুধুমাত্র পাঞ্জাবি এবং শিখদের এটাই লব্জ 'দো রোটি খাকে আতা হুঁ'। ওরা যে-কোনো খাবারকেই 'রোট-শোটি' বলে। অর্থাৎ বাংলা ভার্সানে, 'দুটো রুটি খেয়ে আসছি' যতই পশ্চিমবঙ্গে কাটাক। ছোটোবেলার শোনা কথা, লব্জ আর অভ্যাস যাবে কোথায়! সে তো ওর রক্তে! এরপর ও খবর দিয়ে চলেও গেল। সনতের মৃত্যুর খবর জানল। অথচ একবারও জিজ্ঞাসা করল না যে কাকাতুয়াটা মানে দ্রিঘাংচু ঠিক আছে কিনা! দ্রিঘাংচুকে তো ও-ই নিজের হাতে করে এনে দিয়েছিল। এটাও জানত ডঃ চ্যাটার্জির পোষ্য! তাও ওর মায়া নেই? বার্নিং শিখের মতো খুনি যে ওকে মারতে পারে এমন আশঙ্কা মনে এল না! অথচ সেই বার্নিং শিখের মায়া আছে! এর থেকে একবারও মনে হয় না যে বার্নিং শিখ দ্রিঘাংচুকে এইজন্যই ছেড়ে দিয়েছিল কারণ ওই প্রাণীটাকে সে ভালোবাসত। নিজের হাতেই উপহার দিয়েছিল। আর ঘন্টু এইজন্যই প্রাণীটার খবর নেয়নি, কারণ বার্নিং শিখ যে দ্রিঘাংচুকে মারেনি তা সে আগে থেকেই জানত!"

"গ-ড!"

টুইঙ্কল অরোরা গোল গোল চোখ করে শুনছিল। এবার খালি প্লেটে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, "তবে রোটির ব্যাপারটা কিন্তু স্যার একদম ঠিক। আমাদের বাড়িতে চাইনিজ হলেও দাদি আর বাবা বলবে, 'রোটি-শোটি খেয়ে যা' পাঞ্জাবের লোকেরা অকেশনালি 'চাওয়ল' খায়। তাও পোলাও, মিঠি চাওয়ল গোছের রাইস। প্লেন রাইস খায় না খুব একটা। রুটিটাই মেইন।"

"রাইট।" তার প্লেটে আঙুল বোলানোর ভঙ্গি দেখে অধিরাজ ফের বিরিয়ানি সার্ভ করতে করতে বলল, "আপনিও একটু রোটি-শোটি খেয়ে নিন। আই মিন বিরিয়ানি। খালি প্লেট দেখতে মোটেই ভালো লাগছে না।"

এই নিয়ে পাঁচ প্লেট হল। পরিমাণ এমনই যে বিড়ালও ডিঙিয়ে যেতে পারবে না। অর্ণব মনে মনে হেসে বলল, "এটাও আমি মিস করেছি। কোনো বাঙালি লাঞ্চে সত্যিই 'দুটো রুটি' খায় না, বরং 'দু-মুঠো ভাত'-ই খায়। এটাও অদ্ভুত ছিল।"

"গুল্লু, হুলিয়ার বিষয়ে মুখ ফস্কে বলেছিল-বার্নিং শিখের হুলিয়া এমনই যে গুল্লুর নিজের সঙ্গে তো বটেই, এমনকী যাদব আর ঘন্টুর সঙ্গেও ও হুলিয়া মেলে। শুধু হুলিয়া নয়, বয়েসও মেলে। তুমি গুলাবোঁর বয়েস নিয়ে চিন্তিত হচ্ছিলে। ঘন্টুকে দেখতে বাচ্চা বাচ্চা বলে ওকে ধরোনি। কিন্তু যার পুপুলের বয়েসি বিবাহযোগ্য ছেলে আছে, তারও এজগ্রুপ ওটাই হওয়া উচিত! এছাড়া মদনের কথাও একবার মনে করো। ও ওর বয়ানে কী বলেছিল মনে আছে? বার্নিং শিখের ওকে দেখে ঠিক কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? ওর বয়ান অনুযায়ী, 'লোকটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে'— এইসব বলে একেবারে তেড়ে গালাগালি দিতে শুরু করল। জানি না স্যার, আমি ওর কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি! সে মাল সোজা তেড়েফুঁড়ে আমায় মারতে এল! বলল, 'তোকেও শালা জ্বালিয়ে মারব' কোট-আনকোট। এবার প্রশ্ন হল, বার্নিং শিখ মদনকে দেখে তেড়ে এল কেন?"

"কারণ মদন ওর খুনের সাক্ষী ছিল!"

অধিরাজ হেসে ফেলে, "কীসের সাক্ষী। দিল্লির ঝাড়ুদার তো আরও বড়ো সাক্ষী ছিল যাকে বার্নিং শিখ হাতে চিঠি ধরিয়ে দিয়েছিল। কই, তাকে তো মারেনি। একা সেই ঝাড়ুদারই নয়, তার কর্মকাণ্ডের সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী, তার বার্নিং শিখ মার্কা ভৌতিক হুলিয়ার দর্শক অনেক ছিল। দিল্লিতে তো যত্রতত্র দেখা দিত। আপ্তেসাহেবকেও দেখা দিয়েছে। নিজেকে লুকোনোর চেষ্টাই ছিল না। সিসিটিভি ফুটেজেও তাকে দেখা গেছে। কোনো সাক্ষীকে সে আক্রমণ করেনি। ফুটেজও ট্যাম্পার করেনি। সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শীদের তোয়াক্কাই করে না! কারণ ও জানত, ওরা তাকে যে হুলিয়ায় দেখেছে সেই হুলিয়া থেকে আসল লোকটাকে জীবনেও বের করা যাবে না। অথচ সেই লোকটাই মদনকে তেড়ে মারতে এসেছিল। প্রশ্ন হল, কেন?"

"কেন?"

"কারণ বার্নিং শিখ মদনের মতো আর্চ ক্রিমিনালকে চিনতে পেরেছিল। ও হারামজাদা যে কোনো পাপকাজই ছাড়েনি। খুন, ডাকাতি, সুপারি কিলিং, এক্সটর্শন, কিডন্যাপিং, কিচ্ছু যে বাকি নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা দুশ্চরিত্র, লুচ্চা আর রেপ-মার্ডারের আদল, ওই নেহরু-গান্ধী পরিবারের পেটেন্ট ফেস কাটিং, বড়ো বড়ো চোখের একটু রাগী রাগী চাউনি লক্ষ্য করেই এই প্ল্যান তৈরি করা। এমনকি ওঁর হাইট, চলার ভঙ্গিটাও হুবহু এক। শুধু ডায়লগটা ওঁকে দিয়ে বলানো যেত না। আয়রন লেডির কণ্ঠস্বর সুললিত হলেও অত রিনরিনে নয়। পার্থক্যটা ধরা পড়ত। বিশ্ব ব্যাটা এখানেই কামাল করল। শেষপর্যন্ত অডিও রেকর্ডিং আর মেক-আপের কল্যাণে ইন্দিরা গান্ধী টু পয়েন্ট জিরোর আবির্ভাব হল। মিস্ মুখার্জি অভিনয়টাও ফাটিয়ে করলেন। ওরকম ভয়ংকর নৃশংস খুনির সামনে অমন অবিচলিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং করে যাওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু মিস মুখার্জি প্রমাণ করে দিলেন যে উনি অঘটন ঘটন পটিয়সী। ওঁর ডেডিকেশনের তুলনাই হয় না। বার্নিং শিখ ওখানেই শেষ হয়ে গেল। তারপর কী হয়েছিল তা তোমরা সবাই জানো। আ ভেরি বিগ হ্যান্ডস ফর মিস্ মুখার্জি অ্যান্ড আওয়ার টিম টাইগ্রেস।"

সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে। আহেলির মুখ লজ্জায় সিঁদুরে। সে মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

ডিনার পর্বের শেষে একে একে সকলেই বিদায় নিচ্ছিল। অধিরাজ মেয়েদের প্রত্যেককেই সসম্মানে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল। টুইঙ্কল অরোরা অত খাওয়ার পর কী করে উঠে দাঁড়াতে পারল তা নিয়ে অর্ণবের বিস্ময়ের অবধি নেই। আহেলিকে আজ বড়ো সুখি লাগছিল। কৌশানী আর আত্রেয়ীও খুশি। মিস্ চাউমিন বন্ড আসতে পারেনি। তার শরীর একটু বিগড়েছে বলে তার খাবারটা প্যাক করিয়ে নিজেরই এক নিরাপত্তারক্ষীর হাতে দিয়ে দিল অধিরাজ। ছেলেটি দৃষ্টির ঠিকানায় খাবারটা পৌঁছে দেবে। পবিত্র ও ডঃ চ্যাটার্জিও বিদায় নিলেন। তাকে কিচেন গুছিয়ে রাখতে সাহায্য করে অর্ণবও চলে গেল। শুধু শেষে সে শিশির সেনকে গাড়িতে তুলে দিতে গিয়েছিল। ফাঁক পেয়ে এডিজি সেন চাপা স্বরে জানতে চাইলেন, "রাজা, একটা কথা...।"

"স্যার।"

"সত্যিই কি ভূপেন্দ্র দত্তাকে তুমি বাঁচাতে পারতে না?"

অধিরাজ একটা শ্বাস টানল, "স্যার, টু বি ভেরি অনেস্ট, উনি যে এতদিন সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অবশেষে মানে মানে নরকারোহণ করেছেন, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। আমার ধারণা, ওঁর পরিবারের কেউ বিশেষ দুঃখিতও হননি। খামোখা আপনি শোকপ্রকাশ করছেন কেন? আপনার বরং খুশি হওয়া উচিত যে সব অফিসাররাই আস্ত আছে!"

"তা ঠিক!" তবু তাঁর মুখে বেদনা নেমে আসে, "কিন্তু ঘন্টু এমন করল! এত বছরের বিশ্বস্ত ইনফর্মার।"

"আপনি বুঝবেন না স্যার। আপনি ওর ডায়েরিটা পড়েননি।" সে আস্তে আস্তে বলে, "একটা আট বছরের বাচ্চা সুখে, শান্তিতে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে দিন কাটাচ্ছিল। না সে বেয়ন্ত সিংকে চিনত, না ভিন্দ্রানয়ালেকে, এমনকি ইন্দিরা গান্ধীকেও না। হঠাৎই বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে সে সবকিছু হারাল। চোখের সামনে অসহায় বাবার যন্ত্রণা, তাঁর মাথাটা উড়ে যেতে দেখেছে। ভাইদের পুড়ে মরা-অন্তিম চিৎকার, মায়ের কান্না, অনুরোধ ও গ্যাংরেপ, দিদির শোচনীয় পরিণতি দেখেছে সেই বাচ্চাটা। নিজেও প্রায় মরতে বসেছিল। কোনোভাবে যদি বা বাঁচল তারপর বিচারের অপেক্ষা! চৌত্রিশ বছর ধরে সে দেখল যে একে একে তার অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। সে সেই সর্বহারাই রইল। অথচ তার পরিবারের খুনিরা উঁচুতলার বিলাস-ব্যসনে আরামসে পরিবারের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। চোখের সামনে এই প্রহসন দেখে আর কতদিনই বা স্থির থাকতে পারত।"

"এমন দৃশ্য সব শিখ পরিবারই দেখেছে। কিন্তু সবাই বার্নিং শিখ হয়নি।"

শিশির সেনের কথায় মাথা নাড়ল অধিরাজ, "রাইট স্যার। তবে শিখরা এই ঘটনা আজও ভুলতে পারেনি। ১৯৮৪ সালের ক্ষত আজও তারা বয়ে বেড়াচ্ছে। ক্ষতবিক্ষত মানুষ অনেক থাকে। তবে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন একটাই হয়! এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ডায়েরিটা আমি পাবলিশ করার চেষ্টা করব। বার্নিং শিখের পোড়ার ইতিহাস সবার সামনে আসা উচিত। এটা যাতে মানুষের কাছে পৌঁছোয়, সে চেষ্টার ত্রুটি রাখব না। অবশ্য যদি আপনার অনুমতি থাকে।"

বলতে বলতেই সে আকাশের দিকে তাকায়। আজ আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। তার মনে হল, অনেক নক্ষত্রের ভিড়ে বুঝি একখানা নতুন তারা বড়ো বেশি ঝলমল করছে। তার দীপ্তিতে আগুনের জ্বালা নেই। বরং সাদা শান্ত বিচ্ছুরণে বুঝি হাসছে। তাকে ঘিরে আছে আরও অনেক ছোটো বড়ো তারা। যেন নক্ষত্রের একটা আস্ত পরিবার! আট বছরের ছেলেটা বুঝি এতদিনে নিজের হারিয়ে যাওয়া পরিবারের কাছে ফিরে গেল...!

"টিম্ টিম্ করছে নিকে নিকে তারে, লগ্ দে সানু বহোত পিয়ারে, জি করদা মৈ তোড়ি যাওয়া, অপনে ওয়াড়ি ভিচ্ বিছাওয়া...!"

সায়ন্তনী পূততুন্ডের জন্ম

৩১শে জুলাই, ১৯৮৫।

পড়াশোনা যথাক্রমে যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর।

লেখালিখির জগতে প্রথম প্রকাশ

১৯৯৭ সালে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় বিভাগে 'চশমা' নামক ছোটগল্পের মাধ্যমে। আর ২০১১ সালে 'আনন্দধারা' উপন্যাসটির মাধ্যমে বৃহত্তর পাঠকের দরবারে প্রবেশ।

ইতিমধ্যে লেখিকার একাধিক উপন্যাস ও সংকলন গ্রন্থ পাঠকদের আশীর্বাদধন্য। লেখিকার উপন্যাস অবলম্বনে ২০১৬ সালে তৈরি হয় প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষের পরিচালনায় 'শঙ্খচিল' ছবিটি যেটি সে-বছর বেস্ট চলচিত্র হিসেবে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়। লেখিকার হোমিসাইড অফিসার 'অধিরাজ'কে নিয়ে লেখা সিরিজ রহস্য-রোমাঞ্চ-থ্রিলারপ্রেমী পাঠকদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

ইতিহাস জন্ম দিয়েছিল এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের। ইতিহাস ভুলে গেলেও, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কিন্তু ভোলেনি তার স্রষ্টাদের। কখনোই ভোলে না। যারা তাকে সৃষ্টি করেছিল, তাদের শেষ করতে আসছে সে...

হাতে, মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা!

বিভা
রহস্য রোমাঞ্চ
ISBN 978-81-969528-8-4
₹৬৪৯.০০
www.bivarnart.in

অসোউইক ফোর্টের যুদ্ধ

সঞ্জয় সুরি - ১৯৮৪, দ্য অ্যান্টি শিখ ভায়োলেন্স অ্যান্ড আফটার
বিক্রম কাপুর - নাইন্টিন এইট্টি ফোর, ইন মেমোরি অ্যান্ড ইম্যাজিনেশন
পাভ সিং - নাইন্টিন এইট্টি ফোর, ইন্ডিয়াজ গিলটি সিক্রেট
জর্নেল সিং - আই অ্যাকিউজ...
মনোজ মিত্তা, এইচ এস ফুলকা - হোয়েন এ ট্রি শুক ডেলহি
সনম সুতিরথ ওয়াজির - দ্য কৌরস্ অব নাইন্টিন এইট্টি ফোর, দ্য আনটোল্ড, আনহার্ড স্টোরিজ অব শিখ ওমেন
ইশমিত কৌর চৌধুরি - ব্ল্যাক নভেম্বর
নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় - শিখস্ দ্য আনটোল্ড অ্যাগোনি অফ নাইন্টিন এইট্টি ফোর
সরবপ্রীত সিং - নাইট অফ দ্য রেস্টলেস স্পিরিটস

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
দ্য হিন্দু
হিন্দুস্থান টাইমস্
দ্য টেলিগ্রাফ
দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া
অমর উজালা
দৈনিক জাগরণ
নবভারত টাইমস
পঞ্জাব কেসরী
রাজস্থান পত্রিকা
দ্য স্টেটসম্যান
দ্য ট্রিবিউন
দৈনিক ভাস্কর
আনন্দবাজার পত্রিকা
ফিল্ম থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর
এবিপি নিউজ দর্পকে চৌত্রিস সাল, যব জলি থি দিল্লি
শেখর কাপুর প্রধানমন্ত্রী
ফার্স্টপোস্ট ডকুফিচার
বিবিসি নিউজ দ্য নাইন্টিন এইট্টিফোর রায়টস্
দিল্লি তক ডকুমেন্টারি
এন ডি টিভি দ্য হরর দ্যাট স্টিল হন্টস্, ‘ফরগটেন চ্যাপ্টার?
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এইচ এস ফুলকা ইন্টারভিউ
সঙ্গত টেলিভিশন নাইন্টিন এইট্টি ফোর শিখ জেনোসাইড ডকুমেন্টারি
নানাবতি কমিশন
কপুর মিত্তল কমিটি
সজ্জনকুমার
খুশবন্ত সিং
মনমোহনবীর সিং তলোয়ার এফিডেবিট